বঙ্গবাণী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

পঞ্চম বর্ষ—দ্বিতীয়ার্দ্ধ

ভাদ্র হইতে মাঘ

১৩৩৩

সম্পাদক—

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

কার্য্যাধ্যক্ষ ও স্বত্বাধিকারী

শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কার্য্যালয়—৭৭নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কালকাতা।

বার্ষিক মূল্য ৪৸০] [প্রতি সংখ্যা ।৵০

পঞ্চম বর্ষ

দ্বিতীয় ষাণ্মাষিক বর্ণানুক্রমিক

বিষয় সূচী

ভাদ্র হইতে মাঘ

১৩৩৩

লেখক সূচী

চিত্র সূচী

ভাদ্র

আশ্বিন

কার্ত্তিক

অগ্রহায়ণ

পৌষ

মাঘ

বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

৫ম বর্ষ ১৩৩২-'৩৩ | ভাদ্র | দ্বিতীয় ১ম সংখ্যা

হিন্দু-মুসলমান

ধর্ম্মের ভাণ

ধর্ম্মের বিরোধ যেখানেই ঘটিয়াছে সেখানেই দেখা গিয়াছে ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্মের ভাণকে অবলম্বন করিয়া মানুষ স্বার্থকে বড় করিয়াছে। কারণ, আসল ধর্ম্মের লক্ষ্যই হইতেছে ভেদ নিবারণ করা। এমন কি মানুষের স্বাভাবিক শক্তির তারতম্য যেখানে ভেদকে কিছু পরিমাণে স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছে তাহাকে অস্বীকার করিয়াই মহৎ ধর্ম্মের জন্ম। খৃষ্টান ধর্ম্ম ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানুষের ভ্রাতৃত্ব কল্পনা করিয়া ভাবের জগতে একটা যুগান্তর আনিয়াছিল। ইসলাম ধর্ম্ম ধনী, নির্ধন, স্বজাতি বিজাতিকে এক বিরাট রাষ্ট্রমণ্ডলে বাঁধিয়া সাম্যতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা কল্পনা করিয়াছিল। কিন্তু যে-ই খৃষ্টান জগতে শাদা ও কালো মানুষের স্বার্থ লইয়া একটা সংঘর্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল তখন কোথায় বা সেই একেশ্বরবাদ, কোথায়ই বা সে বিশ্বপ্রেম! ধর্ম্মই তখন শাদা ও কালো জগৎকে পৃথক করিয়া দিল, মানুষের জন্য যে ক্রুশ-বিদ্ধ প্রভুর নিত্য চরম আহুতির লীলা খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছে, সেই প্রভুর নামে এসিয়া ও আফ্রিকায় কি নৃশংস কাণ্ড না হইয়াছে!

গোঁড়ামির কারণ

ইস্‌লাম ধর্ম্ম গোড়া হইতেই একটা গোঁড়ামির উৎসাহ দিয়া আসিয়াছে। আরব-দেশের মরুভূমি জনবহুল নহে, মানুষ সেখানে কিছু পরিমাণে যাযাবর ধন সম্পত্তি ভোগে সেখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আসে নাই। এইরূপ দূরবিস্তৃত জনপদে, অপেক্ষাকৃত সরল সামাজিক জীবনের অন্তরে যে ধর্ম্ম জাগিয়াছিল, তাহা স্বভাবতঃই আত্মম্ভরী, দ্বিধাহীন, নিঃশঙ্ক। এ ধর্ম্মের আসন নিভৃত পূজাবেদী নহে, ঘোটকের পৃষ্ঠে উঠিয়া এ ধর্ম্ম গতিশীল, বিজীগিষু। দূরদূরান্তে সীমাহীন মরুভূমির উপর দিয়া মানুষ কতবার তাহার পশুগুলি লইয়া সবুজ ঘাসের অন্বেষণে চলিয়াছে। বিজন মরুভূমির মধ্যে যে বৈচিত্র্যহীনতা, যে বিরাট শূন্যতা মানুষকে যুগেযুগে অভিভূত করিয়াছে, তাহাকে সে একেশ্বরবাদে পরিকল্পনা করিয়া কেমন আপনার করিয়া লইল। এক অদ্বিতীয় আল্লাই আছেন, এ সত্য অসীম প্রান্তরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, উষ্ট্রারোহীর একমাত্র সম্বল। যুগযুগান্ত ধরিয়া উষ্ট্র ও ঘোটকের পৃষ্ঠে মানুষ ঋতুপর্য্যায়ক্রমে নূতন আবাদ ও মাঠের খোঁজে ফিরিয়াছে। ধর্ম্মও তেমনি ক্ষিরিয়া ভব ঘুরে হইল। ভ্রমণের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে জাতিতে জাতিতে অবিরাম সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। একটা প্রবল বিশ্বাস আসিল, ভগবানের ইচ্ছা, বিশ্বাসিগণ অন্য সব জাতিকে তাহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া মুক্তি দিবে। জাতি সমুদায়ের নিরন্তর স্থান-পরিবর্ত্তনেও যুদ্ধ বিগ্রহের দেশে ধর্ম্ম বিশ্ব জয়ের আহ্বান আনিল। ধর্ম্মের গোঁড়ামি জাতির অভ্যুত্থানের সহায় হইল। ক্রমে একটা বিরাট কর্ম্মঠ, ধর্ম্মপ্রাণ জাতি গড়িয়া উঠিল—যাহার শৌর্য্য ও ধর্ম্ম এসিয়া, আফ্রিকা ও ইয়োরোপের ইতিহাসকে বদলাইয়া দিল। কিন্তু ইসলাম যে সাম্রাজ্য গড়িয়াছিল তাহা ক্ষণস্থায়ী। ইসলাম ঘূর্ণীবায়ুর মত ভাঙ্গিতে জানে, মরশুম বাতাসের মত স্থায়ী সভ্যতার শক্তি দেয় নাই। তরবার দিয়া ইসলাম যাহাকে জয় করিল তাহাকে অন্য বন্ধনের দ্বারা আত্মীয় করিতে পারিল না।

উত্তর-পশ্চিমের গিরি-দ্বার দিয়া মুসলমান এদেশে প্রথম আসিয়াছিল দস্যুর বেশে, মন্দির ভাঙ্গিতে, দেশ লুণ্ঠন করিতে। তাহার পর দস্যুর বেশ ছাড়িয়া মুসলমান ক্রমে রাজবেশ গ্রহণ করিল। মঙ্গল হইতে মুঘলে রূপান্তর,—সে অনেক যুগের সামাজিক পরিবর্ত্তনের ইতিহাস।

দেশ-ধর্ম্ম

ভারতবর্ষে সেই উত্তর-পশ্চিমের সিংহদ্বার দিয়া পূর্ব্বে আরও কত জাতি আসিয়াছে, আসিয়া লোকবহুল জনপদে মিশিয়া গিয়াছে। পশ্চিম এসিয়ার মত ভারতবর্ষ লোকবিরল নহে। এখানে নানা জাতি, সভ্যতার নানা স্তরের মানুষ মিলিয়া একটা সমূহ ভাব গড়িয়া তুলিয়াছে। দ্রাবিড়, আর্য্য, শক, হুন, তুর্কমান, মঙ্গল এক বিরাট সমাজিক জীবনের ইন্ধন জোগাইল, পরস্পরের রোষানলে তাহারা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল না, বরং প্রত্যেকের অগ্নিশিখা

প্রদীপ্ত হইয়া একটা বিচিত্র রঙের স্নিগ্ধ, নিষ্কম্প জ্যোতি ভূমণ্ডলে প্রকাশ করিল। আর্য্য ও অনার্য্যের জাতি ও সভ্যতাগত বৈরভাব যেমন গ্রাম্য সমাজে বর্ণ ও অধিকার ভেদে পর্য্যবসিত হইয়া সমাজের অহিত সাধন করিতে পারে নাই, বরং পঞ্চজাতি মিলিয়া একটা সমবায়ের চেষ্টা হইয়াছিল, সেরূপ শক, হুন, মুসলমানও সমাজ-দেহের মধ্যে আপনার স্থান পাইল। ভারতবর্ষ নানা ধর্ম্মাবলম্বী। হিন্দু ধর্ম্মে অসংখ্য মতের সংস্থান আছে। নানা ভাব, নানা মত পাশাপাশি শান্তিতে থাকিতে গেলে গোঁড়ামি বিসর্জ্জন দিতে হইবে। ধর্ম্মের নিশান উড়াইয়া এই বিচিত্র জাতির ধর্ম্ম ও সভ্যতার দেশে কোন রাজাই একরাট্ হইতে পারেন নাই। "দেবানাং প্রিয়" সম্রাট্ অশোক একবার ধর্ম্মরাজ্য গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সেটাকে ধর্ম্ম বলা যায় না, সেটা সার্ব্বজনীন নীতি, উদার সমাজ-জীবনের মূলমন্ত্রগুলির সমাবেশ মাত্র। পক্ষান্তরে বিদেশী শক হুন সম্রাট ভারতবর্ষের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শিলালিপি মুদ্রায় তাঁহাদের ধর্ম্মপিপাসার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। ক্রমে ভারতবর্ষে এই ধারণাই বদ্ধমুল হইল যে, ধর্ম্ম জিনিষটা ব্যক্তির সাধনবস্তু। দেব দেবী বিভিন্ন, ধর্ম্ম বিচিত্র, মতবাদ অসংখ্য,—এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সাধনকে ধর্ম্মের চরম বস্তু মনে করা, ও অন্যের ধর্ম্ম ও মতকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখাই নিতান্ত প্রয়োজনীয় দেশ-ধর্ম্ম।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সেতু

যুযুৎসু ইসলামও এই দেশ-ধর্ম্মের প্রভাব এড়াইতে পারে নাই। মুসলমানগণের ভারতবর্ষে অবস্থানের কিছুকালের মধ্যেই এদেশের বেদান্ত ও অন্য দর্শনের নিবিড় সম্পর্কে সুফী ভাবুকতা জন্মগ্রহণ করে। সে একটা আন্তরিক, সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, তাহাতে বিজীগিষা বা জিঘাংসা নাই, আছে শুধু একটা উদার তুরীয় ভাব। এ ধর্ম্মে খলিফার প্রভুত্ব নাই। মানুষ এখানে আপনার সাধনার দ্বারাই সর্ব্বোচ্চ পদের অধিকারী। মুসলমান ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ যে সমবেত প্রার্থনা, তাহাও সুফী-ধর্ম্ম অস্বীকার করিয়া বসিল। মুসলমান বাদশাহগণও হিন্দু পণ্ডিত, সাধু সন্ন্যাসীদিগকে সমাদর করিতে লাগিলেন। বাংলার মুসলমান সম্রাটের তত্ত্বাবধানেই মহাভারত সংস্কৃত বাংলায় অনূদিত হয়।

মুসলমানগণ ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় তাহাদের প্রচণ্ড দ্বন্দ্বহীন ধর্ম্ম-ব্যাকুলতা ত্যাগ করিল। গাজনীর মামুদ ও দিল্লীশ্বর আকবরের কি প্রভেদ! আকবর নানা ধর্ম্মের তত্ত্ব বিভিন্ন সাধু ও ধর্ম্মযাজকগণের নিকট শুনিতে ভালবাসিতেন। তিনি সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়া একটা নূতন ধর্ম্মও প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। মোল্লাগণ রাজদরবারে ফতাওয়া সহি করিয়াছিল, আকবরই কুরাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকর্ত্তা, তিনিই যুগ-গুরু, "সাহিব-ই-জামান"।

এদিকে হিন্দুগণও পীর ও ফকিরগণকে আপনাদের নমস্য বলিয়া গ্রহণ করিল। ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে পীরের দরগায় এখনও হিন্দুরা পূজা দেয়। সত্যনারায়ণ বা সত্য

পীরের অলৌকিক কাহিনী যাহা বাঙালী শিশুকাল হইতে শুনিতে অভ্যস্ত তাহা কোন অতীত যুগের মিলনের স্মৃতি আজও জীবন্ত রাখিয়াছে। শিশু, নারায়ণ বা পীরকে একই চক্ষে দেখিতে শিখে। বাংলার ঘরে ঘরে সিন্নী দেওয়ার প্রথা হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্মের মিলনভূমির একটী সুন্দর উদাহরণ। মুসলমান ফকিরের অলৌকিক মহত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া কত গাথা কত প্রবাদ আজও পল্লীগ্রামে লোক মুখে চলিতেছে, সেখানে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব নাই। বৎসর বৎসর কত মেলা পর্ব্ব উৎসবে হিন্দুরা মুসলমান সাধুর পুণ্যস্মৃতি পুনর্জ্জীবিত করিতেছে। বাংলার কত জমিদার পীরের সেবাবিধানের জন্য আজও পীরোত্তরগুলি শ্রদ্ধার সহিত রক্ষা করিতেছেন। সাধুতা ও মহত্ত্বের জাতি বা ধর্ম্মবিচার গ্রাম্য সমাজ করে নাই। দরাব খাঁ ও যবন হরিদাসের সাধনা হিন্দুর ধর্ম্মজীবনের সহিত কেমন সুন্দরভাবে মিশিয়া গিয়াছে।* কবীরের একটি পুরাতন গান একজন নবীন কবি অনুবাদ করিয়াছেন।

"মস্‌জিদই যদি খোদার ডেরা, ত
অন্য মুলুক কার?
রাম যদি শুধু তীর্থে মূর্ত্ত,—
কে রাখে বাহির আর?

পূর্ব্ব দিকটা হরির ত?—আর
পশ্চিম আল্লার
আর সব দিক—সে সব কাহার?
এ বুঝা বড়ই ভার।
মসজিদই যদি খোদার ডেরা, ত
অন্য মুলুক কার?

হিয়ার ভিতর, ওরে, খুঁজে দেখ্,
বুঝে দেখ এক বার,
এখানে করীম, এখানেই রাম
এই কথাটাই সার!

কবীর কে?—সে যে আল্লা-রামের
সন্তান!—এটা স্থির
তিনিই আমার গুরুজী এবং
তিনিই আমার পীর!"

---

* প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩০

মিছিল ও গরু

নীরবে নির্ব্বিবাদে হিন্দু ও মুসলমানের এইরূপ একটা ভাব-সম্মিলন গ্রাম্য সমাজে কত যুগ হইতে যে সংঘটিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। বাংলা দেশে হিন্দু গোয়ালারা মহরমের মিছিলে তলোয়ার ও লাঠি খেলে এবং হাসেন-হোসেনের দুঃখে কাতর নিবেদন জানায়। মুসলমানও দুর্গোৎসবের সময়ে যাত্রা উৎসবে যোগদান করিয়া হিন্দু পরিবারের সহিত প্রীতি বর্দ্ধন করে। কালীবাড়ীতে মুসলমান পূজা দেয় ইহাও কত দেখা যায়। মসজিদ হিন্দুর গৃহ বা মন্দিরের পাশাপাশি উঠিয়াছে, হিন্দুর ঘণ্টা বা শঙ্খধ্বনি ও মুসলমানের আজানের বিরোধ কখনও দেখা যায় নাই। বহুবৎসর হইতে মুসলমান ব্যাণ্ড বাজাইয়া হিন্দুর বিবাহ-মিছিলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া মসজিদের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছে। এ কথা কেহ জানে না, বা শুনে নাই যে, মসজিদের সম্মুখে উৎসবের আনন্দ স্থগিত রাখিতে হইবে। দিল্লীর বিখ্যাত জুম্মা মসজিদের সম্মুখ দিয়া কত মিছিল উৎসব করিতে করিতে যায়, কখনও তাহারা বাধা পায় নাই। শুনিয়াছি রাম-লীলার সময় যখন মিছিল জুম্মা মসজিদের সম্মুখে পৌঁছাইত তখন বৃদ্ধ মৌলানাগণ মিছিলকে অভিবাদন করিয়া গোলাপজল সিঞ্চন করিত। কোন কোন মুসলমান আজ কালই মনে করিতেছেন গরু খাওয়া ধর্ম্মের একটি অঙ্গ। মৌলানা মহম্মদ আলি বলিয়াছেন, গরু কোরবাণী তিনি বা তাঁহার ভাই কখনও করেন নাই, সকল প্রয়োজনের সময় ছাগ বলি দিয়াছেন।

আমি জানি মুর্শিদাবাদ জেলায় অনেক মুসলমান আছে যাহারা জীবনে গরু খায় নাই। যে দেশের চাষে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের চলন নাই সে দেশে গোবরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার। গরু মারিলে শস্য মরিবে। শুধু শস্য মরিবে তাহা নহে জমিও বন্ধ্যা হইবে। দরিদ্র মুসলমানের পক্ষে পল্লীগ্রামে গরুর মাংস ক্রয় করাও অসাধ্য। হিন্দুদিগের মত তাহারা বেশীর ভাগই ছাগ ও মেষ মাংস খায়। পঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছি মুসলমান সেখানে জমির উত্তরাধিকার ও স্বত্ব সম্বন্ধে হিন্দু জাতিরই আইন-কানুন অবলম্বন করিয়াছে। প্রথাগত গ্রাম্য নিয়ম-কানুন কোরাণ বা মনুস্মৃতি অনুসারে হয় নাই, কৃষকগণের সুবিধা অসুবিধা অনুসারে তৈয়ারী হইয়াছে। মান্দ্রাজ প্রদেশে তানজোর জেলায় এক সুদূর গ্রামে গিয়া দেখিলাম মুসলমান সেখানে গরু কাটে না, ছাগল বলি দেয়। যত ছাগল বলি হয় তাহার উপর পঞ্চায়েত কর ধার্য্য করিয়াছে। দুই পয়সা মসজিদ ও দুই পয়সা মন্দির-সংস্কার ও উৎসবের জন্য গ্রামের তহবিলে জমা হয়। মুসলমান অন্য জাতির সহিত পঞ্চায়েতের বৈঠকে যোগদান করে, 'সমুদায়ম' অর্থাৎ সাধারণ গোচারণ-ভূমি ও জলসেচনের তত্ত্বাবধান করে এবং মন্দিরের দেব দেবীর শোভাযাত্রারও ব্যবস্থা করে। দৈনন্দিন জীবনের সাহচর্য্য এইরূপে কত উপায়ে ধর্ম্মের প্রভেদ ঘুচাইয়া একই আচার-ব্যবহার গড়িয়া তুলিয়াছে।

পশ্চিমের মোহ

যত গোল হইল—যখন এই অশিক্ষিত মুসলমানগণকে কে কুশিক্ষা দিল সুদূর আরব্য মিশর তুর্কীর দিকে চাহিতে। তুর্কীর ফেজ পরিয়া অমনি তাহারা মনে করিল তুর্কী তাহাদের জন্মভূমি। দেশের নেতারা তখন ভাবিয়া দেখিলেন না যে, এই ধারণা ভারতীয় জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত করিল। ইতিহাস ভারতীয় মুসলমানকে ভারতবাসীর সহিত অচ্ছেদ্য ভাব ও কর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিয়াছে। পুরাতন স্পেন ও আফ্রিকা বিজয়ের ইতিহাস—সে ত মৃত অতীতের গলিত শব। বর্ত্তমান যে মুসলমানকে হিন্দুর সহিত একই হীনতার বন্ধনে রাখিয়াছে। তুর্কীর খিলাফৎ গৌরব,—তাহা ত মুস্তাফা কেমেল পাশা একেবারে ধূলিধূসরিত করিয়া দিল। এখন প্রকৃত বিশ্বাসিগণের নায়ক একজন নহে, আরব দেশে দুইজন, মিশরে একজন ও তুর্কীতে আরেক। তিনি আবার বলেন যে রাষ্ট্রকে ধর্ম্মবিবর্জ্জিত করিতে হইবে তবেই মুসলমানের রক্ষা।

কিন্তু অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। তাই বিশ্বাসিগণ পশ্চিমমুখো হইয়া রহিয়াছেন। খিলাফতের অপ্রতিহত সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতেছেন। মুসলমানের এক রাজ্য ত ইতিহাস কত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে, আজও দিতেছে। খিলাফতের মর্য্যাদা ত এখন রাজারাজড়ার বিচারাধীনে। দুঃখের বিষয় এই, মহাত্মাজী তাঁহার বিপুল প্রসারিত হৃদয়ে দুর্জ্জয় ভ্রাতাকে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করিতে যাইয়া যে স্বপ্নকে ইতিহাস ভাঙ্গিয়া চূরমার করিয়া দিয়াছে তাহাতে ভুলিয়া গেলেন। রফা নিষ্পত্তি তিনিই প্রথম আরম্ভ করিলেন। এখন তিনি বুঝিয়াছেন নিষ্পত্তি ক্রমাগত বিপত্তির কারণ হইতে চলিয়াছে; অধিকন্তু 'যার জন্য চুরি করি সে-ই বলে চোর।' ধর্ম্মের দাবী অপেক্ষা দেশের দাবী যে আরও বেশী অলঙ্ঘনীয়। স্বদেশবাসীর দীনতা দূর না করিয়া, বিদেশী স্বধর্ম্মাবলম্বীকে আপনার করিয়া দেখা কূটনীতি হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে রাষ্ট্র গড়ে না, রাষ্ট্র ভাঙ্গে। বণিক স্বপ্নের মায়াজাল বুনিতে বুনিতে মূল্যবান পণ্যের বাসনগুলি সব পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। সে-কথা পদ্যপাঠে আছে। মুসলমান তাহার সেই আরব-মরুভূমি-পালিত ভবঘুরে, বিজীগিষু জীবনের স্বপ্ন দেখিতেছে। মুসলমান কৃষক দুই মুঠা অন্ন পায় না। অথচ অজস্র অর্থ বৎসর ধরিয়া আফ্রিকায় প্রেরিত হইয়াছিল। টিটাগর কাগজের কারখানার শ্রমজীবিগণের নিকট যাইয়া দেখি, ধর্ম্মঘটের সময় মুসলমান পরিবার অভুক্ত রহিয়াছে, এদিকে কলিকাতা হইতে ধুরন্ধর আসিয়া খেলাফৎ সমিতি করিয়া বহু অর্থ লইয়া গেলেন। শ্রমজীবিগণের মধ্যে একটা স্থায়ী সমিতি হইলে উপকার হয়। তাহা হইল না।' অবাস্তবই বাস্তব অপেক্ষা বেশী পাওনা আদায় করিল।

আশ্চর্য্য এই যে এই বস্তুতন্ত্রহীন ভাব লইয়া মুসলমান এত বাড়াবাড়ি করিয়াছে যে ভারতের রাজনৈতিকগণ বিচলিত হইয়া তাহাতেই মাতিয়া গেলেন। রফা নিষ্পত্তির গলদ

ঐখানে। মুসলমান পশ্চিম এশিয়ার খবরাখবরে আনন্দে অধীর অথবা বিষাদমগ্ন, অমনি ভারতীয় রাজনৈতিক তাল ঠুকিয়া তাহাতে সায় দিলেন। ভারতীয় মুসলমান এসিয়ার অন্য মুসলমান রাজের সহিত সন্ধির গুজব তুলিল, অমনি ভারতীয় রাজনৈতিক তাহার অভিমান দূর করিতে ব্যগ্র। তাই যেখানে মুসলমান ভয় দেখাইয়াছে বা চোখ রাঙ্গাইয়াছে, ভারতীয় রাজনৈতিক তখনই তাহার নিকট দেশের সাধারণ দাবী বিক্রয় করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কোন সম্প্রদায়ের সহিত দেশের বাহিরের কোন জাতি বা রাষ্ট্রের যোগাযোগ যে ভারতীয় রাষ্ট্রগঠনের প্রধান অন্তরায়, তাহা কেহ ভাবিল না। উপরন্তু, মুসলমান নবাবী আমলের স্মৃতির জীর্ণ-বর্ম্ম পরিয়া অথবা বর্ত্তমান আমীর বা কেমেল পাশার সহিত আত্মীয়তার কর-মর্দ্দন করিয়া ভাবিল বাহুবল দেখাইলে অন্য সম্প্রদায় তাহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিবে। গত দশ বৎসর তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু পরে দিল্লী, নাগপুর, কলিকাতায় বাহুবলেরও ঘাত প্রতিঘাত হইল।

ধর্ম্মান্ধতা

মুসলমানের এই নব-উন্মেষিত পরকীয়া প্রীতি ভারতবর্ষের বহুকালের সামাজিক ইতিহাসকে একরূপ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানের যে ভাব-মিলন-সেতু যুগ-পরম্পরার্জ্জিত লৌকিক সাধনার ফল, তাহা কয়েকজন মোল্লার বক্তৃতার স্রোতে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। অধিকাংশ বিবাদ দাঙ্গা-হাঙ্গামার পশ্চাতে স্বার্থানুসন্ধিৎসুর প্ররোচনা অথবা ধূর্ত্ত মোল্লার ধর্ম্মান্ধতা লুকায়িত রহিয়াছে। এ প্ররোচনা নূতন নহে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময়ও শিক্ষিত মুসলমান দেশের অভাব অভিযোগ অগ্রাহ্য করিয়া পৃথক অনুষ্ঠান তৈয়ার করিতে চাহিয়াছিল। বঙ্গ-বিভাগের সময়ও কয়েকজন মুসলমান জমিদার কম অনিষ্ট করেন নাই। ভাষা-সমস্যাও নূতন করিয়া বাংলা সাহিত্যের নিকট দেখা গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সাহিত্যের তখন চরম উন্নতির যুগ, উর্দ্দু জমান্ বাঙালা সাহিত্য-রসিকগণ তারিফ্ করিলেন না। আজও সরকারী চাকুরীর লোভে শিক্ষিত মুসলমানের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্মাভিমানী সাজিতেছেন এবং মুষ্টিমেয় চাকুরী লাভের আশায় মুসলমানের সেই পুরাতন বিজীগিষা জাগাইতে মোল্লাগণকে উৎসাহ দিতেছেন। দেশের পল্লীগ্রামে এতদিন হিন্দু-মুসলমান বিরোধ দেখা যায় নাই। জিনিষটা যে একেবারেই কৃত্রিম, নব-নাগরিক, সহরের শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যে তাহা এতদিন আবদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ তাহা পল্লীগ্রামের সেই সনাতন সহজ সরল জাতিধর্ম্ম-দ্বিধাহীন আত্মীয়তার বন্ধন মানিল না। গ্রামে গ্রামে মুসলমান আজ হিন্দু ধর্ম্মকে অবমাননা করিতে চলিয়াছে।

হিন্দু-মুসলমানের শিক্ষার তারতম্য

ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে, যে সেই সব জেলাতেই হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সুরু হইয়াছে

যেখানে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা অনেক বেশি, অথচ শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা শিক্ষিত হিন্দু অপেক্ষা অনেক কম।

	মোট অধিবাসীর শতকরা		মোট লেখাপড়া জানা		মোট ইংরাজী জানা	
	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান
বগুড়া	১৬৬	৮২৪	২৪,৭৪৩	৬৪,৫০১	৫,৭৩৩	৬,১৩৪
নোয়াখালি	২২৪	৭৭৬	৩৫,৫৮১	৫৮,৫৮৫	৭,৫০৪	৫,০৭০
রাজশাহী	২১৪	৭৬৪	৩৭,০২৫	৪২,৪০২	৭,৩১১	২,৯১৬
ত্রিপুরা	২৫৮	৭৪২	১২৪,৫০৪	১১৪,৪২১	২০,৩৮০	১১,৫৮৪
চট্টগ্রাম	২২৬	৭২৮	৬০,৪৫৪	৪৯,৫৯৭	১২,৮১০	৫,৫০৬
বাখরগঞ্জ	২৮৮	৭০৬	১৬৪,৭৭৫	১৩৩,৭৫৫	২৪,৮৫২	৬,৪০৪

মুসলমান-প্রধান জেলা মাত্রেই অশিক্ষার পরিমাণ অধিক। মোল্লারা যদি অশিক্ষিতগণের মধ্যে প্রচার আরম্ভ করেন তাহা হইলে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মুসলমান ইচ্ছা করিলেও কি ধর্ম্মোন্মত্ততার প্লাবন হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারিবেন? সমগ্র বাংলাদেশের লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যাও ধরা যাউক,—

	হাজারে লেখাপড়া জানা	হাজারে ইংরাজী জানা
হিন্দু	১৫৮	৩২
মুসলমান	৫৯	৬

উদ্বাহু বামন

অশিক্ষাই হইল আসল সমস্যা। অসংখ্য মুসলমান নিরক্ষর থাকিলে, কুরাণ শরীফের আসল উপদেশ সম্বন্ধে অজ্ঞতা দূর হইবে না। তাই মসজিদে মোল্লা কুরাণের যে ব্যাখ্যাই করিবে তাহাই মুসলমান অবিচারে গ্রহণ করিবে। অপর দিকে ধর্ম্ম অনুসারে চাকুরী দেওয়ার ফলে মুসলমানের মধ্যে উচ্চ-শিক্ষালাভের চেষ্টা জাগিতে পারিতেছে না। সঙ্গে সঙ্গে একটা অত্যন্ত অশুভকর ভাব জাগিয়াছে যে মানুষ তাহার স্বাভাবিক অযোগ্যতা সত্ত্বেও সমাজে সুবিধা পাইতে পারে। ইহাতে যোগ্যতার আদর্শ মলিন হয়, মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয়। উদ্বাহু বামন যদি প্রাংশুলভ্য ফল হইতে বঞ্চিত না হয় তাহা হইলে তাহার বামনত্বও ঘুচেনা। ধর্ম্মোন্মত্ততা ব্যাপক হইলে কতিপয় মুসলমানের উচ্চপদ বা চাকুরী লাভের সুবিধা ঘটিবে, তাই শিক্ষার

বিস্তৃতির দিকে মন না দিয়া তাঁহারা ধর্ম্মাভিমান করিয়া বসিয়া আছেন। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষের সময় অসংখ্য মুসলমানের দুরবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে কেহ খোঁজ লইলেন না, অথচ তাহাদেরই দোহাই দিয়া তাঁহারা চাকুরীর দাবী করিতে তৎপর। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কুরাণের এই বচনটি কি স্মরণ করিয়াছেন, 'যে রাজা অন্য যোগ্যতর ব্যক্তি রাজ্যে থাকিতে অযোগ্যকে কোন চাকুরীতে নিয়োগ করেন, তিনি ভগবানের বিরুদ্ধে ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাপ আচরণ করেন।'

পরস্পরের ত্যাগ

এই ধর্ম্মান্ধতার যুগে হিন্দুরাও যেন আবার ধর্ম্মের বড়াই না করিয়া বসে। যুগপরম্পরা-লব্ধ তাহাদের সেই উদারতা চাই যে, মঠেই হউক মসজিদেই হউক যেখানে কেহ ভগবানকে স্মরণ করিতেছেন কলরব করিয়া তাহাতে সে যেন বিঘ্ন না ঘটায়, হউক না শোভাযাত্রা তাঁহার একটু অঙ্গহীন, যদি কেহ রাস্তার উপর সকলের চক্ষের সম্মুখে গো-বধ করে, উত্তেজনার কোন প্রয়োজন নাই, একটা নিষ্ঠুর দৃশ্যের মত তাহা হইতে তখনই চোখ ফিরাইলেই হইল। নিত্যই ত কত নিদারুণ দৃশ্য চোখে পড়ে। কত শিকারী, আততায়ীর হস্তে পশু পক্ষী প্রাণ হারায়। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষে ত অসংখ্য জাতির খাদ্য ও আচার সম্বন্ধে অসংখ্য মত। আর্য্যগণের মধ্যেও পূর্ব্বে গো-মেধ যজ্ঞ প্রচলিত ছিল। হইলই বা না হয় একটা নূতন আচারের সৃষ্টি, এত জিনিস বরদাস্ত হইল, না হয় এটাও সহ্য করি।

গির্জ্জার সম্মুখ দিয়া ত সংকীর্ত্তনের দল যায় না। এক্ষেত্রেও হিন্দুরা একটু ত্যাগ স্বীকার না হয় করুক। মুসলমানের পক্ষে অবশ্য যথাসম্ভব নির্জ্জনস্থানে গো-হত্যা এবং হিন্দুদিগের সনাতন প্রথাকে শ্রদ্ধা করিয়া মসজিদের সম্মুখে মিছিল বা শোভাযাত্রার বিঘ্ন উপস্থিত না করাই উচিত। হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকে ত্যাগ স্বীকার বিষয়ে এখন পরস্পরের প্রতিযোগী হউক। এ প্রতিযোগিতায় অবশ্য হিন্দুকেই পথ দেখাইতে হইবে, অগ্রে দৌড়িতে হইবে, কারণ হিন্দু যে মুসলমান অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত।

রাষ্ট্রের দাবী

মুসলমান যখন রাজা ছিল তখন হিন্দু সমাজ আত্মরক্ষা কল্পে ম্লেচ্ছ খাদ্য ও স্পর্শ লইয়া কঠোর আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। রাজার জাতির সহিত পারিবারিক লেন-দেনের ফলে বিষম সামাজিক অনিষ্টের তখন সম্ভাবনা ছিল। হিন্দু ও মুসলমান এখন দুই-ই অন্য জাতির অধীনে। খাদ্য ও স্পর্শ দোষ সম্বন্ধীয় অস্বাভাবিক, অপ্রীতিকর সামাজিক নিয়মগুলিকে হিন্দু এখন বর্জ্জন করুক। মানুষের দেহে রক্ষিত অতীত ইতিহাসের নিদর্শন অস্থিখণ্ডের মত এগুলির আর কোন প্রয়োজন নাই, বর্ত্তমান যুগে রাষ্ট্রগঠন বিষয়ে এ জীর্ণ অস্থিগুলি বরং

বাধা দিতেছে। আচার ব্যবহারে সমতা আসিলে হিন্দু অনায়াসেই মুসলমানের শিক্ষার ভার লইতে পাইবে। মসজিদই যে মুসলমানের একমাত্র শিক্ষার স্থান তাহা ত নহে। গ্রামে গ্রামে বিবিধ অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠুক। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আমরা যে পরিমাণে দেশের কাজে লাগিতে পারিব সেই পরিমাণে আমাদের স্বরাজ লাভের আমাদের সভ্যতার ক্রমবিকাশের সুবিধা ঘটিবে। আগে হিন্দু ও মুসলমানের বল পরীক্ষা হইবে, তবে স্বরাজলাভ হইবে,—এ ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। হিন্দুরা যদি ইহা কল্পনা করে তাহা হইলে তাহাদিগকে বলিতে হইবে বিন্ কাশিমের সিন্ধুদেশ আক্রমণের সময় এ প্রতিজ্ঞা করিতে হইত। মুসলমান যদি ইহা ধারণা করে তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময় এ কল্পনা কার্য্যকরী করিতে তাহাদিগকে চেষ্টা করিতে হইত। স্বরাজের অর্থ স্বধর্ম্ম নহে। এমন কি স্বধর্ম্ম স্বরাজের বিপরীত অর্থ। কারণ হিন্দু-রাজ বা মুসলমান-রাজ স্বরাজলাভের আশা সুদূরপরাহত করিবে। ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া রাষ্ট্রের ও সমাজের উন্নতির পথ অব্যাহত রাখা ইহাই হইল ভারতবর্ষের সনাতন সাধনা। আবার ইহাই বর্ত্তমান রাষ্ট্রগঠনের একমাত্র উপায়। ইসলামকেও তাহার জন্মাধিকার ত্যাগ করিয়া এই নূতন আবেষ্টনের ছাঁদে এই নূতন রাষ্ট্রনীতির অবলম্বনে নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতে হইবে। দেশই যে সব চেয়ে বড় সত্য, ধর্ম্ম নহে। সমাজের দাবী অপেক্ষা রাষ্ট্রের দাবী যে অনেক বড়। এই দুইটি তত্ত্ব আমাদের মনে যদি সদাসর্ব্বদাই জাগ্রৎ থাকে তবে সব বিরোধেরই সহজে মীমাংসা হয়।

আষাঢ়, ১৩৩৩

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

প্রজাপতি

রং করা; হরকরা চলেছে উড়িয়া,
বুকে চাপা, নাম ছাপা লিফাফা ধরিয়া
বনভূমে, ছিল ঘুমে কুসুম রূপসী,
জেগে উঠে, পায়ে লুটে পড়ে তার খসি॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

নিষ্কৃতি

গোটা দুপুরটা এবং অর্দ্ধেকটা বৈকাল দিবানিদ্রায় কাটাইয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নিবারণচন্দ্র হাই তুলিয়া, তুড়িদিয়া, আলিস্যি ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল, এবং নরম একটা বালিস কোলের উপর তুলিয়া লইয়া সুমুখের খোলা জানলাটার ভিতর দিয়া নিদ্রালস চক্ষু দুটির অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন ফাঁকা অলসদৃষ্টি বাহিরের দিকে মেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

জানলাটার কোলেই একটা সরু গলি এবং তার পরেই একটি জীর্ণ সংস্কারবিহীন দোতালা বাড়ীর ইট-বারকরা পুরাতন দেয়াল, এবং তাহাতেই সংলগ্ন একটা সেকেলে ধরণের আলকাতরা মাখান ছোট্ট ভাঙ্গা জানালা—তাও বন্ধ। সুতরাং অলস নিবারণচন্দ্রের অলসতর চক্ষুদুটির বেশীদূরে চলিয়া গিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িবার বিশেষ ভয় ছিল না।

আজ সকাল হইতেই বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। নিবারণচন্দ্র আহারান্তে দ্বিপ্রহরে শয্যায় গিয়া যখন শুইয়া পড়িয়াছিল তখন আকাশটা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইয়াছিল; কিন্তু আকাশটা সেদিন সত্যসত্যই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল কিনা তাহা আর নিবারণচন্দ্রের দেখা হয় নাই। তারপর একবারে সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই কিছুক্ষণ হইল চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিয়া সে দেখিল—আকাশটা আস্তই রহিয়া গিয়াছে,—কিন্তু, তখন পর্য্যন্ত ভিজে ভিজে; অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশেষে শ্রান্ত হইয়া কেহ যদি চুপ করে, তখনও পর্য্যন্ত তার চোখের পাতা দুটো যেমন ভারি ভারি এবং ভিজে ভিজে দেখায়, অনেকটা সেই রকম। সুমুখের ভাঙ্গা জানালাটা দিয়া তখনও পর্য্যন্ত অল্প অল্প জল চোঁয়াইতেছিল এবং জানালাটার কোলের কার্ণিশের ফাটলে যে শিশু অশ্বত্থ গাছটি আজ বছর খানেক হইল ভূমিষ্ঠ হইয়া অল্প অল্প করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল, তাহারি কচি কচি পাতা এবং সরু সরু ডালগুলি সারাদিন জলে ভিজিয়া ক্ষান্তবর্ষণ সন্ধ্যার জোলো হাওয়ায় শির্ শির্ করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। নিবারণ চুপ করিয়া সেই দিক পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

আজ বছর খানেক হইল নিবারণচন্দ্র তার পূর্ব্বের বাসা ছাড়িয়া এই নূতন বাসাটিতে উঠিয়া আসিয়াছে, এবং বছরখানেক ধরিয়া সে এই ভাঙ্গা বাড়ীটার ইট-বারকরা জীর্ণ দেয়াল, এবং তাহার গায়ে-বসান জীর্ণতর এই বন্ধ জানালাটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া এমনই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, ইহার দিকে চাহিয়া একটিমাত্রও চিন্তা মনের ত্রিসীমানায় আসিতে না দিয়া সে বোধ হয় একটা গোটাদিন পরম নির্ব্বিকারভাবে কাটাইয়া দিতে পারিত। তার নিঃসঙ্গ কর্ম্মহীন, দায়িত্বহীন নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা এবং এই জনপ্রাণিহীন লোক-কোলাহলশূন্য, নির্জ্জন খালি বাড়ীটার অলস, নির্জ্জন উদ্দেশ্যশূন্য অস্তিত্বের মধ্যে কোথায় যেন বেশ একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র ছিল। আজ একবৎসর ধরিয়া এই বাড়ীটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিবারণ

দেখিয়া আসিতেছে একটিবারের জন্যও সুমুখের সেই জানলাটা খোলা ত দূরের কথা, একটু নড়িলও না, একটিবারের জন্যও একদিন কাঁপিয়া উঠিল না। কেবল বাদলার দিনে, দুর্য্যোগের রাতে যেদিন তার মত নীরস, নিরর্থক একঘেয়ে জীবনটার মাঝখানেও হঠাৎ মুহূর্ত্তের জন্য কে আসিয়া যেন নাড়া দিয়া চলিয়া যায়, সেইদিন কেবল এই ভাঙ্গা নির্জ্জন খালিবাড়ীটার ঐ জীর্ণ ছোট্ট ভাঙ্গা জানালাটা মাঝে মাঝে খট্ খট্ করিয়া নড়িয়া উঠিত।

কিছুক্ষণ সেইভাবেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া নিবারণ অলস এবং জড়িতকণ্ঠে ডাকিল—"বেহারী!", কিন্তু প্রত্যুত্তরে কোন সাড়া আসিল না। গলার স্বরটাকে অতিকষ্টে আর একটু জোর করিয়া লইয়া সে আবার ডাকিল—"বেহারী!"—তথাপি কোন সাড়া আসিল না। ধীরে ধীরে কোলের উপর হইতে বালিসটা শয্যার উপর নাঁমাইয়া রাখিয়া নিবারণ উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, হঠাৎ একটা খট্ খট্ শব্দে চমকিয়া উঠিয়া, সেই ভাঙ্গা বাড়ীটার দিকে চাহিয়াই কি মনে করিয়া সে নিশ্চল হইয়া আবার বসিয়া পড়িল। তার মনে হইল এতদিনের সেই বন্ধ জানলাটা ভিতর হইতে কিসের আকর্ষণে সহসা যেন নড়িয়া উঠিল,—সে অবাক হইয়া সেই দিক পানে চাহিয়া রহিল। তার বুকটা কেন কে জানে যেন ভিতর হইতে দুর দুর করিয়া উঠিল,—কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল। অকস্মাৎ অস্বাভাবিক আকস্মিক কিছু একটা চোখের সুমুখে ঘটিতে দেখিলে লোকে যেমন স্তম্ভিত হইয়া সেইদিক পানে একদৃষ্টে চাহিয়া নিশ্চল হইয়া থাকে, সে ঠিক সেইভাবে ঘনায়মান সন্ধ্যার আলো ও ছায়ার আবছায়ার মধ্যে ভূতাবিষ্টের মত একদৃষ্টে সেই জানলাটার দিকে চাহিয়া নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। খানিকক্ষণ ধরিয়া খট্ খট্ শব্দ করিয়া নড়িয়া চড়িয়া হঠাৎ এক সময় জানালাটা সত্যসত্যই তার চোখের সুমুখে আজ খুলিয়া গেল। তার পরেই দেখা গেল, এই এতদিনের বন্ধ জীর্ণ নিঃশব্দ জানালাটার কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে একটি সুন্দর কোমল বালিকা আর তার কোলে একটি তেমনই সুন্দর নিটোল নধর শিশু,—পরিপূর্ণ প্রাণপ্রাচুর্য্যে টল্‌টল্ ঢল্‌ঢল্ করিতেছে। সেই দিক পানে অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ কি মনে করিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া নিবারণ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং হঠাৎ অত্যন্ত জোরে চেঁচাইয়া উঠিল, "বেহারী—এই বেহারী!" নীচের উঠান হইতে উত্তর আসিল—"আজ্ঞে!" এবং সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়াইতে দৌড়াইতে বেহারী আসিয়া সুমুখে দাঁড়াইল,—তার চোখে মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। নিবারণচন্দ্রকে সে অনেকদিন হইতে দেখিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহাকে চেঁচাইয়া কথা বলিতে বা ধমকাইতে সে বড় একটা দেখে নাই; আজ হঠাৎ তাহাকে এরূপ ভাবে চীৎকার করিয়া ডাকিতে শুনিয়া বেহারী বেশ একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিল—সে তটস্থ ভাবে সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"বাবু!"

স্বাভাবিক নরম সুরে নিবারণ বলিল—"তামাক সেজে ঘরে দিয়ে আয় দেখি!"—

কথাটা শেষ করিয়াই দড়িতে ঝোলান একটা গামছা টানিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিয়া চটিজোড়ার মধ্যে পাদুটো প্রবেশ করাইয়া দিয়া নিবারণ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

মুখ হাত পা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া নিবারণচন্দ্র যখন চটিজোড়াটা চৌকাঠের বাহিরে ছাড়িয়া ঘরে ঢুকিল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সুমুখের বাড়ীর সেই জানালাটার দিকে চাহিয়া সে দেখিল, সেই জীর্ণ ভাঙ্গা জানালাটা কখন এক সময় আবার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সমস্ত দিনব্যাপী দুর্য্যোগের ঘনান্ধকারপূর্ণ কালো মেঘের গুমোট ভাঙ্গিয়া একটা মলিন ছিন্ন মেঘের বাতায়নের ধারে কখন একসময় চুপি চুপি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে - প্রতিপদের চন্দ্রখানি — নির্ম্মল, নিটোল, শুভ্র।

(২)

নিবারণচন্দ্রের বয়স হইয়াছে, —তা প্রায় ৫০শের কাছাকাছি, কিন্তু আজও সে অবিবাহিত। অনেকেই বিবাহ করে না পয়সার অভাবে; নিবারণচন্দ্রের কিন্তু পয়সার ভাবনা আদবেই ছিল না। তার বাপ ৺গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই একমাত্র বংশধরটির জন্য দেশে যে প্রকাণ্ড জমিদারী রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহার আয়ে একটি কেন দশটি বিবাহ করিলেও নিবারণকে অন্নের চিন্তা কোন দিনই করিতে হইত না, —কিন্তু তথাপি সে বিবাহ করিল না।

নিবারণ ছেলেবেলা থেকেই বড্ড বেশী অলস —দেহে এবং মনে। তার আর একটি স্বভাব ছিল, সে ভুলিয়াও কখন কোনরূপ ঝঞ্ঝাট বা গোলমালের দিকে ঘেঁষিতে চাহিত না। ছেলেবেলায়, যে সময় তাহারি সমবয়স্ক সঙ্গীরা ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখিয়া মাতামাতি করিয়া বেড়াইত, সেই সময় বালক নিবারণচন্দ্র সকলের অজ্ঞাতসারে চুপি চুপি কখন সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত —পাছে ছুটাছুটি করিতে গিয়া হাত পা ছড়িয়া যায়। ছেলেবেলা হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহাকে কেহ কখন জোরে হাঁটিতে বা জোরে কথা বলিতে শুনে নাই। দুনিয়ার যতকিছু ঝঞ্ঝাট এবং গণ্ডগোল হইতে নিজেকে কোনও রকমে বাঁচাইয়া যাওয়াই ছিল তার জীবনের একমাত্র কাজ।

তারপর বাল্য কাটাইয়া নিবারণ হঠাৎ একদিন যৌবনে পদার্পণ করিল, কিন্তু সুখ অপেক্ষা সোয়াস্তিপ্রিয় এই অলস নির্জ্জীব প্রাণীটির মনের গতির বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন বাহির হইতে লক্ষ্য করা গেল না। সঙ্গী সে বাল্যেও ভালবাসিত না, যৌবনেও ভালবাসিতে শিখিল না। বড়লোকের ছেলে, সুতরাং গ্রামের অনেকেই আসিয়া লেজুড় হইয়া পড়িবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিল।—বয়স অল্প, মাথাটাও কাঁচা, সুতরাং চর্ব্বণ করিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না—এমনিটাই ছিল তাহাদের ধারণা; কিন্তু দাঁত ফুটাইতে গিয়া তাহারা দেখিল সকলের অজ্ঞাতসারে অল্প বয়সেই এই কচি মাথাটা কখন এক সময় শুকাইয়া, পাকিয়া একবারে ঝুনা হইয়া গিয়াছে। তাহারা ভাবিয়াছিল ছেলেবেলায় যে লোকটা ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি করিয়া

হাত পা ভাঙ্গিবার ভয়ে তাহাদের কাছ হইতে সর্ব্বদা দূরে দূরে থাকিতে চাহিত, আজ আসন্ন যৌবনের স্বপ্নময় ক্ষণটিতে তক্তাপোষের উপর অলসভাবে তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া বসিয়া খোসগল্প এবং আরও পাঁচরকম ফষ্টি-নষ্টি করিবার বেলায় সেই লোকটাই সাগ্রহে তাহাদিগকে আহ্বান করিবে ; কিন্তু এখানেও সে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল এবং তাহাদের ভয়ে অন্দরে গিয়া সেই যে গা ঢাকা দিল, তার্ পর হইতে তার টিকিটি পর্য্যন্ত কেহ আর দেখিতে পাইল না।

অল্প বয়সেই নিবারণের মার মৃত্যু হয়। সংসারে থাকিবার মধ্যে ছিল, বৃদ্ধ গোবিন্দচন্দ্র এবং তাঁরই দূর সম্পর্কীয় এক বৃদ্ধা ভগ্নী। গোবিন্দচন্দ্রের অনেকগুলি পুত্র-কন্যা জন্মিয়াছিল, কিন্তু কেহই বেশী দিন টিঁকিয়া থাকে নাই। অবশেষে অসংখ্য সন্ন্যাসীর জটা নিংড়ান জল, পিরের দরগার চৌকাঠের মাটি, নানান জানোয়ারের নখর, শৃঙ্গ এবং খুর, নানান জাতীয় অদ্ভুত অদ্ভুত বৃক্ষের অদ্ভুততর শিকড় এবং তাহার উপর অসংখ্য মাদুলি, কবচ ও তাবিজের গুণেই হৌক বা অন্য যে কারণেই হৌক অবশেষে নিবারণচন্দ্র সত্যসত্যই টিঁকিয়া গেল। কিন্তু মৃত্যুর দেশ হইতে জোর করিয়া কবচ ও মাদুলি দিয়া বাঁধিয়া ফিরাইয়া আনা এই ছেলেটি বাঁচিয়া থাকার দেশে আসিয়াও মরণের-দেশের অনেকখানি আবহাওয়া নিজের চারিদিকে ধরিয়া রাখিল, এবং বাঁচিয়া থাকিয়াও যে সকল লক্ষণ দেখাইতে লাগিল তাহা সজীব অপেক্ষা নির্জ্জীব পদার্থের মধ্যেই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এহেন নিবারণ চন্দ্রের বয়স যখন ২১ কি ২২, সেই সময় গোবিন্দচন্দ্রের হইল স্বর্গলাভ, এবং সমস্ত জমিদারীটা একরাশ ঝঞ্ঝাট ও দায়িত্ব পশ্চাতে লইয়া তার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িবার জন্য হঠাৎ একমুহূর্ত্তে থাবা মেলিয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দচন্দ্রের অন্তরঙ্গ এক উকিল বন্ধু ছিল। লোকটি প্রবীণ, বিচক্ষণ এবং সৎ। কলিকাতা হাইকোর্টে তাঁর বেশ পশার এবং নামডাক ছিল। মামলা মোকর্দ্দমা বা বিষয় সংক্রান্ত কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলেই গোবিন্দচন্দ্র তাঁর এই উকিল বন্ধুটির শরণাপন্ন হইতেন। আজ এই দুর্দ্দিনের দিনে নিবারণ তাঁহাকেই চিঠি লিখিয়া দেশে আনাইল, এবং কাঁদিয়া কাটিয়া পায়ে ধরিয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিল। পিতৃবন্ধু অটল, তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, "অত অধীর হ'লে ত চলবে না বাপু! তোমাকেই ত এতবড় জমিদারীটার সমস্ত ভার আজ থেকে ঘাড়ে নিতে হবে, এখন থেকে শক্ত না হলে চলবে কেন!" নিবারণ এবার সত্যসত্যই হতাশ হইয়া পড়িল ; সে অটলের পা দুটো জড়াইয়া ধরিয়া ৫ বৎসরের শিশুর মত করিয়া ডুগরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল "আমাকে বাঁচান কাকাবাবু, আমি ওসব ঝঞ্ঝাট পোয়াতে পারবো না।" অটল ধমকাইয়া উঠিলেন—"পারবে না কি রকম? তবে কি পৈতৃক জমিদারীটা একবারে বরবাৎ করে দিতে চাও?" নিবারণ আর কোন কথা বলিল না, সে হতাশ ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া অটলের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিচক্ষণ অটলচন্দ্র বুঝিলেন, ব্যাপার বড় সুবিধার নয়। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পাঁচজনের

সহিত পরামর্শ করিয়া নিকটবর্ত্তী আর একটি জমিদারের নিকট নিবারণের সমস্ত জমিদারী বিক্রয় করিয়া দিলেন এবং পুরাপুরি সমস্ত নগদ টাকা তাহার নামে ব্যাঙ্কে জমা দিয়া একরাশ ঝঞ্ঝাট এবং গণ্ডগোলের হাত হইতে তাহাকে পরিত্রাণ করিলেন।

ইহার পর নিবারণ তার পৈত্রিক বাটিতে কয়েক মাস মাত্র বাস করিয়াছিল ; কিন্তু অবশেষে সেখানে টিঁকিয়া থাকা তাহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। মাথার উপর কেহ নাই, অথচ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রহিয়াছে প্রচুর নগদ টাকা,—মাসে মাসে সুদও আসিতেছে সেই পরিমাণ ; গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা আসিয়া তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিল, এবং কে কত আত্মীয়তা জানাইতে পারে তাল্ঠুকিয়া তাহারি মহড়া দিতে সুরু করিয়া দিল। গতিক বড় সুবিধার নয় বুঝিয়া নিবারণচন্দ্র অন্দরে আশ্রয় লইল, কিন্তু সেখানে গিয়াও সে নিষ্কৃতি পাইল না ; কোথা হইতে হঠাৎ একরাশ খুড়ী, পিসী, মাসী ও মামীর দল চারিদিক হইতে আসিয়া জুটিয়া গেল এবং তাহার প্রতি যে পরিমাণ মোলায়েম এবং মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল, পরস্পরের প্রতি ঠিক সেই পরিমাণই কটূক্তি এবং গালাগালি প্রয়োগ করিয়া নিজের নিজের দাবী এবং অন্য আর সকলের অনধিকার প্রমাণ করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। ফলে নিবারণচন্দ্রকে যিশুখৃষ্টের মত করিয়াই সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিতে হইল—'বন্ধুদের হাত হতে আমায় বাঁচাও প্রভু।"

ইহার কয়েক মাস পরেই নিবারণের দূর সম্পর্কীয়া পিসীঠাকরুণ সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন এবং নিবারণও সেই সঙ্গে গ্রামত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বড় রাস্তার উপর একটি দ্বিতল বাড়ী ভাড়া করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কলিকাতায় আসিয়া প্রথম কয়েকটা মাস সে বেশ দিব্য নির্ঝঞ্ঝাটে দিনের পর দিন কেবল ঘুমাইয়া এবং আহার করিয়া কাটাইয়া দিল, কিন্তু এই তুরিয়ানন্দ তাহাকে বেশীদিন ভোগ করিতে হইল না—হঠাৎ কেমন করিয়া কে জানে পাড়ার লোকে টের পাইয়া গেল, পল্লীগ্রাম হইতে সদ্য-আগত এই যুবকটির পশ্চাতে টাকা আছে বহুত, অথচ মাথার উপর অভিভাবক নাই একজনও। তাহার পর এক্ষেত্রে স্বভাবতঃ যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইল, অর্থাৎ হরেক রকমের লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল, এবং এই নিঃসঙ্গ নিঃসহায় যুবকটির জন্য প্রত্যেকেরই দারুণ মাথা ব্যথার লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল ; তাহার উপর আসিয়া জুটিল রাজ্যশুদ্ধ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দল, তাদের রকমারি আবেদন নিবেদন লইয়া। নিবারণ বাসা ভাড়া লইয়াছিল দরজীপাড়ায়—হঠাৎ একদিন উঠিয়া গেল একেবারে ভবানীপুর অঞ্চলে। এখানে আসিয়া যথাসাধ্য আত্মগোপন করিয়া সে বৎসরখানেক কাটাইয়া দিল, কিন্তু তাহার পরই কেমন করিয়া কে জানে কন্যাদায়িকের দল তাহাকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, এবং অতঃপর যাহা ঘটিল, তাহা নিবারণচন্দ্রকে এখানেও টিঁকিতে দিল না। ইহার পর নিবারণচন্দ্র গিয়া বাসা ভাড়া লইল একবারে মাণিকতলার এক মুসলমান পল্লীর

মাঝখানে। সে পাড়ায় মাত্র তিনখানি কোটাবাড়ী, বাদবাকী আর সব খোলার ঘর এবং মাট-কোঠা। এখানে আসিয়া নিবারণ কয়েক বৎসর পরম নিশ্চিন্ত ভাবে, নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাইয়া দিল।

বিবাহের বয়স তার অনেক দিনই হইয়াছিল—অর্থের অভাবও ছিল না, তথাপি নিবারণ বিবাহ করিল না—পাছে ঝঞ্ঝাট বাড়িয়া যায়। পাড়ার লোকে তাহার সহিত যাচিয়া বন্ধুত্ব করিতে আসিলে সে যেমন চাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইত, সে বাড়ী নাই—পাছে ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হয়,—ঠিক তেমনি করিয়াই তার বক্ষের দরজায় নবযৌবন যখন আসিয়া ঘা মারিতে লাগিল, সে ভিতর হইতে বলিয়া পাঠাইল—"বাড়ী নেই—বাড়ী নেই!" বিবাহ করিতে হয়ত সুখ আছে, কিন্তু সোয়াস্তি কোথায়? অর্থের জন্য তাহাকে না হয় মাথা ঘামাইতে হইল না, কিন্তু তার পর? অর্থ দিয়া চাল ডাল কেনা যাইতে পারে, কিন্তু দায়িত্ব, দুশ্চিন্তা, রোগ, শোক এসকলের হাত হইতে নিষ্কৃতি, সে ত আর অর্থ দিয়া কেনা যায় না; সুতরাং নিবারণচন্দ্র ঠিক করিল, জীবনে সে কখন বিবাহ করিবে না, এবং যেমন আছে ঠিক এমনি ভাবেই সারাটা জীবন পরম নিশ্চিন্ত ও নির্ব্বিকার ভাবে আহার করিয়া এবং নিদ্রা দিয়া কাটাইয়া দিবে, এবং ইহারই মধ্যে যেটুকু নূতনত্ব এবং বৈচিত্র্য তাহার সাধ্যায়ত্ত, তাহা সে ষোল আনার যায়গায় আঠার আনা ভোগ করিয়া লইবে, যথা—বাদলার দিনে খিচুড়ি ও ইলিসমাছভাজা, শীতের দিনে গলদা চিংড়ি ও ফুলকপি, গ্রীষ্মের দিনে ল্যাংড়া আম—এমনি আরো কত কি,—তার উপর আছে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস, এবং তাহারও উপর আছে মধ্যে মধ্যে বায়স্কোপ দেখিতে যাওয়া, সুতরাং অলম্ অতি বিস্তরেণ।

যাক্ এইভাবে বাড়ীর পর বাড়ী বদলাইয়া আরও ২০টা বৎসর আহার করিয়া, ঘুমাইয়া, ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়িয়া এবং মধ্যে মধ্যে বায়স্কোপ দেখিয়া কাটাইয়া, আজ একবৎসর হইল সে এই নূতন বাড়ীটিতে উঠিয়া আসিয়াছে। বয়স তার এখন ৫০শের কাছাকাছি, কিন্তু মাথায় টাক পড়ায় এবং সুমুখের কয়েকটা দাঁত সকাল সকাল পড়িয়া যাওয়ায় তাহাকে দেখিলে ৬০ বছরের কম বলিয়া মনে হয় না।

এই নূতন বাড়ীটিতে উঠিয়া আসিয়া অবধি একটা বৎসর সে বড়ই শান্তিতে কাটাইয়াছে। বাড়ীটি একটি সরু গলির মধ্যে; সুতরাং গাড়ীঘোড়ার ঘড়্‌ঘড়ানির বালাই নাই; তাহার উপর সুমুখের যে বাড়ীটা হইতে সে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়াছিল, কিছুদিন পরেই জানিতে পারিল সে বাড়ীটি আজ কয়েকবৎসর ধরিয়া খালি পড়িয়া রহিয়াছে, এবং আরও কতবৎসর যে এই ভাবেই খালি পড়িয়া থাকিবে তাহারও কোন ঠিক ঠিকানা নাই। বাড়ীটির দুই সরিকে মামলা চলিতেছিল, এবং এই মামলার ফলে কোন পক্ষ যে এই বাড়ীর মালিক হইবেন তাহারও কোন স্থিরতা ছিলনা। ফলে বাড়ীটি খালিই পড়িয়া রহিল, এবং একে অনেককেলে পুরাতন বাড়ী, তাহার উপর অনেক দিন যাবৎ সংস্কার না হওয়ায় দিন দিন জীর্ণ দীর্ণ হইয়া কঙ্কালসার হইয়া

পড়িতে লাগিল। সে যাহাই হৌক, এই ভগ্ন-জরাজীর্ণ বাড়ীটির কাছ হইতে কোনরূপ শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা না থাকায় নিবারণ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, এবং তার শয়নকক্ষের বাতায়ন পথে ইহারেই রুদ্ধ ভগ্ন জানালাটির দিকে চাহিয়া পরম নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার ভাবে দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতে লাগিল।

(৩)

যেদিন সন্ধ্যায় নিবারণচন্দ্র প্রথম আবিষ্কার করিল, সুমুখের ঐ ভাঙ্গাবাড়ীর ভাঙ্গা জানালাটা চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া যায় নাই, ঠিক তাহার পর দিন সকাল ৯টা আন্দাজের সময় সে বাহিরের ঘরে তক্তাপোষের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে একটা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়িতেছিল। গভীর রাত্রে অন্ধকারপূর্ণ একটা সরু গলির মধ্যে গোয়েন্দা দেবেন্দ্রবিজয়ের কানের পাশ দিয়া এই কিছুক্ষণ হইল উপরিউপরি তিনটি গুলি শন্ শন্ শব্দে ছুটিয়া গিয়াছে। উত্তেজনা উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কায় নিবারণচন্দ্রের একেবারে দম আটকাইয়া যাইবার উপক্রম, এমন সময় সেই কক্ষে একটি দশ এগার বৎসরের বালিকা প্রবেশ করিল—কোলে তার মোটাসোটা একটি উলঙ্গ শিশু। নিবারণ কিন্তু ইহার কিছুই টের পাইল না, সে তখন ডিটেক্‌টিভের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কল্পনায় অনেকদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। মেয়েটি ঘরে ঢুকিয়া কোন কথা না বলিয়া প্রথমেই ছেলেটিকে তক্তপোষের উপর বসাইয়া দিল, তারপর কোমরের যে কসিটা আল্‌গা হইয়া গিয়াছিল, সেটাকে শক্ত করিয়া আঁটিয়া লইল। তখনও নিবারণচন্দ্র সেই ভীষণ স্থান হইতে ফিরিয়া আসে নাই এবং গোয়েন্দাপ্রবর বীরবর দেবেন্দ্রবিজয়ের জীবন তখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ হয় নাই। সুতরাং নিবারণচন্দ্র কিছুই জানিতে পারিলনা। মেয়েটি এই মোটাসোটা ভারি ছেলেটিকে এতটা বহিয়া আনিয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল,—কাপড়টাকে ঠিক করিয়া পরিয়া লইয়া সে তক্তাপোষের একপ্রান্তে ছেলেটির পাশে ধীরে ধীরে বসিল। —কিন্তু গোয়েন্দা দেবেন্দ্রবিজয় তখন পর্য্যন্ত শত্রুকবলে—জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে।—এমন সময় হঠাৎ মেয়েটির অসাবধানতায় শিশুটি তক্তাপোষের উপর হইতে সশব্দে মেঝের উপর মুখ ঠুকিয়া পড়িল, এবং তারপরই এই দস্যু-শিশুটি এমনি বিকটস্বরে কাঁদিয়া উঠিল যে, গোয়েন্দা দেবেন্দ্রবিজয়কে শত্রুকবলে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া নিবারণচন্দ্রকে লাফাইয়া বই ফেলিয়া উঠিয়া পড়িতে হইল। মেয়েটি শশব্যস্তে ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইল এবং নানাপ্রকারে তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। নিবারণচন্দ্র প্রথমটা অবাক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইল। এক মুহূর্ত্তে গতকল্যকার সেই জানালা খোলার অপূর্ব্বতা তার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। ছেলেটি একটু শান্ত হইলে নিবারণ জিজ্ঞাসা করিল—বড্ড লেগেছে কি? মেয়েটি তাহাকে কোলে করিয়া ঘরময় পাচারি করিতে করিতে বলিল—"না, তেমন বেশী লাগেনি।"

ছেলেটি কিছুক্ষণ ফোঁপাইয়া অবশেষে শ্রান্ত হইয়া তার দিদির কাঁধে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মেয়েটি অত্যন্ত সন্তর্পণে ধীরে ধীরে তাহাকে তক্তাপোষের উপর শোয়াইয়া দিল, এবং তক্তাপোষের উপর হইতে তালপাতার একটা পাখা কুড়াইয়া লইয়া তাহার পাশে বসিয়া ধীরে ধীরে তার মাথায় হাওয়া করিতে করিতে নিবারণের দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনাদের বাড়ীর মেয়েরা সব বুঝি দেশে চলে গেছেন ?"

নিবারণচন্দ্র এতক্ষণ চুপ করিয়া হতভম্বের মত এই মেয়েটির কার্য্যকলাপ দেখিয়া যাইতেছিল; এ অবস্থায় কেমন করিয়া সে যে এই সম্পূর্ণ অপরিচিতা বালিকাটির সহিত আলাপ করিবে তাহা তার মাথায় কিছুতেই জোগাইতেছিল না—অথচ চুপ করিয়া বসিয়া থাকাটাও যে নেহাৎ অশোভন হইতেছে তাহাও সে বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিল,—এমন সময় মেয়েটি নিজেই প্রথমে কথা কহিয়া তাহাকে প্রকাণ্ড একটা সমস্যা-সমাধানের গুরুভার হইতে বাঁচাইয়া দিল।

ঘাড় চুলকাইয়া—দুচারবার ঢোক গিলিয়া লইয়া নিবারণ উত্তর দিল, "মেয়েরা ত কেউ এবাড়ীতে থাকে না।"

মেয়েটি আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তাঁরা সব দেশে থাকেন বুঝি ?"

নিবারণ অনেক কষ্টে এই মেয়েটিকে বুঝাইয়া দিল যে, এ দুনিয়ায় সে একা, এবং তাহার সহিত স্ত্রীলোকের সম্পর্ক তার মার মৃত্যুর পর হইতে একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছে। মেয়েটি তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুলের রাশ দোলাইয়া অবাক হইয়া বলিল—

"তা হ'লে রেঁধে দেয় কে ?"

"কেন উড়ে বামুন আছে সেই রেঁধে দেয়।"

ইহার উত্তরে বালিকা আর কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু তার মুখের ভাবে বুঝিতে পারা গেল—উত্তরটা তার আদবেই মনঃপূত হয় নাই।

এই একদিনের আলাপেই নিবারণের সহিত এই ক্ষুদ্র বালিকাটির বেশ সহজেই ভাব হইয়া গেল, এবং জীবনে এই প্রথম সে আবিষ্কার করিল, মানুষের সহিত আলাপ করিয়া মানুষ হয়ত বা খানিকটা আনন্দ পাইতেও পারে। তাহার পর প্রতিদিনই এই শান্ত সরল মেয়েটি তার ভাইটিকে কোলে লইয়া আসিতে আরম্ভ করিল, এবং অ-সমবয়সী এই দুটি প্রাণী গল্প করিয়া ডিটেকডিভ উপন্যাস পড়িয়া এমনি আরো কতরকম ছেলেমানুষী করিয়া দিবসের অধিকাংশ সময় পরম আনন্দে নির্ভাবনায় কাটাইয়া দিতে লাগিল। দুনিয়ার কেজো এবং সংসারী লোকেদের সহিত মিশিতে গিয়া যে লোকটাকে বার বার পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে, আজ এই অতি-বড় অসংসারী এবং অকেজো ক্ষুদ্র বালিকাটির সহিত মিশিবার বেলায় সেই লোকটাই সবচেয়ে উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গেল, এবং এই

নূতন অবিষ্কারের বৈচিত্র্য তাহার মধ্যে বেশ একটি মাদকতার সৃষ্টি করিয়া বসিল। মেয়েটির নাম সুভা ; কিন্তু নিবারণ তাহার সহিত যে মধুর সম্পর্ক পাতাইয়া তুলিল, তাহাতে তার নাম ধরিয়া ডাকিবার কোন প্রয়োজনীয়তাই রহিল না। নিবারণ ডাকিত "নাতনী", সুভা ডাকিত—"দাদামশাই !"

সকালে উঠিয়াই সুভা আসিয়া তার দাদামশাইটিকে জাগাইয়া তুলিত, এবং হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিত, আজ কি কি রান্না হবে ব'লে দাও—কুটনো কুটতে হবে তো। নিবারণ প্রথম প্রথম তাহাকে কষ্ট করিয়া কুটনা কুটিতে যাইতে বারণ করিত, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, ইহার মধ্যে বেশ একটি সহজ সুন্দর আনন্দ আছে। এই ক্ষুদ্র গৃহিণীটি যখন ভাঁড়ার ঘরে গিয়া বসিয়া হেঁট হইয়া তরকারী কুটিতে থাকিত তখন বৃদ্ধ নিবারণ চৌকাটের উপর উবু হইয়া বসিয়া তাহার এই ক্ষুদ্র নাতনীটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটি সহজ সুন্দর পরম তৃপ্তির আভাস মনের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিত।

এমনি করিয়া সুভা ক্রমে তার অকর্ম্মণ্য নিঃসহায় দাদামশাইটির খাওয়া, শোয়া, পরার সহিত নিজেকে এমনি নিবিড় ভাবে জড়াইয়া ফেলিল যে, অকর্ম্মণ্য নিবারণচন্দ্র ক্রমে আরও অকর্ম্মণ্য এবং অলস হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু দেহের দিক হইতে সে যতই কেন অলস এবং অকেজো হইয়া উঠুক না, মনের দিক হইতে তার কাজ আজকাল অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সে আজকাল নিজে ছাড়াও আর একজনের সুখ-দুঃখের কথা ভাবিতে শিখিয়াছে, এবং এই দায়িত্বটুকু যতই কেন ক্ষুদ্র হউক না—তাহার মনকে একেবারে অলস এবং একঘেয়ে হইয়া পড়িয়া থাকার দুর্গতি হইতে অনেক খানি বাঁচাইয়া দিয়াছে।

(৪)

একদিন সুভার বাপের সহিত নিবারণের হঠাৎ আলাপ হইয়া গেল। যদিও নিবারণচন্দ্র ইহা আদবেই চায় নাই এবং এই পরম আকস্মিক ঘটনাটি যে কোনদিন ঘটিতে পারে সে সম্বন্ধে সচেতনও ছিল না। লোকটি বয়সে নিবারণ অপেক্ষা কিছু ছোট হইবে। সেদিন রবিবার, হাতে একটা চটের থলে লইয়া বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে গোলগাল ছোটোখাটো গৌরবর্ণ এই লোকটি বাজার করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ নিবারণের বাইরের ঘরের জানালাটার ভিতর দিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল এবং কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই একেবারে একঝুড়ি বকিতে সুরু করিয়া দিল—"নমস্কার মশাই, আপনি বোধকরি আমাকে চিনতে পারছেন না, আর চিনবেনই বা কি করে,—প্রথমতঃ মশায় ত' বাড়ীর বারই হন্ না, দ্বিতীয়তঃ আমরা হচ্ছি গরীবগুর্ব্ব লোক,—তা যাক্, আমার আজ ভাগ্যি বলতে হবে যে মহাশয়ের মত মহৎব্যক্তির দর্শন লাভ হোলো।"

ইহার উত্তরে কি যে জবাব দেওয়া যাইতে পারে তাহা নিবারণচন্দ্রের মাথায় জোগাইল

না—সে হাঁ করিয়া এই অপরিচিত লোকটির মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আগন্তুক লোকটি ইতিমধ্যে নিঃশেষপ্রায় বিড়িটায় শেষটান দিয়া সেটাকে জানালা গলাইয়া রাস্তায় ছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আবার বকিতে সুরু করিয়া দিল—"মহাশয়ের বাড়ীর গায়ই এ গরীবের বাস,—কিন্তু এ যাবৎ একদিনও মহাশয়ের শ্রীচরণ দর্শন কপালে ঘটে উঠলো না; ৯টার মধ্যে নাকে কাঁনে গুঁজে বেরুতে হয় মশাই, আর ফিরতে সেই সন্ধ্যে হয়ে যায়। পথটি ত আর সোজা নয়,—কোথায় চোরবাগান আর কোথায় খিদিরপুর ডক—বুঝুন ত মশাই ঠেলাটা। আজ রবিবার পেলুম, বেরুবার তাড়া নেই, বেলায় বাজার করতে যাচ্ছিলুম, দেখলুম মশাই বসে রয়েছেন, ভাবলুম এই সুযোগে আলাপটা করে রাখতে দোষ কি। তা মহাশয়কে বিরক্ত করেছি না বোধ হয়, কি জানেন দাদা, আমরা হচ্ছি গরীব গেরোস্ত লোক আর আপনারা হচ্ছেন"—কথাটাকে সমাপ্ত হইতে না দিয়াই লোকটি হঠাৎ কি মনে করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমার মেয়ে সুভার কাছে আপনার সব কথাই শুনতে পাই; মেয়েটা ত মশাই আমাদের একরকম পর ক'রে দিতে বসেছে।" এমনি ভাবে আধঘণ্টাটাক্ অনর্গল বকিয়া এবং উত্তরে সংক্ষেপে দু-একটা 'হাঁ' কিম্বা 'না' মাত্র পাইয়া সুভার বাপ শ্রীযুক্তঘনশ্যাম গাঙ্গুলী সেদিনকার মত বিদায় লইল, এবং নিবারণচন্দ্র সেদিন স্নান করিবার পূর্ব্বে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাণ্ডা তিলের তৈল ব্রহ্মতালুতে ঘসিয়া ঘসিয়া মাখিল।

দ্বিপ্রহরে আহারাদি সারিয়া নিবারণ শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল - একটু একটু তন্দ্রাও আসিতেছিল,—এমন সময় সুভা আসিয়া ডাকিল—"দাদামশাই!"

ধীরে ধীরে নিবারণ উত্তর দিল—"কি দিদি!"

শয্যাপ্রান্তে নিবারণের মাথার শিয়রে বসিয়া তাহার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সুভা বলিল, "তুমি লোকের সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কইতে পার না কেন দাদামশাই?"

ব্যাপারটা বুঝিতে নিবারণের বেশী দেরী হইল না—সে একটু হাসিয়া উত্তর দিল—"একথা বলছিস্ কেন রে পাগলী,—কেন তোর সঙ্গে ত আমি রাত দিনই বক্‌ছি।"

"আমার সঙ্গে ত খুব ব'কো, কিন্তু আর কারুর সঙ্গে কথা কইতে পার না কেন? বাবা মার কাছে বলছিল, তুমি বড় লোক কিনা তাই গরীবদের সঙ্গে কথা কইতে চাও না। আমি কত ক'রে বোঝাতে চেষ্টা করলুম যে, আমার দাদামশাই সে রকম লোক নয়, লোকে ভুল বোঝে,—তারা বিশ্বাসই করলে না। তুমি আমার সঙ্গে যেমন কথা কও তেমনি সকলের সঙ্গে কইলেই ত আর কেউ কিচ্ছু বলতে পারে না—না, সত্যি সত্যি তুমি আর ওরকম কোরো না দাদামশাই—লোকে নিন্দে করবে যে!"

নিবারণচন্দ্র বালিকার এই উপদেশ কতখানি শুনিল তাহা ভগবানই জানেন;—কেহ

নিন্দা বা সুখ্যাতি করিলে তাহার যে কি পরিমাণ ক্ষতি বা বৃদ্ধি হইতে পারে তাহাও সে যে কতদূর হিসাব করিয়া দেখিল তাহাও জানেন সেই অন্তর্য্যামী। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বালিকাটি যে তাহার নিন্দা শুনিয়া ব্যথিত হইয়া একবুক সহানুভূতি এবং দরদ লইয়া তার মাথার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহারই পরম তৃপ্তিটি সে চোখ বুজিয়া নীরবে কিছুক্ষণ ভোগ করিয়া লইল।

(৫)

ইহার পরের রবিবারে ঘনশ্যাম আসিয়া আলাপ জমাইয়া তুলিবার জোগাড় করিতেই, নিবারণ হঠাৎ এমনই অস্বাভাবিক রূপে বকিতে সুরু করিয়া দিল যে সে নিজেই নিজের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেল। সে পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, সুভার বাপ এবার তাহার সহিত আলাপ করিতে আসিলেই সে যে করিয়া হউক প্রমাণ করিয়া দিবে যে সে ভদ্রলোকের সহিত অনায়াসে নির্ভয়ে কথা বলিতে পারে এবং এই অসমসাহসিকের কার্য্যে সে কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে কম যায় না।—সুতরাং সে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমটা সে কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছিল না, কি কথা সে কহিবে।

ঘনশ্যাম জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছেন নিবারণবাবু!"

সে উত্তর দিল—"হুঁ!"—ইহার অধিক কি উত্তর সে দিবে?

ঘনশ্যাম জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়ের বুঝি বাড়ীথেকে মোটেই বেরুনো হয় না?"—সে বলিল—"না, মাঝে মাঝে বেরুই ত!"—ইহার বেশী আর কি বলা যাইতে পারে? মনে মনে সে মহা বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময় ঘনশ্যাম আবার কথা তুলিল—"মহাশয়ের পয়সার ত আর অভাব নেই, একটা মোটর কেনেন না কেন? দিব্যি বিকেলের দিকটা গড়ের মাঠের দিকে একটু—" আর পায় কে?—নিবারণ কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই হঠাৎ কবে বায়স্কোপে মোটর-ডাকাতির কি একটা পালা দেখিয়াছিল তাহারই মূল গল্পটা অত্যন্ত এলোমেলো ভাবে বকিয়া যাইতে সুরু করিয়া দিল—যদিও ঘনশ্যামের প্রশ্নের সহিত এই গল্পটির বিশেষ কোনও সম্পর্ক ছিল না। মৌখিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে ইস্কুলের ছেলেরা ইতিহাসের একটা গোটা যুদ্ধের বিবরণ যেমন চোখ কান বুজিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কোনও রকমে আওড়াইয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে, ঠিক তেমনি করিয়া মিনিট দশেকের মধ্যে একটা গোটা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস কোনও মতে উগরাইয়া দিয়া নিবারণ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, এবং ইহার পর সে যদি একটি কথাও আজ না বলে তাহা হইলেও যে কেহ তাহার দোষ ধরিতে পারিবে না, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রান্ত ক্লান্ত ভাবে তাকিয়াটায় হেলান দিয়া চক্ষু মুদিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

ঘনশ্যাম বলিল—"বাঃ, আপনি ত দিব্যি গল্প জমাতে পারেন মশাই।"

সে চক্ষু মুদিয়াই উত্তর দিল—"হুঁ।"

ঘনশ্যাম আবার বলিল— "তা যাই বলুন নিবারণবাবু আপনার কিন্তু একটা মোটর কেনা নিতান্তই দরকার।"

নিবারণ— হুঁ' 'না' কিছুই বলিল না।

ঘনশ্যাম বলিল—"আপনার তন্দ্রা আসছে বুঝি?—তা হলে আর বিরক্ত করবো না—আজ নমস্কার তা হলে"—তার পরই হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ, একটা কথা বলছিলুম- গোটা ত্রিশেক টাকা যদি কিছু দিনের জন্যে—"

নিবারণ সেই ভাবেই চক্ষু মুদিয়া জড়িত কণ্ঠে ডাকিল—"বেহারী!" বেহারী আসিয়া উপস্থিত হইল।

"আমার ঘরথেকে ক্যাশবাক্সটা নামিয়ে নিয়ে আয়ত"—বলিয়া নিবারণ আবার চক্ষু মুদিল।

ঘনশ্যাম আওড়াইয়া যাইতে লাগিল -"আপনার ভরসাতেই এ পাড়ায় রয়েছি, তা না হ'লে আমার মাথার উপর আছেই বা কে, আর থাকলেই বা কে কার মুখ তাকায় বলুন!—আপনি যে দয়া ক'রে আমাদের মত লোককে ঘরে বসতে দেন, এই না আমাদের ভাগ্যি!—এমন শিবতুল্য লোক কি আর একালে জন্মায় মশাই তাই ত সেদিন গিন্নীকে বলছিলুম—"তারকেশ্বর যাবো তারকেশ্বর যাবো করছ,--বাড়ীর গায়েই সাক্ষাৎ তারকেশ্বর রয়েছেন—যাও গিয়ে একদিন দেখে এসোগে—সাধে কি সুভা আমার—"

এমন সময় বেহারী ক্যাশবাক্স লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; এবং ইহার কয়েক মিনিট পরেই তিনটি দশটাকার নোট ট্যাঁকে গুঁজিয়া, নূতন একটা বিড়ি ধরাইতে ধরাইতে ঘনশ্যাম গাঙ্গুলী নিবারণের বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেদিন বৈকালে সুভা আসিতেই নিবারণ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল -"কি, আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে পারি না নয়?" তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, ঘনশ্যাম বাড়ী গিয়া নিশ্চয়ই সুভার মার নিকট বলিবে—এমন মজলিসী লোক সে আর জীবনে ছুটি দেখে নাই, এবং সুভা নিশ্চয়ই তাহা শুনিয়াছে। সুভা কিন্তু ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না, সুতরাং সে একথার কোন অর্থই খুঁজিয়া পাইল না। সে সংক্ষেপে বলিল -"তার মানে?"

নিবারণ সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল—"তার মানে, তোর বাপকে আজ একেবারে কথার তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার যোগাড় করেছিলুম তা জানিস্!—নাগাড় ১৫টি মিনিট একবারও না থেমে বকে গেছি;—কথা কইনা বলে তাই—নইলে একবার মুখ খুল্লে,—নিয়ে আয় না তোর কত ভদ্রলোক আছে—হুঁঃ।" একসঙ্গে এতগুলো কথা এত তাড়াতাড়ি বলিতে নিবারণকে সুভা এই প্রথম শুনিল, এবং এইসকল কথা বলিবার সময় তার মুখে চোখে এমন একটা

উত্তেজনা এবং উৎসাহ সে আজ লক্ষ্য করিল, যাহা নিবারণের পক্ষে অত্যন্ত বেশী অস্বাভাবিক এবং বেখাপ্পা বলিয়া তার চোখে ঠেকিতে লাগিল। নিবারণের মুখের দিকে চাহিয়া অবশেষে সে হাসিয়া ফেলিল।

নিবারণও ইতিমধ্যে বোধ হয় নিজের অস্বাভাবিকত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া গিয়াছিল—সে তার নিজস্ব স্বাভাবিক নরম এবং কোমল স্বরে বলিল, "হাসলি যে দিদি ?"

সুভা আবার হাসিল ; কিন্তু কেন কে জানে তার চোখের কোণে কখন তার অজ্ঞাতসারে এক ফোঁটা অশ্রু সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সেইদিনই সন্ধ্যার পর নিবারণ শয্যার উপর তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়াছিল—সুভা পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে অত্যন্ত করুণকণ্ঠে বলিল —"তোমাকে কারুর সঙ্গে কথা কইতে হবে না দাদামশাই—তুমি শুধু আমার সঙ্গে কথা কোয়ো—তা হলেই হবে—বুঝলে।" সে স্বর অত্যন্ত গাঢ় এবং সহানুভূতিপূর্ণ। নিবারণ কোন কথা বলিল না,—সে কেবল সুভার কোমল ছোট্ট হাতখানি দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া রহিল।

(৬)

ইহার পর গোটা চারিটা বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সুভা এখন আর বালিকাটি নাই—সে এখন ষোড়শী। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তার বিবাহ হয় নাই। না হওয়ার একটা কারণও ছিল। ঘনশ্যাম গাঙ্গুলীর স্বগ্রামস্থ ৺নীলরতন চট্টোপাধ্যায়ের জীবিতকালে তাঁহারি পুত্র শ্রীমান বিমলের সহিত সুভার বিবাহের কথা খুব ছেলেবেলা হইতেই একরকম পাকাপাকি হইয়া গিয়াছিল। নীলরতনের অবস্থা মন্দ ছিল না ; জমিজারাত এবং ছোট খাটো কিছু জমিদারী ছিল—তাহাতেই মোটা ভাত এবং মোটা কাপড় বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত ; ছেলেটিও বেশ সুপাত্র। গ্রামের স্কুল হইতে সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় জলপানী পাইয়াছিল। তখন সুভার বয়স ৭ কি ৮ বৎসর। ঘনশ্যাম তখন দেশেই থাকিত—ঋণের দায়ে চাকরীর সন্ধানে তখন পর্য্যন্ত তাহাকে ভিটামাটি খোয়াইয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিতে হয় নাই। সামান্য যে জমিজারাত ছিল তাহাতেই তাহার সংসার খুব স্বচ্ছলে না হইলেও নেহাত অস্বচ্ছলেও চলিত না। তাহার পর খুড়ার সহিত সামান্য কয়েক বিঘা জমি লইয়া লাগিল মোকর্দ্দমা। পুরা ৩টি বছর ধরিয়া মামলা গড়াইল। ঘনশ্যামের যাহা কিছু জমিজমা ছিল মোকর্দ্দমার খরচা জোগাইতে সে সমুদয় একে একে বাঁধা পড়িয়া গেল—তথাপি কিন্তু মামলায় সে জিতিতে পারিল না। তাহার পর ভিটামাটি বেচিয়া, স্ত্রী এবং তিনটি কন্যাকে শ্যালকের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া সে কলিকাতায় পলাইয়া আসে চাকরির সন্ধানে। এ যখনকার কথা বলিতেছি, তখন সুভার উপরের দুটি ভগ্নীরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া জোগাড়ে-ঘনশ্যাম খুঁজিয়া

পাতিয়া অবশেষে জেটি সরকারের একটা কাজ জোটাইয়া লইল, এবং মাহিনা ও উপরিতে দুই তিন বৎসের মধ্যেই হাতে কিছু জমাইয়া ফেলিল। তাহার পরই সে স্ত্রীকন্যাদের কলিকাতায় আনাইল, এবং নিবারণচন্দ্রের বাড়ীর গায়ের ভাঙ্গা বাড়ীটি নামমাত্র ভাড়ায় রফা করিয়া লইয়া কোনও রকমে দিন গুজরান করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সুভার বিবাহের কথা সে অনেকবার নীলরতনের নিকট পাড়িয়াছিল, কিন্তু পুত্র বি, এ পাশ না করা পর্য্যন্ত তিনি ঘনশ্যামকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। সুভার বয়সও তখন অল্প, সুতরাং ঘনশ্যামেরও বিশেষ তাড়া ছিল না। তার পর হঠাৎ একদিম ঘনশ্যাম শুনিল মাত্র তিন দিনের জ্বরে নীলরতন সহসা হার্টফেল করিয়া মারা গিয়াছে এবং তাঁহার বড় ভাই তারিণী চট্টোপাধ্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন বিমলের অভি-ভাবক। ঘনশ্যামের সহিত নীলরতনের কথাই ছিল, এ বিবাহে বরপক্ষ কন্যাপক্ষের নিকট পণস্বরূপ কিছুই লইবেন না—কেবল নেহাত 'নেমকর্ম্ম' হিসাবে যে সকল জিনিষ না দিলেই নয়, তাহাই দিয়া নমো নমো করিয়া কোনও রকমে ঘনশ্যাম কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইবে। সুতরাং সে নিশ্চিন্ত হইয়াই বসিয়াছিল। আজ হঠাৎ নীলরতনের মৃত্যু সংবাদে তার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং বিশেষ করিয়া তারিণীচরণের কথা ভাবিয়া সে একবারে বিশহাত মাটির তলায় বসিয়া গেল। এই তারিণীচরণকে চিনিতে তাহার বাকি ছিল না। হাঁড়ি ফাঁসিয়া যাইবাব ভয়ে গ্রামের লোকে তাহার নাম প্রাণান্তে মুখে আনিত না, এবং শুনা যায় প্রাতঃকালে উঠিয়া তাঁহার শ্রীমুখ-পঙ্কজ দর্শন করিয়া ফেলিয়া অনেককেই নাকি অনেক প্রকার বিপদে পড়িতে হইয়াছে। এহেন তারিণীচাটুয্যে যে দিন শ্রীমান বিমলচন্দ্রের অভিভাবক হইয়া দাঁড়াইলেন সে দিন ঘনশ্যাম চক্ষে ধুতুরাফুল দেখিতে আরম্ভ করিল। তথাপি একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য তারিণীর সহিত সে অবসর মত একদিন দেখা করিল এবং বিমলের সহিত সুভার বিবাহের কথা পাড়িয়া বসিল। নীলরতনের সহিত দেনা পাওনা সম্বন্ধে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল ঘনশ্যাম তারিণীকে সে সমুদয় স্মরণ করাইয়া দিল।

হাসিয়া আপ্যায়িত করিয়া তারিণী বলিল—"আহা, এ'ত ঘরের কথা হে ঘনশ্যাম—আপোষে দেনাপাওনার কথাটা চুকিয়ে ফেল্লেই ত হয়।"

ঘনশ্যাম হাত জোড় করিয়া বলিল—"নীলরতনদার সঙ্গে আমার কথাই তো ছিল তারিণী-দা, শাঁখা হাতে দিয়ে কন্যাসম্প্রদান করবো—আজ তবে আবার—"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া তারিণী বলিল, "তা, আমিই কোন্ লাখ্ পঞ্চাশ চাইছি তোমার কাছ থেকে হে।"

কতক আশ্বস্ত হইয়া ঘনশ্যাম বলিল—"তা বেশ বলুন কি দিতে হবে আমাকে।"

চোখবুঝিয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া তারিণী বলিল, "চার হাজার টাকা নগদ, বাস্ আর কিচ্ছু না।"

ঘনশ্যামের চক্ষু কপালে ঠেলিয়া উঠিল—"চার হাজার টাকা কোথায় পাবো তারিণী-দা?"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া তারিণী বলিল, "না পাও মেয়ের বিয়ে অন্য যায়গায় দাওগে। যাওনা ভায়া—কেউ ত মাথার দিব্যি দিয়ে ধরে রাখে নি।" সুতরাং ঘনশ্যামকে সেখান হইতে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। এ যখনকার কথা বলিতেছি তখন সবে মাত্র সুভারা কলিকাতার বাটীতে আসিয়াছে, এবং সুভার বয়স তখন ১১ কি ১২ হইবে। দেশে সুভাদের বাড়ী এবং বিমলদের বাড়ী ছিল একেবারে পাশাপাশি। এই দুই ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও ছিল খুব বেশি। ছেলেবেলায় বিমলের আড্ডাই ছিল সুভাদের বাড়ীতে। ইস্কুল হইতে ফিরিয়া, কাপড় জামা না ছাড়িয়াই অর্দ্ধেক দিন বিমল সুভাদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইত এবং সেইখানেই জলযোগের পালা সারিয়া ঘুড়ি এবং লাটাই লইয়া সুভার সহিত তাহাদের ছাতে গিয়া উঠিত। তার পর বিমল প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইয়া কলেজে পড়িবার জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসিল। ওদিকে ঘনশ্যামও মোকর্দ্দমায় হারিয়া ভিটামাটি খোয়াইয়া চাকরীর সন্ধানে কলিকাতায় চলিয়া আসিল,—আর সুভা তার মার সহিত তার মামার বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইল। সুতরাং এই কয়টা বৎসর বিমলের সহিত সুভার একবারও দেখা হইবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। তার পর হঠাৎ একদিন বিমল শুনিল, সুভারা কলিকাতায় আসিয়া বাসা ভাড়া লইয়াছে। তার জ্যাঠা তারিণীচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিত, সেই সূত্রে তারিণীচরণের সংসারটি আজ বৎসর খানেক হইল কলিকাতায় উঠিয়া আসিয়াছে, এবং বিমল ও তার বিধবা মা ইহাদেরই পরিবার-ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিমল এই সময় বি, এ পাশ করিয়া আইন পড়িতেছিল।

(৭)

সেদিন সন্ধ্যার সময় আফিস হইতে ফিরিয়া রান্নাঘরের দরজার কাছ হইতে ভিতরের দিকে একবার মাত্র উঁকি মারিয়াই ঘনশ্যাম হাঁকিল—"কাকে ধরে এনেছি দেখেছ!" সুভার-মা ঝোল সাঁতলাইতেছিল,—শব্দায়মান কড়াটাকে মেঝের উপর নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই চৌকাঠের গোড়ায় জুতা ছাড়িয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বিমল তাঁহার পদ-ধূলি লইয়া নমস্কার করিল।

"অমনি-ই আশীর্ব্বাদ করছি বাবা—আর নমস্কার করতে হবেনা," বলিয়াই সুভার মা একটা কাঠের পিড়ি আগাইয়া দিল এবং বিমল তাহার উপর বসিলে তাহার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তুই যে বড্ড রোগা হয়ে গেছিস বিমল—আমি প্রথমটা তোকে চিন্তেই পারি নি।"

বিমল হাসিয়া বলিল, "তুমি আর মা চিরকালটাই ত আমাকে রোগা হতে দেখে আসছ পিসীমা।"

"নারে, সত্যি সত্যি তুই বড্ড রোগা হয়ে গেছিস্"—বলিয়াই বাহিরে কাহার মৃদু পদশব্দে সচকিত হইয়া উঠিয়া সুভার-মা ডাকিলেন—"সুভা বুঝি? এদিকে এসে দেখে যা কে এসেছে।" পরক্ষণেই সুভা আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল এবং হঠাৎ এই আগন্তুক যুবকটির দিকে একবার মাত্র চাহিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। বিমলও তাহার দিকে চাহিয়া প্রথমটা কেমন যেন থতমত খাইয়া গিয়াছিল, পরক্ষণেই কিন্তু সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া অত্যন্ত সহজ সুরে বলিল, "ওঃ সুভা কত বড় হয়ে গেছে পিসিমা—এ যে একবারে চেনবার জো নেই, য়্যাঁ!"

কড়াটা উনানের উপর চাপাইয়া দিতে দিতে সুভার-মা হাস্রিয়া বলিলেন, "সুভা কি চিরকালটাই খুকী থাকবে রে পাগলা।" এবং তাহার পর সুভাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে বড়,—বিমলকে একটা পেন্নামও করতে নেই বুঝি।—জানিস্ বিমল, ওর বয়সই কেবল বাড়ছে, বুদ্ধিসুদ্ধি কিন্তু একটুও বাড়েনি।" কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সুভা ধীরে ধীরে আসিয়া বিমলকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং দুবার ঢোক গিলিয়া লইয়া, একবার গলাখাঁকারি দিয়া অত্যন্ত নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি ভালো আছ বিমল-দা?"

"হাঁ ভাল আছি—তুই ভাল আছিস্?" বলিয়া বিমল সুভার মুখের উপর দিয়া একটা সস্নেহ দৃষ্টি বুলাইয়া লইল। সেদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত সুভা এবং তার মার সহিত নানান গল্প করিয়া বিমল চলিয়া গেলে পর, আহারে বসিয়া ঘনশ্যাম হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল—"দ্যাখ গিন্নী, বিমলের সঙ্গে সুভার বিয়ে আমি দোবই দোবো—ও কেউ রুখ্তে পারবে না।"

অবাক হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া সুভার-মা জিজ্ঞাসা করিল—"চার হাজার টাকা পাবে কোথায়?"

ইহার উত্তরে ঘনশ্যাম কোন কথা বলিল না,—কেবল রান্নাঘরের জানলার ভিতর দিয়া নিবারণের বাড়ীর দিকে একবার মাত্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

আগামীবারে সমাপ্য

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

রামদাস

যুগসন্ধিতে ভারত যখন সহসা তিমিরময়—
বীরসন্ন্যাসী গাহিয়া উঠিলে নব আলোকের জয়!
অনাগত এক আশার স্বপ্নে নিমিষে উঠিলে জাগি',
মাতিয়া উঠিলে দশের লাগিয়া, দেশ দেবতার লাগি'!
ওহে সাগ্নিক, প্রাণের অনলে জ্বালালে বিশাল শিখা,
যত মোহমায়া ভ্রান্তিবেদনা নিরাশার কুহেলিকা
স্পর্শে তোমার, হে মহাজাতক, নিমেষে হইল ছাই।
সমাজের বুকে পাতিলে আসন, সংসারে নিলে ঠাঁই;
স্তিমিত ভীতের আড়ষ্ট গৃহ কারা আয়তন ভেঙে'
জাতির মুক্তি, দেশের সেবায় আত্ম-আহুতি মেগে'
ঊর্দ্ধগ-হোম জ্বালালে একাকী নিখিল মারাঠাময়!
জরার হৃদয়ে করেছিল তুমি যৌবন সঞ্চয়
মন্ত্রে তোমার,—সংসারে তুমি আসনি উদাসী বেশে;
পাপপ্রপঞ্চ পঙ্কিল পথে নিয়তিবিধির ক্লেশে
সাজোনিক' তুমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী উদাসীন;
নিরাশাতিমিরে বসিয়া একাকী অরুণোদয়ের দিন
চেয়েছিলে তুমি, জেগেছিলে তুমি মোহকারাগার ভেঙে'
কর্ম্মের জয়ে, ত্যাগের পর্ব্বে, সেবার মহিমা মেগে'।
ছত্রপতির হে বিজয়ী গুরু, মারাঠার গৌরব!—
চন্দনসম বুকের রক্তে বিতরিলে সৌরভ!
দেশের লাগিয়া ধূপের মতন অনলশিখায় দহি'
বেদনা মথিয়া দিকে দিকে গেলে শান্তির বাণী বহি!
গরল ভখিয়া মৃত্যু মথিয়া জীবনের অবদান
তুমি সঁপে গেলে, হে বীর কর্ম্মী, হে প্রেমিক মহীয়ান্!

শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত

সাহিত্যে জাতীয়তা

রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় কিছুকাল হইল সাহিত্যের চিকিৎসায় ব্যাপৃত আছেন। তিনি গতমাসে বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা নূতন জীবাণু আবিষ্কার করিয়া তার দূরবীক্ষণিক ও আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সে জীবাণু সাহিত্যে জাতীয়তা। দূরবীক্ষণিক বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি ইংরাজ আবির্ভাবের পর হইতে আমাদের যুগ পর্য্যন্ত সমস্ত বাঙ্গলা সাহিত্য ও সমাজের এক ইতিহাস রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন। এই ইতিহাস যে কতটা আলোচনার যোগ্য তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, ইহার ভিতর ভূদেব মুখোপাধ্যায় অনেকটা স্থান জুড়িয়াছেন, চন্দ্রনাথ বসু ও অক্ষয়কুমার সরকারেরও honourable mention আছে—নাম নাই অক্ষয়কুমার দত্তের,—নাই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের—কেশবচন্দ্র সেনেরও নাই বলিলেই চলে। সুধু এই ক'টা কথা হইতেই বেশ বুঝা যাইবে যে, যে কাচখানার ভিতর দিয়া যতীন্দ্রবাবু বাঙ্গলা সাহিত্যের অতীত যুগের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন সে খানা টেলিস্কোপে বসাইবার যোগ্য নয়, তাহাতে Laughing galleryর আরসী তৈয়ার হইতে পারে।

এই ইতিহাস-চর্চ্চাটা লেখকের আসল প্রতিপাদ্য নয়, প্রতিপাদ্য একটা সামাজিক তত্ত্ব। তিনি একটা গুরুতর সাহিত্য ও সমাজ ঘটিত সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন এবং একটা বৃহত্তর সমস্যা উত্থাপিত করিয়াছেন,—আমাদের স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ বিষয়ক যে সব সনাতন সংস্কার আছে সেগুলির কোনওরূপ পরিবর্ত্তন বা সংস্কার সাধনের চেষ্টা সাহিত্যের দ্বারা করা উচিত কিনা? এবং সাধারণ ভাবে "বিদেশের সঙ্গে, একটা বিভিন্ন সভ্যতার সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান—free trade of cultural ideas সর্ব্বাংশে ভাল না মন্দ?"

এই সব সমস্যা কেবলমাত্র ছদশখানা সাহিত্যের গ্রন্থ পড়িয়া বিবেকবুদ্ধি মাত্রের সহায়তায় করা যায় না। এ সব সমস্যার আলোচনায় অনেকগুলি কথা উঠে। প্রথমতঃ, যে সব সংস্কার লইয়া আলোচনা করা হইতেছে তাহার প্রকৃতি ও ইতিহাস জানা আবশ্যক, সমাজের অঙ্গের সঙ্গে তার কোনখানে কি প্রকার যোগ, সমাজের জীবন ধারার সঙ্গে তার সমন্বয়ের কি সূত্র তাহা জানা আবশ্যক। হিন্দু সমাজের কোনও আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে হিন্দুর শাস্ত্র সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান থাকা দরকার। তা ছাড়া সমস্ত জগতের সামাজিক ইতিহাস ও সমাজের ক্রমপরিণতির মুখে অনুষ্ঠান ও সংস্কার কিরূপে ভাঙ্গা-গড়া হইয়াছে তাহাও বেশ ভালরূপে জানা দরকার। সিংহ মহাশয়ের সমস্ত লেখা পড়িয়া আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এ কথা কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি

"মানসী ও মর্ম্মবাণীতে" আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষে আমার কি নজীর আছে? সে প্রশ্নের উত্তর শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া আমি দিয়াছিলাম "ভারতী" পত্রিকায়। আমার সে যুক্তির কোনও উত্তর দিবার চেষ্টা সিংহ মহাশয় এ পর্য্যন্ত করেন নাই —ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্যক অধিকার থাকিলে তিনি সে সব যুক্তির উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেন কিম্বা স্বীকার করিতেন যে শাস্ত্রমতে আমার যুক্তির উত্তর নাই।

তা ছাড়া, যে সব সমস্যা তিনি আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা কেবল আমাদের দেশেই আবির্ভূত হয় নাই। মানব সমাজের ইতিহাসে অনেক স্থলে এই সব সমস্যা উঠিয়াছে। সেই সব সমাজে এসব সমস্যার কি সমাধান হইয়াছে তাহার আলোচনায় এবিষয়ে অনেকটা সাহায্য পাওয়া যাইবে। তা ছাড়া সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক অনুষ্ঠান ও সংস্কারের ক্রমপরিণতির আলোচনায় এই সব সংস্কার ও অনুষ্ঠানের স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। এই জন্য মানব সমাজের ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বে (social anthropology) সম্যক অধিকার না থাকিলে এসব বিষয়ের আলোচনা নিষ্ফল হয়। সিংহ মহাশয়ের এসব বিষয়ের সহিত যে কিছুমাত্র পরিচয় নাই তাহা তাঁর প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মানব সমাজের ইতিহাসে এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে মানবের যৌনসম্বন্ধের নিয়মনে সতীত্বের উদ্ভব ও প্রকৃতির সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকিলে সতীত্ব সম্বন্ধে তিনি যেসব কথা বলিয়াছেন তাহা বলিতেন না।

আমরা একটা প্রাচ্য জাতি। একটা পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে ভাব ও অনুষ্ঠানের স্বচ্ছন্দ আদান-প্রদান আমরা করিব কিনা,—এই সমস্যা যতীন্দ্রবাবু তুলিয়া তার একটা মনগড়া জবাব দিয়াছেন। এ উত্তরটা দিবার আগে অন্যান্য বহু দেশে এই সমস্যা উঠিয়া তার যে সমাধান হইয়াছে তাহার একটু আলোচনা করিবার চেষ্টা করিলে সিংহ মহাশয় ভাল করিতেন। জাপান ও চীনের গত ৬০।৭০ বৎসরের ইতিহাস তুলনায় সমালোচনা করিলে এ বিষয়ে অনেক তথ্য জানা যাইবে। রুষিয়ার গত তিনশত বৎসরের ইতিহাসে এবিষয়ে অনেক তথ্য নিহিত আছে। যতীনবাবু বোধহয় খবরই রাখেন না যে. রুষ দেশটা তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ছিল একটা প্রাচ্য জাতি। সে-দেশের আচার অনুষ্ঠান ও সমাজ বন্ধনের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও যে পাশ্চাত্য জগতের চেয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে সাদৃশ্য কত বেশী ছিল তাহা Stepniak এর Russian Peasantry পড়িলে জানা যায়। Peter the Great রুষিয়াকে পাশ্চাত্য জাতি করিয়া গড়িবার জন্য নানা প্রচেষ্টা করেন, সেনাগঠনে পাশ্চাত্য সেনাপতি নিয়োগ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাগারে পাশ্চাত্য শিক্ষক ও পাশ্চাত্য বিদ্যা আনিয়া তিনি রুষের "জাতীয়" জীবনের উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত করেন—সে আঘাতের সঙ্গে ভারতে বৃটিশ সংসর্গজনিত আঘাতের সঙ্গে বহু সাদৃশ্য আছে। যতীন্দ্রবাবু ও তাঁহার বন্ধুগণ শুনিয়া অবাক

হইবেন যে, সেখানেও সনাতন-পন্থীরা রুষিয়ার প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান ও প্রাচীন culture রক্ষা করিবার জন্য যেসব তর্ক যুক্তি উপস্থিত করিয়াছিল, যতীন্দ্রবাবু ও তাঁর দলের লোকদের সঙ্গে তার আশ্চর্য্য রকম সাদৃশ্য আছে। রুষের পাশ্চাত্য ভাব গ্রহণ এবং তার ফলে জগতের ইতিহাসে আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে Vinogradffএর "Self-Government in Russia" পুস্তিকায়, তাহা পড়িলে যতীন্দ্রবাবু এসব বিষয় আলোচনার প্রভূত সহায়তা লাভ করিতে পারিতেন।

বর্ত্তমান তুরস্কে যে প্রক্রিয়া চলিয়াছে তাও বিশেষভাবে অনুশীলনের যোগ্য। অনতি-দীর্ঘকাল পূর্ব্বে মুস্তাফা কেমাল পাশা এক বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তার ভিতর একটা প্রকাণ্ড সার সত্যের ইঙ্গিত আছে। তিনি তাঁর দেশবাসী সনাতন-পন্থীদের তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তোমরা একটা সুদূর অতীতে বসিয়া আছ—modern হও। এই কথাটাই আমিও আমার সনাতনপন্থী স্বদেশবাসীকে বলিতে চাই। বিলাত বা কোনও বিশিষ্ট দেশের অনুকরণ আমরা চাই না। কিন্তু, চার পাঁচশত বৎসরের পুরাতন ভারতবর্ষের ভিতর বসিয়া চারিদিক দিয়া পরিবর্ত্তনের পথে পাষাণ প্রাচীর গড়িয়া থাকিতেও আমরা চাই না। আমরা চাই ঠিক আজকার ভারতবাসী হইতে—আজকার বিশ্বের সমস্ত culture-স্রোতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া সজীবভাবে অগ্রসর হইতে, এক কথায়—modern হইতে।

সিংহ মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুরা একটা কথা স্মরণ রাখেন না যে, আজকালকার যে culture বা সামাজিক সংস্কার ও আচার তাহার বেশীর ভাগই কোনও জাতি বিশেষের বিশেষ সম্পদ নয়। আজ যেসব নূতন আদর্শ নূতন ভাব বা চিন্তা গড়িয়া ওঠে, তাহা জাতীয়তার গণ্ডী ছাড়াইয়া বিদ্যুদ্বেগে সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে, সমস্ত বিশ্ব তাহা আপনার জীবন-ধারার সঙ্গে সমীকৃত করিয়া লইবার চেষ্টা করে। তাহার ফলে আজকার মানবসমাজ সমস্ত জাতীয় গণ্ডী অতিক্রম করিয়া cultureএর দিক হইতে এক বিরাট সমাজরূপে গঠিত হইয়াছে, যাহার স্বরূপ ব্যাখ্যান করিয়াছেন Wallas তাঁর Great Society গ্রন্থে। সিংহ মহাশয় চান যে বিশ্বব্যাপী ভাব ও চিন্তার এই আদান-প্রদানের ব্যাপারে আমরা হাত দিব না—আমরা আশ্রয় করিয়া থাকিব আমাদের জাতীয়তা। তার ফল যে কি হইবে তার পরিচয় চীন। চীনদেশ কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আপনাকে ঠিক এইরূপে সমস্ত বর্ত্তমান জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিবিড়ভাবে ডুবিয়াছিল আপনার "জাতীয়" cultureএর ভিতর। সেজন্য Ihering চীনকে বলিয়াছেন 'জাতীয়তা তত্ত্বের ডন কুইক্সোট' (eine chter Donquijote der Nationalitä tsprincips) আমাদেরকেও সিংহ মহাশয় এই কূপমণ্ডূকের পরামর্শ দিতেছেন।

এই সব তত্ত্বকথার উপোদ্ঘাত স্বরূপ তিনি বাংলার প্রায় দেড়শত বৎসরের সামাজিক ও

সাহিত্যিক ইতিহাস এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গিয়াছেন। সে ইতিহাসে তাঁর অধিকার অত্যন্ত প্রগাঢ়। তার দুই চারটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

রামমোহন রায় সম্বন্ধে রায় বাহাদুর বলিয়াছেন, "তিনিও ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপভাবে বিদেশীয় সভ্যতার নিকট আত্মবিক্রয় করা তাঁহার স্বাধীন চিত্ত কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না।"

কথাটা ইহার পূর্ব্বাপরের কথার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে ইহার তাৎপর্য্য এই বুঝা যায় যে (১) ইংরাজী সভ্যতার প্রথম সংস্পর্শে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির চক্ষুতে ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছিল এবং তাহারা ইংরাজের যাহা কিছু তৎসমস্তই অনুকরণীয়, এবং দেশীয় সমস্তই বর্জ্জনীয় জ্ঞান করিয়াছিল। (২) ইহার কিছুকাল পর রাজা রামমোহনের অভ্যুদয় হয়। (৩) রাজা রামমোহনও পূর্ব্বোক্ত 'ইংরাজী শিক্ষিত'দের মত ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

এ কথাগুলির একটিও সত্য নহে। যাহাদের চক্ষে ইংরাজী শিক্ষার আলোকে ধাঁধা লাগিয়াছিল তাহারা হিন্দুকলেজের ছাত্র ডিরোজিওর শিষ্য—রামমোহনের পরবর্ত্তী, অগ্রবর্ত্তী নয়। রাজা রামমোহন ইংরাজী ও বহুভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর শিক্ষা হইয়াছিল সংস্কৃত, আরবী ও ফারসীর সাহায্যে। সুতরাং 'ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত' সেকালের বাবুদের সঙ্গে তিনি এক পর্য্যায়ে ছিলেন না।

রামমোহন রায়ের মতামতের যে ব্যাখ্যা সিংহ মহাশয় দিয়াছেন, তাহা যে ভারতের বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের মতের কত বড় ভেঙ্গানি তাহা যেকেহ রামমোহনের রচনাবলী যত্নের সহিত অনুশীলন করিয়াছে সেই বুঝিতে পারিবে। সিংহ মহাশয়ের মতে খৃষ্টান পাদরীগণ তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা সম্বন্ধে উপহাস করিয়াছিল বলিয়াই রামমোহন রায় তাঁহার দেশের দেবদেবীর উপাসকদের বুঝাইতে লাগিলেন "তোমরা উপনিষৎ প্রতিপাদিত পরব্রহ্মের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া ও কি করিতেছ? তোমাদের জন্য আমি সভ্য সমাজে মুখ দেখাইতে পারিতেছি না।" ইত্যাদি। যদি সিংহমহাশয় রামমোহন রায়ের জীবনী ও গ্রন্থাবলী না পড়িয়া থাকেন তবে তাঁর এসম্বন্ধে কিছু না লেখাই উচিত ছিল। যদি পড়িয়া থাকেন, তবে এমন একটা নিদারুণ অসত্য তিনি লিখিলেন কেমন করিয়া? রাজা রামমোহনের একেশ্বর বাদ বা নির্গুণ ব্রহ্মবাদ খৃষ্টান পাদরীদের বিদ্রূপের বহুপূর্ব্বে জন্মিয়াছিল ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা তাঁর পুঁথিপড়া বিদ্যা ছিল না, ইহা ছিল তাঁর জীবনের সাক্ষাৎ অনুভূতি, তাঁর হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রপাঠের ফল। এই সাক্ষাৎ অনুভূতির আলোকে তিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াই তার ভিতর এই এক সত্যই প্রকটিত দেখিয়াছেন। প্রত্যেক শাস্ত্র হইতে স্বতন্ত্রভাবে তিনি এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন—হিন্দুকে বুঝাইয়াছেন হিন্দুশাস্ত্র হইতে, মুসলমানকে মুসলমানের শাস্ত্র হইতে, খৃষ্টানকে খৃষ্টীয় শাস্ত্র হইতে। তাঁর

নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার যাচাই করা এই সত্য তিনি জগৎকে দিয়া গিয়াছেন,—বিদ্রূপের ভয়ে নয়, প্রশংসার আশায় নয়— সত্যের প্রতি জাতিধর্ম্মনিরপেক্ষ একটা অদম্য অনুরাগবশে। সেই লোকাতীত সত্যনিষ্ঠা ও সত্যানুভূতির এ প্রকার ব্যাখ্যা রামমোহন রায়ের ভেঙ্গানি ছাড়া কিছুই নয়।

সব চেয়ে অদ্ভুত কথা এই যে, সিংহ মহাশয়ের মতে "বেদোপনিষদের পরে ইতিহাস পুরাণ ধর্ম্মসংহিতা, তন্ত্রাদিশাস্ত্র এবং চৈতন্যমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী বৈষ্ণব শাস্ত্রাদির মধ্য দিয়া হিন্দুশাস্ত্রের যে ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি হইয়াছিল তিনি (রামমোহন) তাহার কোনও অনুসন্ধান করেন নাই। * * তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন, ভারতবর্ষে বেদ ও উপনিষদের যুগের পরে একটা dark age অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারের যুগ আসিয়াছিল এবং তাহা পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে অপসৃত হইবে।"

একথা কি সত্য সত্যই মনে করিতে হইবে যে সিংহ মহাশয় রামমোহনের লেখা পড়িয়াও এই কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন? যদি তিনি রামমোহনের বাঙ্গলা রচনা পাঠ করিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন যে রামমোহনের স্মৃতি ও তন্ত্রশাস্ত্রে যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, সে যুগের অপর কাহারও সে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল না। যে কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণতন্ত্র সিংহ মহাশয়ের শরণ্য woodroffe সাহেবের প্রধান অবলম্বন, তাহা সর্ব্বপ্রথমে প্রচারিত করেন রাজা রামমোহন। এমন কি সেকালে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একথা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতেন যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র রামমোহনের স্বরচিত—প্রকৃত প্রাচীন গ্রন্থ নয়। সিংহ মহাশয় কি ইহাও জানেন না যে, নিজের জীবন ও ধর্ম্ম নিয়মিত করিতে রাজা রামমোহনের আশ্রয় ছিল উপনিষদ নয়, তন্ত্র—বিশেষতঃ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র। আমি রাজা রামমোহনের রচনা পাঠ করিয়াছি, "ইতিহাস পুরাণ ধর্ম্মসংহিতা ও তন্ত্রশাস্ত্র" সাধ্যমত পাঠ করিয়াছি—পরের মুখে তার সংবাদ লই নাই। আমি সিংহ মহাশয় এবং তাঁহার মতাবলম্বীদিগকে বলিতে পারি যে, ইতিহাস পুরাণ ধর্ম্মসংহিতা ও তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ে রামমোহনের জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সিংহ মহাশয়ের চেয়ে কম ছিল না, woodroffe সাহেবের চেয়েও নয়।

তিনি বাঙ্গালা দেশে যে 'অন্ধকার যুগের কথা বলিয়াছিলেন এবং যাহা হইতে মুক্তির জন্য তিনি ইংরাজী ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য ফলিত বিজ্ঞানের প্রচার চাহিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃতি সেই অন্ধকার যুগের সায়াহ্নে বসিয়া সেই লোকোত্তর মহাপুরুষ যেমন দেখিয়াছিলেন তাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আজ একশত বৎসরের অধিক পরে চোখে রঙিন চশমা আঁটিয়া, অজ্ঞতার স্পর্দ্ধা সম্বল করিয়া আলোচনা ধৃষ্টতা মাত্র।

বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন "তাঁহাকে একরূপ বঙ্গভাষার জন্মদাতা বলা যাইতে পারে।" পাছে এ কথার অর্থ সম্বন্ধে কোনও ভুলভ্রান্তি হয় সেই জন্য তিনি ব্রাকেটের

ভিতর ইংরাজী করিয়া বলিয়াছেন (Father of Bengali *language*) এত বড় এবং এত অসম্ভব ও অনৈতিহাসিক দাবী বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে কেহ কোনও দিন করে নাই। Language এবং Literature—ভাষা ও সাহিত্য, দুটি স্বতন্ত্র বস্তু, একথা সিংহ মহাশয়ের না জানিবার কথা নয়। তা ছাড়া বাঙ্গলা সাহিত্যেরও একটা খুব গৌরবের যুগ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মের বহু পূর্ব্বে বহিয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বড় জোর গদ্য সাহিত্য সম্বন্ধে স্রষ্টা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে দাবীও খুব টেঁকসই নয়, কেন না, এ বিষয়ে রামমোহনের দাবী বিদ্যাসাগরের পুরোবর্ত্তী—কিন্তু রামমোহনও সর্ব্বপ্রথম গদ্য লেখক ছিলেন না। এমনি কথা কোনও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী লিখিলেই সে পরীক্ষকের কাছে লাঞ্ছিত হইত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দিয়া যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন তার জন্য সাহিত্যের এই ফৌজদারী হাকিমের বিচারে তিনি বিজাতীয় ভাবগ্রস্ত সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছেন। এ আবিষ্কারে যে মৌলিকতা আছে তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যাঁরা জানিতেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন। এই অভিনব তথ্যের মূল যুক্তি এই যে বিদ্যাসাগর মহাশয় "কতকগুলি ইংরাজী বই তরজমা করিয়া তাহাই হিন্দুসন্তানদের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন"। সিংহ মহাশয় কি বাঙ্গালী পাঠককে এতদূর অজ্ঞ বলিয়া মনে করেন যে, তাহারা এই কথাটাও নির্ব্বিবাদে গলাধঃকরণ করিবে? তিনি বিদ্যাসাগরের বোধোদয় কথামালা এবং চরিতাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন—তিনি কি একথা জানেন না যে ইহা ছাড়া বিদ্যাসাগর শকুন্তলা সীতার বনবাস প্রভৃতিও লিখিয়াছিলেন, ঋজুপাঠও লিখিয়াছিলেন—এবং সেগুলি পাঠ্য পুস্তক রূপেই লিখিত হইয়াছিল। যদি জানেন তবে তিনি এ কথাটা এসম্পর্কে চাপিয়া গিয়াছেন কেন?

বিদ্যাসাগরের তিন খানি বইয়ের উল্লেখ করিয়াই সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন—"এই প্রকার জাতীয়তাহীন শিক্ষাপ্রণালী দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশে প্রচলিত ছিল।" সিংহ মহাশয় এ কথাটা প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই যে, এসময়ে এই জাতীয় পাঠ্যপুস্তক আরও অনেকে রচনা করিয়াছিল—এবং তার মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় একজন। তিনিও পাঠ্য পুস্তকে প্রধানতঃ ইংরাজী গ্রন্থ আশ্রয় করিয়াই লিখিয়াছিলেন।

সিংহ মহাশয়ের বাঙ্গালা সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে যে রকম জ্ঞান, অন্যান্য বিষয়েও জ্ঞান তাহা অপেক্ষা হীন নহে।

যথা—একটা সাহিত্য সমালোচনার নমুনা দেখুন—মাইকেল "হিন্দুর হৃদয় লইয়া" কেন রাম ও লক্ষ্মণকে রাবণ ও মেঘনাদ অপেক্ষা হীন করিলেন? মেঘনাদবধের সাহিত্যিক মূল্য বিষয়ে অত্যাবশ্যকীয় এই প্রশ্ন সমাধান করিতে গিয়া সিংহ মহাশয়, মাইকেলের জীবন, তাঁর চিঠি পত্র, তাঁর মতামত সম্বন্ধে কোনও গবেষণা অবশ্যক মনে করেন নাই—কেবল মাত্র অন্তরের অভ্রান্ত আলোক সহায়ে ইহার সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন যে, "সেটা ছিল

বঙ্গসাহিত্যে অনুবাদ ও অনুকরণের যুগ। মাইকেল গ্রীক ট্রাজেডিকে আদর্শ লইয়া মেঘনাদ-বধ রচনা করিয়াছিলেন। হোমারের ইলিয়াডের ন্যায় তাঁর কাব্যে মানুষ দেবগণের ক্রীড়া-কন্দুকমাত্র।" এই আলোচনার ভিতর রসানুভূতির অদ্ভুতত্ব প্রভৃতি বড় বড় কথার আলোচনা নাই করিলাম। সিংহ মহাশয়ের এই রচনা তাদৃশ আলোচনার যোগ্য নয়। সুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সিংহ মহাশয় কি কোনও গ্রীক ট্রাজেডিই পড়েন নাই? গ্রীক ট্রাজেডি সম্বন্ধে কোনও আলোচনাও কি কোথাও পড়েন নাই? মেঘনাদবধ ইলিয়াডের আদর্শে রচিত সত্য, কিন্তু ইলিয়াডকে কি সিংহ মহাশয় সত্য সত্যই গ্রীক ট্রাজেডির নিদর্শন বলিয়া মনে করেন? বলা বাহুল্য প্রাচীন গ্রীকের সাহিত্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পরোক্ষ জ্ঞানও যার আছে সেই জানে যে গ্রীক ট্রাজেডি বলিতে যাহা বুঝায় ইলিয়াড তাহা নয় এবং গ্রীক ট্রাজেডির সঙ্গে মেঘনাদবধের কোনও সম্পর্ক নাই।

আলোচ্য প্রবন্ধের পাতায় পাতায় লেখকের এমন সব বহু মন্তব্য আছে যাহা হইতে লেখকের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রগাঢ় ও বহুমুখী অজ্ঞতা ও স্মৃতিভ্রংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তার দৃষ্টান্ত কত দিব।

লেখকের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগেই "বঙ্গালী প্রথম স্বাধীন চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল। আরম্ভ করিয়াই দেখিল পরাধীনতার ন্যায় দুর্ভাগ্য আর মানব জীবনে হইতে পারে না।" বলা বাহুল্য এ কথার ঐতিহাসিক কোনই ভিত্তি নাই। "স্বাধীন চিন্তা" ও স্বাধীনতার চিন্তা এক নয়। বাঙ্গালার স্বাধীন চিন্তার জন্মদাতা বঙ্কিমচন্দ্র বা তাঁর সমসাময়িকেরা নয় —জন্মদাতা রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার একজন প্রধান পুরোহিত ছিলেন। তা ছাড়া স্বাধীনতা মন্ত্রেও দীক্ষাদাতা রাজা রামমোহন রায়। তাঁর পরবর্ত্তীকালে ইহার উদ্বোধন হইয়াছিল অনেকের হাতে—তার মধ্যে বঙ্কিমের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্থান কাহারও নীচে নয়। এসব কথা সিংহ মহাশয়ের যদি জানিবার অবসর না হইয়া থাকে, তবে তিনি এবিষয় আলোচনা না করিলে পারিতেন।

সিংহ মহাশয় এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা বলিয়াছেন, তাদের পরস্পরের সম্পর্ক আলোচনা করিবার অবসর পান নাই। তিনি যে জাতীয়তার জন্য প্রাণপণ করিতেছেন, সে জাতীয়তার প্রকৃত নাম হিন্দুয়ানী। অথচ তার পক্ষে দৃষ্টান্ত দেখাইতে গিয়া তিনি পোলিটিক্যাল স্বাধীনতা ও পোলিটিক্যাল জাতীয়তার কথা আওড়াইয়াছেন। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র যে জাতীয়তার জন্য চীৎকার করিয়াছিলেন—যে স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে "হিন্দুজাতীয়তা" বা হিন্দুয়ানীর কোনও প্রকৃত সম্পর্ক নাই।

কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে লেখকের অজ্ঞতার গভীরতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। তিনি তাঁর সমাজকে চার্চ্চ বলিয়াছিলেন এবং অনেক বিষয়ে বিশ্বজনীনতার নামে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও

আচার অনুসরণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর ভিতর যে আধ্যাত্মিকতার ধারা ছিল তাহা সম্পূর্ণ স্বদেশী, এবং স্বদেশী বলিয়াই পরমহংসদেবের পক্ষে তাঁহার অভিনন্দন করিতে কোনও বিঘ্ন হয় নাই। কেশবচন্দ্র ভগবানকে মা বলিয়া পূজা করিয়াছেন, তাঁর বহু বাঙ্গলা বক্তৃতায় হিন্দুর সুপরিচিত দেবদেবীর প্রতীক আশ্রয় করিয়াই তাঁর আরাধ্য বিশ্বশক্তির ধারণা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে এত বড় প্রকাণ্ড বিদেশী বলিয়া লেখক সাব্যস্ত করিলেন কেন বুঝিতে পারিলাম না।

Congregational worship যেভাবে নববিধান সমাজে গৃহীত হইয়াছে, তাহার আদর্শ খৃষ্টীয় উপাসনা সন্দেহ নাই। কিন্তু রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভা বিলাতী জিনিস নহে—উহার মূল মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—এ কথাটা বোধ হয় সিংহ মহাশয়ের জানা নাই। নতুবা নিভৃত ব্যক্তিগত উপাসনাই হিন্দুর একমাত্র সাধনপ্রণালী বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিতেন না।

King Charles's head-এর মত সতীত্বের কথা সিংহ মহাশয়ের এ প্রবন্ধে আসিয়া পড়িয়াছে। সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলিব।

যতীন্দ্র বাবু সতীত্ব ও তার সামাজিক মূল্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। "মানসী ও মর্ম্মবাণীর" এই সংখ্যায়ই তাঁর মতাবলম্বী আর একটি লেখক সতীত্ব সম্বন্ধে এমন ভাবে আলোচনা করিয়াছেন যে সতীত্ব বস্তুটা একটা নিত্যসত্য—সর্ব্বকালে সর্ব্বযুগে ইহার মূল্য অপরিবর্ত্তিত।

এ বিষয়টা আলোচনা করিতে গেলে কেবল আমাদের সমাজ সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে জানিলেই চলে না। এ বিষয়ে সমস্ত জগতের মানব সমাজের প্রকৃতি ও পরিণতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। সে পরিচয় যার আছে সেই জানে যে সতীত্ব ধর্ম্মটার মূল্য relative—absolute নহে। সমাজের বিশেষ গঠন প্রণালীর সঙ্গেই সতীত্ব খাপ খায়, সেই প্রণালীর ভিতরই সতীত্ব ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়—অন্য অবস্থায় হয় না। এমন সমাজ আছে যেখানে এক নারীর পক্ষে কেবল মাত্র এক পুরুষে অনুরক্তি, নিন্দা ও শাস্তির বিষয় হইতে পারে। দ্রৌপদীর যে অবস্থা হইয়াছিল সে অবস্থা তিব্বতে বহু নারীর হয়। সেখানে নারীর পক্ষে একাধিক পুরুষের সেবায় অপ্রবৃত্তি ধর্ম্ম নহে অধর্ম্ম। তা ছাড়া যখন স্বামীর ধর্ম্ম ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য নিয়োগের দ্বারা পুত্রোৎপাদন নারীর ধর্ম্ম ছিল, তখন যদি কোনও নারী পাতিব্রত্যের দোহাই দিয়া নিয়োগে অসম্মত হইত, তবে সে প্রশংসিত হইত না নিন্দনীয় হইত। মহাভারতের আদিপর্ব্বে ভীষ্ম, ভ্রাতৃবধুদের নিয়োগের ব্যবস্থা দিতে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা আজকালকার কোনও হিন্দুবিধবার কাছে উপস্থিত করিলে সম্মার্জ্জনী পুরস্কার লাভ করিতে হইত। আরব-দেশের বহুস্থানে অতিথি সৎকারের একটা প্রধান অঙ্গ এই যে গৃহস্থের পত্নী অতিথির অঙ্কশায়িনী হয়। এ ব্যবস্থায় অতিথি আপত্তি করিলে তাহা গুরুতর অপমান বলিয়া

বিবেচিত হয়, এবং পত্নী যদি এইরূপে পরপুরুষের সেবা করিতে পরাঙ্মুখ হয় তবে সে সতী বলিয়া পূজিত হয় না—অধর্ম্মচারিণী বলিয়া লাঞ্ছিত হয়।

এমনি নানাদেশের আচার অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে সতীত্ব বা পতিপত্নীর সম্বন্ধ বিষয়ক যে কোনও কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই কোনও নিত্যবিধি কোথাও নাই। এ বিষয়ে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের মানদণ্ড সমাজের আবেষ্টনাপেক্ষ। সতীত্বের সমাদর ও সম্মানের মূল এই যে, ইহা স্বামী-প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই প্রেম বশতঃ নারী আপনাকে ঠিক সেই ভাবে গঠিত করিতে ইচ্ছা করে যাহা তাহার স্বামীর আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী হইবে। আমাদের সমাজে সে আকাঙ্ক্ষা পত্নীর একনিষ্ঠার দিকে তাই একান্ত পাতিব্রত্য এখানে প্রশংসিত এবং প্রেমময়ী নারী এই পাতিব্রত্যের সাধনা করে।

এই বিষয়ের আলোচনার শেষে সিংহ মহাশয় আমার একটি উক্তি উদ্ধার করিয়া আমাকে challenge করিয়াছেন। আমি বলিয়াছি "নূতন কথা যতই অরুচিকর হউক না কেন, তাহা বলিবার অধিকার কবিকে দিতে হইবে……ইত্যাদি।" আমি যেস্থানে এই কথা বলিয়াছি তাহার context এর সম্বন্ধে লেশমাত্র আভাস না দিয়া সিংহ মহাশয় কথাটা উদ্ধার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার প্রকৃত বক্তব্য কি তাহা যদি কেহ জানিতে চান তবে আমি তাঁকে আমার প্রবন্ধটি পাঠ করিতে বলিব।

সিংহ মহাশয় এ কথার পর বলিয়াছেন "আমি ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, তিনি তো এতগুলি উপন্যাস লিখিয়া আর্টের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তিনি কয়টি 'নূতন কথা' সমাজকে উপহার দিয়াছেন? স্ত্রী পুরুষের একনিষ্ঠ প্রেমের ব্যভিচার, প্রেমের নামে ভোগলালসার বহ্নিতে আত্মসমর্পণ, ইত্যাদি ব্যাপার ত সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই লোকে শুনিয়া আসিতেছে। এই সকল কথা আর্টের কসরত দেখাইবার জন্য বিলাতী ঢঙে যতই চিত্তাকর্ষক করিয়া চিত্রিত করা হউক না কেন, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই।"

যদি সিংহ মহাশয় মনে করিয়া থাকেন যে এ প্রশ্নের উত্তরে আমি আমার গ্রন্থের প্রশস্তি বা সমালোচনা করিতে বসিব, তবে তিনি ভুল বুঝিয়াছেন। আমি আমার উপন্যাসে নূতন কথা কতকগুলি বলিবার চেষ্টা করিয়াছি সত্য—কিন্তু সত্য সত্যই তাহা নূতন বা সত্য কিনা সে বিচারের ভার আমার নহে। আমার প্রবন্ধের যে কথার আলোচনা করিতে তিনি অগ্রসর হইয়াছেন তাহার উত্তরে এই প্রকার ব্যক্তিগত প্রশ্ন উপস্থিত করা শিষ্ট তর্ক পদ্ধতির অনুমোদিত নহে।

আমার উপন্যাসের ভিতর নূতন সত্য কিছু আছে কিনা তাহার দ্বারা আমার প্রবন্ধের বক্তব্যের সত্যাসত্য নির্ণয় হইতে পারে না। যদি নূতন কিছু আমার উপন্যাসে না থাকে,

তবে তাহা নিরর্থক হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাও একেবারে অসম্ভব নয় যে আমার উপন্যাসে নূতন রস বা নূতন সত্য যাহা আছে তাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা হয় তো সিংহ মহাশয়ের নাই। যাহাই হউক একথা বিচারের ভার আমার নহে। কিন্তু সিংহ মহাশয় বলিতে চান যে আমার উপন্যাসগুলিতে তিনি পাইয়াছেন, সুধু স্ত্রী-পুরুষের একনিষ্ঠ ব্যভিচার, প্রেমের নামে ভোগলালসার বহ্নিতে আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ ইহাই আদর্শ অথবা অনিন্দনীয় বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহা ছাড়া নূতন কিছুই তিনি পান নাই।

সাহিত্যিক শিষ্টাচারের যদি কোনও মর্য্যাদা সিংহ মহাশয় রক্ষা করিতে চান, তবে হয় তিনি একথা প্রমাণ করিবেন, নতুবা ক্রটী স্বীকার করিয়া ইহার প্রত্যাহার করিবেন।

আমি এ বিষয়ে সিংহ মহাশয়কে বিশেষতঃ কয়েকটি প্রশ্ন করিতে চাই—আশা করি তিনি তার প্রত্যেকটির সত্য উত্তর দিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

তিনি আমার কয়খানি বই পড়িয়াছেন? কয়খানির নাম শুনিয়াছেন? আমার কয়খানি বইয়ে স্ত্রীপুরুষের প্রেমের ব্যভিচারের প্রসঙ্গ মাত্র আছে? কোন বইখানিতে তাহা প্রশংসিত হইয়াছে বা অনিন্দনীয় বলিয়া বলা হইয়াছে?

কলমের আগায় কালি ছিটাইয়া লোককে কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা সহজ। সিংহ মহাশয় আমার সম্বন্ধে বহুবার এমনি সাধারণ উক্তি করিয়াছেন—কোনও খানেই তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। আশা করি তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে আমার প্রত্যেক গ্রন্থ হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া তাঁর নিন্দাবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিবেন এবং যদি তাহা না পারেন তবে তাঁর অক্ষমতা স্বীকার করিবেন।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ভ্রমর

অলি ধেয়ে আসে, মরমের পাশে
　　এত টুকু নাই মধু।
কোরকের কাণে, নিজ গুণ গানে,
　　হতে শুধু চায় বঁধু।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

বার-এট্-ল

নূতন বারিষ্টার মহলে চারু দত্তের পসার খুব বেশি। তাই অনেকেই তাকে বেশ একটু হিংসার চোখেই দেখে আর তার অসাক্ষাতে কানাকানি করে,—"আশ্চর্য্য। ছোঁড়াটা বিয়ে করে যেন কেঁপে উঠল। কে জান্ত বুড়ো ঘোষ সাহেবের অত টাকা ছিল? ছোকরা দিব্যি শাঁসে জলে বাগিয়েছে হে।"

একজন পাইপটা ঠোঁটের বাঁদিকে চেপে, তাতে আগুন ধরাতে ধরাতে বল্‌ল—"শাঁসে জলে আর বোলটে, ছুটি লক্ষ বেঙ্গল বেঙ্কে নগত।"

দু'বছরের মধ্যে খুব কষ্ট করে চারু দশটি ক্লাবের সেক্রেটারী, সাতটি ক্লাবের মেম্বর, আরও ঐ রকম কত কি হয়েছে, কিন্তু তার মন আর কিছুতেই ওঠে না। মাঝে মাঝে কোন বন্ধুকে বলে, "সত্যি বল্‌ছি ভাই, আমাদের এই দেশী ক্লাবগুলো একেবারে ওয়ার্থলেস্।"

একদিন সন্ধ্যাবেলা চারু, তার জন দুইচার বিলাত-ফেরত বন্ধুকে নিয়ে চা খাচ্ছে। মিসেস্ ডাট্ সকলকে আদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত করছেন। "জারমানরা আবার অফেন্‌সিভ্ নিয়েছে, ওদিকে রাষিয়াও নিজেদের মধ্যেই কাটাকাটি মারামারী আরম্ভ করে দিয়েছে, তবে আমেরিকা এলাইদের পক্ষ নিয়ে নাবছে, এই যা ভরসা" ইত্যাদি, আলোচনার মধ্যখানে হঠাৎ চারু বলে উঠ্‌ল—"আচ্ছা মিঃ বোনার্জি, আপনি ত লজ-এর মেম্বর?" মিঃ বোনার্জি বললেন—"হাঁ, সে আর নতুন কথা কি, আজ প্রায় পাঁচবছর ত ওখানে যাতায়াত করছি।" কথা কয়টী বলে বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে তিনি সকলের মুখের দিকে একবার তাকালেন।

চারু বল্‌ল—"তা আমাকে ত ওখানে যাবার জন্যে একবারও বলেন না। যত রাজ্যের নরক ঘেঁটে আমার দিন যায়।"

বোনার্জি বললেন,—তা ভাই একজনকে ত ঘাঁট্‌তেই হবে। নইলে পরিষ্কার হবে কেন? এই দেখনা তুমি এসে পর্য্যন্ত আমি একটু হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। অস্থির হয়ে উঠেছিলাম হে। কোথায় কোন্ সাহেব বাঙ্গালীদের লক্ষ্য করে কি কথা বলেছে, এক ক্লাব থেকে হুকুম হল—দাও তার জবাব। আজ ছাত্রদের শারীরিক এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে লেক্‌চার দাও। কাল টি পার্টি দাও। বলতে কি ভাই শুধু পাগল হতে বাকি ছিল। আশীর্ব্বাদ করি আমার মাথার চুলের মত তোমার পরমায়ু হোক। তুমি আমার প্রাণদাতা সেভিয়র।

চারু হেসে বল্‌ল—"আপনার ওসব বাজে বকুনি রেখে লজ-এ ঢুকবার একটা উপায় করে দিন্।"

বোনার্জী সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়া গলাটা উঁচু করে আকাশের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে বল্‌লেন—তা এক কাজ কর না, তুমি একটি এপলিকেশন করে দাও, আমি সেটা সব্‌মিট করব। আসল কথাটা কি জান, রোম্যান ক্যাথলিক মিশনারিদের মত ভজিয়ে ভজিয়ে মেসন করবার নিয়ম নেই। যার ইচ্ছে হবে তাকে নিজে দরখাস্ত করতে হয়। বুঝলে ?

মিসেস ডাট সেই খানে বসে পড়ে বল্‌লেন—সত্যি কিন্তু ঐসব লক্ষ্মীছাড়া বাঙ্গালী ক্লাবে গিয়ে অবধি ওঁর শরীর আধখানা হয়ে গেছে। মিঃ বোনার্জি আপনি একটু চেষ্টা করে ওঁকে আপনাদের লজ্-এ নিন।

রাত্রি ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। সকলে যাবার জন্য ব্যস্ত হতে, শুভরাত্রি ইচ্ছা করে, এই টি-তে সকলকে আহ্বান করে মিসেস্ ডাট্ তাঁদের অত্যন্ত বাধিত করেছেন, এবং তাঁরা তাঁর সুরুচিপূর্ণ ব্যবহারে অত্যন্ত আনন্দলাভ করেছেন ইত্যাদি কথার পর চলে গেলেন।

সকলকে বিদায় দিয়ে মিসেস্ ডাট্ বললেন,—আচ্ছা, খুব ভাল হবে না ? আমার ত খুব ভাল লাগ্‌ছে, বেশ হবে কিন্তু। কি কতগুলো বাজে ক্লাবে গিয়ে সময় নষ্ট করার চেয়ে লজ্-এ গেলে ঢের উপকার হবে। তাছাড়া সেখানে কত বড় বড় লোক যায়। মোটের ওপর সোসাইটিটা খুব হেল্‌দি না ?

সপ্তাহ দুই পরে কোর্ট থেকে ফিরেই সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে চারু বলে উঠ্‌ল,—জান মীরা, – শুনেছ ?

বারাণ্ডায় রেলিংএ ভর দিয়ে মীরা বল্‌ল,—"খুব জানি। আগে ওপরে ত উঠে এস।" চারুর ঘর্ম্মাক্ত এবং আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সে বল্‌ল—"হয়েছে কি তোমার ? অমন করছ কেন ?" চারু তেমনি হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌ল,—"ওরা ত আমায় নিয়েছে বুঝলে। সাড়ে পাঁচটা ত বেজে গিয়েছে আর একঘণ্টা মাত্র সময় আছে। তুমি শিগ্‌গির আমার ড্রেস সুটটা বার করে দাও। আজ আমার লজ-এ—আঃ দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? শুনতে পাচ্ছ না ?"

মীরা হেসে বল্‌ল,—"আগে যেটা পরে আছ সেটা ত ছাড়। জলটল কিছু খেতে হবে না কি ?"

ভ্রূকুটি বাঁকিয়ে চারু বল্‌ল—তোমাকে যা বল্‌ছি তাই কর না। আমার জামা আমি ছাড়ি না ছাড়ি তোমার তাতে দরকার কি ? বো—ই। নেপথ্যে শব্দ এল—"হুজুর।"

মীরা একখানা ভিজে তোয়ালে দিয়ে চারুর মুখের ঘাম মুছিয়ে দিয়ে বল্‌ল, "মনে থাকে যেন।" ড্রেসিংরুমে ঢুকে চারু বল্‌ল—"কি ?" মীরা বল্‌ল "আমাকে লজ সম্বন্ধে সব কথা বলতে হবে। আমি এন্‌সাইক্লোপিডিয়াতে ফ্রি মেসন্‌রি সম্বন্ধে যত কিছু একাউন্ট ছিল, সবই

পড়েছি, কিন্তু ওদের আসল উদ্দেশ্যটা যে কি তা ঠিক ধরতে পারি নি। আজ রাত্রে ওখান থেকে ফিরেই আমাকে সব বলতে হবে কিন্তু।"

চারু বল্‌ল,—"বাঃ সে কি করে হবে? তুমি কি জান না মেসনদের যা সিক্রেট তা যারা মেসন্ নয় তাদের কাছে বল্‌তে নেই?"

মীরা বল্‌ল—"বাঃ আমি যে তোমার স্ত্রী!"

চারু বল্‌ল—"হলেই বা স্ত্রী, আমি যখন লজের মেম্বর, তখন আমার কাছে দোকানের মুদি এবং আমার স্ত্রী দুই সমান। তার কাছে যেমন বলতে পারি না, তেমনি তোমার কাছেও নয়।"

ধপধপে শাদা দাঁত দিয়ে মীরা ঠোঁটটিকে একটু কামড়ে, কাপড়ের আঁচলটা আঙ্গুলে জড়াতে জড়াতে বল্‌ল,—"ওঃ বেশ! দোকানের মুদী মিন্‌সে আর তোমার স্ত্রী তোমার কাছে এক্? বেশ তাই হোক।" বলে ঝমাস করে চাবির গোছাটি পিঠের ওপর ফেলে, বেশ মন্থর গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কোন প্রকারে পোষাক পরা শেষ করে চারু মীরার ঘরে এসে দেখল সে বিছানায় শুয়ে আছে। মুখটি দুটি বালিশের মাঝে ঢাকা। আদর করে তার পিঠে হাত বুলিয়ে চারু বল্‌ল -"লক্ষ্মীটি মীরা, রাগ করো না, ওঠ। আচ্ছা, একবার দেখলেও না আমায় ড্রেসসু্‌'ট কেমন মানায়? আচ্ছা বেশ।"

এবার মীরার সর্ব্বশরীর একটু যেন আন্দোলিত হয়ে উঠল। তারপর দুটি ভিজে চোখ আর একটি হাসিমুখ বালিশের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল। চারু মাথার হ্যাটটা ডানহাতে করে তুলে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বিলাতী কায়দায় মীরাকে অভিবাদন করল। মীরা খিল খিল করে হেসে উঠে বল্‌ল—"ঠিক যেন হোটেলের ওয়েটার।"

ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত সোজা হয়ে চারু বল্‌ল "অল্ রাইট।" আর কোন কথা না বলে সে চলে যাবার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে এল। মীরা ছুটে এসে তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বল্‌ল "আর বলব না।" চারু বিরক্ত হয়ে বলল, "আঃ কি কর। সরে যাও আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

"আর অত রাগ করতে হবে না গো মশাই। এই নাও মাপ চাচ্ছি।" বলে মীরা চারুর পায়ের কাছে বসে পড়তে গেল। তাকে তুলে কপালে একটি টোকা দিয়ে চারু বল্‌ল,—"ইউ'নটি গার্‌ল্। আচ্ছা শোধবোধ কেমন?"

মীরা বল্‌ল, "আচ্ছা; কিন্তু……।" ঘড়িতে ৬টা বাজ্‌ল। চারু চম্‌কে উঠে বল্‌ল, "ঐ দেখ তোমার সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল।—টিল্ উই মিট্ এগেন্ ডার্লিং।" চারু যখন শেষ সিঁড়িতে নেবে এসেছে ওপর থেকে মীরা বলে উঠল, "বল্‌তে হবে কিন্তু।"

রাত তখন প্রায় সাড়ে বারটা। চারুর পায়ের শব্দ পেয়ে মীরা তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেবে, চারুর সাম্নে এসে বল্‌ল—"কি হল বল।"

মেসনদের সম্বন্ধে সমস্ত কথা জান্‌বার জন্যে তার মন ছট্‌ফট্‌ করছিল। বই-এর পাতায় সে ঐ বিষয়ের অনেক কথাই পড়েছে, কিন্তু সেগুলো সব সত্যি কিনা জান্‌বার জন্যে তার মন আকুল হয়ে উঠেছিল। কত অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা করে সে সমস্ত সন্ধ্যাটী কাটিয়েছে। তাই চারু ঘরে ঢুকতেই তার যেন আর দেরী সহ্য হল না।

চারুর কিন্তু সে রকম কোনই ভাব দেখা গেল না। সে দিব্য গদাই লস্করী চালে কোটটি পাট করে একটা চেয়ারের উপর ফেলে, বেশ ভাল করে ধুতিখানি পরে বল্‌ল—"চল শুতে যাই, রাত ত বড় কম হয় নি।"

এই অল্প সময়টুকু মীরার যে কি করে কেটেছে, তা ভগবানই জানেন। তার ধারণা ছিল কাপড় ছাড়া হলেই চারু সব বলবে। এত বড় একটি ব্যাপার তার কাছ থেকে কি লুকিয়ে রাখতে পারে ?

মীরা এবার প্রায় কেঁদে উঠেই বল্‌ল —"তাহলে বল্‌বে না আমায় ?" চারু বিরক্ত হয়ে বল্‌ল, —"কি জ্বালা ! আমি কি তোমার কাছে হলপ্ করেছিলাম বল্‌ব ? আর বল্‌বই বা কি ! লজ-এর কথা কাকেও বলতে নেই এ ত তোমায় হাজারবার বলেছি। সে যে সিক্রেট।"

"কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কিছু লুকোচুরি থাকা উচিত নয়। তুমি ত একদিন বলেছিলে 'আমার যা কিছু গোপনীয় বিষয় তার ওপর তোমার অধিকার রইল, আর তুমিও আমায় সব বোল।' আমিত তোমায় সবই বলেছি। এখন তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রাখ।"

চারু একটা হাই তুলে তুড়ি দিতে দিতে বল্‌ল,—"নাঃ আজ আর ঘুমোতে দেবেনা দেখ্‌ছি।" তারপর পাঁচমিনিটের মধ্যেই নাক ডাকার শব্দে স্ত্রীর কান্নাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হল।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে কিন্তু কোথায় যেন একটু গরমিল ঠেক্‌ছিল, সেটা চারু ঠিক্ ধরতে পারছিল না। তাদের সাম্‌নে টোষ্ট, ডিম, কেক্, চা সবই ঠিক রয়েছে, দুজনেই খাচ্ছে, কিন্তু খাওয়াটা যেন সব দিনের মত হচ্ছে না। মীরার মাথাটা চায়ের পেয়ালা থেকে আর ওঠেনা। যদিও বা ওঠেও অন্য সব দিকে ফেরে শুধু চারুর দিক্ ছাড়া। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কিছু বুঝতে না পেরে, কিংবা একটু বুঝে চারু বল্‌ল—"দেখ পেলিটি থেকে আর কেক্ আনিওনা কেস্‌ল্‌এজো থেকেই আনিও।" মীরা ছোট্ট একটি ঘাড় নাড়ল, তারপরই সব চুপ। চারু বল্‌ল—"উঃ চা-টা কি ষ্ট্রং হয়েছে।" মীরা চায়ের পেয়ালায় খানিক দুধ ঢেলে দিয়ে নিজের মনে খেয়ে যেতে লাগ্‌ল।

চা খাওয়া শেষ হলেই মীরা নিজেই চায়ের পাত্র দিয়ে টি সেট্‌টা পরিষ্কার করতে বসে

গেল। চারু বল্‌ল, "চল কাগজ পড়িগে।" এই সময়টা দুজনে একটু পড়াশুনা করে। মীরা কোনই উত্তর দিল না, নিজের মনে বাটি ঘস্‌তে লাগ্‌ল। চারু আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটু বিরক্ত হয়ে বল্‌ল—"ওগো শুন্‌ছ?" ওগো যে কিছু শুন্‌ছে তা মনে হল না, অন্ততঃ তার কোন প্রমাণ পাওয়া গেলনা।

এইভাবে সকালটা কাট্‌ল। কোর্টে যাবার পূর্ব্বে চারুর খাবার সময় মীরা নিয়মমত টেবিলের কাছে এসে বস্‌ল। মোটে দুখানা চপ্‌ দিয়েছে বলে বয়কে ধমকানও হল, কিন্তু চারু কোন কথা জিজ্ঞেস্‌ করে সাড়া পেল না।

কোর্ট থেকে ফিরে জামা কাপড় ছেড়ে চারু দেখ্‌ল মীরা একখানা থালায় ফল সাজিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। খুসী হয়ে সে বল্‌ল, "ওগো চলনা আজ দুজনে একটু বেড়িয়ে আসি?" মীরা তেমনি তার নীরবতার ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে স্বামী বেচারাকে বেশ একটু কাহিল করে কোন কাজে চলে গেল। চারু আপনার মনে বল্‌ল, "নাঃ মজালে দেখ্‌ছি।" সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস করেও মীরার সঙ্গে সন্ধির কোন উপায়ই সে খুঁজে পেল না। রাত্রে শোবার সময়ও ঐ রকম ব্যবহার পেয়ে তার নাসিকাধ্বনির অনেকখানিই হ্রাস হয়ে গেল। তারপর আরও চারদিন ঐ একই অবস্থা, বরং একটু খারাপ।

পাঁচদিনের দিন প্রায় মরিয়া হয়েই চারু মীরার হাত চেপে ধরে বল্‌ল—"দোহাই তোমার, একটা কথা বল। যদি কিছু অন্যায় করে থাকি ত ক্ষমা কর।"

"উঃ লাগে, হাত ছাড়" বলে মীরা পালাবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল।

যাক্‌ কথা বলেছে। আরামের নিশ্বাস ফেলে চারু মীরার চুলের মধ্যে বিলি কেটে দিয়ে আদর করে ডাক্‌ল, "মীরি মীরণ।" মীরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্‌ল—"ঢের হয়েছে আর অত সোহাগ দেখাতে হবে না।"

চারু বল্‌ল, "মীরা আজ এক সপ্তাহ আমার যে কি করে কেটেছে তা যদি জানতে। যদি বুঝতে......"

মীরা বল্‌ল "আর আমার বুঝি বড় সুখে কেটেছে?"

চারু তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বল্‌ল, "দেখত মিছিমিছি আমরা কত কষ্ট পাচ্ছি।"

মীরা চারুর গলা জড়িয়ে বল্‌ল, "বলবে বল।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চারু বল্‌ল,—"দি ওল্ড ষ্টোরি। ও যে হতে পারেনা মীরা।"

"কেন হতে পারে না? তুমি ত প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমার কাছ থেকে কোন কথা লুকিয়ে রাখবে না। আর আমিও ত কিছু লুকোই নি। এই যে সেদিন মিস্‌ লাহিড়ী ও মিঃ বোনার্জ্জির ছোট ভাই লুকিয়ে এনগেজমেণ্ট করল, আমি ছাড়া আর কেউ জানত না,

কিন্তু তোমাকে ত সেইরাত্রেই বলেছি। তারা আমায় কত মানা করেছিল। আমি ভাবলাম তোমাকে বলব তাতে আর দোষ কি ?"

চারু একখানা ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়ে বল্‌ল, "তা সত্যি। কিন্তু মীরা, যদি বাইরের লোক ঘুণাক্ষরেও টের পায় আমি তোমায় বলেছি তাহলে কিন্তু......"

মীরা বল্‌ল "আমি কি এমনি বোকা ?"

চারু সোজা হয়ে বসে বল্‌ল—"আচ্ছা শোন তবে—প্রথমে একটা হল পার হয়েই যে ঘরটায় আমি এলাম, সেখানে সাঁইত্রিশ জন লোক। তাদের 'ভাই' বলে। ধপ্‌ধপে সাদা সাটিনের ইজের আর টকটকে লাল জামা পরে ঘরের দুধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আমায় অভ্যর্থনা করল। আর ঐ সাঁইত্রিশ জন ভাই-এর কপালে......। মীরা ক্ষমা কর, আমি আর পারব না।"

মীরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌ল, "তা আগে বললেই হত। আমায় আশা দিয়ে নিরাশ করবার দরকার কি ছিল ?"

চারু তার হাত দুটি ধরে বলল, "রাগ করোনা মীরা, কি জান, একটা মস্ত বড় প্রতিজ্ঞা করে ভাঙ্গছি বলে মনটা বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে।"

মীরা বলল "আমার কাছে যদি কোন লুকান কথা বল তাহলে সেটা মোটেই দোষের হয় না। তুমি আর আমি কি এক নই ?"

চারু এবার অনেকটা সংযত হয়ে বলতে লাগ্‌ল,—"সেই সাঁইত্রিশ জন ভাইয়ের কপালের বাঁদিকে একটা করে রূপোর তারা ঝুলছে—আর—।" চারুর কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই মীরা বলে উঠ্‌ল,—"তুমি কি বলতে চাও মিঃ বোনার্জ্জি তাঁর কালো পিপেটির মত বপুখানি সাদা আর লাল সার্টিনে ঢেকে কপালে তারা ঝুলিয়ে...... ?" বলেই সে চীৎকার করে হেসে উঠ্‌ল।

চারু খুব গম্ভীর হয়ে বল্‌ল—"মীরা তুমি এত বড় একটা গুরুতর কথা নিয়ে হাস্‌ছ দেখে আমার যে কি মনে হচ্ছে তা তোমায় বোঝাতে পারি না। লজ-এর সাঙ্কেতিক কথা নিয়ে এমন করে হাসাটা অন্ততঃ তোমার পক্ষে শোভা পায় না।"

"না, না, আর হাস্‌ব না। তুমি বল।—কিন্তু বোনার্জ্জির গায়ে লাল জামা!" বলে মুখে কাপড় গুঁজে মীরা হাসি নামাতে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল।

"তারপর সকলে একসঙ্গে ডানহাতের একটা আঙ্গুল ওপরকার ঠোঁটের ওপর রাখ্‌ল।" মীরা বল্‌ল, "ওঃ ওটা তোমাদের মেসনিক সাইন্‌; আমি কিন্তু বাবার সঙ্গে মিঃ গ্রিমস্বর বাড়ী টিপার্টিতে গিয়ে দুএকজন সাহেবকে ওরকম কর্‌তে দেখেছি। তখন মনে করেছিলাম হয়ত ওদের গোঁপ কামাতে গিয়ে কেটে গেছে, তাই হাত বুলাচ্ছে।"

চারু বল্‌ল—"পাগল কোথাকার, তা নয়। ওর মানে একজন মেসন্ আর একজন

মেসন্‌কে লুকিয়ে নমস্কার করছে, বুঝলে; তারপর আমাকে লজ-এর সেই বিশেষ ঘরটিতে নিয়ে গেল। মীরা······।"

"লক্ষ্মীটি তোমার দুটি পায়ে পড়ি যা বল্‌ছিলে তা বলে ফেল।—বল্‌বেনা? লক্ষ্মীটি।"

"সেই ঘরের দেওয়ালের ওপর সৌরমণ্ডল আঁকা ছিল। তার চারধারে অতি সূক্ষ্ম একটি আলোক-রেখা-বেষ্টনীও আঁকা ছিল। এই রেখা-বেষ্টনী ধরেই সৌরমণ্ডল বছরের পর বছর নিজেদের গন্তব্য পথে চল্‌তে থাকে। সেই বেষ্টনীটিকে দেখতে পাবার একটি সহজ উপায় তাঁরা আমায় বলে দিলেন। ঘরের ভিতর বিনা আলোয় সেটিকে দেখ্‌তে পেলে তবে সাঁইত্রিশ মাসের পর শুধু চোখে আকাশের গায়ের রেখাটিও দেখ্‌তে পাব। অন্য বিষয়ের উপদেশ পরের সপ্তায় পাব। আর কিছু জানতে পারিনি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে।"—

মীরা চারুর মুখে হাত চাপা দিয়ে বল্‌ল, "থাক্ প্রতিজ্ঞার কথা আর বল্‌তে হবে না, অনেক রাত হয়েছে শোবে চল।"

"কিন্তু মীরা প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলাম না বলে আমার বুকের ভিতরটা যা কর্‌ছে।"

মীরা মনে মনে বল্‌ল, "মিসেস্ বেনার্জ্জি, চাটার্জ্জি, মজুমদার, এরা কেউ জানে না। শুধু আমি জানি। ওঃ আমার বুকের ভিতরটা যা করছে।"

সকাল বেলাই মিসেস্ মজুমদার চিঠি পেলেন,—মীরা লিখেছেঃ—"ভাই প্রতিমা, তুমি আজ অতি অবিশ্যি দুপুরে আমার বাড়ী এসো। বড় গোপনীয়, বড় দরকারী কথা আছে। নিশ্চয় নিশ্চয় এসো।"

ঠিক বেলা সাড়ে বাড়োটার সময় মিসেস্ মজুমদারের গাড়ী চারুদের ফটকে ঢুক্‌ল। মীরা একরকম ছুটে গিয়েই প্রতিমার ঘাড়ে পড়ে বল্‌ল—"জান ভাই প্রতিমা?" তারপর দশ মিনিটের মধ্যেই মীরার গোপনীয় কথা প্রতিমাকে সব বলা হয়ে গেল। দুজনেই একমত হয়ে রায় দিল,—"কিচ্ছু না, কিচ্ছুনা, ও লজ্‌টজের সিক্রেটের কোন ভেলুই নেই।—কিন্তু বোনার্জ্জির গায়ে লাল জামা, আর কপালে তারা ভারি, ইন্টারেষ্টিং।" দুজনেই খুব হাস্‌তে লাগ্‌ল। প্রতিমা বল্‌ল, "তাহলে আসি ভাই, কাজ আছে।" মীরা তাকে বিদায় দিয়ে বল্‌ল, "দেখ ভাই কাকেও বলনা যেন, তাহলে ওঁর বড় অপমান হবে।" জিভ কেটে প্রতিমা বল্‌ল,—"তাও কি হয়?"

গাড়ীতে উঠেই প্রতিমা কোচ্‌ম্যান্‌কে বল্‌ল,—"চ্যাটার্জ্জি সাবকা কোঠি।" বেশি নয়,—ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে কতকগুলি বিখ্যাত বঙ্গনারী মেসনিক্ লজ্ সম্বন্ধে বিনা আয়াসেই অনেক কথা জেনে ফেল্‌লেন।

একদিন চারু কোর্ট থেকে ফিরে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বল্‌ল,—"মীরা।" ঐ মীরা কথাটা

এমন ভাবে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, যেন ঐ কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার সুখ দুঃখ আশা ভরসা সমস্তই শেষ হয়ে গেল।

ভয় পেয়ে মীরা বলল, "কি হয়েছে? অমন করছ কেন?" চারু তেমনি ভাবেই বল্‌ল, "মীরা তুমি আমার স্ত্রী?" তারপর নির্জ্জীবের মত একটা চেয়ারে বসে পড়ে দুই হাতে মাথা টিপে ধরল। মীরা কাতর হয়ে বল্‌ল, "কি হয়েছে বল্‌বে না?" চারু খুব জোরে নিশ্বাস টেনে সেটা ছাড়তে ছাড়তে বল্‌ল,—"বল্‌বার আর কিছুই নেই মীরা।"

"ওগো দোহাই তোমার, সব খুলে বল। কি হয়েছে?"

"একটু একলা থাক্‌তে চাই মীরা। আহা আজকের এই রাত্রি যদি অনন্ত রাত্রি হয়, দিনের আলো যদি আর না ফোটে, তাহলে আমার এই কাল মুখ এই অন্ধকারের মধ্যে রেখে হয় ত একটু নিশ্চিন্ত হতে পারি। কিন্তু তা হবে কি? ওঃ! ঠিক কাল ৬টার সময় আবার সূর্য্য উঠ্‌বে, আমার মুখের ওপর দিনের আলো পড়বে। আর লক্ষ লক্ষ লোক আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌বে—ঐ সেই বিশ্বাসঘাতক।ওঃ মীরা!"

স্বামীর মুখের ওপর মুখ রেখে মীরা বল্‌ল, "তোমার পায়ে পড়ি, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

চারু তাকে দুই হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে হঠাৎ ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠ্‌ল,—"কি হয়েছে? জাননা কিছু? কতশত বছর ধরে মানুষ যে কথাটি প্রাণপণে নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল, সেই কথাটি সেই পবিত্র কথাটি, আজ এই বিংশ শতাব্দীর একজন নব্য বাঙ্গালী বেরিষ্টারের মুখ দিয়ে রাষ্ট্র হয়ে গেল! আর তার স্ত্রী·········!"

"কিন্তু আমিত কেবল প্রতিমাকে বলেছিলাম।"

"প্রতিমাকে বলেছিলে? তুমি নিজে যে কথা মনে চেপে রাখ্‌তে পার না, কি করে আশা কর অন্যে সেই কথাটা চেপে রাখ্‌বে মীরা?" মীরা চারুর পা দুটি জড়িয়ে ধরে বল্‌ল, "চল আমাকে তোমাদের লজ-এ নিয়ে। আমি সবাইর সাম্‌নে আমার দোষ স্বীকার করে নেব।"

"এবং তোমার স্বামীর মুখে চুণকালি আর একটু বেশী করে মাখিয়ে দেবে। মীরা, তোমার স্বামীর গোপনকথার ওপর তোমার অধিকার আছে একদিন বলেছিলে, কিন্তু স্বামীর মান ইজ্জৎ তোমারও মান ইজ্জৎ তা কি একবারও ভেবেছিলে?"

মীরা আকুল হয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। চারু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল: "কেঁদে কোন লাভ নেই মীরা। অবশ্য এ কথাটা লজ-এর মেম্বররা সকলেই অস্বীকার করবে। তবে······।"

"আমাকে শাস্তি দাও। ওগো আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমায় মেরে ফেল।"

কেঁদে কেঁদে মীরা ঘুমিয়ে পড়েছে। চারু আস্তে আস্তে ড্রেসিং রুমে ঢুকে আলো জ্বেলে আরসিতে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে কুটিপাটি হতে লাগ্‌ল। অনেক কষ্টে

হাসি থামিয়ে বল্‌ল—"ওয়েল প্লে-ড ওল্ড বয়। আমার দেখ্‌ছি ব্যারিষ্টার না হয়ে এক্টর হওয়াই উচিত ছিল।" তারপর অনেকদিন পরে দিব্য আরামে আর একবার নাক ডাকার শব্দে ঘরটিকে কাঁপিয়ে তুল্‌ল।

সকালে চা খাওয়ার পর চারু বল্‌ল, "মীরা, তুমি একটু বোস। আমি লজ-এর গ্রাণ্ড মাষ্টারের কাছে ফোন করে আমার দোষ স্বীকার করি।" অফিস রুমে ঢুকে রিসিভারটা কানে তুলে নিয়ে হাঁক দিল—"নাইন্ নট্ নট্ নাইন্ প্লিজ।" তারপরই "হেলো ডাট্" "হেলো মজুমদার" বলে দুজনে সম্ভাষণ করার পর মজুমদার হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল—"বলি ব্যাপারটা কি হে? তোমার স্ত্রীকে কি সব ছাইভস্ম বলেছ? তিনি আবার তাই আমার স্ত্রীকে বলেছেন। সে ত আজ দুদিন খাওয়া দাওয়া ছেড়ে কেবল এর তার বাড়ী করে বেড়াচ্ছে। কাল দুপুরে তাকে গাড়ী দিইনি বলে একখানা ঘড়্‌ঘড়ে ছেকড়া গাড়ী করে এই রোদে বেরিয়ে পড়্‌ল। তোমার কথা জনকতক সাহেব মেসন্‌কে বলেছিলাম, তারাও তোমার খুব প্রশংসা করলে। বলে, এত সহজে মিঃ ডাট্ নিষ্কৃতি পেলেন। আমাদের হিংসে হচ্ছে। আমাদের আজও ভুগ্‌তে হচ্ছে।"

চারু বল্‌ল,—"কি করি বল ভাই। নাচার হয়েই ওটা করতে হয়েছে। যা চুপ মন্ত্র ছেড়েছিল! বাপ! আমার ত দম বন্ধ হবার জোগাড়। শেষে এই মত্‌লব মাথায় আসে। তাকে জানিয়েছি আমার দ্বারা যে লজ-এর সিক্রেট্ ফাঁস হয়ে গেছে তা সকলেই জান্‌তে পেরেছে। শুনে ভয়ে ত বেচারী আধমরা। খুব এক চোট্ চান্‌কে নিয়েছি। ইন্‌কুইজিটিভনেস ডিজিজের এনটিডোট্‌টা ধরেছে ভাল।"

মীরাকে এসে চারু বল্‌ল, "ওরা আমার দোষ ক্ষমা করতে রাজি হয়েছে। তবে কিছু পেনাল্‌টি দিতে হবে এই যা। তা তুমি কিছু ভেবনা মীরা।"

মীরা তার কৃতজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে স্বামীর মুখখানা একবার ভাল করে দেখে নিল।

৺গোকুলচন্দ্র নাগ

অতীত ও অনাগত

হে অতীত তুমি চির শ্যামল সুন্দর
আজন্মের বাসভূমি বঙ্গের মতন,
পরিচিত স্নেহ মুখ, স্মৃতি মনোহর।
ভবিষ্যৎ, তুমি চির একক জীবন
সুদূর প্রবাস সম, তোমারে বেড়িয়া
অশেষ গর্জ্জন পূর্ণ ভীম পারাবার,
তুমি স্মৃতিহীন তীর, তোমারে ঘেরিয়া
আশঙ্কা ঝটিকা ক্ষুব্ধ অজানা আঁধার।

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ

আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের প্রাধান্য স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; যে কোন মাসিক পত্রিকার পাতা উল্‌টাইলেই এই প্রাধান্যের অবিসংবাদিত প্রমাণ পাওয়া যায়। বহুদিন পূর্ব্বে বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক সাঁতে ব্যুভ উপন্যাসের এই প্রসার লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে উপন্যাস সমগ্র সাহিত্যকে গ্রাস করিয়া লইবে। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী যে কেবল ইউরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধেই সার্থক হইয়াছে তাহা নহে; সুদূর বঙ্গদেশের সাহিত্য সম্বন্ধেও ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য হইয়াছে। এখন প্রত্যেক নূতন চিন্তা, মানব-জীবনের প্রত্যেক নূতন সমস্যা, মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রত্যেক নূতন আবিষ্কার, দর্শন ও সমাজ-নীতির গণ্ডী ছাড়াইয়া উপন্যাসের পৃষ্ঠায় আলোচিত হইতেছে; এমন কি বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধিৎসাও উপন্যাসের মধ্যে প্রতিফলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের উপন্যাস সাহিত্য-ক্ষেত্রে এক নূতন রকমের গৌরব ও মর্য্যাদার দাবী করিতেছে—ইহার উদ্দেশ্য কেবল পাঠকের মনোরঞ্জন করা অপেক্ষা আরও উচ্চতর পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। আমাদের বঙ্গ সাহিত্যও উপন্যাসের এই নব-লব্ধ গৌরবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে; নূতন সমস্যা আলোচনা, ও মানবের প্রাথমিক ভাবগুলির খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দিকে ইহার ক্রমশঃ অধিকতর প্রবণতা দেখা যাইতেছে। ফলতঃ আমাদের সমগ্র সাহিত্যিক প্রচেষ্টার যে একটা মুখ্য অংশ উপন্যাস রচনার দিকে নিয়োজিত হইতেছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। সেইজন্য ইহার বর্ত্তমান কৃতিত্ব ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনার একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে হয়।

পূর্ব্বে উপন্যাসের যে একটা গভীর ভাবগত ও উদ্দেশ্য-গত পরিবর্ত্তনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাকে সমালোচকেরা 'বাস্তবতা-প্রধান' এই সাধারণ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। আমরাও আমাদের আধুনিক উপন্যাসগুলিকে ঐ নামেই অভিহিত করিয়াছি, এবং ইউরোপীয় বাস্তবতা-প্রধান উপন্যাসগুলির লক্ষণ ও উদ্দেশ্যসমূহ আমাদের সাহিত্যে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিতেছি। এক্ষণে আর অধিকদূর অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বে ঐ সংজ্ঞাটী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট করিয়া লওয়া প্রয়োজন। বাস্তবতা যে উপন্যাসের জীবনী-রস ও প্রথম ও প্রধান ভিত্তি তাহা সকলেই মানিয়া লইবেন। বাস্তবতার প্রেরণাতেই উপন্যাসের জন্ম; মধ্য-যুগের অসাধারণ কল্পনা-প্রধান আদর্শ-নিয়ন্ত্রিত ও ধর্ম্মাভিমুখী জীবন-কাহিনী হইতে সাধারণ ও সত্য জীবনে প্রত্যাবর্ত্তনই উপন্যাসের প্রথম কাজ। Richrdson Fielding প্রভৃতি প্রথম যুগের ইংরেজ ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে এই তীব্র বাস্তবতা, অতি সাধারণ জীবনের রসোপলব্ধিই তাঁহাদের রচনার প্রধান লক্ষণ। Fieldingএর উপন্যাসগুলি কতকটা ভ্রমণ-কাহিনীর লক্ষণাক্রান্ত; নানারূপ কৌতূহলপূর্ণ সংঘটন, অবিশ্রান্ত ছুটাছুটি ও মারামারির উত্তেজনা, ও ঘটনা-পারম্পর্য্যের অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন তাহাদের উপর কতক-পরিমাণে রোমান্সের অসাধারণত্ব আনিয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাদের মধ্যে জীবন্ত-চরিত্র-সৃজন ও তাৎকালিক সমাজ ও সাধারণ জীবনযাত্রার অতি নিখুঁত ও সত্য বিবরণ ইহাদিগকে বাস্তবতা গুণেও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। Richardsonএর উপন্যাসে অসাধারণত্ব ও বাহ্য-ঘটনা-বৈচিত্র্য একেবারে বর্জ্জিত হইয়াছে। তাঁহার প্রথম উপন্যাস Pamelaএ একজন নিম্নশ্রেণীর দাসীর প্রণয়-নির্য্যাতনের অভিজ্ঞতা অতি

সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—কোনও অসাধারণ বা চমকপ্রদ ঘটনার দ্বারা পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করা হয় নাই। কিন্তু নির্য্যাতিত দাসীটীর প্রতিদিনকার তুচ্ছতম কাহিনীটী আশ্চর্য্য নিপুণতা ও সত্যনিষ্ঠার সহিত উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলিতে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। রিচার্ডসনের উপন্যাসে যে অবিমিশ্র, অসংস্কৃত বাস্তবতার মহিমা ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

এখন স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে রিচার্ডসনের বাস্তবতা ও আধুনিক যুগের বাস্তবতার মধ্যে প্রভেদ কি? বাস্তবতা যখন সকল যুগের উপন্যাসের সাধারণ লক্ষণ, তখন বর্ত্তমান যুগের উপন্যাসকেই বিশেষ করিয়া বাস্তবতা-প্রধান বলার হেতু কি? প্রথম যুগের ঔপন্যাসিকদের যে বাস্তবতা, তাহা নিতান্ত সরল ও সাধারণ প্রকারের; তাহা প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার রসানুভবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; বিশেষতঃ তাহা জীবনের প্রবৃত্তিগুলির সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সাধারণ জ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছে। ঐ সমস্ত উপন্যাস কল্পনার সঙ্কীর্ণতা ও অন্তর্দৃষ্টির অভাবের জন্যই মানব-চিত্তের গভীরতর আদর্শ বিকাশগুলিতে অবতরণ করিতে পারে নাই; কিন্তু তাহারা যে চেষ্টা করিয়াও কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্যই রোমান্সের অসাধারণত্ব ও দীপ্তি বর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সেরূপ কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কিন্তু আধুনিক উপন্যাসের বাস্তবতার মধ্যে একটী বিশেষ তীব্রতা ও গূঢ় অর্থ আছে—ইহা জীবনের চিরপ্রথাগত রোমান্সের বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া ও গুরুতর অভিযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্কট প্রভৃতির উপন্যাসে জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহাতে সৌন্দর্য্য ও আদর্শপ্রিয়তার (idealism) জন্য প্রকৃত সত্যকে বিসর্জ্জন করা হইয়াছে। রোমান্সে যে প্রেমের চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তথ্যের সহিত তুলনায় কল্পনারই আধিক্য দেখা যায়। জীবন সমস্যার যেরূপ সমাধান করা হইয়াছে, তাহাতে সত্য অপেক্ষা ভাব-প্রবণতারই অধিক মর্য্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে; পুণ্যের সহিত সুখের যে একটা নিত্য সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে, তাহা আমরা বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত দেখিতে পাই না। তার পর জীবনের কতকগুলি বিকাশকে ধর্ম্ম ও নীতির দোহাই দিয়া নিয়মিতভাবে সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে; অথচ এই অনাদৃত, উপেক্ষিত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যেই জীবন-রহস্যের গোপন বীজ নিহিত রহিয়াছে। এই সঙ্কীর্ণতার ফলে মানব-জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত রহিয়া গিয়াছে। অনেকটা এইরূপ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াই আধুনিক বাস্তব ঔপন্যাসিকগণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাঁহারা সত্যের নগ্ন মূর্ত্তির সাক্ষাৎ লাভের জন্য তথা-কথিত সুনীতি ও সুরুচির দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা রোমান্সের রঙ্গীণ আলোক বর্জ্জন করিয়া সত্যের তীব্র জ্যোতিঃর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন; জীবনকে আদর্শলোকের জ্যোতির্ম্মণ্ডল হইতে সরাইয়া আনিয়া তাহাকে সত্যের আলোকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহারা সগৌরবে এই অবিচলিত সত্যনিষ্ঠার

পতাকা ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ঔপন্যাসিকদের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী জানাইয়াছেন। বাস্তব-জগৎ ও উপন্যাস-জগতের মধ্যে পূর্ব্বকালে যে একটী ব্যবধান ছিল তাহাকে অতিক্রম করিয়া উপন্যাসকে সম্পূর্ণ ও অবিমিশ্রভাবেই বাস্তবানুগামী করিয়াছেন। প্রথম যুগের বাস্তব উপন্যাসের এরূপ স্পর্দ্ধা ও আত্ম-গৌরব ছিল না—তাহারা নিতান্ত বিনীতভাবে নিজ ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যগুলি করিয়া যাইত। চিরপ্রথাগত গণ্ডীগুলি অতিক্রম করিবার দুঃসাহস তাহাদের ছিল না, নিষিদ্ধ ফলের মধ্যে জীবনের গোপন রহস্যের অনুসন্ধানই তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া তাহারা বিবেচনা করে নাই। এই আদর্শ ও প্রসারের বিভিন্নতাই এই দুইজাতীয় বাস্তব উপন্যাসের মধ্যে প্রধান প্রভেদ।

ইউরোপীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই বাস্তবতা-প্রধান উপন্যাস যে কতদূর সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহা সুবিদিত; সুতরাং তাহার কোন বিস্তৃত পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তবে কিরূপ সমাজিক ও চিন্তা-গত অবস্থার জন্য ইউরোপীয় সাহিত্যে এরূপ একটী গুরুতর পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল, সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইউরোপীয় সাহিত্যে বহুদিন ধরিয়া দুইটী ধারা ক্রমান্বয়ে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এক যুগে রোমান্সের প্রতি প্রবণতা প্রবল হইয়া উঠিতেছে; তাহার পরবর্ত্তী যুগে বাস্তবের সহিত ঘনিষ্ট পরিচয়ের জন্য একটা বিশেষ ব্যগ্রতা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইউরোপের বিগত যুগটীকে মোটের উপর রোমাণ্টিক যুগ বলা যাইতে পারে; ইহাতে সকল বিচিত্র বিকাশের মধ্যে কল্পলোক-সৃষ্টির চেষ্টা, কল্পনার লীলা-ময়তা ও আদর্শের অনুসরণই বিশেষভাবে লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই রোমান্সের বিরুদ্ধে একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই পরবর্ত্তী যুগে আর্টকে বাস্তবতার দিকে প্রবলবেগে ঠেলিয়া দিয়াছে। উচ্চ বিষয়ের ধ্যান-ধারণায় ও রঙ্গীণ স্বপ্নময়তায় বিরক্তি জন্মিলে মানুষ স্বভাবতঃই বাস্তব জীবনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দিকে আপন মনকে নিয়োজিত করে, তাহাকে আকাশ-বিচরণ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া মৃত্তিকার সহিত নিবিড়, ঘনিষ্ঠ সংযোগে মিলাইয়া দিতে চেষ্টা করে। তার পর পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞান মানুষের জীবন-বিশ্লেষণের প্রণালীর উপরও নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—জীবনটাকে লইয়া সে রীতিমত বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, নির্ম্মম সত্যনিষ্ঠার সহিত সে সমস্ত পুরাতন, কল্পনা-প্রসূত সংস্কারকে পরিহার করিয়া জীবনের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে বসিয়া গিয়াছে। আমাদের প্রবৃত্তি সমূহের কিরূপ প্রকৃতি, ঠিক কি ভাবে তাহা মানব-মনের উপর ক্রিয়া করিতে থাকে, তাহারা কতদূর পর্য্যন্ত আত্মসংযমের বশীভূত, কিরূপ অনিবার্য্য বেগের সহিত তাহারা সময় সময় শাসন-বন্ধন ছিন্ন করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠে, মানব-মনে পাশবিক ও ঐশিক উপাদান সমূহের কিরূপ আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ হইয়াছে—ইত্যাদি অবশ্যজ্ঞাতব্য প্রশ্নগুলির কেবল সত্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সে উত্তর দিতে প্রয়াস

পাইতেছে। এই উত্তরে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না; আমাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শসকল এই সত্যের প্রখর আলোকে শুষ্ক ও ম্লান হইয়া উঠিতেছে; আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ছিন্নপক্ষ হইয়া ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছে—কিন্তু বাস্তব ঔপন্যাসিক সত্যনিষ্ঠার দোহাই দিয়া আমাদিগকে এই সমস্ত আশাভঙ্গের মনোকষ্ট অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য করিতেছে! আবার, তৃতীয়তঃ ইউরোপের অধিকাংশ লোকের মনেই প্রচলিত সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের বিরুদ্ধে একটা প্রকৃত বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান জীবনে সামাজিক ব্যবস্থা, বিশেষত, এই ব্যবস্থার ফলে স্ত্রী পুরুষের যে সম্পর্ক বিধি-বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর ইহাদের একটা গভীর সন্দেহ ও তীব্র অভিযোগ আছে। ইহাদের এই অভিযোগ কেবল যে সাহিত্য-ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে, ইহারা তাহাদের নিজের জীবনেও এই বিদ্রোহ ফুটাইয়া তুলিয়াছে, ও জীবনকে এক নূতন আদর্শে গঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং তাহাদের রচিত সাহিত্যে তাহারা যে সমস্ত পরিবর্ত্তনের আভাস দিতেছে, যে নূতন আদর্শের প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিতেছে, তাহাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি থাকুক বা না থাকুক, তাহারা যে কেবল একটা সুলভ রুচি-বিকারের পরিচয় মাত্র নহে, পরন্তু জীবনের গভীর প্রেরণা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে উদ্ভূত তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। যে দৃঢ়ভিত্তির উপর আমাদের এই সনাতন সমাজ-সৌধ ও নৈতিক আদর্শ রচিত হইয়াছে, এই শ্রেণীর ঔপন্যাসিকেরা তাহার তলে কর্দ্দম ও পঙ্কিল প্রবাহের আবিষ্কার করিয়া ইহার ক্ষণভঙ্গুরত্ব ও কৃত্রিমতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। আমাদের শান্তিময় সংসারের চতুর্দ্দিকে শৃঙ্খলিত প্রবৃত্তির ক্ষুব্ধ গর্জ্জন শুনা যাইতেছে; আমাদের সমুদয় যত্ন-রচিত ব্যবস্থার পিছনে অবরুদ্ধ বন্যার প্রলয়-কল্লোল অস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হইতেছে; আমাদের পরিচিত যন্ত্র-বদ্ধ জীবন-যাত্রার মধ্যপথে ধ্বংসের বিরাট্ গহ্বর মুখব্যাদান করিয়া আছে। বর্ত্তমানকালের বাস্তব উপন্যাস আমাদের আপাত-দৃষ্টিতে নিরাপদ জীবনের মধ্যে এই সমস্ত অতর্কিত বিপদের সম্ভাবনার প্রতি আমাদের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছে।

ইউরোপের এই আধুনিক বাস্তব উপন্যাস-সাহিত্যের সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিবার আছে। যাঁহারা বর্ত্তমান যুগের প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক, তাঁহারা বাস্তব সমস্যার আলোচনা লইয়া ব্যস্ত থাকিলেও উচ্চ আদর্শবাদ বা গভীর সহানুভূতিকে বিসর্জ্জন দেন নাই। তাঁহাদের উপন্যাসে বাস্তব ও আদর্শবাদের একটা চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে। ইংরেজ ঔপন্যাসিক হার্ডির নাম এই হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য; তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে নির্ম্মম বিশ্লেষণের সহিত একটা গভীর করুণতা ও খেদপূর্ণ সহানুভূতির সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। তিনি জীবনের স্বাভাবিক কলুষ-প্রবণতা ও প্রলোভনের নিকট শোচনীয় পরাজয়ের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের ভাবলেশশূন্য শুষ্ক নির্ম্মমতা, বা কুৎসিতের প্রতি একটা অস্বাস্থ্যকর

আকর্ষণ এই উভয়বিধ দোষকে পরিহার করিয়াছেন। পাপ ও পদস্খলন তাঁহার শুদ্ধ সংযত অনাবিল করুণাধারায় ধৌত হইয়া পবিত্র হইয়া গিয়াছে। অবশ্য অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর ঔপন্যাসিকেরা এই উচ্চ আদর্শে উঠিতে পারেন নাই; কিন্তু বাস্তব উপন্যাসের প্রকৃত গৌরব বুঝিতে হইলে আমাদের হার্ডির ন্যায় ঔপন্যাসিকের নিকট যাইতে হইবে।

আবার কেবল চরিত্র-চিত্রণ ও ঘটনা-বিন্যাসের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও বাস্তবতা ঔপন্যাসিকের আর্টের উপর প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পূর্ব্বকালের উপন্যাসে ভাল-মন্দর মধ্যে সীমারেখা যেরূপ সুস্পষ্টভাবে টানা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত জীবনানুগামী বটে কি না সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। বাইবেলে লিখিত আছে যে শেষ বিচারের দিন ভগবান সমুদয় মনুষ্যকে পাপী ও পুণ্যবান এই দুইটী স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করিবেন; কিন্তু কোন মানব-ভাগ্য-বিধাতার হস্তে ও জীবনের এপারে এরূপ সুস্পষ্ট শ্রেণী-বিভাগ মোটেই সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বকালের ঔপন্যাসিকেরা তাঁহাদের সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে একেবারে শাদা ও কালো এই দুই সম্পূর্ণ পৃথক্ শ্রেণীতে ভাগ করিতেন; আধুনিকেরা এই শ্রেণীবিভাগে বিশ্বাস করেন না বলিয়া তাঁহাদের চরিত্রগুলি প্রায় সকলেই ধূসরবর্ণ, ভাল-মন্দে মিশ্রিত। সেই জন্যই দেখা যায় যে পূর্ব্বকালের আদর্শচরিত্র নায়ক ও নায়িকা ক্রমশঃ উপন্যাসের পৃষ্ঠা হইতে অন্তর্হিত হইতেছে। চরিত্র চিত্রণে যাহা কিছু অস্বাভাবিক ও অসাধারণ —অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন, অতর্কিত অনুতাপ প্রভৃতিও ক্রমশঃ উপন্যাসের সীমা বহির্ভূত হইয়া যাইতেছে। আবার ভাষার দিক্ দিয়াও অপরিমিত উচ্ছ্বাস ও কেবল কবিত্বময় বর্ণনা বর্জ্জনের দিকেও চেষ্টা চলিতেছে। সর্ব্বত্রই জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার প্রতি মানুষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির প্রতি একটা সতর্ক, সজাগ দৃষ্টি খুলিয়া রাখার লক্ষণ সমগ্র বাস্তবতা-প্রধান উপন্যাস-সাহিত্যের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে, ইউরোপীয় সাহিত্যে এই নূতন পরিণতি কেবল কতকগুলি লোকবিশেষের খেয়ালের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হয় নাই, পরন্তু একটা গুরুতর সামাজিক ও ভাবগত পরিবর্ত্তনের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত নূতন উপন্যাসের মধ্যে যে সমস্ত সমস্যা আলোচিত হইয়াছে, নারী পুরুষের মধ্যে যেরূপ নূতন সম্পর্ক গঠন করিয়া তোলার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটা গভীর আন্তরিকতা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির সুর ধ্বনিত হইয়াছে। প্রতি পাতায় লেখকের উদ্দেশ্যের গভীরতা ও ভাব-প্রাবল্যের পরিচয় পাওয়া যায়—লেখক যে কতকগুলি প্রকৃত ও অতি প্রয়োজনীয় সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন, তিনি যে কেবলমাত্র কাল্পনিকতার সূক্ষ্ম জাল বয়ন করিতেছেন না, তাহা আমরা নিঃসংশয়িতভাবে অনুভব করি। সুতরাং যে বাস্তব উপন্যাসে এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান আছে, যাহা কেবলমাত্র একটা কলুষিত প্রবৃত্তির তৃপ্তির জন্য সুরুচির সীমা লঙ্ঘন করে

না, বা যাহাতে আলোচিত সমস্যাগুলি কল্পনা-প্রসূত না হইয়া জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কান্বিত, তাহা উচ্চ অঙ্গের আর্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে আমাদের কোন দ্বিধা হয় না। এখন এই সমস্ত মূল সূত্রগুলি মনে রাখিয়া বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক উপন্যাসের ধারাটী বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে বোধ হয় তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে না।

বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পর হইতেই এই নূতন ধারার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। বঙ্কিম যে অদ্ভুত শক্তির সহিত কল্পনা ও বাস্তব তথ্য মিশাইয়া তাঁহার ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন সে শক্তি তাঁহার কোন পরবর্ত্তী লেখক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন নাই। যে মন্ত্রবলে তিনি অতীতের সিংহদ্বার খুলিয়া বিস্মৃত ইতিহাসকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন, সে মন্ত্র রহস্য তাঁহার সহিতই লোপ পাইয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বঙ্কিমের অন্ধ ও অক্ষম অনুকারিবৃন্দ তাঁহার ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক প্রণালীর রহস্যটী মোটেই ধরিতে পারেন নাই; ইতিহাস তাঁহাদের হাতে বিকৃত হইয়া তাহার বাস্তব সুরটী ও বিশ্বাস্যতা হারাইয়াছে; রোমান্স আতিশয্য-দুষ্ট ও কল্পনা-স্ফীত হইয়া একেবারে অপ্রাকৃতের চরমসীমায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্কিম যেরূপ সুকৌশলে ইতিহাস, রোমান্স ও বাস্তব জীবনকে এক সূত্রে গাঁথিয়া তুলিয়াছিলেন, অদ্ভুত প্রতিভাবলে তাহাদের একটা সুন্দর সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তীদের মধ্যে সেই গুণের একান্ত অভাব। বঙ্কিমের প্রতিভা আমাদের সমাজ-জীবনের চিরন্তন অভাব গুলি কল্পনার প্রভাবে কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিয়া, একরূপ অসাধ্যসাধন করিয়াছিল বলিলেও চলে; তাঁহার মৃত্যুর পরে আমাদের প্রকৃত জীবনের একান্ত দৈন্য ও রিক্ততা, অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের একান্ত অজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে প্রকট হইয়া ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক উপন্যাসের পথে অনতিক্রমণীয় বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্কিমের পরবর্ত্তী কোন প্রতিভাবান ঔপন্যাসিকই তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া ঐতিহাসিকতার দুর্গম পথে পদক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই—এবং যাতায়াতের অভাব জন্য সেই পথের রেখা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে উপন্যাস-ক্ষেত্রে যে গভীর পরিবর্ত্তন পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহার প্রথম সূচনা রবীন্দ্রনাথেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথই প্রতিভার পূর্ব্বজ্ঞান-বলে বঙ্কিম-প্রবর্ত্তিত উপন্যাসের ধ্বংসোন্মুখতা উপলব্ধি করিয়া উপন্যাসের ভিত্তিকে রোমান্স ও ইতিহাসের চোরাবালি হইতে সরাইয়া বাস্তব জীবনের দৃঢ়ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ও তাহাকে অসাধারণত্বের অনুসন্ধান হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সূক্ষ্ম ও রসপূর্ণ বিশ্লেষণের কার্য্যে লাগাইয়াছেন। যদিও বঙ্কিমের শেষ বয়সের উপন্যাসে এই বাস্তব-প্রবণতা স্পষ্টই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি তাহাদের মধ্যেও রোমান্সের দীপ্তি ও

উত্তেজনা আনিবার জন্য লেখকের একটা প্রবল আগ্রহ রহিয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। বিষবৃক্ষের অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান ও অপ্রত্যাশিত পুনর্ম্মিলন রোমান্সের রাজ্য হইতে আমদানী; কৃষ্ণকান্তের উইলে পিস্তলের শব্দটী রোমান্সের ক্ষীণ নিঃশ্বাসবায়ু রূপেই আমাদিগকে স্পর্শ করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস হইতে এই রোমান্সের ক্ষীণ ইঙ্গিত ও আভাসগুলিও প্রায় সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে- তিনি রোমান্সের মোহ ও উত্তেজনা হইতে নিজের মনকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়াই বাস্তব বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন কি 'নৌকাডুবির' ও 'গোরার' মত উপন্যাসে, যেখানে একটা অপ্রত্যাশিত সংঘটন আমাদিগকে রোমান্টিক পরিণতির প্রতি উন্মুখ করিয়া রাখে, সেখানেও রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বাভাবিক আশার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অসাধারণ ব্যাপারেও সম্পূর্ণ সাধারণ ও বাস্তব ফলাফলের দিকে আমাদিগকে লইয়া যান। সুতরাং আমাদের আধুনিক উপন্যাসে যে নূতন ধারাটী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাই তাহার প্রথম উৎপত্তিস্থল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রভাব কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষিত হয়। তাঁহার 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে লিখিত ও সেই পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের বিচিত্র ও বর্ণবহুল শোভাযাত্রা রবীন্দ্রনাথের মনকে সেরূপ প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতে পারে নাই; ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ভাগ্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে তিনি নিভৃত সাধনা ও অখণ্ড শান্তির নিবিড় আনন্দরসে মগ্ন হইয়াছিলেন। 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' প্রতাপাদিত্যের রুদ্র মূর্ত্তি ও হিংস্র ভীষণতা অপেক্ষা বসন্ত রায়ের আনন্দবিভোর সরলতা, উদয়াদিত্যের ম্লান ও বিষণ্ণ মুখচ্ছবি ও বিভার করুণ জীবন-কাহিনী আমাদের মনে গভীরতর ভাবে মুদ্রিত থাকে। এই শেষোক্ত চরিত্রগুলি লেখকের গভীর ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার নিজের জীবন-পাত্র যে করুণ মধুর রসে ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহাই তিনি ইহাদের ভিতরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন—যে উদাস বিরহ-ব্যথাতুর রাগিণী তাঁহার গীতি কবিতার বাঁশীতে এরূপ মনোহরণ সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহারই প্রথম কাকলী এই তরুণ বয়সের উপন্যাসে শোনা যায়। 'প্রতাপাদিত্য' তাঁহার নিকট ঠিক জীবন্ত ঐতিহাসিক মানুষ নহে—সংসারের নির্ম্মম ক্রূরতা, যাহা আততায়ী ভাবে আমাদের প্রকৃত সুখ ও শান্তির কণ্ঠ চাপিয়া ধরে, ও আমাদের সুকুমার, সৌন্দর্য্যপ্রবণ বৃত্তিগুলিকে নির্দ্দয় পেষণে পীড়িত করিতে চাহে, তাহারই একটা অস্পষ্ট মূর্ত্তি মাত্র। সেইরূপ 'রাজর্ষিতে'ও ইতিহাস তাহার সমস্ত বাহ্য বৈচিত্র ও কোলাহল লইয়া বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে; ইতিহাসের রঙ্গভূমি যেন দুইটী আত্মার দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্যই পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। মোগলসৈন্যের আক্রমণ, শাহ সুজার রাজধানী—এই সমস্তই যেন কবির আধ্যাত্মিক-ধ্যান-নিরত চক্ষুর সম্মুখ দিয়া অস্পষ্ট, ছায়াময় ভোজবাজীর মত চলিয়া গিয়াছে। ইতিহাসের জনশূন্য প্রান্তরের উপর

রাজর্ষির সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে। তাহার অর্থহীন কোলাহল ও ব্যর্থতর চেষ্টার পশ্চাতে এক মুক্ত প্রাণের অক্ষুণ্ণ শান্তি নীরবে স্থির হইয়া আছে। এক বালিকার করুণ-কোমল হৃদয় ও একটি শিশুর অর্দ্ধোচ্চারিত অস্পষ্ট কথা তাহাকে সংসারের সাধারণ প্রচেষ্টা হইতে বহুদূরে লইয়া গিয়াছে ও তাঁহার গভীরতম অন্তরে যে শান্তির মঙ্গল ঘট স্থাপিত হইয়াছে, অবিরত বারিসেকের দ্বারা তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের এই দুইখানি উপন্যাসে ইতিহাস এক গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির রসে ভরপুর হইয়া তাহার কঠিন বস্তুতন্ত্রতা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বিশেষত্ব ইহার পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলিতেই প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি', 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে'– এইগুলিই তাঁহার পূর্ণ প্রতিভার দান। এবং ইগুলিতেই তাঁহার বাস্তবতার প্রকৃত স্বরূপটীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগে তিনি সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অতিক্রম করিয়াছেন—ইহাদের মধ্যে যদি কিছু রোমান্স থাকে, তাহা সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী, অন্তরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের খুব তীব্র বিকাশ, ও বাহ্য বৈচিত্রের নিকট সম্পূর্ণ অঋণী। এইখানে উপন্যাস-সাহিত্য অতীতের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া এক নূতন পথে পদক্ষেপ করিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ ঘটনার বিস্তৃত বিশ্লেষণেই ইহাদের প্রধান রস; অন্তরের প্রবৃত্তি সমূহের খুব সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন ও সংঘাত বর্ণনাতেই ইহাদের মুখ্য আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে আমাদের উপন্যাসে রোমান্সের অবসর কত অল্প, এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের উপর জোর করিয়া অসাধারণত্ব আরোপ করিতে গেলে, অস্বাভাবিকতাই তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে। বঙ্কিমের উপন্যাসের সহিত তুলনায় ইহাদের সত্যনিষ্ঠা ও অবিমিশ্র বাস্তবতা অনেক বেশী, ও লেখকের মনোবৃত্তি ও আদর্শও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বঙ্কিম তাহার সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসগুলির মধ্যেও কল্পনার রঙ্গীণ আলো ফেলিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই, বৈধ ও অবৈধ যে কোন উপায়েই হউক জীবনকে একটা উচ্চ আদর্শ লোকের আলোকে রঞ্জিত করিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনের স্বাভাবিক ধীর প্রবাহটীর অনুসরণ করিয়াছেন, এবং আমাদের বাস্তব জীবনে স্বাভাবিক কারণে যে সমস্ত বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, সেইগুলিতেই আপন দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বঙ্কিমের বিশ্লেষণ ক্ষমতা যে কম বা অগভীর তাহা বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে - তবে তিনি অন্তর্দৃষ্টি বলে একটী বিশেষ অবস্থার মর্ম্মভেদ করিয়া খুব অল্প কথায় তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, দীর্ঘকালব্যাপী ঘাত-প্রতিঘাতের একটা সাধারণ সংক্ষিপ্তসার সঙ্কলন করিয়া অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতের দ্বারা আভ্যন্তরীণ চিত্রটী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিনের গ্লানি ও বিরোধ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া চিত্রটীকে আরও অনেক বেশী পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন ও পুঞ্জীভূত অথচ সুনির্ব্বাচিত তথ্যের দ্বারা পাঠকের মনে বাস্তবতার ভাবটি দৃঢ়তর ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। ইহাই রোমান্স ও বাস্তব উপন্যাসের মধ্যে প্রথম ও প্রধান প্রভেদ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এ সুন্দরী পৃথিবীরে আমি ভালবাসি—

ভালবাসি। ভালবাসি
এ সুন্দরী পৃথিবীরে আমি ভালবাসি
সর্ব্ব দেহ মন প্রাণ দিয়ে
তাই তার তুচ্ছতম জীর্ণ পাতাটি'র
ছেড়ে নাহি যেতে সরে মন
বুক দিয়া আঁকড়িয়া থাকি
নিশিদিন তার প্রতি অকিঞ্চিৎ বাণী
লিখে রাখি মর্ম্মের পাতায়।

কোথা মোর গ্রন্থি বাঁধা
তার সনে, কেহ নাহি জানে
গোপন মরম তলে
কোন্ গূঢ় অন্তরঙ্গ ডোরে!
তাই দুজনার বুক একসাথে
কাঁপে দুরু দুরু
তাই আর নির্নিমেষ নয়নের
পড়েনা নিমেষ
ছেড়ে' যেতে অশান্ত ক্রন্দন তাই।

তবু—
জানি আমি একদিন
স্তিমিত চোখের শেষ
অশ্রুভরা দৃষ্টিটুকু রেখে
ছেড়ে যেতে হবে।
শিথিল হাতের মুঠি
যাবে খুলে
এই পরিচয় শেষ হবে,
এত চেনা এত জানাজানি
কানে-কানে কওয়া কত চুপিচুপি কথা
বুকে বুকে বয়ে যাওয়া বাসনার বেগ
সব লয়ে চলে যেতে হবে।

বুঝি সেই বিদায়ের দিনটিরে স্মরি'
আজি পৃথিবীর চোখ
গোপন অশ্রুর ভারে করে ছলছল
তাই নিত্য আনন্দ উৎসব মাঝে
বিদায়ের সুর
হাসিটিরে করে সুমধুর,—সকরুণ।
তাই
আরো কাছে সরে যেতে চাই
ইচ্ছা করে সব বাধা ঘুচে যাক্
তাহার ধূলার সাথে ধূলি হয়ে
আলো হয়ে তার আলো সাথে
মগ্ন হয়ে রই শুধু
অপূর্ব্ব আনন্দ-চেতনায়—!

ফাল্গুনের গন্ধভরা ছায়ামাখা
আবেশে বিহ্বল দু পহরে—
মনে পড়ে অকস্মাৎ, ছেড়ে যেতে হবে
সেই বার্ত্তা আসে যেন ঝরে'-পড়া মলিন পাতায়
জীবনের অবশেষ গানে।
মনে হয় - আজও আমি 'ভালো করে'
তাহারে যে চিনি নাই
জানি নাই পাই নাই তাহারে যে প্রাণ ভরি'
কেমনে এ অসমাপ্ত পরিচয় ফেলে রেখে
যাব চলি নিরুত্তর বিস্মৃতির মাঝে—?
আজও বাকি সব কথা
অসম্পূর্ণ আজও সব গান
রহস্য গুণ্ঠন খুলি আজও প্রিয়া ভালো করি
দেখায়নি মুখ
আজো তারে বুঝি নাই!

অশ্রুসাগরের দুই পারে
অন্তহীন বিরহের যুগ যুগান্তর
কাটাতে হবে কি লয়ে
এই শুধু অসম্পূর্ণ পরিচয়টুকু ?
এক পারে প্রিয়া মোর
দুদণ্ডের জানা
আর পারে আমি—
অশেষ বিরহী !
জীবনের দেবতারে কহি
এই যাওয়া এত সত্য যদি
তবে কেন দিলে ভালবাসা
প্রিয়ারে পাঠালে কেন
দু দণ্ডের তরে,
ভঙ্গুর এ খেলাঘরে মিছে—।
কেন কণ্ঠে গান দিলে
বুকে প্রাণ
চক্ষে দিলে আলো
কেন প্রেম দিলে ?

কিন্তু বুঝি এই নয়—
বুঝি আমি বার বার আসিয়াছি
পৃথিবীর বুকে
বারে বারে ভাল বাসিয়াছি
জন্ম মৃত্যু এরা যেন দিন আর রাত্রি
প্রাণ মম তার মাঝে যাত্রী যেন
চির অভিসারে ;

প্রিয়া বুঝি চলে সাথে সাথে
শুধু যবে অন্ধকারে
চিনিতে না পারি
কেঁদে কই—এই বুঝি শেষ !

বুঝি মোর চেনা হলো
তার সাথে বারেবারে নূতন করিয়া
বারে বারে পাই তারে পুনঃ ছেড়ে যাই
আবার নূতন করে' চাই
নূতন জীবনে !
তারে মোর হলোনাক চেনা
বুঝি এই অন্তহীন আনাগোনা হলোনাক
তাই পুরাতন !

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

তৃপ্তি

(৯)

বিনোদকে শেষ কথা দিয়া অবধি শিশিরের মনে এক ফোঁটা শান্তি ছিল না। মিনতিকে লাভ করিবার যে উগ্র আকাঙ্ক্ষা তাকে এতদিন পাগল করিয়া রাখিয়াছিল তাহা একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল নিদারুণ বিষাদে। তার এক ফোঁটাও সন্দেহ রহিল না যে সে যাহা করিতে যাইতেছে তাহা দারুণ অপকার্য্য, একটা প্রকাণ্ড হীনতার কাজ। কিন্তু এখন আর উপায় নাই। সে যাহা করিয়া ফেলিয়াছে তাহাতে এখন বিবাহ না করিলে মিনতির পক্ষে একটা নিদারুণ কলঙ্ক ও অপমানের কথা। কাজেই তার আর ফিরিবার পথ নাই। তাই সে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল যেন যুপকাষ্ঠের কাছে বলির পশুর মত।

আফিস হইতে ছুটী লইয়া যখন সে বাড়ী আসিল তখন তার স্নায়ুমণ্ডলীর অত্যন্ত তীব্র উদ্বেগের অবস্থা। তার ভয়ানক ভয় হইতে লাগিল কখন বা দিলীপ আসিয়া পড়ে। এখন আর দিলীপের চোখের সামনে দাঁড়াইতে তার সাহস ছিল না। তাই রামধারী খানসামাকে তাড়াতাড়ি কয়েকখানা কাপড় গুছাইতে বলিয়া সে টাকাকড়ি বাহির করিয়া লইল। তারপর তাড়াতাড়ি বাড়ী ছাড়িয়া গেল। তিনটার ট্রেনে সে কলিকাতা চলিল।

বিনোদ বিবাহের সব আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। সুমতি তো ছিলই তার পর তার আর দুই বোন এবং ভাজেরা আসিয়াছিল। তারা শিশিরকে যাত্রা করাইয়া দিল এবং অনেক ঠাট্টা তামাসা করিয়া তাকে একেবারে জীর্ণ করিয়া দিল। গম্ভীর মুখে শিশির সমস্ত উপদ্রব সহিয়া গেল।

শিশিরকে যাত্রা করাইয়া দিয়া মেয়ের দল মোটরে মেয়ের বাড়ী চলিয়া গেল, সেখানে খুব শান্তভাবে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

যখন মিনতির হাতখানা তার হাতের উপর রাখিয়া শিশির মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল তখন তার হাতের ভিতর দিয়া এক অপূর্ব্ব শিহরণ সমস্ত শরীরের ভিতর প্রবাহিত হইল—সারাচিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তার পরই দ্বিগুণ বিষাদে সে আচ্ছন্ন হইল। তার মনে হইল বাইশ বৎসর পূর্ব্বে আর একদিনের কথা, যখন সে ঠিক এমনি করিয়া বিদ্যুৎকে ধরিয়াছিল। তারপর কুড়ি বৎসর বিদ্যুৎ তাহাকে কি সেবা কি স্নেহ কি প্রীতি দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। সে প্রেমের মর্য্যাদা সে আজ এমনি করিয়া রাখিতেছে,—বিদ্যুতের ছেলের স্কন্ধে এক বিমাতা চাপাইয়া!

তারপর বিবাহান্তে বাসরে তার শ্যালী ও শালাজেরা আসিয়া অল্প কিছুক্ষণ হাসি তামাসা করিল, বেশী কিছু উৎপাত হইল না। মিনতিকে ধরিয়া মেজো বউ জোর করিয়া শিশিরের কোলে বসাইয়া দিয়া বলিল, "নে তোর শিবের কোলে পার্ব্বতী হ'য়ে ব'স।"

শিশিরের বুক যেন তখন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সে বাম বাহু দিয়া মিনতিকে বেষ্টন করিয়া ধরিল, মেজবউ তাহাকে চাপিয়াই রহিল। কিন্তু শিশিরের সমস্ত হৃদয় মথিত করিয়া একটা প্রবল অশ্রুর ধারা তার মুখ প্লাবিত করিয়া দিল।

শিশিরের কান্না দেখিয়া সবাই ভড়কাইয়া গেল। তাহারা শিশিরের মনের ভিতর কোনও দ্বন্দ্বের খবর জানে না, শিশির যে শেষ চিঠিখানা বিনোদকে লিখিয়াছিল তার কথা পর্য্যন্ত তারা কেহ জানিত না। তারা জানিত পরস্পরকে দেখিয়া দুজনে পাগল হইয়া বিবাহ করিতেছে। কাজেই তারা তাদের রহস্য করিবার বাসনা দমন করিবার কোনও চেষ্টা করে নাই। শিশির যখন কাঁদিয়া ফেলিল তখন তাদের হঠাৎ জ্ঞান হইল যে সে মৃতদার। তাকে লইয়া ঠিক এসময় বেশী ঘাঁটান উচিত হইবে না।

তাই সুমতি তার ভগ্নী ও ভ্রাতৃজায়াদেরকে সে ঘর হইতে বিদায় করিয়া, শিশিরকে দুটো স্নিগ্ধ কথায় শান্ত করিল। শিশিরের কান্না দেখিয়া তারও আজ কান্না পাইতেছিল বিদ্যুতের জন্য। তার স্নেহভরা বেদনাভরা সম্ভাষণে শিশিরের অন্তর কতকটা স্নিগ্ধ হইল। তার পর সুমতি চলিয়া গেল; তার আদেশে মিনতি দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

দরজা বন্ধ করিয়া মিনতি আসিয়া শিশিরের পাশে বসিয়া রহিল। শিশিরের কান্না দেখিয়া সে চমকাইয়া গিয়াছিল, শিশিরের জন্য তার বড় দুঃখ হইতেছিল। এ কয়দিন সে এক মধুর স্বপ্নের ভিতর দিয়া কাটাইয়াছে। তার বাসনা যে অন্তর্য্যামী শুনিয়া এমন পরিপূর্ণরূপে চরিতার্থ করিলেন, ইহাতে সে আনন্দে ভরিয়া গিয়াছিল। সে চাহিয়াছিল স্বামী ও সুখের সংসার—চাহিয়াছিল শিশিরের মত স্বামী - চাহিয়াছিল শিশিরকে। সেই শিশির তার জন্য পাগল, এ আনন্দ রাখিবার তার ঠাঁই ছিলনা। শিশিরের ঘরের ঘরণী হইয়া সে গৃহিণী হইবে, মা হইবে—নারীত্বের, মাতৃত্বের চরম আদর্শ আয়ত্ত করিতে পারিবে, তার সার্থকতায় সে বিদ্যুতের গৌরবকে ম্লান করিতে পারিবে। বিদ্যুতের ছেলের মা হইয়া সে তাহাকে এত স্নেহ এত যত্নে ভরিয়া দিবে, এমন করিয়া মানুষ করিবে যে বাঙ্গলাদেশ হইতে বিমাতার কলঙ্ক চিরদিনের জন্য মুছিয়া যাইবে। আর শিশিরকে সে সুখী করিবে। তার রূপ নাই তবু শিশির তার অন্তরের সম্মান করিয়াছে। সে সম্মানের প্রতিদান সে সারাজীবনের ঐকান্তিক সেবা ও সর্ব্বব্যাপী প্রেম দিয়া প্রতিদান করিবে। ভগবান তার সহায় হউন।

কতবার সে টেনিসনের কবিতার সেই চারটি লাইন ফিরিয়া ফিরিয়া পড়িয়াছে। সেই কয় ছত্র কবিতাকে আশ্রয় করিয়াই শিশিরের সঙ্গে তার অন্তরের পরিচয় – সে কবিতা তার মাদুলীর মত করিয়া বুকের ভিতর গাঁথিয়া রাখিতে ইচ্ছা হইত। দেরাজ হইতে বাহির করিয়া সে তার 'লেখা'গুলি বার বার খুলিয়া দেখিয়াছে। তার সৌষ্ঠবযুক্ত ছাপা ও বাঁধাইয়ের ভিতর সে শিশিরের অতল প্রেমের রূপ দেখিতে পাইত ও মুগ্ধ হইত। তার নিজের কবিতাগুলি সে বার বার পড়িত, ও আনন্দে তার চিত্ত ভরিয়া উঠিত। সে আনন্দ যে শুধু সেগুলি তার নিজের লেখা বলিয়া তাহা নয়, তার দাম আরও শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল এই জন্য যে শিশির এ গুলির সমাদর করিয়াছে। তাই সে সেই ছাপার অক্ষরগুলি তার বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিত।

আর শিশিরের সেই দুইখানা চিঠি। একখানা অতি সংক্ষিপ্ত তারই কাছে লেখা। তার কয়েকটি কথার ভিতর সে রসের অফুরাণ খনি দেখিতে পাইত। তার ছত্রে ছত্রে যেন শিশিরের লুকান প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। আর বিনোদের কাছে শিশির যে চিঠি লিখিয়াছিস সে তো এক অমূল্য রত্ন। তার ভিতর যে শিশির তার সবখানি প্রেম

উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে। এ দুখানি চিঠি মিনতি বার বার শতবার পড়িয়াও তৃপ্তি পাইত না।

এ কয়দিন শিশিরের ধ্যান করিতে করিতে সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে শিশিরের সান্নিধ্যের লালসায়। বিনোদের বৈঠকখানায় সেই আলাপ, সেই সান্নিধ্যের স্মৃতি তার চিত্তকে পুলকিত করিয়া তুলিত আর সে বার বার মনে করিত, এখন আর একবার সে দেখিতে পায় না? এখন যদি শিশির চিঠি লেখে তার কাছে? ভাবিতে ভয় সঙ্কোচ ও আনন্দে তার প্রাণ কাঁপিত, নাচিয়া উঠিত। সে সত্য সত্যই শিশিরের কাছে একখানা চিঠির প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে চিঠির ভিতর কি লেখা থাকিতে পারে তার সম্বন্ধে সে কতরকম কল্পনা করিত। চিঠি লিখিলে সে কি উত্তর দিবে? ছি, কি লজ্জা! কিন্তু উত্তর দিতে তার ভারী ইচ্ছা হইতেছিল। শিশিরকে চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কি লিখিবে তার নানারকম মুশাবিদাও সে করিয়াছিল,—কিন্তু সবই মনে মনে।

পনেরই জ্যৈষ্ঠ তার বিবাহ হইবে একথা শুনিয়াছিল। সে এখনো প্রায় একমাস—বহুদূর। তার আগে বোধহয় আশীর্ব্বাদ হইবে—তিনি নিজে আসিবেন কি? যদি না আসেন? একমাস—এতদিন সে কি কেবল অপেক্ষাই করিবে? এমন সময় কাল বিনোদ হঠাৎ আসিয়া সংবাদ দিয়ে গেল, আজ বিয়ে—আজই শিশির আসিবে। তার বৌদিদিরা কোলাহল করিয়া উঠিল, "সে কি! একদিনে কখনও বিয়ের উজ্জুগ হয়?" মিনতির ভারী রাগ হইতেছিল বৌদিদিদের এসব কথায়। যখন মুখুজ্জে ম'শায় বলিলেন, যেমন করিয়াই হউক উদ্যোগ করিতেই হইবে—তখন সে যেন বাঁচিল।

তখন হইতে সে এই মহামুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় অপূর্ব্ব পুলকে চিত্ত ভরিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু—এ কি—?

যখন মেজ বৌদি তাকে শিশিরের কোলে বসাইবার চেষ্টা করিতেছিল মিনতি তখন প্রাণপণে বাধা দিয়াছিল—লজ্জায়। কিন্তু আনন্দে সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল যখন সত্য সত্যই মেজবউ তাকে বসাইয়া দিল তখন শিশিরের অঙ্গের স্নিগ্ধ স্পর্শে তার সমস্ত শরীরের ভিতর যে অভিনব হর্ষ তরঙ্গিত হইয়া উঠিল তার অনুভূতিতে সে বিহ্বল হইয়া গেল। সে যেন কোন এক স্বপ্ন লোকের ভিতর ডুবিয়া গেল। কিন্তু শিশিরের অশ্রুপাত তাকে সে স্বপ্নের সুধাসাগর হইতে যেন চুলে ধরিয়া টানিয়া তুলিল। মিনতি ইহাতে ভীত চমকিত হইয়া গেল। এ কি—? এ তো তার স্বপ্নেও সে কখনও মনে করে নাই। স্বামীর ব্যথায় তার অন্তর বেদনায় ভরিয়া গেল।

দুয়ার বন্ধ করিয়া আসিয়া সে অনেকক্ষণ স্বামীর কাছে নীরবে বসিয়া রহিল এবং

কয়েকবার অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে চকিত নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। দেখিল গভীর বিষাদে শিশিরের মুখ আচ্ছন্ন।

অনেকক্ষণ মিনতি শিশিরের একটা কথার প্রতীক্ষায় রহিল। তার বুকের ভিতর অশেষ সান্ত্বনার কথা জমিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সে কথাগুলো গলায় ঠেকিয়া ফিরিতেছিল। শিশির একটা কথা বলিলেই তার সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে এই আশায় সে বসিয়া রহিল।

শিশিরেরও অনেক কথা মনে হইতেছিল সেও কেমন করিয়া কোন কথাটা বলিবে তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কথা গুলি অত্যন্ত ভারী ভারী, বাসর ঘরের ঠিক উপযোগী নয়। প্রিয়ার সঙ্গে প্রথম সম্ভাষণের যোগ্য কথা সে মোটেই নয়। তাই তার ভয়ানক বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। সে কোনও কথাই বলিতে পারিল না।

শেষে মিনতি বলিল, "আপনি শোবেন না?"

শিশির বাঁচিল। "এই শুচ্ছি" বলিয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। মিনতি পাশে বসিয়া তাহাকে পাখা করিতে লাগিল। এ সেবায় শিশির বরাবর অভ্যস্ত, কাজেই ইহা তাহার চোখে বিশেষ ঠেকিল না, হঠাৎ তার ভ্রম হইল যেন বিদ্যুৎই তার পাশে বসিয়া তার চিরাভ্যাস মত তাকে বাতাস করিতেছে। সে হাত বাড়াইয়া মিনতির হাতখানা চাপিয়া ধরিল—মিনতির সর্ব্বাঙ্গ আনন্দে কাঁপিয়া উঠিল। তার পর হঠাৎ শিশিরের মুখ ভার হইয়া উঠিল, সে আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়া দিল।

ইহাতে মিনতির অন্তরে আঘাত করিল। সে কতকটা আপনাকে সামলাইয়া অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে একটা কথা বলিল, "আপনার বুঝি দিদির কথা মনে হ'চ্ছে?"

"দিদি!—কোন দিদি?"

"দিলীপের মা," বলিয়া মিনতি মাথা নীচু করিল। শিশির খানিক্ষণ মিনতির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "হাঁ মিনতি, সে আমার বড় প্রিয় ছিল। তার জন্য তুমি কিছু মনে করো না মিনতি?"

"ছি, তা' কেন ক'রতে যাব?"

এই কথা কটায় যেন শিশিরের অন্তর অনেকটা স্নিগ্ধ হইয়া গেল; সে মিনতির মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, মিনতি তখন তার দিকে চাহিয়া ছিল, সে চক্ষু অবনত করিল। অনেকক্ষণ আর কোনও কথা হইল না। অনেকক্ষণ পর মিনতি ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "আমি যদি দিদি হ'তে পারতাম!"

শিশির একথায় তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল। মিনতির হাতখানা দুহাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কেন একথা কেন বলছো মিনতি?

"এমনি মনে হ'ল। মনে হ'ল তা হ'লে আপনি এখন কত সুখী হ'তে পারতেন।"

"মিনতি; আমায় ক্ষমা কর। মনে করো না যে তোমাকে পেয়ে আমি খুব খুসী হইনি। আমার জীবন তোমাকে পেয়ে সার্থক হ'য়ে গেছে মিনু। তবু আজকের দিনে আমার তার কথা মনে হ'চ্ছে, কেন না সে তোমারই মত একদিন আমার জীবন সার্থক ক'রেছিল আর কুড়িটি বচ্ছর সে আমার জীবন আনন্দে ভরে' দিয়েছিল।"

মিনতির চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, সে একটু থামিয়া বলিল, "দিদি আপনাকে যা ক'রেছেন আমি তা' কোথা থেকে পারবো, তিনি ছিলেন দেবতা। তাঁর কথা বড়দির কাছে সব শুনেছি আমি।"

"শুনেছ—দেখেছ তাকে কোনও দিন মিনু?"

"একদিন দেখেছিলাম বড়দির ওখানে, কি সুন্দর চেহারা ছিল তাঁর! এত বয়েস হ'য়েছিল কিন্তু যেন পরীটীর মত—আর মুখে হাসি লেগেই আছে।"

মিনতির মুখে বিদ্যুতের প্রশংসা শুনিয়া শিশিরের ভারী তৃপ্তি হইল তার মনের ময়লা ধীরে ধীরে ধুইয়া গেল। সে উৎসাহের সহিত এ আলোচনায় যোগ দিল। দুজনে মিলিয়া বিদ্যুতের রূপগুণ, তার কাজ কর্ম্ম খুঁটি নাটি করিয়া আলোচনা করিল। পরম আনন্দে সময় কাটিল।

মিনতি বলিল, "আমার আশ্চর্য্য লাগে যে অমন অপ্সরার মত স্ত্রীর স্বামী হ'য়ে আপনি কি দেখে এ কালো পেত্নীকে, পছন্দ ক'রে ব'সলেন!"

"হাঁ পেত্নীই বটে! মিনু, তোমাদের বাড়ীতে কি আরসী নেই, নিজের মুখখানা দেখনি কোনও দিন? ওই চোখ দুটোর দিকে চেয়ে দেখনি?" বলিয়া মিনতিকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া শিশির তার দুটি চোখের উপর দুটি চুম্বন দিল, মিনতি আবেশ বিহ্বল হইয়া বুকের ভিতর লতাইয়া গেল। এ কি আনন্দ! কি সুখ! সে সকল প্রাণ মন দিয়া স্বামীর দেহের সুস্নিগ্ধ স্পর্শ উপভোগ করিল।

শিশির বলিল, "তাছাড়া মিনু তুমি যে তোমার সেই খাতাখানা ঘুষ দিয়ে আমার প্রাণটা কেড়ে নিয়েছিলে।"

"ছাই খাতা! তা ছাড়া আমি তো দি নি, আপনি তো চুরী ক'রে নিয়েছিলেন। যখন 'লেখা' ছাপা হ'য়ে বের হ'ল তখন আমি মুখুজ্জে মশায়ের কাছে গিয়েছিলেম, আপনার নামে নালিশ করবো বলে।"

"গিয়ে বুঝি শুনতে পেলে যে নালিশ করবার আগেই আমার সর্ব্বস্বের উপর ডিক্রীজারি করে বসে আছ।"

মিনতি মাথা নীচু করিয়া বলিল, "না তাঁরা আমাকে কিছু ভাঙ্গেন নি, আমি বাড়ীতে

এসে শুনলুম। আপনি কিন্তু ভারি—ইয়ে—আপনি মুখুজ্জে ম'শায়ের কাছে ও সব অমন ক'রে লিখতে পারলেন কেমন ক'রে। আমার ভারি লজ্জা করছিল।"

এতক্ষণে শিশির বলিল, "মিনতি, তোমার কাছে আমার একটা ভিক্ষে আছে—দেবে কি?"

"কি ব'লছেন!"

"ওই আপনি কথাটাকে এখনি নির্ব্বাসন ক'রতে হবে তোমার মুখ থেকে।"

মিনু মুখ ঢাকিয়া বলিল, "যান আপনি বড় দুষ্টু," তার পর বলিল, "এখন পারবো না পরে আপনি হ'য়ে যাবে।"

"কিন্তু এখনি যেতে হ'বে—এ আমার শিবের ভিক্ষে—না নিয়ে ছাড়বো না।"

অনেক পীড়াপীড়ির পর মিনতি বলিল, "আচ্ছা যান্, আপনি তুমি।"

"এই যে সেই সত্যেন দত্তের কবিতা হ'ল 'দিদি তুমি তুই।" দুইজনেই হাসিয়া উঠিল।

আবার কথায় কথায় মিনতির রূপের কথা উঠিল।

মিনতি বলিল, "আচ্ছা আমাকে মিথ্যে flattery ক'রতে হ'বে না। আমার যে রূপ তা' আমার জানা আছে। আপনার—ইয়ে—তোমার যে কি দেখে আমায় পছন্দ হ'ল তাই ভাবি। বোধহয় খুব খিদে পেলে যেমন লোকের ভাল মন্দ বিচার থাকে না, আপনার—ইয়ে তোমার সেই অবস্থা হ'য়েছিল। Any port in a storm. না?"

"আজ্ঞে না ম'শায়! বরঞ্চ অনেক port আমার কাছে এসে পায়ে ধ'রে সাধাসাধি ক'রে গেছে আমাকে টলাতে পারে নি। শিবের তপস্যা উমাই ভাঙ্গতে পেরেছিল।"

তার পর শিশির বলিল, "তোমাকে দেখেই আমি একরকম পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম ঠিক। কিন্তু তবু অনেক কষ্টে আপনাকে ঠিক রেখেছিলাম। শেষ মত স্থির ক'রলাম কিসে জান? তোমার একটা কবিতা প'ড়ে।"

"তাই নাকি? আমার কবিতার এত শক্তি? আমি তাহ'লে একজন বায়রণ শেলীর গোত্রের ব'লতে হ'বে। আচ্ছা কোন কবিতাটা প'ড়ে তোমার মনটা গ'লেছিল শুনি।"

"সেই যে তুমি লিখেছ,

> "ক্ষুদ্র দুটি বাহু মোর
> আমার এ ছোট কোল দিয়া,
> পারিতাম যদি হায়
> জগতের সব মাতৃহারা
> শিশুদের বুকে টেনে নিতে
> বিলাইতে মাতৃস্নেহ ধারা!

এত স্নেহ দিয়া বিধি
মার জাতি তুলেছ গড়িয়া
শক্তি কেন দেও নাই
ততখানি যত বড় হিয়া।

"মিনতি, আমি তোমাকে ভাল বেসেছিলাম। আমার দরকার ছিল প্রিয়ার—সে আকাঙ্খা তুমি তৃপ্ত ক'রতে পারবে জানতাম। কিন্তু আমার মাতৃহারা পুত্রের দরকার একটি মার, এই কবিতায় জান্‌তে পারলাম তুমি তার মা' হ'তে পারবে। আর কোনও দ্বিধা রইলো না।"

কথাটা শুনিয়া মালতী গম্ভীর হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে একটু ভারী গলায় সে বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি তার মা হবার যোগ্য হ'তে পারি।"

শিশির আবার তাকে বুকের ভিতর চাপিয়া বলিল, "তা পারবে মিনু, সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করছি, আর আমাদের সামনে এসে আজ তোমার দিদিও নিশ্চয় তোমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রছেন। দিলীপের মা হওয়া খুব শক্ত কাজ নয়। তাকে দেখে কেউ ভাল না বেসে পারে না। সেও বড় সহজে ভালবাসার কাছে ধরা দেয়।"

ইহার পর তাদের যা কথাবার্ত্তা হইল সব দিলীপকে লইয়া। শিশির ছিল পুত্রগত প্রাণ। সে শতমুখে দিলীপের সুখ্যাতি করিয়া গেল, তার জীবনের সুদীর্ঘ বৃহৎ আলোচনা করিল। মিনতি পরম আগ্রহভরে এই আশ্চর্য্য ছেলের অলৌকিক কাহিনী শুনিয়া গেল। ছেলের গর্ব্বে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তার চিত্তও ভরিয়া উঠিল।

(১০)

বউ লইয়া শিশির যখন নীরবে বাড়ীতে আসিয়া উঠিল তখন বাড়ীতে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। উমা হাসিমুখে বধূকে সম্ভাষণ করিয়া লইল, তাহাকে বরণ করিয়া ঘরে উঠাইল। কেবল মালতী তার আপনার ঘরে পড়িয়া আছাড়ি বিছাড়ি করিতে লাগিল—তার বুকভরা কান্নার শব্দ সে কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিল না।

শিশির বাড়ীর ভিতর গেল না, বাহিরের ঘরেই বসিয়া রহিল। বাড়ীতে ঢুকিতে তার ভারি সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। দিলীপের সামনে সে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তার পড়িবার টেবিলের উপর ল্যাম্প জ্বলিতেছিল, সে তার সামনে মাথা হাতের ভিতর গুঁজিয়া পড়িয়া ছিল।

বধূকে বরণ করিয়া পিশিমা দিলীপের খোঁজ করিলেন। মিনতিকে দিয়া তার কাণে মধু দেওয়াইতে হইবে, সে তার মাকে প্রণাম করিবে। মিনতিও ব্যগ্র হইয়া পুত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দেখা গেল দিলীপ বাড়ী ফেরে নাই। উমা বলিলেন, "কি দস্যি ছেলে বাবা, আমার

হাড় জ্বালিয়ে খেলো। কাল এই এক কাণ্ড ক'রে এলো—আজ আবার কোথায় পালিয়েছে। বাড়ীতে যদি এক দণ্ড থাকবে। বাপ ওকে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছেন।"

উমা আন্দাজ করিল যে সপত্নীপুত্র সম্বন্ধে এমনি কটূক্তি নূতন বধূর কাছে প্রীতিকর হইবে। কিন্তু মিনতির এ কথা ভাল লাগিল না। এ অপ্রিয়ভাষিণী ননদিনীর যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় সে স্বামীর কাছে ইতিমধ্যেই পাইয়াছিল। তার মুখে এই বিষোদ্গার শুনিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় রমেন আসিয়া বলিল, "মা, খোকাকে তো কোথাও পেলাম না। সে গেল কোথায় ?

ক্রমশঃ প্রকাশ পাইল যে আজ সকালে যদিও দিলীপ রীতিমত আহারাদি করিয়া স্কুলে যাইবে বলিয়া বাহির হইয়াছিল তবু সে বাস্তবিক স্কুলে যায় নাই। রমেন তার আগেই চলিয়া গিয়াছিল। তার পর দিলীপ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে মালতী তাকে সাধ্যসাধনা করিয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কেন না আজ তার শাস্তি হইবার কথা। দিলীপ কোনও কথা শোনে নাই, সে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে স্কুলে যায় নাই।

রমেন তাহাকে স্কুলে না দেখিয়া ভাবিয়াছিল যে সে শাস্তির ভয়ে স্কুলে যায় নাই। বাড়ী ফিরিয়া যখন সে শুনিল যে দিলীপ স্কুলে গিয়াছে, তখন সে কথাটা কাহারও কাছে ভাঙ্গিল না। মনে করিল দিলীপ বুঝি কোনও বন্ধুর বাড়ী লুকাইয়া আছে। স্কুলে যে যায় নাই সে কথা কারও কাছে প্রকাশ করিতে চায় না। সেইজন্য সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া খাবার খাইয়া দিলীপের সন্ধানে বাহির হইয়া গেল। সকল সম্ভব ও অসম্ভব স্থানে সন্ধান করিয়াও যখন তাহাকে সে পাইল না তখন ভয় পাইয়া রমেন আসিয়া তাঁর মার কাছে কথাটা প্রকাশ করিল।

পিশিমা শুনিয়া ভারি চটিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "দেখ দিকিনি ডানপেটা ছেলের কাণ্ড। বাড়ীতে আজ নতুন বউ এসেছে, সে দিক দেখবো না এই দস্যি ছেলের পিছনে ছোট। চুলোয় যাকগে। আসবে এখন কালকের মত রাত দুপুরে। কোন পাড়ায় টো টো ক'রতে গেছে।" বলিয়া অপাঙ্গে একবার নববধূর দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে পিশিমা সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

মিনতির কিন্তু বড় ভয় লাগিল। সে রমেনকে বলিল, "কোথাও তুমি পেলে না তাকে ? সব জায়গায় গিয়েছিলে ?"

"হাঁ মামী মা।"

"কি সর্ব্বনাশ। শিগ্গীর তুমি গিয়ে তোমার মামাবাবুকে বল গে।"

"মামাবাবু যে রাগ ক'রবেন। সে যে"—

"না, না রাগ ক'রবেন না, যাও তুমি তাঁকে বল গে।"

রমেন ভয়ে ভয়ে গিয়া শিশিরের কাছে কথাটা বলিল।

দিলীপকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, এ কথা শুনিয়াই শিশির লাফাইয়া উঠিল। তার মাথাটা বোঁ করিয়া ঘুরিয়া উঠিল—সে বসিয়া পড়িল। তার পর ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সে রমেনকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিল। সে স্কুলে শাস্তি পাইবার ভয়ে কোথাও পালাইয়া আছে এইরূপ তার মনে হইল। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া শিশির বাইসিকেল চড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত নানাস্থানে ঘুরিয়া সে কোনও সন্ধান না পাইয়া শেষে থানায় গেল। ইনস্পেক্টার বাবু তাহাকে মহা সমাদর করিয়া বসাইলেন। তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা চলিল। ইনস্পেক্টার বাবু কয়েকটি কনষ্টেবলকে চারিদিকে সন্ধান করিতে পাঠাইলেন।

তারপর নিরাশ হৃদয়ে শিশির বাড়ী ফিরিল। বাইসিকেল হইতে নামিয়া সে টলিতে টলিতে কোনও রকমে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সেখানে একখানা ইজি চেয়ারে চিৎপাৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। তার আর ভাবিবারও শক্তি ছিল না। শূন্য দৃষ্টি লক্ষ্যহীনভাবে শূন্যে নিবদ্ধ করিয়া সে অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

বাড়ীর ভিতর মিনতি একলা বসিয়া ছট্‌ফট করিতেছিল। উমাকে সে কোনও কথা বলিতে ভরসা পাইল না। সে রমেনকে দিয়া মালতীকে ডাকিয়া পাঠাইল। খোকা নাই এ কথা শুনিয়াই মালতী তড়্‌ বড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল। রমেন যখন তাকে নতুন গিন্নীর আহ্বান জানাইল তখন তার সমস্ত মনটা বিষ হইয়া গেল। তবু মনিব—তার কথা না শুনিলে নয়। সে মিনতির কাছে গেল।

মিনতি তখন অঞ্চল দিয়া কেবলি চক্ষু মুছিতেছে। তার বুক ঠেলিয়া দুর্নিবার কান্নার বন্যা ছুটিয়াছিল, সে কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছিল না। সে যে হৃদয়ভরা স্নেহ লইয়া দিলীপকে বরণ করিয়া লইতে আসিয়াছে—আর এ গৃহে তার পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সে পুত্র কোথায় গেল? যদি তাকে না পাওয়া যায়? যদি সে ফিরিয়া না আসে? তবে কি নিদারুণ অভিশাপ লইয়া তার জীবন কাটাইতে হইবে। শিশিরের বুকে যে তাতে কি দাগা লাগিবে সে কথা সে সহজেই অনুমান করিল—তার ব্যথার কথা ভাবিয়া মিনতির প্রাণ আরও কাঁদিয়া উঠিল। তা ছাড়া সে যদি এ বাড়ীতে এমন অমঙ্গল বহিয়া আনে তবে সে এখানে বাস করিবে কেমন করিয়া। এমনি নির্দ্দিষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট নানা আশঙ্কায় তার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাই মিনতি কাঁদিতেছিল।

মিনতিকে কাঁদিতে দেখিয়া মালতীর মনটা একটু নরম হইল। সে আসিয়া মিনতির পায়ের ধূলা লইল।

মিনতি বলিল, "মালতী, খোকা গেল কোথায়?"

মালতী কাঁদিয়া বলিল, "কি জানি মা, কোথায় সে গেল। বাছাকে আমি কত করে হাতে ধরলাম—ব'ললাম যাসনে বাছা আজ! সে শত্রুর মনে আছে আমাকে সাজা দেবে—তা সে কি শোনে?"

মিনতি বলিল, "তুমি একবার বেরিয়ে দেখ না মালতী? তুমি হয়তো খুঁজলে পাবে। তোমার ডাকে সে আসবে।"

মালতীর চিত্ত মিনতির উপর প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে বলিল, "যাই মা। কি আর করবো, ঘুরে ঘুরে দেখি তবু।"

অনেকক্ষণ বাদে মালতী ঘুরিয়া আসিয়া হাত পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। মিনতিও কাঁদিতে লাগিল। সে কেবল বার বার বাহিরে লোক পাঠাইয়া খোঁজ করিতে লাগিল বাবু অসিয়াছেন কিনা? বার বার সে শুনিল শিশির আসেন নাই। তখন সে শিশিরের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িল। এত রাত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁর নিশ্চয় অসুখ হইয়া পড়িবে তা ছাড়া মনের এ দারুণ উদ্বেগে একলা একলা বেচারা কি কষ্ট না জানি পাইতেছে।

ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে কাঁদিতে মিনতি ঘুমাইয়া পড়িল। যখন শিশির আসিল তখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

রাত্রি যখন দুইটা তখন সে ঘুম ভাঙ্গিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। তার পাশে উমা শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছেন, সে তাকে ডাকিতে সাহস করিল না। নিজেই উঠিয়া দরজা খুলিল। দরজা খোলার শব্দে উমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বলিলেন "কে?"

মিনতি বলিল, "আমি। খোকাকে পাওয়া গেছে ঠাকুরঝি?"

"না, তা, তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"উনি কোথায়?"

"দাদা নীচের ঘরে আছেন।" মিনতি বাহির হইয়া যায় দেখিয়া উমা উঠিয়া বলিল, "তুমি তার কাছে যেওনা বউ, আজ রাত্রে সোয়ামির সঙ্গে দেখা করতে নেই।"

"আমি শুধু খোকার খবরটা জানতে যাচ্ছি।"

"না না সে করো না; তাঁর অমঙ্গল হবে।" ইহাতে মিনতি থমকিয়া দাঁড়াইল। যদিও মিনতি মেয়েলী শাস্ত্রের এতশত বিধিতে বিশ্বাস করিত না, তবুও স্বামীর অমঙ্গল হইবার আশঙ্কার কথা শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কিন্তু মালতী কোথায়?"

সে তার ঘরে আছে নীচে।"

"রমেন?"

"রমেন নীচে শুয়েছে।"

হায়রে, সবাই ঘুমাইয়াছে! গৃহের দুলাল দিলীপের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নাই, তবু সবাই ঘুমাইয়াছে! এরা কি মানুষ নয়? শিশির নিশ্চয় জাগিয়া জাগিয়া ভাবিয়া মরিতেছেন—তাকে একটু সান্ত্বনা দিবার তাঁর সঙ্গে একটু সহানুভূতি দেখাইবার কেউ নাই। তারও হাত পা বাঁধা—যাইবার উপায় নাই।

অনেক দ্বিধার পর সে বলিল, "ঠাকুরঝি আপনি একবার যান না, তাঁর কাছে জেনে আসুন।"

"কি জানবো বল, খোকাকে পাওয়া যায়নি—দাদা এসে পাগলের মত পড়ে' রয়েছেন। আর কি জানবে?"

সত্যই তো! আর কিছুই জানিবার নাই! মিনতির মনটা ভারি ছটফট করিতে লাগিল। স্বামীর এমন নিদারুণ মনঃকষ্টের মধ্যে সে কোনও কিছুই করিতে পারে না। তার পাশে বসিয়া একটু কাঁদিতেও পারিবে না। একটা সান্ত্বনার কথা বলিতে পারিবে না!

এমন বিপদ মানুষের হয়! সে অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িল।

উমার নাক শীঘ্রই আবার ডাকিতে আরম্ভ করিল। তার পাশে শুইয়া মিনতি শুধু কাঁদিয়া বালিশ ভিজাইতে লাগিল আর ছটফট করিয়া বাকী রাত্রি কাটাইল।

(১১)

পরের দিন সকাল বেলায় উমা গিয়া শিশিরকে বলিল, "দাদা, আজ বউভাতের জোগাড় ক'রতে হ'বে। গোটা কুড়িক টাকা চাই।"

শিশির সেই ইজি চেয়ারে ঠিক তেমনি ভাবে ব'সিয়া ছিল। সারা রাত্রির ভিতর এক দণ্ডও সে চক্ষু বুজিতে পারে নাই। ভীষণ-ভীষণ কল্পনা তাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল—থাকিয়া থাকিয়া আশা তাহাকে আশ্বাস দিতেছিল। একটা গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইলে সে চকিত হইয়া জানালা দিয়া রাস্তার দিকে চাহিতেছিল। একবার একটা পায়ের শব্দ শুনিয়া চমকিত হইয়া সে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চৌকীদার চলিয়া গেল। আবার হতাশ হইয়া সে চেয়ারে শুইয়া পড়িল। এমনি করিয়া আশা নিরাশার নিষ্পেষণ ও দুঃসহ কল্পনার বিভীষিকার উৎপীড়নে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া সে পড়িয়া ছিল।

সকাল বেলায় রামধারী চা আনিয়া দিল। শিশির যন্ত্রের মত চা খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতে ভাবিতে লাগিল,—দুই চুমুক চা খাইয়াই চায়ের কথা ভুলিয়া অন্যমনস্ক হইয়া গেল। চা বাটীতে ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

এমনি অবস্থায় সে বসিয়া আছে তখন উমা এই কথা বলিল।

চক্ষু টানিয়া ক্ষীণ ভাবে শিশির বলিল, "বউভাত, কার?"

"সে কি দাদা? তোমার—কি বলছো তুমি?"

"ওঃ, হাঁ বুঝেছি। উমা ওসব আর দরকার নেই।"

"সে কি? এ না হ'লে হয়। কিছু না হ'লেও বউকে ভাঙা কাপড় তো দেবে। বউয়ের হাতে দুজন লোককে তো খাওয়াতে হ'বে। এসব কি অনাছিষ্টি কথা বলছো দাদা।"

ভয়ানক বিরক্ত হইয়া শিশির তার চাবির গোছা পকেট হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "যা, নেগে যা!"

এমন কাজ শিশির কখনও করে না। তার বাক্সের চাবী সে উমাকে কোনও দিনই দেয় নাই। তাই উমা চাবি পাইয়া অবাক হইয়া গেল। সে বাক্যব্যয় না করিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। শিশির নীরবে বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে ইনস্পেক্টার বাবু আসিলেন। শিশির ব্যগ্রভাবে উঠিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিল—বলিল, "কোনও খবর পেলেন শরত বাবু।"

ইনস্পেক্টার শিশিরের চেহারা দেখিয়া ভীত হইলেন। তিনি স্নিগ্ধভাবে তার গায় হাত দিয়া বলিলেন, "এখনও পাইনি স্যর, কিন্তু আপনি চিন্তা ক'রবেন না; সে ছেলে যাবে কোথায়? দু'দিন হ'ক চারদিন হ'ক এর মধ্যে বের করবোই তাকে। ছেলেমানুষ, কত দূরেই যাবে?"

"কিন্তু শরতবাবু, সে যদি—যদি বেঁচে না থাকে।"

"সে ভাবনা ক'রবেন না। আমি সেই সন্দেহ ক'রেই সারারাত সন্ধান নিয়েছি। কোনও accident হ'লে সে খবর পেতাম। তেমন কোনও ভয় ক'রবেন না। সে বেঁচে আছে, সে জন্য ভাববেন না। আপনি অত ভড়কাবেন না স্যর। এখন মাথা ঠাণ্ডা ক'রে সব কাজ ক'রতে হ'বে। আপনি স্থির হন। বসুন।"

শিশিরকে বসাইয়া শরতবাবু এখনকার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তিনি হুগলী জেলার সব থানায় টেলিগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন। এখন খবরের কাগজে একখানা বিজ্ঞাপন দিতে হইবে—ফটোগ্রাফ শুদ্ধ হইলেই ভাল হয়। তা' ছাড়া তিনি কয়েকটা জায়গায় লোক পাঠাইতে চান। কিছু টাকার দরকার।

শিশির বাড়ীর ভিতর ছুটিল ফটোগ্রাফ এবং টাকা আনিতে। সে তার শুইবার ঘরে গিয়া প্রথম ফোটোখানা এলবাম হইতে বাহির করিল—সেই ছবিখানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। আপনার অজ্ঞাতসারে তার দৃষ্টি উঠিয়া গেল দেয়ালে টানান বিদ্যুতের একখানা বড় ব্রোমাইড ছবির দিকে। ছবিখানায় বিদ্যুতের যে ছবি উঠিয়াছিল তার দৃষ্টি একটু গম্ভীর একটু বিষাদময়—আর তাতে সামান্য একটা সুন্দর ভ্রূকুটির আভাস ছিল। ছবিখানা নিপুণ পটুয়ার তোলা, সে যেন ছবি নয়, জীবন্ত মানুষ।

সাশ্রুনয়নে সেদিকে চাহিয়া শিশিরের মনে হইল তার ভিতর হইতে যেন বিদ্যুৎ তার

দিকে চাহিয়া তিরস্কার করিতেছে। তার অঞ্চলের নিধিকে এমনি করিয়া হারাইয়া শিশির আজ বিদ্যুতের এ অভিযোগের দৃষ্টি সহিতে পারিল না। তবু সে চাহিয়া রহিল—সে ছবির দিকে চাহিতে তার চোখ পুড়িয়া গেল তবু সে চাহিয়া রহিল। তার সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে বিদ্যুতের কাছে মাথা খুঁড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল। অপরাধ তো শিশিরেরই। সে যদি মোহে অন্ধ হইয়া মিনতির পিছনে না ছুটিয়া দিলীপের প্রতি তার কর্ত্তব্য করিয়া যাইত, যদি সে দিনরাত দিলীপের উপর অনন্যমনা হইয়া দৃষ্টি রাখিত, তবে তো দিলীপকে আজ সে হারাইত না। কি মত্ত অন্ধ আকাঙ্ক্ষা তার হইয়াছিল! বুড়া বয়সে কি দুর্ম্মতিতেই তাকে ধরিয়াছিল! সে আপনাকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মিনতির উপর তার একটা দারুণ বিতৃষ্ণার ভাব জাগিয়া উঠিল। সেই তো যত অনিষ্টের মূল। শয়তান তার সামনে তো মিনতির মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়াই আসিয়াছিল। —তাই সে মিনতির উপর অযথা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

যখন শিশির বিদ্যুতের ছবির দিকে চাহিয়া ভাবাবেশে অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে সেই সময় মিনতি শুষ্কমুখে শঙ্কিত পদে তার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিল। অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া সে বলিল, "খোকার কোনও খবর পেলে না?"

তীব্র বিষাক্ত দৃষ্টিতে শিশির মিনতির দিকে চাহিল। তার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত চোখ বুলাইয়া গেল। মিনতির মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, অন্তর তার দুঃখে ভরিয়া গিয়াছিল; কিন্তু সে আদ্যোপান্ত বিবাহের অলঙ্কারে সজ্জিত, তার পরণে একখানা সুন্দর গোলাপী রঙের শাড়ী। আজ তার এই দুঃখের দিনে মিনতির এই সাজের জৌলুস শিশিরের অপ্রসন্ন চোখে বড় বেশী বাজিল! কেবল একবার তার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া শিশির নীরবে মুখ ফিরাইল। দিলীপের ফটোগ্রাফের দিকে সে চাহিয়া রহিল, তার মনের ভিতর গর্জ্জন করিয়া উঠিল মিনতির উপর একটা সম্পুর্ণ যুক্তিহীন আক্রোশ! সে মুখ চাপিয়া চুপ করিয়া রহিল।

মিনতি অত কিছু বুঝিল না। স্বামীর দুঃখটাই সে শুধু সারা অন্তর দিয়া অনুভব করিল আর তাতে সমস্ত অন্তর বিষাদে ছাইয়া গেল। সে বলিল, "একবার মুখুজ্জে মশায়কে আসতে টেলিগ্রাম ক'রে দেও না।"

এ কথায় শিশিরের অনর্থক রাগ হইল। সে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "মুখুজ্জে ম'শায় আমার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার ক'রবেন।" বলিয়া সে ফটোখানা বুকের পকেটে রাখিয়া টাকার জন্য বাক্স খুলিতে গেল। চাবী খুঁজিয়া না পাইয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল। তারপর যখন মনে হইল তখন উমার কাছে গিয়া চাবী আনিল।

স্বামীর কথায় মিনতির দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। অভিমানে তার চিত্ত ভরিয়া

গেল। অঞ্চল চক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া সে মুখ ফিরাইল। শিশির তাহা দেখিল না। সে উমার খোঁজে বাহির হইয়া গেল।

যখন শিশির চাবী লইয়া ফিরিল তখন মিনতি কথঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করিয়াছে। সে সাহস করিয়া স্বামীকে বলিল, "দেখ একটা কাজ ক'রলে হয় না? সবগুলো রেলষ্টেশনে একটা টেলিগ্রাফ"——

"সে যা ক'রতে হয় করবো। তার জন্য তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি সেজে গুজে পটের পরীটি হ'য়ে ব'সে থাকগে।" বলিয়া শিশির বাক্স খুলিয়া টাকা তুলিয়া লইল। টাকা অনেক কম বোধ হইল কিন্তু সে কথা ভাবিবার সময় তার ছিল না। টাকাগুলি পকেটে পুরিয়া সে বাক্স বন্ধ করিতে যাইবে এমন সময় তার চোখে পড়িল দিলীপের হস্তাক্ষর। সে তাড়াতাড়ি কাগজখানা তুলিয়া লইয়া পড়িল। পড়িয়া সে কপালে প্রচণ্ডবেগে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িল। তার পর একবার রাশি রাশি বিষ ঢালিয়া মিনতির দিকে চাহিল—তারপর ছুটিয়া ঘর হইতে পলাইল।

মিনতি অবাক হইয়া গেল। তার হৃদয়ের ভিতর তুমুল আলোড়ন লাগিয়া গেল। এ কি? কিসের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে সে? শিশিরের ব্যবহার মিনতির বুদ্ধি সুদ্ধি একেবারে স্তব্ধ করিয়া ফেলিল। নির্বান্ধব সংসারে অপরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে একা পড়িয়া সে আপনাকে ভয়ানক অসহায় বোধ করিল।

শিশির বাক্সে চাবী বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। মিনতি যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইল তখন সে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বাক্স বন্ধ করিল। যে চিঠিখানা পড়িয়া স্বামীর এত ভাবান্তর হইয়াছিল সেখানা মাটিতে পড়িয়াছিল। সেখানা তুলিয়া সে পড়িল। চিঠিখানায় দিলীপ লিখিয়াছে :—

"বাবা,

"শুনিলাম আপনি আবার বিবাহ করিতে গিয়াছেন। মার স্থানে তাঁর শত্রু আসিয়া বাড়ীতে কর্ত্তৃত্ব করিবে ইহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। আপনি মারও মান রাখেন নাই আমার মুখের দিকেও চাহিলেন না। এ অবস্থায় আমি আর এ বাড়ীতে থাকিতে পারি না। আমি চলিলাম। আপনার বাক্স হইতে পঞ্চাশটা টাকা আপনাকে না বলিয়া লইতেছি নিতান্ত উপায় নাই বলিয়া। যদি পারি ইহা একদিন পরিশোধ করিব। আপনি আমার অনুসন্ধান করিবেন না। আমি কিছুতেই বাড়ী ফিরিব না। যদি আপনি বেশী উৎপাত করেন তবে আত্মহত্যা করিব। নিবেদন ইতি

সেবক—

দিলীপ।"

পত্র পড়িয়া মিনতি কাঁদিতে লাগিল। তার দুঃখ দুর্ভাবনায় সে কূল পাইল না, কাঁদিয়া তার আশ মিটিল না। সে কেবলি পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে সে বলিল, "অবোধ ছেলে, না জেনেই আমার স্নেহের এত অপমান ক'রে গেলে। একবার ফিরে এসে দেখ বাপ্ আমি তোর শত্রু নই।" বিদ্যুতের ছবির দিকে চাহিয়া বলিল, "ভাগ্যবতী, তোমার ভাগ্যে হিংসা ক'রেছিলাম ব'লে কি তুমি পরলোকে ব'লে আমাকে এ নির্ম্মম পরিহাস ক'রছো?" এমনি করিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে শিশির ফিরিয়া আসিল। মিনতি তার পায়ের শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া বসিল।

শিশির আসিয়া চিঠিখানা খুঁজিল। মিনতি বিনাবাক্যে চিঠিখানা তার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া দিল। শিশির একবার তার দিকে চাহিয়া কাগজখানা কুড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মিনতি ডাকিয়া বলিল, "চাবীটা নিয়ে যাও।"

শিশির হাত বাড়াইয়া চাবী লইল, কিন্তু কোনও কথা বলিল না।

ইনস্পেক্টার শরত বাবুকে চিঠি দেখাইতে তিনি বলিলেন, "এতে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে এ ছেলে আত্মহত্যা করবে না। খোঁজ করলে তাকে অবশ্য পাওয়া যাবে। আপনি তা হ'লে আজই ক'লকাতা গিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিন গে। আর হাওড়া থেকে সব ষ্টেশনে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিন গে। আমি এদিকে যা' ক'রবার করছি।"

"সব ষ্টেশনে টেলিগ্রাফ! হাঁ তাইতো। সে যদি রেলে গিয়ে থাকে কোথাও না কোথাও তাকে পাওয়া যাবেই।"—তার মনে হইল এ কথা মিনতি বলিয়াছিল।

সে তৎক্ষণাৎ কাপড় চোপড় পরিয়া কলিকাতা চলিয়া গেল। মিনতির বউভাত হইল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

বসিরহাটের শাহী মস্‌জিদ্

"বসিরহাটে মুসলমান শাসনকালের দুইটী প্রাচীন কীর্ত্তি আজও বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে একটী পাঠান শাসনকালে নির্ম্মিত প্রকাণ্ড দুই সারিতে ছয়টী গুম্বজবিশিষ্ট মসজিদ। এই মস্‌জিদই অত্র প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয় (১)। অপরটী একটী প্রকাণ্ড দীঘি—নেওয়ার দীঘি।

(১) স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় A. S. B. Vol. VI. No. 1 N. S. January 1910 পত্রিকায় এ বিষয় প্রথম আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

মস্‌জিদটী বাঙ্গালায় পাঠান রাজত্বের শেষভাগে কোনও সম্ভ্রান্ত এবং ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহা বসিরহাট সহরের মধ্যেই ইছামতী নদীর তীরে ইটিণ্ডা রোডের আন্দাজ দুইশত হস্ত দক্ষিণে অবস্থিত। মস্‌জিদের উভয় পার্শ্বে এবং সম্মুখে কিঞ্চিৎ ভূমি আছে। বর্ত্তমানে ইহার চতুর্দ্দিক অনুচ্চ ইষ্টকের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীর-মধ্যস্থিত ভূমির পূর্ব্ব-দক্ষিণ অংশে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী এবং অপর অংশে নানাবিধ ফলবান বৃক্ষ বিদ্যমান। প্রাচীরবেষ্টিত ভূমিতে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত তিনটি দ্বার আছে। তন্মধ্যে সদর দ্বার একটী—ইহা ইটিণ্ডা রোডের নিকট উত্তরদিকে অবস্থিত। অবশিষ্ট দুইটীর মধ্যে একটী উত্তর-পশ্চিম কোণে এবং অপরটি দক্ষিণ পার্শ্বের মধ্যস্থলে স্থাপিত।

মস্‌জিদের দুইটি অংশ, ভিতর এবং বাহির। ভিতর অংশ প্রথমে এবং বাহির অংশ, যাহা এই মসজিদের চত্বর, তাহা বহুকাল পরে স্থানীয় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক মেরামত হয়। এই চত্বরও আবার অনতিউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহাতে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বমুখী একটী মাত্র ক্ষুদ্র দ্বার আছে, কিন্তু মস্‌জিদ-গৃহ প্রবেশের নিমিত্ত দ্বার তিনটী। সেগুলি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও দৃঢ়। মধ্যদ্বারের প্রশস্ততা ৫ফুট ২ইঞ্চি; উত্তর এবং দক্ষিণ পার্শ্বের দ্বারের ৪ফুট ১১ইঞ্চি। এই দ্বারত্রয়ের উপরিভাগ সরু এবং বক্র খিলান বিশিষ্ট, এবং তলদেশ হইতে উপরিভাগ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্যে ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং বিস্তারে ৪ ফুট ১১ ইঞ্চি। খিলানগুলি ২ফুট ৮ইঞ্চি উচ্চ। এই মসজিদের উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে দুইটি করিয়া চারিটি জানালা আছে। ইহাদের উপরিভাগ দ্বারগুলির ন্যায় সরু খিলানবিশিষ্টও নহে, সম্পূর্ণ গোলাকৃতিও নহে। প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্যে ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং বিস্তারে ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি, খিলানগুলি ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি। পূর্ব্ব পার্শ্বের প্রাচীরের বেধ ৭ ফুট ২ ইঞ্চি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের বেধ ৭ ফুট ৮ ইঞ্চি। এইরূপ চওড়া দেওয়াল আজকাল সাধারণতঃ দেখা যায় না।

দুইটী প্রস্তর স্তম্ভের উপর ছয়টী খিলানে অথবা গুম্বজে ইহার ছাদ নির্ম্মিত। তলদেশ হইতে গুম্বজের শীর্ষস্থান ২৪ ফুট ব্যবধান। স্তম্ভ দুইটীর একটীর দৈর্ঘ্য ৭ ফুট ৫ ইঞ্চি এবং অপরটীর ৭ ফুট ৪ ইঞ্চি,—উভয়ের মস্তকের পরিধি ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি। নিম্নভাগ অপেক্ষাকৃত সরু (১) পরিধি ৪½ ফুট। স্তম্ভ দুইটি গোলাকার নহে—অষ্টভুজবিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রের ন্যায়। গাত্র সম্পূর্ণ মসৃণ নহে। শীর্ষদেশে ৮ টি করিয়া ব্যাঘ্র মূর্ত্তি ক্ষোদিত ছিল। এক্ষণে সেগুলি ভগ্ন-দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। বোধ হয় কোন ভগ্ন দেবালয় হইতে এইগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল।

অন্তরস্থ পশ্চিম প্রাচীর গাত্রে নানাবিধ পুষ্প অঙ্কিত এবং গ্রথিত ইষ্টকের উপর বিবিধ খোদাই কার্য্য আছে। অন্তরস্থ প্রাচীর গাত্র আজকাল সুন্দররূপে সিমেণ্ট করা হইয়াছে, তজ্জন্য

(১) স্তম্ভ দুইটির নিম্নভাগ সরু নহে। উপরে কার্ণিশের অংশের বেড় ও তাহার নীচেও কারুকার্য্য ক্ষোদিত থাকায় নিম্নভাগ অপেক্ষা উপরের বেড় বেশী হইবেই।

অঙ্কিত লতা পুষ্প এবং কারুকার্য্যের শোভা অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। মধ্যস্থলে মেহ্‌রাব, পার্শ্বে মিম্বর্ ইহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া ইমাম্ খোৎবা পাঠ এবং আলেমগণ ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা করেন : তলদেশ হইতে মেহ্‌রাবের উচ্চতা ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি ; ইহারও উপরিভাগ দ্বারের ন্যায় সরু এবং বক্র খিলান বিশিষ্ট।

মেহ্‌রাবের উপরে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরের শিলালিপিতে তোগ্‌রা অক্ষরে এইরূপ খোদিত আছে,—(১)

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মহম্মদ রছুল আল্লা। বেনা হাজাল্ মসজিদ্ ময্‌লিস্ উল্ মো আজ্জাম ওয়ল্ মোকার্ব্বাম ময্‌লিসো 'আ' জামো, দামত্ 'অজমতোহু সনা এহ্‌দা সব্‌ঈনা সমানো মে আতেন্।

অর্থাৎ—

মহামহিমান্বিত ও মহামতি মজলিস্, (যিনি) মজলিস্-ই-আজম (বলিয়া খ্যাত) তাঁহার মহত্ত্ব চিরকাল স্থায়ী হউক এই মস্‌জিদ সন ৮৭১ হিজরীতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

উক্ত শিলালিপি পাঠ করিবার জন্য প্রথমে অনেকে চেষ্টা করেন কিন্তু কেহই প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ে সমর্থ হন নাই। অবশেষে কলিকাতা মাদ্রাসার ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ব্লকম্যান সাহেব অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু তিনিও এ মসজিদ নির্ম্মাণের যথার্থ সময় নির্ণয় করিতে সক্ষম হন নাই। তৎপরে স্থানীয় মুন্সী আব্দুল অছেক সাহেব উক্ত শিলালিপির ছাপ লইয়া তাহার পাঠোদ্ধার করেন, এবং হেয়ার স্কুলের আরবী অধ্যাপক মৌলবী খায়রুল আলাম সাহেবের সাহায্যে তাহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া জনসাধারণের গোচর করেন। মসজিদের বাহির এবং ভিতরের তলদেশ সিমেণ্ট করা এবং পার্শ্বস্থ উঠান হইতে অল্পই উন্নত। মেজের দৈর্ঘ্য ৩৬৷৷০ফুট (২) এবং প্রস্থ ২৪ফুট। বাহিরের অংশ দৈর্ঘ্যে ৪৮ফুট ৮ইঞ্চি এবং প্রস্থে ১৮ফুট ৪ইঞ্চি। জুম্মা অথবা ইদের দিবস ভিতরে ও বাহিরে একসহস্র উপাসক একত্র উপাসনা করিতে পারেন।

মেহ্‌রাবের উপরিস্থিত শিলালিপি হইতে অনুমিত হয় যে এই মসজিদ খ্রীষ্টীয় ১৪৬৬-৬৭ অব্দের মধ্যে বাঙ্গলার পাঠান বংশীয় স্বাধীন নৃপতি সোলতান রুকন-উদ্দীন বারবক্ শাহের রাজত্বকালে মজলিসই আজম্ উপাধিপ্রাপ্ত জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। (৩) কিন্তু অদ্যাবধি বাঙ্গলার ইতিহাসে মজলিসই আজম নামধেয় কোন ব্যক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। এজন্য কোন কোন ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করিয়াছেন যে মজলীস-ই-আজম্ সম্ভ্রান্ত

---

(১) ইহার প্রতিলিপি J. A. S. B. Vol. VI. No. 1 1910 পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) J.A.S.B., January 1910 Vol. VI. No. 1 তে মোহনবাবু ৩৬ ফুট উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মাপে প্রায় ৩৭ ফুট হয় :—সামান্য পার্থক্য স্থির করা যায় না।

(৩) পরে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

পাঠানগণের একটী উপাধি মাত্র। এই নির্ম্মাতার প্রকৃত বৃত্তান্ত আবিষ্কার এক্ষণে ঐতিহাসিকগণের গবেষণা-সাপেক্ষ।

এই মসজিদের বর্ত্তমান ইতিহাস এস্থানে কিঞ্চিৎ বিবৃত করা আবশ্যক। নির্ম্মাণের পর ইহা দুইবার সংস্কৃত হইয়াছে। প্রথমে কাজী মোহাম্মদ লাল মরহুম পরে তাঁহার প্রপৌত্র কাজী আয়নল হক মরহুম ইহার সংস্কার সাধন করেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহার ছাদের উপর একটি তিন্তিড়ী বৃক্ষ জন্মিয়া ছাদের কিয়দংশ নষ্ট করে। পূর্ব্বোক্ত কাজী মোহাম্মদ লাল মরহুম উক্ত তিন্তিড়ী বৃক্ষের মূলোৎপাটন করিয়া মসজিদটিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করেন। কাজী আয়নল হক মরহুম যে সময়ে ইহার সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, সেই সময়ে মৃত্তিকার আবশ্যক হওয়ায় পার্শ্বস্থ ভূভাগ হইতে মৃত্তিকা খনন করিবার নিমিত্ত লোক নিযুক্ত হয়। তাহাদের খনন করিবার সময় এক বৃহদাকার কবর বাহির হয়, উহা দৈর্ঘ্যে ১৮ফুট। এই বৃহদাকার কবর উপস্থিত জনবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায় উক্ত রজনীতে আকাশে গ্রহ উপগ্রহগণের গতি পরিবর্ত্তনও লক্ষিত হইয়াছিল। এইরূপ ঘটনা নিশ্চয়ই বিস্ময় উৎপাদক তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মসজিদের বর্ত্তমান অবস্থায় পুনরায় সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছে এবং যদি যথা সময়ে সংস্কৃত না হয় তাহা হইলে যে ইহা ধ্বংসের পথে অচিরেই অগ্রসর হইবে তাহার বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্য মাত্র। ইহার সমসাময়িক প্রায় সকল মসজিদই এক্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাকে সামান্য উপাসনালয় মনে করা আমাদের একান্ত অনুচিত; কারণ ইহা সেই অতীত মোসলেম যুগের গৌরব-গরিমার জীর্ণ কঙ্কালময়ী স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে।"*

শ্রীআব্দল অদুদ

বিগত ১৩২৭ সালের ২০শে ফাল্গুন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীনিখিলনাথ রায় মহাশয়ের সহিত আমরা উল্লিখিত মসজিদটী দেখিতে যাই। বসিরহাট সহরের মধ্যে অবস্থিত হইলেও স্থানীয় লোকে ইহার প্রাচীনত্ব ও বিশিষ্টতা সম্বন্ধে কোনই সন্ধান রাখেন না। ইহা আমাদের জাতীয়স্বভাব।

প্রাচীর-বেষ্টিত মসজিদের সীমায় ঢুকিতে উত্তরে ও দক্ষিণে দুটী সাধারণ পথ আছে। এখানে চৌকাঠের বাজু ও গোব্রাট হিসাবে ব্যবহৃত বৃহৎকায় কাল পাথর (basult) আগন্তুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইরূপ পাথর এই "পলিমাটির দেশে" জন্মেই না। পশ্চিমে গয়া জেলা ও পূর্ব্বে পূর্ব্ব-আসামের এদিকে এরূপ পাথর পাওয়া যায় না। ঐ পাথরগুলির আকার ও খাঁজ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে উহা অন্যত্র স্তম্ভ বা দেওয়ালের পার্শ্বগাত্র হিসাবে

* ১৩২৫ সালে বসিরহাট বাণী সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।

ব্যবহৃত হইত, এখানে প্রয়োজন মত অসংবদ্ধভাবে স্থাপিত হইয়াছে। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত বলিব। মসজিদটী বৃহৎ না হইলেও সংস্কৃত অবস্থায় প্রত্যহ ব্যবহৃত হয়।

চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে রাজমহলের নিকটে সমুদ্র ছিল। (১) কাজেই এখনকার নিম্নবঙ্গ কতদিন পূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়াছে তাহা স্থির করা যায় না। ঐতরেয় আরণ্যকে প্রথম বঙ্গদেশের উল্লেখ পাওয়া যায় (২) মহাভারতেও বঙ্গের উল্লেখ আছে, কিন্তু তখন বঙ্গ বলিতে কোন স্থানকে বুঝাইত তাহার স্থিরতা নাই, অন্ততঃ আধুনিক নিম্নবঙ্গ বুঝাইত না। কারণ সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তে তাম্রলিপ্তি হইয়া সমতটের মধ্য দিয়া পূর্ব্বে শ্রীহট্ট যাইতে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে তাহার সংস্থান অবিসংবাদিরূপে নির্ণীত না হইলেও এখনকার জেলা ২৪ পরগণা, খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশালের অন্তর্গত স্থানের উল্লেখ বড় পাওয়া যায় না। (৩) সমতট তখন 'ভাটির দেশ' ছিল—সমুদ্রজলে অনেক সময় ডুবিয়া থাকিত। সেই জন্যই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে দুই তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন অতীত যুগের ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিয়া অদ্যাপি দাঁড়াইয়া থাকিলেও (৪) বঙ্গদেশে চারিশত বৎসর পূর্ব্বের মঠ, মন্দির, বা মসজিদ বড় বেশী দেখা যায় না। সেই জন্যই বাঙ্গলা দেশের এত দক্ষিণে প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত বসিরহাটের এই মসজিদটি উপেক্ষণীয় নয়। হুগলি ও পাণ্ডুয়ার দক্ষিণে এই মসজিদটী এতদিন জলবায়ু ও লোনা হাওয়া সহিয়া দাঁড়াইয়া আছে; যতদূর জানা গিয়াছে ইহা অপেক্ষা প্রাচীন গৃহ এত দক্ষিণে আর নাই।

১৯০৯ খৃঃ অঃ সর্ব্বপ্রথম মনীষী স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়—"বঙ্গদেশীয় মন্দির ও তাহাদের বৈশিষ্ট্য" শীর্ষক এক প্রবন্ধে এবং পর বৎসর "বঙ্গদেশে মোগল-রাজত্ব কালের পূর্ব্বের মসজিদ" শীর্ষক প্রবন্ধে এদেশের স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাস ও নিদর্শন সমূহের তথ্য প্রথম প্রচারিত করেন (৫)। এই শেষ নিবন্ধে পাঠান যুগের মসজিদ শ্রেণীকে তিনি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন (ক) প্রাচীনকালের অর্থাৎ যখন বাঙ্গলা দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীন

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৫, শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত লিখিত 'নিম্ন বঙ্গের বিল' শীর্ষক প্রবন্ধ পৃ-৩৪।

(২) ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তাণীমানি বয়াংসি বঙ্গবগধাশ্চের-পাদাস্তম্ভা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি—ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১।

(৩) Watters' Yuan Chuang.

(৪) উত্তরে ভারহুত ও সাঞ্চি এবং দক্ষিণে ইলোরা, মাদুরা, মামুল্লাপুরম্ এবং কোনার্ক প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৫) J. A. S. B. Vol V. No. 5. N.S. 1909. May and J. A. S. B. Vol VI. No. 1. N.S. 1910, January.

ছিল বা পাঠান শাসনকর্ত্তাগণ দিল্লী হইতে প্রেরিত হইতেন অথবা দিল্লীর প্রাধান্য স্বীকার করিতেন; (খ) শেষপাঠান যুগ অর্থাৎ বাঙ্গলায় স্বাধীন পাঠান শাসকগণের আমল (আন্দাজ ১৩৩৮ খৃঃ অঃ পরে)। *এই সময়েই বাঙ্গলায় স্থাপত্য শিল্পের চরম উন্নতি হয়; এবং বসিরহাটের মসজিদ এই যুগেই নির্ম্মিত* (১)। (গ) নূতন ধরণের উপাসনা মন্দির যেমন কদ্‌মরসুল, ইদ্‌গা প্রভৃতি।

মনোমোহন বাবু এই আলোচনার পথ প্রদর্শক। তিনি লিখিয়াছেন, "বসিরহাটের সালিক মসজিদের মধ্যস্থলে মেহ্‌রাবের উপরের শিলালিপিতে যে তারিখ ক্ষোদিত আছে তাহা বুঝা গেলনা। এই মসজিদ সম্ভবতঃ ১৩০৫ খৃঃ অঃ জনৈক আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, কিন্তু স্থাপত্য-বিজ্ঞানের নিদর্শনানুসারে বহুদিন পরে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান হয়। হলঘর ৩৬´×২৪´; ৮ ফিট উচ্চ ২টী পাথরের ক্ষোদিত স্তম্ভ; তিনটী মেহ্‌রাব; সম্মুখে প্রবেশ পথ তিনটী; দুই পাশের দেয়ালে ২টী করিয়া জানালার মধ্যে একটী করিয়া কুলুঙ্গি; দুই সারিতে ৬টী গম্বুজ।"

তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশের পরেই মসজিদের মাতোয়াল্লি মৌলবী হামিদল হক্ উল্লিখিত শিলালিপির ছাপ ও শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পাঠ মনোমোহন বাবুকে পাঠাইয়া দেন। তাহা বাঙ্গলা অক্ষরে উপরে প্রকাশিত মূল প্রবন্ধে লিখিত পাঠের প্রায় অনুরূপ এবং তাহার ইংরাজি অনুবাদ এইরূপ (২)——

"No God there is but He; and Muhammad is His prophet" (crud). This mosque built by the great and the liberal Majlis, Majlis-i-Azam—May his greatness be perpetuated!—in the year eight hundred seventy one" (871H = 1466-67 A. D)

এই পাঠোদ্ধারে নিঃসন্দেহে জানা গিয়াছে যে এই মস্‌জিদ সুলতান বারবক শাহের আমলে মজলিস্‌ই আজম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই নির্ম্মাণকারক কে সে বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইবে।

বসিরহাটের এই মসজিদের নাম মনোমোহন বাবু সালিক (salik) মসজিদ কেন বলিয়াছেন তাহা বুঝিলাম না। স্থানীয় লোকের নিকট সন্ধান লইয়া এ নামের কোনও সদর্থ পাওয়া যায় না। তাঁহারা এনাম কখনও শুনেন নাই বরং কেহ কেহ ইহাকে শাহী মসজিদ বলিয়া থাকেন।

(১) এ সম্বন্ধে মনোমোহনবাবুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পরেই সাময়িক সংবাদপত্রে এই বিষয়ে আলোচনা হয়। মসজিদের অন্যতম মাতোয়াল্লি মৌলবী হামিদুল হক্ মহাশয় ১৫।১২।০৯ তারিখের Statesman পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করেন এবং মনমোহনবাবু তাহার উত্তর দেন।

(২) J. A. S. B. Vol. VI. No. 1 1910—Page 29.

ইহা সকলেই জানেন যে, ইলিয়াস্ শাহ, মহমুদ শাহ ও হুসেন শাহের বংশধরগণ যখন বাঙ্গলা দেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন তখনই এদেশে স্থাপত্য-শিল্পের চরম উন্নতি হয় এবং তাঁহাদের আমলে নির্ম্মিত বহু মস্‌জিদ শত শত বৎসরের জল বায়ু সহ্য করিয়া আজও বাঙ্গলা দেশের চারিদিকে মস্তকোন্নত করিয়া আছে। বসিরহাটের এই মস্‌জিদ উপরোক্ত মহমুদ শাহের বংশের বারবক্ শাহের আমলে তৈয়ারী; কাজেই ইহাকে শাহী মসজিদ বলিলে তাহার অর্থ বোধগম্য হয়। সম্ভবতঃ মনোমোহন বাবু ইহার নাম ভুল শুনিয়াছিলেন (১)। আমরা ইহাকে শাহী মসজিদই বলিব। এতদ্ব্যতীত স্তম্ভশীর্ষ (Capital, স্থপতি শিল্পে যাহা পৃথক্ অঙ্গ বলিয়া ধরা হয়) ধরিয়াও স্তম্ভগুলি ৮ ফুট নয়, কয়েক ইঞ্চি ছোট এবং দুইটী স্তম্ভও সমান উচ্চ একই রূপ ক্ষোদিত ও সমান আকৃতির নয়। মেহ্‌রাবও তিনটী নয়, মধ্যস্থলে একটী মাত্র। তাহার উপরে ও পাশে লতা পুষ্প অঙ্কিত ও কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইঁট দেওয়াল-গাত্রে গ্রথিত আছে। সেগুলি মসজিদ নির্ম্মাণের সময় হইতেই আছে বলিয়া মনে হয়। পশ্চিমের দেওয়ালে মেহ্‌রাবের দুই পাশে দুটী কুলুঙ্গি আছে। উত্তর দিকের দেওয়ালে কুলুঙ্গি একটী, কিন্তু দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে কুলুঙ্গি দুইটী।

এই মস্‌জিদের নির্ম্মাণকারক কে? শিলালিপিতে পাওয়া যায় 'মজলিস্-ই-আজম' নির্ম্মাণ করেন। বিশেষজ্ঞেরা বলেন "মজলিস্" শব্দের অর্থ সভা, সংসদ, সঙ্ঘ (assembly) এবং 'আজম' শব্দের অর্থ মহৎ, পরাক্রান্ত, বিখ্যাত, শ্রেষ্ঠ; কাজেই মজলিস-ই-আজম্ অর্থে শ্রেষ্ঠ বা পরাক্রান্ত মজলিস্ কিংবা সভা (Great assembly or Assembly of the Great) বুঝাইতেছে। 'আজম্' কোনও ব্যক্তি বিশেষের নাম বা উপাধিও হইতে পারে, কিন্তু ইতিহাস বা ঐতিহ্য কথাও এ অঞ্চল-নিবাসী কোনও ব্যক্তিকে 'আজম' উপাধি ভূষিত বলিয়া আজও আবিষ্কার করে নাই। তবে ইনি গৌড় বঙ্গের কোন রাজপুরুষ বা রাজবংশোদ্ভব কেহ কিনা, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

হুগলি জিলায় ছোট পাণ্ডুয়াতে ৮৮২ হিজরিতে নির্ম্মিত (অর্থাৎ বসির হাট-মসজিদের ১১ বৎসর পরে) একটী মসজিদ আজও বর্ত্তমান আছে, তাহার শিলালিপির অনুবাদেও উল্লেখ আছে "The mosque was built by the Majlis-ul-Majlis, the great and liberal Majlis, Ulugh Majlis-i-A'zam" (২) কর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদ ও

(১) আমাদের কয়েকজন আরবী ও পারসী ভাষা অভিজ্ঞ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া 'শালিক' শব্দের কোনও অর্থ জানিতে পারি নাই।

(২) J. A. S. B. 1873, Page 276.

বসিরহাটের মস্‌জিদ নির্ম্মাণকারক সেই একই 'মজলিস-ই-আজম' কর্ত্তৃক নির্ম্মিত অনুমান করা যাইতে পারে (১)

কিছুদিন পূর্ব্বে অনেকগুলি ইলিয়াস্ শাহী শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে নির্ম্মাণকারক 'মজলিস্'এর নামে উল্লেখ দেখা যায়। ৮৮৫ হিজরিতে হজরত পাণ্ডুয়ায় যে মসজিদ নির্ম্মিত হয় তাহার শিলালিপির অনুবাদে লেখা আছে "built by the Majlis-ul-Majlis, the exalted Majlis". শ্রীহট্টে শাহ জলিলের সমাধিস্তম্ভে উল্লেখ আছে "and the builder is the great and exalted Majlis, the wazir (dastur), the Majlis-i-A'lu।" আবার ৯৩৩ হিজরিতে নির্ম্মিত সিকন্দরপুরের মস্‌জিদের শিলালিপিতে লিখিত আছে "the founder of the mosque, during the reign of Nasrat Shah, son of Husain Shah, is the great Ulur (ulugh) *i.e.*, the great Khan,—Khan, Commander of the district of Kharid" (২)। ইহা হইতে দেখা যায় যে নির্ম্মাণকারী পূর্ত্তবিভাগ বা সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেই বুঝাইতেছে। ইলিয়াস্ শাহ এবং তাহার বংশধরগণ এদেশে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করিয়া ধর্ম্মপ্রচারকল্পে বহু মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; কাজেই রাজ্যশাসন-যন্ত্রের মধ্যে একটী পৃথক পূর্ত্তবিভাগ থাকাও অসম্ভব নয়।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় সপ্তগ্রামের বিবরণীতে লিখিয়াছেন (৩) জালালউদ্দীন ফতে শাহের রাজত্ব সময়ে ৮৯২ হিজরিতে সেখানে যে মসজিদ নির্ম্মিত হয় তাহা উলূঘ মজলিস নূর (Ulugh Majlis Nur) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই "মজলিস্ নূর" আর্‌সা শাজ্‌লা মান্‌খাবাদের সৈন্যাধ্যক্ষ ও উজীর ছিলেন (৪)। এখানে দেখা যাইতেছে 'মজলিস নূর' এক ব্যক্তির নাম। আবার ত্রিবেণীর মস্‌জিদের শিলালিপিতে পাওয়া যায় উলূঘ মস্‌নদ হিন্ধু খাঁ কর্ত্তৃক ইহা ৯১১ হিঃ-তে নির্ম্মিত হয়। তিনি হুসেনাবাদ ও আর্‌সা সাজ্‌লা মানকাবাদের সৈন্যাধ্যক্ষ ও উজীর ছিলেন (৫)। এই উলূঘ শব্দটী আরবী ভাষায় নাই, সম্ভবতঃ তুর্কী ভাষার কথা।

(১) ইম্‌পীরিয়াল লাইব্রেরীর মৌলবী ও বহু ভাষাবিদ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বন্ধুবর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার এম্ এ, মহাশয়দ্বয়ও উহার কোনও সদর্থ বলিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মতে 'মজলিস্-ই-আজম' কোন রাজকর্ম্মচারী সভ্যকে বুঝাইতেছে, যেমন The Public 'Works Dept of any Government. আমাদের মনে হয় Public Works Dept. এর ভারপ্রাপ্ত অজম্ নামধের কোনও ব্যক্তিকেও লক্ষ্য থাকিতে পারে।

(২) J.A.S.B.—1873, contributions to the History & Geography of Bengal—H. Blochman—Page 274-86.

(৩) J.A.S.B.—1909—Satgaon—R. D. Banerjee—P. 250.

(৪) "The mosque was built in 892 by Ulugh Majlis Nur. He was commander (Sarlaskar) and Wazir of Arsa Sajla Monkhbad."

(৫) "The mosque was built in 911 by Ulugh Masnad Hindhu Khan who was Sarlaskar and Wazir of Husainabad & of the Arsa Sajla Mankobad."

ইহার সঠিক অর্থ কি জানিতে পারি নাই। তবে শেষোক্ত তিনটী শিলালিপির পাঠ হইতে জানা যায় যে ইহা একটী পদবী বিশেষ, এবং সম্ভবতঃ সৈন্যাধ্যক্ষকেও বুঝায়। যাহাই হউক বসিরহাটের মস্‌জিদ নির্ম্মাণকারক কোন একটী সঙ্ঘ এবং আজমনামা কোনও ব্যক্তি সেই সঙ্ঘের প্রধানপুরুষ ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হইতেছে।

স্বর্গীয় দুর্গাচরণ সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহার বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইলিয়াস্‌ শাহের পুত্র ময়জুদ্দীন, তাঁহার পুত্রের নাম গয়সুদ্দীন ও তাঁহার পুত্রের নাম সৈফুদ্দীন। এই শেষোক্ত দুইজন গৌড়ের রাজা ছিলেন, ইঁহারা ঐতিহাসিক পুরুষ। সৈফুদ্দীনের দুই পুত্র নসেরিৎ ও আজম (বা আজিম)। সৈফুদ্দীনের মৃত্যুর পরে একটাকিয়ার রাজা গণেশ নারায়ণ উভয় ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং গৌড়রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র যদুনারায়ণ আজম শাহের কন্যা আস্‌মান তারাকে বিবাহ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সান্ন্যাল মহাশয় এই বংশাবলীপত্র কোথায় পাইলেন তাহার উল্লেখ করেন নাই। সেজন্য শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে বলিয়াছেন যে "মূল পারসীক ইতিহাস, শিলালিপি ও মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণানুসারে সমসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের পুত্রের নাম সিকন্দর শাহ, পৌত্রের নাম গিয়াস্‌উদ্দীন আজমশাহ, প্রপৌত্রের নাম সৈফউদ্দীন হাম্‌জা শাহ ও বৃদ্ধ প্রপৌত্রের নাম সমস্‌উদ্দীন। সৈফউদ্দীন হামজা শাহের নসেরিৎ (নস্‌রৎ) ও আজিম্‌ (আজম্‌) নামক পুত্রদ্বয়ের অস্তিত্বের প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই"। (১) ইলিয়াস্‌ শাহ বংশের বাঙ্গলার স্বাধীন সুলতানগণের রাজত্বকাল একরূপ নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে (২)। ইতিহাসে দেখা যায় গিয়াসউদ্দীন, সৈফুদ্দীন ও সমস্‌উদ্দীন তিন জনেই গণেশের চক্রান্তে জীবন ত্যাগ ক (৩) সৈফউদ্দীন গিয়াসউদ্দীনের দ্বিতীয় পুত্র (৪)। কাজেই অন্য পুত্র ছিল ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে সান্ন্যাল মহাশয়ের উল্লিখিত নস্‌রৎ বা আজম্‌ নামে পুত্রদ্বয় থাকিতেও পারে। আবার সময়ের হিসাবেও দেখা যায় যে সৈফ্‌উদ্দীন যখন রাজা হন তখন তাঁর কনিষ্ঠ-পুত্রের বয়স ১০ বৎসর ধরিলেও, বারবক্‌ শাহের সময়ে বসিরহাটের মসজিদ নির্ম্মাণ কালে সেই পুত্রের বয়স ৮২ বৎসর হয়। সে দিনে এই বয়স পর্য্যন্ত জীবিত

গৌড় বংশের স্বাধীন সুলতান	হিজরি
১। সমসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ	৭৪০-৫৯
২। সিকন্দর শাহ (১ম)	৭৫৯-৯২
৩। গিয়াসউদ্দীন আজম্‌ শাহ	৭৯২-৯৯
৪। সৈফউদ্দীন হামজা শাহ	৭৯৯-৮০৯
৫। সমসউদ্দীন (২য়)	৮০৯-১২
রাজা গণেশের বংশ	৮১২-৪৬
পুনরায় ইলিয়াশ শাহ বংশের	
১। নাসিরউদ্দীন মহম্মদশাহ	৮৪৬-৬৪
২। রুকনউদ্দীন বারবক্‌ শাহ	৮৬৪-৭৯
৩। সমসউদ্দীন ইউসফ শাহ	৮৭৯-৮৭

(হিজরি সনে ৫৯৫ যোগ করিলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়।)

(১) বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় ভাগ—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—পরিশিষ্ট "ছ"—পৃঃ ১৮৬-৮৭।

(২) বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় ভাগ—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহা ব্যতীত আজও আর কোনও প্রামাণিক ইতিহাস লিখিত হয় নাই। রিয়াজ-উস-সালাতিনে লিখিত সময় হইতে কোথাও কিছু পার্থক্য থাকিলেও তাহা সামান্যই।

(৩) ঐ—পৃ—১৫৬।

(৪) —১৫৭।

থাকা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, এবং তাঁহার পূর্ত্তবিভাগের ভারপ্রাপ্তিও অসম্ভব নয়। শিলালিপিতে উল্লেখ পাইলে যদি লোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু প্রমাণ হয়, তবে বসিরহাটে প্রাপ্ত শিলালিপিতে এই "আজম" শব্দ কোনও ব্যক্তি বিশেষকে নির্দ্দেশ করিলে সৈফউদ্দীনের আজম নামা কোনও পুত্র ৮৭১ হিজরিতে যে এই মসজিদের নির্ম্মাণকর্ত্তা নয়, তাহা প্রমাণাদি দ্বারা অস্বীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া লওয়া যায় কিনা তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্ধারণ করিবেন।

পাঠান যুগের সমস্ত মসজিদ প্রভৃতিতে বৌদ্ধ ও হিন্দু স্থাপত্য রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট দেখা যায়, এবং তাহা ঘটাও স্বাভাবিক। মুসলমান অধিকারের প্রথম যুগে বিজেতৃগণ ও তাঁহাদের শ্রমসহিষ্ণু দৃপ্ত অনুচরবর্গ আরব ও তুর্কিস্থান হইতে তরবারি হস্তে এদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অধিকাংশ নিরক্ষর ও স্থাপত্য-সৌন্দর্য্যজ্ঞানহীন ছিলেন। কিন্তু যেখানেই যান, উপাসনা মন্দির আবশ্যক ; তাহা নির্ম্মাণের জন্য স্থানীয় কারিগর নিয়োগ এবং মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও অন্য স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার আবশ্যক হইত (১)। বাঙ্গলা দেশে পাথর দুর্লভ, সেজন্য ইটই ব্যবহৃত হইত এবং রাজমিস্ত্রিরা পুরুষানুক্রমে শিক্ষিত বৌদ্ধ (হিন্দু) স্থাপত্যরীতি যাহা জানিত সেইরূপেই মসজিদও তৈয়ারী করিত ; ইসলাম ধর্ম্মানুমোদিত স্থাপত্য-শিল্পজ্ঞান-বিশিষ্ট পরিদর্শকেরও অভাবে পুরাতন রীতির প্রভাব সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ থাকিয়া গিয়াছে। (২)

এ অঞ্চলে গৌড়ের আদিনা মসজিদই সর্ব্ব পুরাতন ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর (৭৭৬ হি)। বসিরহাটের মসজিদও সেই রীতিতে নির্ম্মিত তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। বাঙ্গলা দেশে গৃহ নির্ম্মাণে প্রাচীন কাল হইতেই বাঁশ ব্যবহৃত হয়, এবং বৃষ্টির জল সহজে নিঃসরণের জন্য চালে ও পরে ইঁটের ছাদ নির্ম্মাণেও সাধারণ আনতি (curvature) সুস্পষ্ট (৩)। আমাদের

(১) A Handbook of Indian Art, Havell—Page 110 and History of Fine Art in India & Ceylon—V. A. Smith—Page 392-3

(২) J.A.S.B. 1910—Page 24-25

(৩) We might therefore expect it to be the case in Bengal, the home country of Buddhism that the characteristics of cottage-building would be repeated in the temple, and that the mosque, as in other parts of India, would be an adaptation of the temple. This is in fact what we find there. The excellent thatched cottages of Bengal have curved roofs with pointed eaves, built *upon* an elastic *bamboo* framework, which gives them rigidity and acts most effictively in throwing off the rain. The "horse shoe" arch, the "bulbous" dome, and the curvilinear *sikbara* must have been originally built on the

এই মসজিদেও তাহা দেখিতে পাই। পশ্চিম ও দক্ষিণদেশে পাথর ব্যবহৃত হওয়ায় বিস্তৃত ও উচ্চ গৃহনির্ম্মাণে অসুবিধা হয় না, কিন্তু বাঙ্গলা দেশে কাঠে পোড়ান খুব ছোট অথবা বড় ইট ব্যবহৃত হওয়ায় থাম খুব উচ্চ হয় না (পাথরের থাম বহুদূর হইতে সংগৃহীত হয় বলিয়া তাহাও উঁচু দেখা যায় না) এবং তাহার উপরে গম্বুজ নির্ম্মাণে সরু ইট এক-কেন্দ্রিক-ভারসাম্য-বৃত্তাকারে (concentric circle) স্থাপিত হওয়ায় গম্বুজের আকারও বেশী বড় বা উঁচু হইতে পারে না। সেজন্য এদেশে বহু-গম্বুজবিশিষ্ট প্রার্থনা মন্দির দেখা যায় (১); কিন্তু দিল্লী ও লাহোর অঞ্চলে সেরূপ নাই; সেখানকার মস্‌জিদ সমূহের এক একটী অত্যুচ্চ ও বহু বিস্তৃত গম্বুজ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পাঠানযুগের এই গম্বুজ নির্ম্মাণ রীতি হিন্দুদের মণ্ডপ-নির্ম্মাণ-রীতির অনুকরণে অবলম্বিত (২)। বসিরহাট মসজিদের গম্বুজের শীর্ষস্থানটী হিন্দুদের আমলক্ বা কলস অথবা শেখর (spire) ধারার না হইলেও বৌদ্ধ রীতি গন্ধি-শীর্ষ (Gandhi, bell-shaped dome) দেখিতে পাওয়া যায় (৩)। ইহা বৌদ্ধ স্তূপ-শেখরের অনুকরণে নির্ম্মিত (৪)। এই মসজিদের মেহ্‌রাব এবং দ্বারপথ ও জানালার খিলানও প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ত্রিপত্র খিলানের অনুকরণে কল্পিত। বিশেষজ্ঞেরা বলিয়াছেন যে বৌদ্ধযুগের শেষ পাদে স্তূপ, বিহার, সঙ্ঘারাম প্রভৃতি নির্ম্মাণের সময়ে প্রতি গৃহের দেওয়ালে ছোটবড় কুলুঙ্গি করিয়া বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি রাখিবার রীতি হইয়াছিল। প্রধান গৃহের মধ্যে সম্মুখেই মধ্যস্থলে যেখানে বুদ্ধ

---

same principle, which is as effective in its practical purpose whether the roof be built of thatch or brick and plaster or of slabs of stone.

* * * * * *

The pathans, when they made *Lakhnauti* a Mahammadan capital, found therefore a school of building using curvilinear roofs; and as brick rather than stone is the natural building material of the country, they had less difficulty in adapting the temple to Mahammadan symbolism, for the Bengalee builders were accustomed to use the arch both for structural and decorative purposes. The Pathan mosques and tombs of Gour, Panduah and Maldah on this account are an even closer imitation of Hindu and Buddhist buildings than they were in the neighbourhood of Delhi, where stones of large dimensions were procurable. A Handbook of Indian Art—Havell—Page 122.

(১) বাগেরহাটের "ষাট গম্বুজ" ৬০ স্তম্ভও ৭৭ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইহার গম্বুজগুলিও এই একই রীতিতে নির্ম্মিত।

(২) A Handbook of Indian Art—Havell. Page 112.

(৩) Ibid—Page 108.

(৪) Indian Architecture—Havell—Page 98.

মূর্ত্তি পূজিত হইত সেখানকার কুলুঙ্গি সাধারণতঃ বড় হইত এবং খিলানের উপরে ও পার্শ্বে নানাবিধ কারুকার্য্য খচিত থাকিত। মুসলমান বিজয়ের পরে কুলুঙ্গি হইতে বুদ্ধমূর্ত্তি দূরে নিক্ষিপ্ত ও প্রাচীর ভগ্ন হইয়াছিল। যেখানে মন্দির গৃহ একেবারে ভগ্ন হয় নাই, সেখানে তাহা মস্‌জিদে রূপান্তরিত হইয়াছিল। এইরূপে পশ্চিম দিকের দেওয়ালের কারুকার্য্যশোভিত প্রধান কুলুঙ্গি থাকিয়া গিয়াছে, এবং তাহাই পরবর্ত্তীকালে নূতন মসজিদ নির্ম্মাণে অনুকৃত হইয়া সুন্দর মেহ্‌রাবে পর্য্যবসিত হইয়াছে (১)। আবার বৌদ্ধচক্রের অনুকরণে অথবা কাহারও মতে সমুদ্র হইতে সূর্য্যের উত্থানজ্ঞাপক পদ্মপত্র বা অশ্বত্থ পত্রের অনুকরণে, ত্রিপত্র খিলান নির্ম্মাণ বৌদ্ধ যুগে অবলম্বিত হয়। ইহাতে সৌন্দর্য্য, দৃঢ়তা এবং আলো ও আঁধারের সুন্দর সামঞ্জস্য হয় বলিয়া মুসলমানযুগেও ইহা অনুকৃত হইয়াছে (২)। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই ত্রিপত্র খিলানের উৎকৃষ্ট নিদর্শন আজিও দেখা যায় (৩)।

স্বাধীন সুলতানগণের আমলেই বাঙ্গলায় স্থাপত্য-শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল। মোগল অধিকারের পরে দিল্লীসম্রাটের প্রতিনিধিগণের এখানে কোন শিল্প-সৌকর্য্যের জন্য চেষ্টা না থাকাই স্বাভাবিক। তাঁহারা কয়েক বৎসরের জন্য এ প্রদেশ শাসন করিতে আসিতেন, পরে দেশে চলিয়া যাইতেন (৪)। অপর দিকে এদেশের বহু ধনরত্নাদি কররূপে ও ভাল কারিকরগণ বেশী পারিশ্রমিক ও পুরস্কারের আশায় আগ্রা ও দিল্লীর দিকেই ধাবিত হইত; কাজেই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দে বাঙ্গলার রাজধানীতে শাহ্ সুজা কর্ত্তৃক রাজমহলে, সাইস্তা খান্ কর্ত্তৃক ঢাকায় এবং নবাব নাজিমগণ কর্ত্তৃক মুর্শিদাবাদে কয়েকটী সুন্দর মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইলেও তাহা দিল্লীর সৌধাবলীর ছায়া মাত্র।"

আমাদের এই মসজিদটীর রচনা পদ্ধতি সম্বন্ধে যাহাই বলা হউক ইহার উপকরণ সমস্তই

(১) A Handbook of Indian Art—Havell—Page 107.

(২) Ibid—Page 107-8.

(৩) বিজাপুরে আলি শাহি পীরকী মস্‌জিদ Plate XXXV Page 90 of Havell's Indian Architecture; দিল্লীর মতি মস্‌জিদ Plate CI Page 206 ও গৌড়ের ছোট সোনা মস্‌জিদ Plate XXX I Page 86 of Smith's History of Fine Art in India & Ceylon ইহার সুন্দর আদর্শ।

(৪) একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না যে লর্ড কার্জ্জন যখন ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণ কল্পনা স্থির করেন, তখন তর্ক উঠিয়াছিল যে উহা আধুনিক পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য শিল্পরীতিতে নির্ম্মিত হইবে। অনেকেরই মত ছিল আধুনিক পন্থাই অবলম্বন করা উচিত; কিন্তু বিলাতে শ্রীযুক্ত হেভেল প্রভৃতি কয়েকজন ভারতবন্ধু সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের নিকট আবেদন করিয়া হিন্দু ও মুসলমান যুগের সৌধ-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানান। নানা বিতণ্ডার পরে তাহাই অনুসৃত হইয়াছে। ইহার বিশেষ বিতণ্ডার Havellএর Indian Architecture গ্রন্থে দেওয়া আছে।

কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দির হইতে যে সংগৃহীত তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝা যায় যে মূল মসজিদ গৃহটী বহুদিনের নির্ম্মিত এবং সম্ভবতঃ কতকটা প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। মসজিদের চত্বর অর্থাৎ সম্মুখের বারাণ্ডা বহুদিন পরে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। খুব লাল সরু ইঁট এবং তাহার কতক আবার ক্ষোদিত মূর্ত্তি ও লতাপাতাবিশিষ্ট হওয়ায় কোনও মুসলমান নির্ম্মাতার জন্য ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। মেহ্‌রাবের পার্শ্বে ও উপরে যে সকল লতা ও ফুল দেখিতে পাওয়া যায় তাহা উত্তর কালে সিমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত অথবা খোদাই করা ইঁটমণ্ডিত তাহা সহজে নির্ণয় করা কঠিন। তবে মসজিদের বহিরাবরণে খোদাই করা ইঁট উল্টা করিয়া লাগান আছে দেখিয়াছি। নোনা লাগায় এবং ইদানীং চূন সুরকির সাহায্যে মেরামত হওয়ায় মূর্ত্তি চেনা যায় না। গৃহমধ্যের প্রস্তরস্তম্ভ দুটী বিশেষ লক্ষ্য করার জিনিষ। ইহারা রাজমহলের লাল দানাদার পাথরের (laterite) দুইটী পৃথকরূপে তক্ষিত, তাহাতে প্রমাণ হয় যে উহারা পৃথক স্থান হইতে বা পৃথক গৃহ হইতে অন্ততঃ একই গৃহের পৃথক অংশ হইতে সংগৃহীত। ইহাদের উচ্চতারও পার্থক্য আছে। স্তম্ভ-শীর্ষ-খণ্ড (capital) দুইটীরও অপর অংশের সহিত সৌসাদৃশ্য নাই। ইহাতে ব্যাঘ্রের মুখ তক্ষিত ছিল, মসজিদে তাহা থাকিতে পারে না, সে জন্য তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে পূর্ব্ব লিখিত কালপাথরের চৌকাট ও এই প্রস্তর স্তম্ভ এবং ক্ষোদিত ইঁট কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী কোনও বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম বা স্থানীয় কোনও রাজার ভগ্ন গৃহ হইতে এই সব উপকরণ পাওয়া গিয়া থাকিতে পারে। সেকালে রেল হয় নাই, ভারি মাল স্থানান্তরে লইয়া যাওয়ার মত ভাল পথও ছিল না। নদীপথে গমনাগমন ও দ্রব্যাদি বহন প্রচলিত ছিল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বসিরহাটের এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়। কাজেই সে সময়ে নদীপথে বসিরহাটের দক্ষিণে অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চল অবনমিত না থাকিলেও সে অঞ্চলে এমন কোনও লোক বাস করিতেন বলিয়া কোনও কিংবদন্তিও শুনা যায় না যাঁহার ভগ্নগৃহ হইতে উল্লিখিত স্তম্ভাদি সংগৃহীত হইতে পারে। নদী পথে উত্তর দিকে গেলে যমুনাতীরবর্ত্তী গোবরডাঙ্গার নিকট বোধখানা ও বিদ্যানন্দকাটীতে বৌদ্ধদের বাস ছিল বা ভৈরবনদ তীরে বারবাজার সমতটের রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমিত হইলেও (১) তাহা কত যুগ পূর্ব্বের কথা তাহা নির্ণীত হয় নাই। বিশেষতঃ ঐ সকল স্থান আজও খনিত হয় নাই। কাজেই নিঃসংশয়ে—কোনও কথা বলা যায় না। তবে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে নদীপথে প্রায় ১৫০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে বসিরহাটের মসজিদের উপকরণ সংগ্রহ হইয়াছিল ইহা সম্ভবপর নয়।

(১) যশোহর-খুলনার ইতিহাস—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র পৃ—২০২ ও ১৯৮।

অপর পক্ষে জানা যায় যে পাঠানগণ যখন প্রথম এ অঞ্চলে আসেন তখন পীর গোরাচাঁদ নামে একজন পারাক্রান্ত নেতা হিন্দু রাজা চন্দ্রকেতুর সহিত যুদ্ধ করেন, এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া নিজের প্রাধান্য স্থাপন করেন। চন্দ্রকেতু প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। ইনি বিখ্যাত বাঙ্গালী জ্যোতির্ব্বিদ মিহির ও তাঁহার স্ত্রী ক্ষমাবতীর (খনা) প্রতিপালক ছিলেন। তাঁহার গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ আজও বসিরহাট হইতে আন্দাজ ২০।২৫ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ বেড়াচাঁপা ষ্টেসনের এক ক্রোশ দক্ষিণে সদর রাস্তার পার্শ্বে দেখা যায়। বসিরহাট মস্‌জিদের উপকরণ এই হিন্দু রাজার ভগ্ন মন্দির হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল কিনা তাহা ভবিষ্যতে প্রত্নতত্বানুসন্ধিৎসুগণ স্থির করিবেন; তবে বসিরহাটের এত নিকটে কোন বর্দ্ধিষ্ণু রাজার ভগ্নগৃহাদি থাকায় এবং তাহার নিকটেই পীর গোরাচাঁদের আস্তানা থাকায় ও উত্তর এবং পশ্চিম হইতে আগন্তুকদের এই পথে আসিতে হয় বলিয়া এ সংবাদ বসিরহাটের মস্‌জিদ নির্ম্মাণকারকদের জানা সম্ভবপর মনে করিয়াই এই অনুমান করা যাইতেছে মাত্র। শুনিয়াছি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট চন্দ্রকেতু রাজার বাড়ী ভগ্নস্তূপ রক্ষিত-স্মৃতি-মন্দির-আইনের (Preserved Monuments Act) আমলে আনিয়াছেন, এবং প্রত্নতত্ত্ববিভাগ উহার খনন কার্য্য শীঘ্র আরম্ভ করিবেন। আশা করা যায় তখন এতদঞ্চলের অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত হইবে।*

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

সমালোচনা

"সুদুর্লভাঃ সর্ব্বমনোরমা গিরঃ"

মাসিক সাহিত্য

ভারতী,—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

লীলাধারী। শ্রীমতী সরলাদেবী। কবিতা। ১৬ লাইন। সাহিত্য এবং রাজনীতি-ক্ষেত্রে সরলা দেবীর নাম—বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর পরেই উল্লেখযোগ্য। পরিণত জীবনে—কর্ম্মক্লান্ত জীবনে—সকলেরই সেই এক দশা—সেই এক-মুখী গতি। সময় আসিয়াছে—দিনের আলো ক্রমেই পশ্চিমে হেলিয়া পড়িতেছে—তাই চিন্তাশীলা লেখিকা "লীলাধারীর" লীলাস্মরণে কবিতা লিখিতে বসিয়াছেন। —ইহার চারিটি পঙ্‌ক্তি বড়ই ভালো লাগিল,

* '১৯২৩ সালে আর্কলজিক্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ দিক্ষিত মহাশয়ের সহিত আমরা এই স্তূপ দেখিতে গিয়াছিলাম।' মিঃ দিক্ষিতের মতে গবর্ণমেণ্টের এই অর্থদৈন্যের দিনে এই স্তূপ খনন করিবার আবশ্যকতা নাই।

"যাতনা, ভাবনা, সুখের বেদনা,
অশুদ্ধি, শুদ্ধি, সকলি তোমার!
কোন্ সুচরিতে পূজিব তোমায়
চুমিয়া চরণ বঁধুয়া আমার!"

পড়িতে পড়িতে অমর বৈষ্ণব কবিতার স্মৃতি মনে জাগে। তবে ভাবাংশ বাদ দিলে কবিতা হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করা যায় না। বোধ হয়, বিদুষী লেখিকা গদ্যে লিখিলে এই ভাবগুলি আরও মনোহর রূপে ফুটিয়া উঠিত।

"ভিক্ষা"—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। একটি উপাদেয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। জানিবার এবং শিখিবার অনেক তথ্য ইহাতে পাওয়া যায়। কবিবর রবীন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম ৬৫ বৎসর। তন্মধ্যে "৫৫ বৎসর" তিনি (অর্থাৎ দশবৎসর বয়স হইতে) "সাহিত্যের সাধনা করে সরস্বতীর কাছ থেকে যা-কিছু বরলাভ" করেছেন "সমস্তই বাংলা দেশের ভাণ্ডারে জমা করে" দিয়েছেন। প্রবন্ধের এক স্থলে শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন প্রসঙ্গে কবীন্দ্র ব্যথিত হৃদয়ে বলিতেছেন—"অনেকদিন আমি বাঙালীর ছেলেকে এই আশ্রমে মানুষ করেচি—কিন্তু বাংলা দেশে আমার সহায় নাই।" কবির এই মর্ম্মধ্বনি বধির বাংলার কাণে পৌছিবে কি? প্রবন্ধটি সকলেরই পড়া উচিত।

সঙ্গীত কি তুচ্ছ জিনিষ?—বীরবল। "ডেকান কোকিল" শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর "এদেশে সঙ্গীত নিয়ে যে মারামারি উপস্থিত হয়েছে, সে ব্যাপারটি অতি তুচ্ছ"—এই কথার বীরবলী প্রতিবাদ। পাড়তে বসিয়া হাসিতে হাসিতে প্রাণান্ত হয়। এমন নির্ঘাত ও নির্ম্মম কশা-ক্ষেপ এক বীরবলের হাতেই শোভা পায় এবং সম্ভব। বর্ত্তমান বাদ্যবিরোধের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বীরবল যেসব সুন্দর সুন্দর উক্তি করিয়াছেন, তার প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিই বাঙালীর পাঠ্য, হিন্দু-মুসলমান সবারই প্রণিধান-যোগ্য "শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য"।

মাসিক বসুমতী,—আষাঢ়, ১৩৩৩

অভাগা (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। কবি কুমুদরঞ্জনের—"মাঝি, তরী হোথা বাঁধবো নাক আজকের সাঝে" সঙ্গীত আজ বাংলার নিরক্ষর দাঁড়ি মাঝিরাও বর্ষার সন্ধ্যায় গাইতে গাইতে নৌকা বাহিয়া যায়, ঐ একটা গানই কবিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। অদ্যকার এই "অভাগা" সেই কবিরই ঝঙ্কার। পড়িতে পড়িতে হৃদয়ের কম্পন মুন্দীভূত হইয়া আসে। যে অভাগা, তার ভাগ্যে সবই বিপরীত। তার "হীরের বদলে মেলে জিরে," চায় যদি সে জল, পায় আগুন।—

"পাকা ধানে কে এসে তার
　মই দিয়ে দেয় ত্বরিতে,
সপ্তমীতে ঠাকুর ভাঙ্গে
　পায় না সময় গড়িতে।
দুর্ঘটনা তাহার মিতা
　জীবন ব্যাপি সাজায় চিতা
　　জল বদলে আগুন মেলে
　　বরুণদেবে বরিতে।"

*　　*　　*　　*　　*

"ভবনে তার আগুন লাগে
সাঁজের প্রদীপ জ্বালিতে।
ঝলসি যায় ফুলের বাহার
মুকুল ধরা গাছ ভাঙে তার,
দিন দুপুরে সূর্য্য লুকায়
মেঘের কাল কালীতে॥"

কবিতাটি পড়িবার কালে সাধক কবি নীলকণ্ঠের—"হরি, তুমি দুখ দাও যে জনারে"—গানটি মনে পড়ে।

বর্ষায় (কবিতা,)—শ্রীকালিদাস রায়। একটি অনুপম কবিতা। কবির উন্মাদনা, বর্ষার ধারা-সিক্ত প্রকৃতিরাণীর অপূর্ব্ব বেশ দর্শনে কবির আত্মবিস্মৃতি আজ যে কি মধুর বেশে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা এই কবিতার প্রতি পঙ্‌ক্তিতে জাজ্বল্যমান। যেমন ভাব তেমনই ভাষা। বর্ষার কূলপ্লাবিনী তটিনীর ন্যায় নাচিতে নাচিতে, দুলিতে দুলিতে কবির কল্পনা অবাধভাবে ছুটিয়াছে। কবির কল্পনা-মন্দাকিনী লহরে লহরে ছুটিতেছে আর তাই দেখিবার জন্য সত্যই যেন—

"করি স্নান-শেষ পরি রাণী-বেশ ধূপধূমে কেশ খুলি'
কেতকীর রজে তনুখানি মেজে শোভে বন বধূ গুলি।
দিগ্‌ বালিকার লীল-শালিকায় বলাকা-মালিকা দুলে,
সর্জ্জকাননে নির্জ্জনবনে কলতান তারা তুলে।
ত্যজি ফুলধনু ধরি জলধনু স্মর ধারাশর হানে
ত্যজি ধূলিভার ফুল-রেণু হার সমীরণ বহি আনে!"

কবির চক্ষে আজ সর্ব্বত্রই আনন্দ, সর্ব্বত্রই উল্লাস। প্রকৃতির এই মধুময় মুহূর্ত্তে কবি পাগল হইয়া বলিতেছেন—

"কবি, ধর গান মল্লারতান উল্লোল বরষায়,
ভামিনীরা আজ মানিনী থেক না শুভখণ বয়ে যায়।
ঢালো গ্রামবধূ কাজরীর মধু সুরট-পুরট জুটে।
নাগর জীবন নিগড়ে বেঁধেছ কে আজ' সৌধ-কূটে!"

আনন্দবিহ্বল কবি হাতছানি দিয়া সকলকে ডাকিতেছেন, যে যেখানে আছ, এস, ছুটিয়া এস, মাহেন্দ্রক্ষণ বয়ে যায়, এমন সময়ে, এমন অমৃতযোগে কেহ অলস থেকোনা, ছুটিয়া এস—

"এস আশাভরে আষাঢ়-বাসরে কাজ লাজ সাজ ফেলি,'
পুর-কামিনীরা সুরতটিনীতে করে আজ জলকেলি।
লীলাতরঙ্গে ধারা সঙ্গমে জড় জঙ্গমে ছুটে,
বরষা আজিকে হরষ ছড়ায় সবে এসে লও লুটে॥"

কবির এই বর্ষা-উন্মাদ সার্থক হউক, বঙ্গভারতীর কণ্ঠে চিরদিন অম্লানপঙ্কজ মালিকার মত দোদুল্যমান থাকুক।

ভারতবর্ষ,—আষাঢ়, ১৩৩৩।

সুর-ভোলা (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুখ-স্বপ্নের ন্যায় মধুর, প্রভাত সমীরের ন্যায় তৃপ্তিকর ও বাসন্তী প্রকৃতির ন্যায় উন্মাদক। পড়িতে পড়িতে অতিবড় পাষাণেরও আত্মবিস্মৃতি ঘটে, জমীদারের নিকাশনবীশেরও প্রাণে সরসতা আসে। বীণাপাণিকে ডাকিয়া কবি কহিতেছেন :—

"তোমার বীণা আমার মনো মাঝে
কখনো শুনি, কখনো ভুলি, কখনো শুনি না যে।"
* * * * *
হে বীণাপাণি তোমার সভাতলে
আকুল হিয়া উন্মাদিয়া বেসুর হায় বাজে;
—কখনো শুনি, কখনো শুনি না যে॥"

কালিদাসের কবিতার মত যত পড়া যায়, ইহা ততই যেন মধুর! এই একটি কবিতাতেই আমাদের ভারতবর্ষ সার্থক হইয়াছে। বাঙ্গালীর স্পর্দ্ধা বিশ্বের গৌরব রবীন্দ্রনাথের কল্পনার অক্ষয় বটমূলে—আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি।

লক্ষহীরা,—এক দৃশ্যে সম্পূর্ণ কথানাট্য, শ্রীমন্মথ রায় এম, এ। লেখকের নিশ্চয়ই একটা-না-একটা উদ্দেশ্য আছে, নতুবা লিখিবেন কেন? কিন্তু সাধারণ পাঠকে তাহা বুঝিবে না। তবে অসাধারণ পাঠকও ত আছে, সেই যা ভরসা। এরূপ বিলেতী উদ্গার,—না, বিলেতী নয়, তা'হলেও কতক মানাইত, এরূপ এডেন-মেসোপটামিয়ার উদ্গারে ভারতবর্ষের অঙ্গ কেন বিড়ম্বিত হইল, বুঝিলাম না।

সমাধিস্থ—শ্রীনির্ম্মল দেব। ছোট একটি গল্প। মন্দ নহে। শরচ্চন্দ্রী ধাঁচে গড়া, তবে সে কৃষ্ণনগরের কারিগরের ত্রিসীমায়ও পৌঁছায় নাই; ভাষার দিকে অত নজর দিলে জমে না। লেখক—দেখিবেন, শরচ্চন্দ্রের ও-রোগ আদৌ নাই। যেমনটি হয়, যেমন আমরা বলাকহা করি, তিনি ঠিক তেমনই বলেন, লেখেন; তাই আজ তিনি বাঙ্গালীর গৃহদেবতার ন্যায় ঘরে ঘরে বিরাজমান। নির্ম্মলদেব গল্পনায়কের মুখ দিয়া তদীয় বিবাহের বর্ণন করাইতেছেন—"যখন আমার বিয়ে হ'য়েছিল, তখন আমার বয়স তেইশ বছর। তার আগে কোন দিন আমার প্রাণের চোখ দিয়ে কোনো নারীর পানে চাইনি!"—বলিতে বলিতেই দামোদরের বান আসিল,—নায়ক বলে যাচ্ছেন—"সেই একদিন দীপালোকিত উৎসব-রাতে সপ্ত আয়তির কলহাস্যকুহরিত ছালনা তলায়"—ইত্যাদি। বলিহারি! "কলহাস্য কুহরিত" জিনিষটা কি? এইরূপ অস্থান পাত, অনবীকৃততা, গ্রাম্যতা প্রভৃতি নানা দোষের দৃষ্টান্ত খুঁজিতে যাঁরা চান, তাঁরা এই গল্পটি পড়ুন। গল্পটার কোনোই উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

আর্থিকউন্নতি—১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩.
সম্পাদক—শ্রীবিনয়কুমার সরকার

বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে এইরূপ একখানি মাসিক পত্রের বড়ই আবশ্যকতা হইয়াছিল। অধ্যাপক বিনয়কুমারের কৃপায় সে অভাব পূরণ হইল। ইন্‌ফরমেশনের তিনি বিরাট জাহাজ। তাঁহার লেখায় বাজে কথা নাই। সবটুকুই শিখিবার জানিবার। "অলস অঙ্গ শিথিল কবরী"র দিন আর নাই। এখন "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—র দিন আসিয়াছে, এসময়ে এইরূপ সঙ্কেতবহুল পত্রের অতীব প্রয়োজন। বিনয়কুমার বঙ্গভাষার একটা বিরাট দৈন্য দূর করিতে বসিয়াছেন, এজন্য শতধা ধন্যবাদার্হ।

বর্ত্তমান সংখ্যায় ৮৯টি পৃষ্ঠা, ইহার প্রতি পৃষ্ঠাই অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। "বাংলার সম্পদ" অধ্যায়টি দীনহীন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বাঁধাইয়া রাখার ও দৈনিন্দন পাঠের উপযুক্ত। বারান্তরে এই পত্রিকার সবিস্তার আলোচনার বাসনা রহিল।

প্রবাসী,—আষাঢ়, ১৩৩৩।

জন্মদিনে – শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। "১৩৩৩ সালের ২৫শে বৈশাখ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ।"

কবিবর রবীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতারপ্রতি পঙ্‌ক্তিতেই প্রায় তাঁহার "বেলা শেষের গানের" সুর বাজিতেছে। কবিবর নবীনচন্দ্রের "এই তীরে সন্ধ্যা উষা অন্য তীরে মুগ্ধকরী" কবিতার মত, রবীন্দ্রনাথের এই গদ্য কবিতা পড়িবার কালে অনেকেরই মনে জাগে "সাম্‌নে আর কিছু নেই," "দিন শেষ হ'য়ে এল।"

উচ্ছল ভাবাবেগে "মুখর কবি"—যখন জীবনের একটা মধুর ক্ষণ স্মরণে উন্মত্ত হইয়া বলিতেছেন,—

"কি আনন্দ ছিল, আমার সঙ্গে আমার চারিদিকের যোগে। আমার সেই ঘরের সাম্‌নে নারিকেল বৃক্ষের শ্রেণী, শরতের আলোতে তার পল্লবের ঝালর ঝলোমলো; শিশিরসিক্ত তৃণাগ্রগুলির পরে প্রভাত সূর্য্যের কিরণ বীণাতন্ত্রীতে সুরবালকের আঙ্গুলের স্পন্দনের মতো। এই শ্যামলা ধরণী, এই নদী, এই প্রান্তর, অরণ্যের মধ্যে বিধাতা আমাকে অন্তরঙ্গতার অধিকার দিয়েছেন, এর মধ্যে নগ্নশিশু হ'য়ে এসেছিলুম। আজও যখন দৈববাণী অনাহত সুরে আকাশে বাজে, তখন সেদিনকার সেই শিশু জেগে ওঠে, শিশু জেগে উঠে বল্‌তে চায় কিছু, সব কথা বলে উঠ্‌তে পারে না।"—কবির তখনকার দিব্য হৃদয়ের ভাস্বরতার সম্মুখে মস্তক আপনিই নত হইয়া আসে, কবিকে শত নমস্কার না করিয়া থাকা যায় না। এমন সুন্দর লেখা, এমন মধুর উক্তি, এমন স্বর্গীয় কুসুমের একাবলী কণ্ঠি পরিয়া বঙ্গভাষা কত গৌরবেই না শোভা পাইতেছেন, এবং আমাদের—কবির স্বজাতির—এই শ্লাঘায় হৃদয় ভরিয়া যাইতেছে।

বৈকালী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিতা। যত পড়া যায়, এই কবিতা ততই রমণীয়, রমণীয়তর, ক্রমে রমণীয়তম মনে হয়, যাহা রমণীয়, তাহা প্রতিক্ষণেই নবীন, চিরদিনই নূতন। কবীন্দ্রের এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত সেই হিসাবে রমণীয়। ইহার জোড়া নাই। মাঘ কবি রমণীয়তার রূপ নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতামুপৈতি
তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ"—

মহাকবি মাঘের এই ভক্তির প্রকৃত মর্ম্ম, প্রকৃত দৃষ্টান্ত মহাকবি রবীন্দ্রনাথের এই বৈকালীর প্রতিচরণে দেদীপ্যমান। কবির—

"চপল তব নবীন আঁখি দুটী
সহসা যত বাঁধন হতে
আমারে দিল ছুটী।"

কবিতার আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠে, ভাষায় সে ভাব ব্যক্ত করিবার ভাষা বা সামর্থ্য দীনহীন সুদর্শনের নাই।

তৃষিত আত্মা—শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত। (গল্প)—বাড়ীর কর্ত্তা সীতাপতি হঠাৎ মারা গেলেন, বোধ হয় সন্ন্যাসরোগে। পত্নী, একপুত্র, পুত্রবধূ লক্ষ্মী এবং তার এক কচি ছেলে এই রইল সংসারে। লক্ষ্মীর ভূতের ভয়ে,—না,—কি জানি কিসের ভয়ে সর্ব্বদাই গা ছম্ ছম্ করে, কত-কি সে দেখে,—আঁধারে ত কথাই নাই, আলোতেও ছায়ার মত কত-কি তার চোখের সাম্‌নে বিকটভাবে ভাসে,—শিশুটি শুকাইতে শুকাইতে তৃণের

মত হইয়া গেল, এবং শেষে হঠাৎ একদিন মারা গেল। সকলেই বুঝিল—বুঝি মৃত ঠাকুরদাদার আত্মা তাহাকে দুঃখিনী মার বুক হইতে ছিনাইয়া লইল। সবাই দেখিল "নিঃশেষিত-তৈল শিশুদীপটি নিভিয়া গেল।" আ মরি! কি অলঙ্কারের ঝমঝমানিরে! এই হইল গল্পের কল্পিত প্রতিপাদ্য। এরূপ মাথামুণ্ডু ছাপিবার কোনো প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা অন্দরে মানায় তাহাই যে বাহিরেও মানাইবে, এমন কোনো আইন নাই। লেখকের ভাষায় আধিপত্যের একান্ত অভাব।

আলো ও ছায়া—শ্রীপরেশনাথ চৌধুরী, কবিতা, ৩২টি চরণ চারিটি ভাগে বিভক্ত। কবিতার নামটি যেমন সুকবি কামিনী রায়ের নিকট হইতে নেওয়া,—কবিতায় যা-এক-আধটু ভাবের স্ফুরণ আছে বলিয়া মনে হয়, তাহাও তেমনি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাব-সম্পদের পরিত্যক্ত অংশের রোমন্থন। তারপর ছন্দের ত কথাই নাই। যথা—

"আজিকে বরষার তমসায়
বিজলী গেল হেনে বারে বারে"

*

"ছেয়েছে বাদলের বেলাশেষ
রোদন সাথে আর গীতরেশ।"

পাঠকগণ মানে বুঝিতে চেষ্টা করুন। চৌধুরী মশায় এইবার গদ্য ধরুন, হয়ত স্মরওয়ালটারাস্কট হইয়া যাইবেন।

বাদুড়-বৌ—(কবিতা) শ্রীসুনির্ম্মল বসু,। কুড়ি লাইনের একটি পরম উপভোগ্য কবিতা। বহুকাল এরূপ কবিতা পড়ি নাই।

রবীন্দ্রনাথের সেই

"আজ আমাদের ছুটিরে ভাই
আজ আমাদের ছুটি।"

এবং কবিবর নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের পরম সুহৃৎ শিশুপাঠ্য কবিতা-পুস্তক প্রকাশক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের—

"আকাশ সেথা সবুজবরণ গাছের পাতা নীল,
ড্যাঙ্গায় চরে রুই কাত্‌লা জলের মাঝে চিল।"

*　　*　　*

"কচুড়ি আর রসগোল্লা ছেলে ধরে খায়,
জিলেপি যে তেড়ে এসে কামড় দিতে চায়"

প্রভৃতি কবিতার পর এ ধরণের লেখা এই প্রথম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবিতার বিষয়টিও বেশ। গুবরে পোকার বড় সাধ বিয়ে কর্‌তে, কিন্তু মনের মত কনে জুট্‌ছে না। "গঙ্গা ফড়িং তিড়িং তিড়িং" লাফ মেরে ঘটকালিতে বেরুলো এবং অনেক খুঁজে এক সম্ভ্রান্ত বাদুড় পরিবারের মেয়ে যোগাড় কর্‌লে। কতকটা না তুল্লে ক্ষোভ মিট্‌ছে না—

"তুবড়ো মুখো গুব্‌রে পোকার সাধ হলে যে কর্‌বে বিয়ে,
ঠিক হোলো সব, ঠেক্‌ল শুধু মনের মতন পাত্রী নিয়ে।

অ্যাং এর মেয়ে ব্যাং এর মেয়ে নিজের চোখেই দেখ্‌লে কত ;
বোঁচ্‌কা বোঁচা হাড়গিলে সব,—কেউ হোলো না মনের মত।"

* * *

তারপর ঘটকরাজ গঙ্গা ফড়িং এক বাদুড় দুহিতা এনে হাজির কর্‌লো। বিয়ের মস্ত জাঁক, বিরাট আসর, যথা—

"বিয়ের রাতে আসর উজল—জোনাক-পোকা জ্বালায় বাতি,
ধর্‌ল ছুঁচো বরের মাথায় মস্ত বড় ব্যাঙের ছাতি।
ঝিঁঝিঁর দলে ঝাঁঝর বাজায়, ওস্তাদী গায় ভোম্‌রা গুলো,
নাচ জুড়েছে ড্যাং ড্যাঙা ড্যাঙ্‌ ঠ্যাং তুলে ব্যাং গালটি ফুলো,"

এবং বরের মামা নেংটি ইন্দুর তার লম্বা গোঁফে চাড়া দিচ্ছে। অন্দরে বাড়ীর মেয়ে আরশোলারা শাঁক বাজাচ্ছে, ছাদনাতলায় টিক্‌টিকিতে বরকে মন্ত্র পড়াচ্ছে. এর মধ্যে হঠাৎ বেজায় গোল উঠ্‌লো,—ফুড়ুৎ করে করে কনে উড়ে পালালো।—তখন—

"ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌ কোথায় গেল, ছুটলো সবাই কনের পাছে,
দেখ্‌লো খুঁজে ঝুল্‌ছে কনে ক্যাওড়াতলার শ্যাওড়াগাছে।"

কবি সুনির্ম্মলের এ নির্ম্মল কবিতার স্রোত যেন ব্যাহত না হয়।

বৌদ্ধ ভারত

কহিলেন শাক্যমুনি, "যাও বৎসগণ!
দিকে দিকে সত্যধর্ম্ম কর বিতরণ ;
অজ্ঞান মোহান্ধ জীব ধরণীর বুকে
দিক্‌হারা, যাপে দিন জরামৃত্যুদুঃখে।"
সম্ভ্রমে উঠিল রাজা সিংহাসন ছাড়ি,
খুলিল ভাণ্ডার দ্বার ; শ্রেষ্ঠী তাড়াতাড়ি
আনি দিল রত্নধন ; শ্রদ্ধা-অবিচল
দিল গৃহী পুত্রকন্যা জীবন সম্বল।
দলে দলে ভিক্ষুদল লঙ্ঘিল পর্ব্বত,
দলিল তুষার ব্রজ। সেদিন ভারত
যে দৃশ্য দেখালে তুমি—পুণ্য অভিযান
সাম্য মৈত্রী করুণার—সেই গরীয়ান
অপার্থিব ইতিহাস মহৈশ্বর্য্যময়
আজও মানুষের বুকে জাগায় বিস্ময়!

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

হিন্দুরাষ্ট্রের সরকারী গৃহস্থালী

আয়ব্যয়ের মোসাবিদা

(১)

আজকালকার দিনে, কি পল্লী-শাসনে, কি নগর-শাসনে, কি দেশ-শাসনে প্রথম ধান্ধাই "বাজেট" বা আনুমানিক আয়ব্যয়ের মোসাবিদা। সারাবৎসর ধরিয়া নানা খাতে খরচ হইবার সম্ভাবনা কত আর দফায় দফায় আদায়, আমদানি বা আয় ঘটিবে কত তাহার আলোচনা করা বর্ত্তমান জগতের শাসন-নীতির গোড়ার কথা।

আর এই "বাজেটে"র উপর দখল থাকাই বর্ত্তমানকালে স্বরাজ বা আত্মকর্তৃত্ব বা ডেমোক্রেসির প্রধান লক্ষণ। পল্লীর, নগরের এবং দেশের সরকারী রাজস্ব এবং খরচ-পত্রের উপর একতিয়ার যে-সকল নরনারীর নাই তাহারা স্বরাজবিহীন এবং পরপীড়িত লোক। ভারতেও এইরূপ চিন্তাধারা সুপ্রচলিত।

(২)

কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার কথা এই যে,—বাজেটের উপর জনসাধারণের দখল বা সমালোচনার অধিকার জগতে দেখা দিয়াছে উনবিংশ শতাব্দীতে। এমন কি "বাজেট" তৈয়ারি করাটা অর্থাৎ সারা বৎসরের ভিতর রাজ্যের আয় কতখানি আর ব্যয়ই বা কতখানি হইবার সম্ভাবনা সেই বিষয়ে একটা মোটামুটি আন্দাজ করিবার ব্যবস্থাটা ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বে ইয়োরোপে জানাই ছিল না।

ফরাসী রাজস্ব-বিজ্ঞানবিৎ লরোআ-ব্যোলিয়্যো তাঁহার "ত্রেতে দ'লা সিয়াঁস্ দে ফিনাঁস" অর্থাৎ "সরকারী আয়ব্যয় বিষয়ক বিজ্ঞান" নামক গ্রন্থে (প্যারিস ১৯১২) এই সম্বন্ধে ইয়োরোপের তরফ হইতে ঐতিহাসিক ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ইংরেজ ধনবিজ্ঞানবিৎ প্যলগ্রেহ্ব সম্পাদিত "ধনবিজ্ঞানের বিশ্বকোষ" গ্রন্থেও এই বিষয়ে নানা তথ্য সঙ্কলিত আছে। জানা যায় যে, বাজেট তৈয়ারি করা নেপোলিয়নের অন্যতম প্রথম কৃতিত্ব। ফরাসীদেশে নেপোলিয়নের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বৎসর বৎসর সরকারী আয়ব্যয়ের আনুমানিক ফর্দ্দ তৈয়ারী করা হইয়া আসিতেছে।

(৩)

প্রাচীন গ্রীসে অথবা রোমাণ সাম্রাজ্যে বাজেট তৈয়ারী করা হইত কিনা সন্দেহ। এমন কি সেকালে ইয়োরোপের কোন্ রাষ্ট্রে প্রতি বৎসর কত আয় হইত আর কত খরচ হইত সে কথাও জানা যায় না। জার্ম্মাণ পণ্ডিত শ্যেমান তাঁহার "গ্রীক পুরাতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, আথেন্সের সরকারী আয়ব্যয় মাপিবার চেষ্টা বর্ত্তমান কালে করা হইয়াছে। জার্ম্মাণ

পণ্ডিত ব্যেখ এইদিকে মাথা খেলাইয়াছিলেন। আথেনীয় রাষ্ট্রের সরকারী খরচের মাত্রা বুঝিবার জন্যই ব্যেখ বিশেষ চেষ্টা করেন।

রাজস্ব-বিজ্ঞানের তরফ হইতে রোমাণ সাম্রাজ্যেরও যাচাই করা হইয়াছে। ইংরেজ ঐতিহাসিক গিবন এবং ফরাসী রাষ্ট্রতাত্ত্বিক গীজো এই বিষয়ে মাথা খেলাইয়াছেন। তাঁহারা রোমাণ সাম্রাজ্যের সকলপ্রকার আদায়ের মোট পরিমাণ আন্দাজ করিতে সচেষ্ট ছিলেন। রামজে প্রণীত "রোমাণ প্রত্নতত্ত্ব" গ্রন্থে অঙ্কগুলা দেওয়া আছে।

প্রত্নতত্ত্ব ও রাজস্ববিজ্ঞান

এই সকল হিসাবপত্র আলোচনা করিবার দরকার নাই। অঙ্কগুলা নানা পণ্ডিতের হাতে নানা পরিমাণে দেখা দিয়াছে। এইটুকু বুঝিয়া রাখা আবশ্যক যে, হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন বুঝিবার জন্যও এই ধরণের অঙ্ক কষিয়া ঠাওরাইবার দিকে প্রয়াস চলিতে পারে। অবশ্য ভারতীয় রাষ্ট্রশাসন সম্বন্ধে নিরেট তথ্য আজও এত কম যে, এই বিষয়ে অনুমান চালাইতে যাওয়া বর্ত্তমানে বিড়ম্বনা মাত্র।

রাজস্ববিজ্ঞানের তরফ হইতে হিন্দুরাষ্ট্রের যাচাই সুরু হইবামাত্র আর কয়েকটা কথা সর্ব্বদাই মনে আসিবে। সরকারী আয় সম্বন্ধে প্রতি পদেই জিজ্ঞাস্য,—অমুক অমুক আদায়গুলা "ন্যায়সঙ্গত" কিনা। আবার জিজ্ঞাস্য,—জনগণের খাজনা দিবার ক্ষমতার সঙ্গে সরকারী আদায়গুলার পরিমাণ খাপ খায় কিনা। আরও জিজ্ঞাস্য,—এই সকল খাজনার প্রভাবে দেশের আর্থিক অবস্থায় উন্নতি ঘটিতেছে কি অবনতি ঘটিতেছে,—ইত্যাদি।

হিন্দু রাষ্ট্রগুলাকে এই ধরণের কৈফিয়তের আওতায় আনা এখনো বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু সেই দিকে নজর রাখিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে! রূপ-তত্ত্ব ("মর্ফলজি") বা গড়নের হিসাবে হিন্দু "সপ্তাঙ্গের" "কোষ" বিভাগের উপর বৈজ্ঞানিক আলোক ফেলা অন্য কোনো উপায়ে সম্ভব নয়। যতদিন পর্য্যন্ত এই সকল সমস্যা, সমালোচনা এবং তর্ক-প্রশ্ন হিন্দুরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আলোচনা হইতে দূরে থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত এই আলোচনা "প্রত্নতত্ত্বের" গণ্ডীতেই আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য।

হর্ষবর্দ্ধনের "সাম্রাজ্যিক গৃহস্থালী"

হর্ষবর্দ্ধনের চীনা অতিথি য়ুয়ান-চুআঙ্ তাঁহার "সি-য়ু-কি" গ্রন্থে আর্য্যাবর্ত্তের সার্ব্বভৌমের "সরকারী গৃহস্থালীর" পরিচয় দিয়াছেন। রাজ-সরকারের আয়ব্যয় সম্বন্ধীয় কারবারকে জার্ম্মাণ ভাষায় "ষ্টাট্‌স্-হাউসহাল্ট" বা "সরকার গৃহস্থালী"ই বলে। রাজা বাদশার "পারিবারিক" গৃহস্থালী স্বতন্ত্র বস্তু।

(১)

যুয়ান-চুআঙের কথায়,—ভারত-সরকার কোন লোককে জোর জবরদস্তি করিয়া "বেগার" খাটাইত না। সরকারী কাজের জন্য লোক বাহাল করা হইত এবং দস্তুর মতন মজুরি দেওয়াও হইত। বুঝিতে হইবে যে,—হর্ষবর্দ্ধনের আমলে (৬০৬-৬৪৭ খৃঃ অঃ) শারীরিক পরিশ্রম বা গতর খাটানো "কর" স্বরূপ ব্যবহৃত হইত না। সরকার খাজনা আদায় করিত অন্য উপায়ে।

সরকারী জমি জমা বা খাশ মহাল যাহারা চষিত তাহারা ফসলের ষষ্ঠাংশ সরকারকে দিত। এই ষষ্ঠাংশই ছিল রাষ্ট্রের পাওনা। কিন্তু যাহারা নিজ নিজ জমি চষিত তাহারা কত হারে সরকারকে কর দিত? এই বিষয়ে যুয়ান-চুআঙ্ কিছু বলেন নাই।

নদী পারাপারের জন্য সরকার প্রত্যেক পথিকের নিকট হইতে সামান্য কিছু আদায় করিত। আর, সড়কে চলাফেরার জন্যও পথিকেরা কিছু কিছু কর দিতে বাধ্য ছিল।

ব্যস। যুয়ান চুআঙ্ হিন্দু সার্ব্বভৌমের বাদশাহী জমার খাতায় আর কোনো দফা লক্ষ্য করেন নাই।

(২)

সাম্রাজ্যিক খরচপত্র সম্বন্ধে "সি-য়ু-কির" তথ্যগুলা উল্লেখ করা যাউক। চার প্রকার ব্যয়ের নাম দেখিতে পাই।

সরকারী শাসন চালাইবার জন্য এবং পূজাপাঠের ব্যবস্থা করিবার জন্য খরচ উল্লিখিত হইয়াছে প্রথম।

দ্বিতীয় বাবদ দেখিতে পাই অমাত্য এবং শাসনাধ্যক্ষদের "ভাতা"।

নামজাদা লোকজনকে "বৃত্তি" দেওয়া ছিল সরকারী খরচের তৃতীয় বিভাগ।

আর ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য দান খৈরাতকে চতুর্থ দফা রূপে বিবৃত করা হইয়াছে।

যুয়ান-চুআঙের রিপোর্ট

(১)

মোটের উপর "সি-য়ু-কির" মত এই :—হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যে লোকেরা খাজনা দিত কম হারে, আর বিনা মজুরিতে গতর খাটানো এক প্রকার অজ্ঞাত ছিল।

কথাটা শুনায় ভাল। কিন্তু এই হর্ষবর্দ্ধনই না দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের সার্ব্বভৌম হইয়াছিল? "সার্ব্বভৌমিক শান্তি" বা বিশ্ব-শান্তির বাহন স্বরূপ দুই লাখেরও বেশী ফৌজ না এই হর্ষবর্দ্ধনের স্থায়ী পল্টনের অঙ্গ ছিল? পল্টনের খোরপোষ চলিত কি খাশমহালের ষষ্ঠাংশের জোরে আর পথ-কর ও ফেরি আদায়ের কল্যাণে?

সাম্রাজ্যের অন্যান্য বিভাগের কথা না পাড়িয়াও এক মাত্র এই প্রশ্ন হইতেই সন্দেহ করা চলে যে যুয়ান-চুআঙ রাজস্ব-বিজ্ঞান বুঝিতেন না। তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন "বুদ্ধতীর্থে"।

ধর্ম্মকর্ম্ম ছিল তাঁহার বিশেষত্ব। এই সব তিনি বুঝিতেন সন্দেহ নাই,—তবে সবই "বৌদ্ধ চোখে।" যাহা হউক,—অন্যান্য যাহা কিছু চোখে দেখিয়া হাতেপায়ে মাপিয়া সহজে গুণিয়া বুঝা যায় ভারতীয় জীবনধারার সেই সকল তথ্যও হয়ত তাঁহার পর্য্যটন কাহিনীতে মোটের উপর নির্ভুলই পাইতে পারি।

কিন্তু শাসন-যন্ত্রের খুঁটিনাটি বুঝিবার দিকে ঝোঁক তাঁহার ছিল না। এই দিকে তাঁহার ক্ষমতাও ছিল না। তিনি ভারতে "ডিগ্রী" লইতে আসিবার পূর্ব্বে স্বদেশে যে সকল বিদ্যায় "প্রবেশিকা" পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে আইন-কানুন, আর্থিক ব্যবস্থা, বিচার শাসন, সরকারী গৃহস্থালী, এক কথায় "পাবলিক" বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিষয়ক বিদ্যার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না।

তিনি ষোল সতের বৎসর ধরিয়া ভারত-প্রবাসী ছিলেন। কাথাটা ঠিক। কিন্তু বিশ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া কোনো ভারতীয় যুবক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কাটাইয়া গেলেই কি তাহাকে মার্কিন জীবনের সকল সকল প্রকার খুঁটিনাটি সম্বন্ধেই সমান ভাবে ওস্তাদ বিবেচনা করিতে হইবে ?

এইখানে মেগাস্থেনিসের সঙ্গে যুয়ান- চুআঙের তুলনা করা চলে। মেগাস্থেনিসের বিদ্যা বুদ্ধি এবং ব্যবসা ছিল "পাবলিক ল" বিষয়ক। হিন্দু পারিভাষিকে তিনি "আবাপ-জ্ঞ" (ডিপ্লোম্যাটিষ্ট)। কাজেই রাজ্য চালাইতে হয় কি করিয়া তাহা বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া কি তাঁহার সকল কথাই সমান ভাবে বিশ্বাসযোগ্য ? তিনি বলিয়াছেন যে হিন্দু সমাজে চুরি ডাকাইতি ঘটিত না। এই বিষয় লইয়া মামলা মোকদ্দমাও ছিল না। ভারতে নাকি কোন "গোলাম" ছিল না। মিথ্যা কথা বলা এদেশে অজ্ঞাত ছিল, —ইত্যাদি। "ইন্দিকা" কি "বাস্তব" অভিজ্ঞতার গ্রন্থ ? না গল্পগুজবের বই ?

যাহা হউক বিদেশী পর্য্যটন-কাহিনী গুলা ভারতীয় জীবনের সমসাময়িক সাক্ষ্য হিসাবে যারপরনাই মূল্যবান বটে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রত্যেক লেখকের তথ্যগুলা যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘষিয়া দেখা আবশ্যক। যুয়ান-চুআঙ্ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে কয়েকটা "ভালকথা" বলিয়া গিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে বাজাইয়া দেখিতে ছাড়িব কেন ?

(২)

এতদিন এই সকল কাহিনীর উপর রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বিদ্যার সমালোচনা ফেলা হয় নাই। এই কারণেই দুনিয়ার পণ্ডিত মহলে গুজব রটিয়াছে যে, হিন্দুরাষ্ট্রের সরকারী গৃহস্থালী বিশেষ কিছু নয়, ছেলে খেলা মাত্র। বাদশার পারিবারিক গৃহস্থালীরই একটা জের স্বরূপ সমগ্র দেশের কাজ কর্ম্ম চালানো হইত। খরচ ছিল মাত্র "ধর্ম্মকর্ম্মের" খাতে। আর আদায়ও ছিল সেইরূপ নগণ্য। লোকেরা "রামরাজ্যে" বাস করিত আর কি।

এই ধরণের রাষ্ট্রকে “মর্ফলজি” বা গড়ন-তত্ত্বের হিসাবে “প্যাট্রিমোনিয়্যাল” বা রাজা বাদশার ঘরোআ কারবার বলে। “এন্সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা” নামক বিলাতী বিশ্বকোষ গ্রন্থের রাজস্ব অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে এইরূপ ঘরোআ রাষ্ট্রশাসন এবং রাজস্ব ব্যবস্থা ইয়োরোপের মধ্যযুগে বহুকাল চলিয়াছে। পাশ্চাত্য আইন-বিজ্ঞানের ধুরন্ধর মেইন ইত্যাদি পণ্ডিতগণের বিচার স্বীকার করিয়া লইলে বিশ্বাস হইবে যে, হিন্দুরাষ্ট্রগুলা সেই জাতিরই অন্তর্গত। যুয়ান-চুআঙের বিবরণে অনেকটা সেই রূপই মনে হইবার কথা।

সার্ব্বভৌমিক সাম্রাজ্যের কাহিনী হিসাবে কিন্তু যুয়ান-চুআঙের বিবরণ আংশিক, এবং রাষ্ট্র-শাসনের তরফ হইতে এই বিবরণকে বেশী উঁচু ঠাঁই দেওয়া চলিতে পারে না। হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য সম্বন্ধে নতুন কোনো তথ্য সম্প্রতি হাজির করা সম্ভব নয়। কিন্তু অন্যান্য হিন্দুরাষ্ট্রের আয় ব্যয় সম্বন্ধে যা কিছু জানা যায় তাহার জোরে যুয়ান-চুআঙের অসম্পূর্ণতা সপ্রমাণ বা আন্দাজ করা সম্ভব।

করদান হইতে রেহাইয়ের তামিল দলিল

(১)

তামিল লিপির সাহায্যে চোল সাম্রাজ্যের (খৃঃ অঃ ৯০০—১৩০০) সরকারী গৃহস্থালী কিছু কিছু বুঝিতে পারি। হুল্‌ট্‌শ্‌ সম্পাদিত “দক্ষিণ ভারতীয় লিপি” গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের তথ্য ইতিমধ্যে অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও এই গ্রন্থের ডাক পড়িবে। “ভাণ্ডারকার স্মৃতি প্রবন্ধাবলী” (পুনা ১৯১৭) নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রী চোলমণ্ডলের রাজস্ব আলোচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণ স্বামী আয়্যাঙ্গারের “প্রাচীন ভারত” (মাদ্রাজ ১৯১১) গ্রন্থেও লিপিগুলার অনুবাদ পাওয়া যায়।

তবে তামিল সরকারের আয়ব্যয়ের তালিকা এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই। আবিষ্কৃত হইয়াছে মাত্র করদান হইতে রেহাইয়ের দলিল। কোনো কোনো গ্রামের নিকট হইতে সরকার কোনো প্রজার খাজনা আদায় করিবে না এই মর্ম্মে কোনো কোনো বাদশা ফার্ম্মাণ জারি করিয়াছিলেন। যে যে চার্টার বা দলিলের দ্বারা চোল রাজারা পল্লীবাসীদিগকে খাজনার আইন হইতে মুক্তি বা স্বাধীনতা দিয়াছেন সেই সকল দেখিলেই উল্টা পিঠটাও অনুমান করা সম্ভব। অর্থাৎ চোলমণ্ডলে সাধারণতঃ কত প্রকার কর প্রচলিত ছিল তাহা জরীপ করিবার উপায় স্বরূপই এই “স্বাধীনতার ফার্ম্মাণগুলা” কাজে লাগিবে।

(২)

কোনো পল্লী বা একাধিক পল্লীর সমবায় সম্বন্ধে এই সকল দলিল আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাজেই জিজ্ঞাস্য,—যে সকল খাজনা হইতে পল্লীবাসীদিগকে রেহাই দেওয়া হইতেছে সেই গুলাকে আজ কালকার পারিভাষিকে “লোক্যাল” বা পল্লীগত বা জনপদ-গত বলা চলে কি ?

বর্ত্তমান জগতে কোনো কোনো জনপদ-গত কাজ কর্ম্ম চালাইবার জন্য যথাস্থানে কতকগুলা কর বসাইবার ব্যবস্থা আছে। সেই সকল করের শাসন সম্বন্ধে স্থানীয় লোকেরা একপ্রকার পূরা স্বরাজ ভোগ করে।

চোল পল্লীর মাতব্বরেরা পল্লীর ভিতরকার সকল প্রকার খাজনাই তুলিত। কিন্তু এই গুলাকে পল্লী-কর, "লোক্যাল রেট্স" বা জনপদগত খাজনারূপে বুঝিবার কোনো দরকার নাই। সবই "সাম্রাজ্যের আয়" বুঝিলে ঠিক বুঝা হইবে বিশ্বাস করি। তবে এই সমুদয়ের কোনো কোনোটা স্থানীয় খরচ পত্রের জন্য মার্কামারা ছিল কিনা বলা কঠিন।

ব্যাক্তি-কর, সম্পত্তি-কর, ব্যবসায়-কর

[১]

আয়্যাঙ্গার বলিতেছেন যে,—চোলমণ্ডলে একটা সরকারী আদায়ের নাম ছিল মুদ্রা-কর বা টাকা গুণিয়া আদায়। ইহা কিরূপ কর? রোমে "ত্রিবুতুম" নামে এক প্রকার আদায় ছিল। জন প্রতি মাথা গুণিয়া টাকা আদায় করা হইত। বিলাতেও ১৩৭৭-১৩৮০ সালে এই ধরণের একটা কর বসানো হইয়াছিল। তখন ফ্রান্সের সঙ্গে ইংরেজদের তুমুল লড়াই চলিতে-ছিল। রূপতত্ত্বের তরফ হইতে তামিল মুদ্রা-করকে এই সকল পাশ্চাত্য পোলট্যাক্সের [ব্যক্তি করের] দোসর বলা যাইবে কি?

[২]

ইয়াঙ্কি ধনবিজ্ঞানবিৎ সেলিগ্ম্যান প্রণীত "এসেজ ইন্ ট্যাক্সেশ্যন" অর্থাৎ "করবিষয়ক প্রবন্ধ" নামক গ্রন্থে (নিউ ইয়র্ক ১৯১৩) দেখিতে পাই যে, মধ্যযুগের বিভিন্ন জার্ম্মাণ রাষ্ট্রে ঘোড়া বলদ ইত্যাদি জানোআর গুণিয়া ট্যাক্স আদায় করা হইত। তামিল লিপিতেও বুঝিতেছি যে, মান্দ্রাজ এবং মহীশূরের বাদশারা জানোআরের উপর কর বসাইয়াছিলেন।

জার্ম্মান সমাজে আসবাব পত্র, পোষাক পরিচ্ছদ এবং গহনা ইত্যাদির উপরও খাজনা বসানো হইত। তামিল লিপিতে এই গুলার নাম দেখিতে পাই না। কিন্তু অন্যান্য "অস্থাবর" সম্পত্তির উপর চোল সরকারের দৃষ্টি ছিল। তাঁত এবং তেলের কল বা ঘানি গুণিয়া খাজনা আদায় করা হইত। পুকুর-সম্পত্তি ও করের তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বর্ত্তমান জগতে এই ধরণের আদায় এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। পারি-ভাষিক হিসাবে এই গুলাকে "জেনার‍্যল প্রপার্টি ট্যাক্স" বা "সকল প্রকার সম্পত্তি বিষয়ক কর" বলে।

[৩]

রাজারে বাটখারা দাঁড়িপাল্লা ইত্যাদির উপর খাজনা বসাইবার দস্তুর ছিল। চোলমণ্ডলের এই আদায় বর্ত্তমান কালে দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু কৌটিল্যের "অর্থ শাস্ত্রে" ইহার ব্যাখ্যা

আছে। প্রত্যেক দিন হাটুয়ারা বাজারে বসিবামাত্র সরকারের নিকট হইতে বাট্‌খারা "ষ্ট্যাম্প" করাইয়া বা ছাপ্ মারাইয়া লইতে বাধ্য ছিল। প্রত্যেক ছাপের জন্য পয়সা লাগিত; বাট্‌-খারার ট্যাক্সটাকে "সম্পত্তি বিষয়ক কর"ই বিবেচনা করিতেছি।

এই আদায়টাকে নগণ্য বিবেচনা করা চলিবে না। প্রত্যেক পল্লীতে দোকানদারি করিত কত নরনারী? প্রত্যেকের নিকট নেহাৎ সামান্য হারে যৎকিঞ্চিৎ আদায় করিলেও সমগ্র দক্ষিণ ভারত হইতে চোল সার্ব্বভৌমেরা "সরষে কুড়াইয়া বেল" সংগ্রহ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন।

স্বর্ণকারেরা ব্যবসায় চালাইবার জন্য একটা করিয়া "লাইসেন্স" জাতীয় অনুমতি লইতে বাধ্য হইত। বাটখারার ছাপের মতন এই অনুমতির জন্যও চোল সরকার কিছু দক্ষিণা পাইত। এই দুইটাই "সম্পত্তি-কর"। তবে "ব্যবসায়-কর" বলিলেই এই দুই আদায়ের স্বরূপ যথার্থরূপে নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

"কার্ত্তিগাই" মাসে কাঁচাফল আদায় করা ছিল সরকারের এক আয়ের উপায়। অন্যান্য আদায়গুলা বোধ হয় সবই টাকায় অর্থাৎ মুদ্রায় জমা হইত। কিন্তু "কাঁচাফল" "প্রাকৃতিক কর" সন্দেহ নাই। ইহাও আর একটা "সম্পত্তি-কর।"

[৪]

বর্ত্তমান জগতে সম্পত্তি-কর বলিলে "ষ্টক্‌স্," "বণ্ডস্" ইত্যাদি কোম্পানীর কাগজ এবং কেনা-বেচার দলিল ইত্যাদির উপর আদায় বুঝায়। সেকালে এ সব চিজ ছিল না কোথায়ও—না চোলমণ্ডলে না ইয়োরোপে।

কিন্তু চোল বাদশারা "উত্তরাধিকার-স্বত্বে"র উপর কর বসাইয়াছিলেন। "ডান হাত" "বাঁ হাত" নামক দুই জাত নরনারীর কথা, তামিল লিপিতে জানিতে পারি। এই দুই সমাজে কোনো ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পাইবামাত্র সরকারকে খাজনা দিতে বাধ্য হইত।

বর্ত্তমান জগতে এই ট্যাক্‌সকে বিলাতী সমাজে "ডেথ্-ডিউটি" বা মৃত্যু-কর বলে। অর্থাৎ পয়সাওয়ালা লোকেরা "মরিবা মাত্র" তাহাদের সম্পত্তির কিছু অংশ সরকারকে দিয়া যাইতে বাধ্য। উইল না করিয়া গেলেও ক্ষতি নাই। গবর্ণমেণ্টকে খাজনা না দিয়া উত্তরাধি-কারীরা সম্পত্তি দখল করিতে অনধিকারী।

এই "মৃত্যু করে"র হার বোলশেহ্বিক রুশিয়ায় চরমে গিয়া ঠেকিয়াছে। চেকো-সোহ্বাকিয়া, অষ্ট্রীয়া ইত্যাদি দেশেও ইহার হার বেশ উঁচু। বিলাতেও হার চড়িতেছে। জগৎ ভরিয়াই এই উপায়ে উত্তরাধিকারী দিগকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা চলিতেছে। চোল মণ্ডলের হারগুলা জানা যায় না। তবে সম্পত্তিশালীরা সরকারকে কিছু না দিয়া মরিতে পাইতেন না, এইরূপ সহজেই বোধগম্য।

[৫]

বাজারের উপর কর বসানো হইত। বাটখারার ছাপ এবং স্বর্ণকারদের লাইসেন্সের মতন বাজার-করকেও "ব্যবসায়-কর" বলিতে হইবে। পারিভাষিকে ইহার নাম "ভোগ-কর"।

এই বাজার-করকে চোলমণ্ডলে দেখিতে পাই "বিক্রয়-কর"রূপে। আথেন্সে ও রোমে প্রত্যেক বিক্রয়ের উপর দোকানদারেরা শতকরা ১ টাকা হিসাবে কর দিত। চোলমণ্ডলের হার অজ্ঞাত।

এই সমস্ত করের প্রভাবে বাজার-দর চড়িয়া যাইত। অর্থাৎ করটা প্রকাশ্যভাবে দোকানদারেরা দিত বটে। কিন্তু আসল কথা,—চাপটা পড়িত ক্রেতাদের উপর। ক্রেতা হিসাবে দেশের প্রায় প্রত্যেক লোকই বাজার-করের অধীন। ফরাসী পরিভাষায় এই খাজনাকে "কোঁত্রিব্যিসিয়োঁ আঁদিরেক্‌ত্" বলে। তাহার তর্জ্জমা ইংরেজী বিজ্ঞানে চলে "ইন্‌ডিরেক্ট ট্যাক্স" অর্থাৎ "অপ্রত্যক্ষ কর"রূপে।

লবণ ছিল রোমাণ গণতন্ত্রের আমলে সরকারের "একচেটিয়া" বস্তু। মৌর্য্যভারতেও লবণ রাষ্ট্রেরই তাঁবে ছিল। চোলমণ্ডলে একটা "লবণ-কর" মাত্র দেখিতে পাই।

মাছ ধরিবার লাইসেন্স পাইবার জন্যও জেলেরা সরকারকে কর দিত। যাহারা খাজনা আদায় করিবার অধিকার পাইত তাহারাও এই অধিকারের জন্য একটা খাজনা দিত।

কর ("ট্যাক্‌স্") কাহাকে বলে ?

চোল সাম্রাজের ব্যক্তি-কর, সম্পত্তি-কর এবং ব্যবসায়-কর এই তিন শ্রেণীর কর বিবৃত হইল। মর্ফলজির বা গড়ন-তত্ত্বের তরফ হইতে এইগুলার স্বরূপ আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

[১]

প্যালগ্রেভ্‌-সম্পাদিত "ধনবিজ্ঞানের বিশ্বকোষ" গ্রন্থে বুঝিতেছি যে, একালে সেকালে বহু রাষ্ট্রের অধীনেই কতকগুলা "একচেটিয়া ব্যবসা" দেখা যায়। তাহা ছাড়া রাষ্ট্রের সম্পত্তি নামক "খাসমহল" ও অল্পবিস্তর প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই কিছু না কিছু দেখিতে পাই। আধুনিক ফরাসী রাষ্ট্রে এই দুই ধরণের আয় সমগ্র সরকারী আদায়ের চার আনা।

এই সকল আয়কে "ট্যাক্‌স" বলা যায় কি ? কখনই না। জনগণের নিকট হইতে সরকার এই সকল বাবদ যাহা আদায় করে তাহা মামুলি ব্যবসার আয় মাত্র। গবর্ণমেণ্ট এই সকল ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিক এবং ব্যবসাদার বা শিল্প-পতি। অন্যান্য মালিক, শিল্পী এবং বণিকদের যে ঠাঁই গবর্ণমেণ্টেরও সেই ঠাঁই।

কিন্তু ব্যক্তি-কর, সম্পত্তি-কর এবং ব্যবসায়-করকে একচেটিয়া ব্যবসায় হইতে আদায় কিম্বা খাশমহালের আদায়ের সঙ্গে তুলনা করা চলিবে না। এইগুলা দেশের লোক গবর্ণমেণ্টকে

প্রজা হিসাবে দিতে "বাধ্য"। গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি ব্যবহার করুক বা না করুক, নরনারীরা ব্যক্তি হিসাবে, সম্পত্তির মালিক হিসাবে এবং ব্যবসায়ী হিসাবে নিজ নিজ আয়ের এক নির্দ্দিষ্ট হিস্যা না দিয়া তিষ্ঠিতে পারে না।

(২)

আর এক কথা। গবর্ণমেণ্ট সকল দেশেই সমাজের জন্য নানা প্রকার লোকহিত-বিধায়ক কাজ করিয়া থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট জনগণের কেরাণী, মজুর বা সেবকরূপে নানা অনুষ্ঠানের দায়িত্ব লয়। এই সকল ক্ষেত্রেই গবর্ণমেণ্ট জনগণের নিকট হইতে কিছু না কিছু আদায় করিতে অভ্যস্ত। আদায়ের পরিমাণ মোটের উপর এত বেশী হয় যে খরচ পত্র বাদে গবর্ণমেণ্টের লাভ থাকে। সেই লাভ সরকারী জমার খাতায় দেখিতেও পাওয়া যায়।

এই সকল আদায় এবং লাভকেও "ট্যাক্‌স" বলা চলে না। কেননা জনগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সেবা, মাল বা অন্যান্য স্বচ্ছন্দতা উচিত মূল্যে কিনিয়া লইয়াছে মাত্র। গবর্মেণ্ট ঐ সকল বিষয়ে খাটিতে অরাজি হইলে জনগণকে নিজেই পয়সা খরচ করিয়া সে সব বস্তু বা স্বচ্ছন্দতা স্বতন্ত্র উপায়ে সংগ্রহ করিতে হইবে।

কিন্তু চোল-সাম্রাজ্যের যে তিন শ্রেণীর করের কথা বলা হইল সেই সবই আসল "ট্যাক্‌স্"। জনগণের জন্য গবর্মেণ্ট কিছু করুক বা না করুক একমাত্র "গবর্মেণ্ট হিসাবে" এই সকল আদায় তাহার অধিকারেব অন্তর্গত। এইখানে বাধ্য বাধকতার অর্থাৎ প্রজা-রাজার বা আসল রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধে তথ্য বিরাজ করিতেছে।

করের এলাখার বহির্ভূত আদায়

মামুলি কথাবার্ত্তায় যে-কোনো সরকারী আদায়কেই "ট্যাক্‌স্" বা কর বলা হইয়া থাকে কিন্তু রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আলোচনায় বাদ-বিচার করা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

(১)

চোল বাদশারা "দণ্ডধর" হিসাবেও অনেক কিছু আদায় করতে জানিতেন মনে হইতেছে। লম্বা তালিকা পাই নাই। একটা নমুনা দিতেছি। কবিরাজি ব্যবসায় পাঁচন লাগে। এই সকল মূল এবং অন্যান্য ভৈষজ্য পদার্থ পচা বিক্রী করিবার জো ছিল না। যে সকল দোকানদার পচা মাল চালাইত তাহাদের জরিমানা হইত। জরিমানার আয়কে কোনো মতেই ট্যাক্‌স বলা চলে না। তবে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, গবর্মেণ্ট ছাড়া আর কেহ এই দফায় কিছু সংগ্রহ করিতেও অধিকারী নয়।

"দণ্ডধর" হিসাবে চোল সাম্রাজ্যের আয় কত হইত বলা কঠিন। কিন্তু আয়ের পরিমাণটা অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। কৌটিল্যের বিধানে জরিমানার রেওয়াজ এত বেশী যে, ঐ ধরণের

"পেন্যাল কোড" তামিল বাদশাদের জানা থাকিলে তাঁহারা লোকজনের উপর খাঁটি ট্যাক্স্ না বসাইয়াও বড়লোক হইতে পারিতেন।

(২)

চোল-সাম্রাজ্য "সেবক" হিসাবেও জনগণের নিকট হইতে কিছু কিছু পাইত। এই সবও ট্যাক্স নয়, কিন্তু সরকারী আদায় হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রত্যেক পল্লীতে চৌকিদার রাখা হইত। চৌকিদারদের বেতন ছিল পল্লীবাসীদের দেয়। এই চৌকি-করকে খাঁটি "লোক্যাল রেট" বা "স্থানীয়" কর বলা চলে।

চাষীদের ধান মাপিবার জন্য সরকার হইতে "কর্ম্মন্" নামক লোক আসিত। কর্ম্মনের ভাতা দিবার জন্য পল্লী-সভা দায়িত্ব লইত।

তাহা ছাড়া, খাঁলের জল ব্যবহার করিবার জন্য জনগণ গবর্মেণ্টকে এক নির্দ্দিষ্ট হারে মাসুল দিত।

এই তিন বাবদ পল্লীবাসীরা সরকারকে যাহা কিছু দিত সবই সরকারী সেবার মজুরি বা দাম। জরিমানার সঙ্গে এই গুলাকে কর বা ট্যাক্সের এলাখার বহির্ভূত সরকারী আদায় বলা যাইতে পারে। ইংরেজি পারিভাষিকে ইহার নাম "নন-ট্যাক্স রেভিনিউ"।

(৩)

চোল আমলে জনগণ সরকারী টাকশালে ধাতু লইয়া আসিয়া টাকা তৈয়ারী করাইয়া লইতে পারিত। সরকার জনগণের সেবক হিসাবে মুদ্রার উপর "সেইঞ্ঞরেজ" বা সেলামি আদায় করিত।

বাদশা কুলোত্তুঙ্গের আমলে (১০৭০-১১১৮) এই ব্যবস্থা দেখিতে পাই। টাকশালের সেলামিও অবশ্য "নন-ট্যাক্স রেভিনিউ"র অন্তর্গত।

"লিপি" বনাম "সি য়ুকি"

আগেই বলা হইয়াছে চোল সাম্রাজ্যের গোটা আদায়ের তালিকা পাওয়া যায় না। দক্ষিণ ভারতে খনি ছিল ধনসম্পদের এক বড় উপায়। এই বাবদ সরকারের আয় যথেষ্টই হইত। কিন্তু এ বিষয়ে "স্বাধীনতার দলিলে" কোনো উল্লেখ নাই।

আবার বহির্ব্বাণিজ্য-ঘটিত লেনদেনও ছিল বড় রকমের। আমদানি রপ্তানির উপর শুল্ক হইতে আদায় বেশ মোটা আকারেই দেখা দিত। সে সব কথাও এই সকল লিপির ভিতর পাওয়া যায় না। না যাইবারই কথা—কেননা কোনো পল্লীর মামুলি কর-তালিকায় আমদানি-রপ্তানির হিসাব সাধারণতঃ অপ্রাসঙ্গিক।

এই পর্য্যন্ত সহজেই বুঝা গেল যে,—চোল সার্ব্বভৌমেরা জনগণকে "শোষণ" করিবার নানা ফিকিরই জানিতেন। লিপি-সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় য়ুয়ান-চুআঙের ভ্রমণ-কাহিনী

ভারতীয় রাজস্ব সম্বন্ধে যারপরনাই ভাসাভাসা এবং অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। য়ুয়ান-চুআঙ্ হয়ত বা মঠে বসিয়া একমাত্র "শাস্ত্র" লেখক বা শাস্ত্রাধ্যাপকগণের বচনই ডায়েরিতে টুকিয়া রাখিয়াছিলেন।

রোমাণ আইনে জমিজমা

এতক্ষণ যে সকল করের কথা বলা হইল তাহাতে জমিজমার উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু দুনিয়ার লোক সম্পত্তি এবং ধনদৌলত বলিলে প্রধানতঃ এবং বিশেষ করিয়া জমিজমাকেই বুঝে। ইংরেজিতে জমির নাম "রিয়্যাল এষ্টেট্" বা "আসল সম্পত্তি"। চোলমণ্ডলে ভূমি-সম্পত্তির উপর কর বসানো হইত কিরূপ ?

(১)

এইখানে কয়েকটা বিদেশী তথ্য জানা থাকিলে বিষয়টা বুঝিতে গোল বাঁধিবে না। "মান্ধাতার আমলে" এবং নেহাৎ আদিম সমাজে "ল্যাণ্ড রেভিনিউ" বা জমাজমি হইতে আয়ই রাষ্ট্র মাত্রের প্রধান এবং একমাত্র সম্বল। প্রাচীন রোমে "গণতন্ত্রের আমলেও" এইরূপই দেখা যায়।

রোমাণ "সাম্রাজ্যে"ও বহুকাল ধরিয়া ভূমি-কর বা "ল্যাণ্ড রেভিনিউ"ই আয়ের মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল। সেকালে জমিজমা ছিল প্রায় সবই খাশমহাল। বাদশা বা সাম্রাজ্য জমির মালিক এই ছিল রোমাণ আমলের আইন এবং জনগণের ধারণা। এই ধরণের সরকারী জমি বা খাশ মহালকে রোমাণরা বলিত "আজের পুবালকুম"। ফরাসী পরিভাষায় ইহার নাম "দোমেইন"। ইংরেজেরা এই সম্পত্তিকে বলে "ক্রাউন ল্যাণ্ড" অথবা "প্লাবলিক ডোমেইন।"

মার্কিন পণ্ডিত সেলিগ্ম্যান তাঁহার "কর বিষয়ক প্রবন্ধ" গ্রন্থে বলেন যে,—জমিজমা ছাড়া আর কোনো প্রকার সম্পত্তি হইতে সরকারী খাজনা আদায় করা সম্ভব একথা রোমাণরা চিন্তা করিতেই পারিত না। নতুন নতুন কর "রপ্ত" করিতে রোমাণ জাতির অনেক দিন লাগিয়াছিল।

(২)

"ত্রিবুতুম" নামক ব্যক্তি-কর "গণ-তন্ত্রের" আমলে কায়েম করা হয়। কিন্তু ফরাসী রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ বোদ্যাঁ তাঁহার "লে সিস্ লিভ্র দ'লা রেপ্যিব্লিক" অর্থাৎ "রাষ্ট্র সম্বন্ধে ছয় পরিচ্ছেদ" নামক গ্রন্থে (প্যারিস ১৫৭৮) বলেন যে, "রোমাণরা ত্রিবুতুমকে কর বিবেচনা করিত না। তাহাদের চোখে সরকারের এই আদায় ছিল জনগণের রক্ষ হইতে সরকারকে কর্জ্জ দেওয়া। কর্জ্জটা সরকার জোর জবরদস্তি করিয়া লইতেছে। আজের পুব্লিকুম বা খাশ মহালের আয়ে সরকারের খরচ কুলাইতেছে না বলিয়া সরকার এইরূপে দেশের লোককে কর্জ্জ দিতে বাধ্য করিতেছে। কিন্তু দিগ্বিজয়ের লুট রাজধানীতে পৌঁছিবামাত্র সরকার এই কর্জ্জ জনগণকে ফিরাইয়া দিবে।"

চোল সাম্রাজ্যের যে সকল আদায় বিবৃত হইয়াছে তাহাতে মানবজাতির এই আদিম "রূপ" দেখা যায় কি? "গড়ন-তত্ত্বের" হিসাবে চোল করগুলাকে মান্ধাতার আমলের রাষ্ট্রীয় জীবনের সাক্ষী বিবেচনা করা সম্ভব কি?

এই প্রশ্নের জবাব পাইবার জন্যই ভূমি-কর আলোচনা করিবার পূর্ব্বে অন্যান্য কর উল্লেখ করা গেল। এই কর গুলাকে মান্দ্রাজ এবং মহীশূরের দ্রাবিড়েরা "জবরদস্তির কর্জ্জ" বিবেচনা করিত না। জনগণের "বাধ্যতা মূলক ঋণ" না হইয়া এইগুলা চোল মস্তিষ্কে সরকারের ন্যায্য দাবীই বিবেচত হইত।

চোল আমলের ভূমি-কর

তবে তামিল সাম্রাজ্যের ভূমি-কর পরিমাণে অল্প ছিল না। আদায়ের হারও ছিল বেশ উঁচু। রামজে তাঁহার "রোমাণ প্রত্নতত্ত্ব" গ্রন্থে বলেন যে, সাম্রাজ্য কায়েম হইবার পর প্রথম প্রথম বাদশারা ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ লইত। কিন্তু চোল সাম্রাজ্যের ভূমি-কর ছিল ষষ্ঠাংশ। ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ অবশ্য সকল হিন্দু "ধর্ম্ম," "স্মৃতি," এবং "নীতি" শাস্ত্রেরই মামুলি বয়েৎ।

কিন্তু চোল সার্ব্বভৌমেরা এই বয়েৎটা বাহ্যতঃ অর্থাৎ মৌখিক ভাবেই রক্ষা করিতেন। আসল কথা,—জমিজমা হইতে আদায় ষষ্ঠাংশের চেয়ে খুব বেশীই ছিল। যুয়ান-চুআঙ্ আর্য্যাবর্ত্তের সপ্তম শতাব্দী সম্বন্ধে এই যে ষষ্ঠাংশের কথা বলিয়াছেন তাহা বোধ হয় "শাস্ত্র" কথিত "ফর্ম্ম লাটারই" চীনা অনুবাদ। তিনি "রেআল-পোলিটিক" অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় জীবনের "ভিতর কার" বাস্তব কথা ঘাঁটিয়া দেখিতে অবসর পান নাই।

চোল মণ্ডলে জমির উপর "অতিরিক্ত" কতকগুলা আদায় চলিত। সেই সব আদায় ফসলের দশভাগের এক ভাগ। রাজাধিরাজের আমলে জমির মালিকেরা ১/৬+ /১০ অর্থাৎ ৪/১৫ অংশ অর্থাৎ চার ভাগের একভাগেরও বেশী দিতে অভ্যস্ত ছিল। তাহার উপর পথ-কর, চুঙি ইত্যাদি ত আছেই।

ব্যক্তিগত ও যৌথ জমি

দক্ষিণ ভারতের জমিজমা সমন্ধে কয়েকটা তথ্য তামিল লিপিতে পাওয়া যায়। দুনিয়ার আর্থিক ইতিহাসে এই সকল তথ্যের দাম আছে।

প্রথমতঃ দেখিতে পাই যে, ভূমি ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি। কতকগুলা লোক "দলবদ্ধ" ভাবে সম্পত্তির "যৌথ মালিক" নয়। পল্লীর বিভিন্ন জমিজমার উপর বিভিন্ন ব্যক্তির এক্তিয়ার প্রতিষ্ঠিত। ধনদৌলতের অধিকার সম্বন্ধে কেন্দ্র বলিলে পল্লীও বুঝিতে হইবে না, "শ্রেণী"ও বুঝিতে হইবে না, পরিবারও বুঝিতে হইবে না। বুঝিতে হইবে ব্যক্তি।

দ্বিতীয়তঃ এইরূপও দেখিতে পাই যে, "পল্লী-সভা"র অধীনে কতকগুলা জমিজমা

আছে। এই সকল জমিজমা পল্লী-সভার সম্পত্তি। এই হিসাবে গোটা পল্লীই সেই সম্পত্তির যৌথ মালিক সন্দেহ নাই। এই গুলাকে সহজে পল্লীর খাশ মহাল বলা চলে।

চোল শাসনাধ্যক্ষদের কাজকর্ম্ম আলোচনা করিবার সময়ে জমি-জরীপের কথা বলা হইয়াছে। সেই উপলক্ষ্যে রাজ-রাজ বাদশার ৯৮৬ খৃষ্টাব্দের আইনও উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই আইনের বিধানেই দক্ষিণ ভারতের জমি-স্বত্ব বিষয়ক এই সকল কথা জানিতে পারি।

তথাকথিত "ভিলেজ কমিউনিটি," "ডর্ফ-গেমাইনশাফট" বা পল্লী-সম্পত্তির যৌথ ব্যবস্থা চোল আইনে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ব্যবস্থা অতি "সেকেলে" চিজ। চোল রাষ্ট্র গড়ন-বিজ্ঞানের মাপ কাঠিতে মহা "আধুনিক"। সেকেলে যৌথ ব্যবস্থার যতটুকু যে পরিমাণে চোল সাম্রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায় ততটুকু সে পরিমাণে দুনিয়ার নবীনতম রাষ্ট্রেও মালুম হইতে পারে।

রাজরাজের বন্দোবস্ত

রাজরাজের আইনে জমি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়। দুই প্রকার বন্দোবস্ত ছিল বুঝিতে পারি। জমির উপর কর নির্দ্ধারণ করিবার জন্য দুই রীতি অবলম্বিত হইয়াছিল।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক জমির টুকরা সম্বন্ধেই সাবেক বন্দোবস্তের খাজনার পরিমাণ টুকিয়া রাখা হইত। কোন জমির জন্য কে কবে কত দর দিয়াছে এই বিষয়ে গোঁজামিল দিবার আর যো ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক টুকরা সম্বন্ধেই উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ হিসাবে একটা হার নির্দ্ধারণ করা হইত। হারটা অনেক ক্ষেত্রেই কিছু উঁচু করিয়া ধরা হইয়াছিল। ইহাতে জনগণের উপর উপদ্রব ঘটায় এক শত বৎসর পরে কুলোত্তুঙ্গ নতুন আইন জারি করিয়া পুনরায় জমিজমার নয়া বন্দোবস্ত করাইতে বাধ্য হন।

রাজরাজের আইন অন্যান্য হিসাবেও খুব কড়া ছিল। তিন বৎসর উপরাউপরি খাজনা না দিতে পারিলেই মালিকেরা জমি জমা হইতে বিতাড়িত হইত। পল্লী-সভা এই সকল জমি নীলামে চড়াইয়া বেচিতে পারিত। পল্লী-স্বরাজ প্রসঙ্গে এই তথ্য উল্লেখ করা গিয়াছে।

দ্রাবিড়দের জমিগুলা যে ব্যক্তি-গত সম্পত্তি এই সকল বিধান হইতেও বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

সরকার ভূমিকর আদায় করিত তিন বাহনে। ফসল ছিল একপ্রকার আদায়। দ্বিতীয় আদায় সোনা বা মুদ্রা। কাপড়ও কর-দানের অন্যতম বাহন বিবেচিত হইত।

চুক্তি-সংগ্রাহক ?

একটা আইনে দেখিতে পাই যে,—যাহারা খাজনা আদায় করিত তাহাদের উপর একটা ট্যাক্স বা কর ছিল। "স্বাধীনতার দলিল" আলোচনা করিবার সময় এই তথ্য পাওয়া

গিয়াছে। "খাজনা আদায়" করিবার জন্য তাহা হইলে কি বিশেষ এক শ্রেণীর লোক ছিল? তাহারা কি সরকারী খাজাঞ্চী বিভাগের কর্ম্মচারী বা চাকর্যে নয়? সরকার আর চাষী-মালিক এই দুইয়ের ভিতর "কর-সংগ্রাহক" নামে এক স্বতন্ত্র জীব দেখা যাইতেছে।

ইয়োরোপে,—রোমাণ "গণতন্ত্রে"র আমলে "ট্যাক্স-ফার্ম্মিং" নামক এক ব্যবস্থা ছিল। সরকার কোনো কোনো লোকের সঙ্গে "ফুরণ" করিয়া তাহার হাতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জমি-জমা হইতে আদায়ের ভার দিত। এই সকল লোককে "পুব্লিকানি" বলিত। সরকারকে খাজনা আদায়ের ঝুঁকি লইতে হইত না। যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চুক্তি-মাফিক প্রাপ্য তাহার তহশিলখানায় আসিয়া পৌঁছিত। এই ধরণের "চুক্তি-সংগ্রাহক" তামিল সাম্রাজ্যেও ছিল বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। তাহা হইলে সেকালেও "জমিদারি প্রথার" বীজ ঢুঁড়িয়া পাওয়া সম্ভব।

"কর" বনাম "ভাড়া"

একটা কথা তামিল লিপিতে পরিষ্কাররূপে জানা যায় না। ব্যক্তিই হউক, অথবা পল্লী-সভাই হউক - ইহারা কি জমিজমার খোদ্ "মালিক" ছিল? না সকল জমিজমার মালিক ছিল বাদশা, আর বাদশাহী বা সরকারী খাশমহালই ব্যক্তি বা যৌথ-"রাইয়ত"দের ভিতর নির্দ্দিষ্ট শর্ত্তে বাঁটিয়া দেওয়া হইত?

নরনারী ব্যক্তিগত ভাবে অথবা যৌথভাবে যদি মালিক হয় তাহা হইলে গবর্মেণ্ট তাহাদের নিকট হইতে জমি-সম্পত্তি বাবদ যাহা কিছু আদায় করিত সবই ছিল "কর" বা ট্যাক্স্। আর গবর্মেণ্ট স্বয়ং যদি মালিক হয় তাহা হইলে নরনারীরা সরকারী জমি ব্যবহার করিবার জন্য মাশুল বা "ভাড়া" দিত মাত্র। এইরূপ মাশুল বা ভাড়াকে বলে "রেণ্ট্"।

ধনবিজ্ঞানে "রেণ্ট্" বনাম "ট্যাক্স্" (ভাড়া বনাম কর) লইয়া নানা তর্ক আছে। তর্কটা প্রধানতঃ "থিয়োরি" বা তত্ত্ব-সম্পর্কিত। কিন্তু বিলাতী বিশ্বকোষে রাজস্ববিজ্ঞানের এক ইংরেজ ওস্তাদ গিফেন বলিয়াছেন যে,—"আর্থিক হিসাবে ভাড়া এবং কর দুইয়ের প্রভাবই একরূপ। অধিকন্তু দুই-ই সরকার মাত্রের 'একচেটিয়া' আদায়, আবার দুই-ই রাষ্ট্রীয় বাধ্যতার জোরে উসুল হয়।"

তামিল লিপি সমূহ গভীর ভাবে খতাইয়া দেখিলে মনে হইবে যে,—চোল বাদশারা জনগণের নিকট হইতে জমি বাবদ "কর"ই আদায় করিতেন। দ্রাবিড় অঞ্চলের জমিজমা প্রধানতঃ ছিল নরনারীর সম্পত্তি। সরকারী খাশমহালের পরিমাণ বেশী ছিল না বলা যাইতে পারে।

শোষণ-নীতি

রাজরাজ তাঁহার ধন-সচিবের মারফৎ তহশীলদারদিগকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে,

খাজনা আদায় করিবার সময় যেন নরনারীর সুখ দুঃখ সমঝিয়া কাজকর্ম্ম করা হয়। এই "সদিচ্ছা" ছাড়া তামিল সাম্রাজ্যের রাজস্ব-বিভাগ শোষণ-নীতিকে আর কোনো উপায়ে মোলায়েম করিতে পারে নাই।

মাত্র একবার জনগণের উপরকার চাপ কমাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১০৮৬ সালের জমি-জরীপ উপলক্ষ্যে কুলোত্তুঙ্গ কয়েকটা কর উঠাইয়া দিয়াছিলেন। চোলমণ্ডল এই সদয়তার জন্য সেই বাদশার অনেক গুণ গান করিয়াছে।

কিন্তু মোটের উপর কি দেখিতে পাই? "এন্‌সাইক্লোপীডিয়া বৃটানিকা" নামক বিশ্বকোষের কর-অধ্যায়ে গিফেন বলিয়াছেন যে,—"ধনবিজ্ঞানবিৎ আডাম স্মিথের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ইয়োরোপীয় রাজরাজড়ারা অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহ রাজস্ব সম্বন্ধে মাত্র একটা নিয়ম মানিয়া চলিতেন। সে হইতেছে 'শোষণ',—যতখানি পার কেবল 'শোষণ',—তবে নেহাৎ জুলুমের মাত্রায় গিয়া যেন না ঠেকে শোষণের ফিকির ঢুঁড়িবার সময় এই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।"

চোল বাদশাদের "পাক্‌স্ সার্ব্বভৌমিকা" বা বিশ্ব-শান্তিও ঠিক এই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন জিজ্ঞাস্য,—শোষণ-নীতির প্রভাবে জনগণের পার্থিব অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? জনগণের বার্ষিক আয়ের তুলনায় খাজনার পরিমাণ কতটা ছিল? এই সকল প্রশ্নের জবাব আলোচনা করা সম্প্রতি অসম্ভব। কেননা,—না জানা আছে সরকারী আদায়ের পরিমাণ আর না জানা আছে নরনারীর সংখ্যা এবং সম্পত্তির কিস্মৎ।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

পুস্তক-পরিচয়

ব্যাপিকা বিদায়—শ্রীঅমৃতলাল বসু। প্রমোদ প্রহসন। মূল্য বারো আনা। নাট্যাচার্য্য রসরাজ অমৃতলাল বসুর অক্লান্ত লেখনীর বিদ্যুদ্‌বিলাসে "ব্যাপিকা বিদায়ের" প্রতিচ্ছত্র উজ্জ্বল। "ডায়াকি" বুরোক্রেসী ডেমোক্রেসী, শাশুড়ীক্রেসী, শালাক্রেসী, স্বরাজতন্ত্রিত কলিকাতা করপোরেশন, প্রভৃতির এমন নিখুঁত চিত্র এমন রঙ্গীন ছবি, এক রসরাজের তুলিকাতেই সম্ভব। বহুকাল পূর্ব্বে—জীবনের পূর্ব্বাহ্নে সেই বিবাহবিভ্রাট পড়িয়াছিলাম, তার জোড়া নাই। অমন মিছরিমাখানো চাবুক ইন্দ্রনাথের "ভারতোদ্ধার" ছাড়া আর কোথাও এপর্য্যন্ত দেখি নাই, সেই "মিসেস কারফরমার" চিত্রকরের অক্ষয় তুলিকায় আজ মিসেস পাকড়াশীকে পাইলাম, যেন দুই অভিন্নকায় অভিন্নহৃদয় সখী, সুদক্ষ শিল্পীর নিষ্কলঙ্ক আলেখ্য। কবির আসন স্তুতিনিন্দার গণ্ডীর অনেক উপরে, সুতরাং মিসেস পাকড়াশীর দলস্থ দলস্থারা যাহাই বলুন না কেন, অমৃতলালের এ চিত্র বঙ্গসাহিত্যে চিরদিন জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিবে। র‍্যাফেলের ক্লিওপেট্রার ফণি-সাধনার ন্যায় এচিত্র অক্ষয় হইয়া থাকিবে। মিসেস রায় অর্থাৎ মিনি (পুষ্পবরণের স্ত্রী, মিসেস পাকড়াশীর মেয়ে) প্রহসনের নায়িকা

হইলেও প্রতিনায়িকার ছবি অর্থাৎ মিসেস পাকড়াসীর ছবিই জমিয়াছে বেশী। চলিত প্রথামতে শাশুড়ী প্রতিনায়িকা হইতে পারেন না, অন্ততঃ প্রকাশ্যে ত নহেই, কিন্তু রসরাজ অমৃতলালের কাছে অত কায়দা কানন খাটে না। সোজা মানুষ তিনি, তাঁর সোজা দৃষ্টি যেখানে দরকার সেখানেই ইলেকট্রিক কারেণ্টের মত গিয়া পৌঁছায়। শাশুড়ী টাশুড়ীর ধার তিনি ধারেন না। নায়ক—পুষ্পবরণ মিসেস পাকড়াশীর জামাতা,—অতি সুশীল যুবক, তাই রক্ষা, নেহাৎ একতরফা। নইলে আর রক্ষা ছিলনা। শ্রীমতী লীলা বালবিধবা। কবি ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছেন যে, মিঃ ভাদুড়ীর সঙ্গে হয়ত তার আবার বিবাহও হইতে পারে। তবে সেগুলি চিত্রের ব্যাকগ্রাউণ্ড। কবির প্রতিপাদ্য নহে। শকুন্তলার বিদায় কালে—শকুন্তলা কণ্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, অনসূয়া প্রিয়ংবদা আমার সঙ্গে হস্তিনায় যাবে না?—উত্তরে কণ্ব মাত্র বলিয়াছিলেন, "এ দু'জনকেও যে বিয়ে দিতে হবে মা"—বাস্! এইটুকুতেই যেমন প্লটের সবটা খুলিয়া গেল, তেমনিই লীলার "অভিমান করেই তো বাবা আমার অন্যত্র বিবাহ দিয়েছিলেন।"—এই উক্তি এবং মিস্ জটিলেশ্বর ভাদুড়ীর "(স্বগত) পালা, পালা জটে, নইলে বামুনের ছেলে এখুনি মারা পড়্‌বি দেখ্‌ছি" উক্তিতে সমস্ত ছবিটা খুলিয়া গিয়াছে। ক্ষণকালের জন্য পাঠকের মনে লীলাকে প্রতিনায়িকা ভাবিবার অবসর হইলেও প্রকৃতপক্ষে শাশুড়ী মিসেস পাকড়াসীই রসরাজের প্রতিনায়িকার আসন দখল করিয়াছেন।

তারপর "চমৎকার ঝি"; সে সত্যই চমৎকার। যেন মৃচ্ছকটিকের মদনিকা বা অমর তারকনাথের স্বর্ণলতার শ্যামা। আজ দ্বিজেন্দ্রলাল থাকিলে ঘনেশ্যামকে বঙ্গনারীর কেদারের পাশে ডাকিয়া বসাইতেন। বর্ত্তমানকালের পেট্রিয়টদের শ্রেণীবিভাগটি সকলেরই প্রণিধান-যোগ্য। দরকার মত পেট্রিয়টরা যে "খদ্দর সাহেব" হন, চমৎকার ঝি পর্য্যন্ত তাহা বোঝে, আর দেশের অন্যান্য কথা ত দূরে। "ফাষ্টক্লাস পেট্রিয়টদের মোটর আছে।" (তা নিজের বা বাপের বা সাধারণের যার পয়সাতেই হোক্‌না কেন)। "সেকেণ্ডক্লাস সেক্‌সন্—এ—(পেট্রিয়টদের) ট্রাম।" "সেক্‌সন্—বি—ট্যাঙোস্ ট্যাঙোস্। হ্যাট হাফ প্রাইস, কোট্ চাঁদনি," অংশটি বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে। বিশেষতঃ এই নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে। চড়কের বাজনা বাজিয়াছে, চড়ুকে পিঠ চড়্ চড়্ করিতেছে, এ সময়ে অমৃতলালের এই অমৃতময়ী কথায় অনেকের চোখ ফুটিবে।

সঞ্জীব চৌধুরীর বয়স ষাট বছর, আইবুড়ো "একটি পিণ্ডিদাতার সৃষ্টির চেষ্টায় ফিরচেন। ঝি চমৎকারিণী বল্‌ছে, ছেলেত "পিণ্ডিদাতা নয় দণ্ডদাতা"। উত্তরে চৌধুরী বল্লেন, "প্রেয়সীর ঝঙ্কার আর পুত্রের প্রহার আহার করেই-তো আজ বাঙ্গালী বীর বলে জগতে পরিচিত।" ইত্যাদি স্থল একটু পুরানো সুতরাং একঘেয়ে হইলেও লিখনভঙ্গীতে রসভঙ্গ হইবার তত অবসর দেয় নাই।

কলিকাতার কাগজের দলের উপরও কবির রসধারা কৃপণ হয় নাই। মিনি বা মিসেস রায় তাঁর ভাগ্নেকে বল্‌চেন্—"তোমায় মামা বলেন ঘনেশ্যাম আবার লেক্‌চার দেয়।"—অমনি ভাগ্নে ঘনেশ্যাম—"(সহাস্যে)" বল্লেন্—"ফরোয়ার্ড পড়েচেন্ বুঝি? পো—পোত্রিকা—সব ছাপেনা ঠাট্টা করে; যশুরে কিনা নদেকে হিংসে করে।" যথার্থই চমৎকার, স্বরাজ করপোরেশনের আর একটু ছবি তুলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

তোত্‌লা ঘনেশ্যাম বল্‌চেন—"সে......সে......সেক্রেটারী (বোধহয় কংগ্রেস কমিটির) খালি খাটিয়ে নেয়। 'কতদিন মিউনিসিপেলে চাকরি করে দেবে বল্‌চে তা খা-খালি হলে-ই বলে এ্যাখনো......নোয়াখালির নোক্ বাকি আছে......নদের টরূন্ এলে তোমার হবে।" ইহার ভাষ্য অনাবশ্যক।

অল্প ইংরাজী শিখিয়া মা লক্ষ্মীদের যে কি অবস্থা, তাহা মিসেস পাকড়াসীর মুখে ব্রাইড়-গ্রুমের মানে কনের সইস্ এবং এইরূপ আরও দু'চারটি চিত্রে কবি কি সুন্দরভাবেই না ফলাইয়াছেন! ভাদুড়ীর গান—"ডাকের কথা" "খনার বচনের" মত বাঙ্গালীর মুখে মুখে ভাসিয়া বেড়াইবে। —তার আর মরণ নাই।—কতকটা এই—

* * *

ওয়াইফ্ ওয়াইফ্ ওয়াইফ,
Happy sweet life,
যদি রসনাতে Roger's knife না থাকে গোপন—
Fatal weapon.
Beauty, beauty, beautiful
যখন আলাপ করে গোলাপ ফুল,
অবশেষে বানিয়ে fool,
Coolly সে করে শাসন,
এ ভক্তের পক্ষে ভারি শক্ত স্ত্রী rule regulation.

রসরাজের রসময় লেখনী অমর হউক। বঙ্গভাষার কণ্ঠহারে দ্যুতিময় মধ্যমণির ন্যায় শোভা পাক্। প্লটের প্রধান পাত্রগুলি সবই বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে দেখিতেছি—ভাদুড়ী, পাকড়াশী রায় ইত্যাদি। এ ইঙ্গিতের অর্থ কি?

কৌতুক-যৌতুক (১৩২৯ সাল) "শ্রীঅমৃতলাল বসু মুদ্রাঙ্কিত।" ২৫৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ২৲ কাগজ ও বাঁধাই উত্তম।

নট-রাজ অমৃতলালের রসময়ী লেখনীর কুড়িটি গল্প লইয়া কৌতুক-যৌতুক, পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া রাখা যায় না। বাঙ্গালাদেশের—সেই পুরাণো হাসি, আমোদ আহ্লাদ—দশজন একত্রে বসিয়া ঠাট্টা-তামাসা, গোষ্ঠী বন্ধন এখনকার যুবক যুবতীদের নিকট পক্ষীরাজ ঘোড়ার গল্পের ন্যায় অদ্ভুত। এ দুর্দ্দিনে, এমন জাতিধ্বংসকর দুঃসময়ে বাঙ্গালীকে যিনি হাসাইবার চেষ্টা করেন, ক্ষণ কালের জন্য নিরাবিল সুখ সম্ভোগ করাইতে চান্, তিনি শতধা ধন্যবাদার্হ। বহুকাল পূর্ব্বে গুপ্তকবির লেখায়, রঙ্গব্যঙ্গে, রূপচাঁদ পক্ষীর তীব্রমধুর কূজনে, হরুঠাকুর, এ্যাণ্টনি, ভোলাময়রা প্রভৃতির "ঠাকুরুণ গো, ও সব কর্ম্ম করতে হয়, তুমি কর—আমি পারবো না" "পদ্মের মৃণালে কাঁটা, ঠাকুরের পিরালী খোঁটা" প্রভৃতি রসাল বচন মালায় বাঙ্গালী প্রাণ ভরিয়া ও আকাশ কাঁপাইয়া হাসিত, কত আমোদ আহ্লাদ করিত! অনশনদিগ্ধ ব্যাধি-গ্রস্ত ক্ষয়োন্মুখ বাঙ্গালী জাতির আজ সেই হাসি নাই, সে হাসি হাসিতে তাহার শীর্ণ কঙ্কাল কাঁপিয়া ওঠে,—পাঁজর ফাটিয়া যায়।—এমনই দুঃখের দিনে —এস রসরাজ—তোমার কণ্ঠ কণ্ঠে মিলাইয়া কৌতুক-যৌতুক পাঠ করি—তোমার "আমের ধুমধাম"—কবিতার—

সাতসিকে মণ "কোক", বালাম ন'টাকা থোক্,
এক ঢোক্ দুধে প্রায় এক আনা পড়ে।
উঠেছে দাঁড়ীর ফেরে, আলু পাঁচ আনা সেরে,
ঘি-তেলে বেড়েছে ভেল দাম গেঁছে চ'ড়ে॥

সন্দেশের দিতে তুল, হোমিওপ্যাথী গ্রবিউল,
খদ্দরে ভদ্দর সাজি সাতটাকা জোড়া।
ট্রামের বেড়েছে ভাড়া, উপায় নাহিক ছাড়া,
বাবুয়ানা ক'রে ক'রে হ'য়ে গেছি খোঁড়া'।

সার্থক পঙ্‌ক্তিগুলি আবৃত্তি করি।

প্রচুর আম হইয়াছে এবার, যে যত পার, মেয়েবউকে তত্ত্ব পাঠাও,—দেরি করিও না, মাহেন্দ্রক্ষণ বহিয়া যায়,—

মেয়েরে পাঠাও তত্ত্ব, ক'রে রাখ আমসত্ত্ব,
শিশুর সুপথ্য হবে মিশে দুধে ভাতে।
বলিয়া ফেলেছি ভুলে, দুধ কোথা এ গোকুলে,
যেটুকু রেখেছ তুলে—বাবু খাবে চা'তে॥

এমন ব্যঙ্গ, এমন ধ্বনিত্বের ঝঙ্কারে সেই গুপ্ত কবির গান মনে পড়ে!—সেই—"পাঁটা"র—

"মজাদাতা অজা তোর কি লিখিব যশ?
যত চুষি তত খুসী হাড়ে হাড়ে রস॥
এমন পাঁটার মাস নাহি খায় যারা।
ম'রে যেন ছাগী-গর্ভে জন্ম লয় তারা॥
দেখিয়া ছাগের গুণ ক'রে অভিমান।
হইলেন বরারূপ নিজে ভগবান॥
তথাচ যবনহিন্দু করে অপমান।
ইংরাজ কেবল তার রাখিয়াছে মান॥"

লেখার পাশে কালে—কৌতুক-যৌতুক আসন পাইবে সন্দেহ নাই। গুপ্তকবির "তপ্‌সেমাছ" এর পর রসরাজ অমৃতলালের "ইলিশ"—পাইয়া সত্যই রসনা জুড়াইয়া গেল—

"কাঁচা ইলিশের ঝোল কাঁচা লঙ্কা চিরে!
ভুলিবে না খেয়েছে যে বসে পদ্মাতীরে॥
* * * *
রমণী-রসনা বোঝে ইলিশের স্বাদ।
চাঁদ মুখে চিবাইতে সধবার সাধ॥
একটি একটি, কাঁটা তারিয়ে তারিয়ে।
অবলা বিরলে খান বেরালে হারিয়ে॥"

এমন একদিন ছিল, যখন একটা গোটা ইলিশ এক এক জনে খে'ত, তাইতে তাদের চোঁয়া ঢেকুর উঠ্‌ত না বা আইসক্রিম সোডার দরকার হতো না। হায়,—সেদিন এখন স্বপ্নের বিষয়। এখন—

"ছেলে পড়ে স্বাস্থ্যরক্ষা অম্ল উদজান।
চাম্‌চে মাপে নাম্‌চে তাই অন্ন-পরিমাণ॥
আস্ত গোটা মৎস্য খাবে কোস্তাকুস্তি কস্ত।
কাঙ্‌লা বাঙ্‌লা হ'তে সে পুরুষ অস্ত॥"

ছিল একদিন—যখন জগদ্ধাত্রীর মূর্ত্তিতে আমাদের নারীদেবতারা বিরাট সংসার ধারণ করিতেন ও দশভুজার মূর্ত্তিতে সেই সংসারের আদ্যন্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। হায়, কোথায় সে ছবি! এই সে দিনও আমরা—

"দেখেছি এ দেশে নারী ঢুকে ঢেঁকিশালে।
শ্যামা যেন রণবেশে নাচে তালে তালে॥
প'ড়েছে কেশের রাশি পিছনে ঝাঁপায়ে।
দুম্ দুম্ পড়ে ঢেঁকি মেদিনী কাঁপায়ে॥
ঘর্ঘর ঘুরিছে জাঁতা কামিনীর করে।
শিলেতে পিষিছে নোড়া জোড়া ভুজে ধ'রে॥
জলের কলসী কাঁকে হেলাইয়া অঙ্গ।
আলো ক'রে চলে পথে, রূপের তরঙ্গ॥

হায়,—সে এলোকেশী শ্যামা মায়ের মধুর মূর্ত্তি আজ কোথায়? এখন—

"ফর্কে গিয়ে পদ্মাপার্কে সুস্থদেহ হবে।"

বর্ত্তমানে, হিন্দু-মুসলমানের এই অন্তঃকলহের দিনে,—"গো-গোলযোগ"—প্রবন্ধটী যে কত সময়োপযোগী হইয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে।—এমন নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক লেখা আজকাল যত অধিক বাহির হয়, ততই মঙ্গল।

গোবধ লইয়া আন্দোলনের পূর্ব্বে, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমহাত্মারা একটু ত্যাগ স্বীকার করিলেই ত বারোআনা গোবধ আপনিই কমিয়া যায়। "গাছের ছাল আছে, আটা আছে, রবার, শোন্, পাট, কার্পাস, কর্ক বা অন্য কিছু হইতে জুতা, ব্যাগ, কুরিয়ার ব্যাগ; মণিব্যাগ, ঘোড়ার সাজ, মণিবন্ধ-ঘটিকার বগ্‌লস্ প্রভৃতি প্রস্তুতের উপায় করিলে হয় না? ও ভেজিটেবেল-সু বা তরকারি-পাদুকায় কাজ চলিবে না;—ও জিনিসটী মুগ্ধবোধ পাঠের পূর্ব্বে বিদ্যাসাগরের উপক্রমণিকাও নয়।" "বাঙলা ত বিজ্ঞান বিজ্ঞান করিয়া অজ্ঞান হইয়াছে, গোবধের জন্য খৃষ্টান মুসলমানকে দায়ী করিবার পূর্ব্বে প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে পদাভরণের উপকরণ আদায়ের চেষ্টা" "তাঁহারা অগ্রে" করুন না কেন?"

লেখকের তীব্র কশা কাহাকেও বাদ দেয় নাই। তা তিনি রাজা মহারাজই হ'ন্, আর লর্ড নাইটই হন্। "মুমূর্ষু জনক-জননীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অন্যান্য আশা নৈরাশ্যের চিন্তার সহিত প্রথম ভাবনা,—দিনকতক খালি পায়ে চ'লে কষ্ট পেতে হবে। শতকরা ৯৯·৯ জোড়া জুতা তৈয়ারী হয় গোচর্ম্মে। পৃথিবী—ভারতবর্ষ—সমগ্র বঙ্গদেশের কথায় আর কাজ নাই; মাত্র এই কলিকাতা নগরীতে যত লক্ষ জোড়া বিনামা বিক্রীত হয়, তাহার জন্য চর্ম্ম সরবরাহ করে কি—যে সকল বলদ, গাভী বৎস আয়ুর্ব্বেদমতে পীড়িত হইয়া সজ্ঞানে ধাপা লাভ করে তাহাদেরই দেহ? এই জুতার ছুতায় কত গরু মানবের হস্তে আইনী বে-আইনী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার হিসাব কোন Statistician করিয়াছেন কি? জুতার উপর আবার উপসর্গ আছে পোটম্যাণ্টো, ব্যাগ, সুটকেশ্—ইত্যাদি ইত্যাদি।" ইহার টীকা অনাবশ্যক। এক কথায় "কৌতুকযৌতুক" বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিল। বাঙ্গালীকে একটা নূতন উপাদেয় জিনিষ উপভোগ করিতে দিয়া রসরাজ অমৃতলাল কৃতজ্ঞতার ভাজন হইলেন।

সুদর্শন

নারীর ঠাকুর—শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—১৬৯ পৃষ্ঠা,—মূল্য দেড় টাকা।

এখানি একখানি উপন্যাস। আখ্যানবস্তুর কোনই বিশেষত্ব নাই। সাধারণতঃ যে সমস্ত বড় গল্পের বই সাধারণ পাঠকের চিত্তবিনোদনের জন্য নিত্যই বাজারে বাহির হইতেছে ইহা তাহারই অন্যতম।

গ্রন্থকারের আরও কয়েকখানি উপন্যাস পূর্ব্বেই বাহির হইয়াছে, কিন্তু তথাপি তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না! ৬ পৃষ্ঠায় "শচীন রাগে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া……'তবে মর'……বলিয়া মৃণালের বুকে চাপিয়া বসিল" তারপর "চাকুছুরীর চক্‌চকে ফলার ডগাটা মৃণালের কম্পিত কণ্ঠের উপর বসাইয়া দিয়া জোরে চাপিয়া ধরিতেছিল।" ইতিমধ্যে জগদানন্দের আবির্ভাবে মৃণাল রক্ষা পাইল। পরে তাহার মুখে মাথায় "প্রায় পনের মিনিট" জল দিতে দিতে তবে "মৃণাল চাহিল"। কিন্তু ইহার পরেই শচীন-মৃণালের কথোপকথন দীর্ঘ পাঁচ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ইহা আদৌ স্বাভাবিক বলিয়া ত আমাদের মনে হয় না। হেমলতা কর্ত্তৃক কৌতূহলবশে মৃণালের শ্বশুর ও স্বামীর জেলের সম্ভাবনা বিষয়ক প্রশ্নের উপর গ্রন্থকার তাঁহার গল্পটি অনেকাংশে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা গ্রন্থকারের ভাষায় উইয়ের ঢিবিকে পাহাড়ে পরিণত করা হইয়াছে মাত্র। মৃণালের গহনা প্রত্যর্পণ ও অজিতকুমারের দলিলাদি ভস্মীকরণও বলিবার দোষে স্বাভাবিক হইতে পারে নাই।

নিগৃহীতা—শ্রীবিজনবালা কর প্রণীত,—আর্য্য পাব্‌লিশিং হাউস্ (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত,—১৭০ পৃষ্ঠা,—মূল্য দেড় টাকা।

লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিতা নহেন, কিন্তু তাঁহার এই উপন্যাসখানি সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য। আখ্যান বস্তুটি পুরাতন,—কিন্তু তাহা লেখিকা এমন সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন যে, পড়িবার আগ্রহ পত্রে পত্রেই জাগিয়া উঠে। তাঁহার লেখা সরল, সরস ও প্রাঞ্জল, গল্প বলিবার ভঙ্গি মধুর ও কৃত্রিমতা-বর্জ্জিত, এবং ঘটনাদির যথাযথ সমাবেশে তাঁহার পুস্তকখানি সুলিখিত ও সুখপাঠ্য।

অন্ধপথিক—শ্রীমোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও ঘোড়ামারা, রাজসাহী হইতে প্রোফেসর বি, দাস, এম, এস্-সি ও মিঃ জে, চৌধুরী এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক প্রকাশিত—৩৯৬ পৃষ্ঠা,—মূল্য দুই টাকা।

সংসার পথে কত পথিক অন্ধ ভাবে বিচরণ করিতেছে,—তাহারা জানেনা, বুঝেনা যে পদে পদে অন্ধের কত বিপদ। তাই গ্রন্থকার সাবধান করিয়া দিবার জন্য এইরূপ এক অন্ধ পথিকের বিবরণ তাঁহার উপন্যাস খানিতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইবে বলিতে পারিনা, কিন্তু তিনি যে তাঁহার কর্ত্তব্য সুন্দরভাবে করিতে পারিয়াছেন তাহা অকুণ্ঠিতভাবে বলা যাইতে পারে। তাঁহার রচনা সুখপাঠ্য, তাঁহার চরিত্রগুলি এই সংসারেরই লোক, এবং তাঁহার বলিবার কৌশল প্রশংসার্হ। ঘটনা-বাহুল্যে ভারাক্রান্ত না হইলে গল্পটি আরও মনোরম হইত।

দূরের আলো—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এল প্রণীত,—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত,—২৪৩ পৃঃ,—মূল্য দুই টাকা।

এখানি ডাঃ নরেশচন্দ্রের নূতন উপন্যাস—পড়িয়া যথোচিত আনন্দ পাইলাম এবং আরম্ভ করিয়া একেবারে শেষ করিতে হইল। স্বাদেশিকতা ব্যবসায়িগণের চিত্রটি নিপুণভাবেই অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাঠকগণকে দিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ভয় হয়, পাছে, কেহ আবার কোন দিক হইতে "বন্দে……" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে! বলা বাহুল্য, এই চিত্রটি বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। "বন্দে……"র ভয় অগ্রাহ্য করিয়া যে তিনি ইহা সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারিয়াছেন, সেজন্য তিনি প্রশংসার্হ। পুস্তকখানির স্থান বিশেষে ও চরিত্রবিশেষে "ঘরে বাইরে"র ছায়াপাত হইয়াছে। তা' হউক,—তথাপি ইহার নূতনত্বের দাবী অগ্রাহ্য হইবে না।

তৃষ্ণার দিনে

করীর অঙ্গ-ছায়ায় ছায়ায় সঙ্গে চলেছে 'হরি'
তৃষ্ণায় 'হরি' হিংসা ভুলেছে শঙ্কা ভুলেছে করী।
নিয়ত উষ্ণ পবন সেবনে প্রখর তপন করে
শতগুণ হয়ে গরল অহির শরীর দগ্ধ করে।
দলে দলে তারা ছায়ার ভিখারী শিখি-শিখাতলে জোটে,
যদিও ক্ষুধিত, ক্লান্ত কলাপী স্পর্শ করে না ঠোঁটে।
মণ্ডূক-কুল হইয়া আকুল আতপতপ্ত জলে,
শরণ নিয়েছে শ্রান্ত ফণীর ফণার ছত্র তলে।
গ্রীষ্মের দাপে বৃকগর্দ্দভে এক ঘাটে করে পান
নিত্য বিরোধী দ্বন্দ্ব রচিয়া রাখে পাণিনির মান।
এ নিদাঘ তাপ শুধু সহে ছাগ,—দক্ষের বরে বুঝি—
দেখায়ে ভ্রান্ত ভল্লুকে পথ জলাশয় দেয় খুঁজি।
তাপিত ব্যাকুল কৃকলাস কুল না পেয়ে তৃষার জল,
অজগর-দেহ-বিগলিত স্বেদ পিইতেছে অবিরল।
পল্বলে দাহ জুড়ায় বরাহ, খুঁজিছে মুস্তামূল
নিপান পঙ্কে বিলীন শরীর ক্লান্ত মহিষ কুল।
করেণুরে তার নিয়ে গজরাজ নেমেছে হ্রদের নীরে,
কমলপত্রে শ্যামাতপত্র রচে দয়িতার শিরে।
শুণ্ড ধারায় সিনান করায় বারবার তারে সুখে,
মৃণাল কন্দ ছিঁড়িয়া আদরে পূরে দেয় তার মুখে।
চমরী পেয়েছে অমরীর মান, পুচ্ছ পূজারী তার
গবয়ের গলকম্বল আজি গলগ্রহের ভার।
কূপে নামি তৃষা জুড়ায় শরভ হিংসায় কপি চায়,
কদলীকাণ্ড খড়্গো বিদারি গণ্ডার রস খায়।
কুম্ভশূন্যর তৃষার সৃষ্টি প্রান্তর মৃগ যত
মৃগ তৃষ্ণিকালাঞ্ছিত জল-ভ্রান্তিতে হয় হত।
তপের সৃষ্টি উষ্ট্র কেবল রবি-রোষে রয়ে' ধীর
মরু-পারাবার অবহেলে তরে লঙ্ঘিয়া গিরিশির।
বিষাণ-তাড়নে বৃষ রোষে ভূমি খুঁড়িতেছে বারবার,
তাপের জ্বালায় মাটীর তলায় পশিতে বাসনা তার।
ছায়া-লোভে আজি শষ্পের মায়া ছেড়েছে গোঠের ধেনু
পাঁচনি তেয়াগি বট তরুতলে রাখাল ধরেছে বেণু।
তৃষার জ্বালায় নিশায় জ্বালায় আলেয়া উল্কামুখী
ভাবে লোমকেশ-নিপীড়িত মেষ শূকরই আজিকে সুখী।

বাজি ভাবে আজি শোণিত-মথিত ফেনিল ঘর্ম্মে নেয়ে,
সিন্ধু ঘোটক হওয়া ছিল ভালো সিন্ধী ঘোটক চেয়ে।
পাখী ভাবে আজ পাখাতে কি কাজ—পারি যদি মীন হই,
কর্কটই সুখী মীনভাবে আজি, জলে শীতলতা কই ?
গরবিণী চাঁপা বৃক্ষচূড়ায় ঝলসি পড়িয়া ভাবে
এর চেয়ে ঢের সুখ আছে হীন পঙ্কে জনম লভে।
কাঠঠোকরাটি ঠেঁটের ঠোকরে গণিছে দণ্ডপল
গগনের ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে ধ্বনিত "ফটিক জল"।
দীর্ঘ দিনেরে হ্রস্ব করিতে ঝিঁঝিঁরা করাত টানে
দীর্ঘতা আরো দুঃসহ হয় ক্লিষ্ট ক্লান্ত তানে।
তাপ-চঞ্চল সারস মরাল ছিটায়ে পাখার বারি
সজীব করিয়া রেখেছে এখনে যত রাজীবের গাড়ী।
কুম্ভীর দেহে শম্বুককুল ছাড়িছে তপ্ত শ্বাস
ফুম্বের শীতল গর্ভকুহরে অহিকুল করে বাস।
কপোতকণ্ঠে তাপিত সৌধ তৃষ্ণা জানায় তার,
শুকশারিগুলি আজি বুলি ভুলি শুধু করে চীৎকার।
ভূতলে আজিকে নামেনি চাতকী দূষিওনা তারে তবু,
বারি কণা সাথে পারিবে কি দিতে প্রেমকণা তারে কভু ?
মদভরে সে ত ঘুরে না গগনে ত্যজি হ্রদ নদী বন
নিয়ে গেছে সে যে কণ্ঠ ভরিয়া নিখিলের আবেদন।
প্রিয়জন পাশে ব্যর্থ হলেও প্রার্থনা তবু শ্রেয়ঃ
অন্যের কাছে না যাচিতে পাওয়া তাও যে বড়ই হেয়।
দূত অবধ্য—শঙ্খচিলেরে ভানু নাহি বধে প্রাণে
মেঘের বার্ত্তা আনিতে গিয়া সে ঝড়ের বার্ত্তা আনে।
অন্য পাখীরা গিয়াছে ভুলিয়া পক্ষের ব্যবহার
ঝঞ্ঝা জীর্ণ কুলায়ের পুন করিছে সংস্কার।
বনস্পতির বক্ষকোটরে কীট খুঁজে খুঁজে ঘুরে
দাবানল ছাড়া বন হতে তারা ব্যোমপথে নাহি উড়ে।
দাহের ব্যাধিতে অধীর ব্যাধেরা সুলভ শিকার ছাড়ি
ধরাসনে আজি শরাসন ত্যজি হইয়াছে ফলাহারী।
মৃগয়াসক্ত নরপতি আজ কৃপা করি পশুগণে,
বন ত্যজি ঘুরে মনো মৃগয়ায় উপবনে তপোবনে।
বধ্য আজিকে হন্তারও কাছে তৃষ্ণার জল চায়
কর' জলদান, হরো শেষে প্রাণ, ক্ষোভ খেদ নাহি তায়।

শ্রীকালিদাস রায়

"আর কত নীচে—?"

আস্‌ছিলাম—মেঠো রাস্তা দিয়ে—তখনও কাণের পাশ দিয়ে পাগলের সুর ঘুরে-ফিরে যাচ্ছিল—

"আর কত নীচে ফেলিবে আমায়
ভোলা ভাঙ-খেকো শঙ্কর।"

মনে হ'ল—বেশ পরিকল্পনা! ঈশ্বর!—যিনি শঙ্কর—তিনি নিজে যদি ভোলা না হন—তিনি যদি ভাঙ-খেকো না হন—তা' হ'লে আজ এ জাতির এ দশা হবে কেন?

এমন সময় একটা গোঁঙানির আওয়াজ কাণে গেল। চম্‌কে চেয়ে দেখি একটি লোক রাস্তার নর্দ্দমায় পড়ে। কথা তার আড়িয়ে গেছে। দু'একটা ভাঙ্গা শব্দ বার হোয়ে জানিয়ে দিচ্ছে—দেরি নেই—তাকে বুঝি এগিয়ে নিতে শীঘ্রই চিত্রগুপ্তের রথ আস্‌বে। দুই একটা কুকুর 'ঘেউ-ঘেউ' করে তার পানে যাচ্ছে সে শব কিনা পরীক্ষা করে দেখ্‌তে। আর কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে কুকুর তাড়িয়ে সেই দেহটাকে রক্ষা কর্‌ছে। মন্দ নয়—জীবন-পথের নবীন উষার আলো যেন সাঁঝের অস্তোন্মুখ গোধূলিকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে।

জান্‌লাম—সে দেহখান একজন মুচির। সে এসেছে—কাল বাবুদের বাড়ী—বেগারের রস বয়ে। বেগার খাটা তার শেষ—এইবার পড়েছে ডাক। বুঝি তার পথ জানা নেই—তাই অপথে পড়েছে।

কাল প্রাতে সে যখন বাড়ী হ'তে বার হয়—তখন কুয়াসা সূর্য্যদেবকে একেবারে ছেয়ে ফেলেছিল। সে নিঃস্ব মুচি—অক্ষমও। বাড়ীর যারা সক্ষম—বেগার-খাটা তাদের পোষায় না—তা'হলে যে গাছ কামাই যাবে—জল ব'বে না। ও কাজ ক্ষমতাহীনের। কথায় বলে না—বাবুর বাড়ীর বেগার? তাই তারা পাঠিয়েছে—ওকে—যার জীবনের বেগার একরকম শেষ হয়ে এসেছে।

সে এসেছে—তার ছেঁড়া একখান কাপড় পরে—আর তার চেয়েও শত-ছিন্ন তালি-লাগানো একখান পাত্‌লা চাদর গায়ে দিয়ে।

কিন্তু শীত ত আর যেমন-তেমন নয়। বলে মাঘের শীতে বাঘ কাঁপে। তাতে আবার ছিটে-ফোঁটা অল্প-অল্প বাদ্‌লা। দিনটে বোধ হয় তিরিশে পোষ। সেইদিন সে কুয়াসা ও বাদল মাথায় করে এসেছিল—রস দিতে। সেদিন সংক্রান্তি—লক্ষ্মীপূজা ছিল। সাধে কি আর মাঠাকরুণ তাঁর পেচকটিকে বেগার খাট্‌তে রেখে সাগর-পারের অতিথ হয়েছেন।

জমিদার বাড়ী রস যোগান দিয়ে সে ধূলোপায়েই লগ্ন করে—বাড়ী ফেরার জন্যে। কিন্তু ফির্‌তে পারে নি'। ঐ কুয়াসা ও বাদলের ভেতর দিয়ে যে তার ডাক এসেছে। মেঠো পথ ও তার গাঁয়ের বাঁশ বন আর কেমন করে তাকে ফিরিয়ে নেবে।

সে পার্‌ল না। পথের ধারেই এলিয়ে প'ল। সেই দিনই হয়ত'—তার শেষ চলার পথ পার হয়ে সে বেগারের বাইরে চলে যেতে পার্‌ত—কিন্তু তাতে বাধা দিল—আর একজন নিরক্ষর ভেমো গয়লা।

রাতে সে অতিথিকে খেতে দিল—কিন্তু খাবে কে? খাওয়ার দিন যে তার ফুরিয়ে গেছে। পরদিন সকালে সকলে ব্যাপার দেখে তাকে বল্‌ল—"করেছিস কি? ও যে মল বলে। শেষ কালে এই মুচির মড়া নিয়ে ফেসাদে পড়্‌বি? প্রাচিত্তির করতে হবে।"

প্রাচিত্তির কর্‌তে হবে?—নিরক্ষর গোপ চমকে উঠ্‌ল। তারপরই সে তাকে ঘর থেকে বার করে দিল। দুর্ভাগা মুচি গড়াতে গড়াতে এই থানায় এসে পড়েছে।

আরও হতভাগ্য আমি!—এই মৃত্যু পথের পথিক আর কারও চোখে না পড়ে—পড়্‌ল—আমারই এই চশমা-ঢাকা চোখের সাম্‌নে।

কিন্তু কি কর্‌ব? কোনও সৎ-শূদ্রের গাড়ী তাকে বাড়ী পৌঁছে দেবে না। কারণ সে মুচি। বাড়ী তার সেখান হতে ক্রোশ দুই তফাতে। আমার ক্ষীণ বাহুর এমন ক্ষমতা নেই যে তাকে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আস্‌ব।

হঠাৎ মনে হ'ল—মুচি-পাড়ায় যাই। দেখি তাদের মধ্যে যদি কারও মনে একটু মায়া দয়া হয়। কিন্তু পথেই যে নমুনা পেলাম—তাতেই আশা আর আমার গতিকে মোটেই চঞ্চল করে তুল্‌ল না। পথে দু'জন মুচিকে দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"একটি লোক পথে পড়ে মর্‌চে—সে তোমাদেরই স্বজাত! একটু যদি—"

আমাকে কথা আর শেষ কর্‌তে হ'ল না। তার আগেই তারা আমাকে উত্তর দিয়েই ত্বরিতপদে নিজেদের পথ দেখ্‌ল—"সরকারি (মিউনিসিপালিটির) মেথর আছে—তাদের খবর দিন—তারা ফেলে দেবে 'খন।"

"এখনও মরে নি যে!" সে কথা আর কে শোনে?

মুচিপাড়াতেও ফল হ'ল ঠিক সেই এক রকমই। কেউই গেল না। বল্‌লাম—"বেগার খাটাব না—ভাড়া দেব। যদি গাড়ীতে মরে—গাড়ীরও দাম দেব।" তবুও কেউ যেতে রাজি হ'ল না। কেউ বা মুখে স্বীকার করে বাড়ীর পেছন দিক দিয়ে বার হোয়ে গেল। কেউ গরু আন্‌তে গেল ত'—গেলই—আর ফিরে এল না। তাকে ডেকেও পেলাম না। আমারই একজন প্রজা! সে যাবে না—পাছে আমার চোখে পড়ে যায়—এই ভয়ে সে যখন গোলার

তলা দিয়ে—হাটু গেড়ে পালিয়ে গেল— তখন আমার হাসিও এল—দুঃখও হল। হায়! যেখানে যেখানে জন-সাধারণ (Mass) এই রকম—সেখানে স্বরাজের রূপ হবে কি?

লক্ষ্য কর্‌লাম—সকলেই ভাব্‌ল—এ যেন বাবুদেরই দায়! স্বদেশী দায়—চরকা দায়েরই মত একটা কিছু।

সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম। ভাব্‌তে চেষ্টা কর্‌লাম—কি উপায়ে তাকে একটু শান্তিতে মর্‌তে দিতে পারি। কিন্তু এসে দেখি আমার সমস্ত চেষ্টা বৃথা। মানবজাতির নির্ম্মমতাকে দলে সে তার যাওয়ার শেষ করেছে। চোখে পড়েছে জাল, দেহ অসাড়। নেড়ে দেখি—শক্ত কাট হয়ে গেছে।

হয় ত' সে আর বেশী দিন বাঁচ্‌ত না। কারণ তার প্রতি ভঙ্গিটিই বলে দিচ্ছিল—যে তার শেষ হোয়ে আস্‌ছে। কিন্তু তবু আমাদেরই একজনের জন্যে এক ভাঁড় রস এনে যে—সে মরণের পথে এগিয়ে গেছে—সে কথাটি কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌ছিনে।

সেই বেদনা বুকে করে যখন শীতের সন্ধ্যায় স্নান করে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বাড়ী ফির্‌ছি—তখনও পাগল তার গান থামায় নি'। কেবলি তার করুণ কণ্ঠের কাঁদন কাণে গিয়ে ঘা মার্‌তে লাগ্‌ল—

"আর কত নীচে ফেলিবে আমায়
ভোলা ভাঙ্‌-খেকো শঙ্কর!"

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

শোক-সংবাদ

পরলোকগত কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়

"যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি,
যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি।
প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তী
সোঽহং ব্রজামি বিপিনে জটিলস্তপস্বী॥"

কোথায় আজ আমরা, মহা সমারোহের সহিত, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের বিরাট্ সৌধে প্রবেশ-উৎসবের সংবাদ প্রচার করিব, বাঙ্গালীর খাটি নিজস্ব প্রাচীন গৌরবের বিজয় পতাকা উড়াইব, আর কোথায় কি না, চিকিৎসক-শ্রেষ্ঠ, দানবীর, দরিদ্রের বন্ধু অক্ষতচরিত কবিরাজ যামিনীভূষণের অকাল প্রস্থানের ঘোর দুঃসংবাদ পাঠকদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি।

সেই সতত সস্মিতবদন, বন্ধুবৎসল প্রিয়ংবদ যামিনীভূষণ, সেই অধ্যয়ন-রত, অধ্যাপন-নিপুণ, নৈরাশ্যের ভরসা—শান্তমূর্ত্তি যামিনীভূষণ, সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অর্থীর কল্পবৃক্ষ, রোগ-ক্লিষ্টের ধন্বন্তরি, পরহিত-সর্ব্বস্ব যামিনীভূষণ আর নাই। যাঁহার সুমধুর বার্ত্তালাপে

রোগীর যেন অর্দ্ধেক রোগ কমিয়া যাইত, যাঁহাকে রোগশয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিলে মুমূর্ষুরও জীবনে আশা হইত, ধনী, রাজারাজড়া অপেক্ষা দীনহীন কাঙাল যাঁহার অধিকতর প্রিয় ছিল, হায়, সেই মহাপ্রাণ যামিনীভূষণ—আর নাই। নিজ হইতে পথ্যাদি ব্যয় দিয়া যিনি কত শত সহস্র দরিদ্র রোগীকে জীবনদান করিয়াছেন, এবং শেষে পাথেয়াদি দিয়া দেশে পাঠাইয়া দিয়াছেন, সেই দয়ার প্রস্রবণ পরদুঃখকাতর যামিনীভূষণের লোকান্তরে—আজ বঙ্গের তথা আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালোচনার যে ক্ষতি হইল, তাহার আর পূরণ হইবে না। তিনি জাঁকজমক ভাল বাসিতেন না। নীরবে কাজ করিয়া যাইতেন। অর্জ্জুনের ন্যায় তিনি লক্ষ্যরূপ মৎস্য-চক্রের দিকে সমগ্র প্রাণটা উৎসর্গ করিতেন ও বাধাবিপত্তি যত অধিক ঘটিত, তাঁহার উৎসাহ ততই বাড়িত। এক কথায় অমন অদম্য অধ্যবসায়ী লোক অতি বিরল। বড় সাধ ছিল,—তিনি, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদভবনকে ভারতের আদর্শ চিকিৎসা সদনে পরিণত করিবেন,—এবং জীবনের অপরাহ্নে ঐ মন্দিরে বসিয়া আয়ুর্ব্বেদ সাধনায় প্রাণ ঢালিয়া দিবেন, হায়, দুর্দ্দৈব, দেশের অভাগ্য, বাঙ্গালীজাতির দুরদৃষ্ট সে রমণীয় সঙ্কল্প মধ্যাহ্নেই বিনাশ করিল! যামিনী-ভূষণ একপ্রকার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয়ে আয়ুর্ব্বেদ হাসপাতালের সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অনেক কাজই বাকি,—স্বদেশ-প্রাণ প্রত্যেক বাঙ্গালীর উচিত, বাঙ্গালার ঐ কীর্ত্তি-মন্দিরের পূর্ণতা বিধান করা। লক্ষ লক্ষ টাকা ততোধিক একপ্রকার নিজের প্রাণ তিনি ঐ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের কল্যাণে সমর্পণ করিয়াছেন। দিনরাত্রি তাঁহার চিন্তা ছিল, ধ্যান ছিল, স্বপ্ন ছিল—ঐ বিদ্যালয়। আশা ছিল, ঐটি সম্পূর্ণ করিয়া বাঙ্গলার প্রত্যেক নগরে—বৰ্দ্ধিষ্ঠ জনপদে—তাহার একটি শাখা বিদ্যালয় ও দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিবেন।

গত পৌষের বড়দিনের বন্ধের সময়ে মধুপুরে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, এক ব্রাহ্মণের নিকটে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে শুনিয়াছি,—"আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন আমার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ ভবন মনের মত করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি। অন্য প্রার্থনা নাই।"—এত বড় কথা, এত বড় প্রাণের পরিচয়, এত বড় আত্মত্যাগ বড় দেখা যায় না। বঙ্গদেশ আজ নানাপ্রকার আধিব্যাধিতে জীর্ণ শীর্ণ, এই সময়ে যাহার দিকে লক্ষ লক্ষ লোক কাতরনয়নে চাহিয়াও শান্তি পাইত, সেই যামিনীভূষণকে হারাইয়া আজ দুঃখিনী বঙ্গভূমি যে আঘাত পাইলেন,—তাঁহার বেদনার আর অপনোদন হইবে না। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ সদনের সৌধ সম্পূর্ণ করিবার সাহায্যের জন্য মধুপুরে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত তারকনাথ সাধু মহাশয়ের নিকট যামিনীভূষণ ও রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ একত্রে যে দিন যান, সেই দিন তথায় যামিনীভূষণ বলিয়াছিলেন—"রায় বাহাদুর! আমরা সর্ব্বস্ব দিচ্ছি, আমাকে দিচ্ছি,—আপনারা মাত্র গ্রহণ করুন।"

আহা, এই সে দিন স্যর এওয়ার্ট গ্রীভ্‌সের বিদায় সম্বর্দ্ধনার দিন সেনেটহলে যামিনীভূষণ যখন সস্মিতমুখে সকলকে আপ্যায়িত করিতেছিলেন, তখন কে জানিত যে, তার তিন দিন পরে তিনি বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীজাতিকে, সেই সঙ্গে তাঁহার চিরানুরক্ত ভারতের রাজন্যবর্গকে কাঁদাইয়া অপসৃত হইবেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কবিরাজ শ্রীমান বিনয়ভূষণ রায় বি. এস. সি. তদীয় পিতৃ পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক বংশের কীর্ত্তিধারা বজায় রাখুন, ভগবচ্চরণে এই প্রার্থনা।

পরলোকগত কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়

ভাদ্রে

লর্ড সিংহ—বিলাত আপিলের প্রিভি কাউন্সেলে শ্রীযুক্ত লর্ড সিংহ একজন বিচারপতি রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। জ্ঞানের গভীরতায়, নিপূণ বিচারশক্তিতে ও চরিত্রের সাধুতায় তিনি যে এই পদের জন্য বিশেষ উপযোগী পুরুষ তাহা তাঁহার বিরোধী দলের লোকেরাও স্বীকার করিবেন। রাজনীতিতে হোক বা সমাজনীতিতে হোক, তিনি নিজের বিবেচনায় যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহাই চিরদিন অকপট ভাবে অবলম্বন করিয়াছেন ও নিজের জীবনে অনুষ্ঠিত হইতে দিয়াছেন। যাঁহারা রাজনীতির ক্ষেত্রে লর্ড সিংহের মতের বিরোধী তাঁহারা তাঁহার সত্যনিষ্ঠার ও অকপটতার বিরোধে কিছু বলিতে পারেন না। সরকার বাহাদুর উঁহাকে অনেক উচ্চ পদে যখন প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন অর্থের হিসাবে লর্ড সিংহকে পদে পদে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। এখন তিনি হয়ত অধিক উপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, কাজেই এই নূতন সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুখে ও শান্তিতে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবেন।

দণ্ডবিধানের নূতন প্রস্তাব—রাজদ্রোহ সূচক কোন কথা লিখিলে ও প্রচার করিলে, অথবা যে উক্তিতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও দণ্ড ঘটে তাহা প্রচার করিলে দণ্ডবিধির বিশেষ বিধানে অপরাধীকে দণ্ডিত করিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তবুও শ্রীযুক্ত ম্যাডিমান সাহেব ঐ বিষয়ে অতিরিক্ত নূতন ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। সংবাদ পত্র প্রভৃতিতে প্রকাশিত যে কোন উক্তি পুলিশের বিবেচনায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা উত্তেজনা জন্মাইতে পারে বলিয়া বিবেচিত হইলে, পুলিশের লোকেরা সেই উক্তির জন্য লেখককে ও পত্রিকা প্রভৃতির পরিচালকদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন ও তাঁহাদের ঘর ও আপিস খানাতল্লাসী করিতে পারিবেন, ইহাই হইল সংক্ষেপে নূতন প্রস্তাবের মর্ম্ম। কি কথায় যে এক সম্প্রদায়ের জন কতক লোক উত্তেজিত হইতে পারেন বা পারেন না তাহা জানি না; তবে সংবাদ-পত্র প্রভৃতির উক্তি বিশেষ ধরিয়া লেখক ও প্রকাশককে গ্রেপ্তার করিবার সময় এমন ২।১০ জন লোক সর্ব্বদাই মিলিবে যাঁহারা সাক্ষ্য দিবে যে কথাগুলি তাঁহাদের কাছে উত্তেজক মনে হইয়াছে। রাজনীতির উপলক্ষে হোক অথবা সমাজ সংস্কারের সংকল্পে হোক, লেখক ও বক্তারা এমন অনেক কথা লিখিয়া থাকেন ও বলিয়া থাকেন যাহা দেশের অনেকের নিকটে অপ্রিয়; যদি এই শ্রেণীর অপ্রিয় শব্দগুলিকে উত্তেজক বা দ্বন্দ্ব মূলক বলা যায়, তবে সকল শ্রেণীর হিতৈষী লেখক ও বক্তাদিগকেই কলম ও মুখ বন্ধ করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত ম্যাডিমান হয়ত বলিতে পারেন যে, যদি আদালতের বিচারে উক্তিগুলি দোষযুক্ত বিবেচিত না হয় তাহা হইলে লেখক বা বক্তাদের কোন বিপদের শঙ্কা নাই। একথা ঠিক নয়; কারণ এক দিকে আদালতের বিচারের স্থিরতার উপর নির্ভর করা যায় না, আর অন্য দিকে আদালতের বিচারের কুঠোরতার

অপেক্ষা খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তারের কঠোরতা অনেক অধিক ও বহুগুণে অধিক কষ্টপ্রদ। পুলিশের হাতে প্রস্তাবিত ভাবে নূতন ক্ষমতা দিলে যে উৎপীড়ন বাড়িবার সম্ভাবনা আছে, ও নূতন সুফল পাইবার কোন আশা নাই, একথা অনেক সুধী বে-সরকারী ইংরাজও বলিতেছেন। আমাদের শাসনের জন্য যে এমন আইনের কল্পনা ও প্রস্তাব হইতে পারে, তাহাতেই আমরা চমকিয়া যাই, কারণ, যাঁহারা আমাদের জন্য শাসনদণ্ড ধরিয়াছেন, তাঁহাদের মনের ভাব বহু পরিমাণে এইরূপ প্রস্তাবে ধরা পড়ে। আমাদের হিতার্থে যাঁহারা করুণা করিয়া ১৮২৯ অব্দে আমাদিগকে উন্নততর অধিকারে ভূষিত করিবেন, তাঁহাদের হিতৈষণার পশ্চাতে যদি এই শ্রেণীর প্রীতি ও সহানুভূতি থাকে, তবে উপহৃত অলঙ্কারটি শৃঙ্খলে দাঁড়াইতে পারে।

শিক্ষার ব্যবস্থায় দেশের বিপদ—শিক্ষা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ব্যবস্থা আছে তাহা ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা পর্য্যন্ত; তাহার নীচে হইতে দেশের সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থার ভার শ্রীযুক্ত ডিরেক্টর মহোদয়ের হাতে। ডিরেক্টরের কর্ত্তৃত্বের অধীনে কি ভাবে নূতন কমিটি বসিবে ও পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব বারে লিখিয়াছি। বিষয়টি জানাইবার সময় অতি আগ্রহে দেশ হিতৈষীদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে তাঁহারা যদি অবিলম্বে ঐ প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিরোধী না হ'ন ও প্রতিকারের উদ্‌যোগ না করেন, তবে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। আমার মনে হয় যে কেহ কথাটাকে অত গুরুতর মনে করেন নাই, অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনের আকর্ষণে ও মোহে হিতৈষীরা এদিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ পান নাই; জোর করিয়া বলিতে পারি যে জলের বুদ্‌বুদের মত তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ্য উড়িয়া যাইবে, যদি এই মূল ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা না হয়। দেশের লোকে গোড়া হইতে কুশিক্ষায় বাড়িয়া উঠিলে ও মনে সংস্কার বিশেষ দৃঢ়-মূল হইলে, এ দেশকে উন্নতির পথে চালিত করা অসম্ভব হইবে। দুঃখ হয়, ক্ষোভ হয় ও লজ্জা হয়, যে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা কি ভাবে হইবে ও কি বই পড়িয়া হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার দিকে কাহারও আগ্রহ নাই, আর আমরা কেবল কাউন্সিলকে ভাঙ্গিব কি গড়িব তাহারি আলোচনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছি। সরকার বাহাদুর কোন নূতন পদ্ধতি রচনা করিয়া ফেলিবার পর এমন ২।৪ জন সমালোচক ও তার্কিক পাওয়া যাইবে, যাঁহারা পদ্ধতির ধারাগুলির দোষ দেখাইয়া তর্কশক্তির পরিচয় দিবেন; কিন্তু দেশের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেশের উন্নতি বিধানের জন্য যে প্রকার শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন, সে পদ্ধতি গড়িবার জন্য আমরা কাহাকেও পাইলাম না। যাঁহারা কিছুই গড়িতে জানেন না কেবল তর্ক করিয়া ছল ধরিতে জানেন। তাঁহাদের কাউন্সিল ভাঙ্গিবার ক্ষমতা যতই থাকুক, তাঁহারা দেশ পরিচালনে ও সমাজের হিতসাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অনুপযোগী।

Printed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani Office, 77 Russa Road North, Bhawanipur Calcutta.

বঙ্গবাণী

সবারই 'জবাকুসুম

"আবার তোরা মানুষ হ"

৫ম বর্ষ ১৩৩২-'৩৩ | আশ্বিন | দ্বিতীয়ার্দ্ধ ২য় সংখ্যা

আমন্ত্রণী

বোধন সানাই কানে পশে নাই প্রাণে বাজে নাই তোর ?
ওরে পরবাসী ছিঁড়ে ফেল ফাঁসী কাজ অকাজের ডোর।
গুটাও গ্রন্থ সুশীল ছাত্র, পুন জীবন্ত হও,
উঠাও যন্ত্র যন্ত্রীরা আর কেন যন্ত্রণা সও ?
কে কর' গোলামী, কেবল সেলামই করিয়াছ বারোমাস,
উদ্ধত বলে বলুক সকলে, আজো কেন ক্রীতদাস ?
দরকার হ'লে ছুড়ে দাও ফেলে আজি সরকারী চাবি,
চালাও বন্ধু, নাছোড়বন্দ সব আবদার দাবী।
হাতে আছে কাজ ? পড়ে থাক আজ, তুমি কি মজুর মুটে ?
রো'ক গোঁজা মিল, তুমি সোজা খিল খুলে চ'লে এসো ছুটে।
ভাঙো পা'র বেড়ী, হবে বুঝি দেরী মাইনে পাওনি বলি' ?
অচল রবে না সংসার এস 'চাইনে' বলিয়া চলি।

ট্রেণে ভিড় বড় ? যার লাগি জড় হয়েছে ষ্টেসনে সবে,
তারি লাগি তুমি এসো ভিড় ঠেলে, দাঁড়িয়ে গেলেই হবে।
বাঁশরীতে বাজে বারোঁয়া রাগিণী তব গৃহদ্বারে হোথা
সব আয়োজন ঠিকঠাক তবু তুমি পড়ে' আছ কোথা ?
এক মাস হ'তে উন্মনা হয়ে মা আছেন পথ চেয়ে,
দূর দিগন্তে প্রতি তরী পানে অনিমেষে চায় মেয়ে।
হাজার কাজের মাঝেও গৃহিণী একটু সময় পেলে
শুধু বারবার দিন গণে আর তপ্ত নিশাস ফেলে।
শিউলীর আলিপনে আঙিনায় ঠাইটুকু নাই ফাঁকা,
অলিপাখীকুলে আবাহন সভা রচেছে দাড়িম শাখা।
কলাকাঁধিগুলি ঠেকিছে মাথায় এ-ঘর ও-ঘর যেতে,
ফল সঞ্চয় করে রাখে গৃহ উঠানে আঁচল পেতে।
বুধু ঢালে দুধ এত যে, পুরাণো কেঁড়েতে ধরে না আর,
দেরী যে করিছ ? পাও নাই বুঝি এই সব সমাচার ?
সহরে পচিয়া কেমনে জানিবে শরৎ এসেছে দেশে,
গৃহ-ভাণ্ডার-ভরপুর, আর পিণ্ড গিলিছ মেসে ?
আশ্বিন ঝঞ্ঝা আসুক বৃষ্টি এস, মার ডাক শোনো,
বন্যাতলে যাক সকল সৃষ্টি ওজর করোনা কোনো।
নিজে ধরো দাঁড়, টানো গুণ, ঠেল কাদায় গাড়ীর চাকা
আসছ ত বাড়া ! ক্ষতি কি হোকনা হাত পা গা কাদামাখা।
হারিয়েই যদি যায় কিছু, যাক্, খেদ ক'রে কিবা ফল ?
পথে মুটে যদি না জুটে, ভেবোনা নিজ কাঁধে পাবে বল।
কত ভুল হবে কি হবে তা ভেবে কত র'য়ে যাবে প'ড়ে,
তালিকা মতন বরাতী জিনিস কিনেছ ত ভাল ক'রে।
দোকানে ধন্না মিছে, 'বিছে' 'ঝুল' দিবে কি স্বর্ণকার ?
থাক থাক দেরী করোনাক আর নিয়ে কাপড়ের পা'ড়।
হাসিমুখে শুধু এসো দ্বারতলে গোধূলির ধূলি মাখি'—
সাঁজ দীপ করে জননী আদরে নিয়ে যাক ঘরে ডাকি।

শ্রীকালিদাস রায়

চাণক্য-নীতি

১

সকালে মক্কেলের শুভাগমনে, আমার বাইরের 'ওসারা' গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল। তাদের বহুবিধ কাগজ ও নথী-পত্র-সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার আগে নিজেকে একটুখানি বিশ্রাম দিচ্ছিলাম। আর একটু কারণও ছিল। এই মাত্র ডাকে একটা চিঠি পেয়েছি, লেখা প্রিয়ম্বদা দেবীর। এই প্রিয়ম্বদা দেবীটিকে আমি জানিনা, তবে হিন্দিতে লেখা চিঠি, ও চিঠির ধরণ-ধারণ দেখে মনে হয় লেখিকা এ-দেশী (বেহারের) কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের বিবাহিতা নারী। চিঠির মর্ম্ম এই যে, তিনি অসহায় হিন্দু নারী, এবং এতদিন সুখেই ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি তাঁর স্বামী যে কাজ করতে অগ্রসর হয়েছেন, তাতে তাঁর জীবন মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে। তিনি লিখেছেন যে, সকল ব্যাপার সবিশেষ আমি উকীল দেওশরণ বাবুর কাছ থেকে জানতে পারব, এবং শেষকালে এই নিবেদনটুকু আছে যে, আমি উন্নতিশীল বাঙ্গলা দেশের সন্তান, সেইজন্য অপরিচিতা হয়েও তিনি আমাকে চিঠি লেখার মত এতবড় দুঃসাহসের কাজ করছেন এই ভরসায় যে, এর প্রতিবিধান একমাত্র আমার চেষ্টাতেই হ'তে পারবে। যদি না হয় ত' এই পৃথিবীতে থাকার তাঁর আর কোন প্রয়োজন নেই!

আজ পনর বছর বেহারের এই মহকুমায় ওকালতি করছি, প্রতিষ্ঠাও যে কিছু হয়নি তা নয়। কিন্তু এ দেশীয়দের সঙ্গে এমন ক'রে ত' মিশতে পারিনি যাতে ক'রে কোন কুলবধূ আমাকে চিঠি লিখতে পারেন! সুতরাং স্পষ্টই বোঝা গেল যে অত্যন্ত বিপদে না পড়লে প্রিয়ম্বদা দেবী আমার শরণ নিতেন না। কিন্তু কি সে বিপদ! আমি ওঁদের সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নই— আমার দ্বারা কি প্রতিবিধান সম্ভব হতে পারে?

দেওশরণের সঙ্গে দেখা হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে; ভাবলাম তার ওখান থেকে ঘুরে আসি। কিন্তু এই মক্কেলের ব্যূহ ভেদ করে যাওয়া শক্ত, এই সময় আমি বেরিয়ে যাচ্ছি দেখলে ওরা যে রকম হাহাকার ক'রে উঠবে—

কিন্তু ওই মর্ম্মভেদী চিঠিটা! চুলোয় যাক্ গে মক্কেল! যেতেই হবে।

দরওয়ানকে ডাকলাম, মহাবীর সিং।

মহাবীর সিং তার বলিষ্ঠ সুদৃঢ় দেহ অবনত ক'রে সেলাম ক'রে বল্লে, হুজুর।

আমি বল্লাম শীঘ্র গাড়ী জুত্‌তে বলো।

এই সময়ে গাড়ী জুত্‌তে বলায় সে একটু বিস্মিত হ'লো, খানিকটা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে, যো হুকুম ব'লে চলে গেল।

২

কিন্তু যেতে হ'লোনা। দেওশরণ নিজেই এসে উপস্থিত হ'ল।

আমি বল্লাম, এসো দেওশরণ আমি এইমাত্র তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম।

দেওশরণ নমস্কার ক'রে, শুষ্ক-দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বল্লে, আমি বড় বিপদেই পড়োছি।

আমি বল্লাম, কি বল ত'।

দেওশরণ চারিদিকে চেয়ে আমার আরও কাছে ঘেঁসে এসে বল্লে, আপনি আমার খুড়তুতো ভাই বিশ্বেশ্বরকে জানেন,—সেই যে পাটনায় আইন পড়ছে?

আমি বল্লাম, হুঁ।

বিশ্বেশ্বরের অনেকদিন বিয়ে হয়েছে - তার দুটি ছেলেও হয়েছে। বিশ্বেশ্বরের স্ত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, যেমন রূপে তেমনি গুণে। অথচ বিশ্বেশ্বর একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে যে সে আবার বিয়ে করবে। দেখুন দিকি!

আমার কাছে ব্যাপারটা অনেকটা স্পষ্ট হ'ল; আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বিশ্বেশ্বরের স্ত্রীর নাম কি প্রিয়ম্বদা দেবী?

দেওশরণ বল্লে, হাঁ।

আমি সেই চিঠিটা দেওশরণের কাছে এগিয়ে দিয়ে বল্লাম, এ তাঁরই চিঠি বোধ হয়।

দেওশরণ বারম্বার চিঠি পড়ে, তার দুই চোখ মুছে বল্লে, হাঁ, আমার ভ্রাতৃবধূরই চিঠি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ এ খেয়াল যে!

দেওশরণ খানিকটা চুপ করে রইল, তারপর আমার দিকে চেয়ে বল্লে, যতদূর জানতে পেরেছি, বিশেষ কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না, বোধ করি দাম্পত্য কলহ বা এমনি কিছু, যা সচরাচর দাম্পত্য-জীবনে ঘটে থাকে। অথচ এই সামান্য ব্যাপারটা এখন ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করেছে; আমাদের বাড়ীতে যদি যান ত' শুনবেন কেবল কান্নার রোল।

আমি বল্লাম, কিন্তু তুমি ত' বাড়ীর কর্ত্তা; তুমি জোর করে এ অনর্থটাকে বন্ধ করতে পারো না?

দেওশরণ আবেগের স্বরে বল্লে, বাড়ীর কর্ত্তা নামেই। বিশ্বেশ্বর জানে যে অর্দ্ধেক সম্পত্তি তার, অর্দ্ধেক আমার। শৈশবে সে পিতৃমাতৃহীন হয়, তাকে মানুষ করবার দায়িত্বই ছিল আমার, আজ সে যখন বড় হয়েছে, তখন আমার আর কি প্রয়োজন? মুখে না বল্লেও, তার ব্যবহারে স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যের ভাব দেখা যায়, এবং এ কথাও না কি সে জনান্তিকে জানিয়েছে যে আমি যদি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করি, ত' সে তার সম্পত্তি নিয়ে পৃথক হয়ে যাবে। কর্ত্তৃত্ব যেখানে শুধু মাত্র লোক-দেখান নামে র'য়ে যায়, সেখানে সে কর্ত্তৃত্ব যে কতবড় উপদ্রব,

তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। পাছে তার সত্যরূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, এই ভয়ে তার মিথ্যারূপকে কোন রকম ক'রে জোড়া-তাড়া দিয়ে ঠেকিয়ে রাখাই হ'চ্ছে আমাদের মত কর্ত্তাদের প্রধান কাজ।

আমি বল্লাম, তা বটে! কিন্তু একে যে-কোন প্রকারেই যে বন্ধ করতে হবে দেওশরণ।

দেওশরণ কাতরস্বরে বল্লে, সেই জন্যেই ত' আপনার কাছে এসেছি। আমি ত' ভেবে কোনও উপায় করতে পারিনি। আপনি বয়সে ও মর্য্যাদায় আমার জ্যেষ্ঠের মত—একটা উপায় করতেই হবে।

সে কি বলে?

বলে, যে তার পিতামহর ছিল চারটে বিয়ে, প্রপিতামহের নটা, সুতরাং সে যদি তার জীবনের সুখের জন্যে আর একটা বিয়ে করে, ত' তাতে আর অন্যায় কি।

হাসিও এল, রাগও হ'ল। অন্যায়কে সমর্থন করবার যুক্তির অভাব মানুষের কোনও দিন হয় না।

আমি বল্লাম, কিছুতেই এ অনর্থ ঘটতে দেওয়া চলবে না, দেওশরণ। কার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে?

জগন্নাথ মোক্তারের মেয়ের সঙ্গে।

সে কি বলে?

সেই ত অগ্রণী। এর ভেতরে সবচেয়ে লাভবান যে সেই! তার একপয়সা খরচ নেই অথচ বর ঘর সে পাচ্ছে ভালই।

ভাবলাম, সুবিধা সবারই; শুদ্ধ, হায় অভাগিনী হিন্দু কুলবধূ প্রিয়ম্বদা।

আমি বল্লাম দেওশরণ, আমাদের সমাজ হয়ে গেছে মড়া, তাই তার বুকের ওপর বসে যে যা ইচ্ছে করছে। আমরা সমাজের তরফ থেকে ওদের ওপর এমনি চাপ দেবো যে ওরা বুঝবে যে সমাজ এখনও ইচ্ছে করলে জাগতে পারে! জাগিয়ে তুলতে হবে এই সমাজকে, এই সংহত শক্তিকে।

দেওশরণের মুখ অনেকটা প্রফুল্ল হ'ল। বল্লে, কি করতে হবে?

আমি বল্লাম, আজ বিকালেই সমাজের এক মিটিং করো—তাতে আমিও যাব। মোক্তার জগন্নাথকেও ডাকতে হবে। এখনই নোটিশ দিয়ে দেও।

৩

বিকালের দিকে আকাশে মেঘ হয়েছিল সেই জন্যে মিটিং এর অবস্থা সুবিধা নয়। পাছে বৃষ্টি নেমে, আস্‌বার বা ফেরবার পথে জামা কাপড় ভিজে কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয় এই ভয়ে

অনেকেই অনুপস্থিত। প্রেসিডেণ্ট হবার কথা ছিল চতুর্ভুজপ্রসাদ উকীলের। শোনা গেল তাঁর এক সাহেব মক্কেল এসে পড়ায়, তিনি আসতে পারেন নি।

জগন্নাথ মোক্তার এসেছিল।

তাকে আমরা সবাই চেপে ধরলাম। বল্লাম মোক্তার সাহেব, এ কি অন্যায় কথা!

মোক্তার সাহেব চোখ দুটো বড় করে বল্লে, এতে অন্যায় কি? আপনাদের আজকের প্রেসিডেণ্ট যে সুখদেও বাবু, ওঁরই ত তিনটে বিয়ে!

সুখদেও বাবুর মুখ কালি হয়ে গেল। গোটা দুয়েক ঢোক গিলে তিনি চুপ করে রইলেন।

এই অকাট্য যুক্তির জোরে সবাই স্তব্ধ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল!

আমি বল্লাম, তিনটী কেন, কারুর হয়ত দশটা বিয়ে হতে পারে! কিন্তু সে দিন ত নেই! আজকের মানুষের সত্য বুদ্ধি বলছে, একটার বেশী বিয়ে করার কারুই অধিকার নেই, শুদ্ধ মাত্র নরের পশু-বৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে নারীর জীবন বিষময় করে তোলার দিন গত হ'য়েছে।

মোক্তার বল্লে, কি করতে বলেন আমাকে!

আমি জোর করে বল্লাম, এ বিয়ে বন্ধ করে দিন।

মোক্তার রাগ করলে না, সহজ স্বরেই বল্লে, উকীল সাহেব! আমি গরীব মানুষ। আমার মেয়ে বড় হয়েছে—তাকে আর অবিবাহিতা রাখতে গেলে, আপনারাই আমার ওপর চোখ রাঙ্গাবেন। এমন সুবিধায় আমি যে তার বিয়ে দিতে পারব সে কল্পনাও আমার ছিল না। পাত্রের, মেয়ে খুব পছন্দ হয়েছে—সে হয়ত' কিছুতেই মানবে না। সেখানে আপনারা চেষ্টা ক'রে দেখেছেন কি?

আমি বল্লাম, তাকেও আমরা লিখব।

মোক্তার বল্লে, লিখে দেখুন। তারপর আমার মেয়ের বিয়ের একটা ভাল রকম ঠিকানা ক'রে দিন, আপনারা সমাজের গণ্যমান্য অনেকেই ত' এখানে রয়েছেন; খরচপত্র যাতে কমেই হয়। আপনারা যদি আমার এই কাজগুলি ক'রে দেন, ত' আপনাদের আজ্ঞা পালন করতে আমার কোনই আপত্তি নেই!

উত্তর শুনে মাথার ভেতর রী-রী করতে লাগল। কিন্তু জবাব দেওয়াও ত' শক্ত!

আমি বল্লাম, দেখুন মোক্তার সাহেব! যদি আপনি এই বিয়ে বন্ধ না করেন, ত' সমগ্র সমাজের যে শক্তি আছে তাই নিয়ে সে আপনার শত্রু হ'য়ে দাঁড়াবে—এই কথা মনে রাখবেন!

মোক্তার সাহেব আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় সুতরাং সমাজ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বেশী। তিনি হেসে বল্লেন, সমাজের এত শক্তির ত' কোনও দিনই পরিচয়

পাইনি, উকীল সাহেব, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে যদিই বা সমাজ হঠাৎ এই রকম শক্তি-সঞ্চয় ক'রে আমার শত্রু হ'য়ে দাঁড়ায়, ত' ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রে সমাজকে ফাঁকি দেওয়াও ত' শক্ত নয়।

রাগে সমস্ত শরীর যেন কাঁপতে লাগল, কিন্তু বাকী লোকের দিকে চেয়ে দেখলাম তারা একে সহজভাবেই নিয়েছে। কারুর বা মুখে কৌতুকের হাসি। শুদ্ধ পিছন থেকে একজনের ক্রুদ্ধ নিশ্বাস ফুঁপিয়ে উঠছিল, ফিরে দেখলাম, সে আমার দরওয়ান মহাবীর। আমি তার দিকে চাইতেই সে দুই হাত জোড় করে বল্লে 'হুজুর ইঁহাসে চলিয়ে।'

আমারও আর থাকবার ইচ্ছা ছিল না। বিশ্বেশ্বরকে একটা চিঠি লেখবার কথা সভাপতিকে ব'লে আমি চলে গেলাম।

৪

তারপর দিন কাছারীতে বিশ্বেশ্বরের চিঠির উত্তর এল সভাপতির কাছে। ভাবটা এই রকম :—

মান্যবরেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি—কাল মিটিংএর খবরও পেয়েছি। এটা আমার সম্পূর্ণ একটা পারিবারিক ব্যাপার, এ নিয়ে সমাজের এত মাথা ঘামান'র প্রয়োজন ছিল না, উচিতও ছিল না।

আপনারা যদি আমাকে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করবার মতলব করে থাকেন, ত' সে চেষ্টা বৃথা। আমার সঙ্কল্প দৃঢ়।

যদি যুক্তির কথা ওঠে, ত' আমার পক্ষেও যুক্তি আছে ঢের। যে স্ত্রীর সঙ্গে আমি বনিয়ে চলতে পারবোনা তাকে নিয়ে জীবন দুর্ব্বহ করবার প্রয়োজন নেই। আমার স্ত্রী বাইরের লোকের কাছে লক্ষ্মীস্বরূপা হ'তে পারে ; কিন্তু তা নিয়ে আমাদের পরস্পরের ভাব বিচার করা চলে না। সমাজের নিয়মে সে আবার বিয়ে করতে পারবে না সত্য, কিন্তু তাই ব'লে আমি আমার আবার বিবাহ করবার অধিকার ত্যাগ করি কেন? বুঝতে পাচ্ছি এ সব গোলযোগের মূল আমার দাদা দেওশরণ ; তার বোঝাপড়া তাঁর সঙ্গে একদিন আছে।

আপনারা সবাই আমার মাননীয়, আপনাদের মনে দুঃখ না দিতে পারলেই আমি সুখী হতাম। আপনারা, যদি আমার এই নিজস্ব ব্যাপারের ভেতর না থাকতেন ত' সেই হ'ত সব চেয়ে ভাল। কিন্তু তা যখন হয়নি, তখন আমি এইটুকু জানাতে চাই, যে আমার সঙ্কল্প অটল, বিবাহ হবেই।

বিনীত—বিশ্বেশ্বর।

পুনশ্চ :—আমার ছেলের বসন্ত হয়েছিল বটে কিন্তু সে অনেকটা ভাল আছে, আর সে তার মাতুলালয়ে।

দলপতিরা সবাই এই চিঠি পেয়ে দমে গেলেন। বোধ করি তাঁরা মনে করেছিলেন যে

একটা মিটিং করে, ওকে একটা চিঠি দিলেই কাজ হাসিল হ'য়ে যাবে। আমি তা' মনে করিনি, আমি জানতাম ওর সঙ্কল্প দৃঢ়, কিন্তু এক বিষয়ে আমিও যে অত্যন্ত দমে গিয়েছিলাম তাতে সন্দেহ নেই। আমি ভেবেছিলাম যে সমাজের যতটুকু শক্তি আছে তাই সে প্রয়োগ করবে এই অন্যায়ের বিপক্ষে; এমন দৃঢ়ভাবে করবে যে ওরা বুঝতে পারবে।

কথায় কথায় কথা উঠল, বিবাহে যোগ দেওয়া-সম্বন্ধে। একজন যুবক উকীল বল্লে, সবাই মিলে "বয়কট" করো এই বিয়ে। প্রবীণ চতুর্ভুজ উকীল ঘাড় নেড়ে বল্লেন, তা কি করে হয়। ওর বাপ ছিল আমার পরম বন্ধু, আমি কি না গিয়ে থাকতে পারি?

কালকের মিটিংএর প্রেসিডেণ্ট সুখদেও বাবু বল্লেন, ছেলেটা না হয় অন্যায় কাজ ক'রেছে, তা ব'লে কি আমাদেরও অন্যায় করা সাজে?

আমি বল্লাম, দেওশরণ তুমি?

সে মলিন-মুখে বল্লে, আমার ছোট ভাই, আমার যে কর্ত্তব্য।

৫

বিকাল বেলা বাড়ীর সামনের খোলা জায়গায় চুপ্‌চাপ ক'রে ব'সে বসে ভাবছিলাম। এই সমাজ, এবং এই সমাজের সভ্যেরা! আজ সত্যই বুঝতে পারলাম মানুষ দিয়েই সমাজ তৈরী, মানুষ যেখানে ছোট, সমাজও সেখানে নীচ। তার বড় কল্পনা নেই, সাধু প্রচেষ্টা নেই, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা নেই! হায় প্রিয়ম্বদা দেবী, তোমার অরণ্যে রোদন কেউ শুনলে না, কেননা কোনও দিন তারা শোনেনি; হয়ত বা এখনও বহুদিন শুনবে না! বৃথা তুমি মনে করেছিলে যে আমার দ্বারা তোমার কোনও উপকার হবে!

পশ্চিমের আকাশের লালমেঘ ক্রমশঃ কালো হয়ে আসছিল। সূর্য্যাস্তের পর সন্ধ্যার সূচনা। পিছনে কিসের আওয়াজে ফিরে দেখলাম আমার দরওয়ান মহাবীর সিংহ।

মহবীর বল্লে, হুজুরের মনটা ভাল দেখছি না।

আমি বল্লাম, না।

মহাবীর খানিকটা থেমে জিজ্ঞাসা করলে, বিশ্বেশ্বর বাবুর সেই বিয়ের জন্যে?

আমি বল্লাম, হাঁ।

সে কি বন্ধ হ'ল না?

আমি বল্লাম, না মহাবীর সে কারও কথা মানলে না। পরশু বিয়ে হবে।

মহাবীর জিহ্বা আর তালুতে একটা শব্দ করে বল্লে; ভারি আফ্‌শোষ!

এ দিকের ভেতরে মহাবীরের মত পাহাল-ওয়ান ও লেঠেল কম আছে। সে একবার পুলিশের নেক-নজরে পড়ে যায়,—আমি বহু চেষ্টায় তাকে বাঁচাই। সেই থেকে মহাবীর আমার একান্ত অনুগত হ'য়ে আছে;—তার ঘরের অবস্থা মন্দ নয়, তবুও স্বেচ্ছায় আমার

দারোয়ানী চাকুরী নিয়েছে। আমার কাছে তার চাকুরী বছর দশেক হ'ল, এর ভেতরে আমার তাকে চেন্‌বার যা সুযোগ হয়েছে, তাতে এই বুঝেছি যে, ভগবান তার দেহকে যেমন বিরাট-বলশালী করেছেন মনের সম্বন্ধেও তেমনি কোনও কৃপণতা করেন নি।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে রাত্রি হ'ল। মহাবীর যেন কি বলবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল; আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি?

সে বল্লে, হুজুর ভাববেন না, যদি রামজীর মজ্জি হয় ত, এ বিয়েও বন্ধ হ'য়ে যাবে।—মক্কেলরা এসেছে, তাদের থাকতে বলব কি?

আমি বল্লাম, কাল সকালে আসতে বলো।

৬

তার পরদিন কাছারীতে গিয়ে শুনলাম হুলস্থুল! কাল রাত্রে বিশ্বেশ্বরকে কে এমনি ঠেঙ্গিয়েছে যে, তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে; পায়ের একটা হাড় ভেঙ্গে গেছে; মারাত্মক নয় বটে;—কিন্তু মাস-ছয়েকের দায়ে নিশ্চিন্ত।

দেওশরণ বল্লে, তার আর পাশ ফেরবার শক্তি নেই। ডাক্তার বাবু দয়া করে আলাদা একটা ঘর দিয়েছেন, তাকে সেবা করবার জন্যে প্রিয়ম্বদা দেবীকে সেখানে রেখে এসেছি!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, প্রিয়ম্বদা দেবীকে আসতে দিতে রাজী হোল!

দেওশরণ হেসে বল্লে, রাজী! কেঁদে অস্থির; আমার ভ্রাতৃবধূ আসাতে তবে এখন স্থির হয়েছে।

ভাবলাম, ভীরুদের স্বভাবই এমনি!

*　　*　　*　　*　　*

আমাদের সমাজপতিদের সমবেত চেষ্টায় যা হ'লোনা, তা এই অজ্ঞাত লোকটীর দৃঢ় লাঠি স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন করে দিলে। লোকটি যে কে তা আমার কিছু কিছু আন্দাজ হ'চ্ছিল; কিন্তু এটা ঠিক যে তার হাতের বলের চেয়ে বুদ্ধির বল কম নয়।

সমাজ, পঙ্গু'মৃত; অন্যায়কে সে রোধ করতে পারে না দেখে আমরা হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম। পিনাল-কোডের কোন ধারায় যদি থাকত যে এমন কাজ যে করবে তার কঠিন শাস্তি হবে, ত বিশ্বেশ্বর কিছুতেই এ কাজ করতে পারত না। পিনাল-কোডের ধারাই যাদের কাছে একমাত্র প্রবল, সমাজ ও ন্যায়ের ধারা কিছুই নয়, তাদের প্রতি যে এই তৃতীয় ধারাটির প্রয়োগ প্রয়োজন তা' যে বলশালী লোকটী আবিষ্কার করলে তাকে বুদ্ধিহীন বলা চলে না।

কাছারী থেকে ফিরে এসে শুনলাম মহাবীর উচ্চৈঃস্বরে তুলসী দাসের রামায়ণ পড়ছে, আবেগে তার কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে কম্পিত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে।

আমি মহাবীরকে ডেকে বল্লাম, মহাবীর বিয়ে ত বন্ধ হ'ল!

মহাবীর দীর্ঘ সেলাম করে বল্লে, হুজুরের কল্যাণে।

আমি হেসে বল্লাম, আমার কল্যাণে, না তোমার হাতের কসরতে, মহাবীর!

মহাবীর তার দীর্ঘ দৃঢ় হাত দুটো উঁচু করে বল্লে, হুজুর এ হাতের কি শক্তি আছে, যদি রামজীর দয়া আর আপনার ভরসা না থাক্‌ত!

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অসহন

প্রিয়তম! প্রিয়তম!
তোমার হাতের আঘাত আমার
সে তো নহে অসহন।
আমার ব্যর্থ বেদনার রাশি
ম্লান যে করেনা ও মুখের হাসি
জানি আমি জানি ওগো ও উদাসি!
চিরদিন এ নিয়ম—
তোমার হাতের আঘাত সে যে গো
আমার পাবার(ই) ধন।

ওগো—ওগো বাঞ্ছিত!
তোমার হাতের সোহাগপরশ
সে হ'ল সহনাতীত।
কত অনাদর কত অবহেলা
বুকের শোণিতে খেলিয়াছ খেলা
হিয়ায় মাখিয়া ও চরণ ধুলা
সে সকলি সয়েছি ত,—
(আজি) তোমার সোহাগ পরশে আমার
তনু মন মূর্চ্ছিত।

শ্রীসুশীলাসুন্দরী দেবী

নিষ্কৃতি

(৮)

ইহার কয়েক দিন পর রবিবারের এক সকালে নিবারণের নিকট গিয়া বিমলের সহিত সুভার বিবাহের কথা পাড়িয়া ঘনশ্যাম একবারে কান্নাকাটি করিয়া ধন্না দিয়া পড়িল—"এ যাত্রা আমাকে উদ্ধার করতেই হবে নিবারণবাবু।"

অত হাতে পায়ে ধরাধরির কোনই প্রয়োজন ছিল না, কেন না সুভার বিবাহের জন্য চারি হাজার টাকা খরচ করিতে নিবারণ কোন দিনই নারাজ হইত না, তথাপি ঘনশ্যাম বুক চাপড়াইল, কাঁদিল, হাহুতাশ করিল, পায়ে ধরিল, এবং আরও অনেক কিছু করিয়া বসিল, এবং সে যে কতকষ্টে এই অতিবড় কৃপণ এবং অর্থপিশাচ লোকটিকে অভিনয় দেখাইয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, ঠকাইয়া কবুল করাইয়া আসিয়াছে, বাড়ী গিয়া তাহাই ফেনাইয়া বাড়াইয়া এতখানি করিয়া গৃহিণীর কাছে বলিয়া নিজের বাহাদুরীতে খুব খানিকটা গর্ব্ব অনুভব করিল।

আড়াল হইতে সুভা সমস্তই শুনিয়াছিল--তার কান্না পাইতে লাগিল। তার এই অতিবড় ভালমানুষ শিবতুল্য দাদামশাইটির উপর এই যে অমানুষিক অত্যাচার,—এই যে তাহাকে ঠকাইয়া বোকা বানাইয়া আসিবার হৃদয়হীন মিথ্যা বাহাদুরী, ইহার প্রত্যেকটি বিদ্রূপ তার বুকের মধ্যে খোঁচা দিতেছিল। সুভা জানিত তাহার বিবাহের নাম করিয়া নিবারণের নিকট হইতে টাকা আদায় করা কত সোজা, এবং জানিত বলিয়াই ঘনশ্যামের এই সব অলীক এবং মিথ্যা বাহাদুরী তাহার নিকট অসহ্য বোধ হইতে লাগিল, এবং ইহাতে করিয়া ঘনশ্যামের উপর তার যে পরিমাণে অশ্রদ্ধা এবং অভক্তি আসিতেছিল, নিবারণের প্রতি ঠিক সেই পরিমাণেই শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে তার বুকখানি ভরিয়া উঠিতেছিল। তার মনে হইতেছিল, এখুনি গিয়া নিবারণের পাদুটো জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া আসে,—"এ সংসার তোমার জন্যে নয় দাদামশাই—তুমি এ সংসারের অনেক উর্দ্ধে।"

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় নিবারণ আপনার শয়নকক্ষে শয্যার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একখানি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়িতেছিল, এমন সময় সুভা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"দাদামশাই!" বইটাকে মুড়িয়া রাখিতে রাখিতে নিবারণ বলিল, "আয় দিদি আয়—আজ সমস্ত দিন কোথায় ছিলি দিদি?"

নিবারণের পাশে শয্যার উপর বসিয়া পড়িয়া সুভা বলিল, "কাল রাত থেকে মার জ্বর হয়েছে কিনা, তাই রান্নাবান্নার হাঙ্গাম সারতে দেরী হয়ে গেল দাদামশাই!"

তার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে নিবারণ বলিল, "তাই ভালো, আমি ভাবলুম বুঝি দিদি আমার এখন থেকেই মায়া কাটাতে সুরু করে দিলে।"

সুভা চুপ করিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল— কেন কে জানে তার কান্না পাইতে লাগিল।

সে রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া শয্যায় শুইয়া অনেক রাত পর্য্যন্ত সুভার নিদ্রা আসিল না। বিমলের সহিত তার বিবাহ হইবে ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? সে সত্যসত্যই বিমলকে ভাল বাসিত, এবং যে দিন তারিণীচরণের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘনশ্যাম বিমলের আশা ত্যাগ করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল, সে দিন সুভা সত্য-সত্যই ছুনিয়াটা অন্ধকার দেখিয়াছিল। তার পর কতসময় সে কল্পনা করিয়াছে— হঠাৎ বিমলের জ্যাঠা তারিণীচরণ একদিন রাত্রে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল,— জটাজুটধারী কোন্ এক মহাপুরুষ তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া রোষকষায়িত লোচনে বলিতেছে—"সে যদি বিমলের সহিত সুভার বিবাহ না দেয় তাহা হইলে তার সর্ব্বনাশ হইবে"—এমনি আরও কত কি কথা,— তার পর তারিণীচরণ আসিয়া ঘনশ্যামের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিল এবং অবশেষে বিমলের সহিত তার বিবাহ হইয়া গেল,—এমনি আরো কতকি আবোল তাবোল কল্পনা, যার মাথা নাই মুণ্ড নাই অথচ যা মানুষকে হাসায় কাঁদায় সবই করে। আজ কিন্তু সুভার কল্পনা সত্যে পরিণত হইতে বসিয়াছে— ছুদিন পর সত্যসত্যই বিমলের সহিত তার বিবাহ হইয়া যাইবে। কিন্তু এই অতিবড় আনন্দের এবং সুখের অবস্থাটিকে পুরাপুরি উপলব্ধি করিতে গিয়া তার মন আজ বার বার ক্ষুন্ন হইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। তার মন বার বার ভিতরে ভিতরে এই বলিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল যে, তার বাপের মত সেও তার এই অতিবড় উদার, স্নেহময় দাদামশাইটির উপর অত্যাচার করিতেছে না ত? তার কান্না আসিতে লাগিল। কেন এই বৃদ্ধটির সহিত তার আলাপ হইল? কেন এই আত্মীয়-স্বজন-হীন অসহায় বৃদ্ধটি তার সমস্ত অসহায়তা এমন করিয়া তার চোখের সুমুখে মেলিয়া ধরিল?—সে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেলে এই অসহায় অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধটির অবস্থা যে কি হইবে, তাহা ভাবিতে গিয়া আজ সুভা বার বার মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।—তার মনে হইতে লাগিল সে যেন জানিয়া শুনিয়া এই বৃদ্ধটির উপর অত্যাচার করিতে বসিয়াছে, এবং এই অত্যাচারটা যাহাতে ঘটা করিয়া সম্পন্ন হইতে পারে তাহার জন্যে তাহারি নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া, ঠকাইয়া টাকা আদায় করা হইতেছে। ছট্ ফট্ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সুভা জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। তার যেন দম আটকাইয়া যাইতেছিল—বাহিরের উদার মুক্ত প্রকৃতির দিকে চাহিয়া সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সেই রাত্রেই শয্যায় শুইয়া নিবারণের মনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিমল নামক একটি যুবকের কাল্পনিক চেহারা বার বার ভাসিয়া উঠিতেছিল। এই যুবকটিকে সে কখন চক্ষে দেখে নাই—কেবল নাম শুনিয়াছে মাত্র, কিন্তু তাহার কোমল মোলায়েম নামটী মনের মধ্যে বার বার

আওড়াইয়া কেন কে জানে তার দৃঢ় ধারণা হইয়া গেল—সে অত্যন্ত সুন্দর এবং কমনীয়! একথা যতই সে ভাবিতে লাগিল ততই তার মনটা কেন কে জানে ভিতরে ভিতরে দারুণ ক্ষুন্নতায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল। আজ প্রথম নিবারণের মনে হইল—সেও একদিন যুবক ছিল এবং হয়ত বা সুন্দরও ছিল। তার এই একঘেয়ে নীরস জীবনটার মাঝখানে কবে যে যৌবন আসিয়াছিল এবং কবে যে অনাদর এবং অবজ্ঞা মাত্র পাইয়া অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহারি অতিবড় সামান্য ইতিহাসখানির পুরাতন ছিন্ন পৃষ্ঠাগুলি যে কোনদিন উল্টাইয়া দেখিবার জন্য তার তাগিদ আসিবে তাহা সে কল্পনাতেও কোনদিন ভাবিতে পারে নাই —আজ কিন্তু সত্যসত্যই তাগিদ আসিল। কেন কে জানে নিবারণের আজ মনে হইতে লাগিল তার সমস্ত জীবনটা ধরিয়া সে কেবল ভুলই করিয়া আসিয়াছে। যে দায়িত্ব এবং ঝঞ্ঝাটের দিকে সভয়ে চাহিয়া জীবনের সমস্ত সাধ আহ্লাদকে সে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, আজ তার মনে হইতে লাগিল সেগুলো হয়ত ঠিক ততটা ভয়ঙ্কর নয়। সে মনে মনে কল্পনা করিল,—সুভার ভারী কোন পীড়া হইয়াছে, এবং সারারাত ধরিয়া মাথার শিয়রে জাগিয়া বসিয়া সে সেবা করিতেছে;—ইহার মধ্যে ঝঞ্ঝাট সে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না, বরং যাহা পাইল তাহা তার মনের মধ্যে বেশ একটি আত্মপ্রসাদ এবং তৃপ্তি আনিয়া দিল। তার মনে হইতে লাগিল আর ২৫ টা বৎসর পূর্ব্বে সে যদি এই অতিবড় নিগূঢ় সুক্ষ্ম সত্যটি আবিষ্কার করিতে পারিত, তাহা হইলে,—আজ প্রথম যেন তার হুঁস হইল সুভা যুবতী এবং সুন্দরী, এবং দুনিয়ার আর পাঁচজন যুবতীর মতই কাহারও না কাহারও স্ত্রী হইবার সম্ভাবনা তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। এত দিন ধরিয়া দিনরাত কাছাকাছি থাকিয়াও যাহার যৌবন এবং সৌন্দর্য্য তার চোখে কোনদিন ধরা পড়ে নাই, আজ একটি কাল্পনিক সুন্দর যুবকের পার্শে তাহাকে কল্পনায় দাঁড় করাইয়া দিয়া তাহারি যৌবন এবং সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সে সহসা পূর্ণমাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিল, এবং সেই সঙ্গে বার বার করিয়া তার মনে পড়িয়া যাইতে লাগিল—সে বৃদ্ধ এবং কুৎসিত।

কিছুদিন পূর্ব্বে বটতলার কি একটা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসে সে পড়িয়াছিল—কি করিয়া এক অসহায় বৃদ্ধ ভদ্রলোকের যুবতী সুন্দরী স্ত্রীকে একটী ধনী লম্পট যুবক শুধু কেবল সৌন্দর্য্যের মোহে ভুলাইয়া ফুসলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল, এবং তাহার পর পাছে কোনরূপ গোলমাল উঠে, সেইভয়ে, সেই বৃদ্ধটিকে কি নৃশংসভাবেই না হত্যা করা হইয়াছিল। আজ কেমন করিয়া কে জানে তার হঠাৎ মনে হইয়া গেল—সুভা যেন তার বিবাহিতা স্ত্রী এবং বিমল নামক এই যুবকটি তাহার হাত হইতে তাহাকে ভুলাইয়া, ফুসলাইয়া, ফাঁকি দিয়া কাড়িয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে। তাহার পরই সুভার সম্বন্ধে এমন সব কল্পনা এবং চিন্তা তার মনের মধ্যে উঠিতে লাগিল, যাহার দিকে চাহিয়া সে নিজেই হঠাৎ এক সময় লজ্জিত হইয়া উঠিল,—তার মনে হইতে লাগিল, সে যেন গোপনে গোপনে এই অতিবড় সরল এবং স্নেহপ্রবণ

বালিকাটির বিরুদ্ধে জঘন্য একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। তার মনে হইতে লাগিল—পরদিন প্রাতঃকালে সুভা আসিয়া যখন তার সম্মুখে দাঁড়াইবে, তখন কি করিয়া সে তাহার মুখের পানে তাকাইবে?—তার দৃষ্টির মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু থাকিবে—যাহাতে করিয়া তাকে ধরিয়া ফেলা সুভার পক্ষে একটুও শক্ত হইবে না।

৯

প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া জানালার দিকে চোখ পড়িয়া যাওয়া মাত্র নিবারণ দেখিল—সুভাদের সেই ছোট ভাঙ্গা জানলাটার ভিতর দিয়া তাহাদের ভাঁড়ার ঘরের যে অংশটা দেখা যাইতেছে,—তাহারই একধারে একটা বঁটি লইয়া বসিয়া সুভা ঘাড় হেঁট করিয়া তরকারী কুটিতে ব্যস্ত। এক মুহূর্ত্তে তাহার যৌবন এবং সৌন্দর্য্য নিবারণের চক্ষের উপর দিয়া বিদ্যুতের মত ঝলসিয়া গেল। তার মনে হইতে লাগিল,—এই একটি রাত্রের ব্যবধান সুভার কৈশোর এবং যৌবনটির মাঝখানে মুহূর্ত্তের মধ্যে কখন অসীম হইয়া উঠিয়াছে। বায়স্কোপে নায়িকার কৈশোরের দু-চারিটা মাত্র দৃশ্য দর্শকদের চোখের সুমুখে ধরিয়া—তারপর হঠাৎ যেমন দশবৎসরের পরের ঘটনা হইতে পালা সুরু করিয়া দেওয়া হয়, অথচ এই দশটা বৎসর প্রকৃতপক্ষে দর্শকদের চক্ষের সম্মুখে নিমেষেই কাটিয়া যায়, ঠিক তেমনি করিয়া নিবারণের চক্ষের সম্মুখে সুভার কৈশোর যেন এক রাত্রেই শেষ হইয়া গেল, এবং যেখান হইতে সে আজ নূতন করিয়া পালা সুরু করিয়া দিল, সেখানে সে যুবতী এবং সুন্দরী।

দ্বিপ্রহরে সুভা আসিয়া যখন তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, নিবারণ তখন সবে আহার করিয়া শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। সুভার পদশব্দে সে ইচ্ছা করিয়াই চক্ষু মুদিল। সুভা আসিয়া ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ডাকিল—"ঘুমোচ্ছো নাকি দাদামশাই?" সে সেইভাবে চক্ষু মুদিয়াই উত্তর দিল, "না ঠিক ঘুমোই নি—মাথাটা বড্ড ধরেছে, তাই চোখ বুজে পড়ে আছি।" "মাথা টিপে দোবো দাদামশাই?" বলিয়া সুভা শয্যাপ্রান্তে বসিল। "না কিচ্ছু করতে হবে না, একটু চুপ করে ঘুমোতে পারলেই সব সেরে যাবেখন",—বলিয়া নিবারণ যেমন চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল, তেমনই শুইয়া রহিল।—কেন কে জানে সুভার মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিতে আজ তার সাহসে কুলাইয়া উঠিতেছিল না। সুভা কিন্তু কোন কথা শুনিল না—সে জোর করিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। এবং কিছুক্ষণ পর নিবারণ নিদ্রা গিয়াছে ভাবিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর নিবারণের মাথার যন্ত্রণা কমিয়াছে কিনা খোঁজ লইতে আসিয়া সুভা দেখিল, নিবারণ বাড়ীতে নাই। বিহারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল,—বায়স্কোপে গিয়াছেন। সুভার মনে কেমন যেন খট্‌কা লাগিল, যে নিবারণ তাহাকে সঙ্গে না লইয়া বায়স্কোপ দেখিতে

একদিনও যায় নাই, এমন কি কোনদিন কোনও কারণে সুভার না যাওয়া হইলে, যে-নিবারণ সেদিনকার মত বায়স্কোপ যাওয়া বন্ধ করিয়া দিত, আজ সেই নিবারণ তাহাকে না জানাইয়া এই যে গোপনে বায়স্কোপ দেখিতে চলিয়া গেল, সুভার নিকট ইহা কেমন যেন স্বাভাবিক এবং সহজ বলিয়া মনে হইল না। তার দ্বিপ্রহরের ব্যবহারের মধ্যেও সে যেন একটা আড়-আড় ছাড়-ছাড় ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল। মাথা ত তার ইতিপূর্ব্বে কতদিনই ধরিয়াছে; কিন্তু এমন নিরপেক্ষ ঔদাসীন্য সে ত নিবারণের তরফ হইতে কোনদিন লক্ষ্য করে নাই। তারপর সন্ধ্যার সময় আসিয়া সে যখন শুনিল, নিবারণ তাহাকে না জানাইয়া বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছে, তখন সে স্পষ্ট ধরিয়া ফেলিল, ইহার মধ্যে কোথাও একটা কিছু নিশ্চয়ই তাহার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে গজাইয়া উঠিতেছে; কিন্তু অনেক ভাবিয়াও এই 'একটাকিছুর' সন্ধান সে কোনমতেই করিয়া উঠিতে পারিল না।

পরদিন সকালবেলা আসিয়া নিবারণকে সুমুখে পাইয়া সুভা বলিল—"তুমি কাল সন্ধ্যার পর কোথায় গেছ্‌লে দাদামশাই?" মাথা চুলকাইয়া, দুবার ঢোঁক গিলিয়া লইয়া নিবারণ বলিল, "একটু কাজে বেরিয়েছিলুম।"

তার মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া সুভা বলিল—"তবে বেহারী বল্লে বায়স্কোপ দেখতে গেছ!"

নিবারণ এবার সত্যসত্যই বিপন্ন হইয়া পড়িল। তার মনে হইতে লাগিল, একটা মিথ্যা চাপা দিতে গিয়া সে আজ তার অন্তরের অনেক কিছু গোপনতা ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছে, এবং সুভার কাছে হয়ত বা সে ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

"কথা কইছো না যে?" বলিয়া সুভা তার মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টি নিবারণের পক্ষে সত্যসত্যই অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। পুলিশের জেরার সময় অপরাধীর মনের অবস্থা যেরূপ হয়, নিবারণের মানসিক অবস্থা আজ ঠিক তদ্রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সুভা বলিল—"বুঝেছি দাদামশাই, তুমি আজকাল আমাকে আর আগেকার মতন—" এই অবধি বলিয়াই সুভা হঠাৎ থামিয়া গেল—"ওকি তুমি কাঁদছো নাকি দাদামশাই?"—সুভা গিয়া হাত ধরিতেই বৃদ্ধ নিবারণ হঠাৎ অসহায় বালকের মত ডুগরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া নিবারণ লজ্জায় একবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। তার মনে হইতে লাগিল, সে আজ সুভার নিকট সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু কেন কে জানে সঙ্গে সঙ্গে সে খানিকটা হাঁফ্ ছাড়িয়াও বাঁচিল। তার মনে হইতে লাগিল, যে কথাটা সুভাকে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়া বলিবার মত দুঃসাহস তার কোন দিনই হইত না, তাহার এই ক্ষণিক দুর্ব্বলতার ইঙ্গিত আজ তাহাই প্রকারান্তরে তাহাকে আভাসে বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছে। একটা বিপদকে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে ভয় করিতে করিতে হঠাৎ একদিন

সেই বিপদটা আসিয়া পড়িয়া চুকিয়া গেলে পর মানুষ যেমন একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচে এবং হঠাৎ মরিয়া হইয়া উঠিয়া অতিরিক্ত রকম সাহস প্রকাশ করিতে থাকে, ঠিক তেমনি করিয়া নিবারণ আজ হঠাৎ ভিতরে ভিতরে মরিয়া হইয়া উঠিল। তার ধারণা হইয়াছিল সুভা নিশ্চয়ই তার অন্তরের সমস্ত কথা জানিয়া ফেলিয়াছে। তাই সুভা যখন তাহাকে বলিল—"তুমি বুঝি এখন থেকে আমার মায়া কাটাবার চেষ্টা করছো দাদামশাই?" সে তখন টানিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"দোষ কি শুধু আমারই সুভা? শুধু কেবল বুড়ো ব'লে তুইও কি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিস্ না দিদি?"

সুভা এ কথার অর্থ ঠিক পুরাপুরি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, অথবা ইচ্ছা করিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিতে চাহিল না। তার মনে হইল, এটা নিছক্ রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু রসিকতা করিতে গিয়া কোন দিন মানুষের স্বর যে কাঁপিয়া উঠে, ইহা সুভা আজ এই প্রথম দেখিল। কিসের একটা সুদূর সম্ভাবনা তার মনের মধ্যে সহসা ভাসিয়া উঠিতে যাইতেই সে প্রাণপণ শক্তিতে তার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে নীচের দিকে জোর করিয়া ঠেলিয়া নামাইয়া দিল, এবং কথাটাকে সহসা চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল—"কাল কিসের পালা ছিল দাদামশাই?"

(১০)

পরদিন সকালে নিবারণ বাহিরের ঘরে একলাটি চুপ করিয়া বসিয়াছিল এমন সময় ঘনশ্যাম আসিয়া দু-চারটে বাজে কথার পরই হঠাৎ সুভার বিবাহের কথা পাড়িয়া বসিল—"তাহ'লে তারিণী চাটুয্যের সঙ্গে পাকাপাকি করে ফেলি—কি বলেন?"

"সে আপনারা বুঝুন—আমি কি বলবো বলুন।" বলিয়া নিবারণ তাকিয়াটা কোলের উপর টানিয়া লইল।

"আমরা বুঝবো কি রকম?—আপনিই ত হচ্ছেন সব, সুভা ত আপনারই জিনিষ নিবারণবাবু।"—ঘনশ্যাম সাগ্রহে তার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

কি একটা কথা হঠাৎ নিবারণের গলা পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়া গেল। ঘনশ্যাম আবার বকিয়া যাইতে লাগিল—"তারিণী চাটুয্যের মত লোক যে সুভার সঙ্গে বিমলের বিবাহ দিতে রাজী হয়েছেন সে ত আর সুভার বাপের দিকে চেয়ে নয় নিবারণবাবু।—সে কেবল তার দাদামশায়ের মুখ তাকিয়ে।"

এই সকল ছেঁদো কথা নিবারণের আদপেই ভাল লাগিতেছিল না। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঘনশ্যাম আবার বকিয়া যাইতে লাগিল, "গৃহিণী তাই সেদিন বলছিলেন—তুমি আমি ওর মিথ্যে বাপ মা,—সত্যি বাপ মায়ের কাজ করলে ওর দাদামশাই।"—নিবারণ তথাপি কোন উত্তর দিল না। বেগতিক বুঝিয়া ঘনশ্যাম এবার সোজাসুজি কাজের

কথা পাড়িল—"তাহলে চার হাজারেই রাজি হ'য়ে যাই কি বলেন? ঐ চার হাজার আর তার ওপর খাওয়া'দাওয়া এদিক ওদিক ক'রে আরও একটা হাজার ধরে রাখুন।"

হঠাৎ কিঁ মনে করিয়া নিবারণ বলিল—"ও চার হাজারের জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না—"সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া ঘনশ্যাম বলিয়া উঠিল—"সে কি আর জানিনা মশায়,—ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন,—সুভার আমার ভাবনা কি; তাইতো মেয়েটাকে বলি,—আর জন্মে অনেক তপস্যা করেছিলি তাই এমন—"

বিরক্ত হইয়া নিবারণ বলিয়া উঠিল—"আমাকে কি কথা বলতে দেবেন না?"—জিব কাটিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নিবারণ বলিল,—"সুভার বিবাহ,—কথা যা কিছু সে ত আপনিই কইবেন দাদা—আমরা ত কেবল নির্ব্বাক শ্রোতা মাত্র।" সে কথায় কান না দিয়া নিবারণ বলিল—"বলছিলুম সুভার বিবাহ না হয় কোন রকমে হয়ে গেল, কিন্তু দেশের সমস্ত জমিজারাত মায় পৈতৃক ভদ্রাসনটুকু পর্য্যন্ত যে বাঁধা পড়ে রইলো, তার খালাসের করছেন কি?"

এই অসংলগ্ন অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটার কোন একটা নির্দ্দিষ্ট তাৎপর্য্য ঘনশ্যাম হঠাৎ নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারিল না। সুতরাং ইহার যে কি জবাব দেওয়া যাইতে পারে তাহাও সে ঠিক করিয়া উঠিতে না পারিয়া নিবারণের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া বসিয়া রহিল।

নিবারণ আবার বলিল—"মেয়ের বিবাহ না হয় হ'য়ে গেল, কিন্তু ঐ কচি ছেলেটার ভবিষ্যৎও ত ভাবতে হবে।"

হঠাৎ কোথায় কি যেন একটা খেই পাইয়া গিয়া ঘনশ্যাম বলিয়া উঠিল—"হবে বই কি—একশবার ভাবতে হবে;—কিন্তু হারে পোড়া কপাল—"এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ঘনশ্যাম হঠাৎ কোঁচার খুঁটটা শুষ্ক চোখ দুটার উপর বুলাইয়া লইল, এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ একসময় গলা কাঁপাইয়া গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "যদি দু-বেলা দুমুঠো অন্ন যোগাবার ক্ষমতা দাও নি, তবে বাছাদের এই হতভাগার ঘরে পাঠালে কেন ঠাকুর!"

সে কথায় কান না দিয়া নিবারণ বলিল—"এক কাজ করুন না কেন!"

ঘনশ্যাম লাফাইয়া উঠিল—"কি কর্‌ব বলুন দাদা!"

কি একটা কথা বলিতে গিয়াও নিবারণ বলিতে পারিল না।—সে হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

রুদ্ধ নিশ্বাসে ঘনশ্যাম জিজ্ঞাসা করিল—"কি কর্‌তে হবে বলুন নিবারণ বাবু!"

কিসের যেন একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইয়া ঘনশ্যাম ভিতরে ভিতরে এক নিমেষে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ এক সময় নিবারণ বলিয়া উঠিল—"দেখুন ঘনশ্যাম বাবু, আমি আপনার সমস্ত জমিজারাত, মায় ভদ্রাসন নিজের গাঁটের কড়ি দিয়ে খালাস করে দিতে পারি—যদি"—এইখানে হঠাৎ একবার ঢোঁক গিলিয়া

লইয়া নিবারণ আবার বলিল—"যদি সুভার সঙ্গে আমার—," তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ঘনশ্যাম লাফাইয়া উঠিল – "সে ত আমাদের চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি নিবারণ বাবু – ," সে আরো কত কি বলিতে যাইতেছিল— হঠাৎ চাহিয়া দেখে, নিবারণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া চটিজোড়ার মধ্যে পা ঢুকাইয়া দিতেছে।

বাড়ী গিয়া ঘনশ্যাম স্ত্রীর নিকট খুব খানিকটা লাফালাফি করিল,– এবং সে যে কত কৌশলে এবং কি পরিমাণ বুদ্ধি খরচ করিয়া এই পরম উদাসীন চিরকুমার জমিদারটিকে শুধু কেবল কথার মারপ্যাঁচে ভুলাইয়া এ বিবাহে সম্মত করিয়াছে, এবং কিরূপ চালাকি করিয়া ঠকাইয়া সে এই অতিবড় কৃপণ বৃদ্ধটিকে তার সমস্ত নষ্ট সম্পত্তি নিজের গাঁটের কড়ি দিয়া উদ্ধার করিয়া দিবার ভার লইতে বাধ্য করাইয়াছে, তাহাই বাড়াইয়া এতখানি করিয়া বলিয়া মনে মনে খুব খানিকটা গর্ব্ব অনুভব করিল। সুভার মা কিন্তু এই পরম শুভ সংবাদটিতে তাহার মত করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিল না,– যদিও সংসারের এবং ছেলেপুলের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে চাহিয়া জোর করিয়া ইহার বিরুদ্ধে বাধা দিতেও সাহস করিল না।

কথাটা সুভার কানে পৌঁছিতে দেরী হইল না। লজ্জায় ঘৃণায় তার মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা যাইতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, এই যে এতদিন ধরিয়া সে সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই যখন তখন নিবারণের সহিত অবাধে মেলামেশা করিয়া আসিতেছে, ইহাতে করিয়া তার নারীত্ব প্রতিপলে, প্রতিদণ্ডে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে। নিবারণের সেদিনকার যে রসিকতাটার অর্দ্ধেকটামাত্র বুঝিয়া সে মনে হাঁকপাঁক করিয়া মরিতেছিল, আজ তাহারি সম্পূর্ণ রূপটি দেখিয়া সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। ঘৃণায় এবং বিতৃষ্ণায় তার বুকের ভিতরটা একেবারে পুড়িয়া যাইতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, সে যেন নিলামের মাল, এবং নিবারণ যেন সর্ব্বোচ্চ দর হাঁকিয়া তাহাকে কিনিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে। এই বৃদ্ধটিকে সে একদিন দেবতাজ্ঞানে কতই না শ্রদ্ধা করিয়াছে!—আজ নিজের উপর পর্য্যন্ত তার ধিক্কার আসিতে লাগিল,—তার মনে হইতে লাগিল, স্তূপীকৃত কুপ্রবৃত্তি এবং লালসা ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়া বার্দ্ধক্যের মুখোস পরিয়া এই প্রতারক ভণ্ড লোকটা এতদিন ধরিয়া গোপনে গোপনে তিল তিল করিয়া তার নারীত্বকে অপমানিত করিয়া আসিয়াছে।

পরদিন নিবারণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঘনশ্যাম বিবাহের সমস্ত পাকাপাকি করিয়া ফেলিল। ঠিক হইল, বিবাহের পরই নিবারণ নিজের খরচায় ঘনশ্যামের সমস্ত নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিবে, এবং উপস্থিত বিবাহের খরচার জন্য সে ঘনশ্যামকে হাজার টাকার একটা চেক্ লিখিয়া দিল। ইতিপূর্ব্বে তারিণীচাটুয্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঘনশ্যাম দেনাপাওনার কথা একপ্রকার চুকাইয়া ফেলিয়াছিল, এবং উভয় পক্ষ হইতেই দিন দেখাদেখি চলিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একদিন তারিণীচরণ ঘনশ্যামের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক পোষ্টকার্ড পাইল

যে বিশেষ কোনও কারণে অনিচ্ছা সত্বেও তাহাকে বাধ্য হইয়া সুভার অন্যত্র বিবাহ স্থির করিতে হইয়াছে এবং সে জন্য সে আন্তরিক দুঃখিত—ইত্যাদি। সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তারিণী মনে মনে সত্যসত্যই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।—নগদ চার হাজার টাকা হয়ত সে অন্যত্রও পাইতে পারে, কিন্তু নিবারণের মত একটি শাঁসালো অথচ নিঃসন্তান ব্যক্তির সহিত কটম্বিতার সৌভাগ্য মানুষের জীবনে একবারের বেশী দু-বার আসে না।

(১১)

আজ নিবারণের বিবাহ। সুভারা সেই ভাঙ্গা বাড়ীটা ছাড়িয়া সেই পাড়ারই আর একটা বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছে। ঘনশ্যাম আয়োজনের কোনও ত্রুটি করে নাই;—কারণ সে জানিত—কড়ি যতই লাগুক না কেন, পশ্চাতে গৌরীসেন মজুত রহিয়াছে। সন্ধ্যা ৭টার লগ্নে বিবাহ। তাহার পর ৯টা, ১০টা এবং ১২টায়ও লগ্ন ছিল, কিন্তু নিবারণের ইচ্ছামত সন্ধ্যার লগ্নেই বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছিল।

ঘনশ্যাম সম্প্রতি কন্যার বিবাহোপলক্ষে যে বাড়ীটিতে উঠিয়া গিয়াছিল, নিবারণের বাড়ীর ছাদ হইতে সে বাড়ীটি দেখা যাইত। আজ সকালে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়াই নিবারণ শুনিল, বিবাহ বাড়ীতে সানাই ভৈরবী ধরিয়াছে। কেন কে জানে সানায়ের এই প্রভাতী সুরটি তার নিকট আজ বড্ড বেশি করুণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল—এ যেন শুধু কেবল কান্না আর কান্না। তার মনে হইতে লাগিল, এ যেন সুভার কান্না বাতাসে বাতাসে করুণ হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে। একটা দারুণ অবসাদে তার সমস্ত চিত্তটা যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একটা ভাড়াটে ট্যাক্সি করিয়া পুরোহিত ও নাপিত মাত্র সঙ্গে লইয়া বর আসিয়া ঘনশ্যামের দরজায় দাঁড়াইল। ঘনশ্যামের উৎসাহের অন্ত ছিল না—সে নিজে আসিয়া হাত ধরিয়া বর নামাইল। নিবারণের মুখে কিন্তু উৎসাহের লেশমাত্র ছিল না; তার কেমন যেন ভয় ভয় করিতেছিল। চারিদিকের কোলাহল এবং লোকের ঠেলাঠেলিতে তার যেন দম আটকাইয়া যাইবার উপক্রম হইতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল—সকলে মিলিয়া তাকে যেন পিশিয়া মারিয়া ফেলিবার যোগাড় করিতেছে। সে কল্পনায় দেখিতে লাগিল, এই সকল গণ্ডগোল এবং কোলাহল আজ হইতে তার সঙ্গ লইতেছে, এবং জীবনের শেষ দিন অবধি তাহাকে ঠিক এমনি করিয়াই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। সে যে স্বেচ্ছায় এ বিবাহে রাজী হইয়াছে—একথা বিশ্বাস করিতে তার মন আজ কিছুতেই রাজী হইতেছিল না;—তার মনে হইতেছিল, কেহ যেন জোর করিয়া ভয় দেখাইয়া টানিয়া হিচড়াইয়া তাহাকে এই দারুণ গণ্ডগোল এবং ঝঞ্ঝাটের অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, এবং উঠিবার চেষ্টা করিলেই লাঠি মারিয়া তার মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবে।

সভায় গিয়া বসিয়া সে একবার নিজের বর্ত্তমান অবস্থাটা ভাবিয়া লইবার চেষ্টা করিল। আর কয়েক মিনিট্ পরেই সুভার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া যাইবে ; এখনি হয়ত ছাদনাতলায় তার ডাক পড়িবে, তারপর ছাইভস্ম কত কি হইবে, শাঁক বাজিবে, হুলুধ্বনি উঠিবে, হট্টগোলে কান পাতিবার জো থাকিবে না,—তারপর শুভদৃষ্টির পালা। বিশ্বদুনিয়াটাকে আড়াল করিয়া দিয়া একটিমাত্র বস্ত্রখণ্ডের অন্তরালে সুভার সহিত তাহাকে দৃষ্টি বিনিময় করিতে হইবে,—নিবারণের বুকের ভিতরটা সহসা কাঁপিয়া উঠিল — তার সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। কি করিয়া সে তাকাইবে ?—অসম্ভব !—অসম্ভব !—সে কল্পনায় দেখিতে লাগিল—দেহ নাই, শুধু দুটি অগ্নিচক্ষু তার মুখের দিকে একদৃষ্টে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছে—নিবারণ ভয়ে চক্ষু মুদিল।—তার সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ছুটিতে লাগিল। হঠাৎ কি মনে করিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট একটি লোককে ডাকিয়া সে বলিল, "ঘনশ্যামবাবুকে একবার ডেকে দিতে পারেন ?"—তার গলার স্বর কাঁপিতেছিল। লোকটি তার মুখের দিকে একবার মাত্র তাকাইয়াই শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল—"আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন ?" "না, ও কিছু না—আপনি দয়া করে ঘনশ্যামবাবুকে একবার ডেকে দিন।"—বলিয়া মখমলের তাকিয়াটার উপর হেলান দিয়া শুইয়া পড়িয়া সে চোখ বুজিল।

পরমুহূর্ত্তেই হন্তদন্ত হইয়া কোমরে একটা গামছা জড়াইয়া ঘনশ্যাম ছুটিয়া আসিল এবং কোন কথা না শুনিয়াই চেঁচামেঁচি করিতে সুরু করিয়া দিল—"সমস্ত দিন খাওয়া নেই—আমাদের মতন মুটে মজুর লোক ত আর নন্,—ঝাড়ু মার শাস্তরের মুখে,—যত ব্যাটা গাঁজা-খোর মিলে দেশটাকে একেবারে—তার ওপর আজকালকার চাকর বাকরও হয়েছে তেমনি—এক এক ব্যাটা যেন এক এক তেজচন্দরের নাতি—ব্যাটারা জোরে জোরে বাতাস কর্‌তে পারিস্ না !—হারামজাদা শুয়োর ব্যাটা কোথাকার !"

বক্তৃতা শেষ করিয়া নিবারণের পাশে গিয়া বসিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে অত্যন্ত করুণ এবং সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে ঘনশ্যাম জিজ্ঞাসা করিল—"বড্ড কি কষ্ট হচ্ছে বাবাজী ?" সে কথার কোন উত্তর না দিয়া নিবারণ বলিল—"আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে—একটু আড়ালে যেতে চাই।"

উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়া ঘনশ্যাম বলিল—"কোন গোপনীয় কথা নাকি ?"

"হাঁ।"

আড়ালে গিয়ে নিবারণ বলিল—"ঘনশ্যামবাবু আমাকে ক্ষমা করবেন, এ বিবাহ আমি করতে পারবো না।"

ঘনশ্যাম কি বলিতে যাইতেছিল,—তাহাকে থামাইয়া দিয়া নিবারণ বলিল—"আপনার পায়ে পড়ি ঘনশ্যামবাবু এযাত্রা আমাকে বাঁচান। এখনও অনেক লগ্ন আছে, আপনি

গিয়ে তারিণীবাবুর হাতে পায়ে ধরে রাজী ক'রে বিমলকে নিয়ে এসে কন্যা সম্প্রদান করুন—তাতে যত টাকা লাগে আমি দিতে রাজী আছি—দোহাই ঘনশ্যামবাবু, আমাকে বাঁচান আপনি!"

ঘনশ্যাম মুখে খুব খানিকটা দুঃখ প্রকাশ করিল—মনে মনে কিন্তু খুব খুসি হইয়া গেল। সে জানিত টাকা ফেলিতে পারিলে তারিণীকে রাজী করা একটুও শক্ত কাজ হইবে না। মাঝে হইতে টাকাটাও পাওয়া যাইবে, অথচ জামাইও মনের মত হইবে। মুখে কিন্তু সে যথেষ্ট আপশোষ করিল, এবং নিজের পোড়াকপালকে ধিক্কার দিয়া দিয়া একবারে বিব্রত করিয়া তুলিল। কিন্তু একটা সন্দেহ কাঁটার মত তার বুকের মধ্যে খচ্‌খচ্ করিয়া বিঁধিতে লাগিল,—নিবারণ সেই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহার সহিত সুভার বিবাহ দিলে, সে তার সমস্ত নষ্ট সম্পত্তি নিজের খরচায় উদ্ধার করিয়া দিবে, বিমলের সহিত সুভার বিবাহ হইলে সে প্রতিজ্ঞা সে না রাখিতেও পারে ত!

নিবারণ কম্পিত কণ্ঠে বলিল "আপনি একটা ট্যাক্সি করে এখুনি বেড়িয়ে পড়ুন!—যত টাকা লাগে দিতে রাজী আছি—তারিণীচাটুয্যেকে রাজী করে আসুন!"

কতই যেন বিব্রত এবং বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে এমনিভাবে ঘনশ্যাম কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিয়া উঠিল—"গরীব লোক ব'লে এমনি করেই অপমান করতে হয় নিবারণবাবু! গরীব হয়েই না হয় পড়েছি, তাই বলে কি মান সম্ভ্রম আত্মমর্য্যাদা এসব আমাদের কিছুই নেই বলতে চান্!"

নিবারণের সত্যসত্যই কান্না আসিতেছিল—নিজের উপর তার আজ ভয়ানক রাগ হইতে লাগিল। মুখে কিন্তু সে একটি কথাও বলিতে পারিল না।—কিই বা বলিবে সে?

ঘনশ্যাম বুঝিল ঔষধ ধরিয়াছে—সে আবার বলিতে লাগিল—"করুন অত্যাচার!—গরীব হয়ে জন্মেছি যখন তখন সৈতে হবে বৈকি—হাজার বার সইতে হবে!"

নিবারণ কেবল ডাকিল—"ঘনশ্যাম বাবু!" তার স্বর অশ্রুভারাক্রান্ত। ঘনশ্যাম তেমনই বকিয়া যাইতে লাগিল—"বলুন,—তোমার সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার করে দেবো যে বলেছিলুম তাও রাখতে পারলুম না ঘনশ্যামবাবু! আমাকে মাপ করুন—বলুন! বলুন!—ওঃ—গরীব বলে আমরা কি—"

অত্যন্ত করুণ এবং সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে নিবারণ বলিল—"আমাকে অতটা নীচ ভাববেন না ঘনশ্যামবাবু! আজ রাত্রেই সব বন্দোবস্ত ক'রে তবে জলগ্রহণ কর'ব—তা জানবেন!"

(১২)

সত্যসত্যই প্রতিশ্রুত সমস্ত অর্থ ঘনশ্যামকে বুঝাইয়া দিয়া নিবারণ সে রাত্রে জলস্পর্শ করিয়াছিল। সর্ব্বসমেত পনের হাজার টাকার একটি চেক্ ঘনশ্যামের নামে লিখিয়া দিয়া

নিবারণ সে রাত্রে খালাস পাইল, এবং বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া মনে মনে ভাবিল,—এ যাত্রা সে খুব জিতিয়া গিয়াছে।

নিবারণের নিকট হইতে নগদ পনেরটি হাজার টাকা বেমালুম আদায় করিয়া লইয়া ঘনশ্যাম সে রাত্রে খুব খানিকটা আস্ফালন করিয়া লইল। যে-সকল আত্মীয়-স্বজন তাহার দুর্ভাগ্য অপেক্ষা সৌভাগ্যের দিকে চাহিয়াই ভিতরে ভিতরে হিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়া এই বিবাহটাকে অতি বড় পৈশাচিক এবং জঘন্য হৃদয়হীনতা বলিয়া চেঁচাইয়া পাড়া মাথায় করিয়াছিল, আজ তাহাদিগকে সুমুখে পাইয়া ঘনশ্যাম মনের সাধে খুব খানিকটা শুনাইয়া লইল, এবং হাত মুখ নাড়িয়া বক্তৃতা করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিল যে, পূর্ব্ব হইতেই সে তার চির-উর্ব্বর মস্তিষ্কটি খেলাইয়া এমন একটা অব্যর্থ ফন্দি আঁটিয়া রাখিয়াছিল যাহাতে এই আহাম্মক বিয়ে-পাগলা বৃদ্ধটা বিবাহসভা হইতে নিজে হইতেই সরিয়া পড়িতে বাধ্য হয়; অথচ যে বিপুল অর্থের দিকে চাহিয়া তাহাকে দয়া করিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র বরবেশে সভায় বসিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছে, তা না হইলে সে কি এমনি হৃদয়হীন এবং নরাধম যে সত্যসত্যই একটা ঘাটের মড়ার সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া যক্ষের ধন আগলাইয়া বসিয়া থাকিবে?—এবার আর কেহই তাহার বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না, এবং একবাক্যে স্বীকার করিল যে লেখাপড়া না শিখিলেও বুদ্ধিতে সে হাইকোর্টের জজেদেরও কান কাটিয়া দিয়া আসিতে পারে। সুভার মাকেও এবার তার স্বামীর বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হইল।

সমস্ত গণ্ডগোল চুকাইয়া নিবারণ যখন বাড়ী ফিরিল তখন রাত ৯টা বাজিয়া গিয়াছিল। সে নিজ কক্ষে আসিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া একটা বাতি জ্বালিল;—তার পর কি মনে করিয়া সেটাকে ফুঁ দিয়া নিবাইয়া দিয়া অন্ধকারে শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ শয্যায় শুইয়া থাকিবার পর তার কেমন যেন দম্ আটকাইয়া যাইতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, তার বুকের উপর কে যেন চাপিয়া বসিয়াছে,—সে শশব্যস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া ছাতে উঠিয়া গেল। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ—কোথাও সাড়াশব্দের লেশমাত্র নাই,—কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার, থম্‌থমে রাত্রি। নিবারণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—সে যেন তার মার কোলে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিছুক্ষণ এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ একসময় নিজের অজ্ঞাতসারে স্বপ্নাবিষ্টের মত সে ছাদের পূর্ব্বদিককার আলিসাটার ধারে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।—দূরে একটা বাড়ীর ছাতের উপর কালো একটা সামিয়ানার তলায় দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া আলো এবং অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া অসংখ্য অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি ব্যস্ত হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে, এবং তাহাদের দূরাগত কোলাহল স্বপ্নের মত ক্ষীণ হইয়া বাতাসে বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। নিবারণের মনে

হইতে লাগিল—সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। সে চুপ করিয়া মোহাবিষ্টের মত সেই দিক 'পানে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ এইভাবে সে দাঁড়াইয়াছিল তাহা সে নিজেই জানিতে পারে নাই—হঠাৎ একসময় কিসের একটা কোলাহলে সচকিত হইয়া উঠিল,—এবং চাহিয়া দেখিল,—সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট মায়াপুরীটার ছাতের উপরকার সেই অসংখ্য ছায়ামূর্ত্তি কখন একসময় ছাতের আলিসার ধারে কাতারে কাতারে আসিয়া দাঁড়াইয়া নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দ্বিগুণতর ব্যস্ততাসহকারে কোলাহল করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, এবং চারিদিক হইতে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি উঠিয়া এই স্বপ্নপুরীটিকে কখন এক সময় তার অজ্ঞাতসারে বাস্তবজগতের রাশি রাশি বস্তুপিণ্ডের মাঝখানে বসাইয়া দিয়া গিয়াছে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে নীচে নামিয়া আসিয়া নিবারণ আবার তার সেই অন্ধকার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, এবং আলো না জ্বালিয়াই হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। সম্মুখের জানালাটা খোলা ছিল, তাহার ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছিল,—সুভাদের পূর্ব্বেকার সেই ভাঙ্গা বাড়ীটা অন্ধকারের মধ্যে কালো একটা বস্তুপিণ্ডের মত খাড়া হইয়া রহিয়াছে। সেই দিক পানে চাহিয়া হঠাৎ নিবারণ ভয়ে শিহরিয়া উঠিল;—তার মনে হইতে লাগিল একটা কালো দৈত্য তার দিকে কট্ মট্ করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছে। ছেলেবেলায় সে তার পিসীমার নিকট গল্প শুনিয়াছিল, দৈত্যেরা মায়াবলে ঘরবাড়ী পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতি যে কোনও রূপ গ্রহণ করিয়া অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তার পর ভ্রান্ত পথিক তাহাকে নির্জ্জীব বস্তুপিণ্ড মাত্র ভাবিয়া যখন নির্ভাবনায় পরম নিশ্চিন্ত মনে সেই পথ দিয়া যাইতে থাকে, তখন হঠাৎ একসময় নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার উপর গিয়া পড়িয়া ঘাড় মটকাইয়া তার রক্ত শোষণ করে। এই ভাঙ্গা বাড়ীটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আজ তাঁর মনে হইতে লাগিল এও সেই রূপই কোন একটা দৈত্য, তাহার রক্ত শোষণ করিবার জন্য ভাঙ্গাবাড়ীর রূপ ধরিয়া অন্ধকারে জড়পিণ্ডবৎ নিসাড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।—ধড় মড় করিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া নিবারণ ভয়কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল—"বেহারী বেহারী!" এবং সে আসিতেই আলো জ্বালিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—"এখুনি একটা ট্যাক্সি ডেকে আন।" সে অবাক হইয়া নিবারণের অদ্ভুত মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল—"এত রাত্রে কোথায় যাবেন বাবু?"

"হাওড়া ষ্টেশনে।"

অবাক হইয়া বিহারী বলিল—"দেশে যাবেন নাকি? কিন্তু এত রাত্রে ত কোন গাড়ী নেই।"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া নিবারণ বলিল—"দেশে যেতে যাবো কেন? আর কোন চুলোয় কি আমার ঠাঁই নেই?—কাশী আছে, বৃন্দাবন আছে—"

কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বিহারী বলিল—"এত রাত্রে ত কোন গাড়ীই ছাড়ে না বাবু!"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া নিবারণ চেঁচাইয়া উঠিল—"আজ রাত্রে না ছাড়ে—কাল সকালে ছাড়্‌বে তো ?"

হাত জোড় করিয়া বিহারী বলিল—"তা, এখন থেকে ইষ্টিসনে বসে থেকে কি হবে হুজুর ?"

নিবারণ চেঁচাইয়া উঠিল—"আমার খুসি,—আমি সারারাত ইষ্টিসনে বসে থাক্‌বো—তুই ট্যাক্সি ডেকে দিবি কিনা বল্ ?"

পরদিন সকালে বরকনেকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবার জন্য নিবারণকে ডাকিতে আসিয়া ঘনশ্যাম দেখিল—বাড়ীর দরজায় তালা লাগান ; সুমুখের মুদিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—গতকল্য অনেক রাত্রে তিনখানা ট্যাক্সিতে মালপত্র বোঝাই করিয়া তাহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

আগমনী

তবুও হাসিতে হবে,
আশা-নিরাশার কুজ্ঝটিকার
আঁধার নাশিতে হবে,
এ দুখ-সাগরে, রে অভাগা নেয়ে,
পাড়ি দিতে হবে ভাঙা তরী বেয়ে,
অভয়া মায়ের রাঙা পায়ে চেয়ে
অশ্রু শাসিতে হবে,
বরষে বারেক আসেন জননী,
হরষে ভাসিতে হবে।

বাহিরে ঝঞ্ঝা, জল,
ভিতরও আবার শত-কান্নার
বন্যায় টলমল,
মাটীর এ দীপ তৈল-বিহীন,
জেলে রাখ তাই শুধু তিনদিন,
অকূল পাথারে এই আলো ক্ষীণ
যাত্রীর সম্বল,
নিবে নিবে যায়, তবু সে দেখায়
জননীর অঞ্চল।

আবরণ ফেলে দাও,
নয়নের বারি অঞ্জলি ভরি'
মা'র পায়ে ঢেলে দাও,
দেহ হ'ল আজ কঙ্কাল-সার,
আভরণ, সাজ শৃঙ্খল ভার,
এ মায়া-খাঁচার জীর্ণ দুয়ার
ঠেলে যাও, ঠেলে যাও ;
অঙ্গনে তব আগত জননী
আঁখিযুগ মেলে চাও।

থামাও রোদন ধ্বনি,
মায়ের বোধনে ধনী-নির্ধনে
মিলে গাও জাগরণী,
বছর বছর এই আনাগোনা,
মায়েতে-ছেলেতে এই দেখা-শোনা,
লোহাকে তোমার করে' দেবে সোনা,
ওপদ-পরশমণি,
ঢাকে ঢোলে ঢাকি' জীবনের ফাঁকি,
গাও সবে আগমনী।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাস্তবতার পরিমাণ লইয়াও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির মধ্যে আর একটী সূক্ষ্মতর শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা'য় যে বাস্তব গুণটী দেখা যায়.তাহা নীতি ও রুচির দিক্ দিয়া সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ; আজকাল 'বাস্তবতা'র মধ্যে যে একটা বিশেষ অর্থ আসিয়া জড়িত হইয়াছে, বাস্তব বলিলেই যে প্রচলিত নীতি-বিরুদ্ধ জীবনের একটা উপেক্ষিত অংশের কথাই মনে পড়ে, ইহাদের মধ্যে বাস্তবতার সেই তীব্র প্রকাশটীর সেরূপ প্রাধান্য নাই। 'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাইরে'র মধ্যে বাস্তবতা আর এক পদ অগ্রসর হইয়াছে—দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে যে একটা সঙ্কীর্ণতা ও বন্ধন আছে, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর ইহাদের মধ্যে তোলা হইয়াছে, স্বামী স্ত্রীর পরস্পর সম্পর্কটীকে বেষ্টন করিয়া যে একটী ভাব-প্রধান তথা-কথিত পবিত্রতার গণ্ডী রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাহিরের প্রলোভন ও স্বাধীন বিচার-বুদ্ধিকে প্রবেশ করান হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য সংযম ও সুরুচির সহিত এই বিপজ্জনক বিষয়ের সীমান্তরেখাতেই নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন—আগুনে ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে পতঙ্গ যেমন একটা ব্যাকুল আগ্রহের সহিত দীপ্ত অগ্নিশিখার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে, লেখকও সেইরূপ একটা মনোহর অথচ ভয়াবহ নূতন অনুভূতির চারিদিকে দ্বিধাগ্রস্ত অথচ প্রচণ্ডরূপে আকৃষ্ট মানবাত্মাকে ঘুরাইয়াছেন। অগ্নিশিখাকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় পতঙ্গের মনে কি ভাব জাগে তাহা বোধ হয় মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত; কিন্তু এই কাণ্ড-ভীষণ আদর্শের মোহ যে হতভাগ্যকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার মানসিক অবস্থা অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির ন্যায় প্রতিরুদ্ধ-বেগ-চঞ্চল ও একটা অপ্রত্যাশিত ভয়ানক পরিণতির জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। সমস্ত জীবনটা একমুহূর্ত্তে কেন্দ্র-চ্যুত হইয়া কক্ষ-ভ্রষ্ট ধূমকেতুর ন্যায় একটা দুর্নিবার মত্ত ঘূর্ণিপাকের মধ্যে আলোড়িত হইতে থাকে; চক্ষুর সম্মুখে নূতন নূতন বিভীষিকা আলেয়ার আলোর মতই অস্থিরভাবে কাঁপিতে থাকে, জীবনের পরম আশ্রয় ও একান্ত নির্ভরগুলি ধূলিসাৎ হইয়া যায়—যাহা কিছু জীবনের আদর্শ ও সাধনার লক্ষ্য ছিল সমস্তই অর্থহীন কুসংস্কারে পরিণত হইয়া পড়ে। একদিকে চরম সার্থকতার স্বর্গ ও অপরদিকে পতনের অতল-স্পর্শ গহ্বর তাহাকে আকর্ষণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে থাকে। জীবনের এই অগ্নি-গর্ভ মুহূর্ত্তগুলিই বাস্তব ঔপন্যাসিকের বিশেষভাবে বর্ণনীয় বস্তু—এবং ইহাকে আর্টের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে, সৌন্দর্য্যস্রোতে গলাইয়া ও মিশাইয়া দিতে হইলে, উদ্ধত বিদ্রোহের সুরটী শান্তিতে বিলীন করিতে হইলে অসাধারণ কলা-কৌশল ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের প্রয়োজন—নতুবা তাঁহার সৃষ্টিকার্য্য ব্যর্থ প্রয়াস মাত্রে পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এক 'ঘরে বাইরে' ছাড়া আর কোথাও প্রলোভনের এই প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখান হয় নাই। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ জীবনের উজ্জ্বল ও আদর্শমূলক বিকাশগুলিকে কোথায় একেবারে বাদ দেন নাই। 'গোরাতে' যে সমস্ত সামাজিক ও ধর্ম্মজীবন-গত সমস্যা আলোচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের সহিত একটা বিরাট আদর্শের জ্যোতিঃ সম্মিলিত হইয়াছে। 'ঘরে বাহিরের' সন্দীপ যেমন ঘোরতর বস্তু-তান্ত্রিক, নিখিলেশও সেইরূপ ঘোরতর আদর্শবাদী; উভয়েই প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী, কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণে—নিখিলেশ সমস্ত সামাজিক সম্পর্ককে বিধি-নিষেধের বেড়াজাল হইতে মুক্ত করিয়া উহাকে একেবারে বিশুদ্ধ আদর্শের ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে চাহে; সন্দীপ তাহার সর্ব্বগ্রাসী লালসার তৃপ্তির জন্য তাহার ব্যক্তিত্বের বিপুল শক্তিতে সমস্ত নিয়ম-বন্ধন ছিন্ন করিতে উন্মুখ। মোটের উপর রবীন্দ্রনাথে আদর্শবাদের সহিত বাস্তবতার একটী সুন্দর সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসের বিস্তৃত সমালোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, কেবল তাঁহার মধ্যে বাস্তবতা কিরূপ আকারে ও কতটা প্রবলভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহারই আলোচনা ইহার বিষয়ীভূত। এখানে লক্ষিতব্য বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভাশালী ও প্রাচুর্য্যগুণোপেত লেখকও বাস্তব প্রণালী অনুসরণ করিয়া মোটে ৪৫ খানির বেশী উপন্যাস লিখিতে পারেন নাই। আর এই উপন্যাসগুলির বিষয় বস্তুর আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে তাহারা বেশ সাধারণ জীবন-যাত্রার বিবরণ হইতে নির্ব্বাচিত নহে, আমাদের বঙ্গদেশের প্রাত্যহিক সামাজিক অবস্থার মধ্যে সেরূপ কাহিনী খুব অনায়াসলভ্য নহে। এক 'চোখের বালি'কেই আমরা আমাদের সাধারণ জীবনের মধ্যে পুনরাবৃত্ত দেখিতে পারি, অন্যান্য উপন্যাসগুলি কিছু না কিছু অসাধারণ সংঘটনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে সহজেই অনুমান হয় যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন হইতে উচ্চ কলা-কৌশলের উপযোগী বিষয়-নির্ব্বাচন করা ও তাহাকে একখানি বৃহদাকারের উপন্যাসের মধ্যে বিস্তার করা কতটা দুরূহ ব্যাপার। বোধ হয় এই বিষয়-নির্ব্বাচনের দুরূহতার জন্যই রবীন্দ্রনাথ বড় উপন্যাসের ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়া ছোট গল্প রচনার দিকে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ হইতে বাস্তব উপন্যাসের প্রসার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আশাপ্রদ ধারণা হয় না।

রবীন্দ্রনাথের পরে শরৎচন্দ্র বাস্তব উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন, ও নানা দিক দিয়া উহার মধ্যে রস ও উচ্চাঙ্গের কলাকৌশলের অবতারণা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অধিকতর একনিষ্ঠতার সহিত উপন্যাসের সেবা করিয়াছেন, এবং তাঁহার বাস্তবতাও আরও অধিক ব্যাপক ও সুদূর-প্রসারী। রবীন্দ্রনাথে যাহা অস্ফুট ও অর্দ্ধোচ্চারিত ছিল, শরৎচন্দ্র তাহাকে প্রচণ্ড শক্তি ও অসঙ্কোচ নির্ভীকতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত আমাদের প্রকৃত সামাজিক জীবনের পরিচয় যেন একটা

শোভন অন্তরাল ও সূক্ষ্ম যবনিকার মধ্য দিয়া সংসাধিত হইয়াছিল—সেই জন্যই তিনি ইহাকে সম্পূর্ণ আবরণহীন ও নগ্ন করিয়া দেখেন নাই,—ইহার আকাশ-বাতাস, ইহার জীবন-যাত্রা ও সমস্যা, ইহার হৃদয়হীনতা ও বিরল মাধুর্য্য সকলেরই উপর একটা স্বচ্ছ মায়া বিস্তার করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পল্লী-কাহিনীগুলির মধ্যে এই দূরত্বের সুরটী বড়ই করুণ, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী ; তাঁহার কবির প্রাণ যেন এই অতি-সাধারণ জীবন-যাত্রার ভিতরকার রহস্যটীর মর্য্যাদা প্রাণপণে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিয়াছে, অতি-পরিচয়ের অবহেলার মধ্যে তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে দ্বিধা বোধ করিয়াছে। তিনি তাঁহার 'দৃষ্টিদান' নামক সুন্দর গল্পে তাঁহার অন্ধ নায়িকার মুখে যাহা বলাইয়াছেন, তাহাই একটু সামান্য পবিবর্ত্তিত ভাবে তাঁহার বাস্তব-চিত্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য—সেগুলিতে যেন বস্তুঅংশ যতদূর সম্ভব ছাঁকিয়া ফেলিয়া রস-অংশটুকুকেই ঘনীভূত করিয়া তোলা হইয়াছে। শরৎচন্দ্র কিন্তু এরূপ ব্যবধানের মধ্য দিয়া আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে দেখেন নাই—তিনি পল্লীগ্রামের মানুষ বলিয়াই আমাদের পল্লীসমাজকে এত সূক্ষ্মভাবে ও এত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সমাজের সমস্ত নীচাশয়তা, হৃদয়হীনতা ও ক্ষুদ্রতার তিনি এমন একটী নির্ম্মম চিত্র দিয়াছেন, যাহা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিরল ; এবং এই চারিদিককার সর্ব্বব্যাপী কঠোরতার মধ্যে করুণা ও সমবেদনার যে ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত আছে, তাহাও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে মর্ম্মস্পর্শী সহৃদয়তার সহিত বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং বিষয়-নির্ব্বাচনে ও সামাজিক চিত্রাঙ্কনে শরৎচন্দ্র আরও গভীরতর স্তর স্পর্শ করিয়াছেন, বাস্তবতার পথে আরও নির্ম্মম ও একনিষ্ঠভাবে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার 'পল্লীসমাজ,' 'অরক্ষণীয়া,' প্রভৃতি উপন্যাসে হতভাগ্য মানুষের উপর আমাদের এই সঙ্কীর্ণমনা, অন্ধ, প্রাণহীন আচার-সংস্কারের ভারে অবসন্ন ও অচেতন-প্রায় হিন্দুসমাজের বর্ব্বরোচিত অত্যাচারের কাহিনী এক অসহ্য বেদনার ও দৃপ্ত বিদ্রোহের রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এই দিক দিয়া শরৎচন্দ্রের মধ্যে বাস্তবতার চিহ্ন অধিকতর সুপরিস্ফুট, ও এই অনাবৃত বাস্তবতার মধ্য দিয়া তিনি যে করুণ রসের ভোগবতী-ধারা সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন, তাহাই আর্টের দিক দিয়া তাঁহার বাস্তবতাকে সার্থকতামণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

শরৎচন্দ্র বাস্তবতার আর একটী পথ দিয়াও রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। 'বাস্তবতা'র যে বিশেষ অর্থটী আজ কাল সাহিত্যের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আরও গভীরতর রেখায় অঙ্কিত দেখা যায়। তিনি আমাদের সামাজিক জীবনের এমন একটা দিক লইয়া আলোচনা করিতেছেন, যাহা এতদিন পর্য্যন্ত নৈতিক অনুশাসনের জন্য সাহিত্যক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত ছিল। প্রেম বস্তুটি যে কত বিচিত্র ও কত বিস্ময়কর, ইহার ক্রিয়া যে কতই নিগূঢ় ও অপ্রত্যাশিত, ইহা যে কিরূপ অসম্ভব ও অসদৃশ ঘটনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, দীর্ঘদিনের মোহ-নিদ্রার পর কত অকস্মাৎ ইহা নব-লব্ধ

চেতনার ন্যায় জাগিয়া উঠে, জীবনের সমস্ত গ্লানি ও কদর্য্যতার মাঝে কিরূপ আশ্চর্য্য উপায়ে নিজ জীবন ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া থাকে, দেহের সমস্ত কলঙ্ককালিমার স্পর্শ হইতে আপনার মুক্তি সাধন করে, জীবনব্যাপী লাঞ্ছনা ও অবমাননার মধ্যে "নিজ ভগবদ্দত্ত গৌরব-মুকুটের দীপ্তি ম্লান হইতে দেয় না—প্রেমের এই রহস্য-মণ্ডিত মহামহিমময় জীবন কাহিনীটী, যাহা আমরা সাধারণতঃ একটা উচ্ছ্বাসময় অস্পষ্ট কল্পনার মধ্য দিয়া অনুভব করি,—তাহাই শরৎচন্দ্র একেবারে অতি প্রত্যক্ষ ও স্বচ্ছ অনুভূতির রূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রেমের এই রহস্যময় জীবনী-শক্তির উদাহরণ দিতে গিয়া তিনি বিশেষভাবে সমাজ-পরিত্যক্তা পতিতার জীবন-কাহিনীর দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছেন। যাহাদিগকে ঘটনাচক্রে দুর্দ্দমনীয় প্রলোভন বা পুরুষের আশ্বাসবাণীতে অতিরিক্ত আস্থা স্থাপনের জন্যই পাপের পিচ্ছিল-পথে পদক্ষেপ করিতে হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও যে রমণীসুলভ কোমলতা বিদ্যমান, ও একনিষ্ঠ প্রেম নিজ উজ্জ্বল দীপশিখা জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, তাহাই তাঁহার বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়াছে। সমাজের চক্ষে যে পদস্খলন তাহাদের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ, যাহার জন্য তাহারা চিরদিন সমাজের গণ্ডী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, শরৎচন্দ্রের পক্ষে তাহাই তাহাদের প্রেমের বিচিত্র স্ফুরণের হেতু হইয়াছে—তাহাই তাহাদিগকে প্রেমের আসল স্বরূপটী চিনাইয়াছে ও প্রেমের অনপনেয় মহিমাটী তাহাদের মনে গাঢ়তরভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে। সমাজ তাহাদিগকে কোন অধিকার দেয় নাই; কিন্তু এই অধিকারচ্যুতির ফলেই তাহারা প্রেমের সনাতন গৌরবটী আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছে, আরও ব্যাকুল প্রতীক্ষা, শঙ্কিত অভ্যর্থনা ও করুণ কঠোর প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়া তাহাকে অন্তরে বরণ করিয়া লইয়াছে। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে যে প্রেম প্রায় সুপ্ত অচেতন ভাবেই সমস্ত জীবনটী কাটাইয়া দেয়, গৃহকার্য্য সম্পাদন ও সন্তান-পালনের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিচিত্র অনুভূতি ডুবাইয়া দেয়, কর্ত্তব্যকে আপন সিংহাসনে বসাইয়া নিজেকে সেই সিংহাসনের একপার্শ্বে সসঙ্কোচে সরাইয়া রাখে, সেই প্রেম এই পতিতাদের মধ্যে আশ্চর্য্যরূপে সতেজ ও জাগ্রত হইয়া উঠিয়া একটী অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য ও গৌরবের দাবী করিয়াছে। তাহাদের অন্তরে যে ব্যর্থতার অশ্রুস্তর জমাট বাঁধিয়া আছে, সেই তুষার কঠিন প্রদেশ হইতে একটা উগ্রতর উজ্জ্বলতার সহিত, আরও অদ্ভুত বর্ণচ্ছটা মণ্ডিত হইয়া বিচ্ছুরিত হইয়াছে। এই নব-জাগ্রত প্রেমের প্রতি মুহূর্ত্তে এক নূতন অনুভূতি ও নবীন প্রকাশ; ইহা যৌবন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত একটা একটানা, বৈচিত্র্যহীন স্রোতে প্রবাহিত নহে; ইহার মধ্যে প্রণয়ের অনন্ত সমুদ্র হইতে মুহুর্মুহু একটা জোয়ার-ভাটা আসিতেছে, অহরহ একটা গূঢ় আকর্ষণ-বিকর্ষণের লীলা চলিতেছে, অভিমান-ক্রোধ-প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী বিকারের ভিতর দিয়া ইহার অন্তরস্থ মাধুর্য্য আরও গাঢ়তর ও সুস্বাদু হইয়া উঠিতেছে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস লইয়া আমাদের সাহিত্য-জগতে যে একটা ঘোরতর বিচার-বিতর্কের ঝড় উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আর্ট ও নীতির মধ্যে যে একটা ক্রমবর্দ্ধনশীল বিরোধভাব আধুনিক উপন্যাসের একটা বিশেষ লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার মধ্যে নিষ্পত্তি করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয় এবং কোন একটী সাধারণ সূত্রের প্রয়োগে সে বিরোধের মীমাংসা অসম্ভব। প্রত্যেক ক্ষেত্রের বিশেষ অবস্থা অনুসারে স্বতন্ত্র বিচারের প্রয়োজন প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে লেখক যে পরিমাণে প্রচলিত নীতির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন সেই পরিমাণে কলা-সৌন্দর্য্য অবতারণা করিতে পারিয়াছেন কি'না। তারপর, লেখক যে সমস্ত বাস্তব বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, সেগুলি আমাদের সমাজের পক্ষে কতখানি প্রকৃত সমস্যা, কতটুকুই বা কাল্পনিক তাহারও বিচারের প্রয়োজন। আবার এই সমস্ত বাস্তব সমস্যার উপর লেখকের প্রত্যক্ষ অনুভূতির ছাপ না থাকিলে তাহারা আমাদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। বাস্তবতার নামে যাহারা অবাস্তবতা চালাইতে চাহেন, আর্ট হিসাবে তাঁহাদের এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মোটের উপর একটা আন্তরিকতা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির সুর শুনিতে পাওয়া যায়—আর তিনি যে সমস্ত বাস্তব সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন তাহার প্রায়ই আমাদের সমাজের অবিসংবাদিত প্রয়োজনের উপর অধিষ্ঠিত, ও আমাদের প্রকৃত জীবনের মধ্যেও কম বেশী প্রতিফলিত। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী লেখক ও অনুকরণকারীদিগের হাতে বাস্তবতা আমাদের সমাজের প্রকৃত অবস্থার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কতকগুলি কাল্পনিক ও অনুমানসিদ্ধ অবস্থার বিরক্তিজনক বিশ্লেষণে পরিণত হইয়াছে, ও কুৎসিত প্রসঙ্গ অবতারণার উপায় মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যেসব সমস্যা আমাদের নিজের নয়, বিদেশ ও ভিন্ন সমাজ হইতে আমদানী, যে বিদ্রোহ আমাদের গৃহকোণে ও পারিবারিক জীবনে ধূমায়িত হয় নাই, কিন্তু জাহাজ বোঝাই হইয়া সদ্য বন্দরে অবতরণ করিয়াছে, যে আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাদের সামাজিক জীবনে মুকুলিত হয় নাই কিন্তু কতকগুলি ব্যক্তি বা পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেগুলির উপর বাস্তব উপন্যাসকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে যে তাহার ভিত্তি বিশেষ দৃঢ় ও প্রশস্ত হইবে না ইহা নিশ্চিত। আর এই বাস্তব সমস্যার আলোচনার মধ্যে যদি লেখকের নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও গভীর অনুভূতি না থাকে, ইহা যদি লেখকের প্রাণের রসে সিক্ত ও সিঞ্চিত না হয়, ইহাতে তিনি যদি অপরের উক্তি ও ধার করা ভাবের সন্নিবেশ করেন, তবে বাস্তবতা তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণ হারাইয়া উৎকট বীভৎসতাতে পরিণত হইবে। আমাদের বাস্তব উপন্যাসের বিচার করিতে হইলে এই সমস্ত মূল সূত্রগুলি সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে।

যাহা হউক, আপাততঃ এই প্রসঙ্গের আলোচনা স্থগিত রাখিয়া শরৎচন্দ্র ভবিষ্যৎ উপন্যাসের জন্য কতখানি নূতন রাজত্ব জয় করিয়াছেন ও কিরূপ উর্ব্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন

তাহা আমাদিগকে একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে। যাঁহারা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সমূহের নিয়মিত পাঠক, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে কিছুদিন ধরিয়া তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির যেন হ্রাস হইয়া আসিতেছে। তিনি আমাদের এই বৈচিত্র্যবিহীন জীবনের মধ্যে যে নূতন রসধারা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ একটা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ও পরিণতি লাভ করিয়াছে কি না সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহের অবসর আছে। কিছুদিন ধরিয়া দেখা যাইতেছে যে তিনি প্রায় একই রকম চরিত্র সৃজন ও ঘটনা বিন্যাসের পুনরাবৃত্তি করিতেছেন মাত্র—তাঁহার প্রতিভার নবীন উন্মেষ যেন প্রতিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে প্রধানতঃ দুইটী উপায়ে তিনি আমাদের জীবনের মধ্যে রোমান্সের বৈচিত্র্য ও গূঢ় রসের সঞ্চার করিয়াছেন—(১) পতিতা বা সামাজিক বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মানা রমণীর চরিত্রে তিনি এক অপরূপ মাধুর্য্য ও আশ্চর্য্যরূপ বিশুদ্ধ ও একনিষ্ঠ প্রেমের আবিষ্কার করিয়াছেন; ও (২) আমাদের সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনে তিনি ভালবাসাকে একটী নূতন ও অপ্রত্যাশিত প্রণালীর মধ্যে প্রবাহিত করিয়া তাহার ঘাত প্রতিঘাত ও ভাব-বৈচিত্র্য বহুল পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার এই শেষোক্ত শ্রেণীর উপন্যাসে ভালবাসা বিবিধ ছদ্মবেশের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিমাতা সপত্নীপুত্রের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় স্নেহপরায়ণ এবং সংসারের সাধারণ বিরুদ্ধতা ও অবিশ্বাসের ভিতর দিয়া এই স্নেহ যেন একটা প্রতিরুদ্ধপ্রবাহ নদীর ন্যায় উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে ও পরিবারের ভিতর নানারূপ নূতন আবর্ত্ত ও জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে;—ইহাই শরৎচন্দ্রের খুব মনের মত বিষয় ও সামান্য পরিবর্ত্তনের সহিত তিনি একাধিকবার এই বিষয়ের আলোচনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে এই বিস্ময়কর নূতনত্বই আকর্ষণের প্রধান কারণ হইয়াছে। এক একখানি উপন্যাস স্বতন্ত্রভাবে পড়িবার সময় এই একই প্রকার ব্যাপার ও প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি আমাদিগকে ততটা পীড়িত করে না বটে, কিন্তু সমস্ত উপন্যাসগুলির এককালীন আলোচনার সময় আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে এই পুনরাবৃত্তি কল্পনা-দৈন্যের পরিচায়ক। অবশ্য কোন কোন পরিবারে এই অসাধারণ বিশেষত্ব বিদ্যমান আছে তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু যদি আমাদের সামাজিক জীবনে এই বিশেষত্বই মাত্র কেবল আলোচনার বিষয় হয়, তবে যেন সমাজের চিত্রটী ঠিক সত্যানুযায়ী হয় না,—অসাধারণ স্ফুরণগুলির উপর অত্যধিক জোর দিয়া সমাজের আসল স্বরূপটী বিকৃত করা হইয়াছে এই ধারণা আমরা অতিক্রম করিতে পারি না। শরৎচন্দ্রের সমস্ত স্ত্রীচরিত্রের মধ্যেই একটা পারিবারিক সাদৃশ্য (family likeness) সহজেই লক্ষ্য করা যায়—সকলেই স্নেহপরায়ণা, কিন্তু একটা প্রখর তেজস্বিতা ও প্রভুত্বপ্রিয়তার দ্বারা অন্তরের এই স্নেহ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ও পরিবারের অন্যান্য সকলে তাহাদিগকে ভুল বুঝিয়া বা তাহাদের এই হিতকর শাসন সহ্য করিতে না পারিয়া একটা

বিরোধ ও অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। বিষয়টী খুবই উপভোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সমস্ত স্ত্রীচরিত্র অভিন্নপ্রকৃতি হইলে ও তাহাদের ব্যবহার একরূপ ভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে, তাহাতে বৈচিত্র্যের হানি হয় তাহাও অস্বীকার করা যায় না। সেইরূপ সমস্ত পতিতাকেই যদি শ্রেষ্ঠ সতীত্বগুণের অধিকারিণী করিয়া দেখান হয়, তাহা হইলে প্রকৃত অবস্থার এইরূপ বৈপরীত্য-সাধনে আমাদের সত্যনিষ্ঠা সায় দিতে চাহে না। এইরূপে বাস্তবতার কেন্দ্রস্থলে এক নূতন রকমের অবাস্তবতার সৃষ্টি হইতে থাকে এবং শরৎচন্দ্র যে ইহার জন্য অনেকটা দায়ী তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং শরৎচন্দ্র যে নূতন পথ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা আমাদিগকে বেশী দূর অগ্রসর করিতে পারে নাই—তিনি জীবনের যে অংশ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাহা ঠিক কেন্দ্রস্থল না হইয়া সীমান্তপ্রদেশ পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে, ও এই নবাবিষ্কৃত পথ দিয়া ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিক যে তাঁহার বিজয় রথ অধিক দূর চালাইতে পারিবেন এরূপ আশার বিশেষ ন্যায়সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এই বাস্তবতা-প্রধান বিদ্রোহী উপন্যাসের বিরুদ্ধে আর এক প্রকার উপন্যাসের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, যাহাতে বিদ্রোহের পরিবর্ত্তে আমাদের সনাতন সামাজিক ও নৈতিক আদর্শকে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত, ও তাহার গৌরব ও মহিমা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করা হইয়াছে। উপন্যাসের এই বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁহারা লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহিলা-ঔপন্যাসিকেরাই সংখ্যায় এবং উৎকর্ষে শীর্ষস্থানীয়। বস্তুতঃ, এই উপন্যাস-ক্ষেত্রে মহিলাদের আবির্ভাব বোধ হয় সাহিত্য-জগতে সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। এই স্ত্রী-লেখিকারা আমাদের উপন্যাসের একটী বিশেষ অভাব পূর্ণ করিয়াছেন, আমাদের জীবনের একটি বিশেষ দিক্ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; এবং তাঁহারা যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা কোন পুরুষের পক্ষে সমান কৃতিত্বের সহিত করা সম্ভব ছিল কি না সন্দেহের বিষয়। স্ত্রী-প্রকৃতি রহস্যময়ী,—এই সত্য সকল দেশের সাহিত্যেই স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের দেশে সামাজিক আচার-ব্যবহারের বিশেষত্বের জন্য এই প্রকৃতিগত রহস্য অপরিচয় ও অনভিজ্ঞতার জন্য আরও ঘনীভূত হইয়াছে। যে লজ্জা-সঙ্কোচ আমাদের স্ত্রীজাতির প্রধান ভূষণ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা তাহাদের মনের উপর বেশ একটী ঘন অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া ঔপন্যাসিকের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের সমাজ-জীবনে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অবাধ ও অসঙ্কোচ মিলনের কোনই সুযোগ নাই; কোন পুরুষ-ঔপন্যাসিকই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের স্পর্দ্ধা করিতে পারেন কি না সন্দেহ। আমাদের নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ—প্রত্যেকের সহিত আমাদের যে বিশেষ সম্পর্ক তাহাকে সেই আসনে বসাইয়াই দেখি, তাহাকে সেই নির্দ্দিষ্ট আসন হইতে সরাইয়া অপরাপর দিক্ হইতে দেখিবার কোন চেষ্টা করি না। আবার সমাজ ব্যবস্থা ও পারিবারিক কর্ত্তব্যের চাপে আমাদের অধিকাংশ

স্ত্রীলোকেরই ব্যক্তিত্বের স্বাধীন স্ফুরণ হয় না। সুতরাং স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পুরুষেরা যাহা কিছু লেখেন, সমস্তই খুব সঙ্কীর্ণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত, ও তাহারা যে একটা সজীব গৃহস্থালীর যন্ত্র মাত্র,—এই ধারণার ধারা নিয়ন্ত্রিত। সেইজন্য স্ত্রীলোকের চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার আলোচনার জন্য, তাহাদের মূক সঙ্কুচিত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে ভাষার দ্বারা প্রকাশ করিবার জন্য, স্ত্রী-ঔপন্যাসিকের আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন ছিল—পুরুষের হাতে চিরকাল চিত্রতুলিকা আকিলে রমণীর প্রকৃত পরিচয় লাভ আমাদের মধ্যে অসম্ভব হইত। বিশেষতঃ আমাদের জীবনের এই অধ্যায়টী একেবারে অপঠিত রহিয়া গিয়াছে; স্ত্রীলোকের অন্তরের ইতিহাস এপর্য্যন্ত প্রকৃতভাবে লিখিত হয় নাই—যাহারা সংখ্যায় এত বেশী ও প্রকৃতিতে এত বিচিত্র, তাহাদিগকে আমরা কয়েকটী সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে বিন্যস্ত করিয়াই সন্তুষ্ট আছি। সেইজন্য যে উপন্যাস স্ত্রীজাতির প্রকৃত ইতিহাস দিতে চেষ্টা করিবে, তাহাদের বাহিরের ঐক্যের মধ্যে অন্তরের বৈচিত্র্য আবিষ্কার করিতে প্রয়াসী হইবে, তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যে কত অধিক তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

এই মহিলা-ঔপন্যাসিকদের প্রথম পথপ্রদর্শক বোধ হয় শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী; এবং তাঁহার পর বর্ত্তমান যুগে শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, ৺ইন্দিরা দেবী ও সীতা ও শান্তা দেবী উপন্যাস-ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলিকে স্ত্রীলোকের দিক হইতে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ করুণরস, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সহানুভূতির সহিত স্ত্রীজাতির নীরব সহিষ্ণুতা, ও প্রচ্ছন্ন বেদনাটীকে ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সত্যকথা বলিতে গেলে তাঁহাদের মধ্যেও একটা কল্পনা-দৈন্যের একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ও কতকটা পুরুষোচিত ভাবের প্রাধান্য লক্ষিত হইতেছে। ইঁহাদের প্রায় সকল উপন্যাসেই দাম্পত্য মনোমালিন্যের কাহিনীই সামান্যরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া আলোচিত হইতেছে—এই দাম্পত্য কলহে কখনও বা স্বামীর কিন্তু অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীর প্রতিই আমাদের সহানুভূতি প্রবলতর হয়। এই বিরোধের কারণ ও বিস্তৃত বিবরণ প্রায় সকল উপন্যাসেই অভিন্ন, কেবল শেষটী কোথায়ও বা মিলনান্ত আর কোথাও বা বিয়োগান্ত। আরও একটা দুঃখের বিষয় এই যে, স্ত্রীলোকের সুরটী, স্ত্রীজাতিসুলভ লঘুস্পর্শ ও সূক্ষ্মদর্শিতা—ইঁহাদের অনেকের মধ্যে একটা পুরুষোচিত পাণ্ডিত্যাভিমান ও বিশ্লেষণ বাহুল্যের নীচে চাপা পড়িয়া যাইতেছে। ইংরেজী উপন্যাসে যেমন Jane Austen or George Eliot এর প্রথম যুগের উপন্যাসগুলিতে লেখিকার জাতি-পরিচয় মুদ্রিত আছে, আমরা যেমন লেখকের নাম না জানিয়াও তাহাদের রচনার মধ্যে স্ত্রী-হস্তের কোমল স্পর্শটী অনুভব করি, আমাদের দেশের স্ত্রী-ঔপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস ভিন্ন অন্য কোথাও সে স্পর্শটী পাওয়া যায় না।

তাঁহাদের সাধারণ উপন্যাস পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া পুরুষের আদর্শ ও পাণ্ডিত্য-প্রকাশ অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহাদের প্রকৃতিদত্ত শক্তিটী নষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন। তাঁহারা যদি এই নিষ্ফল অনুকরণ-প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের স্বাভাবিক শক্তির অনুশীলন করেন, গৃহকোণের যে রহস্যটী পুরুষ-চক্ষুকে এড়াইয়া নীরবে কবি প্রতিভার প্রতীক্ষা করিতেছে তাহাকে সূর্য্যালোকে টানিয়া বাহির করিতে পারেন, স্ত্রীচরিত্রকে প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তবে তাঁহারা আমাদের উপন্যাসকে গৌরব-মণ্ডিত করিতে এবং ইহার ভবিষ্যৎ পরিণতির পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিতে পারিবেন।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে অনুমান করা যাইবে যে আমাদের বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ নহে। যখনই কোন লেখক আমাদের জীবনের মধ্যে কোন নূতন রসধারা আবিষ্কার করিয়াছেন, তখনই দেখা গিয়াছে যে এই রসধারা কিছুদিনের পর শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, অবিচ্ছিন্ন বেগ ও প্রবাহ লাভ করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ আমাদের বাস্তবজীবনের সঙ্কীর্ণতা ও উচ্চ আর্টের পক্ষে অনুপযোগিতা। আমাদের জীবন ক্ষুদ্র স্বার্থে ও ক্ষুদ্রতর বিরোধে এতই খণ্ডিত ও বিড়ম্বিত, শুধু বাঁচিয়া থাকার চেষ্টাতে এতই বিব্রত, যে ইহাতে উচ্চ আর্টের উপাদান নিতান্ত দুর্ল্লভ—ইহা কোন আদর্শের উজ্জ্বল জ্যোতিতে ভাস্বর বা কোন প্রবল চিন্তাধারার প্রবাহে মুখরিত হয় না। সেইজন্য ঔপন্যাসিক তাঁহার বিষয় নির্ব্বাচনে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত ও বিড়ম্বিত হইয়া পড়েন—বাস্তব জীবন তাঁহার উপযোগী হয় না বলিয়া তিনি কেবল অসাধারণত্বের খোঁজেই ফিরিয়া বেড়ান। সুতরাং তিনি প্রথম হইতেই বাস্তবের একটা রূপান্তরিত বা বিকৃত রূপ, সাধারণ নিয়মের একটা ব্যতিক্রম লইয়া আরম্ভ করিতে বাধ্য হন। আমাদের বাস্তব জীবনের আরও একটা অসম্পূর্ণতা এই যে, ইহা হইতে একটা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের উপযুক্ত প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব—ইহা দীর্ঘজীবিতায় যত হীন, রস-প্রাচুর্য্যের দিক দিয়া ততোধিক অভাব-গ্রস্ত। আমাদের জীবনে যে বিরোধ বা সমস্যাসঙ্কুলতা, তাহা বড় জোর একটী ছোট গল্পের কলেবর পূর্ণ করিতে পারে—ইহাকে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করিতে গেলে বুনন খুব ফাঁক হইয়া পড়ে এবং মন্তব্যের প্রাচুর্য্য দিয়া বক্তব্যের ক্ষীণতা পূরণ করিতে হয়। আমাদের দাসত্ব-লাঞ্ছিত সীমাবদ্ধ জীবনে বিরোধ কেবল অন্তর্গূঢ় হইয়া গুমরিয়া মরে, কোন দুঃসাহসিক কার্য্যের ভিতর দিয়া বাহির হইবার পথ পায় না, কেবল অলস মধ্যাহ্নে কপোতকূজনের মত একটা নিষ্ফল ক্ষোভ ও হতাশ শ্রান্তির সুরটীকে দীর্ঘতর করিয়া তোলে মাত্র। প্রতিভা এই দুর্ভেদ্য পাহাড় কাটিয়া যে রাস্তার রেখাটী বাহির করে, কিছুদিন পরে এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণে সেই পথটী আবার রুদ্ধ হইয়া যায়। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ইতিহাস এই নূতন পথ আবিষ্কার ও অল্পদিন পরেই তাহার স্বাভাবিক বিলোপের কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি। এই সমস্ত কারণেই মনে হয় যে

আমাদের সামাজিক অবস্থার একটা আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে আমাদের মধ্যে উপন্যাসের পরিণতির সম্ভাবনা খুব অল্প। উপন্যাসের সহিত তুলনায় বরঞ্চ ছোটগল্পেরই আমাদের সামাজিক অবস্থার সহিত উপযোগিতা বেশী। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির মধ্যে আমাদের জীবনের যত বৈচিত্র্য, যত রসধারা, যত রোমান্স ঘনীভূত হইয়া আছে, বোধ হয় সমস্ত উপন্যাসগুলি একত্র করিলেও তাহার অনুরূপ কিছু পাওয়া যায় না। আমাদের জীবন-নাটক যেরূপ ক্ষুদ্র, তাহার রঙ্গমঞ্চও তদনুরূপ ক্ষুদ্র হওয়া প্রয়োজন। একটী ক্ষুদ্রায়তন গল্পের পরিধির মধ্যেই আমাদের ব্যস্তব জীবনের যাহা কিছু গাঢ় ভাব, যাহা কিছু সমস্যাসঙ্কুলতা তাহার বোধ হয় বিনা কষ্টে স্থান সঙ্কুলান করা যাইতে পারে। প্রভাতকুমারের ক্ষুদ্র গল্পগুলিও স্বাভাবিকতা, সরলতা ও হাস্য রস প্রাচুর্য্যে আমাদের সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। আমাদের জীবন যতদিন পর্য্যন্ত বিচিত্র অনুভূতিতে পূর্ণ, রসসমৃদ্ধ ও প্রকৃত জাতীয়ভাব-পুষ্ট না হইয়া উঠিবে, ততদিন উপন্যাস তাহার অস্বাভাবিক পিঙ্গলতা পরিহার করিয়া স্বাস্থ্য সম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারিবে না। বোধ হয় প্রত্যেক ঔপন্যাসিক উপন্যাস লিখিবার সময় এই সত্য মনে মনে অনুভব করেন তাঁহারা যদি এই সত্যকে সাহসের সহিত স্বীকার করিয়া ইহাকে প্রকৃত কার্য্যে পরিণত করেন, ও কেবল সংখ্যাধিক্যের মোহের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া অনুপযোগী বিষয়ালোচনার দ্বারা সাহিত্যকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়া না তোলেন, তবে তাহাতে আমাদের সাহিত্যের স্থায়ী মঙ্গল হইতে পারে,—এইরূপ অনুমান করা বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

সমাপ্ত

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বারের বাহিরে

(১)

রাত্রে নানান চিন্তায় ভাল ঘুম হয় নাই। ভোর না হইতেই সুরমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বাহিরে আসিয়া দেখে—অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। গায়ে আঁচলখানি জড়াইয়া সুরমা দুয়ারের পাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শরীরটা তার আদপেই ভালো ছিল না—বড়ই যেন দুর্ব্বল এবং অবসন্ন বোধ হইতেছিল। কয়দিন ধরিয়া ক্রমাগত জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া গতকল্য হইতে তার জ্বরত্যাগ হইয়াছিল বটে, কিন্তু বৃষ্টি থামিয়া যাইবার পরও অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃতির বুক জুড়িয়া যেমন একটা নিরানন্দময় বিষণ্ণ ভাব চাপিয়া বসিয়া থাকে,

ঠিক তেমনি করিয়া একটা শারীরিক জড়তা এবং অবসাদ আজিকার এই মেঘাচ্ছন্ন বিষণ্ণ প্রভাতটিতে তাহাকে ছাড়ি ছাড়ি করিয়াও ছাড়িতে চাহিতেছিল না। অথচ একদিন শুইয়া থাকিলে সংসার অচল হইয়া উঠে, এবং তাহার পতিদেবতাটির দৈনন্দিন হাইকোর্ট যাত্রা এবং তথা হইতে ভেরেণ্ডা ভাজিয়া গৃহপ্রত্যাগমন ব্যাপারটি বন্ধ হইয়া যায়। সংসারে একটিমাত্র যে ঠিকা-ঝি ছিল, আজ কয়দিন হইল অর্থাভাবে তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং এই দরিদ্র সংসারটিতে চণ্ডীপাঠ হইতে জুতা শেলাই পর্য্যন্ত সমস্ত কাজই তাহাকে করিতে হইত, এবং আজও যে করিতে হইবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ একসময় সুরমা উঠিল, এবং নীচে রান্নাঘরে গিয়া গতরাত্রের বাসি বাসনগুলি কলতলায় বাহির করিয়া আনিল। তখন বৃষ্টিটা একটু ধরিয়া আসিয়াছে, তবু বাসন মাজিতে বসিয়া তাহার মাথার ও পিঠের কাপড় ভিজিয়া গেল।

রান্নাঘরে ফিরিয়া সুরমা একখানা গামছা দিয়া আর্দ্র দীর্ঘ কেশগুলি মুছিবার চেষ্টা করিতেছে—এমন সময় শচীশ আসিয়া দরজা ধরিয়া দাঁড়াইল, এবং স্ত্রীর দিকে একবার মাত্র চাহিয়াই শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল—"ভিজে একবারে নেয়ে উঠেছ যে—শিগ্‌গির কাপড় ছেড়ে ফেল—এখুনি কম্পদিয়ে জ্বর আসবে।" ঈষৎ হাস্য করিয়া সুরমা কহিল—"কিছু হবে না গো—কিছু হবে না—তুমি এখান থেকে যাও দেখি এখন।" একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস বক্ষ ভেদ করিয়া উঠিয়া শচীশের নাসারন্ধ্র পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, জোর করিয়া সেটাকে ভিতর দিকে ঠেলিয়া নামাইয়া দিয়া শচীশ কহিল—"বুঝেছি সুরো সব বুঝেছি।"

"কি বুঝেছ শুনি।"

"কাপড় কই যে ছাড়বে।"

"ছাই বুঝেছ।"—বলিয়া সুরমা জোর করিয়া টানিয়া হাসিবার চেষ্টা করিল।

"তবে তাই।"—বলিয়া চলিয়া যাইতে গিয়া হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া শচীশ বলিল—"কলসীটে কই দাও দেখি।"

সুরমা বিস্মিত হইয়া কহিল—"কলসী কি হবে?" একটা শুষ্ক হাসি হাসিয়া শচীশ কহিল—"কলসী গলায় বেঁধে ডুবে মরাই আমার উচিত, কিন্তু সে-কাণ্ড করলে আপাততঃ তোমাকে আর একটু বেশী অসুবিধায় ফেলা হবে, সুতরাং দাও, জলটাই এনে দিই।"

"কি যে বল তুমি! জল আনতে হবে কেন?"

"অত কথার আমি জবাব দিতে পারিনে। দাও কলসী, না, আমি নিজেই নিচ্ছি।"—বলিয়া শচীশ কলসী তুলিয়া লইয়া কলতলায় চলিয়া গেল! এবং অনতিবিলম্বে এক কলসী জল আনিয়া রান্নাঘরের মেঝেতে নামাইয়া রাখিল। সুরমা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া স্বামীর

কাজ দেখিতেছিল ; শচীশ তাহার অভিমান-স্ফুরিত কপোলে মৃদু করাঘাত করিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

বেলা প্রায় দশটার সময় আহারান্তে শচীশ কোর্টে যাওয়ার আয়োজন করিতেছিল ; সুরমা ডিবায় করিয়া পান আনিয়া দিল। কিন্তু স্বামীর মুখ গম্ভীর দেখিয়া কোন কথা কহিল না। কাপড় পরা হইয়া গেলে শচীশ পান লইবার জন্য ফিরিয়া সুরমার মলিন মুখখানি দেখিতে পাইল। নিজের চিন্তাটাকে আমল না দিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "কি সুরো, চুপচাপ যে।"

সুরমা কহিল "কি বলব।"

"কেন, যা খুসী। তুমি অত বিষণ্ণ হয়ে আছ কেন। যে কর্ত্তব্য পালন না করতে পারে তারই মুখ দেখাতে লজ্জা হয়, তুমি তো তোমার সমস্ত কর্ত্তব্য পালন কর সুরমা, তবে তোমার এই দুঃখ কেন?"

সুরমা আরো মলিন হইয়া গেল, কহিল, "এসব কথাগুলো কেন বল। সংসারে সব দিন সমান যায় না। তুমি অত নিরাশ হয়ো না—কোর্টে যাচ্চ, এসো গিয়ে, যা তা ভেবে মন খারাপ কোরো না।"

একটা বেদনার উচ্ছ্বাসে শচীশের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল। সে আর কথা না বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু সেদিন কোর্টেও ভাল লাগিল না! সকালবেলার সুরমার সেই কর্ম্মনিবিষ্ট সিক্ত মুর্ত্তিখানি তাহার চোখে ভাসিতে লাগিল।

(২)

দুপুর বেলা ভাত খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম পাইয়া সুরমা ঘরদোর পরিষ্কারে মন দিয়াছিল। গতরাত্রির বর্ষণ জীর্ণ বাড়ীখানিকে একেবারে স্যাঁতস্যাঁতে করিয়া তুলিয়াছিল ; একটুখানি রৌদ্রের অভাস দেখিয়া সুরমা তাহার সংস্কারে প্রবৃত্ত না হইয়া পারিল না। এই দারিদ্র্যকবলিত ক্ষুদ্র সংসারটিকে চারিদিক হইতে মাজিয়া ঘষিয়া উজ্জল করিয়া রাখিতে সুরমা প্রত্যেকদিন সাধ্যাতীত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিত। সুরমা একমনে আপনার কাজ করিতেছে, এমন সময় দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। পাশের বাড়ীর একটি বছর নয় দশকের ছেলে ঝির অনুপস্থিতিতে সুরমার পাহারায় নিযুক্ত ছিল, সুরমা তাহাকেই ডাকিয়া কহিল, "দেখতো চারু, কে এল বাইরে।" চারু ছুটিয়া নীচে গেল, এবং দ্বার খুলিয়া দেখিল, শচীশ দাঁড়াইয়া আছে। উপরের বারান্দা হইতে সুরমাও দেখিতেছিল ; অসময়ে স্বামীকে ফিরিতে দেখিয়া সে একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

দরজা খুলিয়া দিয়াই চারু কর্ত্তব্যভার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অন্য কোন সৎকার্য্যের সন্ধানে পলায়ন করিয়াছিল। শচীশ বারান্দায় উঠিয়াই স্ত্রীর দেখা পাইল। সুরমা উদ্বিগ্নস্বরে প্রশ্ন করিল, "এত শীগ্গীর যে?"

"কোর্টে আজ ভাল লাগ্‌ল না।"

"শরীরে কোন অসুখ হয়নি ত ?"

"না না, অসুখ না। এক জায়গায় গিয়েছিলাম আজ ; একটা মজার কথা, শুনবে এসো।"

ঘরে ঢুকিয়া শচীশ পোষাকশুদ্ধ বিছানায় শুইয়া পড়িল ; সুরমা একটা ছেঁড়া কাপড়ে রিপু করিতে করিতে উৎসুকনেত্রে চাহিয়া কহিল, "কি মজার কথা !"

শচীশ কহিল, "কোর্টে ভাল লাগছিল না কি না, তাই রাস্তায় বেরুলাম ; হঠাৎ আমাদের নগেনের সঙ্গে দেখা—দেখলুম খুব ব্যস্ত হয়ে কোথায় চলেছে ; জিজ্ঞেস করতে বল্লে, সাধু দর্শনে যাচ্চে। মস্ত সাধু নাকি, মানুষের হাত দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব অনায়াসে বলে দিতে পারেন।"

"গণৎকার বুঝি ।"

"আগেই বিদ্রূপ ! শোন না, গিয়েছিলাম আমিও সেইখানে—"

"সত্যি নাকি ! এমন মতি হল যে ?"

"অভাবে স্বভাব নষ্ট ! একটু মনের সান্ত্বনা পাওয়া গেল, মন্দ কি ?"

সুরমা আগ্রহের সুরে কহিল, "সান্ত্বনা দিলেন নাকি ! কি বল্লেন হাত দেখে !"

"বল্লেন একটা কথা ! এবং নেহাৎ মিথ্যেও বলেন নি, কিন্তু সাধুর কালজ্ঞান নেই, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সব একসঙ্গে পাকিয়ে ফেলেছেন।"

"শুনি না, কি !"

"আমি নাকি বিবাহসূত্রে প্রভূত ধনলাভ করব।" বলিয়া শচীশ হাসিয়া উঠিল। সুরমা যে ভয়ানক চমকিত হইয়া হাত হইতে সেলাইটা ফেলিয়া দিল, তাহা সে লক্ষ্যই করিল না। সুরমা কম্পিতহস্তে সুচে সূতা পরাইতে লাগিল। তাহার বুকের শোণিত-স্রোতে যেন উত্তাল তরঙ্গ খেলিতেছিল।

শচীশ তখন কাছারির কাপড় ছাড়িতেছিল ; সুরমার নিকট হইতে কোন জবাব না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি সুরো, ভাবচ কি ; সাধুর কথাটা সত্যি না মিথ্যে !"

"সত্যিও হ'তে পারে !"

"কি রকম ? সেতো কবেই সত্যি হয়েচে।"

সুরমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। শচীশ কহিল, "বিবাহসূত্রে প্রভূত ধনলাভ তো আমার ভাগ্যে ঘটেই গিয়েছে। এ তো ভবিষ্যতের কথা হ'তে পারে না।"

সুরমা অবস্থাপন্ন পিতার কন্যা নয়। সে সেই কথা স্মরণ করিয়া কহিল, "বিয়েতে খুবই ধনলাভ করেছিলে, তাকি আর জানি না ?"

শচীশ সুরমার অধিকৃত আসনের একধারে বসিয়া পড়িল ; সুরমার হাতখানি আপনার

হাতে তুলিয়া লইয়া কহিল, "সুরো, তুমি ইচ্ছে করেই এসব কথা বুঝতে চাও না, কেবল টাকাই কি ধন ?"

তাহার প্রেমপূর্ণ স্নিগ্ধস্বর সুরমাকে অনেক কথা বুঝাইয়া দিল ; সুরমা আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

জানালার বাহিরে ম্লান রৌদ্রটুকু সহসা নিবিয়া আকাশ অন্ধকার হইয়া গেল। একটা শীতল বাতাস কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেহে অপ্রীতিকর শিহরণ জাগাইয়া তুলিল।

সেদিন রাত্রে আবার আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। শচীশ ঘুমাইয়া পড়িল ; কিন্তু সুরমার ঘুম আসিল না। বাহিরে বৃষ্টির শব্দ ; শার্শিতে বিদ্যুতের আলো আসিয়া পড়িতেছে ; এক একবার গুরুগম্ভীর শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে। গৃহকোণে একটি মৃদু আলো বাতাসে কাঁপিতেছিল, সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া সুরমা ভাবিতে লাগিল, যদি সাধুর ভবিষ্যৎ-বাণী অন্য ভাবে সত্যে পরিণত হয়! যদি স্বামী আবার—, না, একথা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু কল্পনাতীত অনেক ব্যাপার পৃথিবীতে নিত্য ঘটিতেছে। সত্যই যদি স্বামী কোনদিন আবার বিবাহ করেন, তবে সুরমা কেমন করিয়া, কি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে! এই চিন্তাও তাহাকে এমন কষ্ট দিতে লাগিল যে সুরমা আর চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে পারিল না ; উঠিয়া বসিয়া সুপ্ত স্বামীকে ঈষৎ স্পর্শ করিয়া ডাকিল, "ঘুমোচ্ছো নাকি ?"

শচীশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, পাশ ফিরিয়া কহিল, "কি হয়েচে ?"

"হয়নি কিছু, বৃষ্টির শব্দে ঘুম আসচে না।"

শচীশ গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইয়া কহিল, "বসে আছ কেন! শোও, আপনি ঘুম আসবে।"

"না, আসবে না, আমি সেই সাধুর কথা এতক্ষণ ভাবচি।"

"সাধুর কথা কি !"

"সেই—যাঁকে আজ হাত দেখিয়ে এলে! আমি ভাবচি কি—আমারো হাতটা তাঁকে দেখালে হয় না।"

এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া শচীশের নিদ্রার ঘোর একেবারে টুটিয়া গেল। সে কহিল, "পাগল নাকি! ওখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি কখনও ? নিজে যা বিশ্বাস করিনে—"

"তুমি কি তাঁর কথা বিশ্বাস কর নি ?"

"একবর্ণও না, তুমি ঘুমোও, ওসব ভেবে মাথা গরম কর্ব্বার দরকার নেই।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শচীশের নাসিকা ধ্বনিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সুরমার অদৃষ্টে সেদিন নিদ্রাসুখ লেখা ছিল না।

(৩)

বর্ষণক্লান্ত ধূসর আকাশে সাদা মেঘগুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

দ্বিতলের শয়ন কক্ষে মলিন শয্যায় সুরমা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া আছে। চারিদিকে দারিদ্র্যের শতচিহ্ন বিরাজিত। সুরমার পাণ্ডুমুখ, বিশীর্ণ দেহ, অযত্ন-এলায়িত রুক্ষ কেশরাশি গৃহস্থিত জীর্ণ আস্‌বাব্‌পত্রের সহিত সমতা রক্ষা করিয়াছিল। আজ ছয়মাস যাবৎ সুরমা এই রোগশয্যাশায়ী হইয়া আছে। রোগের প্রধান উপসর্গ জ্বর ও প্রবল কাসি; জ্বর মাঝে মাঝে ছাড়িয়া যায়, কিন্তু কাসি কিছুতেই সারে না। আজ কয়দিন মধ্যে কাসির সঙ্গে একটু একটু রক্ত উঠিতেছে। চিকিৎসা চলে না; চোখের সম্মুখে রৌদ্রদগ্ধ লতার মত সুরমা শুকাইয়া উঠিতেছে; আর তাহাই দেখিয়া শচীশের অন্তর অহর্নিশি অগ্নিতাপে দগ্ধ হইতেছে।

················নীচে কলতলায় ঠিকা ঝি বাসন মাজিতেছে, সেই শব্দ সুরমার অবসন্ন কর্ণপথে প্রবেশ করিয়া দুর্ব্বল মস্তিষ্কে সঞ্চরণ করিতেছিল।

অন্ধকার ভগ্নপ্রায় সোপান শ্রেণীতে জুতার শব্দ শোনা গেল, পরক্ষণে শচীশ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহারও চেহারা রোগা হইয়া গিয়াছে। সমস্ত মুখচোখে রুক্ষতার তীব্র ছায়া পড়িয়াছে।

বিছানার কাছে গিয়া শচীশ আস্তে আস্তে সুরমার ললাট স্পর্শ করিতেই সে চোখ মেলিল। শচীশ কহিল, "ঘুমোও নি!"

সুরমা ক্ষীণস্বরে কহিল, "ঘুম তো আসে না।"

"আজ এখনও জ্বরটা আসে নি, সেই অষুধটা খেয়ে একটু উপকার হচ্চে বোধ হয়!"

"কি জানি। তুমি আজও একবার কোর্টে গেলে না!"

"ও যাওয়া-না-যাওয়া সমান। আর একটা প্রাইভেট টিউশনীর ব্যবস্থা করে এলাম।"

"আবার একটা! সকালে সন্ধ্যায় দুটো তো আছেই, তার উপর আর একটা! শরীরে সইবে তো?"

"সইবে একরকম করে।" বলিয়া শচীশ ভাবিতে লাগিল। জীবন তাহার পক্ষে বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল। সুরমার রোগ, গৃহকার্য্যের বিশৃঙ্খলা, অর্থের দারুণ অভাব ও সর্ব্বোপরি অনভ্যস্ত দেহে অবিশ্রাম খাটুনী তাহাকে ক্রমেই ক্লান্ত করিয়া ফেলিতেছিল। তাহার মনে হয়, সংসারের সকল চিন্তা ছাড়াইয়া নিশ্চিন্ত বিশ্রামে কোথাও একবার হাত পা মেলিয়া শুইয়া পড়িতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু সে অবসর কই! এ জীবনে হয়তো আর বিশ্রামের সুযোগ মিলিবে না! এই দৈন্য-পীড়িত, শ্রান্ত দেহ লইয়া শুষ্ক ম্লানমুখে কেবলই ঘুরিয়া বেড়াইবে।

স্বামীকে নীরব দেখিয়া সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবচো!"

সেই সময় অদূরে বড় রাস্তায় একটা ঘড়িতে সশব্দে দ্বিপ্রহর ঘোষিত হইল ; শচীশ ঈষৎ চমকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "আমি তবে এখন যাই।"

"কোথা যাচ্চ ?"

"ঐ যে বল্লুম, আর একটি ছেলেকে পড়ানো ঠিক করে এসেছি, সে আজ হ'তেই।"

"এখুনি যেতে হবে নাকি ?"

"হ্যাঁ। একটা থেকে তিনটে পর্য্যন্ত পড়ানোর কথা ; তা একটা তো বেজেই গেল। শীগ্‌গীর করে যাই।"

শচীশ চলিয়া গেলে সুরমা মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল। স্বামীর জন্য তাহার কিছু করিবার সাধ্য নাই। যতদিন পারিয়াছে, নিজের স্বাস্থ্য, সুখ, আরাম কিছুই লক্ষ্য না করিয়া সে প্রাণপণে তাঁহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল ; সেই প্রাণপণ প্রয়াসের প্রতিক্রিয়া তাহার কর্ম্মক্লিষ্ট, অনাহারশীর্ণ দেহে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিয়া অবশেষে তাহাকে শয্যাশায়ী করিয়াছে। স্বামীর জন্য সমস্ত কাজ করা তাহার জীবনের আনন্দ ছিল, সেই আনন্দ হইতে সে কি নিষ্ঠুররূপে বঞ্চিত হইয়া আছে। চোখের উপরে তাঁহাকে অযত্নে কষ্ট পাইতে দেখিয়াও কোন প্রতিকার করিবার উপায় তাহার হাতে নাই। তাহার সর্ব্বাধিক দুঃখ, আজকাল স্বামীকে চোখে দেখার সুখটুকুও তাহার পক্ষে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। কারণ শচীশকে সারাদিনই নানাকাজে বাহিরে ঘুরিতে হয়।

······বহির্জ্জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ক্ষুদ্র বাসাবাড়ীর ক্ষুদ্র কক্ষে রোগশয্যায় শুইয়া সুরমা দিনরাত্রি কেবল একটি মুখের ধ্যান করিত। সেই একাগ্র তন্ময়তা তাহাকে অজানিত-পূর্ব্ব, কামনাপরিশূন্য এক নূতন প্রেমের রাজ্যে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইত। শচীশ কিছুই জানিতে পারিত না, তখন অন্নচিন্তা তাহার মনে প্রবল হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

নানা দুঃখের চিন্তায় সুরমার চোখে অশ্রু সঞ্চারিত হইতেছিল, এমন সময় একটা অপরিচিত কণ্ঠস্বরে তাহার অসংলগ্ন চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখিল, দ্বারের নিকট একটি স্থূলকায়া বিধবা। ঝিএর সঙ্গে দাড়াইয়া বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিতেছে—"এই শচীর বৌ নাকি !"

ঝি মাথা নাড়িয়া কথার উত্তর দিল।

বিধবা সন্তর্পণে পা ফেলিয়া বিছানার অনেকটা কাছে আসিয়া তীক্ষ্ণনেত্রে সুরমাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিলেন, "তুমি তো আমাকে চেনো না বৌ, আমি শচীর আপন মাসী হই।"

সুরমা এই মাসীটির কথা অনেক শুনিয়াছিল। বড়ঘরের বৌ বলিয়া মাসীর যখন তখন যেখানে সেখানে আসা যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না।

সে কহিল, "মাসিমা,, আমি তো উঠতে পারি না, পায়ের ধুলো দিন।"

মাসী কহিলেন, "থাক্, অমনি আশীর্ব্বাদ করেছি; এসেছিলাম কাঁসারীপাড়ায় আমার ভাগ্নের বিয়েতে; একযুগ পরে এই কলিকাতায় আসা, ভাবলুম শচীকে দেখে যাই। যে বাড়ীতে বাঁধা পড়েছি বাছা, এক পা কোথাও বেরোবার যো নেই। গাড়ী দাঁড় করিয়ে এসেছি, এক্ষুণি যাব; শচী তো বাড়ী নেই, ফিরলে তাকে বোলো যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। চোদ্দ নম্বর—তা কালীহর মুখুয্যের বাড়ী বল্লে সবাই চিনিয়ে দেবে; যায় যেন, আমি আবার কাল সকালেই বাড়ী ফিরব, আজ না গেলে আর দেখাই হবে না। যাই তবে—"

সুরমা কথা কহিবার একটু ফাঁক পাইয়া কহিল—"একটু বসবেন না?"

"না। ওদের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। আসি—" বলিয়া ঘরের চারিদিকে আর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যাবেলা শচীশ বাড়ী আসিলে, সুরমা মাসীর সংবাদ দিল। শচীশ কহিল, "কালীহর মুখুয্যের বাড়ী খুব জানি, মস্ত বড় লোক তাঁরা। যেতে সাহস হয় না।"

সুরমা ক্ষীণহাস্যে কহিল, "মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে যাবে, তাঁদের সঙ্গে কি?"

"তা সত্যি, তবে বাড়ীটা ওঁদের। বড় লোকের সঙ্গে আমি একেবারেই মেলামেশা করতে পারি না।"

"আচ্ছা, দেখে এসো তো।"

সেইদিন রাত্রে ফিরিয়া কিন্তু শচীশ ধনী গৃহস্থের খুব প্রশংসাই করিল। মুখুয্যে ও তাঁহার গৃহিণী নবপরিচিত অতিথিকে অত্যন্ত স্নেহযত্ন করিয়াছিলেন; তাই সে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। সব শুনিয়া সুরমা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "মাসীমা কি কাল চলে যাবেন?"

শচীশ কহিল, "না।"

"তবে আর একদিন আসতে বল্লে না কেন?"

"আসবেন। আমার বাসায় এসে ক'দিন থাকবেন বলেছেন।"

"এখানে তাঁর কষ্ট হবেনা বড্ড?"

"তা কি করব। আমার মা থাকলে থাকতেন না?"

(৪)

সকালের উজ্জ্বল আলো বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছে। সেইখানে বসিয়া মাসীমা তরকারী কুটিতেছিলেন। ঘরের মধ্যে সুরমা বোধ করি এতক্ষণ শুইয়াছিল; বারান্দায় মাসীর সাড়া শব্দ পাইয়া কোনমতে উঠিয়া সেখানে আসিল। মাসী কোন কথা কহিলেন না। সুরমা একটু কাছে গিয়া বসিল; ক্ষীণস্বরে কহিল, "মাসীমা, আমি হাত ধুয়ে এসেছি, তরকারীগুলো কুটে দিই না?"

মাসী অপ্রসন্নমুখে কহিলেন, "না বাছা, থাক, অসুখ বিসুখ ছোঁয়া নাড়ার দরকার নেই।"

সুরমার শীর্ণমুখ একটা দুঃসহ আঘাতে ম্লান হইয়া গেল। সে আর কথা কহিতে পারিল না; মাসী আপনমনে কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন, দিন দশ বারো হইল মাসী শচীশের সংসারে বাস করিতেছেন। প্রথম হইতেই রুগ্ণ অকর্ম্মণ্য বধূ তাঁহার বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছে; তাহা সুরমাও বোঝে কিন্তু হেতু খুঁজিয়া পায় না।

ঝি নীচে হইতে ডাকিল, "দিদিমাগো, উনুন ধরে গেছে—"

মাসী চেঁচাইয়া কহিলেন "যাচ্চি।"

তারপর যেন আপনমনেই কহিলেন "আজ তো বেশী রাঁধব না, শচীর আবার কাঁসারী পাড়ায় নেমন্তন্ন আছে।"

শচীশের আজকাল মুখুয্যেগৃহে খুবই নিমন্ত্রণ হয়। মাসী আসার পর হইতে সুরমা স্বামীর সঙ্গ একেবারেই পায় না। ছোট বাড়ী। গুরুজনের সম্মান রাখিয়া চলিতে হয়। দুইজনে একান্তে সে নির্জ্জন আলাপের আর সুযোগ নাই, আগ্রহ আছে কিনা তাহাতেও সন্দেহ।

স্রোতের মুখে শিলার বাঁধ পড়িলে আর তাহার গতি অব্যাহত থাকে না; আপনার সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে তাহার প্রবাহ উত্তাল হইয়া উঠে। সংসারের রোগ দুঃখ, অনিবার্য্য কত ঘটনা সুরমার জীবনস্রোতের গতিরোধ করিয়া দিয়াছিল, তাই তাহার বুকের মধ্যে অশান্ত ক্রন্দন কেবলই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল।

তরকারীর থালা, বঁটী ইত্যাদি লইয়া মাসী নীচে নামিয়া গেলেন। সুরমা দেয়ালে দেহভার স্থাপন করিয়া সেইখানে বসিয়া রহিল। নীচে শচীশের গলার স্বর শোনা গেল; সে মাসীর সঙ্গে কি কথা কহিতেছিল। সুরমা উৎকর্ণ হইয়া রহিল। অল্লক্ষণের মধ্যেই শচীশ সিঁড়ি উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সুরমা উৎসুকনেত্রে চাহিতেই উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইল। শচীশ জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কেমন আছ?"

সুরমা ম্লান হাস্যে কহিল, "এক রকমই। আর কতদিন তোমাদের ভোগাব জানি না।"

গায়ের চাদর ও জামা খুলিয়া রেলিংএর উপর রাখিতে রাখিতে শচীশ কহিল, "নিজের ভোগটা কিছু কম হচ্চে নাকি।"

সুরমা মৃদুস্বরে কহিল, "নিজেরটা তো সহ্য হয়।"

শচীশের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ছিল না। তবু সে চেষ্টা করিয়াই একটু হাসিয়া কহিল, "খুব পরার্থপর তো!" সে গলার স্বর হাসির শব্দ যেন আর একজনের। সুরমা উত্তর দিল না। শচীশ বারান্দার এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত পায়চারী করিতে লাগিল; যেন কি

বলিবে, কিন্তু সঙ্কোচ কাটাইতে পারিতেছে না। মাসীর ডাক শোনা গেল, "শচী বেলা হচ্চে, নেয়ে ওদের ওখানে যাবিনে ?"

শচীশ কহিল, "যাই মাসীমা।" তার পর সহসা সুরমার দিকে ফিরিয়া যেন কতকটা বাধ্য হইয়া বলিয়া ফেলিল, "সুরো, তুমি না হয় দিনকতক সাঁতরাগাছিতেই থেকে এসো।"

সাঁতরাগাছিতে সুরমার পিত্রালয়। স্বামীর কথা শুনিয়া সে কহিল, "কেন ?"

"এখানে তোমার যত্ন চিকিৎসা কিছুই তো ভাল চল্‌ছে না।"

"সেখানেই কি চলবে বলে মনে কর ?"

"তোমার দাদা নিজে একজন কবিরাজ—"

"ঐ পর্য্যন্ত ! নইলে অবস্থা সব জানত ! মা বাপ বেঁচে থাকলে যেতুম। এখন আর হয় না।"

"গেলেই হয়।"

সুরমা ক্ষণকাল স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। সহসা যেন তাহার সমস্ত ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইয়া গেল ; কিন্তু সে প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "কিন্তু কেনই বা যাব তাই শুনি। অসুখ হয়েছে, যেমন কোরে হৌক নিজের ঘরেই চলবে। পরের উপর দায় ফেলতে যাব কেন !"

শচীশ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সিঁড়িতে মাসীর গুরুপদধ্বনি শুনিয়া আর কিছু বলা হইল না। সে একবারে তরতর করিয়া নীচে নামিয়া গেল। মাসী বারান্দায় উঠিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সুরমা মুখের উপর আঁচল চাপিয়া মেঝেতে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। মাসী অতিশয় তীব্রস্বরে কহিলেন, "ও কি হচ্চে বৌ ! এই দুপুরবেলা কান্নাকাটি—"

সুরমা উত্তর দিতে পারিল না। দুর্নিবার ক্রন্দন রোধ করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে তাহার ক্ষীণ দেহ কাঁপিতে লাগিল। মাসী বলিতে লাগিলেন, "এসব কথা তো ভাল নয়। এত আপ্তগরজে হওয়া তো মেয়ে মানুষের শোভা পায় না। সোনার ছেলে শচী, আর কেউ হ'লে যে এতদিন—"

শচীর উচ্চকণ্ঠের আহ্বানে মাসীর কথায় বাধা পড়িল—"মাসীমা, আমার স্নান হয়েচে, ভাত দিয়ে যাও।"

মাসী কহিলেন, "ওমা, সেকি ! তোর যে নেমন্তন্ন !"

"না, যাব না, মাসিমা।"

"পাগল কোথাকার ! না গেলে তারা ভাববে কি ! সব ব'সে থাকবে যে। না, না, ওসব গোলমাল করিসনে বাবা, আমার কথা শোন্।"

শচীশ অভিমানভরে কহিল, "না মাসিমা, সকলের আবার সব পছন্দ হয় না দেখতে পাই।"

"বাবা! বৌয়ের পছন্দের উপর লোকলৌকতা নির্ভর কর্‌বে নাকি! কেন, এত কিসের!" তিনি নীচে গিয়া সাধ্যসাধনা করিয়া বোনপোকে পাঠাইয়া দিলেন।

............সমস্তটা দিন, সমস্ত সন্ধ্যা মনের যন্ত্রণায় জ্বলিতে জ্বলিতে অবশেষে একসময় সুরমার দুর্ব্বলদেহ ঘুমে ঢুলিয়া পড়িল। শচী তখনও ফিরিয়া আসে নাই।

রাত্রি প্রায় এগারোটা। গলির মোড়ে বরফওয়ালার চীৎকারে সুরমার তরল নিদ্রা টুটিয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখিল, ঘরে আলো জ্বলিতেছে। অদূরে ভিন্ন শয্যায় তাহার স্বামী নিদ্রিত। সুরমা উঠিয়া পড়িয়া স্বামীর বিছানার দিকে অগ্রসর হইল। আর কিছু ভাবিতে পারিল না। ঘুমন্ত শচীশের পা দুখানার উপর মুখ চাপিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল; তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

চৈতন্যলাভের প্রথম মুহূর্ত্তেই শচীশ অনুভব করিল, একখানি অশ্রুসিক্ত মুখ তাহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল; সুরমার আনত পিঠের উপর হাত রাখিয়া ডাকিল, "সুরো—"

অনেকদিন পরে সে আহ্বানে বুঝি পুরাতন সুর বাজিয়াছিল, কেন না সুরমার কান্না বাড়িয়া গেল। শচীশ আস্তে আস্তে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে সুরমা একটু শান্ত হইলে শচীশ আবার ডাকিল, "সুরো—"

কেবল মাথাটা নাড়িয়া সুরমা ইহার জবাব দিল।

"সুরো, তোমার মনে কি কষ্ট হয়েছে, আমায় বল।"

সুরমা নীরবে রহিল।

"বলবে না?"

"আমাকে কোথাও পাঠিও না।"

"এই! তা এত কাঁদা কেন! আমাকে ভাল করে বল্লেই পারতে।"

"পারিনি, আমার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল, সত্যিতো আমি আর বেশীদিন বাঁচব না—"

"ওকি কথা সুরো!"

"না, এ খুব সত্যি! তবে আর ক'টা দিনের জন্য আমাকে কাছ ছাড়া ক'রনা—" বলিয়া সুরমা আবার কাঁদিয়া ফেলিল। শচীশের বুকের মধ্যে একটা প্রবল নিঃশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বিগত দিনের প্রেমপূর্ণ স্মৃতি তাহার অন্ধকার চিত্তপটে একটা অকস্মাৎ রশ্মিপাত করিয়া গেল। সুরমার দুই হাত আপনার হাতে লইয়া কোমলকণ্ঠে কহিল, "আমায় মাপ করো সুরো, আর যাবার কথা কখনও বলব না।"

(৫)

"ওকি বৌ, পান সাজ্‌ছ কার জন্য ?"

সম্মুখে পানের সরঞ্জাম লইয়া সুরমা বসিয়া সবেমাত্র পান চিরিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় মাসী আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সঙ্কুচিত হইয়া সুরমা কহিল, "রাত্রের পান ক'টা সেজে রাখছি—"

মাসীর সমস্ত মুখে বিরক্তির তীব্ররেখা ফুটিয়া উঠিল ; তিনি কহিলেন, "আজ আবার তোমার কি দরকার পড়ে গেল। এতদিন কি পান সাজা হয়নি ?"

"হবে না কেন মাসিমা, আপনি তো সবই বোঝেন, আজ একটু ভাল আছি তাই—"

"তাই কি! তুমি যে কিছুই বোঝ না বাছা। আজ দুদিন জ্বর আসেনি এই ত। নইলে রোগ তোমার সেরেছে নাকি! খাওয়ার জিনিষ—ওতে হাত দেওয়াই তো অন্যায়। একটু বুঝে চল্‌তে হয় না।"

সুরমার হাতখানা স্খলিত হইয়া পানের বাটা হইতে সরিয়া পড়িল।

"আর কিছুতে হাত দাওনি ত ? ঝি, অ ঝি, কোথা গেল, পানগুলো ধুয়ে আন্‌ত। এ পান তো আমি ছেলেকে দিতে পারব না। জেনে শুনে"—অর্দ্ধ সমাপ্ত কথা মুখে লইয়া তিনি ঝির উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন, তাঁহার বাক্যবাণ যে বধূর কোন্ মর্ম্মস্থলে গিয়া বিদ্ধ হইল, তাহার খোঁজ লওয়া অনাবশ্যক বোধ করিলেন।

স্বামীর সঙ্গে সেই রাত্রে বাক্যালাপের পর আজ কতদিন যাবৎ সুরমা একটু ভালই ছিল, আজ আবার এই নূতন আঘাতে সে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। সে কি করিবে! শচীশকে ছাড়িয়া কোথাও যাওয়ার কল্পনাও যে সে সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু যাওয়া উচিত। সকলে আকারে ইঙ্গিতে যে আভাস দেয়, সত্য যদি তাহার সেই দুরারোগ্য কালব্যাধি হইয়া থাকে, তবে তো আর একদিনও এখানে বাস করা উচিত হয় না। সে কি এতই স্বার্থপর। স্বামীর মঙ্গলের জন্য তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না! অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে সে অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেছিল, সহসা শব্দ পাইয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন।

হৃতরত্নের প্রতি মানুষ দূর হইতে যে ভাবে চাহিয়া থাকে, সেইরকম করিয়া সুরমা শচীশের দিকে চাহিয়া রহিল।

শচীশ কহিল, "তোমার দাদার পত্র এসেছে।" আগ্রহহীনস্বরে সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি লিখেছেন ?"

"পূজার সময়টা তোমায় তাঁরা নিয়ে যেতে চান।"

সুরমা সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "সত্যি! যাব আমি। অনেকদিন তাঁদের দেখিনি, বড় দেখতে ইচ্ছে করে।"

"তাহ'লে লিখে দেব নাকি ?"

"হ্যাঁ, আজই জবাবটা দিয়ে দাও। পুজোর তো আর দেরী নেই।"

"না, দেরী কই ?" বলিয়া যেন একটা কঠিন পরীক্ষার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া শচীশ সেইখানেই উপবেশন করিল; কহিল, "আমার তো মনে হয় এতে তোমার শরীর সারতে পারে। দুদিন একটু খোলা হাওয়ায় থেকে এলে শরীর ও মন দুই-ই ভাল হ'বে। কল্‌কাতায় যে চারদিক বন্ধ! যাই, চিঠিখানা লিখিগে, নইলে ডাকে ফেলবার সময় পাব না।"

সুরমা প্রত্যেক কথায় ঘাড় নাড়িয়া স্বামীর সমর্থন করিতেছিল; সে স্পষ্ট অনুভব করিতেছিল তাহার যাওয়ার সম্ভাবনাতেই শচীশের মুখে নিশ্চিন্ততা ও স্বাভাবিকভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে উঠিয়া গেলেও সুরমা নিঃস্পন্দভাবে সেইখানে বসিয়া রহিল; মনে মনে কহিতে লাগিল, "এত অবহেলা কেন! এত যে খুসী হইয়া আমার যাবার ব্যবস্থা করিতে গেলে, একবারো কি মনেও পড়িল না—কেন যাওয়ার কথায় সেদিন কত কাঁদিয়াছিলাম, কেন পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিলাম, আমাকে কোথাও পাঠাইও না; তোমাকে দেখিতে না পাওয়ার কঠিন দুঃখ ভগবান আমাকে তোমার হাত দিয়াই পাঠাইলেন।"

............শরতের এক মলিন সন্ধ্যায় সুরমা তাহার জিনিষপত্র গুছাইয়া শয়ন কক্ষে বসিয়াছিল। আজই সন্ধ্যার পরে যাত্রা করিতে হইবে। তাহার ছোট ভাইটি তাহাকে লইতে আসিয়াছে।

সমস্ত দিন শচীশের দর্শন মিলে নাই। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছট্‌ফট্‌ করিয়া অবশেষে সুরমা ঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঝি, উনি কি বাসায় নেই ?"

ঝি কহিল, "না বৌমা, সেই দুপুর বেলা খেয়ে বেরিয়েছেন, আর তো আসেন নি—," তাঁর জন্য এই একখানা চিঠি দিয়ে গেছে—বৌমা—" বলিয়া ঝি আঁচলের খুঁট হইতে একখানা ভাঁজকরা ছোট্ট কাগজ খুলিয়া সুরমার হাতে দিল।

"কে দিলে ঝি ?"

"ঐ কাঁসারীপাড়া হ'তে যে দরোয়ান আসে; আমি তোমাদের গাড়ী আনতে যাচ্ছি, যদি এর মধ্যে বাবু আসেন তবে ওখানা দিও, বড্ড নাকি দরকারী।"

পত্রখানা পড়িবার অদম্য প্রলোভন জয় করিতে না পারিয়া সুরমা সেখানা চোখের উপর মেলিয়া ধরিল; তাতে এই কয়টি কথা মাত্র লেখা ছিল:—

"শচীবাবু, সকালে আপনাকে বল্‌তে মনে ছিল না। তাই এই চিঠি পাঠাচ্ছি—। আজ রাত্রে বায়স্কোপে যাব, আটটার মধ্যে নিশ্চয় আসবেন। দেরী করবেন না, তাহ'লে ভয়ানক রাগ করব। খাবেন এইখানেই—।

ইতি—কুসুম।"

সুরমা বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল। কে এই কুসুম। একটি মেয়ে নিশ্চয়। কিন্তু সে কে। শচীশকে এতখানি দাবী জানাইয়া চিঠি লিখিবার, নিমন্ত্রণ করিবার অধিকার সে কাহার নিকট হইতে কোন সূত্রে লাভ করিল! শচীশের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কতদূর অন্তরঙ্গতায় পৌঁছিয়াছে, পত্রের ভাষাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ; অথচ শচীশ কোনদিন কুসুমের নামোল্লেখ মাত্র সুরমার কাছে করে নাই। এই গোপন করিবার প্রয়াস কেন!

সে তাহার নিজের অদৃষ্টকে মন্দ বলিয়া প্রতিদিনই ধিক্কার দিতেছিল, কিন্তু সেই মন্দ অদৃষ্ট যে কতখানি তাহা নিজেও জানিত না। আজ এই পত্র পড়িয়া তাহার চোখের উপর হইতে একখানি পর্দ্দা খুলিয়া পড়িল। সুরমার যে সবই গিয়াছে। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, সেবাযত্নের শক্তি সব তো নিঃশেষিত৭ স্বামীর মন পূর্ণ করিয়া রাখিবার মত তাহার কিছুই নাই; সেই শূন্য মনে যোগ্যতর কেহ যদি আপনার আসন বিস্তার করিয়া বসে, তবে কে দায়ী! তাহার স্বামী নয়। দায়ী তাহার দগ্ধ ললাটের লেখা! সুরমা কোনমতেই স্বামীকে দোষী ভাবিতে পারিল না; কিন্তু নিজের প্রেমহীন, সন্তানহীন, রোগজীর্ণ জীবনটা সমস্ত ভবিষ্যৎ কালের জন্য ভয়াবহ ঠেকিতে লাগিল।

কোন্ দিক দিয়া কতখানি সময় গিয়াছে, তাহার সে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া ভাইয়ের কণ্ঠস্বর শুনিল,—"দিদি, গাড়ী এসেছে।"

সুরমা যেন বুঝিতে পারে নাই, এমনি ভাবে তাহার দিকে চাহিল।

বিপিন পুনরায় কহিল, "দিদি এসো, গাড়ী দাঁড়িয়ে—, সময় হয়েচে যে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইল। সময় হইয়াছে। এই পুরাতন গৃহ, সুখে দুঃখে—সম্পদে, বিপদে বিজড়িত,—শ্বশুরের স্নেহ-স্মৃতিপূর্ণ এই প্রিয় বাসস্থান, সাধের সংসার—আর জীবনের সর্ব্বস্ব স্বামীকে ছাড়িয়া যাইবার সময় হইয়াছে। সত্যই কি সুরমার জীবনে এই ভয়ানক সময় আসিল।

ভাইয়ের পশ্চাতে সে নীচে নামিয়া গেল। রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া শচীশ মাসীর সঙ্গে কি কথা কহিতেছিল; অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সুরমা অপলকনেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। এই মুখ যে তাহার জীবনাকাশে ধ্রুবতারার মত উদিত হইয়াছিল। কোন্ পাপে সে ইহার দর্শনসুখ হইতে বঞ্চিত হইতেছে, তাহা কে বলিবে।

শচীশ হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কে ওখানে?"

মাসী মুখ বাড়াইয়া কহিলেন, "বৌ বুঝি! ওদের তো রওয়ানা হবার সময় হয়েচে।"—

শচীশ বিপিনের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বিপিন কহিল, "আপনি কি ষ্টেশনে যেতে পারবেন?"

শচীশ কহিল, "যেতুমতো নিশ্চয়ই, কিন্তু আজকে আবার একটা দরকারী কাজ পড়ে

গেছে, কিছুতেই ওটা কাটাতে পারলাম না। যদি অসুবিধা মনে কর, ওবাড়ীর প্রসন্নকে না হয় সঙ্গে যেতে বলে দিই।”

“না, অসুবিধা কি। আমিই পারব। দিদি এসো, আর দেরী কোরো না—” বলিয়া সে গাড়ীতে গিয়া বসিল।

সুরমা কম্পিতবক্ষে নত হইয়া মাসী ও শচীশকে প্রণাম করিল। দুঃখ সহের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল বলিয়াই বিদায় কালেও একবিন্দু অশ্রুতে বিগলিত হইতে পারিল না।

গলির মোরে গাড়ীর শব্দ মিলাইয়া গেল। শচীশ কহিল, “মাসীমা, দোরটা দিয়ে যাও, আমার ফিরতে রাত হ’বে।”

(৬)

পাঁচ মাস পরের কথা; সুরমার স্বাস্থ্যের একটুও উন্নতি হয় নাই; এখানে আসিয়া সে যত্ন সেবা পাইতেছিল, কিন্তু মনের নিদারুণ অশান্তি সমস্তই ব্যর্থ করিয়া ফেলিত। শচীশ প্রথম প্রথম দুই চারিছত্র পত্র দিয়া খোঁজ করিত, এখন আর খোঁজ করে না; আজ দুইমাস যাবৎ পত্র আসে না।

বিনা খবরে আর থাকিতে না পারিয়া সুরমা গত পরশু দিন বিপিনকে কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছে। আজ তাহার ফিরিবার কথা। সকালবেলা সুরমা অস্থির হইয়া ঘর বাহির করিতেছিল।

গোময়লিপ্ত পরিচ্ছন্ন অঙ্গনের একধারে বসিয়া তাহার ভ্রাতৃবধূ বাড়ীর গৃহিণী সাবিত্রী বড়ি দিতেছিলেন; সুরমার অস্থিরতা দেখিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। ডাকিয়া কহিলেন; “ঠাকুরঝি, এখানে একটু রোঁদে এসে বোসো না, বড্ড শীত।”

সুরমা অনুরোধ পালন করিল।

সদর দরজায় একটু গোলমাল শোনা গেল; এবং তারপরক্ষণেই সাবিত্রীর পুত্রকন্যারা কলকণ্ঠের চীৎকারে জানাইয়া দিল, বিপিন আসিয়াছে। সুরমার দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড সজোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল, না জানি কি খবরই শুনিতে হয়; বিপিন অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াই কহিল, “শচীশবাবু ভাল আছেন দিদি।”

সাবিত্রী কহিলেন, “আর কি খবর?”

“আবার কি খবর!”

“কি করচেন শচীশ বাবু? কোর্টে যান?”

“কোর্টে যাবার আর দরকার কি!”

“কি রকম?”

বিপিন একটু স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, “শচীশবাবু সে পটলডাঙ্গার বাসা তুলে দিয়েছেন।

তাঁদের বাসার কাছে প্রসন্ন বলে' একটি ছেলের সঙ্গে গেলবার কিছু খাতির হয়েছিল, তারি কাছে নূতন বাসার খোঁজ পেলাম।"

"কোন্ খানে?"

"হ্যারিসন রোডে—"

"কেমন বাড়ী?"

"বেশ। আমার ইস্কুলের বেলা হয়ে যাচ্চে, আমি আর দাঁড়াতে পারিনে, দাদার কাছে সব শুনো—" বলিয়া বিপিন ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

সাবিত্রী কহিলেন, "মাসীমার কথাটা জিজ্ঞেস করা হোল না।"

সুরমা কহিল, "আর জিজ্ঞেস করে কি হ'বে। আমি যাব; এখানেও তো সারতে পারলাম না; তবে আর বাড়ী ঘর ছেড়ে থেকে দরকার কি!"

"তোমার দাদাকে একটু বলে নিই!"

"হ্যাঁ, তাই বোলো।"

সেই দিনই বিকালে সাবিত্রী সুরমাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ঠাকুরঝি, ওঁর তো মত হয় না; তোমার যে শরীর বড় খারাপ। আর দুটো দিন থেকে না হয় যেতে!"

সুরমার মুখ সাদা হইয়া গেল। সে কহিল, "বৌদি, তোমাদের ভালবাসার ঋণ শোধ দিতে পারব না। কিন্তু আমাকে যেতে হ'বে, আমার মন বড় অস্থির হয়েচে।"

সাবিত্রী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তাহ'লে যাও। কিন্তু যদি আসতে ইচ্ছে হয় তক্ষুণি লিখো। নিয়ে আসবেন।"

সুরমা মনে মনে কহিল—"আর যেন না ফিরতে হয়।

*　*　*　*　*

তখন প্রায় রাত বারটা হইবে—আহারান্তে শচীশ তাহার ত্রিতলের শয়নকক্ষে গিয়া কখন শুইয়া পড়িয়াছে এবং মাসীও শুইতে যাইবার যোগাড় করিতেছেন, এমন সময় সহসা গাড়ীর শব্দ পাইয়া ঝি বাসন মাজা ফেলিয়া দরজা খুলিয়া দিল। প্রথমে নামিল সুরমার বড় ভাই, তাহার পর যে নামিল তাহার মুখ দেখা গেল না। কিন্তু দাঁড়ানোর ভঙ্গী ঝিকে পুরাতন কথা স্মরণ করাইয়া দিল। হাতের প্রদীপটা উঁচু করিয়া ধরিয়া সে কহিল, "কে গা, আমাদের বৌমা না?"

সুরমা কথা কহিতে পারিল না।

সুরমার দাদা কহিল, "আমি প্রসন্নদের ওখানে চল্লুম্—সেইখানেই আজ শোবো।"

সহসা কি মনে করিয়া তার দাদার হাতখানাকে চাপিয়া ধরিয়া সুরমা বলিল—"না দাদা আমাকে একলা ফেলে তুমি যেও না—আমার বড্ড ভয় করছে!"

তাহার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সুরমার দাদা বলিল—"ভয় কি দিদি—!"

সুরমা আবার বলিল—"তুমি যেওনা দাদা—তুমি আমার কাছে থাক—যেতে হয় কাল যেও।"

"আচ্ছা তাই হবেরে পাগলী"—বলিয়া ঝিয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহারা উপরে উঠিয়া আসিল।

মাসী দ্বিতলের বারান্দা হইতে সমস্তই শুনিতেছিলেন—তাহারা উপরে উঠিয়া আসিতেছে দেখিয়া—চকিতের মধ্যে নিজের শয়নকক্ষের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

ঝি গিয়া দরজায় ঘা দিল—"মাসীমা!"

বিরক্ত কণ্ঠে উত্তর আসিল—"কি?"

"বৌমা এসেছ মাসীমা!"

নীরস কণ্ঠে মাসি কহিল—"বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ আসা হোলো যে!"—তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কি মনে করিয়া আবার বলিয়া উঠিল—"দোতালার কোণের ঘরটায় বিছানা করে দিগে যা—খবরদার শচীকে যেন ডাকা না হয়—তার শরীর ভাল নয়—একটু ঘুমিয়েছে—বুঝ্‌লি!"

নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আসিয়া সুরমা মেঝের উপরেই বসিয়া পড়িল—অবসন্ন দেহের ভার সে বুঝি আর বহিতে পারে না। তার দাদা ঘরের কোলের বারান্দাটায় পাচারি করিতেছিল, এবং ঝি ঘরঝাঁট দেওয়া শেষ করিয়া শয্যারচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিল। সহসা অত্যন্ত ক্ষীণ এবং শুষ্ক কণ্ঠে সুরমা ডাকিল—"ঝি!"

"কেন বৌমা!"

"বাবু কি বাড়ী নেই?"

"বাড়ীতেই বৌমা; তিনি তো খেয়ে দেয়ে কখন শুয়েছেন। ছোট বৌমার আবার শরীর খারাপ কিনা।"

সুরমা সঙ্কোচে লজ্জায় বেদনায় মরিয়া গিয়াও জিজ্ঞাসা করিল, "কার সঙ্গে বিয়ে হয়েচে ঝি?"

"ঐ যে কুসুম দিদি গো। তুমি ভাইএর বাড়ী যাওয়ার পর প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসত; দিদিমার ভাগ্নী; বাবুর সঙ্গে খুব খাতির হয়েছিল, তারপর তো বিয়েই হোল—"

অতি কষ্টে সুরমা প্রশ্ন করিল, "কবে হোল?"

"অঘ্রাণ মাসেই ত। তোমাকে বুঝি এরা কিছুই জানায় নি?"

সহসা মাসীর কক্ষ হইতে আহ্বান আসিল—"ঝি!"

ঝি শশব্যস্তে উত্তর দিল—"যাই মাসীমা!"

তীব্র কণ্ঠে উত্তর আসিল—"আসবার দরকার নেই—গল্প করবার সময় কাল ঢের পাবি—এখন শুগে যা—ভোরে উঠে কাজ করতে হবে না বুঝি—গল্প করলেই সংসারের কাজ হয়ে যাবে নয়?"

ঝি তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুরমার দাদা কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"সুরো!"

"কেন দাদা?"

"অনেক রাত হয়েছে শুয়ে পড়্ দিদি!"

"শুচ্ছি—তুমিও শুয়ে পড়ো!"

ঝি দুইটি পৃথক ছোট ছোট শয্যা রচনা করিয়া দিয়া গিয়াছিল, তাহারি একটিতে সুরমাকে ধরিয়া শুয়াইয়া দিয়া তাহার দাদা ঘরের এক প্রান্তস্থিত অপর শয্যাটি আশ্রয় করিয়া শুইয়া পড়িল এবং অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

তখন অর্দ্ধরাত্র। সুরমা তখনও ঘুমায় নাই। তৈলহীন প্রদীপটা কখন একসময় নিভিয়া গিয়াছিল—অন্ধকার ঘরখানা থম্ থম্ করিতেছিল। বাহিরে তখন প্রকৃতির বুকের উপর দিয়া যে প্রলয়তাণ্ডব চলিতেছিল, তাহারি উদ্দাম মত্ততা সেই অন্ধকার কক্ষের রুদ্ধ জানালা দরজাগুলোকে পর্য্যন্ত ঝন্ ঝন্ শব্দে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। সুরমা কাঠের মত শক্ত হইয়া চুপ করিয়া অন্ধকার শয্যায় শুইয়াছিল;—তার মনে হইতেছিল, ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই আজ তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত সৃষ্টিটা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; তাহাকে ঠেলিয়া ধাক্কা দিয়া মারিয়া ধরিয়া ভয় দেখাইয়া যে করিয়া পারে আজ সমস্ত সৃষ্টিটা যেন তাহাকে তার ন্যায্য অধিকার হইতে জোর করিয়া বঞ্চিত করিবে বলিয়া জিদ্ ধরিয়াছে,—তাই দিগন্ত কাঁপাইয়া মুহুর্মুহু এত বজ্রাঘাত,—তাই আকাশে বাতাসে প্রকৃতির এই সৃষ্টিছাড়া উদ্যম প্রলয়োচ্ছ্বাস।—সহসা কি মনে করিয়া কে জানে, তার মাথাটা ভয়ানক গরম হইয়া উঠিল—এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বরের উত্তাপে তাহার সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তার মনে হইতে লাগিল, দেহের সমস্ত রক্ত সহসা যেন টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। সহসা কেন কে জানে সুরমার মনে হইল—তার শরীরে কোথা হইতে প্রচুর শক্তি এবং বলের আবির্ভাব হইয়াছে এবং সে ইচ্ছা করিলে এখুনি যাহা ইচ্ছা তাই করিতে পারে।—সুরমা সহসা লাফাইয়া উঠিয়া বসিল এবং রক্তবর্ণ চক্ষু দুটি ঘুরাইয়া অন্ধকারের বুকের ভিতর কাহাকে যেন খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ একসময় বিকারের ঝোঁকে সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কক্ষের দরজা খুলিয়া ফেলিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে সেই ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

* * * * * *

শেষরাত্রে হঠাৎ কিসের শব্দে জাগিয়া উঠিয়া কুসুম তার স্বামীকে একটা ঠেলা মারিয়া জাগিয়া তুলিয়া ভয়কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"ও কিসের আওয়াজ বলতে পার?" ধড়্ মড়্ করিয়া জাগিয়া উঠিয়া শচীশ বলিল—"কৈ কিসের শব্দ কুসুম?"

"ঐ শোন—ঐ—ঐ!"

সহসা বাহির হইতে কে যেন দ্বারে ঘা দিল। "খুলে দিচ্ছি মাসীমা," বলিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে যাইয়া শচীশ সহসা কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। প্রকৃতির সেই উদ্দাম দাপাদাপির মত্ত কোলাহল ছাপাইয়া বাহির হইতে কে যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"দরজা খোলো—দরজা খোলো!—শিগ্‌গীর দরজা খোলো!" কি ভীষণ উন্মাদনা সেই কণ্ঠস্বরে। কুসুম তার স্বামীকে প্রাণপণ শক্তিতে জড়াইয়া ধরিল। শচীশ একটি কথাও বলিল না—কাঠের মত শক্ত হইয়া শয্যার উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

* * * * * *

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া ঝিকে সুমুখে পাইয়া মাসী জিজ্ঞাসা করিল—"বৌ এখনো ওঠে নি?"

ঘর ঝাঁট দিতে দিতে ঝি বলিল—"তারা ভাই বোনে ভোর রাত্রিতেই বাড়ী চ'লে গেছে ত!"

টিট্‌কারি মিশ্রিত স্বরে মাসী বলিল—"সবই বিট্‌কেল!—আসতেই বা কে বলেছিল, আর এমন করে চোরের মতন রাত থাকতে উঠে পালাতেই বা কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল—সবই কি উল্টো ছিষ্টি এদের!"

তারপর কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া হঠাৎ ঝিকে নিকটে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল—"দ্যাখ্ বিন্দি বউ যে এ বাড়ীতে এসেছিল সে কথা তুই আর আমি কেবল জানলুম আর কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়—বুঝলি—খবরদার!" তাহার পর নিজকক্ষে প্রবেশ করিয়া মিনিট খানেকের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বিন্দির হাতে দুটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া আবার বলিল—"তোর মেয়েকে কাপড় কিনে দিস্ বিন্দি!—খবরদার বাড়ীর কাগ চিলটা পর্য্যন্ত যেন এ খবর না পায়—বুঝলি!"

বেলা প্রায় ১০টার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া শচীশ যখন রান্নাঘরের দরজার সুমুখে জড়িতকণ্ঠে ডাকিল, "মাসী",—তখন তাহার মুখের দিকে একবার মাত্র চাহিয়াই মাসী অবাক হইয়া গেল; একরাত্রের মধ্যে মানুষের চেহারা যে এত খারাপ হইয়া যাইতে পারে তাহা সে চক্ষে দেখিয়াও যেন ধারণা করিয়া উঠিতে পারিল না।—এক দোয়াত কালী কে যেন তার মুখের উপর ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছে, এবং সমস্ত রাত ধরিয়া কাহার সহিত ধস্তাধস্তি করিয়া এই সবেমাত্র সে যেন অতিকষ্টে তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

—"মাসী !"

"কেন শচী ?"

"কাল রাত্তিরে বউ এসে আমার দরজায় ঘা দিয়ে গেছে মাসী !"

"দুর পাগল !— ঝড়ের আওয়াজ হবে বোধ হয়।"

"না মাসী, ঝড়ের আওয়াজ নয়— আমি তার গলার আওয়াজ শুনেছি।"

"ও কিচ্ছু নয়,—ও রকম হয়— গয়ায় পিণ্ডি দিলেই ওসব থেমে যাবে অখন।"

শচীশ শিহরিয়া উঠিল,—সুরমা ইহজগতে আর নাই। এ সংবাদ মাসী নিশ্চয়ই কোনও না কোন উপায়ে জানিতে পারিয়াছে- কিন্তু তাহাকে এখন পর্য্যন্ত জানায় নাই,— শচীশ কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল— তাহার একটুও দুঃখ হইল না— একটুও কান্না আসিল না— বুকের ভিতরটা অভাবের বেদনায় একটুও ক্ষুন্ন হইয়া পড়িল না- কেবল একটা অজানিত ভয় এবং আতঙ্কে সে ভিতরে ভিতরে বার বার শিহরিয়া উঠিল এবং এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা উত্থাপন করিবার মত দুঃসাহস সে করিয়া উঠিতে পারিল না।

সেই দিন রাত্রে সমস্ত দিন বৃষ্টির পর একটুখানি ম্লান জ্যোৎস্না আকাশে দেখা দিয়াছে ;- মুক্ত বাতায়নে শচীশ ও কুসুম পাশাপাশি বসিয়াছিল। কুসুমের মাথা হইতে আঁচল খসিয়া পড়িয়াছে, তাহার শুভ্র মুখে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। আত্মবিস্মৃত শচীশ তাহাকে একটু আদর করিবার উদ্যোগ করিয়াই হঠাৎ চমকিয়া উঠিল ; বাতায়নের অদূরে গতরজনীর অনুরূপ কণ্ঠে কে যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল— "দরজা খোলো দরজা খোলো।" স্বামী স্ত্রী পরস্পরের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া আড়ষ্ট হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

পরদিন পূর্ণিমা, আকাশে জোৎস্নার ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে, দ্বিতলের খোলা ছাদে শচীশ ও কুসুম বেড়াইতে বেড়াইতে কথা কহিতেছিল। আগামী কল্য তাহাদের পশ্চিমে যাত্রার ব্যবস্থা স্থির হইয়া গিয়াছে, এ বাড়ীতে আর একদিনও বাস করা যাইতে পারে না- কোন মতেই না। সহসা এক তীব্র আর্ত্তনাদে দুজনেই শিহরিয়া উঠিল। মাসীর অবরুদ্ধ কক্ষ হইতে উত্থিত হইয়া সে স্বর যেন বাতাসে বাতাসে হাহাকারের মত ভাসিয়া বেড়াইতেছিল,—"দরজা খোলো— দরজা খোলো।" কুসুম ধীরে ধীরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। সেই দিন হইতে তাহার মূর্চ্ছারোগের সৃষ্টি হইল। ঠিক সেই রাত্রেই সুরমার বৌদিদি সহসা তাহার নিদ্রিত স্বামীকে ঠেলিয়া জাগাইয়া তুলিয়া বলিল -"ওগো ওগো, ঠাকুরঝি কেমন যেন করছে, শীগ্গীর ডাক্তারকে খবর দাও।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার আসিল। সুরমার দাদা ডাকিল—"সুরো অ সুরো, চোখ চাও দিদি—ডাক্তার বাবু এসেছেন যে।"

সুরমা সহসা চক্ষু চাহিল ; তারপর কিছুক্ষণ তার দাদার মুখের দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কি মনে করিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ এবং জড়িত কণ্ঠে ডাকিল "দাদা।"

তাহার মুখের কাছে কান লইয়া গিয়া দাদা বলিল "কি দিদি ?" অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং জড়িত কণ্ঠে সুরমা বলিল—"সে দরজাটা কি আর খুলবে না ?"

তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কি বলিতে যাইয়া সহসা দাদা উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—"ডাক্তারবাবু !—ডাক্তার বাবু !"

ডাক্তার আসিয়া তাড়াতাড়ি তাহার শীর্ণ কঙ্কালসার হাতখানি একবার মাত্র স্পর্শ করিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন। আকুল কণ্ঠে দাদা জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—"কি দেখলেন ডাক্তার বাবু ?"

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ডাক্তার সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

* * * * * *

পর দিন আর পশ্চিম যাত্রা হইল না। কুসুম শয্যা গ্রহণ করিল। অজাত-সন্তানভার-বহনের কষ্ট ও প্রতিরাত্রের অশান্তি ও অনিদ্রা তাহাকে তিল তিল করিয়া ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছিল। সুরমা সমস্তদিন মোহাচ্ছন্নের মত বিছানায় পড়িয়া থাকে এবং প্রতিরাত্রে একবার করিয়া চীৎকার করিয়া উঠে—তাহার পর সমস্ত রাত আড়ষ্ট হইয়া চুপ করিয়া শয্যায় পড়িয়া থাকে। দিনের বেলায় ইহার বিন্দুমাত্র মনে থাকে না। ডাক্তারী ঔষধে এই মানসিক ব্যাধির কোনই উপকার হয় না।

সে দিন রাত্রে কুসুমের ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। একাধিক চিকিৎসকের সমবেত চেষ্টাও প্রকৃতির গতিরোধ করিতে পারিল না। সে রাত্রেই অনেক কষ্টের পর নিতান্ত অকালে কুসুম একটি আকারবিহীন সন্তান প্রসব করিল। সেই বিবর্ণ বিকৃত প্রাণহীন মাংসপিণ্ডের দিকে চাহিয়া শচীশের সমস্ত হৃদয় মথিত করিয়া প্রশ্ন উঠিল—"এ কাহার অভিসম্পাত !" শেষরাত্রে সংজ্ঞালাভ করিয়া কুসুম ডাকিল—"মাসী !"

"কেন মা ?"

"দরজা খুলে দাও মাসী—শুনতে পাচ্ছ না ?"

"কি কুসুম ?"

"শুনতে পাচ্ছনা !—দরজা ঠেলছে যে !"

"ওযে বাতাসের শব্দ মা !"

"না দোর খুলে দাও !—তোমাদের পায়ে পড়ি একবার দরজাটা খুলে দাও !"

শচীশ ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া দিতেই ভোরের শীতল হাওয়া ছুটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।—থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কুসুম আবার অচেতন হইয়া পড়িল।

কুসুমের শরীর একটুখানি সারিতেই মাসী কাশী চলিয়া গেলেন। শচীশ ও কুসুমকে লইয়া সংসার পাতিবার ইচ্ছা কখন একদিন সহসা তাঁর সন্তানহীন বিধবাজীবনের মাঝখানটিতে

গোপনে বাসা বাঁধিয়াছিল—বিধাতার নির্ম্মম কঠোর বিধানে কখন আবার তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

সেই প্রকাণ্ড নির্জ্জন বাসভবনে স্বামী-স্ত্রী দুজনে বাস করে। কেহ কাহারও খোঁজ লয় না। ভৃত্য এবং পাচকের দ্বারা সংসারের ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়—কুসুম সেদিক দিয়াও যায় না। রাত্রে নিভৃত শয্যাতলে দম্পতী ক্ষণকালের জন্য মিলিত হয়। কুসুমের ঘুম আসে না; সে স্বামীকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিয়া ভয়ার্ত্তকণ্ঠে মাঝে মাঝে বলিয়া উঠে, "একবার উঠে দেখ না, গো! কে যেন দোর ঠেলছে।"

শচীশ উত্তর দেয় না; উঠেও না। কিন্তু তাহারও মনে হয় কে যেন প্রাণপণে দরজা ঠেলিতেছে, কে যেন মৌন ক্রন্দনে মেঝেতে মাথা ঠুকিতেছে—কে সে? কোনদিন গভীর রাত্রে মাসী যে ঘরে শুইতেন সেই ঘর হইতে চাপা কান্নার আওয়াজ আসিত, সেই শব্দকে খালিঘরে বাতাসের শব্দ বলিয়া মানিয়া লইতে স্বামী ও স্ত্রীর মন চাহিত না। কখনও অর্দ্ধতন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় শচীশের মনে হইত, কে যেন পা টিপিয়া টিপিয়া সমস্ত বাড়ীটা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেই পদধ্বনির বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই।

এই অভিশপ্ত বাড়ী ছাড়িয়া দূরে যাইবার জন্য শচীশের প্রবল ইচ্ছা হয়। কিন্তু কুসুম কিছুতেই স্বীকার হয় না। বাড়ী ছাড়িবার প্রস্তাব করিলেই তাহার মূর্চ্ছা বৃদ্ধি হইয়া উঠে সে যত ভয় পায়, তত জোরে এই বাড়ীখানা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে চায়।

শ্রীমতী অমিয়া চৌধুরী

বিয়ের দাম

সন্ধ্যার অন্ধকারে দুটি বাড়ীর দুই ছাতের আলিসার উপর ঝুঁকিয়া নলিনী আর নীলিমা গল্প করিতেছিল। পাড়াগাঁয়ে পুকুরঘাটে মেয়েদের মজলিস্ বসে; কলিকাতার সহরে ছাতের উপর মেয়েদের সান্ধ্য-সমিতিও কিছু কম জমে না।

নলিনী বলিতেছিল,—কি করব ভাই, দুটো রোগা ছেলেমেয়ে নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকি, তাছাড়া সংসারের কাজ ত আছেই, তাই চিঠি লিখ্‌তে পারি না। মার চিঠিতে মাঝে মাঝে যা তোমাদের খবর পাই।

নীলিমা বলিল,—তিন বছরে তুমি তিন মিনিট সময় পাওনি, না? যত বাজে কথা। আমার বিয়ে হলে আমি জন্মেও আর তোমার খোঁজ নেব না।

নলিনী বলিল,—বেশ ত, বিয়ে করলেই পার। সে ত তোমার নিজের হাতে। আমাদের মত ত আর হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেবে না তোমাদের।

নীলিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—তোমরা তাই ভাব বটে যে ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা ভারি স্বাধীন। তা নয় গো নয়। মেয়েমানুষ হলেই দুঃখ লেখা কপালে। তা সে যে সমাজেই হোক্।

নলিনী বিস্মিত হইয়া বলিল,—ওমা সে কি কথা। এইত আমার শ্বশুর বাড়ীর কাছে এক ব্রাহ্ম মেয়ে নিজে বিয়ে ঠিক্ করল। ঠিক গল্পের বইর মত সে প্রেমে পড়েছিল।

নীলিমা বলিল,—তা দু একটা কি হয় না। তবে তুমি ভিতরকার খবর নিলেই জানবে, বাপ-মা তাতে প্রাণপণ বাধা দেন। নেহাৎ না পারলে ছেড়ে দেন। মেয়েগুলো নিজে পছন্দ করলে অনেক সময় টাকার ছালাকে মালা না দিয়ে সত্যিকারের মানুষকে ভালবেসে ফেলে কিনা তাই প্রেম-পড়া সম্বন্ধে বাপমায়ের এত রাগ।

নলিনী বলিল,—তা ভাই, বাপ মা মেয়ের সুখ ত দেখ্‌তে চায়?

নীলিমা উত্তেজিত হইয়া বলিল,—সুখ মানে টাকা, আর টাকা মানে খুব সুখ, কেমন এই ত? তা ছোট বেলায় তোমাদের মত বিয়ে দিয়ে দিলে অত বোধশক্তি থাকে না, সে এক রকম। এদিকে আমাদের বড় করে লেখাপড়া শিখিয়ে, বুদ্ধি ফুটিয়ে তুল্‌বেন, কিন্তু সে বুদ্ধি বিবেচনা খাটাতে দেবেন না। এ যেন বেঁধে মারা। আসলে কি জান হিন্দুসমাজ ছেড়ে এলেও তার কতকগুলো সংস্কার এঁদের হাড়ে মজ্জায় জড়িয়ে আছে। তাই এঁরাও মনে করেন মেয়ে হলেই তার বিয়ে দেওয়া দরকার। আর সেই কাজটা যত শীঘ্র সেরে ফেলা যায় ততই ভাল। অবশ্য সব জাতির মধ্যেই মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য একটা ব্যগ্রতা দেখা যায়, তার মানে মেয়েরা দুর্ব্বল বলে তাদের সবলের আশ্রয় লোকে দিতে চায়। যাক্ সে কথা।—আমাদের মধ্যে লেখাপড়া শেখান টেখান গুলো অনেকটা বিয়ের বাজারে মেয়ের দর বাড়ান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজার যা তা বাজারই, তোমাদেরও আমাদেরও। তোমাদের যেমন নখের আগা থেকে চুলের ডগা পর্য্যন্ত পরীক্ষা করে বরেরা কিনে নেয়, আমাদের যাচাইও তার চেয়ে কিছু কম অপমানজনক হয় না।

নলিনী কিছু বলিল না। তার নিজের বিবাহের সময় কত জনের সম্মুখে কত পরীক্ষাই না দিতে হইয়াছে। সেই কথা মনে উঠিয়া তাহাকে আজ বিষম লজ্জা দিল। তৎক্ষণাৎ মনে হইল তাহার যে গায়ের রং, লম্বা চুল, নিটোল গড়নের জন্য অল্প পয়সায় তাহার পিতা কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, সে সব এখন কোথায়? উপরি উপরি দুটি সন্তান হইয়া শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মাথার চুলও উঠিয়া গিয়াছে, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এখন ম্লান। তাছাড়া রূপের এসব তুচ্ছ উপকরণ তাহার ত কোন দিন বিশেষ কাজেও আসে নাই। কেবল বিবাহ হওয়ার জন্যই যেন এগুলির দরকার ছিল। বিবাহের পর তার চুল আছে কি নাই, সে ফর্সা কি কালো, একথা লইয়া কই তাহার স্বামী কিংবা শ্বশুরবাড়ীর আর কেহ ত এখন মাথা ঘামান না।

উত্তর না পাইয়া নীলিমা বলিল,—জানিস্, আমার এর মধ্যে একবার বিয়ে ঠিক হয়ে ভেঙ্গে গেছে ?

নলিনী জিজ্ঞাসা করিল,—তাই নাকি ? কবে ?

নীলিমা বলিল,—এই বছর খানেক হল। একদিন কথা নেই বার্ত্তা নেই এক ভদ্রলোক এলেন। গানটান শুনলেন। তার পরের দিন মা বললেন, তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে। আমি তখনও এতটা পেকে উঠিনি। চুপ করে রইলাম। বাস্। বিয়ের সব ঠিক। ভদ্রলোকটি দুচার দিন এলেন; বল্‌লেন আমায় ভালবাসেন। আমি ভালবাসি কি না তাও জিজ্ঞাসা করলেন। আমি সোজাসুজি বল্‌লাম—না। তিনি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তবে বিয়ে করছি কেন ? আমি জানালাম—বাপ-মার হুকুম। তাছাড়া বিয়ের পর হয়ত তাঁকে ভাল-বাসতে পারব। এখন হঠাৎ অজানা অচেনাকে ভালবাসি কি করে ? তিনি বল্‌লেন,—কবিরা বলেন first sight love অর্থাৎ প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়। আমি মনে মনে বল্‌লাম যাকে দেখলে প্রথম দর্শনে ভালবাস্‌ব অন্ততঃ তুমি সে লোক নও। মুখে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানালাম যে আমার মধ্যে কবিজনোচিত কিছুই নেই বলেই বোধ হয় প্রথমদর্শনে প্রেম হয় নি।

যাক্ তিনি হতাশ হলেন না। কিন্তু পরে বাবার সঙ্গে কি গোলমাল হওয়াতে বাবা বিয়ে ভেঙ্গে দিলেন। আমার তাতে কষ্ট হবে কিনা কেউ জান্‌তেও চাইল না। আমার অবিশ্যি বন্ধু-মহলে লজ্জা পাওয়া ছাড়া আর কোন কষ্ট হয় নি। তবু এই মনে করে রাগ হল যে আমি পণ্যদ্রব্য ছাড়া কিছু নই। দোকানদারে খদ্দেরে বন্‌ল না, তাই আমি গুদামজাত রইলাম, ভাল খদ্দেরের আশায়।

নলিনী জিজ্ঞাসা করিল,—আর কোথাও তোর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে না ?

নীলিমা বলিল,—আমার মুণ্ডু হচ্ছে। মাঝে মাঝে আজকাল দুই একজন ভদ্রলোকের আবির্ভাব হয়। এমন করে মেয়েদের অপমান করে তাঁদেরও কি হয় জানি না। তা আমিও চালাক বনে গেছি ! এমন মুখশ্রী করে তাদের সাম্‌নে বসি, তারা হয় আমায় গোঁয়ার, নয় নির্ব্বোধ ঠাওর করে সরে পড়ে। মা খুব চটে যান। তা চটুন, আমি আর ঠক্‌ছি না। বিয়ে না হয় সেও ভাল, অমন করে আর বাজারে বিকোব না।—ছেলেগুলোর মজা কিন্তু। যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন দিব্যি এর ওর বাড়ী নেমন্তন্ন খেয়ে মেয়ে দেখে ঘুরে বেড়ায়। আমার ত ভাই যাই বলিস্ পুরুষ জাতের ওপরেই অভক্তি হয়ে গেছে। ওরাই না আমাদের 'অবলা' পেয়ে জব্দ করে রেখেছে। আশ্রয় নইলে আমাদের চলে না বলেই বাপের আশ্রয় ঘুচবার আগেই বিয়ে করে স্বামীর আশ্রয় নিতে হয়। তাতেই যেন আমরা চোর দায়ে ধরা পরেছি।

নলিনী বলিল,—যাক্, তোমার কথায় বোঝা গেল যে আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমান-

ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান সব সম্প্রদায়ের মেয়েদেরই এক দশা। কারুর বা লোহার শিকল, কারুর বা লোহার শিকলটা সোনার পাত দিয়ে মোড়া। যেমন করেই হোক্ সেটা শিকলই বটে।

নীলিমা একটু ভাবিয়া বলিল,—শুধু আমাদের দেশে কেন, ইউরোপের মেয়েরাও কি এ সম্বন্ধে কম পরাধীন? বড়মানুষের ঘরে ত কথাই নেই, মধ্যবিত্তদের মধ্যেও প্রেমে পড়া অত সুলভ নয়। যেটা বাইরের লোক ভালবাসা বলে ধরে নিয়েছে, হয়ত সেটার গোড়ায় অনেক সময় পদমর্য্যাদা বা টাকার আকর্ষণই প্রবল। সে দেশের মেয়েদের আত্মসম্মানই বা সব সময় কই বজায় থাকে? তারা বিলাসে ডুবে এমন করে টাকার ভক্ত হয়ে পড়েছে, যে নিজেরাই নিজেদের আত্মসম্মানকে টুঁটি টিপে মারছে। যেখানে দেখ্‌ছে খুব টাকা অমনি ছলাকলা ভাব ভঙ্গির টোপে সেই মাছটিকে গেঁথে তুল্‌বার চেষ্টা। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মায়েদের সাহায্য পাচ্ছে এই বীভৎস লীলার মধ্যে। একজনকে ফাঁদে ফেল্‌বার জন্য শত শত সুন্দরীর প্রয়াস। তার রূপ থাক্, নাই থাক্, তার স্বভাব চরিত্রের মধ্যে মহত্ত্ব দৃঢ়তা ইত্যাদি পুরুষোচিত গুণ আছে কি না আছে তার খোঁজ নেই, তার বয়স আশী পেরুলেও আপত্তি নেই, তার শরীর রোগের আধার হলেও যায় আসে না, তার বিদ্যাবুদ্ধি ব্যাঙ্কের চেকে দস্তখৎ দেবার মত হলেই হল,—আর থাকা চাই তার সোনা রূপোর চাক্‌তি অনেকগুলো। অমনি রূপসী, বিদুষী, নবীনা, প্রবীণার দল তাকে বিবাহ বন্ধনে বাঁধতে ব্যস্ত। এ ক্ষেত্রেও তাদের তুলনায় সব বিষয়ে হীন হয়েও পুরুষটি তাদের চেয়ে বড়, এই কারণে যে, সে মেয়েদের আশ্রয় দিতে পারে, সমাজে উচ্চ স্থান দিতে পারে, তাদের বিলাসের সামগ্রী জোগাতে পারে। এইজন্য মেয়েরা বিয়ে করতে এত ব্যস্ত। আর মেয়েরা সেই বিয়ের দাম যে দিচ্ছে তাদের হৃদয়ের পবিত্র কোমল বৃত্তিগুলি, তাদের আত্মমর্য্যাদা, তাদের শরীরের প্রত্যেকটি বিদ্রোহী রক্তবিন্দু, তাদের ইহকাল, তাদের পরকাল, সেদিকে খেয়াল নেই।

নলিনী কিছু উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। তার হাস্যময়ী বাল্য সঙ্গিনীর তিক্ততা-ভরা কথায় তার প্রাণটা বেদনায় আড়ষ্ট হইয়া গেল। এমন সময় ছাতের সিঁড়ির গোড়া হইতে তার ছোট বোন ডাকিল,—সেজ্‌দি, আমার গল্পের ঝুলি খালি হয়ে গেছে। তোমার ছেলে মেয়েকে আর ঠাণ্ডা রাখ্‌তে পারছি না। তারা 'মা মা' ব'লে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছে। নীচে এসো।

নলিনী সজলচোখে নীলিমার দিকে চাহিয়া—এখন আসি ভাই—বলিয়া চলিয়া গেল। নীলিমা শুষ্ক চক্ষে আকাশের সব চেয়ে বড় তারাটির দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না। তার চোখে আগুন জ্বলিতেছিল।

শ্রীসুনীতি দেবী

——

তরু-স্তোত্র

(১)

তুমি তরু তুমি চিরতরুণের
পরশ পেয়েছ অঙ্গে
কানুর রূপের কস্ লাগিয়াছে
রাস রভসের রঙ্গে।
লভিয়াছ তুমি শ্যামের দরশ
ফুল হয়ে ফোটে তোমার হরষ
মুখর আছিলে মূক হয়ে গেছ
সে মধু মিলন ভঙ্গে।

(২)

হয়ে কদম্ব ব্রজেশ্বরের
সাথে থাপিয়াছ সখ্য
পুলক আকুল শিহরি উঠেছে
ফুলে ফুলে সারা বক্ষ।
বাজায়ে মুরলী নেচেছেন তলে,
দোলায়ে দিয়াছ বনমালা গলে,
সেই কালো রূপে আলো করে আছে
আজও মরমের কক্ষ।

(৩)

তুমি হে তমাল বনের দুলাল,
ঝুলন ঝুলাও হর্ষে,
শ্যামল হয়েছ রাধা মাধবের
রাতুল চরণ স্পর্শে।
বৃন্দাবনের তুমিই যে আধা,
আদর করেন আদরিণী রাধা,
বরষায় গাও 'গীত গোবিন্দ'
মেঘ সুধাধারা বর্ষে।

(৪)

তুমিই অশথ ভগবান-রূপী,
বোধিদ্রুম তুমি বুদ্ধ,
তুমি শমী চির অগ্নিগর্ভ
তুমি অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ।
তুমিই বিল্ব নব কৈলাস,
শিব দুর্গার পল্লী আবাস,
তুমি শাল্মলী 'পঞ্চতন্ত্র'
বুকে রাখিয়াছ রুদ্ধ।

(৫)

তুমিই তুলসী মধু ভাগবৎ
তুমি গীতা. তুমি ক্ষুদ্র,
তুমি সনাতন অক্ষয় বট
বিশাল বিরাট রুদ্র।
তুমি নারিকেল তুমি ব্রাহ্মণ,
স্বর্গ তোমার অবলম্বন,
সেবা অধিকারী তুমি সহকার
কখনো বৈশ্য শূদ্র।

(৬)

কভু বেণু তুমি বীর ক্ষত্রিয়
মহাযুদ্ধের অংশী,
কভু বৈষ্ণব গীত-বেয়াকুল
ব্রজ শ্যামের বংশী।
পুণ্য অশোক তুমি মহাপ্রাণ,
সীতারে করেছ আশ্রয় দান,
তুমিই খাগ্ড়া অতি নির্ম্মম
জয় যদুকুলধ্বংসী।

(৭)

সপ্তচ্ছদ, শকুন্তলার
তুমি মিলনের স্বর্গ,
তুনি চন্দন ভক্তি প্রেমের
চিরসুন্দর অর্ঘ্য।
তুমি তাল, ভালবাসে কালিদাস,
সাগরের কূলে আদিম নিবাস,
পক্ষী-রাজের সোয়ারে জোগাও
তালপত্রের খড়্গ।

(৮)

তুমি ডম্বুর, পুষ্প দেখায়ে
কর কত রাজা সৃষ্টি,
তুমি এরণ্ড, সুধী চাণক্য
দিয়াছেন শুভ দৃষ্টি।
তুমি হরিতকী, দেবতার প্রিয়
সুপক্ক ফল দু একটা দিয়ো,
সিদ্ধ বকুল পুষ্পের সাথে
কর কল্যাণ বৃষ্টি।

(৯)

তুমিই শিরীষ, পুষ্প অতুল—
মৃদুতা এবং বর্ণে
তুমি শিংশপা, 'বেতালের' কথা
এখনো পশিছে কর্ণে।
তুমি তিন্তিড়ী, বুনো রমানাথ,
তুমিই মনসা, পদে প্রণিপাত,
তুমিই রম্ভা কদলী দেখাও—
হিরণ হরিৎ পর্ণে।

(১০)

মেঘদূতে তুমি দেখায়েছ পথ,
নমামি শ্যামল জম্বু,
নমামি নিম্ব, বায়সের চূত,
কর বিস্বাদ অম্বু।
তুমি কুলগাছ, দানী বিধাতার,
তুমিই হিজল ডিঙ্গা বাঁধিবার,
তুমিই পলাশ বটু হয়ে যাহা
করে ধরেছেন শম্ভু।

(১১)

তুমিই ভূর্জ্জ জ্ঞানের আকর—
বিদ্যার গোলকুণ্ডা,
তন্ত্রধারক, বেদের স্মারক,
ভক্তি পথের পাণ্ডা।
কভু শর তুমি, কখনো শায়ক,
কভু ঝাউ তুমি অসহ গায়ক,
কখনো বেতস, কভু পাঁচ তুমি
ভদ্রের বেশে গুণ্ডা।

(১২)

বনের বুড়ার তুমিই আবাস
তোমাতেই প্রীত ষষ্ঠী
খুলেছ মধুর অন্নসত্র
পালিছ ভ্রমর গোষ্ঠী।
রসিক তুমি হে ছলায় কলায়
শুঁড়া শির ডাকো বেলের তলায়
তুমি দারুচিনি ভাল করে চিনি
'যষ্টিমধু'র যষ্টি।

(১৩)

তুমিই শাখোট, প্রেতিনীর গৃহ—
নিবিড় প্রমোদ কুঞ্জ,
বাস্তু ঘুঘুর তুমি খর্জ্জুর,
জোটাও পেচকপুঞ্জ।
ন্যাদা বড়গাছ তুমি হে সবার,
কেহ নাহি যার তুমি আছ তার,
তুমি মন্দার, হেলান দিও না
মন দিয়ে সবে শুন্‌ছো।

(১৪)

তুমি তরু, জ্ঞাতি কল্পতরুর
অক্ষয় তব বিত্ত,
ধৈর্য্য দিওহে তোমার মতন,
ফুলের মতন চিত্ত।
অ-মানীকে যেন দিতে পারি মান,
স্বরগের সুধা করি যেন পান,
করি যেন ছায়া ফুল ফল দান
তোমারি মতন নিত্য।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমরা ও তাঁহারা

সহর ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত বাংলোতে আসার জন্য বড় বদনাম হয়েছে শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু করি কি? ধূলার মধ্যে থেকে শরীর অত্যন্ত খারাপ হতে লাগল এবং নিজের নির্ব্বাচিত গণ্ডীর মধ্যে স্থায়িভাবে বাস কোরলে চিন্তার ধারাগুলিও অভ্যাসে পরিণত হবে ভেবে সহর ছাড়তে বাধ্য হলাম। এধারে বয়সও বেড়ে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রাতিকূল্যে জীবন-যাত্রা চালাবার লোভ ও ক্ষমতা কমে আসছে। তাই নিরালায় নীড় বাঁধতে চলে এলাম। আমার নতুন বাড়ী সহর থেকে অনেক দূরে, নদী পার হয়ে আসতে হয়। সহরের খবর তিন চারদিন পরে কলিকাতার খবরের কাগজ মারফৎ পাই। অবশ্য সে জন্য আর আমি দুঃখিত হই না, নেহাৎ আধুনিক হবার মোহটা ক্রমেই কেটে যাচ্ছে। এ নির্জ্জন স্থানে আরো দু'চার বছর থাকলে আমি পুরোপুরি অধ্যাপক হয়ে যাবো। সাধনার পক্ষে বর্ত্তমানের সংসর্গ ও কোলাহল অত্যন্ত ক্ষতিকর, বিশেষতঃ যখন ব্রত আমার অধ্যাপনা। ছাত্রদের কিছু বর্ত্তমান কিংবা ভবিষ্যতের সম্বাদ দিতে পারি না, কেন না সে সম্বাদের কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই। মূল্য আছে এক অতীতের, কারণ অতীত চিরস্থায়ী এবং যে জিনিষের স্থায়িত্ব নেই, তার আইন-কানুনও নেই। আর আইন-কানুন ছাড়া অন্য কিছু পড়ান যায় না। অন্য কিছু শিক্ষা দিলে ছাত্রদের ঔচিত্যানৌচিত্য জ্ঞান বাড়ান যায় না। বর্ত্তমানে কি হচ্ছে, এবং ভবিষ্যতে কি হবে বোলতে গেলেই পৃথিবীতে যা হয়েছে কিম্বা যা হচ্ছে তাই ঠিক হচ্ছে এ কথা ছাত্রেরা আর বিশ্বাস কোরবে না। এ রকম বিশ্বাস হারালেই ছেলেরা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠবে, নিজের মতে কায কোরতে শিখবে—এবং আমার চাকরী যাবে। অতএব অতীতের জয় হোক্! বর্ত্তমান জাহান্নমে যাক্! এবং আমি সহর ছেড়ে নদী পার হয়ে এসে জীবন বৃত্তিকার সাধনা করি!

কাল রাত্রি নয়টার সময় আরাম কেদারায় শুয়ে সহরে বন্ধুদের কথা স্মরণ করছিলাম। দেহটা ক্লান্ত হলে মানুষ বড় ভাবপ্রবণ হয়ে যায়। অত্যন্ত ক্লান্ত হলে অবশ্য বিদ্বেষ আসে, কিন্তু মাষ্টারের ক্লান্তি কিছু মুটে-মজুরদের মতন হয় না। অত্যাধিক ক্লান্তিতে কলের মুটে-মজুররা হাত পা কেটে ফেলে কিম্বা মদ খায়। এই স্বল্প ক্লান্তিতেই কিন্তু মানুষ অনেক বোকামী করে ফেলে। যত প্রেমপত্র লেখা, যত পাতকাদি প্রকাশ, এই কর্ম্ম অন্তে, বিরাম সাগরে নিমজ্জিত হবার সময়েই সম্ভব হয়। হাতে একখানা বই ছিল, কিন্তু মন ছিল সহরে, অর্থাৎ বইএর বাহিরে। সহরে থাকতে সহরের বন্ধুরা কেমন অযাচিত ভাবেই আসতেন, গল্প কোরতেন, অনেক রাত্রে হাসতে হাসতে চলে যেতেন। এখন আর কেউ আসেন না। মনটা কেমন বিষাদে ভরে উঠল। একটু চুপ কোরে শুয়ে রইলাম। কি আশ্চর্য্য! কিছুক্ষণ পরেই

দেখি আমার সহরের বন্ধুরা এসে উপস্থিত। আমি ত হতভম্ব। তাঁদের সমাদর কোরতেই ভুলে গেলাম। তাঁরা নিজেরাই, আসন টেনে নিয়ে বোসে পড়লেন। তারপর কথা-বার্ত্তা চলল।

আমি—এইমাত্র ভাবছিলাম যে কাল ছুটী, সকালেই আপনাদের সঙ্গে দেখা কোরতে যাবো। আপনারা যে দয়া কোরে উপস্থিত হয়েছেন সে জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে।

তাঁহারা—জ্যোৎস্না কেরাণীদের জন্য নয়। চাঁদের কিরণ, মলয় প্রভৃতি কাব্যবস্তু আপনাদেরই উপভোগ করা শোভা পায়। কায কোরতে হয় না, বোসে বোসে মাইনে নিচ্ছেন—মোটা মাইনে, বছরে সাত মাস ছুটী। কাল রবিবার, অনেক সংসারের কাজ কোরতে হবে—তাই আজ অসময়ে উদয় হলাম। সেজন্য আপনি ইংরাজী কায়দা হিসাবে ধন্যবাদ দেবেন না—বরং আমাদেরই আপনার কাছে মাফ চাওয়া উচিৎ। ওসব ইংরাজী কায়দা এ পাড়ার ভদ্রমহোদয়দের জন্যই তুলে রাখুন। আমাদের জন্য একটু আন্তরিকতা থাকলেই আমরা কৃতার্থ হব। নতুন পাড়ায় এসে শরীরের কোন উন্নতি হচ্ছে বলে মনে লাগছেনা ত; এ পাড়ায় গানের চর্চ্চা হয় না?

আমি—আজ্ঞে না, গান একেবারে ভুলে গেছি, গান শুনতেও পাই নি, গাইতেও চাই না। কতদিন গান শুনিনি, গান গাইনি ভাবলেও কষ্ট হয়। আমি বোধ হয় বেশী দিন ভাল গান না শুনলে বাঁচতেই পারি না। এক এক সময় মনে হয় যে এ পাড়ায় এসে বোধ হয় ভাল করিনি—শরীরের দিক্ দিয়ে কোন লাভ হল না—

তাঁহারা—মনের দিক্ দিয়ে কিছু হয়েছে কি?

আমি—সেখানে লাভালাভের হিসাব এখনও খতিয়ে দেখি নি।

তাঁহারা—আপনারাও যদি হিসাব করেন তা হলে আমরা কি করব?

আমি—কি জানেন অধ্যাপকের কায হিসাব করা ছাড়া আর কিছুই না। আপনারা করেন অঙ্কের হিসাব—আমরা করি মনের। আমরা দুজনেই কেরাণী। এখানে এসে আর্থিক উন্নতি কিছু হয় না, কেননা বাজার অনেক দূর। তবে মানসিক উন্নতি হয় কিনা সে বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে।

তাঁহারা—কি রকম আলোচনা করছেন বলুন না শুনি, যদি বুঝতে পারি।

আমি—আচ্ছা আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের আপত্তি কি? ইংরাজীতে যাকে town আর gown এর ঝগড়া বলে, আপনাদের আপত্তি কি সেই ধরণের?

তাঁহারা—সোজা কোরে বলুন না—ঝগড়া করব, তাও বিলাতী ঝগড়ার অনুকরণ নাই করলাম।

আমি—এখানে আবার বিলাতী গন্ধ পেলেন কোথায়? এর মধ্যে শক্ত কথা পেলেন কোথায় যে বুঝতে পারছেন না? যা কিছু বোঝা যায় না তাই বোধ হয় বিদেশী, নয়?

তাঁহারা—আজ্ঞা হাঁ, যা বোঝা যায়, যা প্রকৃতই বাস্তব তাই দেশী।

আমি—আমরা কি এতই অ-বাস্তব কথা বলি যে সব সোজা কথা বাঁকা হয়ে যায়?

তাঁহারা—আজ্ঞা হাঁ। আপনি দেখছি নিজেদের দোষটি ঠিক্ ধরেছেন।

আমি—একটু চুপি চুপি কথা বলুন। নিজের দোষ ধরা অধ্যাপকের পক্ষে আত্মহত্যার মতনই পাপ কার্য্য। যাক্ এই কি আপনাদের আপত্তি?

তাঁহারা—অন্ততঃ একটা বটে।

আমি—অর্থাৎ?

তাঁহারা—এ সোজা কথাটি বুঝতে পারছেন না? কোন দুর্ব্বোধ্য কথা ব্যবহার করিনি ত?

আমি—এ বড় কঠিন সমস্যা! আপনারা আমাদের কথা বোঝেন না, আর আমরা আপনাদের কথা বুঝি না, অথচ প্রত্যেকেরই ধারণা যে কোন দুর্ব্বোধ্য ভাষা প্রয়োগ করা হয়নি।

তাঁহারা—কঠিন সমস্যা বটে, তবে আমাদের মধ্যে বোঝা পড়া চাইই চাই। আপনারা কষ্ট কোরে বিদ্যা অর্জ্জন করেছেন, তার সুফল ভোগ করবার অধিকার এবং ঈপ্সা আপনাদের যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। এবং আপনাদের মধ্যে পরকে উন্নত করবার বলবতী ইচ্ছা সর্ব্বদাই রয়েছে বোলেই সন্দেহ করি।

আমি—বাস্তবিক পক্ষে আমরা শিক্ষা দিতে ভালবাসি বোলেই আমরা শিক্ষকবৃত্তি অবলম্বন কোরেছি। শিক্ষা দেবার প্রবৃত্তি সব মানুষের মধ্যেই আছে। আপনারা কি ছুতা পেলেই শিক্ষা দিতে কসুর করেন?

তাঁহারা—তবে শিক্ষা দেবার প্রবৃত্তিকে আমরা বৃত্তিতে পরিণত করিনি। একটা কোন প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র কোরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাতেই আমাদের দ্বিতীয় আপত্তি।

আমি—দ্বিতীয় আপত্তির কথা পরে শুনব। প্রথম আপত্তির কথাই আলোচনা করা যাক্। আমাদের ভাষায় দোষ কি?

তাঁহারা—দোষ অনেক। প্রথমতঃ আমরা মনে করি যে প্রত্যেক জিনিষেরই এক একটি স্বতন্ত্র ভাষা আছে, যেমন ফুলের, শিশুর, যুবকের। কিন্তু আপনাদের মুখে তাদের বর্ণনা শুনলে মনে হয় যেন ভগবান তাদের মূক কোরেছেন আপনাদের মুখর করবারই জন্য। হয়ত তাদের ভাষা নীরব, আর সে ভাষা ব্যতীত অন্যের ভাষায় তাদের গোপন কথা তারা ব্যক্ত করে না। আপনারা সে ভাষা আয়ত্ত করেন নি।

আমি—এ দেখছি আপনারা আমাদেরও হারালেন। ভাষা বিভিন্ন মানতেই হবে, তবে ফুলের ভাষা আছে এবং সে ভাষা নীরব এ কথা কি কোরে মানব ? ভাষা একমাত্র মনের, যার মন আছে তারই ভাষা আছে। ফুলের মন আছে এ রকম আবিষ্কার জগদীশ বাবু পর্য্যন্তও করেন নি। শিশুর মন হয়ত থাকতে পারে, কিন্তু রবি বাবু শিশু-মনের পরিচয় দিতে গিয়ে আধ আধ ভাষা প্রয়োগ করেন নি বোলেই স্মরণ হচ্ছে। শিশুর ভাষা শিশুর পিতামাতারই ভাল লাগতে পারে, আপনার আমার লাগবে কেন ? আর যুবকের ভাষাই ত আমরা ব্যবহার করি। যুবকের মুখে কখনও সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হতে শুনেছেন ? বৈয়াকরণিককে জিজ্ঞাসা করুন ভাষা কার ? তিনি নিশ্চয় উত্তর দেবেন ভাষা সর্ব্বসাধারণের অর্থাৎ কারুর নিজস্ব নয়।

তাঁহারা—অতএব সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি থেকে আমরা বঞ্চিত হব কেন ? শুধু তাই নয়, আপনি বোধ হয় নিজের উত্তর পরের মুখে চাপিয়েছেন। বৈয়াকরণিক যদি সত্য কথা কন্ তা হলে নিশ্চয়ই উত্তর দেবেন 'ভাষা আমার'। আমরা বৈয়াকরণিকের হাতে ভাষা সমর্পণ কোরে দিতে ইচ্ছুক নই।

আমি—আর্টিষ্টের কাছে রাখতে ভয় পান না ত ?

তাঁহারা—নিশ্চয় না। তবে দুঃখ এই যে আপনারা কেউ আর্টিষ্ট নন্। যদি হতেন তা হলে গোলই থাকত না। প্রত্যেক বস্তুর বিভিন্ন সত্তা উপলব্ধি করা পণ্ডিতের কাছে সহজ হতে পারে কিন্তু প্রত্যেক বস্তুর ভিন্ন রসগ্রহণ করা আর্টিষ্টের কাজ, আপনাদের কর্ম্ম নয়।

আমি—আপনারা ভিন্ন রসগ্রহণ করতে পারেন ? রস কি প্রত্যেক বস্তুর গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ? রস ত যে ভোগ করে তার মনের। যাই হোক্ আপনারা যে রসগ্রহণ কোরতে সমর্থ তার প্রমাণ ?

তাঁহারা—এই যেমন আমরা ফুল ভালবাসি, শিশুর অত্যাচার সহ্য করি এবং গান শুনে আপনার মতন ঘোরতরভাবে মস্তক সঞ্চালন না কোরেও বেশ আনন্দ পাই। আমরা কীর্ত্তন শুনতে বড় ভালবাসি কিন্তু আপনি ধ্রুপদ খেয়াল ছাড়া অন্য কোন প্রকার গান শোনাকে সময়ের অপব্যবহার বোলে মনে করেন।

আমি—আপনারা যখন বোলছেন যে আনন্দ পান তখন স্বীকার কোরতেই হবে। কিন্তু আমি ধ্রুপদ খেয়াল শুনে যে আনন্দ পাই তার চেয়ে আপনাদের কীর্ত্তন শুনে আনন্দের মাত্রা যে বেশী তার প্রমাণ কি ?

তাঁহারা—প্রমাণ এই যে আমাদের আনন্দ-প্রকাশ বেশী-সংখ্যক লোক বুঝতে পারে এবং আপনাদের প্রকাশকে কেউ বোঝে না অন্ততঃ আমরা বুঝি না। প্রমাণ এই যে ভাল জায়গায় এসেও আপনার শরীর খারাপ হতে চলেছে আর আমরা ধূলার মধ্যেও বেশ আছি।

আমি—আনন্দের মাত্রা তা হ'লে ভোটে ঠিক্ হবে ? আপনারা ঠিকই বোলেছেন—এটা যে গণতন্ত্রের যুগ। আপনারা তা হলে আনন্দে আছেন ধূলার রসগ্রহণ কোরে ? আজকাল রাস্তার জল দিচ্ছে না কি ? যাই হোক্ এবার দ্বিতীয় আপত্তি পেশ কোরতে পারেন্।

তাঁহারা—আপনারা অত শিক্ষা দিতে ভালবাসেন কেন ? না হয় পুঁথিগত বিদ্যা আপনাদের চেয়ে আমরা কম জানি, কিন্তু শিক্ষকত্বের দাম্ভিকতা অন্যান্য প্রভুভাবের মতনই কি ঘৃণ্য নয় ?

আমি—যথা— ?

তাঁহারা—এই ধরুন প্রজার প্রতি রাজার মনোভাব, এবং বর্ত্তমান পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষিতা স্ত্রীদের ভাষায়—স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মনোভাব।

আমি—এসব মনোভাব কি অত্যন্ত খারাপ ? শক্তির অধিকার নেই কি দুর্ব্বলের ওপর প্রভুত্ব কোরতে ? শক্তিশালী ব্যক্তি যে প্রভুত্ব না কোরে থাকতেই পারে না আর দুর্ব্বলেরা সে প্রভুত্ব গ্রহণ কোরবেই কোররে। এই চলে আসছে চিরকাল ধরে—সেই জন্য অধিকারও জন্মেছে।

তাঁহারা—অতএব আপনার মতে আমরা চিরকালই পরাধীন থাকব, মেয়েরা চিরকালই পরাধীন থাকবে ? কেননা এই রকমই হয়ে আসছে ?

আমি—যতদিন আমরা দুর্ব্বল থাকব, (স্ত্রীলোকদের কথা অন্য) ততদিন আমরা পরাধীন থাকতে বাধ্য। এ বেশ সোজা কথা। আমাদের সবল হয়েও পরাধীন থাকা উচিৎ বলছি না ত।

তাঁহারা—আপনার মুখে শক্তির অধিকার শুনে আশ্চর্য্য হলাম। আমরা শক্তির অধিকার জানি না, জানি শুধু প্রেমের অধিকার।

আমি—আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে যে আপনারা প্রেমের অধিকার জানেন না। জানেন শুধু সংখ্যার অধিকার।

তাঁহারা—সংখ্যায় প্রেম আছে প্রমাণ কোরতে পারি।

আমি—প্রমাণ করুন। কিন্তু আপনাদের স্ত্রীরা শুনলে রাগ কোরবেন না ?

তাঁহারা—আপনার মুখে স্বামীর প্রভুত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য শুনে আপনার স্ত্রী যতটুকু রাগ কোরবেন তার বেশী নয়।

আমি—বোলে যান্।

তাঁহারা—স্বাধীনতা এবং পরাধীনতার তফাৎ এই প্রেমেই। আমরা স্বরাজ পেলেও আমাদের মধ্যে জন কয়েক শাসন কোরবেন, বাকী কয়জন শাসিত হবেন। শাসনকর্ত্তারা

অধিকসংখ্যক লোকদের মত নিয়ে শাসন করতে বাধ্য হবেন এবং সে শাসন শক্তির চেয়ে প্রেমের উপরই স্থাপিত হবে। স্বামীর প্রভুত্ব শুধু পুরুষের পৌরুষ নয়।

আমি—কথাগুলিতে খুব আদর্শবাদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণ জ্ঞানে বোলছে শাসন গায়ের জোরের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। আপনারা নেহাৎ সাধারণ মানুষ বোলেই মনে হচ্ছে না।

তাঁহারা—আমরা যে একেবারেই সাধারণ এবং সর্ব্বসময়ে নিতান্তই সাধারণ বোলে দয়া কোরে মনে কোরবেন না। আমাদের মনের মধ্যেও একজন দার্শনিক আছেন, যেমন আপনাদের মনের মধ্যে একটি অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তি লুকিয়ে থাকেন এবং সেই অ-দার্শনিক ব্যক্তি প্রায়ই উঁকিঝুঁকি মারেন—তবে লেখার মধ্যে নয় এই যা দুঃখ।

আমি—তা হলে আমরা আপনাদের সাধারণ বোলে গণ্য করি এই হচ্ছে সত্যকারের আপত্তি? যাই হোক, আমার মধ্যে কখন সাধারণ মানুষের সন্ধান পান বলুন ত? আলাপটা ঘনিয়ে আসছে।

তাঁহারা—আপত্তির স্বরূপ নির্ণয় কোরেছেন বোলতে হবে। আমাদের সাধারণ গণ্য করার নামই আপনাদের দাম্ভিকতা। কিন্তু আপনাদের দাম্ভিকতার মূল্য নেই, কেননা তার ভিত্তি হচ্ছে একজন সাধারণ মানুষ—আমাদেরই মতন।

আমি—এই বোল্লেন সাধারণ মানুষটি কেবলমাত্র উঁকি ঝুঁকি মারে—আবার বোলছেন সেই সাধারণ মানুষই আদৎ মানুষ। প্রথম কথাটি মানি, দ্বিতীয়টি মানি না।

তাঁহারা—প্রথমটি মানলেই আমরা কৃতার্থ হব। যাই হোক্ কখন সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎ পাই বলছি। এই যখন আপনাদের মুখে পরস্পরের নিন্দা শুনি, যখন আপনাদের প্রচারিত মতের সঙ্গে আপনাদের আচারের বৈষম্য দেখি। সত্য কথা বলুনত, নিজেরাই কি নিজেদের মতগুলিতে সন্দেহ করেন না?

আমি—যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে আমার কর্ম্মকর্ত্তাদের বোলে দেবেন না তা হলে বলি। আমি আমার নিজের প্রচারিত মতগুলিকে সন্দেহ করি, তবে গভীর রাত্রে, আলো নিভিয়ে দিয়ে, মশারির ভেতর শুয়ে। সম্ভবতঃ আমাদের মধ্যে অন্যেও সন্দেহ করে থাকেন। তবে তাঁরা এখনও কাঁচা রয়েছেন। যখন সব পাকা হয়ে যাবো, অর্থাৎ যখন আমার মতটি জগতে চালাতে পারবো, অর্থাৎ যখন আমার systemকে সর্ব্বসাধারণে গ্রাহ্য কোরবে, তখন আর সন্দেহ থাকবে না। খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারের পর যদি যীশুখ্রীষ্ট সশরীরে সেন্টপলের সামনে এসে বোলতেন, 'ওহে আমি মরিনি, আমাকে নিয়ে অত বাড়াবাড়ি কোরছ কেন? আমি অতি সাধারণ মানুষ ছিলাম,' তা হলে সেন্টপল যীশুকে কি আবার ক্রুসে ঝুলিয়ে দিয়ে চিরকালের মতন নিজের সন্দেহ দূর কোরতেন না?

তাঁহারা—আপনারও ধর্ম্মপ্রচারের লোভ আছে না কি? কি ধর্ম্ম প্রচার কোরবেন শুনতে পাব কি?

আমি—আমার ধর্ম্ম এই যে প্রত্যেক মানুষ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিকভাবে সকল প্রশ্ন এবং সমস্যার সমাধান কোরবে—তা হলেই জগতে জ্ঞানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এই বিজ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে জগতের এবং জীবনের যাবতীয় প্রাকৃতিক নিয়মগুলি আবিষ্কৃত হলেই প্রত্যেক মানুষ সংস্কৃত হয়ে উঠবে। কেন না তখন আর খেয়ালী হৃদয়বৃত্তিগুলি থাকবে না এবং মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মগুলির দ্বারাই চালিত হবে।

তাঁহারা—হৃদয় বৃত্তিগুলির ওপর এত রাগ কেন? আপনি কি তাদের দ্বারা অত্যন্ত বিধ্বস্ত হন? আর আপনিও যদি না হন, অন্যে তাদের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হচ্ছে অস্বীকার কোরলে সত্যের অপমান করা হয়।

আমি—আদিম বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে দেখছি আপনাদের মধ্যে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। সেগুলির অস্তিত্ব আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু বহুদিন যাবৎ জীব জগতের সঙ্গে জড় জগতের যে যুদ্ধ হচ্ছে বৃত্তিগুলি কি সেই যুদ্ধান্তের সন্ধি সর্ত্ত নয়? সন্ধি সর্ত্তগুলি শুধু সুবিধার নামান্তর মাত্র। সন্ধি সর্ত্তকে চিরন্তন ভাবলে, কিম্বা জোর কোরে ব্যবহারিক জগতে চালাতে গেলে যেমন বর্ত্তমান ফ্রান্সের দুরবস্থা হয়েছে তেমনি জীবনের মূল্য কমে যাবে। সুবিধাকে সত্য গণ্য কোরলে জীবনকে জড়ে পরিণত করা হয়। স্বীকার করছি মানুষ অন্য মানুষের ওপর ক্ষমতা বিস্তার করবার চেষ্টা করে এক আদিম প্রবৃত্তির বশে। এবং সেই ক্ষমতা বিস্তারের প্রকৃষ্ট উপায় শিক্ষা দেওয়া। অন্য ধারে মানুষ অন্য মানুষের কথা শোনে নিজেকে নীচু কোরে দিয়ে। বিনয় শুধু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ নয় ওটাও মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। এই ক্ষমতা বিস্তারের ইচ্ছা এবং অধম বিনয়ী ভাব কিম্বা জ্ঞান-পিপাসা দুই মিলে মিশে শিক্ষার সৃষ্টি হয়েছে। তার ওপর সমাজ আবার তার সমাজিক মূল্য দিয়েছে। অতএব পরকে শিক্ষা দেবার দাম্ভিকতা শুধু আমাদের দোষ নয় ওটা যারা শিক্ষিত হবার অভিলাষী তাদের এবং সমাজের দোষও বটে। সবক্ষেত্রেই সুবিধা—সুবিধা। তবে সুবিধা কখনও সত্য নয় এ কথাও মানতে হবে। তা হলে প্রশ্ন উঠিতে পারে আপনি সত্য কাকে বলেন? যা আছে তাই, না যা হওয়া উচিৎ তাই? আমি বলি Aristotle যা বোলেছিলেন প্রকৃত রূপ হচ্ছে যা হওয়া উচিৎ কিম্বা জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা চালিত হলে যা হবে তার স্বরূপই হচ্ছে সত্য।

তাঁহারা—সাহেবের কথা তোলেন কেন? ভয় দেখাবার জন্য?

আমি—না, সে জন্য নয়, তবে কি জানেন যখন Aristtle আমার মতাবলম্বী হন, তখন সে মতের কিছু মূল্য আছেই আছে। অতএব সাহেবের কথা বাদ দিয়েই বলা যায় সত্য দুই রকমের—এক যা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, আর এক যা সত্যকারের সত্য।

তাঁহারা—আচ্ছা সত্যের অত মিথ্যা সাজবার প্রয়োজন কি? সত্যের কি ইচ্ছা হয় না যে আমরা তাকে সত্য বোলেই গ্রহণ করি? তা যদি না হয় তা হলে বোলতে হবে সত্যের এই লীলা অস্বাভাবিক এবং অনর্থক।

আমি—আপনারা যাকে লীলা বোলছেন দর্শনেও তাকে লীলা বলা হয়েছে। এই লীলা কিম্বা মায়ার কারণ, উৎপত্তি কিম্বা উদ্দেশ্য কেউ বোলতে পারে না, তবে আমাদের কাজ বিচার কোরে যাওয়া মাত্র। এখানেও দেখুন না সেই বিচার-বুদ্ধি কতখানি প্রয়োজন! বিচারের পর যদি কিছু পরিমাণে সত্যের আভাষ পাওয়া যায়, তা হলেও লাভ নেই, কেননা একবার আভাষ পেলে আর কেউ সে যায়গা থেকে ফিরে আমাদের বোলতে আসে না, সেই সত্যের মধ্যেই ডুবে থাকতে চায়।

তাঁহারা—তবে আপনারা যে আভাষ দিচ্ছেন সেটি সত্যের নয় তা হলে? আর যদি বিচার কোরে কিছু না বোলতে পেলাম তবে বিচার করার লাভ কি?

আমি—কিছু পেলেই তার সম্বন্ধে বোলতে যাওয়া কি আমাদের দাম্ভিকতার চেয়ে কিছু কম?

তাঁহারা—অত গোলমালে কাজ কি? আমরা দুইটি সত্য নিয়ে মাথা ঘামাই বা কেন? আমরা কেন সেই সত্যকে গ্রহণ কোরব না যেটি জ্ঞানের মধ্যে খানিকটা এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে রয়েছে। আমরা যদি বলি যে আপনাদের আবিষ্কৃত সত্যটিই মায়া আর আমাদের অভিজ্ঞাত সত্যই ঠিক সত্য,—তা হলে কি বোলবেন?

আমি—না আমার বলবার বড় কিছুই নেই, যদিও Pragmatismএর বিপক্ষে অনেক কথা পড়েছি।

তাঁহারা—সব পড়া কথা ছেড়ে দিন। অতএব দুই সত্যের মধ্যে কোনটি প্রকৃত তা আপনি জানেন না? অতএব আমাদের জ্ঞান-আঁখি খুললেই যে সব ভুল ধুয়ে মুছে যাবে এ রকম বলা যায় না। তাহলে আপনার মতন শিক্ষার দরকার কি?

আমি—কি জানেন সত্যের সন্ধান অনুভূতি-সাপেক্ষ।

তাঁহারা—অনুভূতি কি কেবল জ্ঞান-সঞ্চয়? আপনি বলেন 'কেবল ধ্রুপদ শুনে যাও, তাহলেই দেখবেন যে বাংলা গান কত নীচুস্তরের, আর ধ্রুপদে কত মজা'। আমরা যদি বলি যে সে মজা পাওয়া কেবল মাত্র অভ্যাসের দোষ এবং আপনিও কীর্ত্তন শুনতে শুনতে ভাবে বিভোর হয়ে যাবেন এবং কীর্ত্তনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বোলতে কুণ্ঠিত হবেন না? জ্ঞান-সঞ্চয় মানে অভ্যাস-সঞ্চয় করা, আর অভ্যাস মানে গোটাকয়েক সংস্কার মাত্র। সংস্কারের সাহায্যে ভালমন্দের সত্য রূপ কিম্বা মূল্য নিরূপণ করা যায় না। সংস্কার মায়া নয় কি?

আমি—এ প্রশ্নের উত্তর দর্শনে পাবেন, দার্শনিকে দিতে পারে না।

তাঁহারা—অর্থাৎ শিক্ষায় পারে, শিক্ষককে পারে না ?

আমি—কতকটা। তাহলে আপনাদের আপত্তি ব্যক্তিগত মাত্র, আপনারা শিক্ষার বিরোধী নন্ শুনে সুখী হলাম। যা হোক আমাদের বিপক্ষে আপনাদের অন্য কিছু অভিযোগ আছে কি ?

তাঁহারা—অভিযোগ কি দুই একটা ? আচ্ছা আমরা সব কিছু সমস্যা হিসাবে ধরব কেন ? পৃথিবী কি একটা পরীক্ষা-কেন্দ্র ?

আমি—সে কি। আপনারাই ত বলেন জীবন একটি পরীক্ষাস্থল।

তাঁহারা—বলি বটে, তবে আপনাদের মুখে ঝাল খেয়ে। আমাদের পরীক্ষাগারে অনেক লতাপাতা, ফুলফল, ছেলেপুলে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া অন্য দুঃখ কষ্ট এবং পাস করার আশা ছাড়া অন্যান্য আশা ভরসা আছে। সে পরীক্ষা স্কুলের প্রশ্ন অন্য একজন করেন না, প্রশ্ন আমরা নিজেরাই করি এবং নিজেরাই উত্তর দিই, বই পড়ে নয়, অভিজ্ঞতা দিয়ে। এবং উত্তরও সে জন্য ভিন্ন ভিন্ন হয়। আপনারা কিন্তু ছাত্রদের কাছ থেকে ঠিক এক উত্তর প্রত্যাশা করেন। শুধু তাই নয়—আমরা পাস ফেল করা ছাড়া যে অন্য ফল লাভের আশা করি তার নাম আনন্দ। সে আনন্দ কত গভীর তা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রও হৃদয়ঙ্গম কোরতে পারে না। আমাদের পরীক্ষাগারে শুধু সমস্যারই সমাধান হয় তা নয়, সেখানে বেশীর ভাগ সময় খেলাই করি, গান গাই, নাটকের আখড়া দিই, আবার দেখা দেখিও চলে যে অন্যে কতখানি এগিয়ে গেলো।

আমি—সব পরীক্ষাগারেই শেষোক্ত ঘটনাগুলি ঘটে, তফাৎ যা ঐ আনন্দে।

তাঁহারা—আর এক তফাৎ আছে। আমরা উত্তরগুলি মাতৃভাষায় দিয়ে থাকি—আমরা অবশ্য বেশীর ভাগ সময় উত্তর লিখি না, হিজি বিজি কাটি, এবং শিক্ষক পরীক্ষকের ব্যঙ্গ চিত্রও এঁকে থাকি।

অমি—বেশ করেন। ও-রকম ইচ্ছা আমার নাস্তিক মুহূর্ত্তেও উদয় হয়।

তাঁহারা—যাক্ আপনি তা হলে একেবারে পুরোপুরি শিক্ষক হয়ে পড়েন নি।

আমি—তবে যদি আপনারা এ রকম ভাবে এসে প্রাণ খুলে কথাবার্ত্তা কন, তা হলে শিক্ষকতার কার্য্যে বাধা পড়ার ভয় হচ্ছে।

তাঁহারা—অনেক রাত্রি হয়ে গেল। আপনার মূল্যবান সময়ের অপব্যবহার হল। আমরা এখন উঠি।

আমি—না না মহাশয়। আপনারা আমার সোজা কথাটি যে রকম ভুল বুঝলেন তাতে আপনারাই দার্শনিক আর আমি অত্যন্ত সাধারণ বলেই মনে হচ্ছে।

তাঁহারা—না অনেক রাত হয়ে গেল। আপনার মুখের নল পড়ে যাচ্ছে। আমরা উঠি। নমস্কার।

* * * *

হঠাৎ জেগে উঠে দেখি কেউ কোথায় নেই। রাতের অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম তা হলে। হাতে সেই Jacks এর Alchemy of Thought। বাবা—আবার বই!

শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কাণের ফুল

১

নয়নতারা যখন বিধবা হইল তখন তাহার বয়স সবে বত্রিশ পার হইয়াছে।

একটি শিশুপুত্র এবং দুই বিধবা-কন্যা লইয়া জীবনের নূতনতর কর্ত্তব্যে সে এমন কোমর বাঁধিয়া হুঁসিয়ারির সহিত নামিল যে জ্ঞাতি-প্রতিবেশীদের আর বিস্ময়ের শেষ রহিল না।

তাহার স্বামী অল্পদিন ওকালতি করিয়া বিশেষ কিছু জমাইতে না পারিলেও মৃত্যুর পর স্ত্রীপুত্র কন্যা কষ্ট না পায় ভাবিয়া একটা অসংসাহসের কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত অবস্থার লোক বিশ-হাজার টাকার লাইফ-ইনসিওর করা সহজ ব্যাপার নহে।

এই দুঃসাহসিকতার জন্য স্বামীর জীবদ্দশায় বহু দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করিয়া নয়নতারা কিন্তু একদিন বুঝিয়াছিল যে চন্দ্রমোহনের একটা পাকা আখেরি বুদ্ধি ছিল।

কন্যা দুইটির সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু চিন্তা করিবার ছিল না; তাহাদের মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন জোগাইতে পারিলে তাহার পরিবর্ত্তে তাহারাই সংসারটিকে চালাইয়া লইবার পথ সুগম করিয়া দিবে।

তাই পুত্র বিশ্ববন্ধুর ভবিষ্যতের প্রতি তাহার একান্ত প্রখর দৃষ্টি অনুক্ষণ নিবদ্ধ হইয়া রহিল। তাহাকে পাঁচের আরম্ভেই, যথাসাধ্য সমারোহের সহিত হাতে-খড়ি সমাধা করিয়া, একজন বৃদ্ধ—বিজ্ঞ মাষ্টারের জিম্মায় দিয়াও কিন্তু নয়নতারার মন একদিনের জন্যও নিশ্চিন্ত হইল না।

ভোরের বেলা পুত্রকে নিদ্রা হইতে ডাকা-ডাকি করিয়া তুলিয়া পাঠে বসান এবং মাষ্টার আসিলে পাশের ঘরে বসিয়া কেহ ফাঁকি না দেয়, তাহার রীতিমত তদ্‌বির্ ঘড়ি ধরিয়া করিতে নয়নতারার একটি দিনের জন্যও আলস্য হইত না।

কোনদিন আসিতে দেরি হইলে—মাষ্টারকে বাড়ীতে লোক দিয়া ডাকিয়া পাঠান, এবং নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে কোনদিন তিনি চলিয়া গেলে, পরের দিন উমাকে দিয়া তাঁহার কঠিন কৈফিয়ৎ তলব করা, তাহার একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

২

সে-মাসে মাষ্টারমশাই তাঁহার পুত্রের অসুখের জন্য দিন-তিনেক আসিতে পারেন নাই এবং হয়ত' পাঁচ ছয় দিন দেরি করিয়া আসিয়া সময়ের পূর্ব্বেই শীঘ্র-শীঘ্র চলিয়া গিয়াছিলেন। পরের মাসের পয়লা তারিখে অনেক যোগ-বিয়োগ কষিয়া, বহু তর্ক-বিতর্কের পর, নয়নতারা চারদিনের পূর্ণ বেতন কাটিয়া একটুক্‌রা কাগজে "৮ দিনের অর্দ্ধ বেতন কাটা গেল" লিখিয়া উমার হাতে টাকাটি পাঠাইয়া দিয়া পাশের ঘরে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল; দেখি, কি বলেন মাষ্টারমশাই।

মাষ্টার-মশাই কিছুই বলিলেন না। কেবল একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাসে দরিদ্রের সকল ব্যথার নিষ্ফল নিবেদন নিঃশেষ করিয়া দিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

হঠাৎ নয়নতারা মনের মধ্যে কেমন-যেন-একটা অসাধারণ উষ্মা বোধ করিল। হঠাৎ ফণা তুলিয়া তাহার মন বলিল, ইস্ এত অহঙ্কার! একবার মুখ ফুটে বিনয় ক'রে বল্‌তে কি হয়েছিল?—হাজার হলেও আমিত মুনিব! কি হয়েছিল বল্‌তে?—কেমন করে চলে আমার টাকা কটা কাটা গেলে? সত্যিই কি আমি মানুষের দুঃখ বুঝিনে, না, দয়া করতে জানিনে!

পরদিন প্রাতে বিশ্ববন্ধু পাঠে বসিল; কিন্তু মাষ্টারের দেখা নাই।

নয়নতারা যেন এক নিশ্বাসে আগা-গোড়া সকল ব্যাপার বুঝিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে দুর্জ্জয় রাগে মনটা তাহার মোচড় খাইতে লাগিল। সে মনে-মনে বলিল, বেশ, চাক্‌রি ছাড়ার মতলবখানা কাল যাবার সময় পষ্টো করে বলে যেতে কি হয়েছিল? সমস্ত দিনের মধ্যে একটা কোন উপায় ক'রে নিতে সত্যই কি আমি পারতুম না? দেশে কি মাষ্টার পাওয়া যায় না?

চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, মাষ্টারবাবু 'বড়ি বিহানে' উঠে বেরিয়ে গেছেন; উষা দিদি জানেনা কোথায় গেছেন তিনি।.........

চুলোয় গেছে। নয়নতারার রাগ কিছুমাত্র প্রশমিত হইল না। এঘর-ওঘর করিতে করিতে সে আপন মনে বকবক করিতে লাগিল; বুড়ো; লুভি! সেদিন থেকেই জানি,— সদরালা-গিন্নীর নজর পড়েছে—"বুড়ো পুরোণো নোকটি"—দেখি, রাখ্‌না তোরা কদিন পারিস্ মাথায় ক'রে। আজ বাদে কালত' যাবি বদলি হ'য়ে—তার পর?.........

কিন্তু বিশ্ববন্ধুর পড়ার কি হয়? জীবনের একদিন কেন, এক তিলও কি অবহেলার?

এমন করিয়া ঢিল্ দিলে ছেলে একটা আখাম্বা-আকাট-মূর্খ তৈয়ারি হইয়া উঠিবে। কি হইবে বয়াটে মূর্খকে লইয়া? কয়দিন ঐ ক'টা টাকা!—কতক্ষণের জন্য?......

উত্তপ্ত কটাহে জীবন্ত খলিসা মাছের মত নয়নতারা চারিদিকে ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একবার ভাবিল—কাজ নাই, মাষ্টারকে না হয় টাকাটা পাঠাইয়া দেয়; কিন্তু সেইক্ষণেই আবার মনে হইল, বাপ্‌রে! বিধবার টাকা! একবার নরম পেলেই—চারদিকের চাপে কর্পূরের মত কোথায় উড়ে যাবে। নাঃ অত বোকা আমি নই।

(৩)

চন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর বাড়ির পশ্চিমদিকের রান্না ভাঁড়ারের ঘরগুলা তফাৎ করিয়া নয়নতারা উঠানের মধ্যে একটা পাঁচিল তুলিয়া দিয়াছিল। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিত, সুয্যি-বেদি উঠোনে, কি ভাল হলো? খুদ-কুঁড়ো নিয়ে সংসার, দেবতারা যা' চান্ না—রাখ্‌তেও ভয় করে; হোক্ না সে কর্ত্তার হাতেরই করা।

কিন্তু ধীরে ধীরে সেই অংশে মাসিক সাড়ে পাঁচ টাকায় ভাড়াটিয়া বসিয়া গেল। সবাই বলিল সাবাস-বুদ্ধি বিধবার! এ যেন রথ দেখিতে গিয়া কলা বেচিয়া আসা!

এই বাড়িটিতে মোক্তার হারাধন গাঙ্গুলি মাস চারেক বাস করিতেছিল।

হারাধনের অনেক গুণ, বিশেষ করিয়া ভারি মুখ-মিষ্ট; কিন্তু প্রকাণ্ড দোষ যে ইহারই মধ্যে তিন মাসের ভাড়া বাকি ফেলিয়াছে। হারাধন কিন্তু সেকেলে ছাত্রবৃত্তি পাশকরা অগা-মোক্তার নয়;—বলিয়ে-কইয়ে একটা-পাশ-করা ইংরাজি-জানা চালাক-মোক্তার। আশা ছিল যে একদিন তাহার পসার জমিবে।

ছট্‌ফট্ করিয়া এদিক-ওদিক করিতে করিতে নয়নতারার মাথায় সেদিন বিদ্যুতের মত একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল:—হারাধনকে মাষ্টার রাখ্‌লে কি হয়? ভাড়ার টাকাও বাকি পড়ে না—আর পুত্রের জীবনের এই অমূল্য মুহূর্ত্ত গুলো বৃথা ব'য়ে যেতে পারে না।

কথাটা কিন্তু হঠাৎ ফাঁস হইবার আশঙ্কায় মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া নয়নতারা সোজা খিড়কির দরজা খুলিয়া হাঁক্ পাড়িল, বৌ, ও-বৌ, বলি, হারাধন কি বাড়ীতেই?

হারাধন বেচারির বাড়িতে তখনো মক্কেল আসিত না। কাজেই, সে সকাল-সকাল আহার সারিয়া, আদালত বসিবার বহু পূর্ব্বেই—কাছারি বাড়ির প্রশস্ত প্রাঙ্গণের বটতলায় সার্কাসের ঘোড়ার মত চক্কর দিত।

কিন্তু সাত-সকালে আহার করিতে হইলে দাসী-রাঁধুনির একত্র সমাবেশ, অল্প বয়সের স্ত্রীর উপর নির্ভর করিলে কাঁচা ভাত হইয়া মেজাজ খারাপ করিতে করিতে আদালত

যাইতে হয়। তাই বুদ্ধিমানের মত হারাধন, সকালের দিকটায় আইনের চর্চ্চা না করিয়া পূর্ব্ব-পুরুষানুসৃত জাতিব্যবসার অনুশীলন করিতে রন্ধনশালায় যাপন করিত।

অসময়ে কর্ত্রীর হুঙ্কার শুনিয়া হারাধনের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি চক্ষু পরিষ্কার করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া বলিল, কি বল্‌চেন, মা ?

নয়নতারা চেষ্টা করিয়াও মানসিক উত্তেজনার সবটা চাপিতে পারে নাই। তাই হারাধন মনে মনে প্রমাদ গণিল এবং কণ্ঠটি যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া বলিল, কেন, মা ?

নয়নতারা কহিল, বলি বাছা, তিনমাস পেরিয়ে চার মাসে প'ড়লো, বাড়ির ভাড়া দেখ্‌তে-দেখ্‌তে অনেকগুলি হ'য়ে জমে উঠ্‌লো ; আর বিধবারই বা চলে কেমন ক'রে ?...

হারাধন জানিত যে বলিবার অবসর দিলে কর্ত্রীর মুখ হইতে অনেক-কিছু কটু-কাটব্য নিঃসৃত হইয়া আসিবে—তাই তাড়াতাড়ি তাঁহার কথার গতিরোধ করিয়া বলিল, মা, যদি আমি একমার ছেলে হই......কি বলচি, ভুলেও মিথ্যে বল্‌বো না......এই টাকার জন্যে, সত্যি বল্‌চি মা, খেতে মুখে রোচে না, রেতে শুয়ে হু'চোখে একতিল ঘুম নেই, মা। কি কোরবো বলুন, বিল দিয়েছি—আজ তিনমাস.......জমিদারি সেরেস্তা...বেটাদের, আঠারো মাসে বচ্ছর কিনা! আ' মা, আপনার চরণ ধরে বল্‌চি, আজ আবার পাট্‌ওয়ারির হাতে ধরে বল্‌বো।

নয়নতারা বলিল, ও কথা ত' বাছা—সেই নাগাদ সুরু থেকেই শুন্‌ছি—এই ক'মাসে বোধ করি তেত্রিশ বার শুন্‌লুম ; একটা উপায় ত' করা চাই। তোমাদের ত' বোঝা উচিত বাপু,—যে এই টাকাই নেড়ে-চেড়ে আমাদের দিন চলে।—শেষ পর্য্যন্ত কি আমরা না খেয়ে থাক্‌বো ?......আর অন্যের বাকি রাখ্‌লে একদিনও চ'লে না।—এই দেখ না, মাস যেতে-না-যেতে মাষ্টারকে তো কড়ায়-ক্রান্তিতে তার পাওনাটি গুণে দিতে হলো।

হারাধন ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, সে কথা একশ'বার সত্যি মা। আপনি যা হুকুম করেন, তাই ক'রবো।—না হয় বৌএর ফুল দুটো বেচে ফেলি, বলেন ত ?

নয়নতারা এবারে একটু ঝাঁঝাইয়া উঠিয়া বলিল, তাই বা আমি ব'লতে যাব কেন ? কপালের দোষে এ-জন্মেত রাঁড়ি হয়েছি,—আবার এয়োস্তিরির গয়না বেচিয়ে—আস্‌চে জন্মের আশাটুকুও খুইয়ে বসবো ?

হারাধন অপ্রতিভ ভ্যাবা-গঙ্গারামের মত চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—না—না......

নয়নতারার বক্তৃতা এদিকে ছল্ ছল্ গতিতে বহিয়া চলিল, আর এও ত' বাপু তোমাদের বিচ্ছিরী অন্যায়, তোমাদের নিজের—দু'হাত পা থাক্‌তে—একটিবার তার কথা মনে পড়ে না—সব্বারির আগে ঐ কচি বৌটার গায়ের গয়না বেচার কথাই কি ছাই মনে আসে ?

আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া হারাধন বলিল, কি করি মা, উপায় না দেখ্‌তে পেয়ে দিশেহারা হ'য়ে ওকথা ব'লেছি, মাপ কর্‌বেন।

বাসন মাজিতে মাজিতে সুরবালা নয়নতারার দিকে সকৃতজ্ঞ-শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবিল, উনি বোধ হয় আর জন্মে আমার মা ছিলেন।

নয়নতারা বলিল, কিন্তু পুরুষ মানুষের এমন কথায়-কথায় দিশে-হারা হ'লেই বা চ'লবে কেন? তুমি ত' আর মুখ্‌খু সুখ্‌খু নও; এই সকাল বেলা মেয়ে মানুষের পিছনে-পিছনে না ফিরে—সত্যিই কি একটা ছেলে পড়ান খুঁজে নিতে পার না?

হারাধন কর্ত্রীর শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্যে অকস্মাৎ ভুলিয়া গেল যে কেনই বা সে স্ত্রীর পিছনে ফেরে। লজ্জিত হইয়া সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, তাই বা কে দিচ্ছে, মা?

নয়নতারা প্রায় ধমক দিয়া বলিল, খুঁজে কোনদিন দেখেছ কি? কেন—তুমি যদি দুবেলা একটু-আধটু ক'রে বিশুটাকে নিয়ে বোসতো—আমি চাইনি তোমার কাছে বাড়ির ভাড়া। বুঝবো যে একজন গরীব বামুনের উপর দয়াই করলুম।

হারাধন নিরুপায় বুঝিয়া তাহাতেই রাজি হইয়া গেল।

সুরবালা তাহার কাণের ফুল দুইটির আশু-রক্ষার কথা চিন্তা করিয়া সহসা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

(৪)

বিশ্ববন্ধুর মাষ্টার মশাই—রাজেন্দ্র ঘোষালের অনেক বয়স হইয়াছিল।

মাষ্টারিতে একদিন তাঁহার ভালই নাম ছিল। তিনি কবি বায়রণের কবিতা অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং বার্কের এমেরিকান ট্যাক্‌সেশন, তাঁহার আগা-গোড়া মুখস্ত ছিল।

কিন্তু এই সমূহ-পরিবর্ত্তনশীল সংসারে পাণ্ডিত্যের মাপ-কাঠির নিত্য বদল হইতেছে। হঠাৎ একদিনে বার্ক-বায়রণ একদম বাতিল হইয়া গেল।

নবাগত, খিট্‌-খিটে-মেজাজ বি-টি হেডমাষ্টারটি "আর্ট অভ টিচিং"এর উপর এমন বেতর জোর দিয়া বসিলেন—যে ঘোষাল মহাশয়ের মা-সরস্বতী আর কিছুতেই হালে পানি পাইলেন না।

তাহার উপর—তিনি ক্লাশে মারধোর একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন; ছেলেদের মঞ্চে খাড়া করিলে কৈফিয়ৎ তলব করেন। আরো উৎপাত। একটা মন্তব্যের খাতা খুলিয়া এমন সকল কঠিন ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন যাহাতে বোঝা গেল যে বৃদ্ধের চাকুরির আয়ু প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

তবুও লোকে মনে করিত যে চল্লিশ বছরের বুড়া-বটের অনেক শিকড়, ফুৎকারে উড়িয়া যাইবার নহে।

সেদিন নয়নতারার বাড়ি হইতে ফিরিয়া বৃদ্ধের যেন কি হইল। উষা বারবার তাগিদ দেয়, বাবা, তোমার যে দেরি হ'য়ে যায়। কিন্তু বাবা তেল মাখিয়া হুঁকা খাইতে খাইতে কেবলই ঘুমাইয়া পড়েন।

ফলে নাকে মুখে গুঁজিয়া খাইয়া হন্ত-দন্ত করিয়া ছুটিতে ছুটিতে স্কুলে পৌঁছিয়া দেখিলেন হাজ্‌রি বহির তাঁহার নাম-সহির স্থানে বড় কর্ত্তার লাল কালির ঢেরা পড়িয়া গেছে।

চাকুরি-জীবনে এতবড় অপমানের শেল ঘোষাল মশাইএর বুকে বোধ করি, এই প্রথম। কাজ করিয়াও সে-দিনের বেতন পাইবেন না, উপস্থিত থাকিয়াও অনুপস্থিত গণ্য হইবেন! এত বড় অসত্যের জবরদস্তি, তাঁহার মনটাকে তিক্ততায় পূর্ণ করিয়া দিল। দুই চক্ষু লঙ্কা ঘষিয়া দেওয়ার মত জ্বালা করিয়া মাথা-টিপ্‌টিপ্, গা-শির্‌-শির্ করিয়া শরীরটা একেবারে বে-এক্তার হইয়া পড়িল।

রাগে অভিমানে ঘোষাল মশাইএর মনটাও কেমন বেতালা হইয়া গেল—তিনি একখানা কাগজে, শরীর-অসুস্থতার অজুহাতে বাড়ী চলিলেন—লিখিয়া দিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যথাকালে, ভরা-সন্ধ্যার সময় ব্যাঘ্রের সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল; একখানা লম্বা মোড়কের মধ্যে জরুরী চিঠি!

স্কুলের সম্পাদক জানাইয়াছেন :—

যেহেতু স্কুলের স্বার্থে তোমাকে, তোমার কাজের হিসাবে আমরা, অতি বৃদ্ধ এবং একান্ত অপটু বিবেচনা করিতেছি, অতএব অনুরোধ করি যে আগামী কল্য হইতে স্কুলে না আসিয়া বাধিত করিবে।

এই পত্র প্রাপ্তির পর—আইনতঃ তোমার যাহা কিছু পাওনা হইবে—তাহা হিসাব করিয়া তোমাকে দিবার আদেশ, যথাযোগ্য ব্যক্তিকে করিলাম।

চিঠি পাইয়া তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল; বিছানায় শুইয়া সমস্ত রাত্রি এপাশ-ওপাশ করিয়া বিনিদ্রায় কাটিয়া গেল।

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া তিনি সেক্রেটারির বাড়ী রওনা হইয়া গেলেন।

আশা ছিল—হাতে, পায়ে ধরিলে হয়ত আরো ছয় মাসের সময় পাইতে পারেন।

পথ অতিক্রম করিতে করিতে কি বলা উচিত এবং অনুচিত তাহা মনে মনে সাজাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে নানা তর্ক জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। কোথায় তাহাদের খেই কিছুতেই ভাবিয়া বাহির করিতে পারেন না।

মনে হইল, ছয় মাসের সময় প্রার্থনা কোন প্রকারে অযৌক্তিক হইবে না, কেন না :

প্রথমতঃ—উষার বিবাহের ঋণ পরিশোধ করিতে তখনো বাকি ছিল—একশত।

দ্বিতীয়তঃ—স্ত্রীর অসুখের দরুণ ঔষধের দোকানে দেনা জমিয়াছিল মোবলক, পঁইষট্টি।

অবশ্য—উষা তাঁহার পর বিধবা হইয়াছে এবং স্ত্রীও দেড় বৎসর ভুগিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

তাহাতে কি?—কোন্ মহাজন এই অজুহাতে ঋণ মাফ্ করে?

এবং কেমন করিয়াই বা তিনি সেই অনুরোধ তাহাদের করিতে যাইবেন?

অতএব প্রমাণ হইল যে তাঁহার আরো ছয় মাসের সময় পাওয়া একান্ত আবশ্যক।

বিহ্বলতায় অধীর হইয়া বৃদ্ধ বিপর্য্যস্তভাবে এই সব চিন্তা করিয়া কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছিলেন না। একবার আশা হইতেছিল, গুছাইয়া জুৎ-মত করিয়া বলিতে পারিলে হয়ত রায় বাহাদুরের দয়া হইতে পারে। পরক্ষণেই কালো মেঘের মত নিরাশা তাঁহার মনের দিগদিগন্ত ছাইয়া দিতেছিল।

রায় বাহাদুরের গৃহে প্রবেশ করিয়াই কিন্তু সকল আশা সহসা চূরমার হইয়া গেল। রায় বাহাদুরের পার্শ্বে হেড মাষ্টার খাড়া হইয়া বসিয়া ছিলেন।

তবুও ঘোষাল মশাই কিছুই ত্রুটি রাখিলেন না, দুইকর জোড় করিয়া বলিলেন, আজ আপনারা যুগলে দয়া করুন·········

টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে সস্মিতবদনে, বিদ্রূপকঠোরকণ্ঠে রায় বাহাদুর বলিলেন, দয়া, বুঝেছেন কিনা, ঘোষাল মশাই?—অনেক দেখান হয়েছে,—এতদিন; আর কিছুতেই চল্‌বে না। আপনাকে রাখ্‌লে হেড মাষ্টার বলেন ইস্কুল উঠে যাবে।

কম্পিতকণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন, এই চল্লিশ বছোর—কণ্ঠে ধ্বনি বদ্ধ হইয়া গেল, জল-ভারাবনত দুই চক্ষু বুজিয়া তিনি শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে স্পষ্টাক্ষরে শুনিতে পাইলেন—অতি কর্কশকণ্ঠে হেড মাষ্টার বলিতেছেন—হিপক্রীট্—প্রকাণ্ড ভণ্ড।

(৫)

পরদিন প্রাতে নয়নতারা বিশ্ববন্ধু এবং তাহার নূতন মাষ্টারকে লইয়া কঠিন পাহারা দিতেছিল।

চির-অনভ্যস্ত কাজে হারাধনের মন যেন কিছুতেই বসে না। একবার করিয়া সে পলায়নোদ্যত মনটিকে ধর-পাকড় করিয়া নূতন কর্ত্তব্যের মধ্যে টানিয়া আনে—আবার কখন কোন্ ফাঁকে তাহা ছুটিয়া সুরবালার কাছে উপস্থিত হয়। কেমন করিয়া একাকী নয়টার মধ্যে রান্না শেষ করিতে সে পারিয়া উঠিবে? দেরি ত' অবশ্যম্ভাবী। অতএব আজ হইতে বেণী মোক্তারের পোয়াবার-তের। এই কথা ভাবিয়া—তাহার সমূহ চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিতেছিল।

এদিকে পুরাতন মাষ্টারের অভাবে বিশ্ববন্ধুর যেন সবই ফাঁকা ঠেকে। তাহার উপর, নয়নতারা তখন থাকিত নেপথ্যে—এত কাছাকাছিতেও সে যেন সমূহ অস্বস্তি বোধ করিল।

হারাধন কিছু গুরুগম্ভীরচালেই কাজ সুরু করিয়াছিল—তাই বিশ্ববন্ধুর কেমন ভয়-ভয় করিতেছিল; যেন কিছুতেই এই মাষ্টারকে খুসী করিতে পারা যায় না।

তাহার হাতের লেখার খাতা দেখিয়া সে-মাষ্টার বলিতেন, বাঃ বাঃ কি চমৎকার ! কি সুন্দর ! তাই সে তাড়াতাড়ি সেই খাতাখানি খুলিয়া ধরিয়া প্রশংসার প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল।

হারাধনের কিন্তু বাঁক-চোরা—খগাবগা অক্ষর দেখিয়া পিত্ত চটিয়া গেল। পাতাখানির একদিক হইতে অপরদিক পর্য্যন্ত লাল-কালির "ঘ্যাচ" টানিয়া দিয়া, ধমক দিয়া বলিল—এ কিচ্ছু হয়নি—আবার লিখে আন্।

ভয়ে বিশ্ববন্ধুর তালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিল।

নূতন শিক্ষকের রাশ-ভারি তর্জ্জন-গর্জ্জনে কিন্তু নয়নতারা অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিয়াছিল। এমন হাঁক-ডাক নইলে মাষ্টার ! যেন বনের আস্ত জীবন্ত বাঘটি। প্রসন্নচিত্তে সে তুলনা করিয়া দেখিতেছিল ; ইস্ ! কি ভালই হয়েছে ; কোথায় পনর টাকায়—মাত্র এক বেলা ; আর স্যাড়ে পাঁচে দু-বেলা। ইস্ কি ভালই হয়েছে ; নিজের বুদ্ধির সে অনেক তারিপ করিল। খুসীতে তাহার মনটি ভরিয়া উঠিল—এবং চক্ষু দুইটা ঝক্-ঝক্ করিতে লাগিল ;

ঠিক সেই সময়ে বাহির হইতে ক্ষীণকম্পিতকণ্ঠে ডাক শুনা গেল ; বিশ্ববন্ধু, বিশু বাবু···

বালক লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, ওই আমার ভালো মাষ্টার—ওর কাছে আমি পড়বো।

সে ছুটিয়া গিয়া ঘোষাল মশাইএর কাপড় ধরিয়া সাগ্রহে আহ্বান করিল, এসো , এসো ; এদিকে······

অবোধ বালকের নির্ব্বুদ্ধিতায় এত বড় কায়েমি বন্দোবস্তটা বুঝি বা উল্টাইয়া যায়—মনে করিয়া নয়নতারা অতিমাত্র ব্যতিব্যস্ত হইয়া তীব্র চীৎকার করিয়া বলিল, হারাধন, ওঁকে যেতে বল, কাজ নেই আমার ওঁকে দিয়ে। যান্ না উনি সদরালাদের ছেলে পড়াতে।—বলে দাও, ওঁকে আমার আর কোন দরকার নেই—হারাধন, ওঁকে যেতে বল—ওঁকে কোন দরকার নেই·········

অবাক হইয়া ঘোষাল মশাই একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, বেশ, ব্যস্ত হবেন না, আমি যাচ্ছি।

পথের বাহির হইয়া পা-দুইখানা তাঁহার কিছুতেই আর বশ মানে না। কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিবার সময় কোথায় ? তাঁহার চক্ষের সম্মুখে হঠাৎ একটা অন্ধকারের আচ্ছাদন নামিয়া আসিল।

তিনি অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন—তাইতো কোন্ দিকে যাই ? কিন্তু দাড়ানও

যায় না—তখনো যেন পিছন হইতে বলিতেছে—ওঁকে যেতে বল, ওঁকে যেতে বল—কাজ নেই, ওঁকে যেতে বল…

কালো পর্দ্দাটা দুই হাত দিয়া সরাইবার সময় অলক্ষ্যে নিজের চক্ষের জলের স্পর্শ অনুভব করিয়া বলিলেন—এ যে জল। নদী নাকি?

নদী!

মনে হইল হয়ত ইহার পর-পারে কত চেনাপরিচিত লোক—তাঁহাকে ডাকিয়া লইতে বসিয়া আছে।

তখন একটি সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ দুই চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায়—ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করিয়া ডাকিলেন ঃ

মাঝি! মাঝি! আর দেরি করিস্‌নে—মাঝি! মাঝি! নৌকা আন——!

(৬)

বহুলোক ধরাধরি করিয়া ঘোষাল মশাইকে যখন গৃহে আনিল—তখন আর কিছুমাত্র জ্ঞান-চৈতন্য নাই।

অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া অরুণ ডাক্তার বলিল, দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তায় মাথার ভেতরের শির ছিঁড়ে গেছে। অনবরত বরফ দেওয়া ছাড়া আর কিছু উপায় নেই।

উষা টাকার ছোট ব্যাগটি খুলিয়া দেখিল তাহাতে আছে—মাত্র কয়েকটি পয়সা।

বাহিরে আসিয়া দেখিল, ভিড় সরিয়া গেছে—কেবল ও-বাড়ির নিতাই একখানা পাখা লইয়া সজোরে ঘোষাল মশাইএর মাথায় বাতাস দিতে ছ।

সে বাষ্প-জড়িত স্বরে বলিল, নিতাই দাদা, বরফ এনে দিতে হবে যে।

নিতাই বলিল, দেবো ; কিন্তু তুই কি একলা থাকৃতে পারবি ?

উষা এতক্ষণ যেন ব্যাপারটা ঠিক করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। নিতাইএর কথায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া গেল—তবে কি বাবা আর বাঁচবেন না? তাহার কান্না আর কিছুতেই থামিতে চায় না।

নিজেকে সম্বরণ করিয়া নিতাই বলিল, ছিঃ উষা, কাঁদিস্ নে। বিপদের সময় অধীর হ'স্‌নে বোন্। তুই এমন ক'রলে কে জেঠা-মশাইকে সেবা ক'রবে? তোর সেবাতেই উনি ভাল হ'য়ে উঠ্‌বেন যে, ভাই।

চক্ষু মুছিয়া উষা বলিল, তবে আর আমি কাঁদবো না নিতাইদাদা, তুমি একটু বোসো আমি মনের কথাকে ডেকে আনি গে।

ক্ষিপ্রপদে সে বাহির হইয়া গেল।

হারাধন আদালতে চলিয়া যাওয়ার পর সুরবালা খাইয়া মুখ ধুইতেছিল। উষা ছুটিয়া

গিয়া বলিল, মনের কথা! শীগ্‌গীর দুটো টাকা দে—আর আমাদের বাড়ি চল্; বাবার বড় অসুখ করেছে ভাই,—তাঁর মাথায় বরফ দিতে হবে।

সুরবালা আকাশ হইতে পড়িল, বলিস্ কি? সে কি লো, এইতো তাঁকে দেখলুম্ রাস্তা দিয়ে আস্তে-আস্তে বাড়ি যাচ্চেন। কখন অসুখ হলো?

উষা বলিল, পথেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেন। অরুণদাদা বল্লেন, ভাবনায়-ভাবনায় মাথার ভেতরের শির ছিঁড়ে গেছে।

সুরবালা বাক্স পাতি পাতি করিয়া খুঁজিল, মনের কথা ভাই—টাকা যে একটিও পাইনে।

নেই? উষার গৌর মুখখানি সহসা কালো হইয়া গেল,—কি হবে ভাই! বাবা কেমন ক'রে বাঁচবেন? নিতাই দাদা ব'সে আছেন, আমরা গেলে বরফ এনে দেবেন।

সুরবালা নিবিড়ভাবে চকিতে কি যেন ভাবিয়া লইল—তাহার পর কাণের একটি পাথর বসান ফুল খুলিয়া বলিল, ভয় কি মনের কথা! টাকার জন্যে ভাবনা নেই! চল্, আর দেরী ক'রে কাজ নেই ভাই।

উষা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, ওকি! তুই কাণের ফুল দিবি?

দেব না ত কি? বাবার চাইতে কি কাণের ফুলটা বড়, মনের কথা?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

চোর ?

অ্যাঁ, আমি চোর?

কি আশ্চর্য্য, এখনো সন্দেহ করছি? প্রকাশ্য আদালতে হাতে-নাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে গেল যে জর্ডন কোম্পানীর কেসিয়ার আমি শ্রীসতীশচন্দ্র দাস গত ৭ই বৈশাখ রাত্রে কোম্পানীর তহবিল ভেঙে পাঁচ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছি—তবু সন্দেহ?

কিন্তু কেন এ সন্দেহ? এর মধ্যে কি কোনো গলদ আছে? না! না! বিচার ঠিকই হয়েছে। যাঁরা এই বিচারে সাক্ষী ছিলেন তাঁরা সকলেই গণ্যমান্য আমার শ্রদ্ধাভাজন;—পুলিশের শেখানো সাক্ষী নয়। তাঁরা এই চুরি-সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছেন তার এক-বর্ণও মিথ্যা নয়—এ আমি চোর হয়েও হলফ্ কোরে বলতে পারি। তাঁদের জবানবন্দী শুনতে শুনতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমার নিজের মনেই সেদিন বিশ্বাস হয়েছিল আমি সত্যই চোর—তবে বিচারকের অপরাধ কি!

যাঁরা আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ তাঁরা আমার প্রতি ভালোবাসার অন্ধ মোহে এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না যে আমার মতো নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তি হীন চোর হতে পারে। তাঁরা

স্থির করেছেন এই ব্যাপারটার মধ্যে নিশ্চয় কোনো ষড়যন্ত্র আছে—এ আমার আপিসের কোনো শত্রুপক্ষের কাজ! কিন্তু হায়, তাঁরা আত্মপ্রবঞ্চনা করছেন; তাঁরা দেখেও দেখ্ছেন না আপিসে আমার কেউ শত্রু নেই—সবাই আমার এ বিপদে মর্ম্মাহত—মৌখিক নয়, আন্তরিক; কারণ আমি যে তাদের সকলেরই প্রিয় ছিলুম, কারো সঙ্গে কখনো দুর্ব্ব্যবহার করিনি—কারোর উন্নতির পথে কখনো অন্তরায় হইনি কোনো দিন।

তবু আমার উকিলরা এই ষড়যন্ত্রের কল্পনাটাকে ভিত্তি কোরে আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের একটা অনাবিষ্কৃত পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন—যদিও তাঁরা মনে-মনে ভালো রকমই জানেন যে আমি সম্পূর্ণ দোষী। তুচ্ছ কটা টাকা খেয়ে সৎ অসৎ যে উপায়ে হোক এঁরা আমার মান বাঁচাতে বদ্ধপরিকর। হায়, এদের হাত থেকে দান গ্রহণ কোরে আমার মান বাঁচাতে হবে! আমি যে জেলের আসামী, এদের চেয়ে আমারও দেখছি লজ্জা আছে!

এই সব নির্ল্লজ্জ উকিলের দল যখন সরল সত্যবাদী সাক্ষীদের কথাগুলোকে জেরার ফুস্‌মন্তরে একেবারে মিথ্যা কোরে তোলবার চেষ্টা করছিল তখন সত্যই আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলুম এদের কাণ্ড দেখে! এরা করছে কি? একজন চোর, তার মান বাঁচাতে গিয়ে এরা অবলীলাক্রমে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের মিথ্যাবাদী বোলে অপমান কোরে যাচ্ছে। তখন আমি মনে মনে এই প্রার্থনা করেছিলুম—হে হরি, এ-বিপদ থেকে আমার বেঁচে কাজ নেই—এঁদের গায়ে যেন কলঙ্কের আঁচ না লাগে! আমার জন্যে এই সরল সত্যবাদীদের আজ এ কী লাঞ্ছনা!—সত্যকে মিথ্যা বোলে প্রমাণ করতে পারলে হয় ত মান বাঁচে, প্রাণ বাঁচে কিন্তু সত্যকে যারা অপমান করে—থাক, আমার মুখে এ সব বড় কথা আজ আর শোভা পায় না। যে চোর তার মুখে এত ধর্ম্ম কথা কেন?

কিন্তু সত্যই কি আমি চোর? অন্তর্যামী জানেন এ জীবনে কখনো কারো একটি কাণা কড়িও চুরি করিনি। জগতের চক্ষে আমি ঘৃণিত লাঞ্ছিত অস্পৃশ্য চোর কিন্তু হে ঠাকুর, তুমি জান আমি নিষ্পাপ—ধর্ম্মাধিকরণের বিচারে আমার পাপ প্রমাণিত হয়ে গেলেও তোমার চক্ষে আমি নিষ্পাপ!

কিন্তু এ কি বিড়ম্বনা? আমার বুকের দেবতা অন্তর থেকে ঘোষণা করছেন—আমি নিষ্পাপ, আমি নিষ্কলঙ্ক, আমি চোর নই! অথচ আমি যখন ভেবে দেখ্ছি, বিচারালয়ের সমস্ত দৃশ্য যখন চোখের উপর ভেসে উঠছে, আমার বিপক্ষে সমস্ত প্রমাণগুলোকে নিংড়ে-নিংড়ে পরখ করছি তখন তো জোর গলায় বলতে পারছি না—চোর নই, আমি চোর নই! হাঁ, চুরি তো আমিই করেছি! নইলে ঐ জ্বলন্ত প্রমাণগুলো কি মিথ্যে? সমস্ত কাহিনী আগাগোড়া শুনলে কেউ বল্‌বে না মিথ্যে! তবু তীব্রকণ্ঠে আমার অন্তরাত্মা বলছে—ওগো আমি চোর নই, নই!

এ দুর্ভেদ্য রহস্য কি ?

এক' 'একবার সন্দেহ হচ্ছে আমার মাথা ঠিক আছে ত ? নইলে এমন পরস্পর-বিরোধী চিন্তা আমাকে এমন ভারাক্রান্ত করছে কেন ? নইলে একই সঙ্গে আমি চোর এবং চোর নই এই দুই বিশ্বাসই এত প্রবলভাবে আমাকে অধিকার করছে কেন ? মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা এ অবস্থার কি সংজ্ঞা দেবেন জানি না কিন্তু এটা ঠিক যে আমি এখনো পাগল হইনি। যিনি যাই বলুন।

আচ্ছা, আমার নিজের মনের বিশ্বাসের কথা না-হয় ছেড়েই দিলুম, কিন্তু আমার গুটি-কয়েক অন্তরঙ্গ আত্মীয় তাঁরা কেন অন্তরের সহিত স্বীকার করতে পারছেন না যে আমি চোর ? তাঁদের চোখের সামনে তো নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয়ে গেছে আমার চুরির সমস্ত খুঁটি-নাটি। চুরির টাকা, সে তো আমারই বাড়িতে আমারই হাত-বাক্স থেকে বেরিয়েছে ; তবু তাঁদের এ অন্ধ-বিশ্বাস কেন ?......

এ কি ভালোবাসার মোহ ? ভালোবাসা কি এতই অন্ধ ? সে কি দিনকে রাত করে ? না, এর মধ্যে আরো কিছু রহস্য আছে ?......

আমার এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের দিনে আমার প্রতি অনেকের চাহনির রং দেখছি বেশ বদ্‌লে গেছে—তাঁদের চোখ আমার প্রতি একটা তীব্র ঘৃণায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে কারো কারো বা ক্রূর আহ্লাদের একটু আভাও থেকে-থেকে উঁকি দিচ্ছে ; কিন্তু আমার এই গুটিকয়েক আপন-জনের চাহনি দিনে-দিনে কেন এমন একটি নির্ম্মল স্নেহের ধারায় এমন অভিষিক্ত হয়ে উঠছে ? আমার দুর্ভাগ্যের প্রতি কি এ তাঁদের করুণা মাত্র ! ওগো না গো না, এ পৃথিবী এত নিষ্ঠুর নয়।

কি দেখছি ? এঁদের চোখে কি দেখছি ? দেখছি আমার প্রতি—আমার দেহ-মন-চরিত্রের প্রতি একটি অটল বিশ্বাস এক টুকরো নিখুঁৎ হীরের মতো গভীর রাতে শুক্‌তারার মতো জ্বল্ জ্বল্ করছে ! এর আলো কোথাও এতটুকু ম্লান হয়নি। এই বিশ্বাস—এ কি একেবারে ভূয়ো জিনিষ ? এর কি কোনো ভিত্তি নেই ? বাইরের ঘটনার পারম্পর্য্যে যা প্রমাণ হয়ে যায় তাই প্রমাণ, আর অন্তরের বিশ্বাস যা অস্বীকার করে, তা কিছুই নয় ? সে কি শুধু ভ্রম-মাত্র ?...... মায়া ?......

তাঁদের এই বিশ্বাসের মূলে কি আমি নেই—একটা জলজ্যান্ত মানুষ ?—যে-আমি দিনে-দিনে পলে-পলে আমার আমিত্ব নিয়ে তৈরি হয়ে উঠেছি ? যে-আমি বিপদে-সম্পদে, হাসিতে-কান্নায়, আলোকে-আঁধারে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, গ্রহণে-ত্যাগে, স্নেহে-ভালোবাসায়, ভক্তিতে-ঘৃণায়, ঈর্ষায়-রাগে, লোভে-ক্ষোভে—এমনিতর সহস্র খুঁটিনাটিতে দিনে দিনে তাঁদের চোখের সামনে পরিপূর্ণ হয়ে-উঠেছে—সে কি কিছুই নয় ?—সে কি মিথ্যা ? তার এতদিনকার অস্তিত্ব কি এক মুহূর্ত্তেই ঐ জর্ডন কোম্পানীর ক্যাসঘরের টাকার স্তূপের মধ্যে কবরিত হয়ে গেল ?

কয়েক খণ্ড রূপিয়ার রূপের ঝলকে সে কি চিরদিনের জন্য ভস্মীভূত হয়ে গেল ?—এ কি সম্ভব ? এ কি বিশ্বাস হয় ? আমার তো হয় না—আর হয় না ওঁদের, যাঁরা আমার সঙ্গে এক-মন, এক-প্রাণ। তাঁরা আমারই মতো দুঃখে-লজ্জায় নিপীড়িত হয়ে পড়েছেন বটে কিন্তু অন্তরের বিশ্বাস হারাতে পারছেন না। এই বিশ্বাসের শতদলের উপর যে-অন্তর্য্যামী বিরাজ করছেন, তাঁর ঐ আসন পুলিশ-কোর্টের বিচার-দণ্ডের আঘাতে কৈ একটুকুও তো হেল্‌ছে না। তবে আমার এ চুরির ব্যাপারটা কি ?......কে এ রহস্য ভেদ করবে ? এই হাঁ-না দুটো প্রবল দৈত্যের দ্বন্দ্ব কেমন কোরে মেটাবো ?—আমি যে অস্থির হয়ে উঠেছি।

দূর হোক দ্বন্দ্ব না হয় দ্বন্দ্বই রয়ে গেল......মীমাংসা না-হয় নাই হোলো......যা-হবার তাই হোক্......মিছে ভাবি কেন ? কিন্তু কী—কোন্‌টাকে আমি মেনে নেব—আমি চোর, না চোর নই ?......

দেখা যাক্, সমস্ত ঘটনাটাকে একবার আলোচনা কোরে। জর্ডন কোম্পানীর ক্যাস-ঘর থেকে চুরি হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই......পুলিশ আমার বাড়ি খানা-তল্লাসি করেছে ......তারপর আমার হাত-বাক্স থেকে পাঁচ হাজার টাকা বেরিয়েছে..... সে টাকা আমার নয় ......জর্ডন কোম্পানীর......কারণ জর্ডন কোম্পানীর হারানো নোটের সঙ্গে আমার বাক্সয়-পাওয়া নোটের নম্বরের মিল আছে.......আমি স্বীকার করেছি ঐ নোটগুলো আমিই আমার বাক্সয় রেখেছিলুম......এবং সে-কথা সত্য......তবে আমি চোর নয় ত কি ? কিন্তু তবু সন্দেহ ? এ সন্দেহের মূল কোথায় আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটা একবার তল্লাস কোরে দেখা যাক্।

সেদিন শনিবার ; ৭ই বৈশাখ। সন্ধ্যাবেলা কোম্পানীর ক্যাস মিলিয়ে লোহার সিন্দুকে তুল্‌ছি এমন সময় বড় সাহেব আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। তিনি প্রতিদিনই এই সময় আসেন, ক্যাস্ মিলিয়ে, খাতায় সই কোরে, টাকা সিন্দুকে তুলে চাবির তোড়া নিয়ে তিনি চলে যান। এতক্ষণ পর্য্যন্ত ক্যাসের সমস্ত ঝক্কি আমার, বড় সাহেবকে বুঝিয়ে দিলেই আমি খালাস—টাকাকড়ি তখন সবই তাঁর জিম্মায়—চাবিও তাঁর হাতে।...

আমার বেশ মনে আছে সেদিন আমাদের মোট আদায় একান্ন হাজার নয় শত পনের টাকা। তার মধ্যে দশখানা নোট হাজার টাকার, চারশত নোট একশো টাকার, একশো একানব্বইটা নোট দশ টাকার এবং খুচরা পাঁচ টাকা। এই সমস্ত নোট ও টাকা সাহেবকে বুঝিয়ে দিয়ে সেগুলো সিন্দুকের মধ্যে যথাস্থানে সাজিয়ে রেখে দিলুম। তারপর সিন্দুক বন্ধ কোরে তার চাবি সাহেবের হাতে দিলুম। তিনি সিন্দুকের হাতলটা সজোরে টেনে একবার দেখলেন সিন্দুক ঠিক বন্ধ হয়েছে কিনা। প্রত্যহই এইরকম হয়। অন্যদিন সাহেব চাবি হাতে পেলেই চলে যান, আজ আমার পাশের একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। আমায় বল্লেন—"বোসো সতীশ।" আমি বসতেই তিনি আবার বল্লেন—"দেখ দাস, আমি বিশেষ

দুঃখিত তোমায় জন্যে—তোমার যে-আশা দিয়েছিলুম তা কিছুতেই রক্ষা করতে পারলুম না ; ডিরেক্টররা কোনো মতেই তোমার আবেদন মঞ্জুর করতে রাজি হলেন না— এজন্য আমি ভারি দুঃখিত।" বোলেই তিনি আমার মুখের দিকে চাইলেন। দেখলুম বিফলতার আঘাতে তাঁর সদা-প্রফুল্ল চোখ দুটি আজ একেবারে নিষ্প্রভ। সেই চোখের দিকে চেয়ে আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আস্‌তে লাগলো ; খানিকক্ষণ আমি কোনো কথাই কইতে পারলুম না। আমার বড় আশা ছিল আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে। বড়-সাহেবও সেই ভরসা দিয়েছিলেন। সেই আশায় নির্ভর কোরে আমি কার্য্যে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি এখন হঠাৎ এই আশা-ভঙ্গের কথাটা আমার মাথায় বজ্রাঘাতের মতো এসে পড়লো—আমি চারিদিক অন্ধকার দেখতে লাগলুম।

সাহেব বল্লেন—"ও কি দাস, তুমি যে একেবারে মড়ার মতো বিবর্ণ হয়ে গেলে। নাও, বুকে বল নাও। পুরুষবাচ্ছা এত-অল্পে এমন ভেঙে পড়লে কি চলে ? একেবারে হতাশ হচ্ছ কেন ? কিছুদিন অপেক্ষা কর, আমি আবার তোমার জন্য চেষ্টা করব।" বলেই তিনি আমার কাঁধের উপর দুটো জোর থাবড়া দিয়ে আমার দেহে-মনে যেন বল এনে দেবার চেষ্টা করলেন।

আমি শুষ্ক কণ্ঠে বল্লুম—"ধন্যবাদ।"

সাহেব বল্লেন—"ধৈর্য্য ধর সতীশ, কিছু ভাবনা কোরোনা, সব ঠিক হয়ে যাবে।" এই বোলে তিনি আমায় নানা রকমে প্রবোধ দিতে লাগলেন।

সাহেব আমায় ভালোবাসতেন—সে পরিচয় অনেকবার অনেক রকমে আমি পেয়েছি। আজ আমার প্রতি তাঁর এই স্নেহের সম্ভাষণ, তাঁর এই আশার বাণী আমাকে আরো ভালো কোরে বুঝিয়ে দিলে তিনি আমায় কতটা ভালোবাসেন! কিন্তু তবু আমি শান্ত হতে পারলুম না। হায়, আমার শান্ত হবার উপায় কৈ ?......

সাম্‌নের সপ্তাহে আমার মেয়ের বিয়ে—সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে। হাতে এক-পয়সা পুঁজি নেই, তাই আপিস থেকে দু-হাজার টাকা ধার চেয়েছিলুম, মাসে-মাসে মাইনে থেকে কিছু-কিছু কাটান্ দিয়ে শোধ করব। আমি অনেক দিনের বিশ্বাসী চাকর ; আজ বিশ বৎসর একাদিক্রমে হাড়ভাঙা পরিশ্রম কোরে এই জর্ডন কোম্পানীর ক্যাসের কাজ সমাধা কোরে আসছি, কোথাও একটু গলদ হতে দিই নি। নিজের দেহকে দেহ-জ্ঞান করিনি, নিজের বিপদ-আপদ গ্রাহ্য করিনি পাছে কোম্পানীর কাজের ক্ষতি হয় ; ভেবেছিলুম এর তো একটা প্রতিদান আছে, সেটুকু পরিশোধ করতে কি কোম্পানী কার্পণ্য করবে ? তার উপর বড়-সাহেব আমার পক্ষে। তাই মনে-মনে খুব জোর আশা করেছিলুম, আমার এই বিপদের দিনে এই সামান্য প্রার্থনা মঞ্জুর হবেই। একরকম ধরেই নিয়েছিলুম মঞ্জুর হয়েই গেছে। তাই ভরসা কোরে মেয়ের বিয়ের সমস্ত ঠিক কোরে ফেলেছি। এমন-কি সেকরাকে গহনা

গড়াতে দেওয়া হয়েছে, সে আজ বাদে কাল জিনিষ নিয়ে আসবে, তার দাম চুকিয়ে দিতে হবে। দান-সামগ্রীর আসবাব-পত্র কেনা হয়েছে, তার বিল আমার পকেটে, আজই তার দেনা শোধ করবার কথা। গায়ে হলুদের আর পাঁচটি দিন এবং বিয়ের মাত্র সাতটি দিন বাকী...... চারিদিকে টাকা খরচ......হাতে একটি পয়সা নেই......ভরসা ছিল এই আপিসের টাকা...... তারই আশায় বুকে বল বেঁধে আমি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছি......এখন সে-ভরসাও গেল..... করি কি? উপায় কি?......জর্ডন কোম্পানী শেষ মুহূর্ত্তে যে এমন কঠিন হয়ে আমায় উপেক্ষা করবেন, সে-কথা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি......

বড়-সাহেব কখন উঠে চলে গেছেন আমি জানতেও পারিনি......আমি চুপ-কোরে একা মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলুম। উঠে যে বাড়ি যাই এমন ইচ্ছেটুকু পর্য্যন্ত মনে হচ্ছিল না। এমন একটা অবসন্নতা আমায় গ্রাস করছিল যে বোধ হচ্ছিল যেন আমার সমস্ত দেহটা একটু একটু কোরে অচল পাথরের মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হয়ে আসছে।.....

বিয়ের দিনকার একটা লোমহর্ষক চিত্র জ্বলন্ত রেখায় চোখের সামনে জেগে উঠতে লাগলো—বায়াস্কোপে যেন একটা দক্ষ-যজ্ঞের ব্যাপার দেখতে লাগলুম। অন্দরমহল থেকে একটা চাপা কান্নার শব্দ কানে এসে বাজতে লাললো......বর-পণের টাকা দেওয়া হয়নি বোলে বরের বাপ কেবলই আমাকে চোর চোর জোচ্চোর বলে ভীষণ শব্দে গাল পাড়ছে...... বরকে বরণের পিঁড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে......আমার বাধা দেবার শক্তি নেই.......আমি নির্ব্বাক কণ্ঠে ফ্যাল্-ফ্যাল্ চোখে তাকিয়ে তাই দেখছি। বরযাত্রীরা টিট্‌কারি দিচ্ছে - হাহা হো হো! স্যাকরার লোক ক্রমাগত শাসাচ্চে, এখনই টাকা না পেলে সে পুলিশ নিয়ে আসবে ......তাকে কোনো জবাব দিতে পারছি না। চারিদিকে পাওনাদারের দল বিকট চীৎকার লাগিয়েছে—টাকা, টাকা, টাকা নিয়ে এসো! কিন্তু কোথায় পাব টাকা? স্ত্রীর গায়ে গহনা নেই, নিজের একখানা বসত-বাড়ি নেই যে বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়ে আসব! কে এমন সুহৃৎ আছে যে এই বিপদে টাকা ধার দিয়ে আমায় উদ্ধার করবে? ......আমার এমন-কি সম্পত্তি আছে যে তাই দেখে লোকে আমায় টাকা ধার দেবে? তবে উপায় কি? উপায় কি? যতই ভাবতে লাগলুম একটা নিরুপায়ের তীক্ষ্ণ শেল তার কঠিন ফলা দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ডটাকে বিঁধতে লাগলো।......উঃ কি ভীষণ যাতনা......

টং টং কোরে ঘড়িতে আটটা বাজলো। বুকের ভিতর থেকে একটা শুষ্ক কান্না দীর্ঘশ্বাসের মতো বেরিয়ে এলো......উপায় কি?.......বিয়ে বন্ধ হয়ে যাক্......যা হবার হবে।

কিন্তু অনেক কষ্টে পাত্র জুটিয়েছি; খুঁজে-খুঁজে হয়রান হয়েছি, কেউ পাঁচ সাত হাজারের কম হাঁকেনি। এই ছেলেটি ভালো, দামও কম। এ যদি হাত-ছাড়া হয় আবার পাব কোথা? উঃ, আবার সেই গোড়া-থেকে আরম্ভ করা! আবার সেই ছেলের খোঁজে দ্বারে-দ্বারে

ভিখারীর মতো ঘুরে বেড়ানো—লোকের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে। কতদিনে নিষ্কৃতি পাব কে জানে। গৃহিণীর গঞ্জনা, সারা রাত অনিদ্রা, সর্ব্বক্ষণ দুশ্চিন্তা - এই সমস্ত নরক-যন্ত্রণা একটি-একটি কোরে আবার সহ্য করতে হবে? না, না, সে পারব না পারব না!

তা-ছাড়া বিয়ের সমস্ত কথাবার্ত্তা বরের বাপের সঙ্গে পাকা কোরে এসেছি—দিন পর্য্যন্ত স্থির; এখন কথা ফেরাই কেমন কোরে? বরের বাপকে যে বড় জোরগলায় বোলে এসেছি—বর-পণ পাঁচশো টাকাই দেবো। তিনি বলেছিলেন—কথা ঠিক তো! আমি বড় স্পর্দ্ধা কোরে বলেছিলুম, আমাদের বংশে কখনো কথার বেঠিক হয় না। তিনি সে-কথা শুনে একটু মুচ্‌কে হেসেছিলেন; সে-হাসিতে তখন মনে-মনে রাগ করেছিলুম; কিন্তু সে-হাসি এখন তীক্ষ্ণ ছুরির মতো আমার সর্ব্বাঙ্গে খোঁচা দিতে লাগলো—বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে! না, না—আমি তাঁকে কিছুতেই বল্‌তে পারব না, টাকার অভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলুম না।' তার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভালো—হ্যাঁ গলায় দড়ি দিয়ে!....

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম—আর চুপ কোরে বসে থাকতে পারলুম না; ঘরের জিনিষপত্রগুলো উল্টে-পাল্টে হাতড়ে-হাতড়ে কি যেন একটা খুঁজতে লাগলুম—বুঝি কোনো একটা উপায়...কিম্বা গলায় দেবার জন্যে এক গাছা দড়িই হবে, কে জানে?

খুঁজতে-খুঁজতে একটা জিনিষ হাতে লেগে ঝনাৎ কোরে উঠলো...এক গোছা চাবি! তুলে দেখি ক্যাস-ঘরের লোহার সিন্দুকের চাবি। কোথা থেকে এ-চাবি এলো এখানে? কে আনলে? কে এখানে এমন কোরে রেখে গেল? সর্ব্বনাশ। এই চাবির ভিতর যে জর্ডন কোম্পানীর যথাসর্ব্বস্ব। এ যদি কারো হাতে পড়ে সে যে সর্ব্বস্ব চুরি কোরে নিয়ে যেতে পারে। বড়-সাহেব এই চাবি এখানে ভুলে ফেলে গেলেন? টাকা চুরি গেলে এখন সে দায় যে তাঁরই—তহবিল যে এখন তাঁরই জিম্মায়। সর্ব্বনাশ। প্রবল উৎকণ্ঠায় আমার বুকটা দুর্-দুর্ করতে লাগলো। মুহূর্ত্তের মধ্যে মেয়ের বিয়ের সমস্ত দুর্ভাবনা ভুলে গেলুম। পাছে আবার খোয়া যায় এই ভয়ে চাবির গোছাটা অতি সন্তর্পণে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখলুম। এখন চাবিটি তাড়াতাড়ি নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে পারলে হয়। সাহেব এতক্ষণে ক্লাব থেকে নিশ্চয় বাড়ি ফিরেছেন। যাই তাঁর কাছে। আর দেরী নয়। পা-দুটো যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো ব্যস্ততার স্ফূর্ত্তিতে।

"এই যে সতীশবাবু, নমস্কার!" ঘরে ঢুকলেন রায় কোম্পানীর ম্যানেজার। আমি বল্লুম—"কি খবর?"

"আজ্ঞে সেই বিলের টাকা।"

বিল্? কি বিল—কিসের বিল্—চাবির দুর্ভাবনায় কিছুই যেন বুঝতে পারলুম না; মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে গিয়েছিল...কিন্তু ক্ষণেকের মধ্যে চৈতন্য ফিরে এলো—মেয়ের বিয়ে... দানসামগ্রী কেনা হয়েছে...তারই বিল। আজই তো টাকা দেবার কথা...ঠিক, ঠিক।

আমি আবার অবসন্ন হয়ে বসে পড়লুম, মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হতে চাইলে না... রায় কোম্পানীর ম্যানেজার আমার দিকে খানিক চেয়ে কেমন যেন আশ্চর্য্য হলেন, তারপর মিষ্টিস্বুরে বল্লেন—"আজ বুঝি টাকাটা দিতে পারবেন না? তা থাক!" বলে নমস্কার কোরে চলে গেলেন।

লোকটা আমার অবস্থার প্রতি করুণা দেখিয়ে চলে গেল...সে যদি দুটো কড়া কথা বল্‌তো বোধ হয় সহ্য কর্‌তে পারতুম, কিন্তু তার ঐ নীরব দয়া...উঃ, আজ আমায় একজন দোকানদারের দয়ার ভিখারী হতে হলো! আরো অদৃষ্টে কি আছে, কে জানে!...

কপালটা ঘেমে উঠেছিল, পকেট থেকে রুমাল নিয়ে মুখ মুছতে গিয়ে লোহার সিন্দুকের চাবির গোছাটা হাতে ঠেকলো...আমি তড়াক কোরে দাঁড়িয়ে উঠলুম, তাইত, চাবিটা যে ফিরিয়ে দিতে হবে, রাত হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু আগের মতো তেমন আগ্রহে অগ্রসর হতে পারলুম না...বুঝি রায় কোম্পানীর ঐ লোকটা যাবার সময় আমার সমস্ত শক্তি হরণ কোরে নিয়ে গেছে!...

আমি ধীরে-ধীরে চল্লুম আপিস ঘর থেকে বেরিয়ে। রায় কোম্পানীর ম্যানেজারের চেহারাটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলুম না—বোধ হচ্ছিল সে এসে সমস্ত বাতাসটা যেন কেমন পাথরের মতো ভারি কোরে দিয়ে গেছে; সে-ভার ঠেলে চল্‌তে হাঁফ লাগে। তবু চল্‌তে লাগলুম কর্ত্তব্যের দায়ে—সাহেবকে চাবি পৌঁছে দিতে। চলার সঙ্গে-সঙ্গে চল্‌তে লাগলো আশ-পাশ ঘিরে যত সব এলোমেলো দুর্ভাবনা। বুকটা একবার ছ্যাঁৎ কোরে উঠলো—স্ত্রীর মুখ মনে পড়ে'। বাড়ি ফিরে এই রাত্রে স্ত্রীকে কি বল্‌বো!...বাড়ি যদি আর না ফিরতে হয় তো বেশ হয়—যদি এমনি চল্‌তে-চল্‌তে হঠাৎ হাওয়ার মতো একেবারে মিলিয়ে যাই... আর কি শান্তি!

গৃহ-সংসার বিষ মনে হচ্ছিল...আজ রাত্রের পর কালকের দিনের যে আলো তার দিকে কল্পনায় চাইতেও সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠছিল!...কিন্তু উপায় কি? সেই গৃহ-সংসারের মধ্যে ফিরে যেতেই হবে যার দ্বারে কাল প্রভাতের অগ্নি-জ্বালা আলো আমার জন্যে অপেক্ষা করছে ....হায় হতভাগ্য!...তবু চলেছি সেই ভয়ঙ্কর ভয়ের অভিমুখে...উপায় কি? যাক্, যা হবার হবে! এখন চাবির গোছাটা সাহেবকে ফিরিয়া দিতে পারলে বাঁচা যায়—কিন্তু তার পর? উঃ!

আপিসের দালান পেরিয়ে সিঁড়িতে নাম্‌তে যাব দরজার মুখে কে আমার পথ আট্‌কালে সজোরে যেন চুলের মুঠি ধরে'! সেই ধাক্কায় বুকের উপর লোহার সিন্দুকের চাবির গোছাটা টন্‌টন্ ঝন্‌ঝন্ কোরে বেজে উঠলো; সেই আঘাতে আমার মাথা থেকে সমস্ত শরীর যেন ঝন্‌ঝনিয়ে উঠলো...আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম!...কে এ? এ কে?—কে "এত জোরের সঙ্গে আমার পথ আটকায়!..

তাইতো কে এ ? সে-প্রশ্ন কেবল তখন নয়, এখনও অনবরত আমার মনকে পীড়িত করছে। কিন্তু তার কি কোনো সমাধান করতে পেরেছি ? যাকে জিজ্ঞাসা করেছি, সেই কেমন সন্দেহের দৃষ্টিতে চেয়ে আমার চোখের মধ্যে কি যেন রহস্য অনুসন্ধান করেছে, বার-বার—জবাব কিছু দেয়নি। কেউ বা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি তো উড়িয়ে দিতে পারছি না। সে যে আমার মনের মাঝে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। কত ভেবেছি, উল্টে-পাল্টে কত চিন্তা কোরে দেখেছি, কত দিকে কত রকম কোরে হাতড়েছি কিন্তু কিছুতেই তো নির্ণয় করতে পারিনি—কে এ ?···ওগো তোমরা বল কে এ ? শত্রু না মিত্র ?... জীবন না মৃত্যু ? কে এ ?...

প্রবল শক্তির সামনে মানুষ যেমন স্তম্ভিত হয় আমি তেমনি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম হঠাৎ এর বাধা পেয়ে ······চারিদিক চেয়ে দেখলুম রাত্রের অন্ধকার জমাট হয়ে রয়েছে—কাউকে দেখতে পেলুম না, অথচ বেশ টের পাচ্ছিলুম কে যেন আমায় চেপে ধরেছে—কিছুতেই পালাতে দেবে না। মনে হলো যদি এই দরজটা কোনো রকমে পার হতে পারি তা'হলে এই আপিসের এই খাঁচা থেকে বেরিয়ে নিষ্কৃতি পাই। ভয়ে-ভয়ে একটু পা বাড়াতেই সে যেন ধমক দিয়ে উঠলো—"কোথা যাস্।"

আমি থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লুম। কিন্তু তার এই অনধিকার শাসনে আমার বিদ্রোহী মন বেঁকে বসলো—সে বল্লে—"আমি যাবই, তুমি আমায় আটকাবার কে।" তারপর লেগে গেল তাতে-আমাতে তুমুল ঝটাপটি।....এবার তার কঠিন বাঁধন একটু আল্‌গা কোরে তার মুখখানা দেখবার চেষ্টা করলুম কিন্তু দেখতে পেলুম না, মনে হলো একখানা কালো অন্ধকার দিয়ে সে মুখখানা একেবারে ঢাকা।....তার শক্তির কাছে আমি ক্রমেই যেন অবশ হয়ে পড়তে লাগলুম। তখন মনে হলো সে যেন আমায় ছেড়ে দিলে। ধুঁকতে ধুঁকতে পালাতে গেলুম, সে আবার বাধা দিয়ে বল্লে—"কোথা যাস্ হতভাগ্য।"

হতভাগ্য। হতভাগ্য তো বটেই। কিন্তু মুখের টিট্‌কারিতে তো ভাগ্য লজ্জিত হয় না। তবে উপায় কি ?

"উপায় তোমারই কাছে।"

আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।....চোখের সামনে একটা প্রকাণ্ড আঙুল এসে আমার বুকের উপরটা ছুঁয়ে গেল, সে যেন বল্লে সৌভাগ্য ঐখানে।...আমি অধিকতর বিস্ময়ে নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে ধীরে-ধীরে বুকের উপর হাত দিতেই হাতে ঠেকলো একগোছা চাবি—জর্ডন কোম্পানীর ক্যাসঘরের সেই চাবির গোছা।

অতি তীব্র বেগে আমার মাথাটা ঘুরে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীটা চোখের সামনে ঘুরতে লাগলো, দুলতে লাগলো। কে এ দস্যু, আজ এই রাত্রের অন্ধকারে পৃথিবী লুঠ করতে

বেরিয়েছে ;—এ যেন যশ, মান, বিশ্বাস, স্নেহ, ভালোবাসা সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী পৃথিবীর বুক থেকে লুটে নিয়ে যেতে চায় ।

হাঁ, এ দস্যু—এ তো দস্যুই ! ধূর্ত্ততার কৌশলে এর চেহারা আমার কাছে গোপন রেখেছে, তাই এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। এ এতদিন এই তকেই ছিল, কখন সুযোগ হয় ; কত দিন ধরে এ নিশ্চয় লুকিয়ে-লুকিয়ে ক্যাস-ঘরের মধ্যে আমার আশে-পাশে ঘুরেছে এই চাবির খোঁজে ; আজ হঠাৎ আল্‌গা পেয়ে আমায় চেপে ধরেছে। এর উদ্দেশ্য চুরি করা। আমি দরোয়ানদের ডাকবার জন্যে সজোরে চীৎকার কোরে উঠলুম ; কিন্তু আমার গলা থেকে একটুও আওয়াজ বার হলোনা। হায়, মানুষ কী অসহায়, কী অসহায়। বিপদের সময় কতটুকু তার শক্তি ?....পারলুম না - একটুখানি কণ্ঠস্বর, তা দিয়েও এই দস্যুটাকে তাড়াতে পারলুম না। আমার চীৎকারে কেউ এসে পড়লে, এ দস্যু কি এক মুহূর্ত্ত সেখানে টিকতে পারত ? না আমার এ সর্ব্বনাশ হত ? হায় নিয়তি !

জর্ডন কোম্পানীর অতি-বিশ্বাসী ভৃত্য আমি ! আমি কিছুতেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। শুধু ক্যাসঘরের চাবি কেন, সমস্ত ভাণ্ডার আমার সামনে নির্ব্বিঘ্নে খুলে গেলেও জর্ডন কোম্পানীর একটি কাণা কড়িও আমি চুরি করতে পারব না -ঐ সর্ব্বনেশে দস্যুটার পরামর্শে। তুমি দূর হও—দূর হও ! তোমার পাপ-কথা অমি শুনতে চাই না। "আমি চুরি করব না।"

"কে বল্লে, এ চুরি ?"

"চুরি নয় ?"

"এ সুযোগ ! সুযোগ মানুষের জীবনে অকস্মাৎ এক-আধবার আসে—কখনো বন্ধু-বেশে কখনো শত্রু-বেশে। যে সেই সুযোগকে ব্যবহার করে সে এই জগতে ধনে-মানে বিকশিত হয়ে ওঠে। যে-নির্ব্বোধ আলস্যে কিম্বা ভয়ে পিছিয়ে যায় সে চিরদিন পাঁকের তলায় পড়ে থাকে।"

"কোথায় সুযোগ ?"

"ঐ যে চাবির গোছা। যত্নে-চেষ্টায় গলদঘর্ম্ম হয়ে ওটাকে তোমায় সংগ্রহ করতে হয়নি—আপনি তোমার হাতে এসে পড়েছে ;—তোমার সৌভাগ্য তোমায় মিলিয়ে দিয়েছে। সুযোগ তো এমনি-কোরেই সহজে আসে।"

"তা বলে বিশ্বাসঘাতক হব ?"

"চাবির বিশ্বাস তো তোমার উপর নয়—সে ছিল বড়-সাহেবের উপর। চাবির গোছা ফেলে গিয়ে সেই বিশ্বাসকে সে আঘাত করেছে। দোষী যদি হয় তো সেই। তার অমনোযোগিতার দণ্ড পাক্‌ সে ! তুমি কেন ভেবে মর।"

"মনিবের মন্দ এ জীবনে কখনো করিনি।"

"তার প্রতিফল কি পেলে? যার জন্যে প্রাণপাত করলে সে তোমার এই বিপদের দিনে কি মুখ চাইলে? কুকুরের মতো তোমায় সে প্রত্যাখ্যান কোরে তাড়ালে।"

"তা বটে।"

"তবে?"

"যদি ধরা পড়ি?"

"যদি নিজের থেকে ধরা না দাও—তোমায় ধরে কার সাধ্য। তোমার গায়ে সন্দেহের ছায়া পর্য্যন্ত লাগবার সম্ভাবনা নেই, কারণ তুমি বিশ্বাসী এবং এ কাজের কোনো রকম সন্দেহের ছাপ তুমি রাখবে কেন? তা ছাড়া এক আমি বই তোমার একাজের সাক্ষী কই? কাজেই আজকের এ ঘটনা আমারই মতো চিরদিন অন্ধকারে থেকে যাবে। তবে ভয় কিসের?"

"না, না, আমি কিছুতেই চোর হতে পারব না।"

"মূর্খ, চুরি ধরা পড়লেই তবে চোর হয়—নইলে নয়।"

ও গো, এ কি সর্ব্বনেশে যুক্তি! এ কি সর্ব্বনেশে প্রলোভন! কে আমাকে এর হাত থেকে উদ্ধার করবে?

আমি আবার চীৎকার কোরে উঠলুম—"না, আমি চুরি করতে পারব না।"

সে বল্লে—"তবে জাহান্নমে যাও।" বলেই আমার জন্যে নির্দ্দিষ্ট জাহান্নমের এক ভীষণ চিত্র আমার চোখের সামনে জ্বলন্ত রেখায় খুলে ধরলে ..সেই মেয়ের বিয়ে বন্ধ....সেই আমার নিদারুণ অপমান...সেই পদে-পদে লাঞ্ছনা....দেনার দায়ে কারাগার পর্য্যন্ত...তার পর আরো কত কি...আরো কত কি। আমি সে দৃশ্য আর দেখতে পারলুম না, বল্লুম - বন্ধ কর, বন্ধ কর। সেই নিষ্ঠুর আমার কাতরতা দেখে হো-হো শব্দে হেসে উঠলো। তারপর সে আমায় দেখালে এই ছবির উল্টো পিঠ...জর্ডন কোম্পানীর টাকায় কেমন নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ সমাধা হয়ে যাচ্ছে—কোথাও কোনো চিন্তা নেই, উৎকণ্ঠা নেই...আঃ কি আরাম, কি শান্তি।

এই শান্তি, এই আরামের স্নিগ্ধ মোহ আমার সর্ব্বাঙ্গে বিস্তার কোরে দিয়ে সে আমাকে ধীরে-ধীরে সম্মোহিত করতে লাগল। তারপর মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি তার দ্বারা পরিচালিত হতে লাগলুম...মনে হতে লাগলো যা করছি, না-করছি সে যেন আমার ইচ্ছাধীন নয়। এইবার যা ঘটলো, স্পষ্ট বলবো, সে চুরি—চুরি—চুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই সম্মোহিত অবস্থায় আমার হাত দিয়ে সে সিন্দুকের চাবি খোলালে, আমার হাত দিয়ে সে নোটের তাড়া আমার পকেটে তুলে দিলে, তারপর আমার হাত দিয়েই সে আবার সিন্দুকের চাবি বন্ধ করলে। আমি হাঁ, না কিছুই বলতে পারলুম না।

কে গো, তুমি কে, আমার অজানা বন্ধু, এই বিপদের দিনে আমায় পথ দেখাতে এসেছ?

হঠাৎ অন্ধকারের পর্দ্দা ঠেলে সে সামনে এসে দাঁড়ালো। অ্যাঁ, কে এ! এ যে —

তোমরা ভাবছ আমার এই চুরির ব্যাপারটাকে আমি একটা নিগূঢ় রহস্যময় গল্পে রূপান্তরিত কোরে তোমাদের সামনে আমার আত্মমর্য্যাদাকে সাফ রাখতে চাচ্ছি—যেন আমি চোরই নই। ওগো, না গো না, তা নয়। তোমরা আমাকে বার-বার চোর বল, তা আমি মাথা পেতে নেব; কিন্তু বোলে দাও আমার জীবনের এই রহস্যটা কি? সত্যই কে চোর, তা কি নির্ণয় হবে না? কে চোর? সে, না আমি? সে, না আমি?

আমি যদি সত্যই চোর হব তবে পরের দিন সকালে পুলিশের খবরদারিতে স্বেচ্ছায় নিজের দোষ স্বীকার করলুম কেন? আমার উপর তো কারো সন্দেহ হয়নি। যেচে গিয়ে নিজের গলায় নিজে ফাঁশি পরবার প্রবৃত্তি হলো কেন? ইচ্ছে করলে কি নিজেকে বাঁচাতে পারতুম না? সে বাঁচবার ইচ্ছা হলো না কেন? বাঁচা তো খুবই সহজ ছিল। চুরির সমস্ত কাহিনী যখন সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করলুম, এই কাহিনীর অদ্ভুতত্বে তখনো সকলে এই সন্দেহ করতে লাগলো মেয়ের বিয়ের দুর্ভাবনায় আমার মাথার ঠিক নেই, তাই আবোল-তাবোল বক্‌ছি, আমি না কি চোর হতে পারি! ঐ কাহিনীটা আমার দুর্ব্বল মস্তিষ্কের দুঃস্বপ্ন মাত্র! এই তো ফাঁক ছিল, এই ফাঁক দিয়ে শেষ-মুহূর্ত্তে পালালুম না কেন? বরং আমি যে মিথ্যাবাদী নই এই প্রমাণ করবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে চুরি-করা নোটের তাড়া সকলের সামনে বার কোরে দিয়েছিলুম। সেই অজ্ঞাত দস্যু তখন অলক্ষ্য থেকে আমায় শাসিয়েছিল -"করছিস্ কি উন্মাদ!" আমি তার' কথা শুনিনি—প্রবল ঘৃণায় তাকে অবজ্ঞা করেছিলুম। কেন? তখন আমি যে আমি! আমি যে আমার প্রভু; যে-আমি কখনো কারো এক-পয়সা ঠকিয়ে নিইনি!

তোমরা হয় তো বলবে চোর আমি, এখন ধরা পড়ে সাধুত্বের বড়াই করছি। ওগো, না গো না! অন্তর্য্যামী জানেন এই কয়েদখানায় বসে আজ বড়াই করবার আমার কিছুই নেই।

কিন্তু সেই যে দস্যু, সেই যে অন্ধকারের অভ্যাগত, বন্ধু-ভাবে যে আমার এই সর্ব্বনাশ করলে কে সে? সে আমার বন্ধু না প্রতিদ্বন্দ্বী? সেই রাত্রে অন্ধকারের ভিতর থেকে তাকে যে মুহূর্ত্তের জন্য দেখেছি, সে কি দেখেছি? কাকে দেখেছি?…

চুরির কাজ শেষ হতেই লোহার সিন্দুকের চাবির গোছাটা হঠাৎ তপ্ত আঙারের মতো রাঙা হয়ে উঠলো—আমার সমস্ত হাতটা যেন জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যেতে লাগলো! আমি সেই জ্বলন্ত চাবির গোছা সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে ক্যাস্-ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। সিঁড়ি-বেয়ে নামতে যাচ্ছি কে আমার পথ আট্‌কালে। ঠিক এইখানটিতেই সে আমার প্রথম পথ আট্‌কেছিল। আবার কি? আবার কে ডাকে? মিথ্যে বলব না, আমি আতঙ্কে দু-হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধরলুম—যেখানে নোটের তাড়া লুকানো ছিল। বোধ হয় ভয় হচ্ছিল পাছে সেই মহামূল্য টাকাগুলো কেউ কেড়ে নেয়! হায়, মানুষের মন কি দুর্ব্বল!

আমি আমার সেই অন্ধকারের বন্ধুকে নিশ্চয় মনে-মনে ডেকেছিলুম আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে, নইলে হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর থেকে সে আমায় আশ্বাস দিলে কেন? বন্ধু, কে গো তুমি কে—অলক্ষ্যে থেকে আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করছ? কি তোমার মূর্ত্তি? দেখি, দেখি।......

অন্ধকারের পর্দ্দা দেখতে-দেখতে ফিকে হয়ে এলো। সে যেন আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। এ কি দেখছি? একি স্বচ্ছ আয়নার উপর প্রতিবিম্ব? এ যে আমি—এ যে আমারই মূর্ত্তি। স্বচক্ষে দেখলুম ছুই-আমি মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে আছি—ছুই বন্ধু, ছুই প্রতিদ্বন্দ্বী। এ কোন্ যাত্নকরের মায়া-দিয়ে তৈরি এই নতুন আমি—এই নকল আমি—এই চোর-আমি। অ্যাঁ?

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

স্নেহের টান?

(১)

"সে আমি পার্ব না, মামাবাবু।"

ভাগিনেয়ের মৃত্নকণ্ঠস্বরে যে দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল, তাহা যে বিচারকের রায়ের ন্যায়ই অমোঘ, ইহা ব্রজেন্দ্রকুমার উত্তমরূপেই অবগত ছিলেন। তাঁহার সকল আদেশ শিশিরচন্দ্র অকুণ্ঠিতচিত্তে পালন করিবে তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু এই একটি বিষয়ে সে কাহারও অনুরোধ উপরোধ রাখিবে না এ আশঙ্কা তাঁহার অনেক দিন হইতেছিল। ধীরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে, এজন্য শিশিরচন্দ্রকে দোষ দেওয়া ত যায়ই না, বরং তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও পিতৃভক্তির প্রশংসা করিতে হয়।

কিন্তু তথাপি শেষ চেষ্টা প্রাণপণে করিতেই হইবে। মাতৃহীন এই বালকের—একমাত্র সহোদরার এই শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকুর প্রতি তাঁহার যে স্নেহ আছে, তাহার প্রেরণাকে তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না। তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার পিতা চিরদিনই উদাসীন; কিন্তু তিনি যখন তাহাকে গড়িয়া তুলিতে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন, তখন তাহার মঙ্গলামঙ্গলের পথনির্দ্দেশ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

ব্রজেন্দ্রকুমার, শিশিরচন্দ্রের নত আননে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিলেন, "ভাল করে ভেবে দেখ, বাবা। চৌধুরী কোম্পানীর বিস্তৃত ব্যবসায়ের অর্দ্ধেক মালিকান স্বত্ব, প্রচুর যৌতুক, একটা প্রকাণ্ড বাড়ী—এ সকল সুবিধা ত্যাগ করা কি উচিত হবে?"

খোলা জানালার দিকে চাহিয়া শিশির বলিল, "কিন্তু বাবাকে আমি কোন মতেই ত্যাগ কর্‌তে পারব না। তিনি যাই করে থাকুন, তিনি আবার বাবা। এ বয়সে অনেকগুলি ছেলে মেয়ে নিয়ে তিনি বিব্রত, মাও আমায় স্নেহ যত্ন করেন। আমার ভরসাতেই তাঁরা—"

শিশির অর্দ্ধপথে স্তব্ধভাবে থামিল। তাহার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল।

ব্রজেন্দ্রবাবু একটু অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "তা তুমি তাঁদের অর্থ সাহায্য কর্‌তে পার, কেউ নিষেধ কর্‌বে না; কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তুমি আর থাক্‌তে পারবে না—সামাজিক সম্বন্ধ রাখা চল্‌বে না, এই হচ্ছে চৌধুরী মশায়ের সর্ত্ত।"

শিশির তাহার মাতুলের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "এরূপ হীন সর্ত্তে তাঁর কন্যাকে গ্রহণ করতে আমি কিছুতেই পারব না—কারও স্বাধীন মতামতের উপর কোন সর্ত্ত নির্দ্দেশ করা সঙ্গত কি?"

ব্রজেন্দ্রবাবু এবার একটু উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "তোমার বাবা খেয়ালবশে সমাজ ত্যাগ করে গেছেন; তোমার মত ছেলে থাক্‌তেও সমাজ-সম্বন্ধকে অস্বীকার করে আবার বিয়ে কর্‌লেন কেন? তিনি কি তখন কর্ত্তব্য পালন করেছিলেন? ধর্ম্ম, সমাজ, সন্তান-বাৎসল্য—সবই কি তখন ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে বিসর্জ্জন দেন নি?"

তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছিল। মেঘনম্র আকাশে বিদ্যুতের দীপ্তি—আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনায় রাজপথে জনস্রোত দ্রুত গন্তব্যস্থানের অভিমুখে চলিয়াছে। খোলা জানালার মধ্য দিয়া উদাসভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া শিশির বলিল, "আপনার কাছেই শিখেছি গুরুজনদের কাজের সমালোচনা করা উচিত নয়। বাবার কাজের সমালোচক আমি নই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সংস্রব রাখবার, তার সেবা করবার সম্বন্ধটাই আমার কাছে সব চেয়ে বড়। সেটা আমি ভুল্‌তে পার্‌ব না।"

ক্ষুণ্নস্বরে ব্রজেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা হ'লে চৌধুরী মশায়কে সাফ্ কথা জানাতে হলে, তাঁর সঙ্গে কাজ হবে না। তোমার বাবার কীর্ত্তির কথা জেনেও তুমি যে সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, ভাল লেখাপড়া শিখেছ, কাজকর্ম্মের বুদ্ধি বেশ আছে,—এই সকল বিচার করেই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। এ সম্বন্ধ হলে আমরাও সুখী হতুম; কিন্তু উপায় যখন নেই, দুঃখ করে লাভ কি? তবে এ কথা ঠিক, তোমার বাবার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখ্‌তে হলে এ সমাজের কেউ তোমাকে কন্যা দান কর্‌তে চাইবে না।"

শিশিরচন্দ্র আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মাতুলের পদধূলি মাথায় লইয়া বলিল, "বাবাকে ত্যাগ করা অসম্ভব। আমাকে ক্ষমা করবেন।"

ভাগিনেয়ের সুস্থ সবল দেহের দিকে চাহিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাহাকে সত্যই তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

"চৌধুরীদের ওখানে এর পর ম্যানেজারী করা—"

প্রশান্তস্বরে শিশির বলিল, "না, আমি কালই তাঁদের কাজে ইস্তফা দেব। এর পর ওখানে থাকা কোন দিক দিয়েই বাঞ্ছনীয় হবে না।"

"তারপর ?"

"আপনাদের আশীর্ব্বাদ, বাবার আশীর্ব্বাদ যার সহায়, একটা কিছু উপায় তার হবেই।"

"তুমি আজ এখানে থেকে যাও। মেঘ বৃষ্টি, পথে কষ্ট হবে।"

শিশিরচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল, "ট্যাক্সি করে ষ্টেশনে যাব, কোন কষ্ট হবে না। গাড়ীতে বসেই কর্ম্মত্যাগের পত্র লিখে দেব। কাল আমাকে পাটনায় পৌঁছুতেই হবে।"

ব্রজেন্দ্রবাবু উঠিলেন। অগ্রে চলিতে চলিতে বলিলেন, "তবে চল, শীঘ্র খেয়ে নেবে। তোমার মাসীমা দু'বার তোমাকে ডেকে গেছেন।"

(২)

কিন্তু যাঁহাদের জন্য শিশির ভবিষ্যতের সুখ-সম্পদ-ঐশ্বর্য্য এমনভাবে প্রত্যাখ্যান করিল, তাঁহারা তাহার বিবেচনাবুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিলেন না। চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে মৌখিক সম্মতি দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবার পর সে ত অনায়াসে তাহার পিতামাতা প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিত। কে তাহাতে বাধা দিত ? আর বাধা দিলেই বা ফল কি হইত ? কন্যাজামাতাকে তাঁহারা কিছু ত্যাগ করিতে পারিতেন না। শুধু একটা 'সেন্টিমেণ্টের' খাতিরে এমন নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় কেহ দেয় না।

অবশ্য প্রকাশ্যভাবে পিতা অথবা বিমাতা তাহার সম্মুখে এসব কথা এমনভাবে না বলিলেও তাহার অগোচরে আলোচনা চলিতে লাগিল। শিশির বধির ছিল না, কথাটা তাহারও কাণে গেল। হৃদয়ে আঘাত পাইলেও সে মন খুলিয়া আঘাতের বেদনা প্রকাশ করিল না। কোনদিনই সে কাহারও নিকট হৃদয়ের গোপন ব্যথার কথা প্রকাশে অভ্যস্ত ছিল না।

মাতার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই পিতা যখন ভিন্ন ধর্ম্মমতে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন, বালক হইলেও সে দিনের স্মৃতি সে কখনও ভুলিতে পারিবে না। তখন সে মাতুলালয়ে থাকিয়াই লেখাপড়া শিখিতেছিল। পিতৃস্নেহ আশানুরূপভাবে না পাইলেও তাহার হৃদয় সর্ব্বক্ষণই পিতার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকিত। তাঁহার কোন দোষ ত্রুটি, অপরাধ যে থাকিতে পারে এমন চিন্তা তাহার হৃদয়ের কোন প্রান্তেও কখন উদিত হইতে অবকাশ পায় নাই। পাঠ্যগ্রন্থ হইতে সে যে উপদেশগুলি লাভ করিয়াছিল, তাহা সে অভ্রান্ত বলিয়াই বিশ্বাস করিত এবং তদনুসারে সে তাহার জীবনকে গঠিত করিয়াছিল। মাতুল ও মাতুলানীর জীবনের পবিত্র আদর্শও তাহার তরুণ মনে দৃঢ় রেখাপাত করিয়াছিল।

বি, এ পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হইবার পর সে আর মাতুলের স্কন্ধে না থাকিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের প্রস্তাব করিল। বাল্যকাল হইতেই কেরাণীগিরীর প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ছিল, উহাতে মনুষ্যত্ব অল্পদিনেই অন্তর্হিত হইয়া যায়, দুঃখও ঘুচে না।

মাতুলের ইচ্ছা ছিল, শিশির আরও পড়া শুনা করে ; কিন্তু শিশির একবারে বাঁকিয়া বসিল ; সে আর পড়িবে না। সে বুঝিয়াছিল অনেকগুলি পুত্রকন্যা লইয়া তাহার পিতা অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছেন। আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল। যে সমাজের বিধানমতে তিনি সদ্যোবিধবাকে পত্নীর আসনে বসাইয়াছিলেন, সে সমাজও—'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার' পতাকা মূলে সমবেত হইয়াও—এই দম্পতীর প্রতি উদারতা প্রকাশ করিতে পারে নাই। কাজেই সকল দিক হইতে উপেক্ষিত হইয়া তিনি সপরিবারে পাটনা সহরের নিভৃত প্রান্তে আপনাকে নির্ব্বাসিত রাখিয়াছিলেন। সেখানে সামান্য ভাড়ায় একটী বাড়ী লইয়া বসবাস করিতেছিলেন। জীবিকার্জ্জনের অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া স্বাধীনভাবে তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া দালালী করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই উপায়েই তিনি কোনমতে সংসার প্রতিপালন করিতেছিলেন।

সর্ব্বআত্মীয়স্বজন পরিত্যক্ত হইলেও পুত্র পিতাকে ত্যাগ করে নাই। সুযোগ পাইলেই সে পাঠ্যাবস্থাতেও পিতার নিকট যাইত। তাঁহার সেবা করিয়া মনে মনে তৃপ্তিলাভ করিত। বৈমাত্রেয় ভ্রাতাভগিনীগুলিকে সে সহোদর সহোদরার মতই ভালবাসিত। বিমাতার প্রতিও তাহার স্নেহ ভক্তি কম ছিল না। কেহ পীড়িত হইলে, সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিত। এমন কি বিংশ শতাব্দীর যুবক হইয়াও সে অনেক সময় পিতাকে তামাক সাজিয়া দিত, পীড়ার সময় পদসেবা করিত। পিতার এই সংসারের জন্য সে যে কোনও প্রকার কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল। সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া সে তাঁহার সেবায় আপনাকে উৎসৃষ্ট করিতে পারিলে জন্ম সার্থক বলিয়া বিবেচনা করিত।

যে পিতা পুত্রের কথা একবারও চিন্তা না করিয়া, আপনার সুখলালসায় কর্ত্তব্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য শিশিরের এমন আগ্রহভরা আবেশ দেখিয়া তাহাকে কত বিদ্রূপ, কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। এমন কি উদারহৃদয় মাতুল পর্য্যন্তও তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইতেও উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার হৃদয় কোনও উপদেশ, কোনও সতর্কবাণী মানিতে চাহিত না। সে বুঝিয়াছিল, তাহার পিতা বিপন্ন, তাঁহাকে সাহায্য করা, সেবা করা তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য। সংসারের সহস্র বিপদ, লক্ষ্য অশান্তি সে হাসিমুখে মাথা পাতিয়া লইবে।

তাই সে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত না হইয়াই অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিয়াছিল। অনেকগুলি বড় বড় সদাগরী আফিসের মাল সরবরাহ কার্য্যে সে

অল্পদিনের মধ্যেই এমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিল যে, চৌধুরী কোম্পানী অবশেষে তাহাকে নিজের আফিসে উচ্চ বেতনে ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। কেরাণীগিরী নহে বলিয়াই সেও এই লাভজনক কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছিল।

উপার্জ্জিত অর্থের সামান্যমাত্র নিজের ব্যয়ের জন্য রাখিয়া সমস্ত টাকাই সে পাটনায় পাঠাইয়া দিত। ইহাতে পিতা যতীশচন্দ্র আবার সুখের মুখ দেখিতে পাইয়াছিলেন। দীর্ঘ দিনের দুঃখ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু পুত্র অবশেষে এ কি করিয়া বসিল ? কৌশল অবলম্বন না করিয়া, বর্ত্তমান যুগে সহজ সরল ভাবে চলিতে গেলেই দুঃখ অনিবার্য্য। 'সত্যং শিবং সুন্দরং' এ যুগে অচল। কাব্য-সাহিত্যেও নহে—জীবন যাত্রার পথেও নহে। এ যুগের নীতি—মনে যাহা ভাবিবে কার্য্যে তাহা কখনই করিবে না ; কার্য্যে যাহা করিবে মনের কোনও প্রান্তে তাহাকে স্থান দিবে না।

পুত্রের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে কঠোর জীবন সংগ্রামের বিষময় পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। দারিদ্র্য, অশান্তি ও অভাবের কুটিল ভ্রূভঙ্গী কল্পনা করিয়া প্রৌঢ় যতীশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন। মুখে প্রকাশ না করিলেও তাঁহার অন্তরমধ্যে পুত্রের প্রতি বিরাগ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল।

(৩)

দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য পনের আনারও বেশী লোক যে কঠোর সংগ্রামে রত থাকে, ভোগবিলাসী সুখৈশ্বর্য্যে প্রতিপালিত নরনারী তাহার নির্ম্মমতা, নৈরাশ্য এবং ভীষণতা সম্বন্ধে কতটুকু ধারণা করিতে পারে ? সমাজস্তরের যে অংশ ভদ্র নামে অভিহিত,—পরিচ্ছন্ন, আচার ব্যবহার, মনোবৃত্তি এবং চিন্তাধারা যে স্তরের নর নারীকে অন্যস্তর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখে, জীবন সংগ্রামের কঠোরতা তাহারা যেমনভাবে উপলব্ধি করে, তাহার প্রকাশের ভাষা সম্ভবতঃ সাহিত্যে আজিও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

সমস্ত দিন হয়ত অন্ন জুটে নাই—সামান্য আহার্য্য পর্য্যন্ত উদারানলের প্রবল ক্ষুধার জ্বালা উপশান্তি করিবার জন্য সংগৃহীত হয় নাই, দেহ, মন অবসন্ন, শ্রান্ত ; কিন্তু তথাপি ভদ্রের মুখে সে কথা প্রকাশ পাইবে না। নীরবে তাহাকে সে যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে। উপায় নাই। উপায় নাই।

এমনই সংগ্রাম শিশিরের জীবনে আরম্ভ হইল। বলিষ্ঠ দেহ ও মন লইয়া সে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। বহুদিন যে কর্ম্মপ্রণালীর অনুসরণে সে বিরত ছিল, আবার নূতন করিয়া সেই ত্যক্ত পথে তাহাকে চলিতে আরম্ভ করিতে হইয়াছে। পথ দুর্গম, পিচ্ছিল ; কিন্তু তাই বলিয়া নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না। পিতাও পুত্রের উপার্জ্জনে নির্ভর করিয়া পূর্ব্বাবলম্বিত দালালী কার্য্য হইতে বহুদিন বিদায় লইয়াছিলেন ; অভাবের পেষণে তাঁহাকেও আবার কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইল। সবই শিশিরের নির্ব্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতার ফল, ইহা মনে

করিয়া যতীশচন্দ্র পুত্রের শিরোদেশেই সমস্ত অপরাধের বোঝা চাপাইয়া দিলেন। তাঁহার অন্তর শিশিরকে ক্ষমা করিতে পারিল না। নিজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ভোগবিলাসকে যে বড় করিয়া দেখে তাহার যুক্তি এইরূপ পথই অবলম্বন করে।

মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা কিছুদিন নানাপ্রকার বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছিল। তাহার পর জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ, পীড়ার প্রকোপ প্রভৃতি নানাবিধ কারণে এবং টাকার বাজারের চাঞ্চল্যে ব্যবসায়ের গতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই মন্দীভূত হইয়াছিল, কাজেই শিশিরচন্দ্র প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও, আশানুরূপ অর্থ উপার্জ্জন দূরে থাকুক, গ্রাসাচ্ছাদনের অন্নের সংস্থান করিতে বিষম বিপন্ন হইয়া পড়িল, তাহার পিতার উপার্জ্জনের অবস্থাও তদনুরূপ। পাটনায় স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণকে রাখিয়া যতীশচন্দ্র অগত্যা পুত্রের নিকট কলিকাতায় আসিলেন, তাঁহার পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্রে যদি তিনি কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারেন।

শেষে এমন হইল যে, যদি কোন কেরাণীর কার্য্য পাওয়া যায় শিশির তাহাও ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে। কেরাণীর জীবন স্পৃহণীয় নহে, তবু এ অবস্থায় তাহাও প্রার্থনীয়। কিন্তু সরকারী কর্ম্ম তাহার হইবার নহে। নির্দ্দিষ্ট বয়স সে অনেক কাল অতিক্রম করিয়াছে। সদাগরী আপিসে কার্য্য? তাহাও দুর্লভ। চারিদিকেই অভাবগ্রস্ত তরুণ ও প্রৌঢ়ের দল ক্ষুধাকাতর, বিশীর্ণ মুখে ভিড় করিয়া আছে। সে ব্যূহ ভেদ করিয়া কাজ সংগ্রহ করা তাহার মত নির্ব্বান্ধব যুবকের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। মাতুলের চেষ্টায় গৃহ শিক্ষকতা করিয়া সে কোনও মতে সংগ্রামে অটল থাকিবার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এক প্রৌঢ়দম্পতি ৭।৮টি সন্তান সহ যে দিন গণনা করিতেছে!

শিশিরের অটল ধৈর্য্যও বুঝি বিলুপ্ত হয়!

এমন সময় একদিন তাহার পিতা আসিয়া একটা সুসংবাদ দিলেন। তাঁহার কোনও পরিচিত ব্যক্তির পুত্র এক সরকারী আপিসের ভাগ্যবিধাতা। সেখানে একটি দায়িত্বপূর্ণ, উচ্চবেতনের পদ খালি হইয়াছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে—বহু দরখাস্ত পড়িয়াছে। কিন্তু শিশির যদি দরখাস্ত করে তবে কার্য্যটি তাহারই হইবে। যতীশবাবু সে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। আপাততঃ অস্থায়ী বটে, কিন্তু একবৎসর পরে উহা পাকা হইবে।

শিশির দরখাস্ত দিল। বিস্ময়ের বিষয়, তাহার অপেক্ষা উপযুক্ত প্রার্থী থাকিতেও তাহার আবেদনই মঞ্জুর হইবার সংবাদ সে পাইল। সে আপিসে বহু উপযুক্ত প্রবীণ কর্ম্মচারী উক্ত পদের প্রার্থী হইলেও আপিসের ভাগ্যবিধাতা সকলকে বঞ্চিত করিয়া তাহাকেই উক্তপদে নিযুক্ত করিলেন। কোন্ যাদুকরের মায়াদণ্ড স্পর্শে এমন অঘটন ঘটিল তাহা সে প্রথমতঃ অনুমান করিতেও পারিল না। ৩৫ বৎসর বয়সে সাধারণ সরকারী কর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিবার

মত কোন্ বিশিষ্ট গুণপণা তাহার ছিল সে তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে সে কার্য্যালয়ে গিয়া কর্ত্তার সহিত দেখা করিল।

আপিসের ভাগ্যবিধাতা যে তাহারই সতীর্থ ইহা জানিতে পারিয়া সে প্রথমতঃ বিস্মিত হইল ; দীর্ঘ কাল উভয়ের মধ্যে দেখা শুনা ছিল না। কলেজ-জীবনের কথা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সে একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিল। কিন্তু যে ব্যক্তি সাফল্যের চরম শিখরে উঠিয়া এত দিন তাহার কথা একবারও মনে করে নাই আজ এই দুর্দ্দিনে তাহাকে এমনভাবে উচ্চ বেতনের পদে নিযুক্ত করায় তাহার মন সতীর্থের প্রতি বিস্ময়ে ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল। আপিসের ভাগ্যবিধাতা কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, সে যে তাঁহার সঙ্গে একই কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছে একথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়। বাহিরে উভয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত ব্যবহার করিবে।

বিস্ময়ানন্দে শিশির বাসায় ফিরিয়া আসিল।

(৪)

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে পিতা বলিলেন, "তুমি বার বার এমন ভাবে চল যদি, তাহলে তোমার মত স্বার্থপর আর কে আছে ?"

শিশির বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে পিতার দিকে চাহিয়া রহিল। যে পিতাকে সে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া আসিয়াছে, যাঁহার জন্য সে সকল প্রকার সুখ, ঐশ্বর্য্য, যশঃ প্রতিপত্তির আশা অম্লান বদনে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পিতা এমন উদাসীন ? অর্থই কি তাঁহার কাছে প্রধান ও একমাত্র কাম্য ? পুত্রের সুখদুঃখ তিনি কিছুই বুঝিবেন না ?

সরকারী আপিসে কাজ হইবার পরের মাসেই সে বিমাতা ও ভ্রাতা ভগিনীগুলিকে কলিকাতার বাসায় আনিয়া রাখিয়াছিল। সে যে বেতন পাইতেছিল তাহাতে সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনায়াসলভ্য হইয়াছিল। দুইবেলা গৃহশিক্ষকতার কাজও সে বজায় রাখিয়াছিল। পিতারও আয় কিছুকিছু ছিল। পিতা, বিমাতা ও ভ্রাতা ভগিনী গুলিকে আনন্দে রাখিতে পারিয়া তাঁহার তৃপ্তির সীমা ছিল না। [illegible] উৎসাহ সহকারেই সে কাজ করিয়া চলিয়াছিল। অবকাশ পাইলেই সে দালালী করিয়া অর্থার্জ্জনেও মনোনিবেশ করিত। সরকারী কার্য্যে সে সুযোগ অনেক সময়েই মিলিত।

অতি আনন্দেই তাহার দিন কাটিতেছিল ; কিন্তু পিতা আজ তাহাকে এ কি কথা শুনাইলেন ? তাহার এই চাকরী একটা সর্ত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ পূর্ব্বাহ্ণে এই সর্ত্তের কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায় নাই। কি আশ্চর্য্য! সর্ত্ত যাহাকে পালন করিতে হইবে তাঁহাকে গোপন করিয়া এতবড় একটা ঘটনা হইতে চলিয়াছে !

তাহার প্রকৃতিগত দৃঢ়তা মুহূর্ত্তে তাহার অন্তরকে কঠিন করিয়া তুলিল। অভিনয়, ভাণ,

কূটকৌশল—না শিশির এ সকল খেলায় অভ্যস্ত নহে। সহজ সরলভাবে সে চিরদিন জীবন-পথে চলিয়া আসিয়াছে। বিংশশতাব্দীর প্রশংসিত নীতিজ্ঞান তাহার নাই। না—সে উহা পারিবে না।

মৃদুস্বরে সে বলিল, "কিন্তু এ সর্ত্তে আমি রাজী হতে পারি না, বাবা।"

যতীশচন্দ্রের কণ্ঠস্বর উগ্র হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তবে তুমি কি করতে চাও?"

"আমি মোট ঘাড়ে করেও আপনাদের জন্য অর্থ উপার্জ্জনে কুণ্ঠিত নই; কিন্তু এমনভাবে—না, সে আমি পার্‌ব না।"

ক্রোধে পিতার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "তোমার পিতৃভক্তি কেবল লোক-দেখান। নৈলে আমি ভদ্রলোকের কাছে কথা দিয়েছি, আর তুমি তা ভেঙ্গে ফেলে শুধু আমায় অপদস্থ করা নয়, আমাদের অনাহারে মারবার পথে চল্‌তেও কুণ্ঠিত নও! এই তোমার লেখাপড়া শেখার ফল?"

পিতার সহিত কোনও দিন তর্ক করা তাহার স্বভাব নয়। কোনও দিন মুখ তুলিয়া সে পিতার কথার উপরে কথা বলে নাই। কিন্তু আজ সে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। আপনাকে সংবরণ করিতে না পারিয়া সে বলিল, "কিন্তু আমার জীবন-মরণের যেটা সব চেয়ে বড় বিষয়, সে সম্বন্ধে কিছু ঠিক করবার আগে আমায় একটু জানালে ভাল হত।"

"না, তখন তা বুঝিনি। তখন ভেবেছিলাম, তোমার জন্য যা ভাল বুঝব তাই তুমি মাথা পেতে নেবে। আমি তোমার অনিষ্টকারী নই।"

শিশির আর কথা কহিল না। যে-কন্যা বধির ও মূক বলিয়া এত বয়সেও অবিবাহিতা রহিয়াছে—পিতা ও ভ্রাতার সহস্র চেষ্টাতেও কেহ যাহাকে এতদিন গৃহলক্ষ্মী করিতে উদ্যত হয় নাই—যাহাকে বিবাহ করিলে বাসযোগ্য অট্টালিকা এবং নগদ লক্ষ টাকা যৌতুক ঘোষণা করা সত্ত্বেও কোনও প্রার্থী উপস্থিত হয় নাই, পিতা সেই কন্যাকে তাহার জীবনসঙ্গিনী করিয়া দিতে উদ্যত! অর্থ সম্পদ ও চাকরীর বিনিময়ে একজন নারীকে সহধর্ম্মিণীর আসনে বসাইতে হইবে! নারীর মর্য্যাদার গুণে নহে!—এ হীনতা স্বীকার করিতে যে চাহে সে করুক, শিশির কখনই তাহা করিতে পারিবে না। সামাজিক ধর্ম্ম নষ্ট হইবে বলিয়া নহে, তাহার মানব ধর্ম্ম এ অনাচারে সায় দিতে পারিতেছে না। পিতার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিবার মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলে একদিন যে, রূপে গুণে সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয়া কন্যা লাভ করিতে এবং তৎসঙ্গে বিপুল সম্পত্তি ও কারবারে অংশী হইতে পারিত, শুধু মানবধর্ম্ম পালনের জন্যই সে প্রলোভন সে অবহেলায় জয় করিয়াছিল, তজ্জন্য কত দুঃখ কত লাঞ্ছনাই না সে সহ্য করিয়াছে। আজ আবার সেই প্রকার অবমাননাজনক প্রস্তাব!

এই জন্যই তাহার চাকরী হইয়াছিল? এরূপ শঠতা ও ষড়যন্ত্র যাহারা করিতে পারে

তাহাদের সহিত সে কোন সম্বন্ধই স্বীকার করিতে পারে না। লোভে পড়িয়া, ব্যক্তিগত স্বার্থের প্ররোচনায় তাহার পিতা আজ যে কার্য্য করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিতেছেন, সে অসঙ্গত প্রস্তাবে মত দিয়া সে তাহার পিতার হীনতাকে প্রশ্রয় দিয়া তাহার পিতৃপিতামহের অভিজাত বংশকে সে কখনই কলঙ্কিত হইতে দিবে না।

এ প্রস্তাবে সম্মত না হইলে তাহার এই দুর্লভ চাকরী থাকিবে না। আবার দারিদ্র্য —তাহার কঙ্কালশীর্ণ মূর্ত্তি লইয়া তাহাকে বিভীষিকা দেখাইবে। জীবন সংগ্রামে আবার তাহাকে বিপর্য্যস্ত হইতে হইবে ; কিন্তু তাহাও প্রার্থনীয়—সহস্রবার শিরোধার্য্য।

পিতা বলিলেন, "তোমার মত কি ঠিক করে বল।"

শিশির দৃঢ় অকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমি ত বলেছি, আমার শরীর পাত করে মোট বহেও আপনাদের ভরণপোষণ বরং শ্রেয়ঃ মনে করি।"

সক্রোধে পিতা কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

(৫)

দ্বিতীয়বার পুত্র যে হঠকারিতা ও অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিল তাহার জন্য পিতা ও বিমাতা কোনও মতেই তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রকাশ্যে এ বিষয়ে মন্তব্য-প্রকাশ শোভন নহে ; কারণ সকলদিক বিচার করিয়া দেখিলে কেহ তাহাকে কোনমতেই অপরাধী করিতে পারিত না। কিন্তু স্বার্থ যাহাদিগের সর্ব্বস্ব, তাহারা স্বার্থহানিতেই ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। যাহার জন্য স্বার্থহানি ঘটে মনে মনে তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে না।

আপিসের ভাগ্যবিধাতাও অভিষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে হতাশ হইয়া সতীর্থকে আর প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেন না। একজন বাহিরের লোক আসিয়া আপিসের যোগ্য ব্যক্তিদিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়ায় নিরীহ কেরাণীরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। সরকারের উচ্চতম বিভাগে এ বিষয়ে আবেদন করিয়া তাহারা বিচারপ্রার্থী হইয়াছিল, কাজেই হাঙ্গামা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কৌশলী, চক্রী ভাগ্যবিধাতা শিশিরকে আপিস হইতে সরাইয়া দিলেন। সেত প্রস্তুতই ছিল।

নত মস্তকে সে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে অভিবাদন করিল। দৃঢ়চিত্তে সমগ্র বিপদের সম্মুখীন হইল। আবার সেই কঠোর জীবনযাত্রা।

পিতা ও পুত্র সারাদিনরাত্রি কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিল। ইহাতে ছোট ছোট ভাই ভগিনীগুলির পাঠ ও চরিত্র গঠন সম্বন্ধে কাহারও দৃষ্টি রাখিবার অবকাশ রহিল না। স্বাধীনতার মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিলেই উহা উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হয়। শিশিরের ছোট ভাইদুইটি পাঠে অবহেলা করিয়া অনাচারে মন দিল।

কর্ম্মশ্রান্ত দেহে গৃহে ফিরিয়া সে ভ্রাতাদিগকে কর্ত্তব্যে উদাসীন দেখিলে মৃদু তিরস্কার করিত, উপদেশ দিত। কিন্তু সব দিন এরূপ অবকাশও সে পাইত না। ভ্রাতারা পূর্ব্বে তাহার শাসন বা উপদেশ পালন করিত; কিন্তু পিতামাতা শিশিরের অসাক্ষাতে তাহার আচরণ সম্বন্ধে অপ্রীতিকর আলোচনা করিতেন, স্নেহহীন কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। বালক বালিকারা তাহা শুনিয়া শুনিয়া শিশিরকে আর তেমন সম্মান করিতে চাহিত না। শিশির তাহা বুঝিত না, সে স্নেহ ও কর্ত্তব্যের প্রেরণায় তাহাদিগের চরিত্র সুগঠিত করিয়া তুলিবার যত্ন করিত।

দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে মানুষের সকল উচ্চ মনোবৃত্তি নিষ্পিষ্ট হইয়া যায়। ক্রমে হীন স্বার্থ, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি নীচ বৃত্তিগুলি প্রবল হইয়া উঠে। সে অবস্থায় বিশেষ ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে না পারিলে সর্ব্বনাশ ঘটে। শিশির আপনাকে যথাসাধ্য সংবরণ করিয়া চলিতে লাগিল; কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিতে অশেষ বিলম্ব করিতে লাগিলেন।

তবে সুখের বিষয় প্রৌঢ় যতীশচন্দ্র দালালী কার্য্যে ইদানীং কিছু সুবিধা করিয়া ফেলিলেন। শিশির তখন অখণ্ড মনোযোগ সহকারে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল। পিতার উপার্জ্জনে তাহার জীবনধারণ করা বাঞ্ছনীয় নহে—সেই উপার্জ্জন করিয়া তাঁহাকে ভরণপোষণ করিবে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে তাহার একটি ছেলে পড়ানর কাজ চলিয়া গেল।

একটি কাজের চেষ্টায় সে ৪।৫ দিন কলিকাতা হইতে অন্যত্র গিয়াছিল। বাড়ী ফিরিয়া সে শুনিল, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিন দিন বাটী হইতে পলাইয়া কোথায় গিয়াছিল। এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়া সে মাতার তিরস্কারে কড়া জবাব শুনাইয়া দিতেছে।

অসাফল্য ও নৈরাশ্যবশতঃ ইদানীং সত্যই শিশিরের শান্তপ্রকৃতি কিছু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। কিশোর ভ্রাতার অবিনয় ও ঔদ্ধত্যে সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে শাসন করিতে গেল।

দুই চারি কথার পর কিশোর ভ্রাতা শিশিরকেও এমনভাবে বিদ্রূপ করিয়া উঠিল যে, শিশিরের পক্ষেও ধৈর্য্যধারণ সে ক্ষেত্রে অসম্ভব। সে ভ্রাতার কাণ ধরিয়া তাহার গণ্ডদেশে একটি চপেটাঘাত করিল।

দুষ্ট বালক এমন বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল যে, চারিদিক হইতে সকলে ছুটিয়া আসিল। যতীশচন্দ্র বাহিরে ছিলেন, তিনিও মুক্তকচ্ছ হইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যতীশবাবু সন্তানদিগকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিতেন; কাহারও কোন প্রকার শাসন তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। আদরের দুলাল মাটীতে লুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে দেখিয়া তাঁহার পিতৃ-স্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। শিশির এই অভিনব দৃশ্যে অপ্রতিভভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পত্নীর দুই চারিটী মন্তব্য, বালকের আর্ত্তনাদ—যতীশচন্দ্রের ধৈর্য্যের বাঁধকে বিচলিত করিয়া দিল। শিশিরের উপর এত দিন ধরিয়া যে বিরক্তি ও ক্রোধ পুঞ্জীভূত হইতেছিল, আজ বাঁধ-বিমুক্ত বন্যাপ্লাবনের মত তাহা বিপুল উচ্ছ্বাসে শিশিরকে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

পিতার স্নেহহীন মর্ম্মান্তিক কঠোর বাণী মুহূর্ত্তের জন্য পুত্রকে স্তব্ধ করিয়া দিল। সে আপনার কর্ণকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

কিন্তু যতীশচন্দ্র যখন বলিলেন, "এ বাড়ীতে তোমার সত্যই স্থান হবে না। তোমার মত পিতৃদ্রোহী সন্তানের আদর্শে আমার অন্য ছেলেরা বিগ্‌ড়ে যাবে।" তখন শিশিরের মস্তক আপনা হইতেই নত হইল।

হাঁ, এই তাহার যোগ্য পুরস্কার।

সে মাথা তুলিতে পারিতেছিল না। পৃথিবীর মানুষের দিকে চাহিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। মানুষকে সে চিরদিন মানুষের দৃষ্টিতে দেখিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে; আর তাহার পিতাকে সে দেবতার আসনে বসাইয়া মনে মনে পূজা করিয়া আসিয়াছে যে! সে আদর্শ মুখ তুলিয়া চাহিলেই শতধা ভাঙ্গিয়া যাইবে না?

"আজ এখনই তুমি পথ দেখ, বাপু। তোমার যে রকম মেজাজ হয়েছে, তাতে কোন্ দিন কাকে খুন করে বস্‌বে!"

ধীরে ধীরে শিশির সে কক্ষ ত্যাগ করিল। আপনার শয়নগৃহ হইতে বিছানা ও ট্রাঙ্ক বাহির করিয়া সে মুটের মাথায় দিল। পিতা ও মাতাকে প্রণাম করিয়া নীরবে সে গৃহত্যাগ করিল।

তখন ঢং ঢং করিয়া সন্নিহিত থানার ঘড়ীতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

"বুকে দোলে তার বিরহ ব্যথার মালা!"

ফাল্গুন মাস। জ্যোৎস্না রাত্রি। শহরের একটা নিন্দিত অঞ্চলের কোনও একটা হোটেলে একতলার খোলা ছাদের উপর টেবিল পাতিয়ে তিন বন্ধুতে গল্প করতে করতে পানাহার ক'রছিলেন। তবে আহারের চেয়ে পানের মাত্রাটাই তাঁদের বেশী চলছিল এবং তার চেয়েও বেশী তাঁরা বক্তার হ'য়ে উঠেছিলেন!

"—আচ্ছা বিশু, ও বুড়ো লোকটা কে বল্‌ত ভাই? হঠাৎ যেখানে সেখানে এসে প'ড়ে এমন মুস্কিল বাধায়! চিনিনি শুনিনি বটে, তবু কেমন দেখলেই ওকে সমীহ না করে থাকতে

পারি নি। হাতের সিগারেট-টা যেন আপনিই হাত থেকে পড়ে যায়। আমি বেশ লক্ষ্য করে দেখিছি - এক ফোঁটাও মাল ও কখন চেকে দেখে না,—দু'দণ্ড কোথাও বসে--দু'একখানা গান শুনে যে একটু তারিফ করে যাওয়া—তাও করেনা - রাত কাটানো তো দূরের কথা – অথচ—"

রাসবিহারীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সনৎ বল্‌লে –"অথচ—রোজ রাত্রেই কোনও না কোনও সুন্দরীর বাড়ীতে ওঁকে দেখতে পাওয়া যাবেই!—ভদ্রলোক দেখি সব পাড়াতেই ঘোরেন—!"

বিশু বল্‌লে—"যা বলেছো—ওই প্রকাণ্ড দুই কালো 'ওয়েলার' জুড়ী জোতা হলদে রংয়ের মস্ত 'ল্যাণ্ডো" খানা শহরের হেন বেশ্যাপল্লী নেই যেখানে দেখতে পাওয়া যায় না।"

রাসবিহারী বলে উঠলো "আর কি খাতিরই ক'রে ওঁকে এই সব বিবিজানেরা, সেটা দেখেছো? যেন ওদের বাপের ঠাকুর এলেন। সেদিন 'বিণী'র বাড়ীতে বেড়ে জমজমাট আসর বসেছে তোফা গান বাজনা হচ্ছে—হরদম মাল চলেছে—ধুম ফূর্ত্তি—বুঝলে দাদা—এমন সময় দেখি একমাথা পাকা বাবরী চুল নিয়ে সেই বুড়ো এসে দাঁড়িয়েছে।—ব্যস! গানের সুরের মাঝখান থেকেই তাল কেটে দিয়ে নাচের তেহাই শেষ না ক'রেই, মুখের গেলাস আধখাওয়া নামিয়ে রেখে—হাতের সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—আমাদের মতো সব কাপ্তেন বাবুদের থোড়াই কেয়ার করে হুড়মুড়িয়ে ছুটে গেল 'বিণী'টা তাকে খাতির ক'রতে। কেন বলোতো?—"

বিশু বললেন "কে জানে ভাই। শুনতে পাই শহরের সব ঠাক্‌রুণেরাই ওই বুড়োপ্রাণকে ভয়ানক খাতির করে! ব্যাপারটা কেমন আজও রহস্যজনকই রয়ে গেছে"—শেষের এই কথা গুলো প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে বলতে বলতে হঠাৎ সামনে একজনকে দেখে প্রচণ্ড উৎসাহে চিৎকার করে বিশু বলে উঠল--"আরে। কেও! ঠাকুরদা যে। --আরে, এস এস দাদা—বসে যাও, এই নাও একেবারে সোডা বরফ চড়ানো টাট্‌কা ব্র্যাণ্ডীর গেলাসটি—তোমার জন্যই তৈরী! এক খানা গরম কাট্‌লেট্‌ ভেজে আনতে বলবো নাকি?—এইই বয়—"

নীচের রান্নাঘরের থেকে খান্‌সামা সাড়া দিলে "হুজুর।"

"—আরে না হে ভায়া না। ওসব কাট্‌লেট্‌ ফাট্‌লেট্‌ তোমাদের জন্যই থাক; আমার কি আর দাঁত আছে যে ওসব চিবিয়ে খাবো?—আমার এখন এক মাত্র সম্বলই হচ্ছে এই—'লিকুইড ফুড্‌!'—এর জন্যই এখনও বেঁচে আঁছি বাবা।"—বলে হাসতে হাসতে বিশুর হাত থেকে মদের গেলাসটা নিয়ে ঠাকুর দা পাশের একখানা চেয়ারে ব'সে চুমুক দিতে সুরু করলেন।

ঠাকুর্দ্দা লোকটির বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি হবে। চুলপাকা এবং দাঁত পড়া সত্ত্বেও বেশ হৃষ্ট পুষ্ট স্বাস্থ্যকর চেহারা, অথচ দেখলেই তাঁকে একটি পাকা মাতাল বলে সহজেই চেনা যায়!

বিশু ব'ললে "আজ আর তোমায় ছাড়ছিনি ঠাকুরদা; রোজ বলো—ব'লবো রে—

ব'ল্‌বো –আর রোজই শেষ পর্য্যন্ত ওটা শোনবার মতো আমাদের আর অবস্থা থাকে না! আজ এই বেলা শুনিয়ে দাওতো দাদা তোমার সেই বুড়ো-ইয়ারটির ইতিহাস। তোমাকে তো প্রায়ই ওর সেই 'সবচিন' ল্যাঙোজুড়ীতে মানিকজোড়ের মতো ওর পাশে বসে আছো দেখতে পাই, শুনতেও পাই যে ও নাকি এককালে তোমার 'ক্লাস-ফ্রেণ্ড' ছিল! এমন এক ক্লাসের বন্ধুটিকে তো আজও ঠাকুরদা একগ্লাসের ইয়ার ক'রে তুলতে পারলে না!—ছ্যাঃ, তুমি কুছ কাম্‌কা নও। কেবল আমাদেরই মতো ছেলে ছোকবাদের বখাতে শিখেছো দেখছি।—"

ঠাকুর্দ্দা হাসতে হাসতে কৃত্রিম ধমক দিয়ে বললেন "চুপ কর্ বিশে; তোর বড্ড নেশা হয়েছে দেখছি! আর টানিস্‌নি, মাতাল হ'য়ে পড়বি! ঠাণ্ডা হয়ে ব'সে শোন আজ তোদের ওই অমূ চৌধুরীর ব্যাপারটা ব'লবো—এ আমার একেবারে খোদ অমূর নিজের মুখ থেকে শোনা;— জানিস্‌তো ওরা ঠন্‌ঠনের চৌধুরী বংশ, মস্ত বনিয়াদী বড়লোক—একটা ঘরেযানা ঘরের ছেলে —কিন্তু হ'লে কি হবে—বাপের মিথ্যে একগুঁয়েমীর জন্য ওর জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেছে! শোন্ তবে গোড়া থেকে বলি –অমূ যখন এণ্ট্রান্স্ পাশ ক'রে প্রেসিডেন্সী কলেজে আমাদের সঙ্গে এফ্-এ পড়ছে –সেই সময় ওর সঙ্গে আলাপ।

একদিন শীত কালের এক ধোঁয়াটে সন্ধ্যেবেলায় গায়ের আলোয়ান খানার মধ্যে কি একটা গোপনে ঢেকে নিয়ে অমূ তাদের ফটক পার হয়েই সাম্‌নের ভাঙাচোরা একতলা বাড়ী খানার মধ্যে ঢুকে পড়লো।

এঘর ওঘর খুঁজে মাঝের ঘরের ভেজিয়ে রাখা দরজাটা ঠেলে দেখলে একখানা ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে ছোটো ভাইটিকে কোলের কাছে নিয়ে শৈলজা ঘুম পাড়াচ্ছে। ঘরের কোণে একটা মাটির দেলকোর উপর তৈলহীন প্রদীপটা নিভে যাবার পূর্ব্বাভাস জানাচ্ছে।

দরজার দিকে পিছন ফিরে ব'সেছিল বলে অমূকে সে দেখতে পাইনি। অমূ ডাকলে "শৈলী!"

শৈলজা ঘাড় ফিরিয়ে অমূর দিকে চেয়ে—আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে—"একি! তুমি এমন সময় যে অমূদা! জ্যাঠামশাই বুঝি এখনও বেড়িয়ে ফেরেন নি?" এই বলতে ব'লতেই, তার ঠোঁটের ধারে ধারে একটা দুষ্টুমীর চাপা হাসি উঁকি মেরে গেল! সে একটু ঝুঁকে পড়ে নিষ্প্রভ প্রদীপ শিখাটা উস্কে দিতে দিতে বল্‌লে—"ঘরের ভিতর এসে বোস'না ভাই, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, হিম লাগবে যে!"

তৈলহীন দীপ ক্ষণেকের জন্য উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে আবার স্তিমিত হয়ে এল। শৈলজা ডাক্‌লে—

"মা একটু তেল দিয়ে যাও না এ ঘরের পিদীমটা নিবে যাচ্ছে।—"

রান্নাঘর থেকে খুন্তি নাড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো—"কেন তুমি কি এমন

নবাবের বউ হয়েছো যে অন্ধকারে থাকতে পারবে না? থাকগে পিদীম্ নিবে,—ঘরে এক ফোঁটাও তেল নেই।"

অমূ ঘরের ভিতর ঢুকে তার গায়ের কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা ধোপার বাড়ীর পাট করা ফর্সা দিশী কালা পেড়ে ধুতি বার করে শৈলজার কোলের উপর ফেলে দিয়ে একটু ঢোক গিলে বললে—

"আমার অনেকগুলো কাপড় জমে গেছে তাই তোর জন্য একখানা নিয়ে এলুম শৈলী! তুই কাল থেকে এই কাপড়খানা পরিস্।"

"শৈলজা কাপড়খানা নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে দেখতে বললে—"বুঝিছি আমার কাপড়খানা বড্ড ছিঁড়ে গেছে দেখে সেবারকার মতো আবার আমাকে তোমার নিজের কাপড় একখানা এনে দিচ্ছ, কিন্তু এ তোমার ভারি অন্যায়। না এ কাপড় আমি কিছুতেই নেব না। কেন তোমার ভাল ভাল কাপড়গুলো আমি পরে পরে নষ্ট করবো।"

অমূ মিনতি করে ব'ললে "লক্ষীটি নে ভাই, তুই। কাপড়গুলো কেউ না প'রে নষ্ট হওয়ার চেয়ে তুই পরবি সেটা কি ভাল নয়?"

শৈল এবার উঠে দাঁড়িয়ে কাপড়খানা ভাঁজে ভাঁজে খুলে নিজের কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত ঝুলিয়ে ধ'রে বহর মাপতে মাপতে ব'ললে "ইস্! এত বড় কাপড় আর এই এমন ভাল দামী কাপড় আমাকে দিয়ে যাচ্ছ, তোমার পিসীমা জানতে পারলে কিন্তু ভারি বকবেন—তোমাকেও আমাকেও—"

"নারে না, পিসীমা কিছু টের পাবে না, তুই সেবারকার মতন কাপড়খানা রং করে নিস্, আমি কাল কলেজ থেকে আসবার সময় রং কিনে নিয়ে আসবো, বুঝলি। আমি এখন চল্লুম—বাবার বেড়িয়ে আসবার সময় হ'লো—"বলতে বলতে অমূ যেমন নিঃসাড়ে এসেছিলো তেমনিই নিঃসাড়ে চলে গেল।

ঘরের প্রদীপটা সেই সময় একবার বাঁচবার শেষ চেষ্টা করে নিভে গেল।

শৈলজার চোখ দুটো অকারণ জলে ভরে উঠেছিল। অন্ধকারে সে অমূর দিয়ে-যাওয়া কাপড়খানা মুখের উপর চেপে ধ'রে নিজে চোখ দুটো মুছে নিলে।

শৈলজার মা মহামায়া একদিন রাত্রে শয্যাপার্শ্বস্থ নিদ্রাতুর স্বামীকে পা ঠেলে তুলে বললে—"ওগো! শুনছো?—ঘুমুলে না কি? বলিহারী যাই তোমার ঘুমকে। অত বড় মেয়ে বাড়ীতে পুষে রেখে তুমি দু'চোখের পাতা এক করো কী করে? আমি তো আহার নিদ্রা ত্যাগ করিছি।"

পতিতপাবন এবার স্ত্রীর দিকে পাশ ফিরে বললে "তা বেশ করেছো, কিন্তু তাতে তোমার মেয়ের বিয়ে তো খুব বেশী এগিয়েছে ব'লে বোধ হ'চ্ছে না।"

"না না সত্যি,—তামাসা রাখো। একটা কাজের কথা বলি শোনো। ওই রায়েদের ছেলে অমূ এতটুকু বেলা থেকে আমাদের শৈলীর সঙ্গে খেলাধূলো ক'রে এসেছে। আজ দু'জনেই ডাগর হয়েছে বটে, কিন্তু ওদের হাল চাল দেখে আমার মনে হয় যে ওদের সেই ছেলেবেলাকার স্নেহ এখন যেন একটা বেশ গভীর ভালবাসায় দাঁড়িয়েছে। ছেলেটা শৈলীকে যেন মার পেটের বোনের চেয়েও বেশী ভালবাসে আর তোমার মেয়েও একেবারে 'অমূদা' বলতে অজ্ঞান! তা তুমি এক কাজ করনা গা—এখানে ওখানে পাত্র খুঁজে খুঁজে পায়ের জুতো ছিঁড়ছো কেন,—একদিন অমূর বাপকে গিয়ে ধরনা।"

পতিতপাবন একথা শুনে হেসে ফেললে। বললে "তোমার বামন হ'য়ে চাঁদ ধরবার সাধ যে দেখছি। ওরা শহরের একঘর প্রসিদ্ধ বড় লোক, আমার মতো দীনদুঃখীর মেয়েকে ওরা নেবে কেন? আর কোন আক্কেলেই বা আমি সে কথা রায়মশাইকে বলতে যাবো।"

"—আহা, নিক না নিক, ব'য়েই গেল। তুমি একবার ব'লেই দেখ না কি হয়। মা মরা ছেলে তাঁর সুখী হবে জানলে হয়ত রায়মশাই এ বিবাহে অমত না করতেও পারেন। আমরা গরীব দুঃখী বটে,—কিন্তু ছোটলোক ত আর নই, আমরা ওদেরই পাল্টা ঘর—তা ছাড়া মেয়েতো আমাদের কালো কুৎসিৎ নয়। শৈলর মতন অমন নিখুঁত সুন্দরী মেয়ে এই বাংলা দেশে হাজারে একটা মেলে কিনা সন্দেহ!—আর অমূ—কি জানো, বাপের ওই এক ছেলে, ওদের বংশের প্রদীপ, ওর মুখের পানে চেয়েও চাই কি রায়ম'শায় গরীবের মেয়েটাকে নিলেও নিতে পারেন, তুমি একবার চেষ্টা ক'রেই দেখো না, তাতে ক্ষতি কি? মেয়েটার যদি বরাত ভাল হয়, চাই কি লেগে যেতেও তো পারে?—"

"কিন্তু, ওঁরা কি এখন ছেলের বিয়ে দেবেন? ছেলে তো সবে একটা পাশ দিয়ে—আর একটা পাশের পড়া প'ড়ছে?"

"হ্যাঁগো হ্যাঁ দেবেন। তুমি ত' কোনও খবর রাখো না ঘটক ঘটকী যাতায়াত করছে। ছেলের মা নেই ব'লে কর্ত্তার বড় ইচ্ছে শিগ্‌গীর ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘরে একটী বউ আনবেন।"

"ঠিক জানো তুমি?"

"আমি ছেলের পিসীর মুখ থেকে সেদিন নিজে শুনে এসেছি।"

"আচ্ছা, সে যা হয় কাল একবার দেখা যাবে।" ব'লে পতিতপাবন মাথার বালিশের নীচে থেকে বিড়ী আর দেশলাই বার ক'রে একটি বিড়ী ধরিয়ে টানতে লাগল, আর আকাশ পাতাল কত ভাবতে লাগল।

*   *   *   *

—"লক্ষ্মী বাপ আমার খাবে এসো, খাবারগুলো জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।"

"—না আমি খাবোনা। তোমার আর একটা কথাও আমি শুনবো না।"

"কেন আমি কি অপরাধ করলুম বাছা ?"

অমূ তার পিসীমার এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে আপনার মনে পাঠ্যপুস্তকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে রইল।

"যা পারিস দু'খানা খেয়ে নিয়ে এসে পড়তে বোস্ না বাছা। আমি আর কত রাত পর্য্যন্ত তোর খাবার কোলে ক'রে নিয়ে বসে থাক্‌বো—বলতো ? আমার কি আর কোনও কাজ কর্ম্ম নেই ?"

বইয়ের পাতা থেকে মুখ না তুলেই অমূ বললে "কে তোমাকে বসে থাকতে বলেছে ; তুমি যাওনা তোমার নিজের কাজে। আমি তো আজ খাবোনা তোমাকে আগেই বলে দিয়েছি।"

"লক্ষ্মী ছেলে, আমার কথা শোন্। আয় খাবি আয়, না খেলে কিসের জোরে কালেজের পাশের পড়া পড়বি ?"

"তোমার কথা তো আর শুনবো না—বলিছি।"

"কেন, কি হয়েছে ? এত নাক-ফোলা রাগ কিসের জন্য শুনি ?

"তুমি কি আমার একটা কথাও শোনো যে তোমার কথা আমি শুনবো ?"

"ও মাগো। কি নেমকহারাম ছেলে তুই ? তোর কোন কথাটা আমি কবে না শুনেছি বল্ ? এই যে সেদিন কিসের চাঁদা দিতে হবে বলে আমার কাছে একটা টাকা নিয়ে গেলি, দাদা শুন্‌লে কি তোকে আস্ত রাখতো ?"

"এতো আর চাঁদা দেবার কথা হচ্ছে না। বাগান থেকে কাল অত তরিতরকারী ফল-মূল এলো তোমাকে কত ক'রে বললুম শৈলীদের কিছু পাঠিয়ে দিও পিসীমা ; তা তুমি কি দিয়েছিলে ?"

"কেন দেবো শুনি ? শৈলীরা কে তোমার হরির খুড়ো মাধাই দাস—সাত পুরুষের কুটুম—যে যেখান থেকে যখন যা আসবে তাই আগে শৈলীদের বাড়ী পাঠাতে হবে ?—এ যে তোমার অন্যায় আব্দার অমূ।"

"কেন, কেউ না হ'লে বুঝি কাউকে কিছু দিতে নেই ? ওরা গরীব, ওদের দিলে তোমার পুণ্যি হ'তো। আর কেউ নয়ইবা কেন ? তোমার ওরা কেউ না হ'তে পারে, কিন্তু আমার তো শৈলী ছেলেবেলার বন্ধু।"

"আচ্ছা গো আচ্ছা ; এবার কিছু এলে আগে তোমার ছেলেবেলার বন্ধুকে পাঠিয়ে দিয়ে তবে জলগ্রহণ করবো। নে বাছা উঠে আয়, খেয়ে নিবি চ'। দু'বেলা খাওয়াবার জন্য আমি আর তোর খোসামোদ করতে পারছিনি, এবার রাঙাবউ আনছি। সে এলে তার ওপর তোর খাওয়াবার ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হবো।"

"হ্যাঁ, আমি অমনি বিয়ে করছি কিনা ?"

"অমনি কেন করবি ? কত কি জিনিস পাবি।"

"আমি তোমাদের কথায় বিয়ে করবো না।"

"না করবে না বই কি ? দুপাতা ইংরেজী পড়ে মাতব্বর হয়েছো না ? আইবুড়ো কার্ত্তিক হয়ে থাকবে। চল খাবি চল— বিয়ে করিস কিনা সে পরে দেখা যাবে।"

"আচ্ছা দেখো"— বলে অমূ তার পড়ার টেবিল ছেড়ে পিসীর সঙ্গে উঠে গেল।

* * * * *

পতিতপাবন পরদিন দোকানের ফেরত বাড়ীতে এসে আর কিছু খেলে না। তার যন্ত্রপাতি বার করে চশমাটা চোখে দিয়ে প্রদীপের আলোয় দু'টো পুরাণো ঘড়ীর কল কব্জা খুলে মেরামত করতে বসল।

মহামায়া এসে বললে "হ্যাঁগা কিছু খেলেনা যে! এসেই একেবারে কাজ নিয়ে বসলে ?"

"আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রাখো প'রে খাবো। হ্যাঁ, আজ তোমার মেয়ের বিয়ের সব পাকাপাকি করে এলুম। এই মাঘমাসের শেষেই দিনস্থির করিছি। টাকাকড়ির যোগাড় ক'রতে হবে। হাতের কাজগুলো চটপট তুলে দিতে পারলে কিছু পাওয়া যেতে পারে।"

"হাঁগা, সত্যি ঠিক করে এলে! আ! বাঁচলুম! মুখে যেন অন্ন আর উঠছিল না! ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। রায়মশাই তাহ'লে শৈলীকে নিতে রাজি হয়েছেন ? দেখলে তো, বললুম ও রাজী হ'তেই হবে। সবে ধন নীলমণি ওই একটিমাত্র ছেলে তাঁর—মা মরা শিবরাত্রির শ'লতে—তাকে কি আর বাপ হ'য়ে অসুখী করতে পারে ? ভাগ্যে আমার কথা শুনে গেলে নইলে কি আর এমন রাজযোটকটি হ'তো ? আমার রাজার ঘরের যোগ্য মেয়ে রাজার ঘরেই পড়বে। শৈলী পোড়ারমুখী একথা শুনে আর আহ্লাদে বাঁচবে না। কত পুণ্য করেছিল তাই অমূর মতো স্বামী আর রায়মশা'য়ের মতো শশুর—"

বাধা দিয়ে পতিতপাবন গর্জ্জে উঠল—"খবরদার ওদের নাম আর মুখে এনো না তুমি! অমূর বাবাটা যে এতবড় ছোটলোক পাজী তা আমি জানতুম না। তার মুখ দেখলেও পাপ হয়।"

মহামায়ার মুখখানি ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। তার সর্ব্বাঙ্গ কি যেন একটা আতঙ্কে কেঁপে উঠ্‌ল। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ধীরে ধীরে মহামায়া ব'ললে তবে কোথায় তুমি মেয়ের বিয়ের পাকাপাকি ক'রে এলে ?"

"আমি সেই কলমীগাছির পাত্রটিই ঠিক করে ফেললুম। কিছু নেবেনা বলেছে। আমি যা দিতে পারবো তাই। খুব ভদ্রলোক তারা। পয়সা তাদেরও আছে; কিন্তু পয়সার

গরমে তারা এখনও ওদের মতো ছোটলোক হ'য়ে ওঠেনি। বড়লোক না ছুঁচো!—ব'লে কটমট করে পতিতপাবন সামনের ফটকওলা মস্ত বাড়ীখানার দিকে চেয়ে রইল।

মহামায়া চমকে উঠে বললে—"সেকি! তুমি শেষটা কল্মীগাছির পাত্রটিই ঠিক ক'রলে? অথচ নিজেই দেখে এসে বলেছিলে একেবারে বাঁদরের মতো কুৎসিৎ দেখতে, বয়সেও নাকি প্রাচীন হয়েছে—"

পতিতপাবন একেবারে উগ্র হ'য়ে উঠে বললে—"তা এখন কি করবো—মেয়েতো আমায় পার করতে হবে? আর এমনই বা কি বয়স হয়েছে? ওর চেয়েও বুড়ো জামাই কত লোক করেছে। বেটাছেলে—পুরুষমানুষ—তার আবার বয়সই বা কি—আর রূপই বা কি? এক পয়সার সংস্থান নেই যার সে এখন তোমার ফরমায়েসী কার্ত্তিকের মতো সুপুরুষ অল্প বয়সের জামাই সাত তাড়াতাড়ি কোথায় পায় বলো? এদিকে যে মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে বলে তোমার চ'খে ঘুম নেই, মুখে ভাত রুচছে না বলো?"

"হ্যাঁগা, তাবলে কি সেই বানরের গলায় আমাদের এমন গজমতির হারের মতো সুন্দরী মেয়েটাকে তুলে দেবো? মেয়ে বলে কি বানের জলে ভেসে এসেছে? সেকি মানুষ নয়? তার কি রক্তমাংসের শরীর নয়? তার কি পছন্দ অপছন্দ বলে কিছু নেই?"—বলতে বলতে মহামায়া প্রায় রোরুদ্যমানা হয়ে উঠলো।

অসহিষ্ণুর মতো পতিতপাবন বলে উঠলো "থামো থামো! ওসব বিবেচনা করবার আর এখন অবসর নেই। সব ঠিক হয়ে গেছে।"

"কি ঠিক হয়েছে শুনি?"

"আমি তাদের কথা দিয়েছি—ওইখানেই মেয়ে দেবো। এই রবিবারেই উভয় পক্ষের আশীর্ব্বাদ। আর সামনের ২৮শে, ২৯শে যেদিনটা ভাল সেই দিন বিবাহ। ওই ছোটলোক রায়মশায়ের কাছ থেকে আমি মেয়ের বেতে একটি পয়সাও সাহায্য নেবো না!"

"হঠাৎ একথার মানে কি? তিনি তোমার মেয়ের বিয়েতে কিছু সাহায্য ক'রতে চেয়েছেন নাকি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ! স্পর্দ্ধার কথা শোননা, 'ব্রাহ্মণকে জুতো মেরে গরুদান' করতে চায়! বলে,—'ঘড়ীওয়ালা মিস্ত্রীর মেয়ে রায়বংশের বউ হবে এ দুরাশা কেন করেছো পতিতপাবন? যাও তোমার যেমন অবস্থা সেইরকম একটি ঘরের পাত্র দেখে মেয়েটির বিয়ে দাওগে। আমি না হয় তোমার কন্যাদায়ে দু'পাঁচটাকা সাহায্য ক'রবো—বুঝলে! তোমাদের মতন ও হাঘরের মেয়েকে আমি ঘরে আনতে পারবো না কিছুতেই।'—এই অপমানের কথাগুলো আমাকে কেবল তোমাদের দোষেই শুনতে হ'লো।"

"যাকগে, ও তুমি কিছু মনে করোনা। 'ঘড়ীওলা মিস্ত্রী' কথাটা মোটেই গালাগাল

নয়, ওটা বরং 'কেরাণী' বা 'দোকানীর' চেয়ে অনেক মান্যের পদ,—তবে তাঁর বলবার রকমে একটু দোষের হয়েছে বটে। আর উনি যে নিজের বাড়ীতে পেয়ে তোমার অপমান করবেন এটা আমি কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি।—হ্যাঁ, তাহ'ল সেই কলমীগাছির পাত্রটিই ঠিক হ'ল, না?"

"হ্যাঁগো, তাতো এই তিনবার বললুম।"

"তা বটে! তা বটে! তবেত' আর দেরী নেই। এখন থেকেই বিয়ের সব যোগাড়যন্ত্র সুরু করে দিই তাহলে?"

"যোগাড় যন্ত্র আর কি হাতি ঘোড়া ক'রবে? কোনওরকমে রুলী চেলী পরিয়ে মেয়েটাকে পার করা বইত নয়।"

"আহা, তা ছাড়া আর কি বলনা। তবু কি জানো এই হ'ল আমাদের প্রথম কাজ। দু'পাঁচজনকে বলতে হবে ত? আচ্ছা, সে যা হয়, এরপর পরামর্শ ক'রে ঠিক করা যাবে—আমি এখন চল্লুম, ভাত চাপি'য়ে এসেছি।" বলতে বলতে মহামায়া রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। পতিতপাবন কিন্তু দু'ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করেও সেদিন ভাঙা ঘড়ী দুটোর কলকব্জা কিছুতেই আর ঠিক ক'রে বসাতে পারলে না। তার নিজের বুকের ভিতরকার ক'লজের কলকব্জাগুলো সেদিন কেমন যেন বিকল হয়ে পড়েছিল।

*　　*　　*　　*

"কিরে শৈলী, তোর নাকি ২৯ শে মাঘ বিয়ে হবে?"

"নিজের বিয়ে হবে কিনা, তাই বুঝি আমাকে ঠাট্টা করতে এসেছো?"

"আমি তো আর তোর মতন মেয়েমানুষ নই য়ে, বুড়ো হাবড়া, কালো কুৎসিৎ যার সঙ্গেই বাপ মা বিয়ে দেবে তার সঙ্গেই অমনি ঘোমটা দিয়ে চলে যাবো!"

শৈল এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে নতশিরে দাঁড়িয়ে রইল। তার দুই চখের কোণ জলে ভরে আসছে দেখে অমূ তাকে সস্নেহে বললে—"শৈলী, তুই কাঁদছিস্ কেন?—কাঁদিস নি; ভয়কি তোর? আমি রোজ ঠাকুরের কাছে মানছি যে 'হে ঠাকুর, শৈলীকে যে বিয়ে করতে আসছে সে যেন পথেই রেলগাড়ী চাপা পড়ে'।"

"যাও এ সময়ে ঠাট্টা ভাল লাগে না। কত যে পাপ করিছিলুম তাই মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছি! তোমাদের কি বলনা অমূদা! বিয়ে করবোনা বল্‌লেই হ'লো—আর মেয়ের বেলা, বিয়ে তাকে একটা করেতেই হবে—তা সে তার ইচ্ছে থাক বা না থাক্।........নইলে নাকি বাপ মার জাত যাবে।—"

"তা তুই ব'ললিনি কেন শৈলী যে তুই আমার বউ, আর কারুর নয়।"

"বলেছিলুম তো মার কাছে, তা মা বললেন আর একজন এসে যদি অমূর বউকে জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে যায়, তাতে বউয়ের কি দোষ?"—বল্‌'তে বল্‌তে শৈল এবার আঁচলে

চখের জল মুছে—জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা অমূদা, সত্যই কি আমাকে তবে তোমার চখের সামনে অন্য লোকে কেড়ে নিয়ে যাবে ?"

"হ্যাঁ অমনি নিয়ে গেলেই হ'লো! এটা অমনি মগের মুল্লুক কিনা!"—বলে অমূ বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল।

শৈল উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে "তুমি কি তবে পারবে এটা বন্ধ করতে অমূদা ?"

"দেখিস্ না। মহাভারত পড়েছিস তো। সেই অর্জ্জুন যেমন করে সুভদ্রাকে কেড়ে নিয়ে গেছল—শ্রীকৃষ্ণ যেমন ক'রে রুক্মিণীকে কেড়ে নিয়েছিল—ঠিক তেমনি করেই তোকেও আমি ঐ কল্‌মীগাছির বুড়োর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আসবো।"

উত্তেজিত হ'য়ে শৈল বললে "হ্যাঁ হ্যাঁ সেই বেশ হবে।—কিন্তু—" পরক্ষণেই একটু হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করলে "কিন্তু—আমি তো সুভদ্রা কি রুক্মিণীর মতো রথ চালাতে জানিনি, অমূদা!"

এমন সময় মহামায়া সে ঘরে এসে একটু রুক্ষস্বরে বললে "অমূ, তুমি বাছা আর যখন তখন এমন করে আমাদের বাড়ীর ভিতর এস না। কর্ত্তা বড় রাগ করছিলেন। শৈল এখন বড় হয়েছে, আজ বাদে কাল তার বিয়ে হবে, তোমরা দু'জনে তো আর ছেলে মানুষটি নও।—শৈলী, আয় আমার সঙ্গে রান্না ঘরে খোকার সাবুটা চাপিয়ে দিবি আয় ?"—বলে তিনি শৈলর হাত ধ'রে রান্না ঘরের দিকে টেনে নিয়ে গেলেন।

অমূ খানিকক্ষণ সেখানে স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে থেকে তার পর ছুটে বাড়ী চলে এসে একেবারে তার পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল।

* * * *

সেদিনের পর পুরো একটি বছর কেটে গেছে। সেই যে এক বছর আগে মাঘ মাসের সেই শেষ অশুভ লগ্নটায় কল্‌মীগাছির কোন্ এক কৃষ্ণকায় প্রেতমূর্ত্তি এসে অমূর চ'খের সামনে দিয়েই তার আশৈশবের সঙ্গিনী শৈলকে বিয়ে করে নিয়ে চলে গেছে,সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত অমূর সঙ্গে শৈলর আর দেখা হয়নি।

সত্যিই যেদিন আর একজন এসে অমূর 'বউকে' তাদের সামনের বাড়ী থেকে লুটে নিয়ে চলে গেল, অমূ সেদিন কিছুই করতে পারেনি। শৈলর কাছে তার সমস্ত আস্ফালন নিষ্ঠুরভাবেই ব্যর্থ হয়ে গেছল।

ক্রোধে-ক্ষোভে, অভিমানে-অপমানে, বেদনায়-লজ্জায় তার বুকের ভিতরটায় সেদিন যেন এক প্রলয় তাড়নে তোলপাড় হ'য়ে উঠেছিল। নিষ্ফল আক্রোশে সে শুধু তার পড়বার ঘরটির মধ্যেই পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো অস্থির হ'য়ে ঘুরেছিল।

ঘন ঘন শাঁখ ও উলুধ্বনির ভিতর দিয়ে খুব খেলো একখানি ছোটো লাল চেলী প'রে

ঘোমটার উপর সিঁথি-ময়ুর ঝুলিয়ে, গাঁটছড়াবদ্ধ শৈল যখন নতশিরে ব্রীড়াবনত নববধূর মতই তার বিভীষণ বরের সঙ্গে একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ ভাড়াটে গাড়ীর মধ্যে উঠ্‌ছিল—তখন তার মেঘ্‌লাদিনের মতো আঁধার আকুল মুখখানা ক্ষণেকের জন্য তুলে, বাদল-ঝরা সজল আকাশের প্রায় অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি মেলে যার সন্ধানে সে সামনের বাড়ীর দিকে বিপুল আগ্রহ নিয়ে একবার ফিরে চাইলে, সেও তখন তেমনিই ব্যাকুল হয়ে সেই নববধূর ক'নে-চন্দন তিলকাঙ্কিত মুখখানি একবার দেখে নেবার জন্য পড়বার ঘরের জানালার কপাট দু'টো দু'হাতে খুলে ধরে দাঁড়িয়েছিল।

শৈলর সে জলভরা বড় বড় চোখ দুটি সেদিন যেন অমূকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে, করুণমিনতির সুরে অভিযোগ ক'রে বলে গেছল,—"নিষ্ঠুর, এমনি করেই আমাকে তুমি শেষে পরের হাতে বিলিয়ে দিলে ?"

সে দৃষ্টির বেদনাময় মর্ম্মভেদী ভৎর্সনা অমূর তরুণ-হৃদয়ে যে প্রবল হাহাকার তুলে দিয়ে গেছল, অন্তর্জ্জগতের সেই ঝড় তুফানের মধ্যে তার পিতার অকস্মাৎ মৃত্যুও তাকে বিশেষ কিছু কাতর করতে পারলে না।

রায়মশাই ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহেই অমূর বিবাহ দেবার সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি সে শুভকার্য্য সম্পন্ন ক'রে যেতে পারেন নি। বিবাহের দু'একদিন আগে বিকেলে একদিন বেড়িয়ে আসবার সময় তাঁর গাড়ীর সঙ্গে হঠাৎ ট্রামের ধাক্কা লেগে তিনি এমন আহত হ'ন যে দু'দিন হাঁসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থেকে তাঁর অপঘাত মৃত্যু হয়।

এই দুর্ঘটনায় যে বিবাহ তার স্থগিত হ'য়ে গেল কালাশৌচের শেষে পিসীমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও অমূ আর সে পথে পা দিলে না।

পড়াশুনোতেও আর মন দিতে না পেরে অমূ কলেজ ছেড়ে দিয়ে দিনকতক বিলেত ঘুরে আসবার ব্যবস্থা ক'রতে লাগ্‌ল। পিসীমার কানে একথা পৌঁছতে তিনি একেবারে কেঁদে এসে পড়লেন—"ও বাবা, এমন ক'রে আর আমাকে খুঁচিয়ে মারিস্‌নি, তোকে ব্যগ্রতা করে ব'লছি! হ্যাঁরে বিলেত কি এই হেথা ?—সে যে সাত সমুদ্র তের নদীর পার! না অমূ, কিছুতেই তোকে আমি সেখানে যেতে দেবো না,—তুই যেদিন জাহাজে উঠ্‌বি অমূ—আমিও সেদিন গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ম'রবো এই তোকে বলে রাখলুম!"

কিন্তু ইতিমধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যে অমূর বিলেত যাওয়াটা বন্ধ হ'য়ে গেল বটে, কিন্তু পিসীমার গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরবার সাধটা আরও দ্বিগুণ হ'য়ে উঠল!

*   *   *   *

একবছর পরে অমূ হঠাৎ একদিন শৈলর কাছ থেকে তার নিজের হাতের সেই অতিপরিচিত আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা একখানা চিঠি পেলে।

চিঠিতে লেখা ছিল—

শ্রীচরণেষু—

অমুদা, কই তুমি তো তোমার কথা রাখতে পারলে না। তুমি যে তোমার বউ'কে কেড়ে নিয়ে যাবে বলে আমাকে অভয় দিয়েছিলে সে কথা বুঝি ভুলে গেছ? আমি আর তোমাকে না দেখে এখানে একদিনও তিষ্ঠতে পারছিনি! কতদিন হ'য়ে গেল তোমার পথ চেয়ে রয়েছি বলোতো?

শতকোটী প্রণাম জানবে। ইতি

তোমার দুঃখিনী বউ—
শৈলী

চিঠিখানা অনেকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অমু দেখলে তার আষ্ঠে-পৃষ্ঠে সতেরোটা পোষ্ট আফিসের ছাপ মারা। চিঠিতে তারিখ নেই, ঠিকানা নেই। খামের উপর শুধু লেখা আছে তার নাম আর ঠনঠনে কালিবাড়ীর সম্মুখে রায় মশায়ের বাড়ী পোঁছে। কলিকাতা। কাজেই চিঠিখানা প্রায় মাসাবধি কাল নানা স্থান ঘুরে তারপর যথাস্থানে এসে পোঁচেছে।

সেইদিন রাত্রেই অমু যখন কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে কল্মীগাছি ছুটলো, পিসীমা চখের জল মুছতে মুছতে এসে বললেন—"হ্যাঁ বাবা আমার গা ছুঁয়ে বলে যা ঠিক ক'রে বিলেত যাচ্ছিসনে তো?"

অমু হাসতে হাসতে বললে "না পিসীমা—এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—আমি বউ আনতে যাচ্ছি।"

পিসীমা কথাটা বুঝতে না পেরে অমুর মুখের দিকে চেয়ে সখেদে বললেন "আমি পোড়া কপালী কি সে বরাত করে এসেছি রে যে তোর বউ দেখে চোখ জুড়োতে পার'বো—নইলে আমার অমন রাজা ভাইকে জলজ্যান্ত গিলে কুটে আমি অবাগী আজও বেঁচে আছি!"

—"আমার বউ দেখবার জন্যই তো ভগবান তোমায় বাঁচিয়ে রেখেছেন পিসীমা। তুমি না থাকলে আমার কি দুর্দ্দশা হ'তো ব'লোতো?—আমি এই চললুম—একেবারে বউ'য়ের হাত ধ'রে বাড়ী ঢুক্‌বো। কিন্তু, আমার বউকে তুমি অযত্ন করবে না তো?" বলে অমু আবার হাসতে লাগল।

অনেক দিন পরে ছেলেটাকে আজ প্রাণখুলে হাসতে দেখে পিসীমার বুকটা যেন জুড়িয়ে গেল, বললেন—"শোনো একবার ছেলের কথা! ওরে তোর বউ যে আমার চিরদিনের আকাঙ্ক্ষার ধন—তাকে আমি অযত্ন করবো এমন কথা তুই মুখে আন্‌লি কি বলে? বউত আগে এনেদে' তুই আমাকে—দেখবি সে তখন যত্ন করা কাকে বলে।—আমার অমুর বউকে আমি গলার হার ক'রে রেখে দেবো রে।"

"দোহাই পিসীমা—আমার 'বউত' তোমাদের সেই শ্রীরামচন্দ্রের 'সোনার সীতা' নয় যে তুমি তাকে স্যাকরা ডেকে গালিয়ে নিয়ে গলার হার করে পরবে!"

"তোর সব বাপু যত অনাসৃষ্টির কথা।"—বলে হাসতে হাসতে পিসীমা আবার অমুকে অভয় দিলেন যে—"বউ তুই আগে নিয়ে আয়, তারপর দেখিস্ তাকে আমি কি আদরে রাখি!—"

অমু প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—"না পিসীমা, আগে তাকে এনে তারপর কী হয়, না দেখে,—আমি তাকে আনবার আগে তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই যে এখানে এসে তার অনাদর হবে না।' তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি ক'রে বলো যে আমি যাকে আজ তোমায় বউ বলে এনে দেবো সে যেই হোক্ তুমি তাকে সস্নেহে বুকে তুলে নেবে?—"

পাগল ছেলের জেদাজেদীতে অগত্যা পিসীমাকে দিব্যিটা করতেই হ'লো। অমুও হৃষ্ট চিত্তে তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিয়ে ষ্টেশনে রওনা হ'ল।

*　*　*　*　*

শৈলর বিয়ের অল্পদিন পরেই ভীষণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হ'য়ে পতিতপাবনের স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র যেদিন একশয্যাতেই চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত ক'রলে, পতিতপাবন, সেদিন সজল চ'ক্ষেও একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। তারপর সে ঘড়ীর দোকানটা তুলে দিয়ে বাড়ীখানা বেচে ফেলে কোথায় যে নিরুদ্দেশ হ'য়ে চলে গেছে কেউ তা জানে না। অমু তার অনেক খোঁজ খবর করেছিল কিন্তু কোনও সন্ধানই পায়নি।

শৈলর খবর আনবার জন্যও সে গোপনে কলমীগাছিতে একজন বিশ্বাসী লোক পাঠিয়েছিল। সে লোক ফিরে এসে তাকে বলেছে যে পতিতপাবন বাবুর মেয়ে বেশ সুখেই আছেন, তাঁর কোনও কষ্ট নেই। পতিতপাবন বাবুর জামাই ওখানকার বেশ একজন অবস্থাপন্ন লোক। বয়েসটা তাঁর খুব বেশী না হ'লেও বাত আর হাঁপানি কাশিতে প্রায় বারোমাসই শয্যাগত থাকেন। পতিতপাবন বাবুর মেয়ে তাঁর খুব সেবা শুশ্রূষা করেন।

অমু এখবর পেয়ে শৈলজা সম্বন্ধে একরকম প্রায় নিশ্চিন্তই হয়েছিল। কিন্তু শৈলর এই এতদিন পরে পাওয়া অপ্রত্যাশিত চিঠিখানা তার মনের এমন একটা ক্ষত স্থানে এসে ঘা দিলে যে অমু সেই রাত্রেই কলমীগাছিতে চলে গেল।

মনে মনে সে দৃঢ় সঙ্কল্প করে গেল যে প'রিণাম যাই হোক না কেন, সে তার শৈলকে সেখান থেকে যেমন ক'রে পারে নিয়ে চলে আসবেই।

*　*　*　*　*

কলমীগাছিতে অনেক অনুসন্ধান করে অমু যখন শৈলর শ্বশুর বাড়ী আবিষ্কার ক'রলে, সে একেবারে বরাবর সেখানে গিয়ে উঠলো। কিন্তু সেখানে গিয়ে অমু যা শুনলে তা শোনবার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

পতিতপাবনের জামাতার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী যারা সে বাড়ীটি তখন দখল করে বসেছিল, তারা অমূকে জানালে যে আজ দিন আষ্টেক হ'ল শৈলর স্বামীর কাল হ'য়েছে কিন্তু অত্যন্ত লজ্জার কথা যে বউঠাকুরুণ অশৌচান্ত হবার আগেই তাঁর গহনার বাক্সটি নিয়ে আমাদের মুখে চূণ-কালি দিয়ে কার সঙ্গে নাকি কুলত্যাগ ক'রে চলে গেছেন।

এই খবর শুনে মৃতের মতো বিবর্ণমুখে অমূ যখন গুটি গুটি ষ্টেশনের দিকে ফিরছে তখন পথে একটি অপরিচিত বালক এসে তার হাত ধরে বললে—"আপনি একবার আমাদের বাড়ী আসুন মা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান! আপনাকে ডেকে আনতে বললেন।"

অমূ বিস্মিত ও কৌতূহলী হয়ে বালকের অনুসরণ করলে।

একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝক্ ঝকে তক্ তকে কুঁড়ে ঘরের সামনে এসে বালক বললে "আসুন ভিতরে অসুন। এই বাড়ী আমাদের।"

বালকের গলা পেয়ে ভিতর থেকে মধুর নারীকণ্ঠে কে প্রশ্ন করলে, "গোপাল, তিনি এসেছেন না কি রে?"

"হ্যাঁমা এসেছেন।"

"আয়, ওঁকে ভিতরে নিয়ে আয়।"

অমূ ভিতরে যাবামাত্র একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের বিধবা মেয়ে এগিয়ে এসে দাওয়ার উপর একখানি কাঠের পিঁড়ি পেতে দিয়ে বললে, "আসুন বসুন। আপনিই বুঝি শৈলর অমূদা?"

বিস্মিতভাবে এই অপরিচিতার মুখের দিকে চেয়ে বললে—"হ্যাঁ কিন্তু—"

অমূর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে স্ত্রীলোকটি বললে—"কিন্তু আমি তা কি করে জানলুম ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছেন?—আমি আপনাদের সব জানি। আপনার বৌয়ের মুখ থেকেই সব শুনিছি। তা এতদিন পরে বুঝি আপনার 'বউ'কে মনে প'ড়ল?"

অমূ অপরাধীর মতো নতমস্তকে বললে "আপনি যখন সব জানেন তখন এ অনুযোগ করা আপনার উচিত নয়।"

"দেখুন উচিত অনুচিত ঠিক ঠাক্ হিসাব করে মেনে মানুষ যদি পৃথিবীতে চলতে পারতো তাহলে বোধহয় কারুর জীবনই এখানে অসুখী হতোনা। কিন্তু, সে কথা যাক্। এখন যা বলি শুনুন, লাজলজ্জার মাথা খেয়ে আপনাকে পথ থেকে ধরে এনেছি যে জন্যে আগে সে কথাটা ক'য়ে নিই। দেখুন, আমিও কলকাতারই মেয়ে। ভাগ্যচক্রে এখানে এসে পড়ে স্বামীর ভিটেয় দু'বেলা সন্ধ্যে জ্বালবার জন্য বাস করতে হচ্ছে। শৈল কলকাতা থেকে আসছে শুনে আমি তার পৌছনর দিনই ছুটে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে এসেছিলুম। তাকে দেখেই কেমন আমার মনে হ'য়েছিল যে হিন্দু সমাজের হাঁড়ী-কাঠে আর একটি আমারই মতো বলির পশু

আজ ও-বাড়ীতে এসেছে। হ্যাঁ, তারপর আমাদের সেই একদিনের আলাপ চিরদিনের বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। আপনি যে মনের মতন 'বউ'ই পছন্দ করেছিলেন, এজন্য আপনাকে আমি তারিফ্ দিচ্ছি। রূপে গুণে শৈল আপনার অনুপম! বুড়ো সনাতন ঘোষাল তাকে বিয়ে ক'রে এনেছিল বটে কিন্তু সেই কেশোরুগী কেলে সনাতনকে সে কোনওদিনই স্ত্রীর অধিকার নিতে দেয়নি। আমার পরামর্শ মতো সে তার সেবা-শুশ্রূষা অক্লান্তভাবে করতো বটে, কিন্তু বাঘিনী যেমন করে তার বাচ্ছাকে আগলে রাখে তেমনি করেই শৈল তার অমুদার বউকে আগলে রাখতো। সনাতন ঘোষাল সেদিন মারা যেতে তার জ্ঞাতিরা এসে তার ঘরবাড়ী দখল ক'রে রাতারাতি কোথায় যে তাকে পাচার করে দিলে কেউ জানতে পারলে না। সকালে ওদেরই চেষ্টায় গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেল যে বুড়ো সনাতনের ছুঁড়ী বউটা কাল রাত্রে কার সঙ্গে গয়নার বাক্স নিয়ে উধাও হ'য়েছে।"

অমূ পিঁড়ি ছেড়ে তড়াক করে উঠে পড়ল দেখে—স্ত্রীলোকটি শশব্যস্ত হ'য়ে বললে "আহা, বসুন বসুন অত উত্তেজিত হবেন না, আপনার চোখ মুখ সব রাঙা হয়ে উঠ্ল যে! শুনুন আরও কথা আছে। ভাগ্যে সে যাবার আগে একখানা চিরকুট লিখে গয়লা বৌয়ের হাতে দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল, নইলে আপনি হয়ত তাকে ভুল বুঝে আর গ্রহণই করতেন না।" বলে মেয়েটি তার আঁচল থেকে একখানা চিরকুট খুলে অমূর হাতে দিলে। অমূ প'ড়ে দেখলে শৈল লিখেছে—

"পদ্মা দিদি, এঁরা আমাকে আজ রাত্রেই কলকাতায় আমার বাপের বাড়ীতে রেখে আসবার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন, তোমার সঙ্গে আর দেখা ক'রে যেতে পারলুম না। সে সুযোগও এরা দিতে চায় না। অতএব চল্লুম ভাই, বিদায়। আমার প্রণাম ও ভালবাসা জানবে। কলকাতায় যাচ্ছি শুনে তুমি নিশ্চয় সুখী হবে, কিন্তু ভাই আমার বুক যেন গুর্ গুর্ করছে। সেখানে গিয়ে যদি দেখি যে অমূদা আমাকে ভুলে গিয়ে নতুন 'বউ' এনেছে তা হ'লে জেনো তোমার অভাগী বোন্ শৈল নিশ্চয় মরেছে। ভগবান এই বিদেশে এই কয়েদখানার ভিতর ভাগ্যে তোমার মতো একজন পরমাত্মীয়কে জুটিয়ে দিয়েছিলেন, নইলে দিদি অমূদার এই অবহেলা আমি আজ এই একটি বচ্ছর ধরে সহ্য করতে পারতুম কিনা জানি না। মনে রেখো, ভুলো না। ঈশ্বর যদি দিন দেন আবার দেখা হবে। আসি তবে ইতি—

তোমার স্নেহমুগ্ধ
"অমূর বউ""

অমূর পত্র পড়া শেষ হবামাত্র পদ্মা বললে "বুঝেছেন ত ব্যাপারখানা সব। সনাতন ঘোষালের বিষয়টা ফাঁকি দেবার জন্যই ওঁরা শৈলর নামে গ্রামে এই বদ্নামটা রটাচ্ছেন। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যান। আমি বুঝ্তে পারছি আপনি এখনও নূতন 'বউ' আনেন

নি। শৈল যে একটা 'বাজে লোককে ভালবেসে তার জীবনটা অপব্যয় করেনি দেখে খুব খুসী হলুম। হাসিমুখে বাড়ী ফিরে যান। আপনার বউ এতক্ষণ সামনের বাড়ীতেই গিয়ে হাজির হ'য়েছে নিশ্চয়। বিধবা বিবাহ করতে যদি আপত্তি না থাকে তা হ'লে তাকে সামাজিক হিসাবে প্রকাশ্যে স্ত্রী বলে গ্রহণ করবেন এই আমার অনুরোধ।"

অমূ উঠে পড়ে হাত জোড় করে পদ্মাকে একটা প্রণাম ক'রে বললে "আপনি আমার আজ যে উপকার করলেন এর জন্য আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।"—বাধা দিয়ে পদ্মা বললে,—"না ভাই অত কেতাবী কৃতজ্ঞতা রাখবার আমার মোটেই স্থান নেই—কিন্তু অমনি মুখে চলে যাওয়া তো হবে না। আমি শৈলর দিদি হই, সুতরাং তোমারও দিদি বুঝলে। ও আপনি মশাই গুলো এইবার ছেড়ে লক্ষ্মীছেলের মত হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও। দিদির বাড়ী থেকে কি ধূলো পায়ে বিদায় নিতে আছে?"

এর পর আর অমূর কোনও আপত্তি করাই চল'ল না। পদ্মাদিদির আতিথ্যে পরম পরিতুষ্ট হয়ে অমূ যখন বিদায় নিতে প্রস্তুত হ'ল- পদ্ম হাসতে হাসতে বললে—"বিয়ের খাওয়াটা যেন ফাঁকি দিও না ভাই।"

"সহাস্যমুখে অমূ বললে তোমাকে না নিয়ে গেলে কি শৈল আমায় ক্ষমা ক'রবে পদ্মা দিদি?"

"নিশ্চয়ই করবেনা।"—বলে পদ্মাও খুব খানিকটা হেসে উঠল—তারপরই গম্ভীর হ'য়ে বললে—"দেখ তুমি আমার শৈলর ছেলেবেলার 'বর'। আমি আজ সকালে ঘোষালদের বাড়ী একটা কাজে গিয়ে যেই শুনলুম যে ক'লকাতা থেকে ঘোষালদের নতুন বৌয়ের এক দাদা এসেছেন তাঁর তত্ত্ব নিতে, তাঁর নাম অমূল্য বাবু, আমি তখনি বুঝিছিলুম যে সে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। তাই তোমার সঙ্গে দেখা করবার ব্যগ্র প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হ'য়ে বসেছিলুম। এই পথ দিয়েই তোমাকে ষ্টেশনে যেতে হবে জেনে জানলায় দাঁড়িয়েছিলুম। শুক্‌নো মুখটিতে অবসন্নর মতো যখন ফিরছিলে,—কোনও রকম দ্বিধা না করে আমি ছেলেকে পাঠিয়ে তোমায় ডেকে আনালুম্। তোমার সঙ্গে যে ব্যবহারটা করলুম, মনে করোনা যেন যে গোপালের মা পদ্ম বামূনী যে-কোনও অপরিচিত লোকের সঙ্গে এমনই করে থাকে।" বলতে বলতে তার চ'খে মুখে আবার সেই নির্ম্মল হাসি ফুটে উঠল! এবার হাসতে হাসতেই বললে—"আমার পরিচয় তুমি শৈলর কাছেই পাবে। আজ তবে এসো ভাই। ট্রেণের আর টাইম নেই।"

অমূ অসীম শ্রদ্ধাভরে মস্তক অবনত করে পদ্মাকে আবার একবার প্রণাম করে—সমস্ত পথটা—তার দুঃখিনী শৈলর কথা আর এই আনন্দময়ী অসামান্যা মেয়েটির কথা—ভাবতে ভাবতে কলকাতায় ফিরে এল।

* * * *

কলকাতায় পা'দিয়েই বিদ্যুৎ চমকের মতো অমূর মনে পড়ে গেল—সামনের বাড়াখানা ত আর শৈলদের নেই। পতিতপাবন যে সেখানা লাহাদের বেচে দিয়ে চলে গেছে। পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে অমূ বাড়ী চলে এসে তার সরকার গোমস্তা বামুন চাকর দরওয়ান ঝী প্রত্যেককে ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে জানলে যে কোনও মেয়ে সোয়ারীই সামনের বাড়ীতে এসে দোরে চাবী দেওয়া দেখে ফিরে যায়নি। আশে পাশের দোকানদারদের পাড়ার লোকদের কালীবাড়ীর পুজারীদের—সকলকে জিজ্ঞাসা করেও অমূ শৈলর আসার বা ফিরে যাওয়ার কোনও সংবাদই পেলেনা।

হয়ত' আসবার মুখে পথে কোথাও আটকে পড়েছে, কিম্বা আর কোনও আত্মীয়র বাড়ী হয়ে আসছে এই ভেবে সে আরও দু চারদিন ব্যাকুল হয়ে শৈলর আগমন প্রত্যাশায় থেকে শেষে অস্থির হৃদয়ে আবার কলমীগাছিতে ছুটল। যাবার সময় লাহাদের কাছ থেকে সামনের বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে তার চাবি খুলিয়ে ধুইয়ে মুছিয়ে লোকজন মোতায়েন করে রেখে গেল। হুকুম দিয়ে গেল যে যদি কোনও জেনানা সোয়ারী ইতিমধ্যে সে বাড়ীতে আসে—তাকে যেন খাতির করে বাড়ী ছেড়ে দেওয়া হয়।

কলমীগাঁয়ে এসে অমূ এবার আরও হতাশ হয়ে পড়ল। সর্ব্বাগ্রে সে শৈলর পদ্মা দিদির কাছে ব্যাপারটা জানাতে গিয়ে দেখলে সে-বাড়ীতে কেউ নেই। দোরে তালা দেওয়া। খবর নিয়ে জানলে পদ্মা ঠিক আগের দিনই পাড়ার জনকতক বর্ষীয়সী মহিলার সঙ্গে তীর্থ দর্শনে চলে গেছে। অনেক জায়গা তাদের ঘোরবার কথা—কবে যে ফিরবে কিছুই ঠিক নেই।

সেখান থেকে অমূ গেল আবার ঘোষালদের বাড়ী। জোর ক'রে তাদের চোখ রাঙিয়ে পুলিশের ভয় দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"আপনারা তাকে কলকাতায় তার বাপের বাড়ীতে রেখে আসছি বলে কোথায় নিয়ে গিয়ে রেখে এসেছেন বলুন।"

তারা অমূকে পাগল বলে তার কথা হেসেই উড়িয়ে দিলে! বললে—ও কথা সে কার কাছ থেকে শুনেছে? কে তাকে পরিহাস করেছে। ওসব সর্ব্বৈব মিথ্যা।—সনাতনের মৃত্যুর পর পতিতপাবনের বিধবা কন্যা যে কোথায় পালিয়েছে তারা সে খবর কিছুই জানেনা।

অমূ যদি না স্বচক্ষে পদ্মাকে লেখা শৈলর হাতের চিঠিখানা দেখতো তাহ'লে সেও হয়ত এদের পাল্লায় পড়ে ওই কথাই বিশ্বাস ক'রতে বাধ্য হ'তো। অমূ দেখলে এরা অতিভয়ানক লোক, সহজে এদের কাছে কোনও খবর পাওয়া যাবে না।

*   *   *   *   *

অমূ সেখান থেকে বেরিয়ে একেবারে সোজা কলমীগাঁয়ের থাঁড়ীতে গিয়ে হাজির হলো।

অনেক চেষ্টার পর পুলিশকে হাত ক'রে অমূ তাদের সাহায্যে এবং টাকার জোরে ঘোষালদের এক জনকে ধরতে পারলে যে একটি বউকে নিয়ে সেদিন কলকাতার গাড়ীতে

উঠেছিল। পুলিশের গুঁতোয় শিবু ঘোষাল সব স্বীকার করলে এবং দারোগা ইন্সপেক্টারও অমূকে সঙ্গে করে নিয়ে কলকাতার এক বেশ্যাপল্লীর যে বাড়ীওয়ালীর কাছে সে শৈলকে রেখে গেছল,—দেখিয়ে দিলে। কিন্তু শৈলকে সেখানেও পাওয়া গেল না।

বাড়ীওয়ালী স্বীকার করলে যে—হ্যাঁ এই বাবু একটি সুন্দরী বউকে এ বাড়ীতে রেখে গেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি চলে যাবার পরদিনই মেয়েটি এখান থেকে পালিয়ে গেছে। আমরা অনেক খুঁজেও তার কোনও তল্লাস ক'রতে পারিনি।

তারপর থানায় থানায় হুলিয়া নোটিস্ বিজ্ঞাপন পুরস্কার ঘোষণা কতকি চললো। মানুষের সাধ্যে যতখানি করা যায় অমূ তার কিছুই বাকী রাখলে না, কিন্তু কিছুতেই আর তার শৈলর কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

অমূর সন্দেহ হ'য়েছিল বোধহয় খুন হয়ে গেছে। কিন্তু পুলিশ তাকে বুঝিয়ে দিলে যে সে কিছুতেই হ'তে পারে না। তিনি নিশ্চয় বেঁচে আছেন। কোনও বদমায়েস লোকদের পাল্লায় পড়েছেন। তারা খুব সম্ভব তাঁকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। একটু খোঁজাখুজির সোর গোলটা কমলেই কোনও না কোনও বেশ্যাপল্লীতে তাঁর সন্ধান পাওয়া যাবেই।

কেবলমাত্র পুলিশের উপরই শৈলকে খোঁজার ভার দিয়ে অমূ নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেনা। হতাশার পর হতাশার আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত হ'য়ে অমূর মস্তিষ্কও ঈষৎ বিকৃত হয়েছিল। তার পরদিন থেকে সে নিজেই প্রত্যেক বেশ্যাপল্লীতে প্রত্যেক স্ত্রীলোকটীর ঘরে ঘরে ঢুকে দু'হাতে অকাতরে অর্থ ঢেলে দিয়ে শৈলর অনুসন্ধান ক'রে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু শহরময় অবিলম্বে রটে গেল যে ঠনঠনের প্রসিদ্ধ ধনী বিশ্বনাথ চৌধুরী চোক বুজতে না বুজতেই তার একমাত্র পুত্র অমূল্য চৌধুরী নাকি একেবারে মরিয়া হ'য়ে কাপ্তেনী সুরু করেছে। শহরে আর এমন কোনও বেশ্যা নেই যে অমূ চৌধুরীর পয়সা খায়নি।

পিসীমা একদিন অমূকে ডেকে বললে "হ্যাঁ বাবা এ সব কি শুনছি? আমার যে গঙ্গায় ঝাঁপ খেয়ে ম'রতে ইচ্ছে করছে! এর চেয়ে তুই পাঁচটা বিয়ে করলিনি কেন অমূ, তাহ'লে তো দাদার নামটা এমন করে ডুবতো না।"

অমূ শুধু গম্ভীরভাবে বললে "পিসীমা যা জানো না—যা বোঝ না—সে সম্বন্ধে কোনও কথা কোও না। তোমার দাদার ভুলেতেই আজ আমার এই সর্ব্বনাশটা হয়েছে!—বিয়ের কথা যদি আর মুখে আনো তাহলে আমি কোন্‌দিন আত্মহত্যা ক'রে বস্‌বো ব'লে রাখলুম!"

* * * *

"তারপর বিশ তিরিশ বছর কেটে গেছে। অমূর পিসীমা স্বর্গে গেছেন। কিন্তু অমূর শৈলকে খোঁজার এখনও বিরাম নেই!"—ব'লে ঠাকুরদা তাঁর হাতের নিঃশেষিত গেলাসটি টেবিলের উপর রেখে দিলেন।

বিশু, সনৎ, রাসবিহারী নিস্তব্ধ হ'য়ে অবাক্ বিস্ময়ে ঠাকুরদার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

ঋণ-শোধ

"রক্ষা করো কে কোথায় আছো! রক্ষা করো! মেরে ফেল্‌লে ··জান্ গেলো"···

"মার্! মার্! ইন্দু কাফের হালাক মাইর‍্যা ফ্যাল্!...মাইরলে গাজী, মর্‌লে শহীদ্!"

"গেলাম, গেলাম! মারিস্ না বাবা, আমি তো তোদের কাছে কিছু কসুর করিনি..."

"তুই তো হালা ইন্দু, কাফের! এই তো তোর জবর কসুর হালা!"

"বাবা, আমি ডাক্তার, আমি কতোদিন তোদের কতো উপকার করেছি......কতো লোকের বাচ্চা-কাচ্চার জান্ বাঁচিয়েছি..."

"পয়সা নেস্ নি হালা? মোফ্‌তে ভালা কর্‌ছস্?...ধর্ ধর্ ··হালা পলায়লো..."

ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিলের পরদিন এক টোলার্ এক গলি গোলমালে অকস্মাৎ মুখর ও উচ্চকিত হ'য়ে উঠ্‌লো। গলির বাড়ীতে বাড়ীতে চট্‌পট্ সব দরোজা জানালা বন্ধ হ'য়ে গেলো; হিন্দু বাড়ীর বাসিন্দারা রুদ্ধ ঘরে দম্ বন্ধ ক'রে ইষ্ট-দেবতার নাম জপ্‌তে জপ্‌তে ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। বাড়ীর মধ্যের দুই একজন সাহসী লোক দরোজা-জানালার ছিদ্র দিয়ে বাইরে দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো—ব্যাপার কি? কাকে মারে?

কে বা কারা মারে সে সম্বন্ধে কারো মনে কোনো সংশয়ের প্রশ্ন উত্থিত হলো না।

কেউ কেউ দেখ্‌তে পেলে প্রায় পনেরো-বিশজন মুসলমান গুণ্ডা একটি পথিক ভদ্রলোককে অকস্মাৎ আক্রমণ করেছে; সেই লোকটি পশ্চাদ্ধাবিত রক্তলোলুপ নৃশংস দস্যুদের আক্রমণ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য গলির বাসিন্দা দয়ালু ও সাহসী লোকদের সাহায্য প্রার্থনা কর্‌তে কর্‌তে দৌড়ে পালাচ্ছে। একজন লোক দরোজার ফুটো দিয়ে দেখে পলাতক লোকটিকে চিন্‌তে পার্‌লে; চিন্‌তে পেরেই সে শিউরে উঠ্‌লো, কিন্তু চেঁচিয়ে কথা বল্‌বার সাহস না পেয়ে সে নিজের মনেই বল্‌লে—অধর ডাক্তার! আহা হা, ডাক্তার বেচারাকে মেরে ফেল্‌লে!

বাস্ ঐ পর্য্যন্ত। আন্তরিক অনুকম্পা অনুভব করা ছাড়া কারো আর সাহস হলো না যে ঐ সব নরপিশাচদের কাপুরুষতার অকারণ আক্রমণ থেকে একজন নিরীহ বিপন্ন পথিককে কোনো রকম সাহায্য করে।

অধর ডাক্তার হাতের সরু লাঠি দিয়ে গুণ্ডাদের ডাণ্ডা আর ছোরার আঘাত যৎকিঞ্চিৎ ঠেকিয়ে রক্তাক্ত-কলেবরে প্রাণপণ বেগে ছুটতে ছুটতে একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে' পড়্‌লো।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পশ্চাদ্ধাবিত দস্যুরা ঠাহর কর্‌তে পার্‌লে না ডাক্তার কোন্‌পথে কোন্‌দিকে পালালো। তারা হাল্লা কর্‌তে কর্‌তে অন্য পথে চলে গেলো—ডাক্তারকে পায় ভালোই, না পায় অন্য শিকার তো মিল্‌বে।

রক্তাপ্লুত ডাক্তার ছুটে যেতে যেতে দেখ্‌লে একজন একপদহীন খোঁড়া লোক বগলে ক্রাচ্-লাঠির ঠেক্‌নো দিয়ে ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ করে' দ্রুতগতিতে সেই দিকে আস্‌ছে। সেও মুসলমান। সে মুসলমান হলেও ডাক্তারের ততো ভয় হলো না; কারণ, সে খঞ্জ, কী ক্ষতি সে কর্‌তে পার্‌বে?

ডাক্তার দৌড়াতে দৌড়াতে খোঁড়ার কাছে পৌঁছাতেই খোঁড়া বগল থেকে ক্রাচ্-লাঠি খুলে নিয়ে উঁচিয়ে মার্‌বার উপক্রম কর্‌তে কর্‌তে বলে' উঠ্‌লো—হালা কাফের! কোথায় পালাবি বে?

ডাক্তার নিজের অঙ্গে রক্তপাত দেখে' চিন্তিত হয়ে' পড়েছিলো। সে তখনও ভেবে' দেখ্‌বার বা নির্ণয় কর্‌বার সময় পায় নি যে সে কি পরিমাণ জখম হয়েছে। অল্প আঘাতকেই তার মারাত্মক বলে মনে হচ্ছিলো। রক্তপাতে সংশয়ে ও ভয়ে অভিভূত ও আর্ত্ত ডাক্তার আকস্মিক আক্রমণে চকিত হয়ে' চেয়ে দেখ্‌লে সেই খোঁড়া তার চেনা। সে আশ্বস্ত হয়ে বলে' উঠ্‌লো—গফুর। আমি অধর-ডাক্তার।

গফুর অধরের গায়ে ক্রাচের বাড়ি আঘাত কর্‌তে কর্‌তে গর্জ্জে উঠ্‌লো—জানি হালা জানি! আমার পা-ই নাই সিন্, আঁখ তো আছে বে হালা!

ডাক্তারের অঙ্গে খোঁড়ার ক্রাচের বাড়ি অপঘাতের উপর অপমান হয়ে' পড়্‌লো। ডাক্তার ইচ্ছা কর্‌লে খোঁড়াকে এক ধাক্কায় ধরাশায়ী করে' ফেল্‌তে পার্‌তো। কিন্তু একে সে পলায়নে ব্যস্ত, কোনো নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন কর্‌তে ইচ্ছুক; এবং ত্রাস ও আশঙ্কায় অভিভূত; তাতে আবার গফুর তাকে মেরেই ক্রাচ আড় করে' গলির পথ আটক করে দাঁড়িয়েছে; এই অবস্থায় ডাক্তারের সাহস হলো না যে গফুরকে প্রত্যাঘাত করে; তার ভয় হলো পাছে গফুরকে আঘাত করলে সে শোরগোল করে' গুণ্ডাদের ডেকে' আনে; তাই সে পালাবার জন্ম ব্যগ্র হয়ে' মিনতির স্বরে গফুরকে বল্‌লে—গফুর, তোমার পা যখন বিষফোঁড়ায় পচে' উঠেছিলো, তুমি মরে'যেতে বসেছিলে, তখন হাঁস্‌পাতালে আমিই তোমার পা কেটে' চিকিৎসা করে' তোমাকে বাঁচাই......

গফুর আবার লাঠি তুলে' মারতে উদ্যত হয়ে' বলে' উঠ্‌লো—তাতে কি অইলো বে হালা! তুই হালা তো কাফের। তগো এই পিট্টিই ওষুধ! আমাগো ধরম নাশ কর্‌তে বইচস্ হালারা! তরা হক্কলি হমান!

খোঁড়া একপায়ে ভার সামঞ্জস্য করে' দাঁড়াবার চেষ্টায় টাল সামলাতে গিয়ে একদিকে ঝুকে' পড়্‌লো আর তার হাতের লাঠিও গলির আটক ছেড়ে' আকাশে উঠে' গেলো।

এই অবকাশে অধর-ডাক্তার প্রাণ নিয়ে চোঁচা পলায়ন করে' অন্ধকারে লুকিয়ে পড়্‌লো।

গফুর টাল সাম্‌লে সোজা হয়ে' দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে ডাক্তার পলাতক। সে নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জন করে' উঠ্‌লো—ইয়া আল্লা! হালা বড্ডা ফস্‌কে' পলায়লো তো!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছিটে-ফোঁটা

মোলায়েম গালি

বিসংবাদী ঠেকে যদি বিশ্বগীতি—সুরে সাধা,
হ্রস্বকর্ণ তুমি ছুঁচা, না হয় দীর্ঘকর্ণ গাধা।
শোভাকে চাও চিবিয়ে দাঁতে একেবারে কর্‌তে কুচি।
তুমি একটি আস্ত পাঁটা, না হয় তোমার উই-এর রুচি?
করুণা ধায় কোমলতায় স্পর্শ লাগে মধু বাতে;
বেঁধে কি তার অনুভূতি গাড়ী-টানা মোষের কাঁধে?
প্রকৃতি যে তাজা, কচি, নিত্য উচ্ছ্বসিত রসে,
ঘুণে কি তার ধর্ম্ম বোঝে? খুনের তরে মর্ম্মে পশে?
প্রেমের ফুলের সুরভি কি লাগে পূতিপ্রিয়ের নাকে?
বিলাস-লীলার বিয়ের বাসর কৃমি-কেঁচোর পচা পাঁকে।
পারাপারের প্রাণের সাড়া পাওনা যদি তোমার প্রাণে,
তুমি গণ্ডার, তুমি গাড়ল, এইত দাঁড়ায় তাহার মানে।

ভোট ভিখারীর আশীর্ব্বাদ

ঝুলি ঘাড়ে তোমার দ্বারে! জান তাহার কারণ ত;
একটি ভোটের ভিক্ষা মোটে, বল' না তা' বাড়ন্ত।
ভিক্ষা দিলে সবাই মিলে পাব স্বরাজ খুব-খানিক;
চাকৃরি পাবে আধা-আধা, পৌরাণিক ও কৌরাণি

উল্টে গেল

ফটিক দিল সঠিক খবর,—উল্টে যাবে দেশটা।
গেল কমে ক্ষুদিরামের খিদে আর তেষ্টা।
কোমর কষে' ভারি রোষে ছুট্‌ল কানাই নন্দী;
অবশেষে থানায় এসে হ'ল সবাই বন্দী।
উলু দিল মেয়েগুলো, ছুট্‌ল বাণীর ছন্দ;
পাঠশালা ও দোকান পাট হয়ে গেল বন্দ।

মানা দ্বন্দ্বের গন্ধ পেয়ে শনি খোঁজেন রন্ধ্র,—
দিতে এলেন দুঃখে মোক্ষ স্বামী ভ্রষ্টানন্দ।
এলেন সাথে,—আদি যাঁদের আরব, ইরাণ, তুর্কি।
ছুটে এল ইট-পাটকেল, লাঠি, শোটা কুর্কি।
চূর্ণ মাথা—pactএ গাঁথা! কে সাধু, কে চোট্টা?
উল্টে গেল (দেশটা নহে) নেতার গায়ের coatটা।

ন তজ্জলং যন্ন সুচারুপঙ্কজম্

নয় সে ধর্ম্ম নহে যাহা শাস্ত্র মাঝে কক্ষিত,
নয় সে শাস্ত্র নহে যাহা শস্ত্রবলে রক্ষিত,
নয় সে শস্ত্র নহে যাহা রক্ত-ধারায় লক্ষিত,
নয় সে রক্ত, নিরীহদের কণ্ঠে নয় যা' মোক্ষিত।

শোক-সংবাদ

"ভবানীপুর সঙ্গীত-সম্মিলনী"র প্রতিষ্ঠাতা, সঙ্গীত-আমোদী যাদবকৃষ্ণ বসু মহাশয় গত ১৩ই শ্রাবণ ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে যাদবচন্দ্র এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, অনেক সময়ে স্কুলের সময়ে স্কুলে না গিয়া মেটিয়া বুরুজের নবাব-বাড়ীতে আবিষ্টভাবে তিনি গান-বাজনা শুনিতেন এবং পরিণত বয়সে "ভবানীপুর সঙ্গীতসম্মিলনী ও সঙ্গীত বিদ্যালয়" স্থাপন করিয়া "তাল, লয়, সুর—এই তিনে ভবানীপুর"—ভবানীপুরের এই খ্যাতি ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। আজীবন সঙ্গীতসাধনার ফলে তিনি কালক্রমে যন্ত্র-সঙ্গীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং "সুরতরঙ্গ" নামক সঙ্গীত-যন্ত্র আবিষ্কার ও "সঙ্গীত-দর্পণ" নামক এক অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত সঙ্গীতপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

যাদবচন্দ্র পর-হিতৈষী, নির্বিরোধী ও অমায়িক লোক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত স্বাধীনচিত্ত ছিলেন—সেইজন্য ছোটলাট বাহাদুরের কুঠিতে প্রাইভেট সেক্রেটারি আফিসে সরকারী চাকরী গ্রহণ না করিয়া এক দর্জ্জীর দোকান স্থাপন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

যাদবচন্দ্রের বিয়োগে আমরা এই শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে এতদ্দ্বারা আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি।

আশ্বিনে

আগামী ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন—যাঁহারা মনে করেন ইংরেজেরা এদেশটি ছাড়িয়া দিবেন অথবা ছাড়িতে বাধ্য হইবেন, আর আমরা নিজেদের পদ্ধতিতে শাসনের কাজ চালাইব, তাঁহাদের ধারণা ঠিক কি ভুল, তাহা বলিবার সাধ্য আমাদের নাই। তবে নিশ্চিত বলা চলে যে আমরা যদি কেবল অসহযোগের বাধা দিয়া চলি, ইংরেজেরা তাহাতে বিরক্তির জ্বালায় দেশ ছাড়িবেন না। ঘেনর ঘেনর সহিতে না পারিয়া ইংরেজ দূরে গেলেও সে ব্রহ্মাস্ত্রে দেশের রক্ষা ও শাসন চলিবে না; যে অবস্থাতেই হউক রাষ্ট্র-পরিচালনের কাজ না শিখিলে, অর্থাৎ হাতে কলমে দেশ চালাইবার শিক্ষায় অভ্যস্ত না হইলে, আমরা একতিল পরিমাণেও কাজ করিতে পারিব না। আমরা যে দেশ শাসন করিবার ক্ষমতা ও অধিকার চাহিতেছি, উহাই প্রমাণিত করিতেছে যে এ পর্য্যন্ত আমরা সে অধিকার পাই নাই, কাজেই হাতে-কলমে দেশ পরিচালন করিবার কাজে এপর্য্যন্ত অভ্যস্ত হই নাই। সমাজের বা রাষ্ট্রের এখন কোন কাজের নাম কেহ করিতে পারিবে না, যাহা করিবার ক্ষমতাটি "জ্যাপ্য" হইয়া বা ডুব্ মারিয়া মনের একটি কোণায় থাকে আর কাজ করিবার সময় আসিলে সে ক্ষমতা মাথা তুলিয়া আমাদের কাজ নির্ব্বাহ করিয়া দেয়। নানা বিদ্যায় যত পণ্ডিত হইলেও মানুষকে এ কাজ শিখিতে হয় ঠাণ্ডা মাথায় কর্ম্মক্ষেত্রে খাটিয়া। আমরা যতখানি চাই ততখানি না পাওয়ার দরুণ এপর্য্যন্ত কাজে ভিড়ি নাই, আর ১৯২৯ এর পরে যে আমরা আকাঙ্ক্ষা পুরাইয়া অধিকার পাইব, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। যাঁহাবা আকাঙ্ক্ষা মিটিবার পর কাজে জুটিতে চান, তাঁহারা এ জীবনে কাজ শিখিবার অবসর পাইবেন না।

অধিকার-প্রার্থী বহুদলের দল-পতিরা বলিতে পারেন তাঁহারা আমাদের অজানা কোন পন্থা অনুসরণ করিয়া গোপনে রাজ্য পরিচালনের কাজ শিখিয়াছেন,—তাঁহাদের পক্ষে শিক্ষা-নবিসির প্রয়োজন নাই। যাহারা ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে, তাহারা যখন এই নিগূঢ় ক্ষমতার পরিচয় পায় নাই ও পাইতে পারে না, তখন কি বিশ্বাসে ও সাহসে ভোটারেরা কাজের লোক বাছিতে পারিবে, তাহা বোঝা দুঃসাধ্য। দেশ উদ্ধারের জন্য যতগুলি দল গড়িয়াছে, সে সকল দলের লোকেরাই আপনাদের দলের মান ও গৌরব রক্ষার জন্য নিজেদের নিগূঢ় ক্ষমতার প্রভাব নানা কৌশলে বুঝাইয়া ভোট সংগ্রহ করিবেন, তাহা জানি। কিন্তু তাহাতে খাঁটি কাজের লোক পাইবার আশা নাই। এদেশের এখনকার অবস্থায় চটকদার লোকেদের ভিড় ঠেলিয়া খাঁটি ধীরবুদ্ধির লোকেরা কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারে না; দলগুলির স্বার্থের কোলাহল আছে, কিন্তু এদেশে ধীরতার এমন শক্তির প্রবাহ নাই, যাহাতে দেশের কাজের দায়িত্ব বুঝাইয়া দল-ছাড়া বুদ্ধিমানেরা যথার্থ কাজের লোককে অগ্রসর করিতে পারেন। 'ক'

আঁতে আঁতে জানেন যে তিনি 'খ'এর তুলনায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আর 'ক' সর্ব্বদাই 'গোপনে' 'খ'এর পরামর্শ পাইলে বর্ত্তিয়া যান, কিন্তু তবুও যদি 'খ' ভোটের আসরে নামেন, তবে 'ক' নিশ্চয়ই 'খ'কে ঠেলিয়া আপনার বাহাদুরির চটক দেখাইবেন। খাঁটি লোকেরা এই অসূয়ার বিবাদে সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত; কাজেই জিতিয়া যাইবে 'ক'-শ্রেণীর লোকেরা। নির্ব্বাচনের সমারোহে অনেক টাকা ও শক্তির অপচয় হইবে,—অনেক উৎসবের কোলাহল হইবে, কিন্তু আমরা আগামী ব্যবস্থাপক সভায় কাজ শিখিবার উপযোগী লোক পাইব কিনা সন্দেহ।

নানা সম্প্রদায়ের লোক যদি এক নৌকায় বসিয়া বড় নদীর অগাধ জলে সত্যকার ঝড় তুফানে পড়ে, তবে সম্প্রদায়ের গৌরব না খুঁজিয়া খাঁটি মাঝির হাতেই নৌকা চালাইবার ভার দিবে; কিন্তু আমরা ছোট ডোবায় রাজনীতির নৌকা ভাসাইয়া খেলা করিতেছি, নৌকাডুবির ভয় নাই,—প্রাণে প্রাণে দায়িত্ববোধ নাই। অনেকের বিশ্বাস, এখন যে-কোন খেলা খেলিলেই চলিবে আর যে এই খেলায় জিতিয়া একটু পদ-গৌরব ও অন্য কিছু সংগ্রহ করিতে পারিবে, সেইটুকুই তাহার যথালাভ; কারণ, আসল দেশ চালাইবার ইংরেজেরা সমানে বজায় থাকিবেন ও তাঁহাদের আওতায় একটুখানি সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র স্বার্থ উশুল করিতে পারাই যথেষ্ট।

শারদীয় উৎসবের সময়ে, এই শক্তি-পূজার ঋতুতে কোথায় সেই ঋত্বিক বা পুরোহিত যিনি দুর্দ্দিনে সেই শক্তির উদ্বোধন করিতে পারেন যাহার প্রভাবে সাম্প্রদায়িকতার পাপ ও দল-গৌরবের নীচতা দূর হইতে পারে, আর আমরা এই কর্ম্মভূমিতে ১৯২৯এর কল্পিত মোহ কাটাইয়া দৃঢ়তায় ও ধীরতায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় অগ্রসর হইতে পারি?

* * *

এ কি উন্নতির আগ্রহের অশান্তি?—গত উনবিংশ শতাব্দী যখন আশীর কোঠায় ছিল সেই সময়কার দেশব্যাপী শান্তি দেখিয়া উদারচেতা বীর লর্ড রবার্ট্‌স্ আতঙ্কে শিহরিয়া লিখিয়াছিলেন যে সেই শান্তি যেন মরণের আড়ষ্টতার মত দেশের বুক চাপিয়াছিল। উদ্‌ভ্রান্তদের ছট্‌ফটানিতে যে কোলাহল ও অশান্তির সৃষ্টি হয় তাহা ঘরে আগুন লাগার মত বিপজ্জনক; কিন্তু যে অশান্তি আসে উন্নতির আগ্রহে তাহা চিরদিনই মানুষের কাম্য। প্রকৃতি তাহার প্রফুল্ল হাস্যময় অশান্তিতে শিশুর জীবন বাড়াইতেছে, আর বার্দ্ধক্যের জড়তার শান্তি-জীবনকে নির্ব্বাণে ডুবাইতে চায়। জীবনের মন্ত্র "শান্তি" "শান্তি" নয়, উহা চির অশান্তি, আর আমাদের নিদ্রা, বিশ্রাম ও নির্জ্জনবাস অশান্তির প্ররোচনায় চলিবার জন্য শক্তি-সংগ্রহ মাত্র।

বর্ত্তমান সময়ে মুসলমানদের মধ্যে যে উত্তেজনা ও হিন্দু-বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে তাহা বহুকালের জড়তা ভাঙ্গিবার মুখে অবিবেচনার ফলে হইতেছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। এ অনুমান সত্য হইলে সুখের হয়, কারণ যাহা উন্নতির আগ্রহে জন্মে তাহাতে উদ্‌ভ্রান্ত ভাব

ও পরবিদ্বেষ কিছুতেই স্থায়ী হইতে পারে না। কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিবার মুখে শিশুর চীৎকার প্রত্যক্ষের জিনিধ ও কুম্ভকর্ণের হুঙ্কার সাহিত্যের দৃষ্টান্ত।

কিন্তু এই নিদান নির্ণয়ে একটু খট্‌কা আছে, যাহাদিগকে হিতৈষীরা অতি কুৎসিৎ depressed বা অধঃপতিত বিশেষণে আদর করেন, তাহারা যদি আত্মসম্মানের বোধে উচ্চজাতীয়দের বিরুদ্ধে কোলাহল বাধাইয়া অশান্তি আনিত তবে কেন যে অশান্তির ঢিল আমাদের মাথায় আসিয়া লাগিত তাহা বুঝিতে পারা যাইত; কিন্তু মুসলমানেরা যখন ব্রাহ্মণের শাসনে পীড়িত ন'ন্, তখন উন্নতির আগ্রহের জাগরণে তীব্র বিদ্বেষের অনুষ্ঠান হয় কেন? উত্তেজিত হইয়া যাহারা লড়াই করে তাহারা সেই শ্রেণীর লোক নয়, যাহারা শিক্ষিত হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতেছে অথবা কোন শ্রেণীর চাকুরির প্রার্থী। শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা হিন্দুদের সঙ্গে আড়াড়াড়ি করিতে চান্, তাঁহাদের মধ্যেও হিন্দু-বিদ্বেষ জাগিতে পারে কেবল তাঁহাদের মনে যাঁহারা নির্ব্বোধের মত অনুন্নতির কারণ না বুঝিয়া হিন্দুর কৃতিত্বে হিংসা করেন। অবস্থাটি পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

দুইটি লাইনে যদি দুইটি রেলগাড়ির শ্রেণী পাশাপাশি থাকে, আর নিঃশব্দে একটি লাইনের গাড়িগুলি চলিতে আরম্ভ করে তবে স্থির গাড়ির আরোহীরা যদি মাটির দিকে না তাকাইয়া কেবল চলন্ত গাড়ির দিকেই তাকায়, তাহা হইলে তাহাদের মনে হইবে যেন চলন্ত গাড়ি তাহাদের গাড়িগুলিকে পিছনে হটাইয়া হটাইয়া চলিতেছে। গাড়ির দৃষ্টান্তের বেলায় যেমন বলিতে পারি যে মাটির দিকে তাকাইলেই চোখের ধাঁধা থাকে না সেইরূপ নিজেদের অবস্থার দিকে না তাকাইয়া কেবল হিন্দুদের কৃতিত্বের দিকে তাকাইলে মন উদ্‌ভ্রান্ত হইতে পারে; এই শ্রেণীর লোকেরা কি মুসলমানসমাজে এত প্রভুতাশালী, যে তাঁহাদের উত্তেজনায় শ্রমজীবী দলের বা ঐরূপ শ্রেণীর মুসলমানেরা হিন্দু-বিদ্বেষে ক্ষেপিয়া উঠিতে পারে? সুস্পষ্ট ধরিতে পারা যায় যে উচ্চ স্তরের নিগূঢ় স্বার্থপরেরা ধর্ম্মের নামের ছলে উত্তেজিত না করিলে সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানেরা নির্ব্বিবাদের রোজগার ছাড়িয়া আপনাদের ও পরের প্রাণকে বিপদে ফেলিত। যাহা হউক, উত্তেজনা-দাতারাও যদি উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার প্রথম সঙ্কল্পের দিনে চিত্তের উদ্‌ভ্রান্ত ভাবের ফলে অহিতকর কাজে নির্ব্বোধদিগকে উৎসাহিত করাইয়া থাকেন, তবে শীঘ্রই সকল উৎপাত দূর হইবে। নিদানপক্ষে বাঙ্গলার হিন্দুরা যখন কোথাও আগেই বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা করেন নাই তখন উৎপাতের কারণ বিশ্লেষণের জন্য মুসলমান সমাজের অবস্থাই আলোচনা করা গেল।

* * * *

আকাশ-যানের আতঙ্ক—মানুষের স্থিতির সুবিধা ঘটাইয়া ইউরোপীয়

বৈজ্ঞানিকেরা নিত্য নূতন আবিষ্কার করিতেছেন, আর আমরা সেই গড়া-পেটা সুবিধাগুলি বুদ্ধির বিনা আয়াসে ব্যবহারে পাইয়া বিংশ শতাব্দীর উন্নতির গর্ব্ব করি। কেহ কেহ বলিতে পারেন—করিব না কেন? বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন করেন অল্প দু-দশজন লোক, আর ইউরোপেও আমাদের মত ফল ভোগ করে অসংখ্য অধিবাসীরা যাঁহারা কেহই উদ্ভাবন করিতে বা কল গড়িতে জানে না; সাধারণ ইউরোপীয়েরা যদি বিংশ শতাব্দীর গর্ব্ব করিতে পারে তবে আমরা পারিব না কেন, এই হইল তর্ক। এখানে ইউরোপে ও এদেশে প্রভেদ কোথায়, তাহা বুঝিবার প্রয়োজন আছে। ইউরোপে যাহা আবিষ্কৃত হয়, সকল ইউরোপীয়ের পক্ষে তাহার মূলমন্ত্র ও নির্ম্মাণ কৌশল শিখিবার অধিকার ও সুবিধা আছে; সেই জন্য ইউরোপে সে দেশের কোন আবিষ্কারের ফল সেদেশে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা কিন্তু যাহা পাই তাহা গড়িবার ও বাঁচাইয়া রাখিবার সাধ্য আমাদের নাই। বিংশ শতাব্দীর নামে জাঁক করিবার আমাদের কিছু নাই। একটা জলের কল বিগড়াইলে বিলাত হইতে উহার সরঞ্জাম না আনিলে কলকাতা সহরের জল যোগান বন্ধ হইয়া যায়।

কল-কারখানা সম্বন্ধে আমাদের আতঙ্কের একটা দিক আছে তাহাও বুঝিয়া নিতে হইবে। ঐ যে আকাশ-যান সাত দিনে ইংলণ্ড হইতে এদেশে আসিবে, উহাতে একবার চড়িয়া আমরা আকাশে ওড়ার সুখ ভোগ করিতে পারি, কিন্তু ঐ কলের বলে এদেশে স্থিতির ব্যাপারে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহা একবার ভাবিয়া দেখিতে হয়। আমরা যদি স্বাধীনভাবে ঐ যন্ত্রটি গড়িতে ও ব্যবহার করিতে জানিতাম, তবে এ ভাবনা উঠিত না।

এরূপ প্রস্তাবের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে, যে এখন যদি ইংলণ্ডে ও ভারতে দূরত্ব কমিয়া গেল, আর দুস্তর দুরারোহ হিমালয় প্রদেশে যখন অনায়াসে ঐ যানের সাহায্যে যাইতে পারা যায়, তখন অন্য মানুষের অনধিকৃত যে সকল বিস্তৃত শীতপ্রধান স্বাস্থ্যকর স্থান হিমালয় প্রদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেখানে অনায়াসে লক্ষ লক্ষ ইংরেজ সুখময় উপনিবেশ রচনা করিতে পারেন। কোন শ্রেণীর স্থানকেই অব্যবহারে ফেলিয়া রাখিবার বুদ্ধি ইংরেজের নাই। এই অসহ্য উত্তাপের দেশে কলনি (colony) বা উপনিবেশ করা ইংরেজের অসম্ভব ছিল, তাই তিনি তাহা করেন নাই। অনেকবার অনেক ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ পরিতাপের শ্বাস ফেলিয়া লিখিয়াছেন যে তুচ্ছ টাকার খাতিরে এক সময়ে কাশ্মীরের মত দেশটিকে এদেশের লোককে দেওয়া হইয়াছিল; ঐ দেশে অনায়াসে ইংলণ্ডের শ্রমজীবীরা সকল রকমের পরিশ্রম করিয়া বাস করিতে পারে। এখন কাশ্মীর প্রদেশ অপেক্ষা বড় বড় ভূভাগ হিমালয় প্রস্থে পাওয়া যাইতেছে যেখানে বহু লক্ষ ইংরেজের বাস অসুখকর হইবে না; সেখানে বাস করিলে এখন আকাশ-যানের কৃপায় সারা পৃথিবীর সঙ্গে যোগ রাখা চলিবে।—এই ইঙ্গিত অনুসারে কাজ হইলে হিমালয়ের উত্তর অঞ্চল হইতে কোন উৎপাত আসিবার বাধা থাকিবে না। এই ইঙ্গিত বা প্রস্তাব কাজে পরিণত হইলে হিমালয় উপনিবেশের ইংরেজেরা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবেন না, কাজেই সারা ভারতে স্বরাজ্য আসিবে,—অর্থাৎ আমরা যাহা "দেলায় দে রাম" বলিয়াছিলাম তাহাই আসিবে, তবে রাম হয় ত একটু উল্টা বুঝিতে পারেন।

Printed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani Office, 77 Russa Road North, Bhawanipur Calcutta.

বঙ্গবাণী

কাত্যায়ণী ষ্টোরস
প্রসিদ্ধ
কাপড় ও পোষাক।
বিক্রেতা
Kashi Studio

ব্যর্থ প্রয়াস

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

ঘণ্টু। কি হে ভায়া! কোথায় চল্লে? হাতে ওটা কি? সুটকেস না কি? এ যে কাঠের তৈরি দেখ্‌ছি!

মণ্টু। না হে না, সুটকেস নয়। গ্রামোফোন জগতের নূতন আবিষ্কার—"হিজ মাষ্টার্‌স্ ভয়েস" পোর্টেবল্ গ্রামোফোন।

ঘণ্টু। বল কি? তাও কি হয়?

মণ্টু। তবে দেখবে এস।

মণ্টু। কেমন দেখ দেখি, যা ব'লেছি সত্যি কি না?

ঘণ্টু। তাইতো ভাই! দেখ্‌তে তো

খুবই সুন্দর—ঠিক যেন একটি সুটকেস। তা ছাড়া যেমন হাল্‌কি সাইজেও তেমনি ছোট। এর আওয়াজ কেমন?

মণ্টু। খুব স্পষ্ট, খুব মিষ্টি। আবার যেখানে ইচ্ছে, নিয়ে যাও, কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। এবার Changeএ যাবার সময় সঙ্গে নেবার বেশ সুবিধা হবে। সত্যিই এ মেসিন রূপে গুণে অতুলনীয়।

মূল্য মাত্র ১৩৫৲ টাকা।

গ্রামোফোন প্যালেস এণ্ড মি[illegible]জক্যাল ভ্যারাই[illegible]স

কে, সি, দে এণ্ড সন্স

৮০নং লোয়ার চিৎপুর রোড, (হ্যারিসন রোড, জংসন) ক[illegible]কাতা।

"আবার তোরা মানুষ হ"

৫ম বর্ষ ১৩৩২-'৩৩ | কার্ত্তিক | দ্বিতীয়ার্দ্ধ ৩য় সংখ্যা

ভারতে জাতীয়তা

জনৈক রুসলেখক স্বদেশে বল্‌শেভিক্ প্রভুত্বের অত্যাচার পর্য্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন —"আমাদের সময়ের প্রধান পাপ—শিক্ষিত ইউরোপের পাপ—সমগ্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার বেলায় সকলরকম নীতিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব।"* কথাটা নিশ্চয়ই অতিরঞ্জিত; আমরা সভ্য ইউরোপকে এতটা হেয় মনে করিতে পারি না। ভিতরে যে ভাবই থাকুক, বাহিরে শিক্ষিত সমাজে মর্য্যাদা রক্ষার একটা চেষ্টা আজকালকার সভ্যতাভিমানী জাতিমাত্রেরই আছে। ধর্ম্মনীতির কতকটা সম্মান রক্ষা না করিলে এই চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে না।

রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিশিষ্টতাই ইউরোপ ও আমেরিকার প্রাধান্যের মূলে। বিজ্ঞান ও যুদ্ধবিদ্যা বাহন, রাজনীতি ও অর্থনীতি সওয়ার। এইরূপ শক্তি পরিচালনেই

*The greatest sin of our time, the sin of cultured Europe, is the entire absence of all sense of morality from political and economical questions—The *statesman*, August 29, 1926.

আজ সমস্ত জগৎ পাশ্চাত্য জাতির পদানত। আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাধান্য—যেভাব এক সময়ে কপিলবস্তুতে অঙ্কুরোদ্গমের পর 'অর্দ্ধজগৎ'কে 'ভক্তিপ্রণত' করিয়াছিল অথবা প্যালেষ্টাইনে জন্মগ্রহণ করতঃ পশ্চিম মুখে অগ্রসর হইয়া মানবের পশুত্ব বহুপরিমাণে দূর করিয়া দিয়াছিল—ইউরোপ বা আমেরিকার নিজস্ব নহে। পরাধীন নগণ্য জাতির কবি রবীন্দ্রনাথ যে পাশ্চাত্য জগতে এতটা সমাদর লাভ করিয়াছেন তাহার প্রধান কারণ তাঁহার সঙ্গীতে এমন কিছু আছে যাহা ইউরোপের যুদ্ধবিদ্যায় বা রাজনীতিতে নাই - ভারতে তাঁহার বাণী নূতন নহে।

আমরা পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে অনেকটা অন্ধ অনুকরণ করিতেছি অথচ ঠিক পাশ্চাত্য পন্থা ধরিতে পারিতেছি না। যুদ্ধবিদ্যা অবশ্য আমাদের নাই, যাহা ছিল তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। সার্ জগদীশচন্দ্র ও সার্ প্রফুল্লচন্দ্রের কৃতকার্য্যতা সত্ত্বেও বিজ্ঞানে আমরা শিশু। বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের জাতীয়তা জগতে একটী অপূর্ব্ব বস্তুতে পরিণত। এ অবস্থায় এই অন্ধ অনুকরণ কতটা শোভা পায় বা কার্য্যকর হইতে পারে তাহা ভাবিবার বিষয়।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ এখন ইউরোপে একরূপ অতীতের বস্তু। রাজনৈতিক দলাদলি যথেষ্ট আছে কিন্তু ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িকতা সেখানে মস্তক উত্তোলনে অসমর্থ, পার্থিব স্বার্থ লইয়াই দল। অর্থ ও ক্ষমতার বিভাগ সকল দেশেই দলাদলির একটা প্রধান লক্ষ্য,—ইউরোপে ধনী ও শ্রমীর মধ্যে, এদেশে এখন দাঁড়াইয়াছে প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে। তাই এদেশে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের এতটা আত্মপ্রকাশ।

মানুষে মানুষে বিভিন্নতা এদেশে যতটা আছে অন্য দেশে ততটা নাই। দেশটী বড়, ইহার ইতিহাসও খুব বড়, তাই এতটা বিভিন্নতার সৃষ্টি। ইহা লইয়া কাঁদিয়া লাভ নাই। যাহাতে এই বিভিন্নতা আর প্রাধান্য লাভ করিতে না পারে তাহার জন্যই সকলের সচেষ্ট হওয়া উচিত। হইতেছে কিন্তু তাহার বিপরীত। দেখিতে দেখিতে হিন্দু ও মুসলমানের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সমিতি, স্বতন্ত্র বিদ্যালয়, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সরকারী চাকরী—তাহা দেওয়ার সময়ও অনুপাত করা হইতেছে। হিন্দুর মধ্যেই আবার কত জাতির, কত শাখার কত স্বতন্ত্র সমিতি মাথা তুলিতেছে। নিজেদের মধ্যে সামাজিক সংস্কারের জন্য যে সমিতির সৃষ্টি তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু রাজনৈতিক সমিতিও কত প্রতিযোগিতামূলক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া গঠিত হইতেছে। ইহার কোনটীই জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনুকূল নহে। সকলের উপরে বিভিন্ন গণ্ডীতে নির্ব্বাচন দেশের কি ঘোর অনিষ্টই করিতেছে।

আমরা ক্রমশঃ গণতন্ত্রপ্রণালীর উপর রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে ইচ্ছুক।

গণতন্ত্রপ্রণালীর মূলনীতি অধিকাংশ লোকের মতানুযায়ী কার্য্য। ইহাতে যাহারা সংখ্যায় অল্প তাহাদের স্বার্থে অনেক সময়ে অবশ্যই আঘাত লাগিতে পারে এবং এইরূপ আঘাত নিবারণের নানা উপায় নানা সময়ে উদ্ভাবিত হইয়া থাকে; কিন্তু কোথাও ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িকতার উপর দলাদলির সৃষ্টি করিয়া তাহার উপর জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা এ পর্য্যন্ত জগতে হয় নাই --ভারতেও তাহা হইবে না।

অনেক সময়ে মনে হয় দেশটা প্রজাতন্ত্রপ্রণালীর মোটেই উপযোগী নহে, সদাশয় কঠোর নিরপেক্ষ রাজতন্ত্রপ্রণালীর নিকট মস্তকের অবনমনই ইহার পক্ষে শ্রেয়ঃ. এইরূপ রাজতন্ত্র-শাসনের মধ্যে দীর্ঘকাল বাসেই এদেশে জাতীয়তা গঠিত হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ শাসন একালে একটী কঠিন ব্যাপার, কালের গতি অন্য দিকে। যুগধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া কর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

প্রকৃত গণতন্ত্র অবশ্য খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশস্থলেই জনসাধারণ মুষ্টিমেয় মস্তিষ্কযুক্ত লোকের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলী। ইটালী, গ্রীস, রুসিয়া প্রভৃতি অনেক দেশের কাহিনীই এই এক ছাঁচে ঢালা। এ দেশে ক্ষমতা পরিচালনের ক্ষেত্র যে এতটা সীমাবদ্ধ তাহাতেও এই শ্রেণীর "নেতা"রা দলে পুরু হইয়াছেন বই সরু হন নাই। গোলযোগও বাধাইতেছেন তাঁহারা। ভগবান যাঁহাকে প্রকৃত নেতৃত্বের ক্ষমতা দিয়াছেন তিনি জাতি গড়িয়া তোলেন, অমানুষকে মানুষে পরিণত করেন, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির সৃষ্টি তাঁহার নিয়তি নহে।

আমাদের রাজনীতি ও অর্থনীতি অক্ষমের হস্তপদ বিক্ষেপ মাত্র। বৈদেশিক জাতির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি না, সেটা করেন আমাদের প্রভুরা। আমরা যাহা কিছু করি আমাদের প্রভুদিগের ব্যবহার পরিবর্ত্তনের জন্য। কেহবা অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রভুর জয়ধ্বনি গাই, কেহবা অধিকতর অধিকার—যাহাকে আমরা মানবজাতির স্বাভাবিক অধিকার বলি—লাভের জন্য চক্ষু রাঙ্গাই ও হস্তপদ ছুড়িতে থাকি, কিন্তু আমরা সকলেই বুঝি মুখে যাহাই বলি শীঘ্র এই প্রভুদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাইবার স্থান আমাদের নাই। এক প্রভুর পরিবর্ত্তে অন্য প্রভুর আগমন সম্ভব হইলেও বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ ইঁহাদের সহিত বেশ চেনা-পরিচয় ঘটিয়াছে আর আমাদের মধ্যে অনেকে যাহা কিছু হইয়াছে তাহা ইঁহাদিগেরই কৃপায়। জগতে ইঁহাদের একটা মান ইজ্জত আছে, আমাদের সহিত ব্যবহারেও সেই মান ইজ্জত যাহাতে বজায় থাকে তাহার চেষ্টা ইঁহারা অবশ্যই করিয়া থাকেন। আমরা জানি আমরা বিভক্ত—জোর করিয়া কিছু করিবার শক্তি দূরে থাকুক, বলিবার শক্তিও আমাদের নাই। সভ্যজগতের হিসাবে আমরা নিরস্ত্র, অস্ত্র থাকিলে পরস্পরের গলায় হয়ত আরও বেশী করিয়া বসাইতাম। আমাদের রাজনীতি ও অর্থনীতি নানা বন্ধনে আবদ্ধ। তাহা সত্ত্বেও আমরা ইউরোপের অনুকরণে গর্জ্জন অভ্যাস করিতেছি।

গর্জ্জন চলে চলুক, কিন্তু তাহাও হিসাব করিয়া চালান আবশ্যক, আর তাহা অপেক্ষা বহুগুণে আবশ্যক গৃহসংস্কার। হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ, আর্য্য ও পরিয়া যে-দেশে প্রতিবেশী সে-দেশে গৃহসংস্কার খুব সহজসাধ্য নহে। না হইলেও তাহার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাগ্রে। মানবজাতির স্বাভাবিক অধিকারের উপযুক্ত না হইলে তাহার জন্য শুধু গর্জ্জনে লাভ কি?

আবার বলি আমাদের মনোযোগ সমাজ ও ধর্ম্ম-নীতির দিকেই বেশী আবশ্যক। প্রথমতঃ ধর্ম্ম-বিভিন্নতা, তাহার পর জাতি-বিভিন্নতা (হয়ত অন্বেষণ করিলে অনেকস্থলে ইহার একটীর মূলে অপরটী ধরা পড়িবে) আমাদিগকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এতটা দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে। এই ধর্ম্ম-বিভিন্নতার কি সমাধান নাই? যে-দেশে আবহমান কাল এত বিভিন্ন রকমের ধর্ম্মবিশ্বাস পরস্পর পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছে সে-দেশে কি বর্ত্তমান আলোকের যুগে হিন্দু ও মুসলমান আপনাদের ধর্ম্মবিবাদ মিটাইয়া লইতে পারে না? রক্তপাত ও বলপূর্ব্বক একের অবনতিই কি এ দেশের নিয়তি?

আমাদের কিন্তু আশা আছে। মানুষ সাময়িক উত্তেজনায় ও তথাকথিত নেতৃবৃন্দের স্বার্থের তাড়নায় আত্মবিস্মৃত হইতে পারে কিন্তু এই প্রবঞ্চনা চিরকাল চলে না। দশের স্বার্থের সহিত যে ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত, বৈষয়িক ব্যাপারে যে হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ সাধারণতঃ অভিন্ন, ধর্ম্মাচরণে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও উদারভাব পোষণ যে এক দেশে বাসের পক্ষে একান্ত আবশ্যক,—অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক অধিকাংশ স্থলেই তাহা এতকাল বুঝিতেছিল। আশা করা যায় অর্দ্ধশিক্ষিত বা স্বার্থান্বেষী নাগরিকও ক্রমশঃ বুঝিবে।

যে-দেশে যত বিভিন্নতা সে-দেশে তত সার্ব্বজনীনতার প্রয়োজন। এই উদারতা বা সার্ব্বজনীনতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের ভিতর দিয়া আসে না যে স্বার্থের ভিতর দিয়া আসে তাহা এত উচ্চশ্রেণীর যে পরার্থের সহিত মিশিয়া যায়। এদেশে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে ও সমাজে যেমন অনেকস্থলে ঘোর সঙ্কীর্ণতা, উচ্চশ্রেণীর ব্রহ্মবাদ ও দর্শনে—জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগে—তেমনি অত্যধিক উদারতার বিকাশ। সাধারণ গ্রাম্য লোকের মধ্যেও সর্ব্বত্র বিভিন্নতা দর্শনের ফলে ধর্ম্মে সামরিক ভাব নাই। দেবদেবীর দেশে মুসলমানের "আল্লা"র নামেও পুরাণ রচিত হইয়াছে, অনেকস্থলে হিন্দুর পূজাপার্ব্বণে মুসলমানের উৎসাহ দেখা গিয়াছে। স্থলবিশেষে বিশ্বকর্ম্মার পূজার দিনে মুসলমান কারিকরকে অর্থলোভেও যন্ত্র স্পর্শ করাইতে পারি নাই। সার্ব্বজনীন ভাবের প্রসার রাজনৈতিক ও সামাজিক অনেক সমস্যার সমাধানে ধর্ম্মান্তর না ঘটাইয়াও কার্য্যকর হইতে পারে। উদার শিক্ষার বিস্তার হইলেই মানুষ বুঝিতে পারে সাম্প্রদায়িক গণ্ডী খুব তুচ্ছ জিনিষ। সাধারণ রাস্তার লোকের মধ্যে ইহার প্রভাবে সাময়িক মত্ততা জন্মান যাইতে পারে কিন্তু সেই মত্ততার উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা যাহার লক্ষ্য এত বড় দেশে—এই বিভিন্নতার বিরাট ভূমিতে—তিনি নেতৃত্বের উপযুক্ত পাত্র নহেন। তাঁহার

ক্ষমতা ততদিন যতদিন রাস্তার লোক তাঁহার নীতির বিষময় ফল বুঝিতে না পারে, যতদিন তিনি ধরা না পড়েন।

খুব বড়দরের নেতা সর্ব্বত্রই দুর্লভ। কিন্তু উদার-প্রকৃতি কর্ম্মঠ লোক সকল দেশেই আছে। এই শ্রেণীর লোক বিস্তৃতরূপে সার্ব্বজনীন ভাবের প্রচার করিতে থাকিলে তাহার শক্তি দেশের লোককে কতকটা উচ্চ স্তরেই তুলিবেই, সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক সঙ্কীর্ণতা বিলুপ্ত না হউক, প্রভাব বিস্তার করিতে ততটা সাহসী হইবে না। হিন্দু ও মুসলমানের দেশেও—এত বিভিন্নতা এত স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও—এই উদারতার ভাব সম্ভব। ইহার ভিত্তি ঐক্যের উপর, পার্থক্যের উপর নহে—উপকরণ প্রীতি, ঘৃণা নহে; হিন্দু মুসলমানের মধ্যেও ঐক্যের উপাদান যথেষ্ট আছে।

আজ যে প্রবল বৈশ্যভাবে জগৎ প্লাবিত তাহার পীঠস্থান প্রতীচী। বৈশ্যভাব সকল দেশেই আছে, মানুষের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ও অভাবের উপর উহার প্রতিষ্ঠা কিন্তু ইহার প্রবলতা পশ্চিমে। নগ্নদেহ যোগীর প্রভাব এই দণ্ডমসের (দণ্ডাচার্য্যের ?) দেশেই। সেই ব্রাহ্মণের পুনর্জাগরণ আবশ্যক। যষ্টিহস্ত সংক্রান্তি-ব্রাহ্মণের জাগরণ চাহিতেছি না, অপেক্ষাকৃত আধুনিক "স্মৃতি" ব্রাহ্মণ নামক বর্ণবিশেষের যে পার্থিব সুবিধাগুলি করিয়া দিয়াছিল তাহার অনুশাসনের কথাও বলিতেছি না, প্রকৃত সার্ব্বজনীন ধর্ম্মভাব প্রভাব বিস্তার করিলে, ধর্ম্মের উদার মত জনসাধারণের নিজস্ব হইলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কমিয়া বিভিন্নতার উপরও সমতা আসিতে পারে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ সকল জাতি, সকল সমাজের মধ্যেই আছে—মুসলমানের মধ্যেও আছে, খৃষ্টানের মধ্যেও আছে। চাই তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য। এদেশের প্রকৃতি যে আধ্যাত্মিকতার দিকে তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। যে সকল ধর্ম্মোপদেষ্টা সময়ে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের স্থানই সাম্প্রদায়িকতার অনেক উপরে। এত অস্পৃশ্যতার মধ্যেও পরকে আপন করিয়া লওয়া এ দেশের রীতি। যাঁহারা নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে প্রয়াসী অথচ বিভিন্নতার উপর সেই নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে উৎসুক তাঁহাদের প্রণালী দেশের এই বৈশিষ্ট্যানুযায়ী নহে। মুসলমান সমাজের অনেকে বলেন এদেশে হিন্দুরা শিক্ষায় ও প্রতিপত্তিতে প্রবল, তাহাদের সহিত একত্র রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিচরণ করিলে মুসলমানের স্বার্থে ব্যাঘাত জন্মিবে, মুসলমান আর মস্তক উত্তোলন করিতে পারিবে না—ইহারা স্বতন্ত্রভাবে, প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের উপর জাতীয়তার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। স্বদেশী ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী লোক অপেক্ষা বিদেশী মুসলমানকে ইহারা বেশী আত্মীয় মনে করেন, কোন কালে হয়ত ভারতবর্ষের সীমা উল্লঙ্ঘন করেন নাই কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি যায় বোগদাদ ও এঙ্গোরার দিকে। ইহারা পদে পদে ভুল বুঝিতেছেন ও করিতেছেন। এদেশে মুসলমান সংখ্যায় ও মর্য্যাদায় এত নগণ্য নহে যে ইহাদের আশঙ্কা

কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, ইহাদের অবলম্বিত প্রণালীতে দেশে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হইতেই পারে না। আমাদের শিক্ষাগুরু ইংরাজের দেশে এই নীতির প্রবলতা থাকিলে সদাশয় মণ্টেগু ও লর্ড রেডিং কোথায় আসিতেন? ইহার ফল ভেদ ও অন্তর্বিপ্লব।

যদি কোন বিকৃত-মস্তিষ্ক হিন্দু মনে করেন যে কেবল সংখ্যাধিক্যে ৭ কোটী মুসলমানকে চিরকালের জন্য পদদলিত করিয়া রাখিবেন অথবা কোন বীরহৃদয় মুসলমান যদি মনে করেন যে তাঁহার স্বজাতির বাহুবলের নিকট বিশাল হিন্দু-সমাজ ভবিষ্যতেও মস্তক অবনত করিয়া থাকিবে তবে তাঁহার সহিত তর্ক করা বৃথা। আমাদের কিন্তু মনে হয় এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম, একটু সাধারণ বুদ্ধি অনেকেরই আছে।

শুধু শারীরিক বল বা ধর্ম্মের গোঁড়ামির দিন এখন সভ্য জগতে নাই। হিন্দু ও মুসলমান বহুকাল এক দেশে বাস করায় শারীরিক বলবত্তার প্রভেদও আর বড় লক্ষ্য করা যায় না অথবা যাহা কিছু লক্ষ্য করা যায় তাহা আচার-ব্যবহার-জনিত। ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে বংশ ও ধর্ম্মজনিত তেজোবত্তার পার্থক্য বেশীদিন প্রবল থাকে না। হিন্দু ও মুসলমান বহুবার বলপরীক্ষা করিয়াছে। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত ভেদ করিয়া যখন দৃঢ়কায় মুসলমান এদেশে সমরসজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল তখন, যে কারণেই হউক, হিন্দুস্থান তাহার গতি রোধ করিতে পারে নাই। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় ও বিস্তীর্ণ দেশ-শাসন ভিন্ন ব্যাপার। যে রণোন্মাদ মুসলমানকে বিজয়ী করিয়াছিল দেশ-শাসন তাহার কার্য্য নহে। মুসলমানকে হিন্দুর সাহায্য লইয়াই দেশ শাসন করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গলা দেশে মুসলমান শাসনের সময়ে হিন্দু জমীদারগণ বরাবরই বেশ প্রবল ছিলেন। একজন হিন্দু জমিদার মুসলমান নৃপতিকে অপসৃত করিয়া স্বয়ং গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন। মুসলমানে মুসলমানে যে সকল যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিত, তাহার ভাগ্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিত অনেক সময়ে হিন্দু রাজা বা সেনাপতির রণকৌশল। মোগলকুলতিলক আকবর হিন্দুর সাহায্যেই অত বড় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন। প্রবল সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাজাহান হিন্দুর সহিত সৌহার্দ্দ রাখিয়াই দেশে শাসনকার্য্য চালাইয়াছিলেন। ধর্ম্মধ্বজী আওরঙ্গজেবও রাজপুত-নৃপতি যশোবন্ত সিংহ ও জয়সিংহের সাহায্যে যুদ্ধে ও রাজ্যশাসনে অনেক স্থলে সফলকাম হইয়াছিলেন, শেষে তাঁহার হিন্দু-বিদ্বেষই ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হইল। তিনি হিন্দুর সহিত সদ্ভাব রাখিলে রাজপুতানায় ও দাক্ষিণাত্যে হিন্দুশক্তি এত প্রবল হইতে পারিত না। অত্যাচারই দুর্ব্বলজাতিকে সবল করে, প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি জাগরিত করিয়া তোলে, দেশে ও সমাজে বিপ্লব ঘটায়। রাজসিংহ উপদ্রুত হইয়া ধর্ম্মের নামে পশ্চিম ভারতে কত কি কাণ্ড করিয়া বসিলেন, দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র শক্তি ক্রমে মোগল শক্তিকে পশ্চাতে ফেলিল। আজ ভারতে মুসলমান রাজা কোথায়? মোগল সাম্রাজ্যের

ধ্বংসাবশেষ হইতে যে সকল শক্তির উদ্ভব বা পুনরুদ্ভব সেগুলি ত প্রায়ই হিন্দু। হায়দারাবাদের নিজাম-উল্-মুল্‌ক ও অযোধ্যার নবাব অবশ্য মুসলমান ছিলেন, ভূপালের ভাগ্যবিধাতা বা বিধাত্রীও মুসলমান, কিন্তু তাহা ছাড়া এখনও যে এত করদ ও মিত্র রাজা ইংরাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে কোন মতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া বাস করিতেছেন তাঁহারা ত প্রায়ই হিন্দু। সিন্ধিয়া, হোলকার ও গাইকোবাড়ের উৎপত্তি উত্তেজিত মহারাষ্ট্র হইতে। শিখরাজ্য গুলির উৎপত্তি উত্তেজিত পঞ্জাব হইতে। ভেদনীতিই অন্তর্বিপ্লব জন্মাইয়া দেশে অরাজকতা ও পরে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইয়াছিল। আওরঙ্গজেব যদি আকবরের নীতি অনুসরণ করিতেন তবে মুসলমান সাম্রাজ্য এত শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়িত না।

মানুষ যতদিন মানুষকে মানুষ বলিয়া মনে করে ভেদনীতি ততদিন বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। মানুষ আপনাকে মানুষ মনে না করিয়া হিন্দু বা মুসলমান বা খৃষ্টান মনে করিলেই ভেদনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভাব যত বর্দ্ধিত হইবে দেশে অনৈক্যও তত বাড়িয়া যাইবে। আজ হয়ত এই নীতির অনুসরণে সম্প্রদায়বিশেষের দুইটী চাকুরী জুটিল, কিন্তু ইহাতে যোগ্যের পরিবর্ত্তে অযোগ্যের যে সংস্থান হইল শুধু নিয়তির উপর নির্ভর সে অন্যায়কে কতদিন ঢাকিয়া রাখিবে? ইহাতে স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তি ত হারাইতেই হয়, অন্য সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিয়া যে বিদ্বেষের সৃষ্টি করা হয় তাহার কুফলও সুদূরব্যাপী।

ঘোর নাস্তিক জগতে খুব কমই আছে। কোন না কোন ভাবে লোক ভগবানের উপর নির্ভর করিবার চেষ্টা করে—অন্ততঃ অবস্থাবিশেষে। একের পথ হয়ত অন্যের মনঃপূত হয় না। 'মহাজন'ও এত অধিক যে তাঁহার পন্থাটী ধরা মহাভারতকার যত সহজ মনে করেন বাস্তবিক তত সহজ নয়। নিতান্ত ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি ভিন্ন কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না 'আমার অবলম্বিত পথ একমাত্র সত্য পথ, অপর সকলেই ভ্রান্ত'। ভগবানও এত নির্ব্বোধ হইতে পারেন না যে তাঁহাকে পাইবার জন্য যে ব্যগ্র তাহাকে ঠিক পথে যাইবার ক্ষমতা দেন নাই বলিয়া শেষের দিনে পদাঘাতে দূরীভূত করিয়া দিবেন। তবে এত সাম্প্রদায়িক রেসারেসি কিসের জন্য? বিধাতাপুরুষ মানুষের দুর্ব্বুদ্ধিতায় নিশ্চয়ই হাসিতেছেন। ভাই হিন্দু বা মুসলমান, তুমি তোমার বিবেকানুযায়ী ধর্ম্মাচরণ কর কিন্তু অপরের বিবেকের পথে কণ্টক রোপণ করিতে যাইও না। ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি অন্যকে ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিতে অনিচ্ছুক থাকার কারণস্বরূপ বলিতেন—নিজের জন্য বেত খাই তাই যথেষ্ট, আবার অপরের জন্য বেত খাইতে পারিব না। বিবেকানুযায়ী ধর্ম্মোপদেশ দিলে ও সেই উপদেশ ভ্রান্ত হইলে যে পরকালে বেত খাইতে হইবে এ বিশ্বাস অবশ্য সকলের নাই। ভগবান্ হয়ত প্রবৃত্তির হিসাব লইয়াই বিচার করিবেন কিন্তু উপদেশ এক কথা আর জোর করিয়া অপরের ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত যুদ্ধ অন্য কথা।

২

বর্ত্তমান হিন্দু মুসলমানে বিবাদ ঠিক ধর্ম্মানুষ্ঠান লইয়া নহে, ধর্ম্মানুষ্ঠানের অন্তরালে কোন প্রকার স্বার্থ লইয়া। মস্‌জিদের সম্মুখে হিন্দুর বাজনা ও মুসলমান কর্ত্তৃক গোহত্যা এই দুই-টীতেই এক্ষণে হিন্দুমুসলমানের বিবাদ কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে। বাজনাও পূর্ব্বে ছিল, গোহত্যাও ছিল। এখন যে এই দুইটী ব্যাপার এতটা আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহার কারণ অনেকেরই মতে রাজনৈতিক। হিন্দু ও মুসলমানের স্বতন্ত্র গণ্ডীতে নির্ব্বাচন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ায় সভ্যপদ প্রার্থীদের অনেকে দেশের, জেলার বা উপবিভাগের কিসে হিত হয় সেদিকে লক্ষ্য না রাখিয়া হিন্দু বা মুসলমানের কিসে প্রীতি জন্মে সেই দিকেই লক্ষ্য রাখেন। সভ্য-পদপ্রার্থী মুসলমান হইলে মুসলমানের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিলেই তাঁহার সফলতার সম্ভাবনা, হিন্দু হইলে হিন্দুর প্রীতি আকর্ষণ ভিন্ন তাঁহার নির্ব্বাচনের আশা নাই। এ অবস্থায় যাঁহার নীতিজ্ঞান খুব প্রবল নয় তিনি দেশের হিতের উপর নির্ব্বাচনের দাবী উপস্থাপিত না করিয়া সাম্প্রদায়িকতার দানবী মূর্ত্তির পদেই পুষ্পাঞ্জলি দিতে স্বভাবতঃ ব্যগ্র হইয়া পড়েন। একটু উত্তেজনার যোগাড় হইলেই সাধারণ লোকের মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে যত সহজবোধ্য ও মুখরোচক করিয়া তোলা যায় দেশের হিতকে ততটা করা যায় না। কিন্তু ইহাতে যে হিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে তাহা ক্রমে সংক্রামকভাবে অপরকেও গ্রাস করিয়া বসে। ফলে দেশে যে ঘোর অশান্তি ও নানা প্রকার নৈতিক অবনতি ঘটে তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কলিকাতা গত হিন্দু-মুসলমান-দাঙ্গার সময়ে যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তাহা সভ্যদেশের অযোগ্য। লোকের ধনপ্রাণ গুণ্ডার ক্রীড়ার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বাণিজ্যের ক্ষতি ত পরের কথা। কলিকাতার দাঙ্গাতেই এই অন্তর্বিবাদ তৃপ্তিলাভ করে নাই। মফঃস্বলে স্থানে স্থানে ইহার স্রোত পৌঁছিয়া নানা প্রকার অত্যাচার অশান্তির মধ্যে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দাঙ্গায় যোগ দেয় নাই তাহাদেরও অনেকেরই মনের ভাব এত বিকৃত করিয়া দিয়াছে যে কতদিনে যে আবার প্রকৃত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে তাহা বলা কঠিন। এইরূপ ভাব যে-দেশের শিক্ষিত বা অশিক্ষিত প্রতিবেশী পরস্পরের মধ্যে পোষণ করিতে পারে সে-দেশের রাজনৈতিক গগন তমসাবৃত না হইয়াই পারে না।

আত্মরক্ষার চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, নিজের দলপুষ্টির ইচ্ছাও তাই, মুসলমানেরা অনেক হিন্দুকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। হিন্দুরা সাধারণতঃ মুসলমান বা খৃষ্টানকে স্বশ্রেণীতে গ্রহণ বা পুনর্গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। আজকাল কোন কোন হিন্দুসম্প্রদায় ধর্ম্মে উদারতা প্রদর্শন করতঃ এই প্রথার ব্যতিক্রম ঘটাইতেছেন। এই সকল সম্প্রদায়ের লোক তাহা ঘটাইতে গিয়া যদি বলপ্রকাশ করিয়া বসেন তবে অবশ্যই নিন্দনীয় ও দণ্ডার্হ হইবেন। কিন্তু যদি ন্যায়সঙ্গত উপায়ে—আইনের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া —এরূপ করেন তবে অন্য সম্প্রদায়ের তাহাতে ক্রুদ্ধ হইবার অধিকার নাই। কতক হিন্দু মুসলমানের অনুকরণে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার

চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া সাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইলেই ভাল হয়—কিন্তু যেখানে তাহা ঘটে না সেখানে এক পক্ষ সঙ্ঘবদ্ধ হইলে অপরকেও বাধ্য হইয়া তাহার অনুকরণ করিতে হয়। দেশটা পূর্ব্বে হিন্দুর ছিল, তাহার 'পর হইল হিন্দু মুসলমানের, এখনও প্রধানতঃ তাই। ইংরেজাদি পাশ্চাত্য জাতীয় লোক যাঁহারা আছেন তাঁহারা বেশীর ভাগই অস্থায়ী অধিবাসী—অর্থোপার্জ্জনের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে এদেশে আসেন, কার্য্যসিদ্ধি হইলেই দেশে ফিরিয়া যান। তাঁহাদেরও অবশ্য এদেশে স্বার্থ আছে এবং সেই স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁহারাও আবশ্যকমত সঙ্ঘবদ্ধ হন। এ অবস্থায় দোষটা কি কেবল হিন্দুর বেলায়ই হইবে ?

হিন্দুরা দেশে সংখ্যায় ও শিক্ষায় প্রবল। মুসলমানের সাহায্য না পাইলেও তাঁহারা নিজেদের মধ্যে দলাদলি মিটাইয়া লইতে পারিলে একটা বড় জাতি হইতে পারেন। কিন্তু সাহায্য না পাওয়া এক কথা আর বাধা পাওয়া অন্য কথা। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই প্রাচ্যজাতি। বৈশ্যবৃত্তিকে প্রাধান্য দান ইহাদের মধ্যে কোন কালেও ছিল না। হিন্দুভারতে দরিদ্রজাতি ব্রাহ্মণই চরিত্রগুণে সকলের উপরে ছিলেন—তাঁহার মাহাত্ম্য ছিল ত্যাগে, ভোগে নহে। তাহার পরেই সামরিক জাতি ক্ষত্রিয়। ইস্‌লাম জগতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-বৃত্তির একাধারে সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, বৈশ্যবৃত্তির নহে। হজরত মহম্মদ একদিকে যেমন ধর্ম্মপ্রচারক অন্যদিকে সেইরূপ যোদ্ধা ও সেনাপতি ছিলেন। পরবর্ত্তী খলিফারাও তাই। বাঙ্গলা দেশে মুসলমান অভিযানের সময় অনেক আউলিয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা ত্যাগী ধর্ম্মযাজক হইলেও অনেকেই আবার অস্ত্রধারণে পটু ছিলেন, দলবলে সশস্ত্র চলিতেন। হিন্দু ও মুসলমানে এখানে বেশ একটু প্রভেদ ছিল কিন্তু আউলিয়াদিগের মাহাত্ম্য ছিল আধ্যাত্মিকতায়, অস্ত্রধারণে নহে। মুসলমান ফকীর ও হিন্দু সন্ন্যাসীর মিলনের ক্ষেত্র ছিল এইখানে। সশস্ত্র আউলিয়া এখন নাই, কিন্তু ফকীর ও সন্ন্যাসী দেশে যথেষ্ট আছে। অনেকেই ভণ্ড, সাধুসন্ন্যাসীর বেশে ডালরুটীর সংস্থানে ব্যস্ত; কিন্তু যে-দেশে আসল নাই সে-দেশে মেকী চলে না। আধ্যাত্মিকতার এখনও আদর আছে বলিয়া দেশে এত মেকী চলিয়া যাইতেছে। ধনলিপ্সার পরিবর্ত্তে ত্যাগশীলতার উপর, হিংসার পরিবর্ত্তে প্রীতির উপর, জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই এদেশের পক্ষে স্বাভাবিক ও আবশ্যক। ইহার সহিতও রাজনীতির সংস্রব আছে, কিন্তু সে রাজনীতি কিছু অন্য ধরণের।

এ দেশের আদর্শ শাসক জুলিয়স্ সিজর নহেন,—ত্যাগের অবতার রামচন্দ্র ও ধর্ম্মপ্রচারক অশোক। জনসাধারণের অভিমত অনুসারে রাজ কার্য্যের ব্যবস্থাও এদেশে ধর্ম্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। সে নীতি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের নহে, সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের; সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী ধরিয়া নির্ব্বাচন, সে নীতির সহিত মোটেই মিশ খায় না। মুসলমানকে

বাদ দিলেও হিন্দুর মধ্যে এত দলাদলি, জাতি ও আচারের এত বিভিন্নতা যে সংস্কার ভিন্ন মিলন অসম্ভব। এ দিকে হিন্দু মনস্বিগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে কিন্তু উপযুক্ত কাজ হইতেছে কোথায়? ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রের দোহাই সকল ব্যবস্থাতেই চলে। নানা মুনির নানা মতের ফলে, যুগযুগান্তর ধরিয়া আচার পরিবর্ত্তনের ফলে তাহাতে এত বিভিন্নতার সমাবেশ ঘটিয়াছে যে সমাজের কল্যাণজনক সকল ব্যবস্থারই নজীর তাহা হইতে বাহির করা সম্ভব। শিক্ষিত সমাজ—আবশ্যক মত পণ্ডিতের সাহায্য লইয়া—নূতন ব্যবস্থা করুন, অসন্তুষ্ট নিম্নজাতিকে উপরে টানিয়া তুলুন, নির্য্যাতিত জাতির টানে যেন স্বয়ং নীচে পড়িয়া থাকিতে না হয়। এদিকে যাহা কিছু চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে হইয়াছে তাহা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর। ইংরাজী শিক্ষা ও তাহার পরোক্ষ প্রভাব দেশের সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যার সময় আসিয়াছে। হিন্দু মহাসভা ভাসা ভাসা কাজ না করিয়া এদিকে উঠিয়া পড়িয়া লাগুন, দেশময় উপযুক্ত লোকের সাহায্যের ব্যবস্থা করুন। হিন্দুর সমাজ সংস্কার চলিতে থাকিলে তাহার ঢেউ মুসলমান সমাজেও পৌঁছিবে। আপনাদের মধ্যে একতা আনয়ন করিতে পারিলে সাম্যবাদী মুসলমানের সহিত একতা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে। গোহত্যা ও মস্‌জিদের সম্মুখে বাজনা লইয়া বিবাদ অন্তর্দাহের সামান্য বাহ্য বিকাশ মাত্র। চাই সেই অন্তর্দাহের নিবারণ। ধর্ম্মনীতি সমাজনীতির ধারা সংশোধন করিলে ক্রমে রাজনীতিও সহজ হইবে। সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার ভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাধির প্রতিকারের আশা দুরাশা মাত্র।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

নটরাজ

ডিমি ডিমি ডিমি বাজিছে ডমরু,
তাথৈ তাথৈ চরণে,
মহাকাল ওই নাচে তাণ্ডব
দলিয়া জীবন মরণে;
জ্বল ধক্ ধক্ কপাল অনল,
পিঙ্গল জটা অম্বর তল
ফেলেছে ঢাকিয়া—কণ্ঠের ফণী
গরজে রুদ্ধ স্বননে।

যজ্ঞ অনল ফেলে নিশ্বাস
নিখিল প্রাণের মরমে,
বাজে ওম্ ওম্ প্রলয় ঘণ্টা
ঘুচায়ে শঙ্কা সরমে,
সুমুখে প্রসারি সুবিমল কর
জানায় বিশ্বে শঙ্কা কাতর
বর ও অভয় রয়েছে লুটায়ে
ও অভয় পদে চরমে।

প্রলয় সৃষ্টি, সৃষ্টি প্রলয়,
বাজে অনন্ত বাণী ;
ভাঙা আর গড়া, হারান ছড়ান,
সংঘাত হানাহানি ;
হাসি ও অশ্রু, শীত বসন্ত,
দিবস রাত্রি কত অনন্ত,
জীবন মরণে—কত কোলাকুলি
কত কথা কানাকানি !

নৃত্যচপল কত না ধরণী
নিঃশেষে হ'ল হারা,
নিভে গেছে কত দীপ্ত তপন,
খ'সে গেছে কত তারা ;
কত অনাগত সৌর জগৎ
রুদ্ধ আবেগে খুঁজে ফিরে পথ,
কত নীহারিকা নভোতট যুড়ি
এখনও অর্থ হারা !

নাচে নটরাজ—গুরু গুরু গুরু
ঝরে অবিরল জল,
অলকা নগরে যক্ষ-বধূর
হিয়াখানি টলমল ;
কাননে কাননে বাজে কলরোল,
কেলি কদম্বে, দোলে হিন্দোল,
'আয় আয় আয়'—বাঁশী বেজে উঠে
নবরাগ বিহ্বল !

নাচে নটরাজ—আসে বৈশাখ
মেঘের ঐরাবতে
তুলি বৃংহতি দেবদারু বনে
দূর গিরি পর্ব্বতে ;
মদদান-ঘন দিন দুর্দ্দিন,
উৎসব দীপ হয়ে আসে ক্ষীণ—
তুলে দাও ধ্বজা, বাজাও শঙ্খ
শঙ্কাহরণ রথে !

মনে নাই সেই দু'হাতে ঠেলিয়া
এসেছিলে হেথা কবে !
আজিকে হয়েছে যাবার সময়,
পথ ছেড়ে দিতে হবে ;
কল্লোলি উঠে জোয়ারের গান,
আসে তরুণের মহা অভিযান,
জাগিছে প্রভাত- সন্ধ্যার ফুল
কেমনে হেথায় রবে !

যুগ যুগ ধরি চলে অভিনয়,
উঠে পড়ে যবনিকা ;
কোথাও রৌদ্র, কভু মেঘ ঝড়,
বজ্রচপলা শিখা ;
কভু আনন্দ, কল উৎসব,
কভু মহামারী আর্ত্ত নীরব ;
শুধু বেড়ে যায় অনন্ত লিপি—
মহাভাষ্যের লিখা !

নাচে নটরাজ—ওম্ ওম্ ওম্
উঠে অনাহত ধ্বনি ;
কোথায় মৃত্যু, কোথায় জীবন,
কোনখান হতে গণি !
শুধু কূলে কূলে দুলে মহোদধি,
তারি আসা যাওয়া শুধু নিরবধি,
শুধু শুনি কানে তারি তরঙ্গ
উন্মাদ রণরণি !

তাথৈ তাথৈ জাগে তাণ্ডব,
কূলছাপা উচ্ছ্বাস,
অসীম প্রাণের স্পন্দন ঘন
বিচিত্র পরকাশ ;
যায় ডুবে যায়, যায় সুখ দুখ,
চির-নবলীলা-রস-উন্মুখ
নাচে নটরাজ—কাঁপে অণু-রেণু
উথলিছে উল্লাস।

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

তৃপ্তি

(১২)

কলিকাতায় কয়েকদিন পড়িয়া থাকিয়া শিশির চারিদিকে নানাবিধ অনুসন্ধান করিল কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। তারপর সে স্থির করিল সে নিজে দেশে দেশে ঘুরিয়া দিলীপের খোঁজ করিবে।

অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে সে ছুটি লইয়াছিল, কাজেই সে আর ছুটি পাইল না। সুতরাং সে একদম কাজে ইস্তফা দিয়া চলিয়া গেল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের দুই ধার দিয়া প্রত্যেক ষ্টেশনে নামিয়া সে সন্ধান করিতে লাগিল কোথাও কোনও সূত্র সে পাইল না। অনেকস্থানে সে এক-একটা ভুয়ো খবর পাইয়া সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধান করিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে আবিষ্কার করিল যে, যে সন্ধান সে পাইয়াছে সেটা কোনও কাজের নয়।

এমনি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে দুইমাস বাদে কাশীতে আসিয়া পড়িল। কাশীর ঘাটে ঘাটে, পথে পথে সে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর আখ্ড়া ঘুরিল। ছোক্রা গোছের সন্ন্যাসী ফকীর দূর হইতে দেখিয়া অনেকবার সে অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু প্রতিবারই নিরাশ হইয়াছে।

অবশেষে সে আশা ছাড়িয়া দিল, ভাবিল, এতটুকু ছেলে, চিরদিন বাপের আওতায় মানুষ! সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া কোথায় যাইবে? পথে ঘাটে কোথাও বেঘোরে মারা গিয়াছে।

জীবনে তার দারুণ বৈরাগ্য আসিয়া পড়িল। ঘরে ফিরিবার নামে তার প্রাণে আগুন জ্বলিতে লাগিল। মিনতির স্মৃতিতে তার মনে বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল, দারুণ জ্বালা অন্তরে লইয়া সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

মনের জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য সে ধর্ম্মে মন দিল। সাধু-সন্ন্যাসীদের আখ্ড়ায় যাইয়া সে ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিত আর মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিয়া বেড়াইত। ইহাতে তার অশান্ত চিত্ত অনেকটা শান্তি লাভ করিল।

কিছুদিন এমনি গেলে সে মিনতিকে একখানা ও বিনোদকে একখানা চিঠি লিখিল। লিখিল যে, বয়সের অযোগ্য মোহে অন্ধ হইয়া সে পাপ করিয়া ফেলিয়াছে, ভগবান তার শাস্তি হাতে হাতে দিয়াছেন। মিনতির তাতে কোনও দোষ নাই সত্য, কিন্তু অভাগ্যের সঙ্গে যখন তার অদৃষ্ট জড়াইয়া গিয়াছে তখন তার দুঃখ ভোগ ছাড়া উপায় কি? সে মিনতিকে পিত্রালয়ে ফিরিয়া যাইতে লিখিল। তার বিষয় সম্পত্তি যা কিছু আছে সে মিনতির হাতে

দিয়া নিজে মাত্র মাসে একশ' টাকা লইবে। যদি দিলীপ কোনও দিন ফিরিয়া আসে তাকে যেন মিনতি সমস্ত সম্পত্তি ফিরাইয়া দেয়। নতুবা সে সব মিনতির হইবে। বিনোদ এই সব বিষয়ে যে ব্যবস্থা আইনসঙ্গত হয় তাহাই করিবে।

মিনতি চুঁচুড়ার বাড়ীতেই ছিল। স্বামী চলিয়া গেলে প্রথম সে এক চোট খুব কাঁদিয়াছিল। দুঃখে সে কাঁদিয়াছিল, অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছিল। বাড়ীর আর কেহ তার দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই, কিন্তু মালতী তার কাছে তার চিরাভ্যস্ত সেবা লইয়া আসিয়াছিল। সে মিনতিকে সান্ত্বনা দিত, আশার কথা শুনাইত, খাওয়াইত, পরাইত। তার হৃদয়ের সকল স্নেহ ঢালিয়া সে এই বঞ্চিত তরুণীর দুঃখের বোঝা কতকটা লঘু করিত। মিনতি এই স্নেহময়ী নারীর সেবায় অনেকটা তৃপ্তি পাইত। বিশ্ব-জোড়া অস্নেহের মাঝখানে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া সে মালতীকে তার ঊষর জীবনের একমাত্র সুখের আশ্রয় বলিয়া জড়াইয়া ধরিল।

যখন সাত আট দিন চলিয়া গেল, দিলীপের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না, আর স্বামী একখানা চিঠি দিয়াও তাহার সংবাদ নিলেন না, তখন সে কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিল। নিদারুণ অভিমান তার সমস্ত চিত্তকে কঠোর করিয়া তুলিল। এত অপমান তার কেন? সে কি করিয়াছে? তার তো কোনও অপরাধই নাই, অথচ স্বামী তাকে অপরাধীর মত শাস্তি দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন! সে কি ইহা কেবল মাথা পাতিয়া লইবে।

তার বড় রাগ হইল স্বামীর উপর, সপত্নী পুত্রের উপর। সে কিছু উপযাচিকা হইয়া তাদের সংসারে আসে নাই। ভালবাসিয়াছিল শিশিরকে এই তার অপরাধ, কিন্তু শিশিরকে তো সে কোনও মতে ফুসলাইয়া বিবাহ করায় নাই! শিশিরই উপযাচক হইয়া গিয়াছিল, মিনতিকে না পাইলে তার জীবন অসার্থক হইয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। তাই সে আসিয়াছে। আর তাকে ইহারা একটা পরীক্ষার পর্য্যন্ত অবসর দিল না; স্বামী ও সপত্নী-পুত্রের উপর যে বুকভরা স্নেহ ও করুণা লইয়া সে আসিয়াছিল তার পরীক্ষার একটা অবসর না দিয়া তারা এমনি অপমান করিল তার! কেন? সে কি একটা মানুষ নয়? তার জীবনের, তার সুখ-দুঃখের, তার সার্থকতা-অসার্থকতার কি একটা মূল্য নাই?

মনে পড়িল তার, কতবড় আশা লইয়া সে স্বামীর হাত ধরিয়া এ বাড়ীতে আসিয়াছিল—কত ভাল সে বাসিয়াছিল। সে আশায় তার ছাই পড়িয়াছে, সে ভালবাসায় আগুন লাগিয়া গিয়াছে। কেন সে ভালবাসিয়াছিল, কেন বা সে সব হারাইল! এই অভিশপ্ত প্রেম না হইলে তার জীবনটা তো এমন খাক্ হইয়া যাইত না! সে পড়াশুনা করিয়া এক রকম আনন্দেই জীবন কাটাইতে পারিত। তবু—তবু তো সে ভালবাসিয়াছে!—মনে পড়িল,—

'It is better to have loved and lost

Than never to have loved at all,

মনে পড়িল এ দুটি ছত্রের ব্যাখ্যা লইয়া তার আলোচনা। কথাটা তার একেবারে মিথ্যা মনে হইল না। যদি তার প্রেমাস্পদকে ভগবান আপনার কোলে কাড়িয়া লইতেন তবে সে এ কথায় কতক শান্তি লাভ করিতে পারিত। কিন্তু এমন করিয়া তাকে উজাড় করিয়া দিয়া, তার জীবনের সব স্বাদ তিক্ত করিয়া যে তার প্রেমাস্পদ তার প্রেমের অপমান করিয়া গেল—মনে হইল এর চেয়ে ভালবাসার আস্বাদ না জানাও যে তার ভাল ছিল।

অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া, মিনতি শক্ত হইয়া বসিল, মালতীর সঙ্গে সে তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিল। মালতীর বুদ্ধি হার মানিল। অনেক যুক্তি করিয়া সে ভাবিল স্বামীর কাছে একখানা বিনীত পত্র লিখিয়া তাঁকে ঘরে ফিরিতে অনুরোধ করিবে, কিম্বা তাঁর কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়া অনুরোধ করিবে। এটা মালতীর পরামর্শ। এ কথা সম্পূর্ণ মনোনীত না হইলেও মিনতি স্বীকার করিল। কিন্তু শিশিরের ঠিকানা কিছুতেই জোগাড় করা গেল না। সে আজ এখানে কাল সেখানে থাকে। টেলিগ্রাফে খবর দেয়, টেলিগ্রাফে তার কাছে টাকা যায়। কাজেই এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা গেল না।

তার বড়দা তাকে পিত্রালয়ে লইতে আসিলেন, বিনোদ সঙ্গে আসিল। তারা অনেক সাধ্য-সাধনা করিল, মিনতি কিছুতে নড়িল না। সে বলিল এ বাড়ী রাখিতে হইবে এবং এ বাড়ীতে তার থাকিতে হইবে। কেন না, দিলীপ যদি কখনও ফিরিয়া আসে তো এই বাড়ীতেই আসিবার সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং সে এই বাড়ীতেই থাকিবে। তার এ সঙ্কল্প হইতে কিছুতেই টলাইতে না পারিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। সুমতি ও তার বউদিদিও আর একবার আসিয়াছিল, তাহারাও মিনতির সঙ্কল্প টলাইতে পারিল না।

শিশির সব কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল, সে বিজ্ঞাপন কিছুদিন চলিয়া বন্ধ হইয়া গেল। তারপর মিনতি বিজ্ঞাপন দিল। সে বিজ্ঞাপনে সে লিখিল,—

"বাবা দিলীপ, তুমি বড় দুঃখে বাড়ী থেকে চ'লে গেছ। ফিরে এসো বাপ। তোমার পিতা দেশত্যাগী হ'য়েছেন আমার জীবন বিষময় হ'য়ে গেছে। আমি তোমার জন্য ঘর আগ্‌লে ব'সে আছি। তুমি এলেই চলে' যাব। তোমার সুখের কোনও বিঘ্নই থাকবে না, এ কথা আমি সব দেবতার নামে শপথ ক'রে বলছি।

তোমার অভাগিনী মা—মিনতি।"

এ বিজ্ঞাপনের কোনও জবাব আসিল না। কিন্তু নিয়মিতরূপে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতে লাগিল।

তার পর মিনতি মালতীর মুখের একটা কথা ধরিয়া স্থির করিল সে তারকেশ্বরে গিয়া

হত্যা দিবে। এ সঙ্কল্প শুনিয়া মালতীই সর্ব্বাগ্রে তাহাকে বারণ করিল। সকলেই বাধা দিল, কিন্তু মিনতি বাধা মানিল না।

লোকজন লইয়া রমেনের সঙ্গে সে তারকেশ্বরে চলিয়া গেল। মালতী যাইতে চাহিল কিন্তু মিনতি তাকে সঙ্গে নিল না, বলিল, "দিলীপ যদি এ বাড়ীতে ফিরে আসে তবে তুমি ছাড়া কে তাকে আটকাতে পারবে মেয়ে?"

তারকেশ্বরে গিয়া সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা পরিহার করিয়া সাতদিন ক্রমান্বয়ে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিল। তার পর সে একদিন তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখিল, মহাদেব আসিয়া তাহাকে বলিতেছেন, "তুই ঘরে ফিরে যা, কিছু দিন পরে তোর আশা মিটবে—এখনো সময় হয় নি।" আর মহাদেবের পাশে সে অস্পষ্টভাবে এক শিশু সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি দেখিল তার মুখ অনেকটা দিলীপের ফটোর মত।

এই আদেশ পাইয়া সে উপবাস-ক্লিষ্ট দেহ টানিয়া তুলিল। দুটি ঝি ও রমেন তার সঙ্গে ছিল তাহারা কোনও মতে তোল্লা করিয়া তাহাকে উঠাইয়া আনিল।

হুগলীতে ফিরিয়া মিনতি মালতীর কাছে তার স্বপ্নের কথা জানাইল। তার অন্তর আশায় ভরিয়া উঠিল। দেরী থাক, কিন্তু দিলীপ আসিবে—বাবা তারকনাথের আদেশ মিথ্যা হইবার নয়। এই আশায় বুক বাঁধিয়া সে দিন কাটাইবে। মালতীও বুক বাঁধিয়া উঠিয়া বসিল।

ইহার কিছুদিন পর সে শিশিরের পত্র পাইল। পত্র পড়িয়া তার মনটা একদম বিষ হইয়া গেল। কি অবিচার! নিরপরাধা নারীকে এমন করিয়া লাঞ্ছনা ও অপমান করিতে একটু দ্বিধা হইল না তাঁর? তার প্রেম ও নারীত্বের এমন অমর্য্যদা করিয়া আজ তার স্বামী তাকে সম্পত্তি দিয়া ভুলাইতে চান। কি লজ্জা! কি ঘৃণা! সে-চিঠির উত্তরে সে লিখিল,

"তোমার পত্র পেলাম। এতদিন পর যে আমার কথা মনে প'ড়েছে সেজন্য ধন্যবাদ।

"তোমার ধন-সম্পদে আমার প্রয়োজন নাই। তোমার কাছে পত্নীত্বের কোনও অধিকারই আমি চাই না। আমার কেবল একটী অনুরোধ, তুমি ফিরে এসো।

"আমি এখানকার বাড়ী ছাড়ি নি। যদি কোনও দিন দিলীপ ফিরে আসে এই আশায় আমি বাড়ী আগ্‌লে ব'সে আছি। বাবা তারকনাথের কাছে হত্যা দিয়েছিলাম, তিনি আদেশ দিয়েছেন—দিলীপ ফিরে আসবে কিন্তু তার দেরী আছে।

"আমার বিশ্বাস যে যতদিন আমি বাড়ীতে আছি ততদিন সে ফিরবে না। তাই তোমার পায় ধরে' অনুরোধ ক'রছি তুমি ফিরে এসো। তোমাকে বাড়ীতে না রেখে আমি কোথাও যেতে পারছি না। তুমি এলেই আমি চলে যাব। তোমার বা তোমার ছেলের পথে কোনও রকম বিঘ্নই আমি হব না। তোমার যেভাবে দিন কাটান ইচ্ছা হয়, এইখানে গঙ্গার তীরে

এসেই কাটাও। দিলীপ ফিরে এলে আর যা হয় করো। আমার জন্য তুমি কোনও ভয় ক'রো না। আমি তোমার কাছেও থাকব না।"

বিনোদ শিশিরের চিঠি পাইয়া স্বয়ং সশরীরে কাশীতে গিয়া উপস্থিত হইল। উপরোধ অনুরোধে যখন কিছু হইল না, তখন সে মুখ খুলিয়া গালিগালাজ করিয়া তার বন্ধুত্বের পরিসমাপ্তি করিয়া আসিল। তার মনটা কেবল এই অনুশোচনায় তিক্ত হইয়া উঠিল যে যখন শিশির নিজে সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিল তখন বিনোদই তাকে জোর করিয়া বিবাহ করাইয়াছিল। না হইলে মিনতির আজ এ দুর্গতি হইত না। তার এই বুদ্ধির ভুলের জন্য বিনোদ আপনাকে ক্ষমা করিতে পারিল না।

মিনতির পত্র পাইয়া শিশির পরম ঔদাস্যের সহিত তাহা ফেলিয়া দিল। একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য চিঠিখানা পড়িয়া তার মন মিনতির উপর একটু নরম হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই দিলীপের পত্রখানার কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল যেদিন দিলীপকে সে হারাইল সেদিন মিনতি আদ্যোপান্ত অলঙ্কার পরিয়া সাজিয়া বসিয়াছিল। সে স্থির করিল এ চিঠি আগাগোড়া মিথ্যা অভিনয়। মিনতি কবি, কথা গাঁথিতে সে জানে—বেশ গুছাইয়া একখানা চিঠি লেখা তার পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু দিলীপের জন্য তার প্রাণ কাঁদিতেছে এটা সম্ভব নয়। তাই সে চিঠিখানা ফেলিয়া দিল।

মিনতিকে সে আর চিঠি লিখিল না। তার পরিবর্ত্তে দেশে তার নায়েবকে লিখিল, মাসে মাসে শিশিরের নিকট ১০০৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়া অবশিষ্ট টাকা মিনতির কাছে বুঝাইয়া দিবে এবং সকল আবশ্যক কার্য্যে মিনতির আদেশ লইবে। বিষয়-সংক্রান্ত কোনও কথা যেন শিশিরের কাছে আর না লেখা হয়।

(১৩)

আরও চার বৎসর চলিয়া গিয়াছে। উমা অনেক দিন সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

দিলীপের কোনও খবরই পাওয়া যায় নাই। শিশির কাশী ছাড়িয়া অন্যান্য তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মিনতি এখন পাকা গৃহিণী ও ভূম্যধিকারিণী হইয়া বসিয়াছে। সে বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করে, তার তত্ত্বাবধানে সম্পত্তির আদায় তহশিল বেশ সুচারুরূপে হইতেছে। মাসে মাসে শিশিরের কাছে নিয়মিতরূপে একশত টাকা করিয়া পাঠান হইতেছে। অবশিষ্ট টাকার মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা সমস্তই নিয়মিতরূপে ব্যাঙ্কে জমা হয়।

রমেনের লেখাপড়া বেশী দূর হইল না। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তিনবার অকৃতকার্য্য

হইবার পর মিনতি তাহাকে পড়া ছাড়াইয়া তার সম্পত্তির ভিতর এক নায়েবিতে নিযুক্ত করিয়াছে। এখন সে মিনতির দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ।

মিনতির আবশ্যকাতিরিক্ত ব্যয় মাত্র একটি আছে—সে সাধু সন্ন্যাসীর সেবা—তারকেশ্বরে দৃষ্ট অস্পষ্ট স্বপ্নের ফল। কোনও সন্ন্যাসী আসিয়া তার কাছে ফিরিয়া যায় না। তার চুঁচুড়ার বাড়ী প্রায় একটা সাধুর আখড়া হইয়া উঠিয়াছে। সাধুদের সেবা করিয়া মিনতি প্রত্যেকের কাছে জিজ্ঞাসা করে তারা দিলীপের মত কাহাকেও দেখিয়াছে কিনা। কোনও রকম সন্ধান পাইলেই সে সেখানে খোঁজ খবর করে। তারপর তাদের বিদায়ের সময় মিনতি তাঁদের অনুনয় করিয়া বলে যে যদি কোথাও তাঁরা দিলীপের সন্ধান পান তবে যেন মিনতিকে সংবাদ দেন। এই সব সাধু সন্ন্যাসী অনেক দেশে ভ্রমণ করে, এতগুলি লোকের চেষ্টায় কোনও না কোনও সন্ধান সে একদিন পাইবে তার এমন আশা হইল।

একদিন একটি সাধু আসিল, তার সঙ্গে চারটি চেলা ছিল—তাদের বয়স খুব বেশী নয়। তার মধ্যে আঠার উনিশ বৎসরের এক যুবককে দেখিয়া মিনতির কেমন একটু সন্দেহ হইল। সে মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল। মালতী অনেক করিয়া সাধুকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একবার বলিল এই দিলীপ, আর একবার বলিল এ নয়। রমেনকে দিয়া অনুসন্ধানেও বিশেষ কিছু ফল হইল না।

চেলাটির নাম ছিল তোতারাম। তার সুগঠিত দিব্য দেহ, তার অত্যন্ত প্রশান্ত কমনীয় কান্তি। তার চোখের ভাব অনেকটা বিদ্যুতের ফটোর মত। মিনতি লক্ষ্য করিল তার আচার-ব্যবহার সাধারণ সাধু সন্ন্যাসীর চেয়ে অনেকটা ভদ্র ও নম্র—সে মোটেই কাঠ-খোট্টা নয়।

দিলীপের চেহারার এমন কোনও বিশেষত্ব কাহারও মনে আসিল না যাহা দিয়া নিঃসন্দেহরূপে তাকে ছয় বৎসর পর চিনিয়া ফেলা যায়। আর তের বছরের ছেলের উনিশ বছরে কি চেহারা হইবে একথা কেহ বলিতে পারে না। কাজেই সন্দেহ মিটিল না। রমেন ও মালতী তাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিল কিন্তু সাধুবাবা হিন্দুস্থানী বুলিও ছাড়িল না, কোনও রূপে ধরা-ছোঁয়াও দিল না।

শেষে মিনতি একদিন তাকে ভিতরে ডাকাইয়া আনিল।

তোতারাম নেংটির উপর বেশ সম্ভ্রান্তভাবে গৈরিকবাস জড়াইয়া মিনতির সম্মুখে আসিয়া বসিল। আর তার জলযোগের জন্য যে আয়োজন করা হইয়াছিল সম্পূর্ণ বাঙ্গালী কায়দায় তার যথারীতি সৎকার করিল।

তখন মিনতি বলিল, "বাবা, তুমি তো হিন্দুস্থানী নও, বাঙ্গালীর ছেলে।"

সাধু মাথা নত করিয়া বলিল, "নেহি মাই—মৈঁ পশ্চিমসে আয়া হুঁ।"

সাশ্রুনয়নে মালতী বলিল, "কার ঘর আঁধার ক'রে এয়েছ বাছা। তোমার তো নরম শরীর, এ কষ্টের জন্য তো এ দেহ তৈরী হয় নি।"

"মাফ কিজিয়ে মাইজী। ঘরকা খবর বোলনা সাধু লোগকো মনা হৈ।"

"বাবা আমি বড় দুঃখী, আমার মুখপানে চাও, আমায় মিছেমিছি কাঁদিও না। যদি আমার দিলীপ হও তবে বল বাবা।"

তোতারাম মিনতির মুখের দিকে চাহিল। তার চোখে জল দেখিয়া একটু বিব্রত হইয়া গেল। তার পর মাথা নত করিল। মিনতি তার ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। তাহাতে সাহস পাইয়া সে তোতারামের একখানা হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল, "আর আমায় দগ্ধাস্নে বাপ, তুই-ই দিলীপ।"

সাধু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বাঙ্গালায় বলিল, "মা আমি দিলীপ নই।"

মিনতি হাত ছাড়িয়া দিল, তার সমস্ত মুখে যেন কে কালী ঢালিয়া দিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে বলিল, "তবে তুমি কে ?"

"মিথ্যা বলবো না মা, আমি বাঙ্গালী, কিন্তু আমার পরিচয় বলতে পারবো না।"

"তুমি দিলীপ।"

"না মা।"

"আচ্ছা দিলীপ হও বা না হও, আমাকে তুমি মা ব'লেছ তোমাকে আমি ছাড়বো না। তুমি যেই হও তুমি আমার ছেলে।"

সন্ন্যাসী মাথা নত করিয়া নীরব রহিল। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, "মা আমাকে বাঁধবেন না, আমায় ছেড়ে দিন। আমি মোক্ষলাভ করবার আশায় বেরিয়েছি, আপনি তাতে অন্তরায় হ'বেন না।"

"এই কি তোমার মোক্ষলাভের বয়স বাবা ? তোমার এই কাঁচা বয়েস, এখনতো তোমার ভোগের সময়।"

"মোক্ষলাভের বয়স কিছু ঠিক নেই। ধ্রুব, প্রহ্লাদ কত বছরে মোক্ষলাভ ক'রেছিলেন ? তা ছাড়া মোক্ষলাভ তো দুচার দিনের কথা নয় মা। সারা জীবন সাধনা ক'রে তবে লোকে মোক্ষলাভ ক'রতে পারতে পারে। কাজেই যত শীগ্‌গির আরম্ভ করা যায় ততই ভাল।"

"কিন্তু তুমি মোক্ষলাভের সন্ধানে ঘুরবে, আমার কি উপায় হ'বে ? আমার প্রাণটা তো এই জড় জগতে আটকে থেকে আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে মরবে। আমাকে তুমি মা বলেছ, মায়ের দুঃখ দেখবে না, একথা কোন শাস্ত্রে বলে ?"

"মাপ করুন মা, আমাকে আর লুব্ধ ক'রবেন না।" বলিয়া হাত জোড় করিয়া সাধু প্রস্থান করিল।

মিনতি রমেনকে বলিল, "এ দিলীপ না হ'য়ে যায় না। কি বল রমেন ?"

"হাঁ মামীমা, আমার তো তাই মনে হ'চ্ছে।"

মালতীকে বলিল, "তুমি কি বল মেয়ে ?"

"কি বলবো মা, কিছুই বুঝতে পারি না। তবে আমার দিকে যে তাকিয়ে দেখছিল, আমার মনে হ'ল যেন আমাকে ও চিনতে পেরেছে।"

"রমেন, ওকে কিছুতেই ছাড়া হ'বে না।"

"তাই তো, কিন্তু কি ক'রে আটকান যায় ওকে ?"

"ওর গুরুর হাত পা ধ'রে বল্‌বো, তাঁর দয়া হ'লেই হ'বে। তুমি তা'কে একবার বলগে রমেন।"

রমেন অনেক দরবার করিয়া গুরুজীর সঙ্গে কথাটা প্যাড়িতে পারিল। গুরুজী হাসিয়া বলিল, "আরে লড়কা, রহোগে য়হা ঘরমে—না মোক্‌ষ লাভকা ইরাদা হ্যায়।"

"প্রভু মুঝকো মৎ ছোড়িয়ে—মৈঁ মাফ চাহতা হুঁ।"

"শুনা বাবুজী—য়হ চিড়িয়া সংসারকে বন্ধন ছোড়কে মুক্ত আকাশ পর ধাওয়া কিয়া হৈ, উসকো ক্যা মায়াসে বন্ধা জায়েগা ? মাইজীকো বোলিয়ে, মায়া মৎ কিজিয়ে। রামচন্দ্র সীতাপতি !"

রমেন এ কয় বৎসর জমীদারী সেরেস্তায় কাজ করিয়া বিলক্ষণ বিষয়বুদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিল। সে বলিল, প্রভু যদি দয়া করেন তবে মাইজী ভাণ্ডারার বিরাট ব্যবস্থা করিবেন, সাধু বাবার পদসেবার জন্য বিলক্ষণ প্রণামী দিতে প্রস্তুত আছেন।

সন্ন্যাসী পুলকিত হইয়া অনেকগুলি দন্ত প্রকাশিত করিয়া বলিলেন—"হা, হা, মায়া—সব মায়া হ্যায়, সব ঝুট। আচ্ছা, ভক্তকো এয়সা মনোবাঞ্ছা হোয় উসকো তুষ্ট্ করনা অবশ্য চাহিয়ে। বোলো বেটা তোতারাম, তু য়হাঁ রহে যাও—যব তক ন মাইকো অনুজ্ঞা হো। পর পিছে তো তুম্‌হারা ব্রহ্মজ্ঞান হোনেহি হোগা।"

তোতারাম গুরুজীর পা জড়াইয়া ধরিল। সন্ন্যাসী, ভাণ্ডারার আয়োজনের বহরের যেরূপ আঁচ পাইয়াছিলেন তাহাতে তিনি বিশেষরূপে চেষ্টা করিলেন ; এমন কি তোতারামকে গালি গালাজ করিলেন, তাহাকে ত্যাগ করিবেন এমন পর্য্যন্ত শাসাইলেন। কিন্তু তোতারাম ছাড়িল না, এবং শেষে সে ইহা বলিল যে গুরু যদি নিতান্তই তাকে বিনাদোষে ত্যাগ করেন তবে সে অগত্যা পলায়ন করিয়া অন্য গুরুর সন্ধান করিবে। কিন্তু গৃহে সে থাকিবে না।

তখন সন্ন্যাসী রমেন বাবুজীকে সমঝাইলেন যে এমন পীড়াপীড়ি করিয়া বিশেষ ফল হইবে না। সন্ন্যাসী তোতারামকে বুঝাইয়া পড়াইয়া যথাসময়ে নিশ্চয় ফিরিয়া পাঠাইবেন। 'লেকিন' ভাণ্ডারা ও প্রণামী বিষয়ে ব্যবস্থা যেন হয়।

এসব কথাবার্ত্তা শুনিয়া মিনতির আর সন্দেহ রহিল না যে এই দিলীপ। সন্ন্যাসী তো তার প্রকৃত পরিচয় অবশ্যই জানেন। যদি এ দিলীপ না হইবে তবে তিনি তাকে এখানে থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন কেন ?

ভাণ্ডারার আয়োজন যথাবিধি হইল। প্রণামীতেও ক্রটি হইল না। পরের দিন সন্ন্যাসী যখন তল্পীতল্পা বাঁধিলেন, তখন মিনতিও জিনিষপত্র গুছাইল। রমেন ও কয়েকজন দাস দাসীকে লইয়া সে এই সন্ন্যাসী দলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া দিলীপকে ফিরাইয়া আনিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। মালতী চুঁচুড়ার বাড়ীতে রহিল। যদি মিনতির অনুমান মিথ্যা হয় ও তোতারাম দিলীপ না হয় এবং দিলীপ চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসে তবে সে যাহাতে পলাইয়া না যায় সেজন্য মালতী এখানে রহিল।

হুগলী হইতে সন্ন্যাসী কলিকাতায় গেলেন। সেখানে জগন্নাথ ঘাটে তাঁর আস্তানা হইল। এখানে রমেন দেখা দিল এবং তার নিযুক্ত চর নিরন্তর তোতারামের পিছু পিছু ঘুরিতে লাগিল। মিনতি আসিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া গেল। তোতারাম তাহাকে দেখিয়া পলাইয়া গেল।

সন্ন্যাসী তার পর গঙ্গাসাগর গেলেন। রমেনের চর সঙ্গে গেল। মিনতি রমেনকে লইয়া ষ্টীমারে গঙ্গাসাগরে গিয়া উপস্থিত হইল। বিনোদ ও তার দাদারা তাকে নিবৃত্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিল। সে তাঁহাদের কাছে কিছু ভাঙ্গিল না, শুধু বলিল সে তীর্থ করিতে যাইতেছে। সকল বাধা অস্বীকার করিয়া সে গঙ্গাসাগর গিয়া হাজির হইল।

তোতারাম সেখানে নিশ্চিন্তমনে স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে স্নান করিতেছিল, হঠাৎ দেখিল সেই ঘাটে মিনতি স্নান করিতে নামিয়াছে। তোতারাম স্তোত্র ভুলিয়া গেল। মিনতিকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পলাইল। মিনতি একান্তভাবে দিলীপের সঙ্গে মিলন কামনা করিয়া সেখানে ডুব দিয়া উঠিল।

তার পর ফিরিয়া সন্ন্যাসীরা নানাস্থান ঘুরিয়া তারকেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেখানেও তোতারাম মিনতিকে দেখিতে পাইল। সর্ব্বত্র মিনতিকে এমনিভাবে দেখিয়া দেখিয়া সে নিশ্চয় বুঝিল মিনতি তার অনুসরণ করিতেছে। সে রমেনকে একদিন ধরিয়া বলিল, "আপনারা কেন মিথ্যে আমার পিছনে এমনি ঘুরছেন, আমি আপনাদের দিলীপ নই।"

রমেন বলিল, "আমাকে সে কথা বলা মিথ্যে ভাই। মামীমা বড় দুঃখ পেয়ে একেবারে ক্ষেপার মত হ'য়ে গেছেন। ওঁর এ খেয়ালে কেউ বাধা দিতে পারবে না। তা ছাড়া আমার সন্দেহ হয় যে যদি শেষ পর্য্যন্ত তুমি দিলীপ নও এই সাব্যস্ত হয় তবে হয় তো উনি বাঁচবেনই না।"

তোতারাম গম্ভীর হইয়া গেল। অনেকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিল, তার পর চলিয়া গেল।

সেই দিন গুরুজী তাকে বলিলেন, "তুঝ্‌কো ঘর যানা ভালা হৈ বৈটা। মায়া তুম্‌হারে পিছে লটক্‌ যা রহা হৈ। উসকো ঘরসে পরাস্ত করকে তব আনা চাহিয়ে।"

তোতারাম শুধু কহিল, "গুরুজী এয়সা আদেশ মৎ কিজিয়ে। ছ বরস্‌ মৈ মহাত্মাজকে সাথ ঘুমতা হুঁ। মুঝকে অব ন ঘুমায় দিজিয়ে।"

"ছ বৎসর!" কথাটা রমেনের কাছে তার চর রিপোর্ট করিল, মিনতি সে কথা শুনিল। তার আর কোনও সন্দেহ রহিল না।

তার পর ক্রমে সন্ন্যাসীদের পিছু ধরিয়া মিনতি মুঙ্গের পর্য্যন্ত গিয়া হাজির হইল।

মুঙ্গেরে আসিয়া মিনতির শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। এতদিন সে শরীরকে একদম অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছে—মনটা সর্ব্বদাই একটা দারুণ উদ্বেগ ও উত্তেজনায় অস্থির হইয়া থাকিত। তোতারামের সন্ধান পাওয়া অবধি সে আরও উদ্বেগ ও উত্তেজনায় দিন কাটাইয়াছে। আর এ কয়দিন শরীরটাকে একবারে তছ-নছ করিয়া লইয়া বেড়াইয়াছে। সুকুমার দেহ তার এ উদ্বেগ সহ্য করিতে পারিল না, সে অসুস্থ হইয়া পড়িল।

রমেন ভয় পাইয়া বিনোদের কাছে টেলিগ্রাম করিয়া দিল। বিনোদ, সুমতি ও বড় বউ চলিয়া আসিলেন। ব্যারাম এমন কিছু গুরুতর নয়, কিন্তু শারীরিক ক্লান্তিতে সে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, স্নায়ু অত্যন্ত দুর্ব্বল।

বিনোদ আসিয়া জোর করিয়া ধরিল মিনতির ফিরিতে হইবে। মিনতি চক্ষের জলের প্রাকার রচনা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে ইহা লইয়া দারুণ ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিতে লাগিল।

রমেনের সঙ্গে তোতারামের রোজ দেখা হয়। রমেনের কাছে তোতারাম মিনতির খবর শুনিত। রোজ দুই বেলা সে আগ্রহ করিয়া মিনতির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিত।

অসুখের তৃতীয় দিনে বাবুঘাটে বসিয়া তোতারাম রমেনকে বলিল, "দেখুন মাকে বুঝিয়ে বলুন—এ আলেয়ার পিছু পিছু ছুটে অনর্থক শরীর নষ্ট ক'রে তিনি আমাকে অপরাধী ক'রছেন। আমি দিলীপ নই।"

রমেন বলিল, "বিনোদ বাবু আর ওঁর দিদি বৌদি দিনরাত জপাচ্ছেন সে কথা, কিন্তু মামীমা তো সে কথা কাণেও তুলছেন না। কেবল দিনরাত কাঁদছেন। ফেরান ওঁকে অসম্ভব।"

তোতারাম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গম্ভীরভাবে পাইচারী করিতে লাগিল। শেষে বলিল, "আচ্ছা আমি যদি প্রমাণ দি যে আমি দিলীপ নই।"

রমেন সন্দিগ্ধ-ভাবে তার দিকে চাহিল। শেষে বলিল, "তাই যদি ঠিক হয় ভাই, তবে—তবে সে কথা এখন নাই বল্লে। এ কথা নিশ্চয় জানলে ওঁর এ অবস্থায় প্রাণ দু দিনও থাকবে না।"

আবার মুখখানা অন্ধকার করিয়া তোতারাম পাইচারী করিতে লাগিল। সে গম্ভীর ভাবে সম্মুখে বিপুল-বিস্তার গঙ্গার দিকে চাহিয়া রহিল। সুদূর পশ্চিমে গঙ্গার জল-রাশি, অর্দ্ধ নিমজ্জিত পর্ব্বতের অন্তরালে দিগন্ত স্পর্শ করিয়া রক্তায়মান সূর্য্যকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বক্ষ বিস্তীর্ণ করিয়া পড়িয়াছিল। দক্ষিণে নীল মেঘমালা গঙ্গার প্রান্তদেশে এক বিরাট প্রাকার রচনা করিয়া পড়িয়াছিল। তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া তোতারাম নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে সে বলিল, "চলুন আমি একবার মাকে দর্শন ক রে আসি।"

বাবুঘাটের কাছেই একখানা ছোট বাঙ্গলা মিনতি ভাড়া লইয়াছিল। অদূরে গঙ্গার কলকল নাদ শোনা যাইতেছিল, ঝিরঝির করিয়া গঙ্গা শীতল স্নিগ্ধ বায়ু বহিয়া আসিতেছিল। বারান্দায় একখানা ইজিচেয়ারে শুইয়া মিনতি একটু বেদানার রস খাইতেছিল। সুমতি ও বড় বউ পাশে বসিয়া তাহাকে বুঝাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল।

এমন সময় রমেন তোতারামকে লইয়া আসিল। এই সুদর্শন তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সুমতি ও বড় বউ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

মিনতির মুখ সহসা আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"এসেছ বাবা, মনে প'ড়েছে মাকে? বস!" বলিয়া মিনতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল।

তোতারাম বলিল, "আপনি উঠবেন না মা, ব্যস্ত হ'বেন না, আপনি শুয়ে' থাকুন।" বলিয়া তোতারাম একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

তারপর তোতারাম বলিল, "শরীর এখন কেমন বোধ ক'রছেন মা?"

"এখন ভালই আছি।"

সুমতি বলিল, "ভাল আছে না ছাই। ভেবে ভেবে দিন দিন তিল তিল ক'রে শরীরটা খেয়ে ফেলছে পোড়ারমুখী।"

তোতারামের চোখের কোণ জলে ভরিয়া উঠিল, সে বলিল, "মা, কেন আপনি বৃথা কষ্ট পাচ্ছেন, আপনি ঘরে ফিরে চলুন।"

মিনতি বলিল, "তুমি বল্লেই যেতে পারি বাবা। আমার ছেলে আমায় ঘরে না নিয়ে গেলে আমি তো ফিরতে পারবো না।"

তোতারাম বলিল, "মিথ্যে মায়ায় কেন নিজেকে এত কষ্ট দিচ্ছেন মা?"

"কি এমন কষ্ট আমার বাবা! আমি তো দিব্যি আরামে আছি। তোমার এ কষ্ট যে আমি দেখতে পারি না। তোমার কষ্ট দেখে আমার যে আর ঘরে থাকতে মন চায় না।" মিনতি কাঁদিয়া ফেলিল।

তোতারামও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। সে কিছুক্ষণ নীরবে গৈরিক বাসের অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিল। অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিল না।

শেষে তোতারাম বলিল, "আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক মা, চলুন, দেশে চলুন।"

মিনতি আনন্দের উত্তেজনায় উঠিয়া বসিল, "সত্যি বাবা? যাবে তুমি?"

"হাঁ মা, আপনার এত স্নেহের অপমান আমি ক'রতে পারি না। যদি অপরাধ করি, তবে ভগবান আমায় ক্ষমা ক'রবেন। কিন্তু মা আমার একটা ভিক্ষা আছে।"

"কি বাবা, কি চাই তোমার? তোমাকে না দেবার আমার কিছুই যে নাই।"

"আমি ঘরে ফিরে যাচ্ছি সুধু আপনার স্নেহ আমাকে টেনে নিচ্ছে ব'লে, কিন্তু আমি ব্রত ত্যাগ ক'রতে পারবো না। ঘরে গিয়েও আমি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রবো।"

"এমনি করে? এ আমি প্রাণে ধ'রে তোমায় দিতে পারবো না। তুমিই যদি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ক'রলে তবে আমার ধনদৌলতে কি কাজ?"

সুমতি বলিল, "আচ্ছা সে আর একটা কঠিন কি? ব্রহ্মচর্য্য পালন মানে বিয়ে থা ক'রবে না, তা যতদিন ওর ইচ্ছা তা নাই বিয়ে ক'রলো। ঘরে যদি থাকে, শরীরকে যদি কষ্ট না দেয় তবে তাতে এমনই কি ক্ষতি?"

মিনতি অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা তাতে আমি রাজী আছি, কিন্তু বাবা, শরীরকে না-হ'ক কষ্ট দিতে পাবে না।"

সেই বন্দোবস্ত ঠিক হইল। তোতারাম কষ্টহারিণী ঘাটে সন্ন্যাসীর আখড়ায় গিয়া গুরুজীকে প্রণাম করিয়া আসিল। প্রস্তরে অঙ্কিত গঙ্গাকে প্রণাম করিল। রামচন্দ্রের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া সে সাশ্রুনয়নে বিদায় হইল।

দুই দিন পর মিনতি একটু সুস্থির হইলে তাহারা ফিরিয়া আসিল। কলিকাতায় কয়েকদিন থাকিয়া মিনতি তোতারামকে লইয়া চুঁচুড়ায় চলিয়া আসিল।

(১৪)

আরও দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

মিনতির দিন বড় আনন্দে কাটিতে লাগিল। তোতারামের খাওয়া-দাওয়া, তার সুখস্বচ্ছন্দতা বিধানে সে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া রাখে আর অবসর সময়ে তোতারামের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করে।

তোতারাম প্রত্যূষে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করে, স্নানান্তে অনেকক্ষণ তার মধুরকণ্ঠে স্তোত্রপাঠ করে। তারপর সে মায়ের কাছে আসিয়া বসে। মিনতি সংসারের কাজ করে আর তোতারামের সঙ্গে কথা কয়। তোতারাম সঙ্গে সঙ্গে তার ভারী ভারী কাজ করিয়া দেয়,

ঝি চাকরদের আমল দেয় না। তোতারাম তার কৃচ্ছ্রসাধন অনেক ছাড়িয়াছে, কিন্তু সে গৈরিক পরে।

দিলীপের যে ঘর ছিল সেই ঘরে তোতারাম থাকে। আহারান্তে সে সেই ঘরে বিশ্রাম করিতে যায়। মিনতি সেখানে গিয়া বসে। তোতারাম সুর করিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করে। ভাবে বিহ্বল হইয়া সে পাঠ করে ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া মিনতিকে শোনায়। মিনতি মুগ্ধ হইয়া শুনিয়া যায়। মিনতি ইংরাজী বাঙ্গলা ও সংস্কৃত কাব্য অনেক পড়িয়াছে, কিন্তু হিন্দী সে মোটে জানিত না। তুলসীদাসের সুললিত দোঁহা ও চৌপাই, এবং তার ভিতরকার অর্থ ও রসের প্রাচুর্য্য তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দিল। শুনিতে শুনিতে তার ইংরাজী বাঙ্গলা ও সংস্কৃত কাব্যের অনেক পদ তার মনে হইত, সে মাঝে মাঝে তাহা আবৃত্তি করিয়া তার সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া তুলসীদাসের পদের রসব্যাখ্যান করিত, তোতারাম অবাক হইয়া শুনিত—এমন রসবহুল ব্যাখ্যান সে তার গুরুমুখে কোনও দিন শুনিতে পায় নাই।

সন্ধ্যাবেলায় তোতারাম ভজন গায়, মাঝে মাঝে বাঙ্গলা কীর্ত্তন গায়। মিনতি এসরাজ লইয়া তার সঙ্গে সঙ্গত করে, আবার কখনও কখনও ভাবে বিহ্বল হইয়া আপনি সে গানে যোগ দেয়।

তোতারাম সুকণ্ঠ, সুগায়ক। মিনতি চলনসই রকম গান বাজনা শিখিয়াছিল, আর তার গলা ছিল অতি সুমধুর, তাই দুইজনে যখন কণ্ঠ মিলাইয়া ভজন বা কীর্ত্তন গাহিত তখন বাড়ীর সব লোক দরজার আশে পাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াইত।

মিনতি হিন্দী শিখিতে লাগিল। তোতারামের কাছে সে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িত, দাদু, সুরদাস, রবিদাস প্রভৃতির ভজনের মানে করিত। আর সে ইংরাজী ও সংস্কৃত কবিতা তোতারামকে শিখাইত। তোতারাম ইংরাজী ও সংস্কৃত জানে কিন্তু খুব বেশী নয়। তবে সে ভারী মেধাবী, মিনতির কাছে অল্পদিনেই বেশ শিখিয়া উঠিল।

ভজন গাহিতে গাহিতে, তুলসীদাসের রামায়ণ ব্যাখ্যান শুনিতে শুনিতে অল্পদিনের মধ্যেই মিনতির চিত্তে একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসের আভাস জাগিয়া উঠিল। ভক্তির জীবনে, ভগবানের কাছে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণে যে একটা আনন্দ ও সৌন্দর্য্য আছে তার রসবহুল চিত্তে তার প্রথম আভাস আসিল দাদুর ভাবাস্পদ পদাবলী গাহিতে গাহিতে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনের এতদিনকার না-খোলা সব মণিকোঠায় যেন হাজার বাতির রোশনাই জ্বলিয়া উঠিল। তোতারামের ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা, এবং ধর্ম্ম জীবনের গভীরতা তাহাকে মুগ্ধ করিল। ছেলেমানুষ তোতারাম, কিন্তু তার অন্তরের গভীরতা ছিল খুব বেশী। ইহা মিনতির অন্তরকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়া যেন একটা ঘুমঘোর হইতে জাগাইয়া দিল।

সে প্রথমে শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল, তোতারামদের সম্প্রদায় বৈষ্ণব। বাঙ্গলা

দেশের বৈরাগী ছাড়া যে বৈষ্ণব আছে তাহা সে জানিত না, আর বৈষ্ণবেরা যে জটাজূট ধারণ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম করে তাও সে জানিত না। তোতারামের কাছে সে বৈষ্ণবের নানা সম্প্রদায়ের তথ্য শুনিল। সে বলিল তার গুরু রামানন্দের সম্প্রদায়ভুক্ত। সে শুনিয়া আরও অবাক্ হইল যে ইহারা বৈদান্তিক। বেদান্ত দর্শনের শাঙ্কর মত বিষয়ক দুএকখানা গ্রন্থ সে পড়িয়াছিল। দর্শন হিসাবে তার মতামত সে অনেক আলোচনা করিয়াছে। মায়াবাদ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা তার ছিল। কিন্তু তার ভিতর সে রস পায় নাই। সে মায়াবাদ সম্বন্ধে যতটুকু জানিয়াছিল তাহাতে বৌদ্ধ শূন্যবাদের সঙ্গে তার খুব পার্থক্য বুঝিত না। সবই যদি মায়া, তবে সবই মিথ্যা, সবই ফাঁকি, সবই শূন্য। সত্য রহিল এক ব্রহ্ম। সে ব্রহ্ম সৎচিৎ ও আনন্দ স্বরূপ কিন্তু সে আনন্দ মানে সুখ ও দুঃখের অভাব, চিৎ মানে বিকৃতি শূন্য, বস্তু (object) শূন্য এক অবোধ্য জ্ঞান। ইহার সঙ্গে জড়ের বিশেষ প্রভেদ সে খুঁজিয়া পাইত না। সুষুপ্ত অবস্থায় মানুষের যে অবস্থা তাই ব্রহ্মের এই অবস্থার খুব কাছাকাছি। তার মানে ব্রহ্ম চিরদিনই ঘুমাইয়া আছেন। একথা চিন্তা করিতে তার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। এমন সুন্দর এমন মধুর রসের এমন অফুরাণ খনি জগৎখানা, এটা একটা মিথ্যা ধোঁয়া—আর সত্য যা' তা মৃতবৎ—একথা ধ্যান করিতে তার শ্বাসরোধ হইত।

কিন্তু বৈষ্ণব বেদান্তের যে তত্ত্ব সে তোতারামের মুখে শুনিল তাহাতে সে মুগ্ধ হইল। তোতারামের বেদান্তশাস্ত্র বেশী পড়া-শুনা ছিল না। সে যাহা গুরুমুখে শুনিয়াছে তাহা মিনতিকে শুনাইত। মিনতি সেই সব ছাড়া-ছাড়া কথা জোড়া দিয়া বৈষ্ণব বেদান্তের যে তত্ত্ব নিজের মনের ভিতর গড়িয়া তুলিল তাহা তার চিত্তকে মুগ্ধ করিল। তার একটা বিশেষ কারণ এই যে, তার ভিতর, রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতির মতের খুব সারতত্ত্ব সবই ছিল, তা ছাড়া দাদু, রবিদাস, মীরাবাই প্রভৃতি সাধকদের মতবাদের রসের ধারাও যথেষ্ট ছিল—কিন্তু তার অনেকটাই ছিল মিনতির সাক্ষাৎ জ্ঞানের ফল। অন্যের দৃষ্ট জ্ঞানের টুকরা টুকরা উপাদান লইয়া এ তত্ত্বটা গড়িয়া তুলিয়াছিল সে নিজে।

ব্রহ্মই সত্য, কিন্তু জগৎ মিথ্যা নয়—জগৎও ব্রহ্মময়—ইহা ব্রহ্মের প্রকাশ তাঁর লীলা। জীব লইয়া ব্রহ্মের এ খেলা। জীবকে ব্রহ্ম টানিতেছেন প্রেম দিয়া, জীব ব্রহ্মকে লাভ করিতেছে প্রেম দিয়া। এই প্রেমই এ লীলার—এ জগতের একমাত্র সার বস্তু।

এই তত্ত্বের আলোকে মিনতির চক্ষে সমস্ত জগৎটা একটা অপূর্ব্ব প্রেমলীলায় মিলাইয়া গেল। তার মনে পড়িল Coleridgeএর কবিতা—

> All thoughts, all passions, all delights,
> Whatever stirs this mortal frame,
> All are but ministers of love
> And feed his sacred flame."

আর শেলীর অমর কবিতায় এই সত্যের একটা বৃহত্তর প্রকাশ—

All fountains mingle with the river,
And rivers with the Ocean.
The winds of heaven mix for ever
With a sweet emotion ;
Nothing in the world is single,
All things by a law divine
In one another's being mingle—
Why not I with thine ?
See the mountains kiss high heaven
And the waves clasp one another ;
No sister flower would be forgiven
If it disdained its brother :
And the sunlight clasps the earth,
And the moonbeams kiss the sea—

এ সত্য শেলী দেখিয়াছিলেন, কিন্তু মিনতির মনে হইল তিনি দেখিয়াছিলেন তাঁর সঙ্কীর্ণ প্রেমের অপ্রসর দৃষ্টিপথে। আজ মিনতি বিশ্বে যে এক বিরাট প্রেমের লীলা দেখিতে পাইল তাহাতে এই কবিতা একটা প্রকাণ্ড রসবহুল অর্থে ভরিয়া গেল।

মিনতি এই তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়া তাহা তোতারামের কাছে শুনাইল। তোতারাম অবাক হইয়া শুনিল, বৈষ্ণব বেদান্তের এমন প্রাণপূর্ণ ব্যাখ্যা সে কোনও দিন শোনে নাই।

মুগ্ধচিত্তে সে মিনতির পায়ের উপর অনেকক্ষণ তার মাথাটা ঠেকাইয়া রাখিল, তারপর সে উঠিয়া বলিল,—

"মা আপনি এত জ্ঞান কোথা থেকে পেলেন ?"

"কেন বাবা ? এ সব তো তোমারই কাছে শিখেছি।"

"কি ভ্রান্তি! আমি কি এত কোনও দিন জানি যে আপনাকে শিখাব মা ? আপনি ক্ষণজন্মা, আপনার প্রতি রামচন্দ্রের অপার দয়া, তিনি আপনাকে এ জ্ঞান দিয়েছেন মা।"

মিনতি একটু স্থির হইয়া ভাবিল, তারপর বলিল, "বাবা দিলীপ, তুমি তো অনেক দেশ ঘুরেছ, অনেক সাধু সন্ন্যাসীকে দেখেছ। ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ ক'রেছেন এমন কাউকে দেখেছ কি ?"

মিনতি তোতারামকে দিলীপ ছাড়া আর কিছুই বলিত না, তোতারাম তাহাতে এখন আর আপত্তি করিত না। সে বলিল, "হাঁ মা, আমার গুরুর গুরুজী আছেন—তীর্থানন্দ স্বামী মহারাজ"—বলিয়া সে মাথায় হাত ঠেকাইল—"প্রয়াগে কুম্ভমেলার সময় তাঁকে দেখেছি।

তিনি প্রায় সব সময়ই সমাধিস্থ হ'য়ে থাকেন। তখন তাঁর মুখ এমন আনন্দে হাসতে থাকে যে দেখলে সন্দেহ থাকে না যে তিনি ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ ক'রেছেন। গুরুজীর কাছে শুনেছি তিনি ব্রহ্মসিদ্ধি লাভ ক'রেছেন।"

"কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাওয়া যায় বাবা ?"

"তিনি এ সময় বৃন্দাবনে থাকেন। দোলপূর্ণিমার পর তিনি সেখান থেকে বের হন।"

মিনতি ভাবিয়া চিন্তিয়া বৃন্দাবন যাওয়া স্থির করিল।

তোতারাম আসিবার পর রমেন একদিন মিনতিকে বলিয়াছিল যে এইবার শিশিরকে খবর দিলে হয়তো তিনি দেশে আসিতে পারেন। মিনতি অনেক ভাবনা চিন্তার পর বলিয়াছিল, এখন খবর দিয়া কাজ নাই। তোতারাম কখনই নিজেকে দিলীপ বলিয়া স্বীকার করে নাই। যদিও মিনতির মনে কোনও সন্দেহই ছিল না যে তোতারামই দিলীপ, তবু সে ভাবিল যে যদি সে দিলীপ নাই হয়, তাহা হইলে শিশির অনেক আশা করিয়া আসিয়া হয়তো দারুণ নিরাশার কষ্ট পাইবেন। তা ছাড়া হয়তো তিনি মনে করিবেন, মিনতি নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁকে দেশে আনাইবার জন্য এই মিথ্যা ষড়যন্ত্র করিয়াছে। এ মিথ্যা অপবাদ মিনতি সহিতে পারিবে না। তাই সে স্থির করিয়াছিল যে, যে পর্য্যন্ত তোতারাম আপনাকে দিলীপ বলিয়া স্বীকার না করে কিম্বা অন্য কোনও উপায়ে তার দিলীপত্ব নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত না হয় সে পর্য্যন্ত সে স্বামীকে সংবাদ দিবে না।

রমেনের কাছে এ প্রস্তাব ভাল বোধ হয় নাই, কিন্তু সে কোনও আপত্তি করিতে সাহস করে নাই।

তার পর এ দুই বৎসর এ পরামর্শ সে মিনতিকে অনেকে দিয়াছে। সেদিনও সুমতি আসিয়া তাকে বলিয়াছিল, "মিনু এইবার শিশির বাবুকে একটা খবর দে, সে দেশে এসে দেখুক।"

"না দিদি, ও যে এখনও স্বীকার করে না।"

"তা' যদি না করে তবে তো খুব সন্দেহেরই বিষয়—ও দিলীপ না হওয়াই তবে সম্ভব। শিশির বাবু এলেই কথাটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।"

"তিনি যে ঠিক চিনতে পারবেনই তার ঠিকানা কি ? মালতী রমেন এরা তো কেউ ঠিক নিশ্চয় ক'রে কিছুই বুঝতে পারছেনা। তারা বরঞ্চ বলে ও দিলীপই।"

"মালতী রমেন এক কথা, আর ওর বাপ এক কথা। তিনি এলেই সব পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।"

"কিন্তু যদি তিনি এসে বলেন যে ও দিলীপ নয় !"

"তবে সেটা নিশ্চয় জানাই ভাল। ও যদি সে না হয় তবে ওকে বিদায় করে আপদ

চুকিয়ে ফেলতে হ'বে। মিছেমিছি একটা পরের ছেলেকে রাজার হালে পুষবার কি দরকার।"

কথাটায় মালতীর মুখ কালো হইয়া গেল। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "রাজার হালের তো এক শেষ। কম্বল বই অন্য বিছানায় শোয় না। আর খায় যা' তা দেখলে আমার চক্ষে জল আসে।" তার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল।

"তবু যে হালে আছ, ও যদি একটা ভিখারী ফকির হয় তবে তাই ওর কাছে রাজার হাল। তা ছাড়া একটা মিথ্যা পুষে তো কোনও লাভ নেই। সত্য যত শক্ত হ'ক সেটা জানাই ভাল।"

মিনতির অশ্রুরোধ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। সে বলিল, "কিন্তু এও তো হ'তে পারে যে তিনি এসে ঠিক ক'রলেন ও দিলীপ নয়, ওকে সবাই মিলে বের ক'রে দিলে, ও মনের আনন্দে চ'লে গেল। কেন না ওর সংসারে মোটেই মন নেই। ও কেবল ঘরে আছে আমার মুখ চেয়ে। তার পর যদি জানা যায় যে তিনি ভুল ক'রেছেন, ওই সত্যি দিলীপ, তবে তো আর দুঃখ রাখবার ঠাঁই থাকবে না বড় দি।"

"তুই যত সব অনাছিষ্টি ভাবতে পারিস। ও যদি দিলীপ হয় তবে বাপে ছেলেয় দেখা হ'লেই সব পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। যদি না হয় তবেও টের পাওয়া যাবে।"

মিনতি আর এ কথা চালাইতে পারিল না। সে বুঝিল সুমতি তার মন বুঝিবে না।

সুমতি কলিকাতায় ফিরিয়া বিনোদকে বলিল, "আমার বাপু এসব ভাল বোধ হ'চ্ছে না। তুমি শিশির বাবুকে লিখে দাও সে এসে দেখে যাক। ও দিলীপ কি না সন্দেহ।"

বিনোদ সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিয়া বলিলেন, "না থাক ও ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। শেষে যদি ও দিলীপ নয় এইটাই ঠিক হয়, তবে হয় তো মিনতি একেবারে ভেঙ্গে পড়বে।"

"তা বোধহয় হ'বে, মিনুর রকম সকম আমার ভাল বোধ হ'ল না। ওর চ'লে যাবার কথা উঠলেই সে যেন কাঁদ কাঁদ হ'য়ে ওঠে। এ সব ভাল হ'চ্ছে না।"

চমকিত হইয়া বিনোদ বলিল, "তুমি ক্ষেপেছ, কি বকছো?"

"না, বলছি না কিছু। মায়ের পেটের বোন আমার মিনু, তা ছাড়া প্রায় মেয়ের বয়সী। আমার পোড়া মুখ দিয়ে তার নামে কোনও মন্দ কথা বেরোবে না। কিন্তু তবু হাজার হ'লেও তার এখন ভরা যৌবন, তার একটা বিশ বাইশ বছরের ছোকরাকে নিয়ে এতটা মাখামাখি করা ভাল নয়। লোকে নিন্দে ক'রবে।"

"নিন্দে করবার মত কিছু দেখছ তুমি?"

"বালাই, তা' হ'তে যাবে কেন। আমি তাদের খুব লক্ষ্য ক'রেছি, তেমন কিছু নয়। তবু আগুনের পাশে মোম, হ'তে কতক্ষণ।"

বিনোদ গম্ভীর হইয়া বলিল, "তুমি মিনতিকে চেন না তাই ব'লছো।"

তবু ব্যাপারটা লইয়া আত্মীয়-স্বজন সবাই বেশ একটু অশান্তি বোধ করিতে লাগিল। শিশিরের সঙ্গে দেখ-শুনা হইয়া সব ভালয় ভালয় মিটিয়ে যায় ইহা সকলেই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

তাই যখন মিনতি বৃন্দাবন যাওয়া স্থির করিল তখন সকলেই খুসী হইল। রমেন প্রস্তাব করিল বৃন্দাবন যাইবার পথে যে কয়টা তীর্থ আছে সব সারিয়া যাওয়া যাইবে। মিনতি বলিল, যাইবার পথে নয়, ফিরিবার পথে প্রয়াগ হরিদ্বার কাশী হইয়া ফিরিবে। রমেন সন্তুষ্ট হইল। কেননা শিশির তখন প্রয়াগে। সেখানে গেলে শিশিরের সঙ্গে দেখাশুনা হইয়া সব পরিষ্কার হওয়াই সম্ভব।

শুভদিন দেখিয়া সকলে বৃন্দাবন যাত্রা করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

নিবেদন

কবিযশ চাহি না মা, তোমার দুয়ারে
আসিয়াছি মুগ্ধপ্রাণে পূজিতে তোমারে।
বিগত শৈশবে কবে অরুণের সনে
ছন্দোময়ী উদেছিলে মোর বাতায়নে!
এসেছিলে চিত্তে মোর পুলক সঞ্চারি'
নিখিল কবির কাব্যে ঝঙ্কারি' ঝঙ্কারি'
মানসে জাগালে মম অপরূপ জ্যোতি!
দিবাকর জিনি'—তব গরিমা ভারতী
আমারে নিয়েছে ডেকে,—কৃতাঞ্জলিপাণি
তুচ্ছ অর্ঘ্য লয়ে আমি ওগো বঙ্গবাণী
এসেছি তোমার রাঙা চরণ-সমীপে!
কোটি বরপুত্র যেথা গন্ধে বর্ণে দীপে
তোমার আঙিনাখানি রেখেছে উজ্জ্বল,
আমি সেথা আনিয়াছি এক ফোঁটা জল;—
নিঃস্ব ব্যর্থ হৃদয়ের ব্যথা-উপহার
নেবে কি মা? মোর তরে খুলিবে কি দ্বার!

শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত

প্যারীচাঁদ মিত্রের বঙ্গভাষা

(২*)

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—বাবু প্যারীচাঁদমিত্র যদি দুই একখানি "আলালের ঘরের দুলালের" মতন গল্পের বই লিখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন তাহা হইলেও তাঁহাকে গল্পের প্রথম লেখক বলিয়া মান্য করিতে হইত। কিন্তু গল্পলেখার চেয়ে তিনি ঢের বেশী কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন বাঙ্গালায় সব জিনিষই লেখা যায়, সব ভাবই প্রকাশ করা যায়। বাঙ্গালায় দর্শন বিজ্ঞানেরও বই লেখা যায়। তিনি চায ও বাগান করা সম্বন্ধে বাঙ্গালায় অনেক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এগ্রিকালচার সোসাইটির মেম্বর ছিলেন। এই উপলক্ষে চায ও বাগানের বিষয়ে তিনি অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি চলিত ভাষায় লেখা, সহজ করিয়া লেখা, তাহা পড়িলে এখনও লোকের উপকার হইতে পারে।

পূর্ব্বকালে এদেশে শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতিকল্পে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে Calcutta Mechanics Institute ও ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে Calcutta Lyceum নামক দুইটি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথমোক্ত সভার সম্বন্ধে প্যারীচাঁদ তাঁহার Life of Cobsworthy Grant নামক পুস্তকে আংশিক বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই উভয় অনুষ্ঠানেরই প্যারীচাঁদ Executive Committeeর সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন কিন্তু সভাদ্বয় অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে Soceity for the Promotion of Industrial Arts নামক সভা স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই সভার উদ্‌যোগে ঐ বৎসরের ১৪ই আগষ্ট তারিখে School of Industrial Arts নামক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এই শিল্পবিদ্যালয় প্রথম প্রথম এই সভার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। পরে অর্থকৃচ্ছ্র হওয়াতে গভর্ণমেণ্ট হইতে বার্ষিক বৃত্তি পাইত। ক্রমে এই সভা লোপ পায় ও বিদ্যালয়টি গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বে আইসে। এক্ষণে ইহা Government school of Arts নামে খ্যাত। প্যারীচাঁদ তাঁহার Education in Bengal নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে এই সভার স্থাপনার প্রথম সূচনা Hodgson Pratt সাহেবের Mountains Hotel নামক বাসস্থানে হইয়াছিল এবং প্যারীচাঁদ স্বয়ং এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এই সভার প্রথমাবধি তিনি ইহাতে সভ্যরূপে সংসৃষ্ট ছিলেন এবং সংবাদপত্র ইত্যাদিতে সভার অধিবেশন বর্ণনায় তাঁহার নাম প্রথম প্রথম দৃষ্ট হইত, কিন্তু কোন্ সময় হইতে তিনি ইহার সম্বন্ধ ত্যাগ করেন তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

* প্রথম প্রবন্ধ "বঙ্গবাণী"র চতুর্থ বর্ষের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষীয় কৃষি সভা (Agricultural and Horticultural Society)র সহিত তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্টতা ছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে এই সভার অধিবেশনে তাঁহার নাম সভ্যরূপে প্রস্তাবিত হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী ১৫ই জুলাই তারিখের অধিবেশনে তিনি সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পরন্তু ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ২৩শে মার্চ্চ তারিখে তিনি অবৈতনিক সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোনও এদেশবাসী সভার অবৈতনিক সভ্য নির্ব্বাচিত হন নাই। মধ্যে মধ্যে তিনি ইহার সহকারী সভাপতি (Vice President) পদে নির্ব্বাচিত হইতেন এবং একবার ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি অস্থায়িভাবে সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সভার সভাপতি ও সম্পাদক পদ বরাবরই ইংরাজ জাতির এক চেটিয়া, তবে আমরা দেখিতে পাই যে বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজ সভাপতি পদে বৃত হইয়া এই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই সভার কার্য্য-বিবরণী ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত হইত এবং ইহার প্রকাশিত Transaction ও Journal সাময়িক পুস্তিকাগুলিও ইংরাজিতে প্রকাশিত হইত। সভার প্রকাশিত Transaction পুস্তক হইতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক জে, মার্শম্যান সাহেব ১৮৩১ ও ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে "ক্ষেত্র বাগান বিবরণ" নামক দুইখানি পুস্তক অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহার ভাষা কদর্য্য ছিল ও নির্ব্বাচিত প্রবন্ধগুলিও এদেশীয় কৃষিজীবীদের ব্যবহারোপযোগী ছিল না। কয়েক বৎসর পরে প্যারীচাঁদের উদ্যমে সভা হইতে "ভারতবর্ষীয় কৃষি বিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ" (Indian Agricultural Miscellany) নামক পুস্তক ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কার্য্য একটি কমিটির হস্তে ন্যস্ত ছিল, কিন্তু কমিটি বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া সম্পাদন-ভার প্যারীচাঁদের হস্তে দিয়াছিল। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৫৩, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড ১৮৫৪, পঞ্চম ১৮৫৫ ও ষষ্ঠ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ছয়খণ্ডে, সভার প্রকাশিত ইংরাজি ট্রানজাকসন ও জর্ন্যাল হইতে অনুদিত প্রবন্ধ ব্যতীত প্যারীচাঁদের লিখিত মৌলিক প্রবন্ধও ছিল এবং শেষখণ্ড প্রকাশিত হইলে সভার ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের কার্য্য-বিবরণী পাঠে আমরা অবগত হই যে সভা এই কার্য্যের জন্য প্যারীচাঁদকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। পুস্তিকার দুই খণ্ড প্রকাশের পরে সভার কোনও এক অধিবেশনে রেভেরণ্ড জে, লঙ্‌ সাহেবের একখানি লিপি পাঠ করা হইয়াছিল। উহাতে তিনি সভাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে পুস্তকদ্বয় অতি অনুকূলভাবে গৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহার বিশ্বাস যে পুস্তকের লিখন-প্রণালী এদেশবাসী মধ্যবিদ্‌, অবস্থাপন্ন লোকদিগের বোধগম্য হইবার বিশেষ উপযোগী।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে লঙ্‌, সরকার গভর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে বঙ্গভাষায় মুদ্রিত পুস্তক ও গ্রন্থকার (বা অনুবাদক)দের নামে একটি নির্ঘণ্ট পুস্তক* প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

---

* পুস্তকখানির সম্পূর্ণ নাম :—The Return of the Names and Writings of 515 persons

প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম গ্রন্থকাররূপে উল্লেখ করিয়া তিনি দুইখানি পুস্তকের নাম লিখিয়াছিলেন।

(১) Agri-Horticultural Miscellany

(২) Lives of Vikramaditya, Plato and Judhistir

[রেভেরণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে বিদ্যাকল্পদ্রুম (Encyclopædia Bengalensis) নামে দ্বিভাষী পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাতে সাহিত্য ইতিহাস জীবনী বিজ্ঞান গণিত শাস্ত্র প্রভৃতি প্রকাশিত হইত। স্বয়ং কৃষ্ণমোহন ব্যতীত তাঁহাকে অনেকে এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। পঞ্চম ভাগ "জীবনী" প্রকরণে প্যারীচাঁদের তিনটী প্রবন্ধ—বিক্রমাদিত্য, যুধিষ্ঠির, প্লেটো প্রকাশ হইয়াছিল।

এই প্রবন্ধত্রয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক রূপে পরে প্রকাশিত হইয়াছিল।]

কিরূপ ভাষায় "ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ" প্রকাশিত হইত তাহার নিদর্শন স্বরূপ আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত "ইউরোপ ও এতদ্দেশের সচরাচর ব্যবহার্য্য কতিপয় শাক সবজি উৎপন্ন করিবার প্রণালী" প্রবন্ধ নিম্নে প্রকাশ করিলাম। বলা বাহুল্য আমরা ইহার কোনও বর্ণাশুদ্ধি বা ছেদ প্রভৃতির পরিবর্ত্তন করি নাই। এইখণ্ড প্রকাশিত হইবার এক বৎসরের ও অধিক কাল পরে "মাসিক পত্রিকা" প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইউরোপের এবং এতদ্দেশের সচরাচর ব্যবহার্য্য কতিপয় শাকসব্‌জি উৎপন্ন করিবার প্রণালী

হাতিচোক—ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলে স্বভাবতঃ সকল সময়ে জন্মিয়া থাকে। বীজ বপন অথবা ফেঁকড়ী কলম দ্বারা উৎপন্ন করা যায়। ইংরাজী অক্টোবর মাসে অথবা সেপ্টেম্বর ও মে মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে ইহার বীজ বুনা যাইতে পারে। অতিশয় হাল্‌কা মাটিতে বীজ বপন করিতে হয়। পরে চারা সকল দুই তিন ইঞ্চ উচ্চ হইলে সে স্থান হইতে তুলিয়া লইয়া নূতন পটির মধ্যে পরস্পর ছয় ২ ইঞ্চ অন্তরে এক ২ টা করিয়া রোপণ করিয়া দিতে হয়। চৌকার মধ্যে সে সকলের মূল উত্তম হইলে তথা হইতে তুলিয়া লইয়া উর্ব্বরা অথচ গভীর ভূমীতে পরস্পর দুই ফিট অন্তর করিয়া পুনর্ব্বার রোপণ করা আবশ্যক। বীজ বপন দ্বারা হাতিচোক উৎপন্ন করিবার এই যে ধারা কথিত হইল, ফেঁকড়ী কলম করিয়া উৎপন্ন করিতে হইলেও ঐ ধারা অবলম্বন করিতে হয় বিশেষ এই যে বর্ষার শেষে ফেঁকড়ী তুলিয়া পরস্পর ছয় ইঞ্চ অন্তরে রোপণ করিতে হয়। কিন্তু যদিস্যাৎ চারা বৃহৎ হইয়া উঠে তাহা হইলে যেখানে

connected with Bengali literature either as authors or translators of printed works, chiefly during the last fifty years, and a Catalogue of Bengali Newspapers and Periodicals which have issued from the years 1819—1854 submitted to Government by Rev. J. Long. 1855 (Selections from the Records of the Bengal Government. No XXII পুস্তিকা দেখুন)।

তাহা রাখিবার মানস আছে একেবারে সেই স্থানে লইয়া রোপণ করা যায়। এদেশে হাতিচোকের পাতা অধিক হইয়া ফল ছোট ২ হয় কিন্তু সমধিক পত্র না জন্মিতে পারে এবং ফল বাড়িয়া উঠে এমত করা আবশ্যক অতএব চারা সকল ১৩ কিম্বা ১৫ ইঞ্চ উচ্চ হইলে ভূমির সমান করিয়া কাটিয়া লইয়া তাহার উপর শুষ্ক পুরাতন সার দিয়া আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া যায় ও পুনর্ব্বার ভূমি হইতে কয়েক ইঞ্চ উচ্চ হইলে পুনশ্চ ঐরূপ করিয়া কাটিতে হয়। হাতিচোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারা কাটিয়া লইবার অগ্রে কতকদিন যদিস্যাৎ বান্ধিয়া রাখা যায় তাহা হইলে সে সকল শাদা হয় সেলাড করিয়া খাওয়া যাইতে পারে।

পারাগ্রাস—ব্রিটন দেশে স্বভাবতঃ সকল সময়ে জন্মে। ইহার গাছ কেবল বীজ বপন দ্বারা উৎপন্ন হয়, অক্টোবর মাসে কিম্বা যে কোন সময়ে নূতন বীজ পাওয়া যায় তখনই রোপণ করা যাইতে পারে। বীজ বুনিবার নিমিত্ত ভূমি দুই ইঞ্চ গভীর করিয়া খনন পূর্ব্বক সেই মৃত্তিকায় অধিকাংশ পচা সার মিশাইতে হয়। কিন্তু এই গাছের মূল উৎপন্ন করণার্থ ভূমিকে প্রায় সার্ব্বিংশয় উর্ব্বরা করিতে পারা যায় না। ইহার মূল উৎপন্ন হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হয় এজন্য আয়তন অধিক করিতে হয় ও সার মিশ্রিত করিয়া সকল ভূমিতে ছড়াইয়া দেওয়া যায়। অতএব পারাগ্রাসের চারা রোপণ নিমিত্ত তিন ফিট চৌড়া চৌকা এবং তাহার মধ্যে ১৮ ইঞ্চ চৌড়া আলি করিতে হইবে ও প্রত্যেক চৌকায় ২ ফুট অন্তরে চারা বসাইবে, পরে হাল্‌কা ও পচা সার তিন ইঞ্চ পুরু করিয়া তাহাতে চাপা দিবে। যদি ক্ষুদ্র চারা না পাওয়া যায় তাহা হইলে দুই কিম্বা তিনটা করিয়া বীজ এক ২ ফুট অন্তর করিয়া পুতিয়া দিবে। সকল বীজে যদি গাছ জন্মে তবে এক ২ টা রাখিবে তাহা হইলে চারা হইবেক। গ্রীষ্মকালে পারাগ্রাস উৎপন্ন করিতে হইলে দুই ২ ফিট অন্তরে জুলি কাটিয়া তন্মধ্যে ৯ ইঞ্চ অন্তর করিয়া চারা সকল রোপণ করিতে হয় এবং উত্তাপ নিমিত্ত সপ্তাহের মধ্যে দুই দুই জলসেক করিতে হয়।

বাম—ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলে স্বভাবতঃ সকল সময়ে জন্মে, চারা কাটিয়া তাহার এক ২ খণ্ড রোপণ করিলে গাছ উৎপন্ন হইতে পারে।

বসিল—এতদ্দেশে স্বভাবতঃ বৎসর বৎসর জন্মিয়া থাকে। বর্ষার শেষে বীজ বপন করিতে হয়।

বিন অর্থাৎ একপ্রকার সীম—ইজিপ্ট দেশে স্বভাবতঃ বৎসরে একবার জন্মে; কেবল বীজ বপনে উৎপন্ন হয়। বর্ষার শেষে দুই ফিট অন্তর শারি করিয়া রোপণ করিতে হইবেক, লম্বা এবং ছালযুক্ত সীম যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিট—ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলে স্বভাবতঃ জন্মে, এবং একবার উৎপন্ন হইলে দুই বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। ইহা বীজ হইতে উৎপন্ন হয় এবং বর্ষার শেষে বুনা গিয়া থাকে।

বেগুন—এদেশে স্বভাবতঃ বৎসর বৎসর জন্মে, যে কোন সময়ে হউক বীজ বপন দ্বারা ইহার চারা উৎপন্ন করিতে পারা যায়। শীতকালে যথেষ্ট ফল ফলিতে পারে এমত চারা করিবার নিমিত্ত বর্ষার আরম্ভেই চৌকা করিয়া তন্মধ্যে চারা রোপণ করিতে হয়, পরে জুলাই মাসে ক্ষেত্র মধ্যে দুই ফিট অন্তর মাটির শারি করিয়া তথাকার হাল্‌কা উর্ব্বর মৃত্তিকার উপর নাড়িয়া পুতিতে হয়।

কপিশাক—ইংলণ্ডের সমুদ্রতীরে স্বভাবতঃ জন্মে এবং একবার উৎপন্ন হইলে দুই বৎসর পর্য্যন্ত থাকে কিন্তু সে স্থানে এই শাক কেহ ভক্ষণে ব্যবহার করে না। ইদানী অনেক বাগানে এই শাকের নানা জাতি উৎপন্ন হওয়াতে এক্ষণে ইহার সম্পূর্ণ সদবস্থা হইয়াছে। এই শাক বীজ বপন অথবা চারার ফেঁক্ড় রোপণ

দ্বারা জন্মিয়া থাকে। আগষ্ট মাস হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত রোপণ করিতে হয়। বর্ষার অবসান হইলে গামলাতে বীজ বপন করিয়া চারা জন্মিলে সে সকল হালকা উর্ব্বর মৃত্তিকার চৌকাতে নাড়িয়া পুঁতিতে হয়। ঐ সকল চৌকায় আতপ নিবারণ নিমিত্ত আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া হয়। চৌকার মধ্যে চারা সকল শক্ত এবং উত্তমরূপ মূল বদ্ধ হইলে ভাল সারাল ভূমিতে দুই ২ ফিট অন্তর করিয়া তথা হইতে পুনর্ব্বার নাড়িয়া রোপণ করিতে হয়, কিন্তু নাবি চারা সকলকে জুলির মধ্যে রোপণ করিয়া তাহাতে যথেষ্ট জল দিতে হয়।

লঙ্কা—এতদ্দেশে স্বভাবতঃ বৎসরে একবার জন্মে। বীজ দ্বারা ইহা উৎপন্ন হয় বর্ষার সময়ে গামলাতে অথবা উচ্চ ভূমিতে রোপণ করিতে হয়। চারা উৎপন্ন হইয়া দুই কিম্বা তিন ইঞ্চ উচ্চ হইলে সে সকলকে তথা হইতে নাড়িয়া হাল্‌কা মৃত্তিকার চৌকার মধ্যে চারি ২ ইঞ্চ অন্তর করিয়া রোপণ করিতে হয়। পরে অক্টোবর মাসে দুই ২ ফিট অন্তর শারির মধ্যে পুনর্ব্বার রোপণ করা যায় অথবা ফুলের চৌকাতে এক এক স্থানে এক ২ টা করিয়া পুতিয়া দেওয়া যায়।

গাজর—ব্রিটন দেশে স্বভাবতঃ জন্মে এবং একবার জন্মিলে দুই বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। এই শবজি এদেশেও স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা কেবল বীজ বপনে উৎপন্ন হয়, এক্ষণে কৃষি দ্বারা অতিশয় উপাদেয় হইয়াছে। গাজরের বীজ রাখিবার প্রয়োজন না হইলে ইহার চারা নাড়িয়া পুতিতে হয় না। অক্টোবর এবং নবেম্বর মাসে পাকা বা ঝুরা অথচ হালকা গভীর মৃত্তিকায় রোপণ করিতে হয়।

ফুলকপি—কপিশাকের এক জাতি, কিন্তু ইহা উৎপন্ন করণার্থে অত্যন্ত উর্ব্বর মৃত্তিকার আবশ্যকতা হয়। সেপ্টেম্বর অবধি নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই শাক রোপণ করিতে হয়। চারা জন্মিয়া দুই ইঞ্চ উচ্চ হইয়া উঠিলে সে সকলকে তুলিয়া হাল্‌কা মৃত্তিকা উপরে পুনর্ব্বার রোপন করিতে হয়। তদন্তর বিলক্ষণ শক্ত হইলে দুই ফিট অন্তর জুলির মধ্যে পুতিয়া গোড়ায় পুরাতন সার পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হয়। যদি শুষ্ক স্থানে ফুলকপির চারা বর্ষাকালে হয় তবে ফিব্রুয়ারি কিম্বা মার্চ্চমাসে রোপণ করিবে, এই শাক খোঁচা কলমদ্বারাও উৎপন্ন হইতে পারে।

সেলেরি—ইংলণ্ড দেশে স্বভাবতঃ জন্মে একবার জন্মিলে দুই বৎসর থাকে। এই গাছ আবাদ দ্বারা এক্ষণে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, কেবল বীজ বপনে ইহা উৎপন্ন হয়, আগষ্ট মাস অবধি জ্যানুয়ারি মাসের মধ্যে হাল্‌কা উর্ব্বর মৃত্তিকায় রোপণ করিবে পরে চারা সকল দুই ইঞ্চ উচ্চ হইলে চারি ২ ইঞ্চ অন্তর করিয়া নাড়িয়া পুতিবে। ঐ সকল চারা জুলিতে পুতিবার উপযুক্তরূপ তাজা হওয়া পর্য্যন্ত ঐ স্থানে থাকিবে। নাড়িয়া পুতিবার নিমিত্ত এক ফুট চৌড়া এবং পরস্পর তিন ফিট অন্তর জুলি প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহা হইলে চারার শারি চারি ফিট অন্তরে থাকিতে পাইবে। জুলি সকল ৮ ইঞ্চ গভীর করিয়া খনন করিয়া প্রত্যেকের পার্শ্বে মৃত্তিকার আলি করিয়া দিবে এবং নিম্নে পচা সার দিয়া উত্তমরূপে আবরণ করিয়া খনন করিবে, এইরূপে জুলি প্রস্তুত হইলে চারা সকলকে মূলশুদ্ধ তুলিয়া চারি ২ ইঞ্চ অন্তর করিয়া তাহাতে বসাইয়া দিবে। তদন্তর চারা সকল বাড়িয়া যখন আট কিম্বা দশ ইঞ্চ উচ্চ হইবে তখন দুই পার্শ্বে মৃত্তিকায় পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে এবং যাবৎ মূল সকল ব্যবহার যোগ্য না হয় তাবৎ সপ্তাহে এক ২ বার করিয়া ক্রমিক ঐরূপ করিতে হইবে।

ক্রেশ—পারশ্য দেশে স্বভাবতঃ বৎসর বৎসর জন্মে এবং কেবল বীজ বপন দ্বারা উৎপন্ন হয়। প্রতি সপ্তাহে ইহা রোপণ করা যাইতে পারে, কিন্তু উত্তাপ অথবা শুষ্ক সময়ে গামলাতে পুতিতে হয়।

সুসা—এদেশে স্বভাবতঃ বৎসর বৎসর জন্মে, কৃষিদ্বারা সংপ্রতি অতিশয় উত্তম হইয়াছে, বীজ বপন দ্বারা

ইহা উৎপন্ন হয়। অক্টোবর মাস অবধি মে মাস পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে রোপণ করা যায় এবং উর্ব্বর আলগ মৃত্তিকায় পুতিতে হয় ও চারা বাড়িবার নিমিত্ত যথেষ্ট স্থান দিতে হয়। চারা উৎপন্ন হইয়া যখন তাহাতে চারিটী পাতা ধরে তখন প্রধান কুঁড়িটাকে মুশড়াইয়া দিলে তাহা বাড়িতে না পারিয়া পার্শ্বে দুইটা ফেঁকড়ী হইবে তাহাও ঐরূপে মুশড়াইয়া দিলে তাহাতে নূতন ফেঁকড়ি ধরিবে, তাহারও দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় গাঁইট ঐরূপ করিয়া মুশাড়িয়া দিবে। তদনন্তর গাছ বড় হইয়া যখন ফল ধরিবার উপক্রম হইবে তখন ফলোন্মুখী শাখার দুই গাঁইট ঐ রূপে মুশড়াইয়া দিতে হইবে এবং গাছের গোড়ায় উত্তাপ না লাগে ও ফলসকল দাগী না হয় এ নিমিত্ত পাতা ও খড় দিয়া আচ্ছাদন করিতে হইবে।

এণ্ডাইভ—এদেশে স্বভাবতঃ বৎসর ২ জন্মে, কেবল বীজ বপন দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে, আগষ্ট অবধি জ্যানুয়ারি মাসের মধ্যে রোপণ করিতে হয়। ইহার চারা সকল পরস্পর এক ২ ফুট অন্তর করিয়া রাখিবে এবং যখন প্রায় সম্পূর্ণরূপ বাড়িয়া উঠিবে তখন তাহা শাদা করিবার নিমিত্ত বান্ধিয়া দিবে।

ফেনেল—ইংলণ্ড দেশে স্বভাবতঃ জন্মে বীজ হইতে উৎপন্ন হয়; অক্টোবর মাসে বুনাগিয়া থাকে।

রশুন—সিসিলি দেশে স্বভাবতঃ সর্ব্বদা জন্মে, ইহার প্রত্যেক স্তবক অর্থাৎ খোলুয়াতে অনেক কোষা থাকে, সে সকলকে অনায়াসে পৃথক ২ করিতে পারা যায়। সেই সকল খোলুয়া ছাড়াইয়া এক ২ টা করিয়া বর্ষার অবসান হইবামাত্র রোপণ করিতে হয়।

লাউ—এদেশে স্বভাবতঃ বৎসর ২ জন্মে, বীজ বপনে উৎপন্ন হয়, এপ্রেল অবধি জুন মাস পর্য্যন্ত বীজ পুতিলে গাছ হয়।

হার্সরেডিস—ব্রিটন দেশে স্বভাবতঃ সর্ব্বদা জন্মে, শিকরের কলম হইতে উৎপন্ন হয়। ভূমিতে দুই ফিট গভীর গর্ত্ত করিয়া তাহার নীচে শিকড়ের অগ্রভাগ পুতিলে গাছ হয়।

বঙ্গভূমির সর্ব্বত্র সচরাচর উৎপন্ন শজিনা গাছের শিকড় হার্সরেডিসের উত্তম প্রতিনিধি হইতে পারে।

হিসপ—ফ্রান্স দেশের দক্ষিণাঞ্চলে স্বভাবতঃ সকল সময়ে জন্মে, মূল কাটিয়া খণ্ড ২ করিয়া পুতিলে অথবা ফেঁকড়ী কিম্বা খোঁচা কলমে ঐ গাছ উৎপন্ন হয়।

জেরুসেলেম হাতিচোক—ব্রেজিল দেশে স্বভাবতঃ সকল সময়ে জন্মে, বিলাতী আলুর চাষ যে প্রকারে করে শীতকালে ইহার ক্ষুদ্র ২ শিকড় পুতিয়া সেই প্রকারে ইহারও চাস করিতে হয়। বীজ বপন করিলেও এই গাছ উৎপন্ন হইতে পারে কিন্তু বীজদ্বারা উৎপন্ন করিতে হইলে এপ্রেল মাসে তাহা বুনিতে হইবে। জেরুজেলেম হাতিচোকের মূল না নাড়িলে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত থাকিতে পারে কিন্তু যত পুরাতন হইতে থাকে ততই তাহা ক্ষুদ্র ও কদাকার হয় অতএব বৃহৎ অথচ উত্তম মূল পাইবার বাসনা করিলে প্রতি শীতকালে সে সকল তুলিয়া লইয়া উর্ব্বর অথচ হাল্‌কা নূতন মৃত্তিকাতে রোপণ করিতে হইবে।

কিড্‌নি বিন্‌—বৎসর ২ হয়, এদেশে লতা জাতীয় মধ্যে গণ্য হইয়া অনবরত জন্মে। বীজ হইতে তাহার গাছ উৎপন্ন হয়। ক্ষুদ্র ফরাস বিন সেপ্টেম্বর মাস অবধি ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত দুই ২ ফিট অন্তর করিয়া শারির মধ্যে পুতিতে হয় কিন্তু এদেশে বৃহৎ জাতীয় বিন্‌ এপ্রেল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চারি২ ফিট অন্তর করিয়া শারির মধ্যে রোপণ করিতে হয়। পরে চারা জন্মিলে বাঁখারি অথবা জাফরি দ্বারা অবলম্বন করিয়া দিয়া শাখা পল্লব বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রশস্ত স্থল দিতে হয়।

ল্যাবেণ্ডর—ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলে স্বভাবতঃ সকল সময়ে জন্মে, চারার খণ্ডদ্বারা এই গাছ উৎপন্ন হয়।

লিক—স্থইটজরল্যাণ্ড দেশে স্বভাবতঃ জন্মে, এবং একবার জন্মিলে দুই বৎসর থাকে, বীজ বপন দ্বারা ইহা উৎপন্ন হয়। বর্ষার শেষে শুষ্ক উর্ব্বর ভূমিতে বীজ রোপণ করিবে পরে চারা উৎপন্ন হইয়া তিন বা চারি ইঞ্চ উচ্চ হইলে সে সকলকে তুলিয়া পরস্পর ১৮ ইঞ্চ অন্তর ক্ষুদ্র ২ খালের মধ্যে নয় ২ ইঞ্চ অন্তরে এক ২ টা করিয়া পুতিয়া দিবে। তদনন্তর যখন সে সকল বাড়িতে থাকিবে তখন শাদা করিবার নিমিত্ত গুড়ির উপরে মৃত্তিকা চাপাইয়া দিবে কেন না শাদা হইলেই লিক অতি উপাদেয় হইয়া থাকে।

লেটুস—বৎসর ২ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু কোন্ দেশে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয় জ্ঞাত হয় নাই, কেবল বীজ হইতে ইহার গাছ হয়। সেপ্টেম্বর মাস অবধি জ্যানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত এক ২ পক্ষে এক ২ বার রোপণ করিবে, পরে চারা জন্মিলে সে সকলকে এক ২ ফুট অন্তর করিয়া পুতিয়া পাতলা করিতে হইবে। প্রথম বপনে যে সকল চারা উৎপন্ন হয় তাহা পুনর্ব্বার রোপণ করা যাইতে পারে কিন্তু যদিস্যাৎ বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে শেষে বুনা বীজ হইতে উৎপন্ন চারা পুনর্ব্বার স্থানান্তরিত করিলে তাহাতে প্রায় ফল দর্শে না।

লোব এপল—দক্ষিণ আমেরিকায় স্বভাবতঃ বৎসর ২ জন্মে, বীজ বপনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে বীজ বপন করিবে, পরে যখন চারা উৎপন্ন হইয়া দুই কিম্বা তিন ইঞ্চ উচ্চ হইবে তখন সে সকলকে তুলিয়া চারি চারি ইঞ্চ অন্তর করিয়া হাল্কা মাটির চৌকাতে রোপণ করিবে। তদনন্তর সে সকল শক্ত হইলে নদী তীরের প্রান্তভাগে পরস্পর এক কিম্বা দুই ফিট অন্তর শারির মধ্যে এক ২ টা করিয়া পুতিয়া দিয়া ডালপাতা বাড়িবার নিমিত্ত বাঁশের মাচা করিয়া দিবে।

মারজেরাম—পোর্টুগাল দেশে স্বভাবতঃ বৎসর ২ জন্মে, চারার খণ্ড রোপণ করিলে ইহা উৎপন্ন হয়।

পুদিনা শাক—ব্রিটন দেশে স্বভাবতঃ সকল সময়ে জন্মে, কলম করিয়া অথবা চারার শিকড় কাটিয়া পুতিয়া দিলে উৎপন্ন হয়।

সরিষা—এদেশে স্বভাবতঃ বৎসর বৎসর জন্মে, কেবল বীজ বপনে ইহা উৎপন্ন হয়। বর্ষার শেষে রোপণ করিতে হয় কিন্তু সামান্য আচারের নিমিত্ত প্রতি সপ্তাহে বুনা যাইতে পারে।

নেষ্টরসিয়ম—পেরু দেশে স্বভাবতঃ বৎসর ২ জন্মে, কেবল বীজ বপনে উৎপন্ন হয়, কিন্তু বর্ষার শেষে বীজ বুনিতে হইবেক।

পেঁয়াজ—একবার জন্মিলে দুই বৎসর থাকিতে পারে কিন্তু কোন্ দেশে স্বভাবতঃ জন্মে জ্ঞাত হয় নাই। বীজ বপনে উৎপন্ন হয়, অক্টোবর মাসের আরম্ভ অবধি ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত বুনা যাইতে পারে, কিন্তু বীজ বপনের নিমিত্ত আল্কা উর্ব্বর মৃত্তিকার চৌকা করিতে হয় এবং সাবধানতার সহিত বীজ সকল ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক।

পারসিলি—সার্ডিনিয়া দেশে স্বভাবতঃ জন্মে, এবং একবার উৎপন্ন হইলে দুই বৎসর পর্য্যন্ত থাকে, কেবল বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু বর্ষার শেষ হইবামাত্র রোপণ করিতে হইবে।

পারস্নিপ—ইংলণ্ড দেশে স্বভাবতঃ জন্মে, এবং একবার উৎপন্ন হইলে দুই বৎসর থাকে, বীজ বপনে ইহার গাছ হয়। অক্টোবর মাসে উর্ব্বর গভীর ভূমিতে বীজ বপন করিতে হয়, অর্থাৎ ভূমিতে দুই ফিট গভীর জুলি করিয়া তাহার মধ্যে এক এক ফিট অন্তর করিয়া বীজ পুতিয়া দিতে হয় পরে চারা হইলে সে সকলকে এপ্রকার পাতলা করিয়া বসাইতে হয় যে পরস্পর অন্ততঃ ১৮ ইঞ্চ অন্তরে থাকিতে পারে।

মটর—ইউরোপে স্বভাবতঃ জন্মে, এক্ষণে কৃষির গুণে ইহার অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে, কেবল বীজ হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেপ্টেম্বর মাস অবধি ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত দশ দিন রোপণ করিতে হয়।

পেনিরয়াল—ব্রিটন দেশে সকলসময়ে স্বভাবতঃ জন্মে, চারা কাটিয়া এক এক খণ্ড রোপণ করিলে ইহার গাছ হয়।

বিলাতি আলু—দক্ষিণ আমেরিকা দেশ স্বভাবতঃ সকল সময়ে জন্মে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল সকল অথবা বৃহৎ মূল খণ্ড খণ্ড করিয়া রোপণ করিলে ইহার গাছ উৎপন্ন হয়। একটা চৌকা খুলিয়া যদিস্যাৎ এই আলু বপন করা যায় তাহাতেই অনায়াসে চারা জন্মিতে পারে কিন্তু বিজ্ঞ বহুদর্শি কৃষকেরা একেবারে দুই তিনটা চৌকাতে পুতিয়া থাকে। মূল কাটিয়া এক এক খণ্ড পুতিলে গাছ হইতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে বিলাতি আলুর চোক বাহির হইবার অগ্রে সে সকল প্রায় শুষ্ক হইয়া যায় এবং প্রায় সর্ব্বদা পোকায় খাইয়া ফেলে অতএব সম্পূর্ণ এক ২ টা মূল বপন করাই ভাল, অখণ্ড আলুর উপরে ছাল থাকাতে শুষ্ক হইতে অথবা পোকায় খাইতে পারে না। আমি যেপর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি তাহার আমার নিশ্চয় বোধ হইয়াছে মধ্যম পরিমাণের যে বিলাতি আলুতে তিন বা চারিটা চোক থাকে বৃহৎ বৃহৎ মূলেও এক এক খণ্ড অপেক্ষা তাহা অধিক কর্ম্মণ্য ও তাহাতে উত্তম শস্য হয়। যদিস্যাৎ নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে বিলাতীআলু পাইবার বাসনা হয় তাহা হইলে অধিক শস্য উৎপন্ন হইবেক না বটে কিন্তু এক এক টা চোক পুতিয়া দিলে গাছ হইতে পারিবেক। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এবং নবেম্বর মাসে হালকা শুষ্ক উর্ব্বর মৃত্তিকার উপরে রোপণ করিবে; ক্ষেত্রমধ্যে পুরাতন সারের পাইট করিয়া দিলে উত্তম ফসল হইবে নূতন অথবা তাজা সার দিলে ফসল সুস্বাদ হইবেক না।

মূলা—চীন দেশে স্বভাবতঃ সকল সময়ে জন্মে, কেবল বীজ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। আগষ্ট অবধি ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মাসে দশ ২ দিন করিয়া হাল্কা মৃত্তিকায় বপন করিবে।

রোজমেরি—ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলে স্বভাবতঃ সকল সময়ে জন্মে, খোঁচা কলম দ্বারা ইহার গাছ উৎপন্ন হয়। পুরাতন ইষ্টকালয়ের অধিকাংশ রাবিস্ অর্থাৎ জঞ্জাল দিয়া মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে রোপণ করিবে।

রু—ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলে স্বভাবতঃ সকল সময়ে জন্মে, এবং চারার খণ্ডদ্বারা উৎপন্ন হয়।

সেজ—ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলে স্বভাবতঃ সর্ব্বদা জন্মে, চারার খণ্ড পুতিলে গাছ হয়।

বঙ্গদেশীয় সেজ—মাঠ কলম অথবা খোঁচা কলম হইতে অতি সহজে উৎপন্ন হয় এবং সামান্য মৃত্তিকাতেই বাড়িয়া উঠে।

স্পিনাচ—বৎসর বৎসর জন্মে কিন্তু কোন্ দেশে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয় জ্ঞাত হয় নাই। বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; বর্ষার শেষে চারি ফিট চৌড়া চৌকার মধ্যে রোপণ করিবে এবং চারা উৎপন্ন হইলে সে সকলকে পরস্পর এক এক ফুট অন্তরে পাতলা করিয়া বসাইয়া দিবে।

ট্যানজি—ব্রিটনদেশে স্বভাবতঃ জন্মে, চারা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া রোপণ করিলে ইহা উৎপন্ন এবং সামান্য মৃত্তিকাতেই বাড়িয়া উঠিতে পারে।

থাইম—ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলে স্বভাবতঃ জন্মে, বীজ বপন অথবা চারা কাটিয়া খণ্ড২ করিয়া রোপণ করিলে ইহা উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইহার নিমিত্ত শুষ্ক মৃত্তিকা অত্যন্ত আবশ্যক।

সালগ্রাম—ব্রিটন দেশে স্বভাবতঃ জন্মে, এবং একবার উৎপন্ন হইলে দুই বৎসর থাকে। কেবল বীজ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। সেপ্টেম্বর অবধি ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বীজ বপন করিবে এবং প্রত্যেক চারা পরস্পর ছয় ইঞ্চ অন্তর করিয়া পুতিয়া দিয়া সে সকলকে পাতলা করিয়া দিবে।

বেজিটেবিল মেরো—পারশ্য দেশে বৎসর বৎসর স্বভাবতঃ জন্মে, বীজ বপনে উৎপন্ন হয়। সেপ্টেম্বর অবধি ডিসেম্বর পর্য্যন্ত উর্ব্বর হাল্‌কা মৃত্তিকাতে রোপণ করিবে এবং চারা সকল যেমন বাড়িতে থাকিবে তাহাদের শাখাসকল তেমনি মৃত্তিকা দিয়া ঢাকিয়া দিবে, পরে তাজা ডাল নুয়াইয়া আটকাইয়া পুতিয়া দিলে তাহাতে নূতন শিকড় হইবে। এইরূপে খোঁচা কলমে ইহা জন্মে।

আম আদা—সর্ব্বদা জন্মে, শিকড় কাটিয়া এক এক খণ্ড রোপণ করিলে গাছ উৎপন্ন হয়, মার্চ্চ কিম্বা এপ্রেল অথবা মে মাসে রোপণ করিবে, কিন্তু তাহার নিমিত্ত মধ্যম প্রকার উর্ব্বর ভূমিতে তিন তিন ফিট চৌড়া চৌকা করিতে হইবে এবং এক এক গোলুয়া পরস্পর ছয় ছয় ইঞ্চ অন্তরে পুতিতে হইবেক।

চিচিঙ্গা—বৎসর ২ জন্মে এবং বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মে কিম্বা জুন অথবা জুলাই মাসে বপন করিবে এবং চারা জন্মিলে তাহা বাড়িবার নিমিত্ত যথেষ্ট স্থান দিবে। অপর বর্ষার সময়ে ফল ধরিলে তাহাতে দাগ না হয় এ নিমিত্ত মোটা খুটি অথবা বাঁশের মাচা করিয়া দিবে।

ডেরস—বৎসর বৎসর জন্মে এবং বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। এপ্রেল হইতে জুলাইমাস পর্য্যন্ত রোপণ করিবে। পরে চারা হইলে উর্ব্বর মৃত্তিকাতে এক একটা দুই দুই ফিট অন্তর করিয়া নাড়িয়া পুতিবে এরূপ করিলে বর্ষাকালে ঐ সকলে যথেষ্ট যথেষ্ট ফল উৎপন্ন হইবে।

ধনিয়া—বৎসর ২ জন্মে অক্টোবর মাসে রোপণ করিতে হয়।

আদা—মূল খণ্ড ২ করিয়া এক ২ খণ্ড পুতিয়া দিলে তাহা হইতে গাছ হয়। এপ্রেল কিম্বা মে মাসে উর্ব্বর হাল্‌কা শুষ্ক মৃত্তিকায় পরস্পর ১৮ ইঞ্চ অন্তর তিন অথবা চারি ফিট চৌড়া চৌকা করিয়া তন্মধ্যে রোপণ করিবে, কিন্তু পুতিবার নিমিত্ত অগ্রে ভূমিতে সার দিয়া তাহা অল্প করিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে ও চৌকার মধ্যে এক ২ ঝাড় পরস্পর ছয় ২ ইঞ্চ অন্তর করিয়া পুতিয়া দিবে পরে তাহার উপর খড় অথবা পাতা আচ্ছাদন দিয়া তাহাতে আলির মৃত্তিকা ছড়াইয়া দিবে।

হরিদ্রা—সকল সময়ে জন্মে, মূলের এক ২ খণ্ড রোপণ করিলে ইহার গাছ উৎপন্ন হয়। মার্চ্চ অথবা এপ্রেল কিম্বা মে মাসে মধ্যম প্রকার উর্ব্বর ভূমিতে রোপণ করিবে কিন্তু তদর্থ চারি ২ ফিট চৌড়া চৌকা করিয়া তাহার মধ্যে এক ২ ঝাড় ছয় ২ ইঞ্চ অন্তরে পুতিতে হইবেক।

ঝিঙ্গা—বৎসর ২ জন্মে, বীজ বপনে ইহার গাছ উৎপন্ন হয়। এপ্রেল অবধি জুলাই মাস পর্য্যন্ত রোপণ করিবে এবং চারা হইলে তাহার বিস্তার নিমিত্ত যথেষ্ট স্থান করিয়া দিবে।

করলা বৎসর ২ জন্মে, বীজ বপনে ইহার গাছ উৎপন্ন হয়। মে এবং জুন মাসে রোপণ করিবে।

মেথি—বৎসর ২ জন্মে, বীজ হইতে ইহার গাছ উৎপন্ন হয়, অক্টোবর মাসে রোপণ করিবে।

মাখন সীম—সকল সময়ে জন্মে, বীজ বপনে অথবা খোঁচা কিম্বা মাট কলম অথবা ফেঁকড়ী রোপণ করিলে ইহার গাছ উৎপন্ন হয়। যে কোন সময়ে রোপণ করা যাইতে পারে, কিন্তু শুষ্ক সময়ে রোপণ করিলে সর্ব্বদা জল দিতে হইবে। মাখন সীম নানা প্রকার হইয়া থাকে তাহার মধ্যে সর্ব্বোত্তম জাতীয় সীম গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, (কিড়নি বিনের বিবরণে দৃষ্টি কর)।

আলুং—বৎসর ২ জন্মে, বীজ হইতে ইহার গাছ উৎপন্ন হয়, বর্ষা নিবৃত্ত হইবামাত্র রোপণ করিবে।

পান—সকল সময়ে জন্মে, খোঁচা কলম ও মাট কলমে ইহার উৎপন্ন হয়। বর্ষার মধ্যে ভিজা উর্ব্বর ভূমিতে রোপণ করিবে কিন্তু চারা বাড়িয়া উঠিলে সে সকলকে অধিক ছায়া ও যথেষ্ট স্থান দেওয়া আবশ্যক।

পিয়াজ—সকল সময়ে জন্মে, বীজ বপন অথবা ফেঁকড়ী রোপণ করিলে গাছ উৎপন্ন হয়। "এই জাতীয় পালঙ্ক অতিশয় ব্যবহার্য্য, ভারতবর্ষে বর্ষার শেষভাগে এবং অক্টোবর, নবেম্বর, ডিসেম্বর, জ্যানুয়ারি ও ফিব্রুয়ারি মাসে শীতল অথচ শুষ্ক সময়ে এই পিয়াজের অধিক চাস হয়। কৃষকেরা ছোট ছোট গেঁউড় অথবা ফেঁকড়ী রোপণ কিম্বা বীজ বপন দ্বারা ইহার গাছ উৎপন্ন করে। এই পিয়াজের শুষ্ক মূল সকল ভারতবর্ষের মধ্যে সকল বাজারেই সচরাচর বিক্রয় হয় এবং ইহা এতদ্দেশীয় লোকদিগের একটা প্রধান আহারীয় সামগ্রী।" রাক্সবরা।

পটোল—সকল সময়ে জন্মে, বীজ বপন অথবা মূল সকল খণ্ড২ করিয়া রোপণ করিলে ইহার গাছ উৎপন্ন হয়। অক্টোবর কিম্বা নবেম্বর মাসে রোপণ করিবে এবং বর্ষার মধ্যে কোন মাসে মূল শিকড় সকল কাটিয়া দিবে তাহা হইলে বাড়িয়া উঠিবেক। এই গাছের চারা সকল বাড়িবার নিমিত্ত যথেষ্ট স্থান দিতে হয় এবং ফলে দাগ ধরা নিবারণার্থে বর্ষার সময়ে বিশেষরূপে রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যক।

পুইশাক—"ইহার চাস অধিক হয় এবং পুরাতন গাছ হইতে সর্ব্বদাই ডগা কাটিয়া লয়। এই শাকের গাছ অতিশয় বাড়ে তন্নিমিত্ত অতি প্রশস্ত মাচা সকল করিয়া দেয় কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকদিগের ঘরের চালের উপরেই প্রায় সচরাচর স্থান পাইয়া ব্যাপ্ত হয়। ঐ গাছের অসংখ্য বড় ২ রসাল ডগা ও পাতা হওয়াতে তদ্দ্বারা লোকদের সূর্য্যের উত্তাপ হইতে রক্ষণ হইবার আশ্রয় হইয়া থাকে"। রাক্সবরা।

ইহা বীজ রোপণ দ্বারা জন্মে এবং সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবর মাসে বুনিতে হয়।

শকরকন্দ আলু—সর্ব্ব সময়ে জন্মে, শিকড় কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া রোপণ করিলে ইহার গাছ উৎপন্ন হয়। আগষ্ট, সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল রোপণ করিবে।

অড়হড়—সকল সময়ে জন্মে, বীজ হইতে ইহার গাছ উৎপন্ন হয়। মে মাস অবধি সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত হালকা শুষ্ক উর্ব্বর ভূমিতে রোপণ করিবে।

তরমুজ—বৎসর বৎসর জন্মে, বীজ বপনে ইহার গাছ উৎপন্ন হয়, অক্টোবর অবধি ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রোপণ করিবে।

ইয়াম—প্রায় আবযুক্ত হইয়া থাকে এবং বৎসর বৎসর জন্মে। মূল খণ্ড ২ করিয়া পুতিয়া দিলে গাছ উৎপন্ন হয়। এপ্রেল মাসে ঘোড়ার পচা নাদ ও পুরাতন রাবিসে মিশ্রিত হাল্‌কা মৃত্তিকাতে দুই ফিট অন্তর করিয়া রোপণ করিবে। ইয়াম নানা জাতীয় হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ডাক্তার রাক্সবরা সাহেবের মতে নিম্নলিখিত এক ইয়াম অতি উত্তম। যথা—

চুপড়ী আলু—কন্দময় শিকড় সকলের মধ্যে অগ্রগণ্য, এতদ্দেশীয় লোকেরা ভক্ষণ করিয়া থাকে, অপর এতদ্দেশস্থ ইউরোপীয় দিগের অতিপ্রিয় ইয়াম সকলের মধ্যেও গণ্য বটে।

ক্রাম আলু—প্রথমোক্ত আলুর দ্বিতীয় স্থানস্থ। লাল গরানিয়া আলু তৃতীয় স্থানস্থ।

গরানিয়া আলু—চতুর্থ স্থানস্থ কিন্তু কলিকাতার চতুর্দিকে ইহার বিস্তর চাস হয়।

পো'ড়ো বাড়ী

বাড়ীটি একেবারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বাড়ীওয়ালা সেটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নতুন বাড়ী প্রস্তুত করিবেন মনে করিয়া একজন ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে লইয়া সেই পো'ড়ো বাড়ীর ভিতর ঘুরিতেছিলেন, ও নানা কাজের কথার মধ্যে এই বাড়ীর পূর্ব্বের ভাড়াটিয়াদের অনেক কথাই তিনি বলিতেছিলেন।

একটি দোতালায় উঠিবার সিঁড়ি দেখাইয়া বাড়ীর কর্ত্তা বলিতে লাগিলেন—"একবার কয়েকজন মাতাল দোতলা থেকে এক শবদেহ নামাবার সময় এই সিঁড়ির উপর আছাড় খায়। মাতালগুলো দস্তুরমত জখম হয়, কিন্তু অত উঁচু থেকে গড়াতে গড়াতে পড়লেও শবদেহটির কিছু হ'লো না। শুধু তাকে কাঁধে তোলবার সময় তার মাথাটা নড়তে লাগলো।"...... সিঁড়ির পাশে সারি সারি তিনটী দরজা দেখাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"ঐ তিনটী ঘরে কিছুদিন কয়েকজন যুবতী স্ত্রীলোক থাকতো। তাদের দ্বার সব সময়েই সকলের কাছে মুক্ত ছিল। তাদের কাজের মধ্যে সাজগোজ করাই ছিল প্রধান। এরা কখনও ভাড়ার টাকা দিতে দেরী করতো না। এর কারণ কি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। তারা সারারাত্তির মদ খেতো আর হল্লা করতো। এই ঘরগুলি শুধু রোগের বীজাণুতে ভর্‌তি। অনেক ভাড়াটে এখানে মারা যেতে দেখেছি। আমি একথা জোর করেই বলতে পারি - এ ঘরগুলির উপর কারও অভিশাপ ছিল এবং জীবন্ত মানুষের সঙ্গে অনেক অদৃশ্য প্রাণীও এখানে বাস করতো।

একটি পরিবারের কথা আমার এখনও বেশ মনে আছে। সেই পরিবারের কর্ত্তা ছিল একজন সাধারণ বৈচিত্র্যহীন মানুষ। নামটি বোধ হয় ছিল তার—রামশরণ। সে তার স্ত্রী, মা ও চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ঐ ঘরটিতে থাকতো। রামশরণ এক এটর্ণির অফিসে নকল-নবিশের কাজ করতো—তার মাইনে ছিল চল্লিশ টাকা। সে খুব ধর্ম্মভীরু সাধুপ্রকৃতির লোক ছিল। যখনই সে ভাড়া নিয়ে আমার কাছে আস্‌তো—প্রত্যেকবারই ভাড়া দিতে দেরী হয়েছে ব'লে আমার কাছে ক্ষমা চাইতো। যখন আমি তাকে টাকার রসিদ দিতাম—সে হেসে বল্‌তো—"ও! রসিদ দিচ্ছেন! রসিদে আবার দরকার কি!"

গরীব হলেও বেশ শৃঙ্খলার সাথে তার সংসার চলতো। মাঝের ঘরে চারটি নাতি-নাত্‌নী নিয়ে ঠাকুমা থাক্‌তো,—সেই ঘরেই রান্না খাওয়া ঘুমোনো আবার সময় সময় বৈঠকখানার কাজও চ'লতো।......আর এইটি রামশরণের নিজের ঘর।......এই ঘরে তার এক ভাঙ্গা টেবিল ছিল, তাতে তাঁর লেখবার কাগজ কলম, দোয়াত সব সাজানো থাক্‌তো। একখানি ভাঙ্গা চেয়ারে বসে সে অনেক সময় থিয়েটারের পার্ট লিখতো কিংবা অন্য কোনও লেখা নকল করতো— কারণ এতে তার উপরি কিছু উপার্জ্জনের সম্ভাবনা ছিল।......আর এই

দক্ষিণের ঘরটি রামশরণ অন্য একটা লোকের কাছে ভাড়া দিয়েছিল।—তার নাম রঘুলাল। সে সব সময়েই মদে চুর হয়ে থাকতো—তাই বাড়ীর বের হলেই তার পায়ে জুতো আর গায়ে জামা থাকতো না—রঘুলাল অল্প স্বল্প সব কাজই জানতো—সে তালাচাবি তৈরী করতো, বাইসাইকেল মেরামত করতেও জানতো—আবার সুবিধে হলে ঘড়িটড়ি সারাবারও চেষ্টা করতো। কিন্তু তার এই গর্ব্ব ছিল যে বাদ্যযন্ত্র মেরামত করাতেই সে একজন 'স্পেশালিষ্ট'। রঘুলালের ইস্পাত ও লোহার পাতের পাশে একটি ভাঙ্গা হারমোনিয়াম কিংবা একটা ভুগ্নচাবি ক্ল্যারিওনেট্ সব সময়েই দেখা যেতো। এই ঘরটির জন্য রামশরণকে তিনটি টাকা ভাড়া দিত।

কোনও কারণে যখন সন্ধ্যাবেলা এই দিকটায় আসতুম—তখন এই চিত্রই বরাবর দেখে এসেছি—রামশরণ তার টেবিলের উপর ঝুঁকে কি সব লিখে যাচ্ছে, তার মা আর পাতলা ছিপছিপে রোগে দুঃখে শীর্ণ স্ত্রী প্রদীপের কাছে ব'সে সেলাই করছে। রঘুলাল তার মেরামতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে। আর বাহিরের বারান্দায় ছেলেমেয়েগুলো খুব স্ফূর্ত্তির সাথে লুটপাট করছে—ভাবখানা এই যে চিরকালই তাদের এমনিভাবে কেটে যাবে।

কিছুদিন পর রামশরণের স্ত্রীটি মারা গেল। এটা অবিশ্যি সত্যি কথা যে এমন কোনও ভাগ্যবান্ স্বামী নাই যার স্ত্রী অমর হ'য়ে বেঁচে থাক্‌বে, কিন্তু সেদিন তার মুখে যে শোকার্ত্তের ভাব ফুটে উঠতে দেখেছিলুম—সে দৃশ্য আমি কখনও ভুলতে পারবো না।

তার স্ত্রীর মৃত্যুতেই আমার মনে হলো—এদের সুখশান্তির দিন ফুরিয়েছে, এমন উপর্য্যুপরি বিপদ্‌পাতে এরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠ্‌বে। কেন যে আমার এ ধারণা হলো জানিনে। আমি অদৃষ্টবাদী—আমার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল—তাসের খেলায় যে প্রথম থেকেই হঠ্‌তে সুরু হয়, সে কখনও শেষ পর্য্যন্ত জিতে উঠতে পারে না। বিপদ যখন আসে—একলা আসে না। যেমন পাহাড় থেকে একটা পাথর খসে গেলে তার সঙ্গে আরও অনেকগুলো গড়িয়ে পড়ে—তেমনি একটি বিপদ আরও অনেকগুলিকে সঙ্গী ক'রে আনে।

আমার ধারণাই সত্যি হলো। ঠিক এরই সাত দিন পর এটর্ণি তাকে কর্ম্মচ্যুত করে তার জায়গায় একজন যুবতীকে নিযুক্ত করলে। কাজটি হারালো দেখে রামশরণের যতটা দুঃখ না হোক, তাকে যে একজন স্ত্রীলোকের নিকট নত হতে হলো—এই কথা মনে ক'রেই তার দুঃখের সীমা পরিসীমা রইলো না। সেদিন সে এমনি ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে বাড়ী এসে ছেলে মেয়েকে বিনা কারণে প্রহার করলে, তারপর মায়ের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রঘুলালের সঙ্গে বেদম মদ খেলে।

সেবার সে মাসের আঠার দিন পর বাড়ীর ভাড়া দিতে এসে ও বিলম্বের জন্য আর আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো না, রসিদ নিয়ে তার অভ্যস্ত বুলি না বলেই গম্ভীরভাবে চলে গেল।

তার পরের মাসে সে আর এল না—তার মা অর্দ্ধেক ভাড়া দিয়ে বললো বাকি টাকা আগামী সপ্তাহে দিয়ে যাবে। তৃতীয় মাসে তারা আর এক পয়সাও দিল না। আমার ভাড়াটে বাড়ীর তত্ত্বাবধানকারী জানালো এরা ত মোটেই ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করছে না। এতেই বুঝতে পারলুম তাদের অবস্থা কেমন দাঁড়িয়েছে।

এই দৃশ্যটি একবার মনের চোখে দেখুন। সে দিন শীতের প্রভাত—সূর্য্যরশ্মি তখনও কুয়াসার পর্দ্দা ভেদ করতে পারেনি। রামশরণের মা চা তৈরী করে নাতি-নাত্নীকে দিচ্ছিলেন। শুধু বড় নাতিটী পেয়ালা পেয়েছিল—আর কজনের প্লেট ভিন্ন অন্য পাত্র ছিল না।......

রামশরণ তার ঘরে চৌকির উপর মাথায় হাত দিয়ে বসে তার পায়ের নীচে মেঝের দিকে লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। তার বিছানার চাদর নেই, বালিশও অন্তর্হিত হয়েছে। তার কাপড় জামা সবই জরাজীর্ণ, দেহটিও রোগগ্রস্ত হয়ে উঠেছে।

ঠাকুরমা বড় নাতি পল্টুকে বল্লেন—'তাড়াতাড়ি খেয়ে নে, নইলে স্কুলে যেতে দেরী হবে যে। আমাকেও বাবুদের বাড়ী যেতে দেরী করলে চলবে না।'

এই বৃদ্ধাই শুধু এদের মধ্যে মনের বল হারায়নি। সে পুরোনো দিনের কথা ভাবে আর পরের বাড়ীতে বাসন মাজা, ঘর ধোওয়া প্রভৃতি নোংরা কাজ করে কিছু উপার্জ্জন করে। আর বাড়ীতে অবসর মত মোজা বুনে, রুমাল তৈরী করেও তার দুপয়সা হয়। দুঃখ যে তার মনকে আকুল করে না তোলে তা নয়—কিন্তু সে কিছুতেই তার কর্ত্তব্য ভোলে না।........

খাওয়ার পর পল্টু তার একমাত্র সম্বল কোটটি পরতে গিয়ে দেখ্‌লে সেটি নেই। সে ঠাকুমাকে বল্লো—'আমার কোট কোথায় গেল?' তারপর সবাই মিলে তার সন্ধান করতে লাগ্‌লো কিন্তু কোটটি আর পাওয়া গেল না। ঠাকুমা ও পল্টুর মুখ বিষাদে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো, রঘুও বিস্মিত হলো—কিন্তু রামশরণ কোনও কথাই বল্‌লো না। তার ভাবটা এই, সে যেন কিছুই দেখ্‌ছে না বা শুন্‌ছে না—অথচ সব জিনিষ খুঁটিয়ে দেখা আর সব কথা চুটিয়ে শোনা তার স্বভাব। এই স্বভাববিরুদ্ধ ভাব দেখে তারই উপর সকলের সন্দেহ হলো।

রঘুলাল বল্লো—'নিশ্চয়ই কোট বেচে মদ খেয়েছে'। রামশরণ এ অপবাদের বিরুদ্ধে একটুও উচ্চবাচ্য করলো না। এতেই বোঝা গেল—সেই কথাই সত্যি। একমাত্র অবলম্বন এই ধূসর রঙ্গের কোটটির অভাবে পল্টুর চোখ ছল্‌ছল্‌ করতে লাগ্‌লো। এই কোটটি যে তার মা তাঁরই জামা কেটে নিজের হাতে তৈরী করে দিয়েছিলেন। তার এমন সখের কোটটি কিনা মদের জন্য বাবা বিক্রী করে ফেল্লে। আর শুধু তো কোটই যায় নি—তার সঙ্গে লাল নীল পেন্সিলটি আর ছোট্ট পেন্সিল শুদ্ধ তার সখের নোটবুকটিও গিয়েছে যে।—

পল্টুর ইচ্ছা করছিল—সে খুব জোরে কাঁদে, কিন্তু কাঁদবারও তার উপায় ছিল না। তার বাপ কাঁদার শব্দ শুনলে নিশ্চয়ই চীৎকার সুরু করবে, আর মাটিতে সজোরে পা ঠুকতে

ঠুক্‌তে তাকে মারতে আস্‌বে। ঠাকুমা নিশ্চয়ই বাধা দিতে যাবেন' কিন্তু তার বাপ তাঁকে মারতেও দ্বিধা করবে না। তারপর রঘুলাল তার বাপকে নিবারণ করতে গেলে—দুইজনে জড়াজড়ি করে মেঝের উপর পড়ে যাবে। তারপর তারা দুজনে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে মেঝের উপর গড়াগড়ি সুরু করবে।—ঠাকুমা চীৎকার করবেন, তারা ভাই বোন কাঁদতে লাগ্‌বে, আর পাড়ার বাসিন্দারা শান্তিভঙ্গের 'জন্য পুলিশে খবর দিতে ছুটবে। কারণ এমন ঘটনা তো প্রায়ই হয়ে থাকে। না—সে আর কাঁদ্‌বে না।

জোরে কেঁদে বা চীৎকার করে তার মনের যন্ত্রণা প্রকাশ করতে না পেরে সে তখন দুঃখের আগুনে পুড়তে পুড়তে হাত কচলাচ্ছিল, পা ছুড়ছিল আর দাঁত কড়মড় করছিল। তার চোখের দৃষ্টি ও মুখে হতাশার ভাব মাখা।—বৃদ্ধা নাতির দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে তার গায়ের চাদরখানি তাকে দিল। তারও মুখে চোখে হতাশের ভাব ফুটে উঠেছিল। ঠাকুমা আর নাতির এটুকু বুঝতে বাকি রইলো না তাদের জীবন একেবারে নষ্ট হতে বসেছে আর আশা করবার কিছুই নেই।

রামশরণ কান্নাকাটির শব্দ শুনতে পায় নি বটে কিন্তু এ ঘরে কি হচ্ছে সবই সে বুঝতে পারছিল।—আধঘণ্টা পর যখন পল্টু ঠাকুমার চাদরখানি গায়ে জড়িয়ে স্কুলে চলে গেল—তখন সে এমন মুখের ভাব নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো তা আমি আপনাকে বুঝিয়ে উঠতে পারবো না।—তার ইচ্ছা করছিল ছেলেকে ডেকে এনে তাকে সান্ত্বনা দেয়, তার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলে যে তার মায়ের নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞা করছে যে আর এমন কাজ করবে না।—কিন্তু সে এসব কিছুই করতে পারলে না, শুধু তার দুই চোখ ছাপিয়ে জল এসে পড়লো। বাড়ী ফিরে এসে রামশরণ চোখের জল ফেলতে ফেলতে তার মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে অনেক কথা বলে গেলো, তারপর আমার কাছে এসে আকুল হয়ে বল্লো—তার জন্য একটা কাজ আমাকে জোগাড় করে দিতেই হবে।

সে বলতে লাগলো—'আবার আমার জ্ঞান বুদ্ধি ফিরে পেয়েছি। এতদিন পশু হয়েছিলাম—কিন্তু এখন সব বুঝতে পেরেছি।' আমি তাকে আশ্বস্ত করলুম—সে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে গেলো।—কিন্তু আমার তার দিকে চেয়ে বল্‌তে ইচ্ছা হচ্ছিল—'অনেক দেরী হয়েছে তোমার সুবুদ্ধি ফিরতে—মরতে তোমার আর বেশী বাকি নেই।'

সে এইবার স্কুলের দিকে গেল—তার ছেলে না আসা পর্য্যন্ত সে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলো।

ছেলেকে আসতে দেখে তার নিকটে গিয়ে সে উৎফুল্ল হয়ে বল্লো—'ছাখ পল্টু, আমি একটা কাজ পাব এমন আশা পেয়েছি। কিছুদিন ধৈর্য্য ধরে থাক—তোর জন্য একটা ভাল

গরম জামা কিনে দেব। " তারপর এ ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে তোকে দেয়ো ইস্কুলে পাঠাবো—বুঝেছিস ? আমি তোকে একেবারে বড়লোক করে তবে ছাড়বো। আর মদ খাব না প্রতিজ্ঞা করেছি। কখনো খাবো না—তুই দেখে নিস্।'

ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল চিত্র মনের চোখে দেখতে দেখতে সে প্রফুল্ল হয়ে উঠলো।

কিন্তু আবার রাত এলো। বৃদ্ধা মনিবর্বাড়ী থেকে ফিরে নাতি নাত্নীর ময়লা জামা কাচতে বসলো। পণ্টু বসে বসে অঙ্ক কসছিল। রঘুলালের কোনও কাজ ছিল না। আর রামশরণ চুপটি করে বসেছিল—তার মনে মদ খাওয়ার অদম্য স্পৃহা ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল। সে নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

রঘুলাল জিজ্ঞাসা করলো—'কি হে বেরোচ্ছ নাকি ?' রামশরণ কোনও কথা বললো না, তার মদ খাওয়ার স্পৃহা এমনি বেড়ে উঠেছে যেন মদ না খেয়ে আর তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোবে না। রঘুলাল ব্যাপার বুঝে তার সঙ্গ নিলো।

ইহার ফলে পরদিন ঠাকুমার চাদরখানি আর দেখা গেল না।

এই অভিনয় এই ঘরের মধ্যেই হতে দেখেছি। চাদর বিক্রী করে আর রামশরণ বাড়ী ফেরেনি—কোথায় গিয়েছে তাও জানিনে। শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবেন—পুত্রের অন্তর্ধানের পর বুড়ো মাও মদ ধরলো, তারপর শয্যাশায়ী হলো। তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ছেলেমেয়েগুলোকে তাদের কোন এক আত্মীয় নিয়ে গেল, শুধু পণ্টু চটকলে কাজ করছিল। সে দিনের বেলা কাজ করতো—আর রাত্রে মদ খেতো। সেখান থেকে তাকে কিছুদিন পরই তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে নাকি তারপর রূপ-ব্যবসায়ীদের রূপের খদ্দের জুটিয়ে দিতে আরম্ভ করেছিল। এখন তার কি দশা হয়েছে আমি জানিনে।"

তারপর তিনি আর একটি ঘর দেখিয়ে বল্লেন—"এই ঘরে যে লোকটি থাকতো সে রাস্তায় গান গেয়ে পয়সা উপার্জ্জন করতো। আশ্চর্য্যের কথা সে মারা গেলে তার বিছানার নীচে পাঁচটি হাজার টাকার নোট পাওয়া গেল।"*

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

* রুষ লেখক শেকভের অনুসরণে

কোজাগরী

কো জাগর ?—কে জাগর ?—কে জাগে আজ এই নিশিতে ?
যে জাগে সে সত্য কবি, সেই জানে প্রাণ মিশিয়ে দিতে
বিশ্বপ্রাণের লীলার সাথে ; সেই জেনেছে পিইতে মধু ;
সেই জেনেছে দেখ্‌তে কিরূপ রূপ-গরবা বিশ্ববধূ।
রাত ত এ নয়,—এ যেন রে শুদ্ধ শোভার মূর্ত্তিখানি,
আকাশ-রাজার স্বপ্নে-দেখা স্বপ্নময়ী এ এক রাণী।
ফুলের হাসি, নারীর শোভা, প্রভাত-বিভা, সাঁঝের মায়া—
টুক্‌রো শোভা ছড়িয়ে যা রয় সে এই রাত্রির ক্ষুদ্র ছায়া।
সব শোভারি পূর্ণ মিলন পূর্ণ বিকাশ কোজাগরী ;
বিশ্বহিয়ার রূপের তৃষা কী রূপ ধরে—মরি মরি।
বর্ষা-শ্যামল বিশ্ব-দেহে লাগ্‌ল জোয়ার যৌবনেরি,
তাই এল আজ নিশার রূপে প্রিয়া তাহার, ঘেরি' ঘেরি'
সবটা তারি প্রীতি দিয়ে শুভ্র উজল প্রীতির সুধায়,—
পিয়ে পিয়ে বিশ্ব বিবশ, সুখ ছাপে তার হিয়ার কানায়।
বর্ষা স্নেহ বিলিয়ে গেল, জাগিয়ে গেল প্রাণের সাড়া,
সে-প্রাণ পেল পরিণতি তৃপ্তি ধৃতি প্রীতির ধারা।
শোভার সেরা শরৎ-শোভা, সেই শরতের হৃদয়-রাণী
জুড়িয়ে দিল সকল হৃদয়, মুছিয়ে দিল সকল গ্লানি।
এই ধরাতে হিংসা আছে, লোভ আছে দ্বেষ, মারামারি—
সব ভুলে যাই যতই হেরি কোজাগরী পারাবারী।
রৌদ্র আছে, ঝঞ্ঝা আছে, আছে কাঁটা, দুঃখ আছে,—
সব ভুলে যাই সব ভুলে যাই, চিত্তে অগাধ তৃপ্তি রাজে।
কোজাগরীর রূপ-সাগরের জোয়ারে আজ ভাস্‌ছি একা,
যাক নিয়ে যাক যাক রে নিয়ে, ধরার সাথে আর না দেখা ;
আর না আসা দুঃখ-শোকের ঘূর্ণিপাকে বিষম খেতে ;
আর না আসা কোলাহলের আঘাত নিতে বক্ষ পেতে ;
আর না আসা চোখের জলে করতে বরণ ভাগ্য রূঢ়,
আর চাহিনা জান্‌তে দুখের অন্তরেরি তত্ত্ব গূঢ়।

দে রে ছুটি দে রে ছুটি আজকে রাতের সঙ্গে ছুটি,
দু'পায়ে আজ দুঃখে দলে' সুখ লুটি রে সুখ সে লুটি।
দীর্ঘা রহ দীর্ঘতমা হে পূর্ণিমা কোজাগরী,
দিবসে আর জাগিও নাকো, তোমার বুকেই যাই গো মরি'।
কিম্বা নিয়ে চলো আমায় যেথায় তুমি চিরন্তনী,
অমর করে' রেখো সেথায় পিইয়ে সুধা সঞ্জীবনী।
রূপের নেশায় করলে পাগল, এ নেশা মোর ভেঙো নাকো,
এই নেশাতেই নিবুক জীবন, ঐ স্বপনেই রাখো ঢাকো।
কোজাগরী লো শর্ব্বরী, চিত্তক্ষুধার পরম সুধা,
পিয়ে পিয়ে তোমার সুধা কাঙাল হিয়ার জুড়ায় ক্ষুধা।
যাই ভেসে আর পান করে' যাই, একলা আমি, নাই রে কেহ;
কোজাগরী শয়ন আমার বিলাস স্বপন পেয় গেহ।

ভেসে ভেসে চল্‌ছি আমি রূপ-সাগরে ভেসে ভেসে,
রূপের সে ঢেউ আছ্‌ড়ে গায়ে যাচ্ছে ভেঙে শুভ্র হেসে।
চল্‌ছি ভেসে অবাধ সুখে—ধরার ছেলে নইরে আমি,
রূপ-সাগরের ফেনা আমি, তার গতিরই অনুগামী ;—
কখন্ ভুলে উঠেছিনু ধরার কূলে—কে তা জানে ?
দূর আবাসের সুবাস পেয়ে আজ ছুটেছি তাহার টানে।
দোল দে রে ঢেউ, দে রে দোলা, নয়ন মুদে আজকে বুঝি
এলাম ভেসে যেখান হতে চল্‌ছি সেথা সোজাসুজি ;—
কোথা সে ঠাঁই জানি নাকো, জানি আমি হাসির ছেলে,
সুন্দরেরি ছেলে আমি, তার বুকে যাই বক্ষ মেলে।

* * * *

কো জাগর ?—কে জাগেরে ?—কে জাগে আজ এই নিশিতে ?—
কবি জাগে, কবি জাগে, সে জাগে প্রাণ মিশিয়ে দিতে।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

কহে শুভঙ্কর মৌজুদ গণ

সেকালে রাজস্বের হিসাব-নিকাশের কর্ম্মকর্ত্তা একটা থলিতে কাগজপত্র নিয়ে এসে রাজ্যের আয়ব্যয়ের বৃত্তান্ত রাজসভায় বুঝিয়ে দিতেন। থলিকে ফরাসী ভাষায় বলে বুজেট (bouget) তাই থেকে বজেট (budget) শব্দের উৎপত্তি। আয়-ব্যয় রাজ্য পরিচালনের সকল নীতির মূল। কোথা থেকে টাকা এল এবং কোথায় গেল—এই সকল কথা থাকে বলে বজেট থেকে রাজ্যের অর্থনীতি, শাসন-নীতি, সমরনীতি, বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি সব নীতিই জানতে পারা যায়। কাযেই বজেট আলোচনাটা একটা খুব গুরুতর বিষয় এবং তাই নিয়ে শাসকবর্গ ও দেশপ্রতিনিধিবর্গের মধ্যে তুমুল তর্ক-বিতর্ক, বাগবিতণ্ডা, তীব্র সমালোচনা হয়ে থাকে। সম্প্রতি আমাদের ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে এই বাগযুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন শুভঙ্করের উপদেশ অনুসারে মৌজুদ গুণে দেখা যাক ফলাফলটা কি দাঁড়াল।

বিষয়টা বুঝতে হলে এর উপক্রমণিকা স্বরূপ শাসনপ্রণালী সম্বন্ধীয় দুই একটা কথা জানা আবশ্যক। সংস্কৃত শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হবার পূর্ব্বে সকলপ্রকার আয় ভারত গবর্ণমেন্টেই জমা হত, আর ভারতগবর্ণমেণ্ট তদধীন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে তাদের ব্যয়ের জন্য যা' আবশ্যক তা' দিতেন। সংস্কৃত শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হবার পরে আয়কর কতকগুলি বিষয়—যেমন জমির খাজনা কাটাখালের (irrigation canal) আয়, আবগারি, কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প (Judicial stamps) প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির হাতে সমর্পণ করে দেওয়া হল। তাঁরাই এই সকল রাজস্ব সংগ্রহ করবেন এবং তা ব্যয় করবেন। এই বন্দোবস্তের মধ্যে কিন্তু সর্ত্ত থাকল যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে সকলে মিলে ভারত গবর্ণমেণ্টকে দিতে হবে ন' কোটি তিরাশী লক্ষ টাকা। এর মধ্যে বাঙলার ভাগে পড়েছে ৬৩ লক্ষ টাকা। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এখন দু'ভাগে বিভক্ত—এক ভাগে থাকল সপারিষদ গবর্ণরের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব, আর অপর ভাগে থাকল গবর্ণরের অনুগ্রহাধীন মন্ত্রীদের কর্ত্তৃত্ব। বিষয় বিভাগ হল বটে কিন্তু বিষয়ের আয়টার ভাগ হল না। বন্দোবস্ত হল আয়টা এক জায়গায়ই থাকবে, মন্ত্রীদের যা' আবশ্যক তা' তাই থেকে দেওয়া হবে। দেওয়া হবে কিন্তু দিতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা থাকল না। কাজেই কথার মত কায হল না। মন্ত্রীরা আবশ্যকমত টাকা পেলেন না। অন্য অন্য কারণের মধ্যে এই একটা কারণ, বোধ হয় প্রধান কারণ, যার জন্য দ্বৈতশাসন কোন কোন প্রদেশে অচল হয়ে গেল। যে ব্যবস্থায় স্থাবর শাসনমণ্ডলী (Executive Council) প্রজাপ্রতিনিধিদের ভোটের দ্বারা স্থানচ্যুত হতে পারে না, সে ব্যবস্থায় অস্থাবর দায়িত্ববিহীন মন্ত্রীদিগকে স্থানচ্যুত করে দ্বৈত শাসনের এক অঙ্গকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করাই সহজ এবং প্রতিনিধিরা

তাই করেছেন। স্থাবর শাসকমণ্ডলী এবং জঙ্গম মন্ত্রীমণ্ডলী—এ দুয়ের একীকরণে যে দ্বৈতশাসন তা' কখন স্থায়ী হতে পারে না।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ভারতগবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা এক রকম ভালই ছিল। কিন্তু ১৯১৮-১৯ সালে দেখা গেল জমার চেয়ে খরচ বেশী হয়েছে ৬ কোটি টাকা। পর বৎসর ছ' কোটি বেড়ে ২৪ কোটি হল, খরচের চেয়ে জমার কমতি (deficit) হল ২৪ কোটি। তার পর বৎসর (১৯২০-২১ সালে) কমতি হল ২৬ কোটি। তার পর বৎসর অর্থাৎ ১৯২১-২২ সালে নতুন সংস্কৃত শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হল ; ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার—Indian Assemblyর প্রথম অধিবেশন হল। নতুন ব্যবস্থাপকেরা দেখলেন সেবারকার বজেটে কমতি হয়েছে ১৮,০০,০০,০০০ আঠার কোটি। এই স্বল্পতা পূরণ করবার জন্য বাণিজ্যশুল্ক কিছু কিছু বাড়াবার প্রস্তাব করা হল ; সঙ্গে সঙ্গে খরচ কমাবারও প্রস্তাব করা হল। হিসেব করে দেখা গেল এতে বৎসরের শেষে রাজস্ব কিছু উদ্বৃত্ত হবে। কিন্তু পর বৎসর ব্যবসা-বাণিজ্য বড় মন্দা হয়ে গেল, যত টাকা রাজস্ব আদায় হবে আশা করা গিয়েছিল প্রকৃত পক্ষে তার চেয়ে ২০,০০,০০,০০০ কুড়ি কোটি টাকা কম আদায় হল। আর খরচ কিছু বেড়ে গেল। ফল হল ৩৩,০০,০০,০০০ তেত্রিশ কোটি টাকার ঘাটতি। নতুন ব্যবস্থাপক সভা এতে অসন্তুষ্ট হলেন এবং গবর্ণমেণ্টকে খরচ কমাতে বললেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যখন রাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা বোঝাবার চেষ্টা করে দেশী-বিলিতী সুতো এবং কাপড়ের উপর শুল্ক বাড়াতে চাইলেন তখন ব্যবস্থাপক সভা উল্টো বুঝলেন। তাঁরা বুঝলেন যে এই শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব কাজে পরিণত হলে দেশী মিলের সুতো এবং কাপড়ের ব্যবসায়ের হানি হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিলিতী মিলেরই সুবিধা হবে। কাযেই ব্যবস্থাপক সভায় সে প্রস্তাব গৃহীত হল না। নুনের টেক্সও বাড়াবার চেষ্টা গবর্ণমেণ্ট করেছিলেন। ব্যবস্থাপক সভা তাতেও বাধা দিলেন।

তার পরেই আরম্ভ হল খরচ কমাবার চেষ্টা। লর্ড ইঞ্চকেপ শীর্ষক কমিটি ভারত-গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কার্য্যবিভাগ নিরীক্ষণ করে ১৯,২৫,০০,০০০ উনিশ কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা পরিমাণ ব্যয় সংক্ষেপের প্রস্তাব করলেন। এক সৈনিক বিভাগেই ১০,৫০,০০,০০০ দশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার খরচ কমাতে চাইলেন। অন্যান্য বিভাগের মধ্যে রেলওয়ে বিভাগে সাড়ে চার কোটি, পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ বিভাগে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ এবং সাধারণ শাসন বিভাগে (General Administration) পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খরচ কমাবার প্রস্তাব করলেন।

প্রস্তাব ত হল এই রকম। কিন্তু কাজ কি রকম হল দেখা যাক। সৈনিক বিভাগে ইঞ্চকেপ কমিটি প্রস্তাব করেছিলের সাড়ে দশ কোটী টাকা কমাতে ; গবর্ণমেণ্ট কমাবার প্রস্তাব করলেন পৌনে ছ' কোটি (পাঁচ কোটী পঁচাত্তর লক্ষ)। আর অ-সৈনিক বিভাগে কমিটির প্রস্তাব ছিল আট কোটি টাকা কমান, গবর্ণমেণ্ট কমাবেন বললেন ছ' কোটি ষাট লক্ষ।

এ ছাড়া আরও দু' একটি বিষয়ে কিছু কিছু কমাতেও গবর্ণমেণ্ট রাজী হলেন। এর মোট ফল হল এই :—১৯২২-২৩ সালের বজেটে অনুমান করা গিয়েছিল যে পর বৎসর মোট খরচ হবে ২১৫ কোটি ২৭ লক্ষ। কিন্তু ১৯২৩-২৪ সালের হিসাব প্রস্তুত হলে দেখা গেল খরচ হয়েছে ২০৪ কোটি ৩৭ লক্ষ, কিন্তু জমাটা হল ১৯৫ কোটি ২০ লক্ষ—অর্থাৎ জমার চেয়ে খরচ বেশী হল ৯ কোটি ১৭ লক্ষ। এ অবস্থার প্রতিবিধানের একমাত্র উপায় জমার বৃদ্ধি করা এবং গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করলেন নুনের টেক্স বৃদ্ধি করে এই কাজ করা সব চেয়ে সহজ। টেক্সটা ছিল মণকরা ১।০, প্রস্তাব হল একে বাড়িয়ে করা হক মণকরা ২॥০ টাকা। রাজস্ব সচিব অনেক তর্কজাল বিস্তার করে ব্যবস্থাপক সভাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে এই প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হলে জমা খরচের মিল রাখা অসম্ভব, এবং জমাখরচের মিল রাখতে না পারলে টাকার বাজারে ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রসার প্রতিপত্তির হানি হবে। কিন্তু দেশীয় নির্ব্বাচিত সদস্যেরা এ যুক্তি বুঝলেন না; প্রস্তাবটিও তাঁদের অনুমোদিত হল না। কিন্তু তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে তাঁদের অনুমোদনটা পরামর্শ মাত্র; পরামর্শগ্রহীতা তা শুনতেও পারেন, না শুনতেও পারেন। এক্ষেত্রে পরামর্শগ্রহীতা গবর্ণর-জেনারেল পরামর্শটা শুনলেন না, সার্টিফিকেট দিয়ে সবৃদ্ধি লবণকর সমেত বজেট পাশ করে দিলেন। দেশের রাজনীতিক বা অর্থনীতিক অবস্থার উপর এর প্রভাব যাই হক, বজেটে জমাখরচের মিল হল; টাকার বাজারে গবর্ণমেণ্টের প্রতিপত্তি বাড়ল।

টাকার বাজারে প্রসার-প্রতিপত্তি বাড়ার অর্থ সহজে ঋণ পাওয়া। ঋণ সহজে পাওয়া গেলেই ঋণগ্রহণের প্রবৃত্তিটা প্রবল হয়, প্রয়োজনটা, কাল্পনিক বা বাস্তবিক, অবশ্য সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। এমন অবস্থায় লোকায়ত দর্শনকারের পরামর্শ 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' অবশ্য গ্রহণীয়। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে এ পরামর্শ গ্রহণের যুক্তি এই যে সে ঋণ আর শোধ দিতে হবে না, ঋণগ্রহীতার ভস্মীভূত দেহের সঙ্গে তার অবসান হবে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই যুক্তি দেখান যেতে পারে যে ঋণগ্রহীতা গবর্ণমেণ্ট "ঘৃতং পিবেৎ" এবং তার পরবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট তা "পরিশোধয়েৎ।" এই নীতি অনুসারে ১৯২৩ সালে গবর্ণমেণ্ট ঋণ করলেন ভারতবর্ষে ২৪ কোটি টাকা এবং বিলেতে ২০ মিলিয়ন পাউণ্ড বা তিন কোটি টাকা। ভারতবর্ষের টাকার ঋণটার সুদ হল শতকরা পাঁচ টাকা আর সেই সুদটা হল আয়করমুক্ত (Income tax free)। সুদটা আয়করমুক্ত হওয়াতে সাক্ষাতভাবে গবর্ণমেণ্টের এবং পরোক্ষভাবে দেশের শিল্প বাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছে—এ কথা গবর্ণমেণ্টের বোঝা উচিত ছিল। ঋণদাতারা যদি এই টাকাটা ঋণরূপে গবর্ণমেণ্টকে না দিয়ে মূলধনরূপে শিল্পবাণিজ্যে নিযুক্ত করতেন তা' হলে তার লাভ থেকে তাঁদের আয়কর দিতে হত। সুতরাং টাকাটা ঋণরূপে গ্রহণ করে গবর্ণমেণ্ট সেই অনুপাতে আয়কর থেকে বঞ্চিত হয়েছেন আর দেশের শিল্পবাণিজ্যও সেই অনুপাতে মূলধন থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

বিলিতী ঋণের (Sterling loan) প্রথম কথাই এই যে তার কাগজ গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৯০ টাকায় বার করলেন—অর্থাৎ মহাজনকে শতকরা ১০ টাকা নজর আনা দিয়ে এই টাকাটা ধার করলেন। ঋণ গ্রহণের আরম্ভেই এই ক্ষতি। তার পর সুদ দেবার সময় ভারতীয় টাকাকে বিলিতী পাউণ্ডে পরিণত করবার বাটা (exchange) দিয়ে বিলেতে পৌঁছে দিতে হবে। বাটার পরিমাণটি নিতান্ত নগণ্য নয়। ১৯২৩-২৪ সালে বিলিতী ঋণের সুদের বাবদে এবং অন্যান্য বাবদে গবর্ণমেণ্টকে বাটা দিতে হয়েছিল ১৪,৭৭,৫৬,২১৬, চোদ্দ কোটী সাতাত্তর লক্ষ, ছাপান্ন হাজার দু 'শ' ষোল টাকা। এ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। ১৯২৩-২৪ সালের বাটার হার ছিল টাকায় এক শিলিঙ চার পেন্স। কিন্তু পর বৎসর (১৯২৪-২৫) গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছামত একে করে নিয়েছেন টাকায় দু' শিলিঙ। এতে গবর্ণমেণ্টের ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বিলেতে টাকা পাঠানর খুব সুবিধা হয়ে গিয়েছে। আগে একজন ইংরেজ সিবিলিয়ানকে এক পাউণ্ড বিলেতে পাঠাতে হলে পনর টাকা দিতে হত, এখন দশ টাকা দিলেই হয়। কিন্তু একজন বণিক যদি এক পাউণ্ড বিলেতে পাঠাতে চান তাঁকে দিতে হবে ১৩৷৷০ টাকা, কারণ, বাণিজ্য-জগতে ও হার চলে না। সেখানকার বর্ত্তমান হার টাকায় ১ শিলিঙ ৫৲ পেন্স। ভারতীয় টাকার ঋণে এ বালাই নাই।

ভারত গবর্ণমেণ্টের আয়ের উৎপত্তিস্থান প্রধানতঃ :- (১) বহির্বাণিজ্য শুল্ক (২) আয়কর (৩) লবণকর (৪) আফিঙ (৫) জমির খাজনা (৬) অন্তর্বাণিজ্য শুল্ক (৭) ষ্ট্যাম্প (৮) বন (৯) রেজিষ্ট্রি (১০) রাজগণপ্রদত্ত কর। এ ছাড়া আছে গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগ যেমন খাল, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে, টাকসাল ইত্যাদি। তার উপর, প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকেও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে তাঁদের ব্যয়নির্ব্বাহ কল্পে কিছু কিছু দিতে হয়। বাঙলাকে এই হিসাবে দিতে হয় ৬৩ লক্ষ টাকা, তা আগেই বলেছি।

এর মধ্যে বহির্বাণিজ্য শুল্কই প্রথম স্থানীয়। ১৯২২-২৩ সালে এ থেকেই আদায় হয় মোট আয়ের শতকরা ২১ ভাগ। ১৯২৩-২৪ সালের বজেটে অনুমান করা হয়েছিল এ থেকে আয় হবে ৪৫ কোটী ১০ লক্ষ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পাওয়া গিয়েছিল ৩৯ কোটী ৭০ লক্ষ। যে লবণ করের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় এত তর্ক বিতর্ক, বাগ্‌বিতণ্ডা হল এবং শেষে যা' সার্টফিকেটের জোরে পাশ হল সেই লবণ কর থেকে আয় হবে, বজেটে ধরা হয়েছিল, ১১ কোটি ৭৫ লক্ষ, কিন্তু কার্য্যতঃ হয়েছিল ৮ কোটি ৭৫ লক্ষ, অর্থাৎ ৩ কোটি কম। চিনির আনুমানিক শুল্ক থেকেও ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা কম আয় হয়েছিল।

ডাকঘরের আয় সম্বন্ধেও তাই। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে ডাকঘর সম্বন্ধীয় ব্যয় ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ থেকে ৬ কোটি ২৯ লক্ষ হয়ে উঠেছিল। গবর্ণমেণ্ট যখন দেখলেন আয় দাড়াতে না পারলে আর কিছুতেই চলে না; তখন পরামর্শ হল সাধারণ চিঠির মাশুল

দু' পয়সা থেকে চার পয়সা আর পোষ্ট কার্ড এক পয়সা থেকে দু' পয়সা বাড়িয়ে দেওয়া হক। ১৯২২ সালের বজেটে এইরূপই হিসাব করা হল। গবর্ণমেণ্ট আশা করলেন এতে আয় বাড়বে ১ কোটির উপর। কিন্তু আশার অনুযায়ী ফল হল না। পূর্ব্ববৎসর ডাকযোগে-যাতায়াত করা চিঠি পত্রাদি সংখ্যায় ছিল ১৪২, ২০, ০০, ০০ একশ বিয়াল্লিশ কোটি কুড়ি লক্ষ; এই মাশুল বৃদ্ধির জন্য এবৎসর তার সংখ্যা কমে গিয়ে হল ১১৮, ৬০, ০০, ০০০ একশ' আঠার কোটি ষাট লক্ষ অর্থাৎ মোট কম হল ২৩, ৬০, ০০, ০০০ তেইশ কোটি ষাট লক্ষ। প্রত্যাশিত আয়ও ৪০ লক্ষ টাকার উপর কমে গেল। বর্ত্তমান বর্ষে (১৯২৫-২৬) ধরা হয়েছে মোট আয় হবে ১০ কোটি ৮১ লক্ষ ৬২ হাজার আর ব্যয় হবে ১০ কোটি ১৩ লক্ষ ৫১ হাজার। ১৯২৩-২৪ সালের তুলনায় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৪৯ লক্ষ ৪৮ হাজার আর ব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণটা ৭৭ লক্ষ ৫০ হাজার। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ব্যয়টা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে—১৯২৩-২৪ সালে হয়েছিল ৯ কোটি ৩৬ লক্ষ ১ হাজার; ১৯২৪-২৫ সালে ৯ কোটি ৫১ লক্ষ ৭ হাজার আর ১৯২৫-২৬ সালে হবে ১০ কোটি ১৩ লক্ষ ৫১ হাজার বজেট-টা বড় মানুষের, সেই জন্য গরীবের চিঠির মাশুলটা এবং পোষ্টকার্ড খানার দাম আর কমল না, পূর্ব্ববৎ এক আনা আর দু' পয়সাই থাকল।

রেলওয়ের আয় ১৯২১-২২ সালে ছিল ৮১ কোটি ৯৪ লক্ষ আর ব্যয় হয়েছিল ৯১ কোটি ২১ লক্ষ; আয়ের চেয়ে ব্যয়টা বেশী হয়েছিল ৯ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা মাত্র। প্রতীকার, ডাকঘর সম্বন্ধে যা করা হ'য়েছিল তাই। যাত্রীদের, প্রধানতঃ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের, ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া হল; মালের ভাড়াও কিছু বেড়ে গেল। এতে আয় বাড়ল সাড়ে এগার কোটি, কিন্তু ব্যয়টা পূর্ব্বেই যথেষ্ট বেড়ে ছিল, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের মোট লাভ হল ১ কোটি ২২ লক্ষ মাত্র। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বেড়ে যাওয়া সত্বেও যাত্রীর সংখ্যা বেড়েছিল ৫০ কোটি ৫ লক্ষ থেকে ৫০ কোটি ২৯ লক্ষ; কারণ, দরিদ্র তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী নিতান্ত আবশ্যক না হলে সখ করে রেলে যাতায়াত করে না। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর যাত্রী যাঁরা অনেক সময় সখ করেও রেলে ভ্রমণ করে থাকেন, তাঁদের সংখ্যা কমে গিয়েছিল। সকলেই জানেন যে উচ্চ শ্রেণীর ভাড়া থেকে উচ্চশ্রেণীর গাড়ীগুলির উচ্চ ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীকেই সে ব্যয় ভারটা বহন করতে হয়। সেই জন্যই বোধ হয় তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়াটা কমান রাজস্ব-সচিব সমীচীন মনে করেন নি। এবার রেলওয়ে গবর্ণমেণ্টের খাস সম্পত্তি হলেও অনুমান করা হয়েছে আয় কমে যাবে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা।

আবকারীর আয়টা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ আফিঙকেও আবকারীর মধ্যেই ধরা হয়, কিন্তু বজেটে ইনি স্বতন্ত্র। সুতরাং এ প্রবন্ধেও এঁকে স্বতন্ত্র স্থান দেওয়া হবে। ১৯২২-২৩ সালে মদ ও গাঁজার জন্য

যুক্তপ্রদেশ দিয়েছিল মাথা পিছু	.	...	।/০ আনা
বিহার-ওড়িষ্যা	...	...	।৶০
পঞ্জাব	...	...	॥০
মধ্য প্রদেশ	...	...	॥৵০
আসাম	...	...	৸০
মান্দ্রাজ	...	...	১৶০
বোম্বাই	...	...	২।৹

এই হার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অত্যন্ত অল্প। সকল প্রদেশেই আবকারীর আয় কমে গিয়েছিল। অসহযোগই এর প্রধান কারণ। এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অভিযোগ এই যে অসহযোগীরা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেছে যে গবর্ণমেণ্ট আবকারী বিভাগের রাজস্বের অনুরোধেই মদ-গাঁজার চাহিদা বাড়িয়েছেন; এই রাজস্বটা যদি গবর্ণমেণ্ট ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হন, তা' হলে মদ-গাঁজা দেশ থেকে একেবারে উঠে যেতে পারে। গবর্ণমেণ্ট বলেন, মদ-গাঁজা ত দেশের লোকে খাবেই, তা কিছুতেই নিবারণ করা যাবে না; আর অল্প-স্বল্প খেলেও যে বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় তা' নয়। গবর্ণমেণ্ট এর জন্য মেডিকেল সার্টিফিকেটও নিয়েছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নীতি হল এই যে মাদক দ্রব্যগুলির ব্যবহার থাকবে, তবে চেষ্টা করা হবে যাতে ব্যবহারের পরিমাণ খুব কম হয় অথচ তা' থেকে রাজস্বটা খুব বেশী হয়—Maximum of revenue with minimum of consumption

মদের আয় সম্বন্ধে ইংরেজের একটু জাতিগত বিশেষত্ব আছে। গ্লাডষ্টোন যখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী, তখন সেখানকার জাতীয় ঋণ অত্যন্ত অধিক। এই ঋণটা ইংরেজরা মদ খেয়েই শোধ দিয়েছিল—এত মদ খেয়েছিল এবং তার জন্য এত মদের কর দিয়েছিল যে জাতীয় ঋণ পরিশোধ করবার জন্য অন্য করের আবশ্যক হয় নি। তাই তখনকার রাজস্ব মন্ত্রী মিঃ লো (Lowe) বলেছিলেন "The nation has drunk itself out of (national) debt" (The National Budget by A. J. Wilson, P. 102) এ সম্বন্ধে Bastable তাঁর Public Finance নামক গ্রন্থে বলেন ইংলণ্ডের আভ্যন্তরিক রাজস্বের প্রধান আকর দেশের লোকের মদ্যপান। এই এক বাবদে বৎসরে ৩৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগ্রহ হয়। এর উপর যোগ করতে হবে আর ১০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা যা' বিদেশ থেকে আমদানী মদের উপর শুল্কস্বরূপ আদায় হয়। অর্থাৎ এক মদ থেকেই মোট আয় প্রায় ৪৫ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। পৃথিবীর আর কোন দেশে মদ থেকে এত আয় হয় না। সমস্ত রাজস্বের অনুপাতে ইংলণ্ডে এর পরিমাণ শতকরা ৩৮ টাকা; ফ্রান্সে এর পরিমাণ শতকরা ২০ টাকা, জারমানিতে ১২ টাকা, ইটালীতে এরূপ শুল্ক নাই বললেও হয়। কাযেই ভারতীয় রাজস্বেও যে তাঁদের এই রাজস্বটার উপর বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আফিঙ—১৯২৩-২৪ সালে এ থেকে আয় হয়েছিল ৪ কোটি ২৪ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা, ১৯২৪-২৫ সালে ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ এবং বর্ত্তমান বর্ষে ধরা হয়েছে ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ ৮৫ হাজার। এই হ্রাসের প্রধান কারণ হেগ আন্তর্জাতিক সমিতির মীমাংসা (The Hague International Convention). কিন্তু অনেক বিদেশ সন্দেহ করেন যে হেগের মীমাংসা ইংলণ্ড ঠিক মেনে চলেন নি। ভারতীয় আফিঙ ইংলণ্ড না কি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত চীন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে পাঠিয়ে থাকেন। এই সন্দেহ নিরসন করবার জন্য বিষয়টা জাতি-সংঘের (League of nations) সভায় উপস্থিত করা হ'য়। এই সভা প্রস্তাব করেন যে একটা অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করা হ'ক। ঔষধের জন্য এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদির জন্য ঠিক কি পরিমাণ আফিঙ আবশ্যক, এই কমিটি তার নির্দ্দেশ করে দেবেন এবং লীগের সেই নির্দ্দেশ অনুসারে আফিঙ-উৎপাদক দেশে আফিঙ চাষের পরিমাণ অবধারিত হবে।

কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরা এর প্রতিবাদ করলেন, বললেন যে অনেক দেশে শত শত বৎসর থেকে আফিঙ খাওয়া একটা সামাজিক আচারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সুতরাং যতটুকু আফিঙ ঔষধার্থে বা বিজ্ঞানার্থে আবশ্যক তার অতিরিক্ত আফিঙ উৎপন্ন করতে পারা যাবে না এমন বাঁধাবাঁধি নিয়ম হতে পারে না। এই প্রতিবাদের সমর্থনের জন্য তাঁরা সত্যমিথ্যা অনেক যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁরা বলেন, আফিঙ খাওয়াতে যে কেবল মস্তিষ্কটা বিকৃত হয়, বুদ্ধিটা জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং শরীরটা পরলোকের পথে এগিয়ে যায়, তা নয়। এ সকল সাধারণ অজ্ঞ লোকের কথা, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের মত নিয়েছেন; রয়াল কমিশনও বসিয়েছেন (Royal Commission of 1895). এই কমিশন বলেন, অল্প পরিমাণে আফিঙ খেলে কোন অনিষ্ট হয় না এবং তাতে আয়ুর হ্রাসও হয় না। জীবন বীমা কোম্পানিরা আফিঙ খাওয়ার জন্য বেশী প্রিমিয়ম নেয় না। বরং আফিঙ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি অনেক রোগ থেকে শরীরকে রক্ষা করে। সাধারণ লোকের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে প্রৌঢ় বয়সে আফিঙ শরীরের পক্ষে হিতকর। Sir Charles Havelockও এ মতের সমর্থন করেন। তিনি আরও বলেন একটু মদ্যপানের চেয়ে একটু অহিফেন-সেবন বেশী অনিষ্টকর নয়। আফিঙ-খাওয়া উঠিয়ে দেওয়া উচিত কি মদ্যপান নিবারণ করা উচিত—যদি এই সমস্যা সমুপস্থিত হয়, তা'হলে Sir Charles Havelock আফিঙ-খাওয়া বজায় রেখে মদ খাওয়া উঠিয়ে দেবার পক্ষপাতী। ডাক্তার A. Powell সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে তিনি ৪৭০০ পাগলের চিকিৎসা করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে এমন একজনও পান নি যে আফিঙ খেয়ে পাগল হয়েছে। পুলিস রিপোর্ট বিচারালয়ে প্রমাণরূপে অগ্রাহ্য। কিন্তু যে ব্যাপারে রাজস্বের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় তাতে পুলিস রিপোর্টকেও ছাড়া যায় না। এই

বিষয়ের জন্য তাই পুলিস রিপোর্টও গবর্ণমেণ্ট ছাড়েন নি। রিপোর্টটা এই যে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বোম্বায়ের পুলিস কমিশনর এবং ডেপুটি কমিশনরগণ আফিঙ খেয়ে পাগল হয়েছে বা আফিঙের প্রভাবে কোন অপরাধের কায করেছে এমন একটি লোকও পান নি। Sir T. Carey Evans রয়াল কমিশনে সাক্ষ্য দেবার সময় বলেছেন যে তাঁর ১৫ বৎসরব্যাপী ভারতীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে আফিঙ-খাওয়ার সঙ্গে কোন দুর্নীতির কায কখন দেখেন নি, বরং তিনি দেখেছেন যে মদ খেলে প্রাচ্যদেশের লোকের নৈতিক অবনতি হয়। চীন দেশের লোককে আফিঙ-গুলি-চণ্ডু-খোর করে তুলেছেন বলে ইংরেজের শত্রুরা যে অপবাদ দেয়, সে সম্বন্ধে Dr. H. Harold Scott তাঁর দু' বৎসরব্যাপী চৈনিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে বলেন যে গুলি বা চণ্ডু খেলে মানসিক শক্তির হ্রাস হয় না। তিনি যত অবস্থাপন্ন চীনে ভদ্রলোক দেখেছেন তারা সকলেই খুব কাজের লোক, সুনীতিপরায়ণ এবং কখন কথার খেলাফ করে না। এর পরেও একজন বিশেষজ্ঞ পাওয়া গিয়েছিল—J. W. Scharff—যিনি বলেছিলেন যে চীনদেশ থেকে আফিঙ উঠিয়ে দিলে তার চেয়ে বেশী মারাত্মক আর এক বিষ, সুরা, (a more deadly drug viz alcohol) তার স্থান অধিকার করবে।

এই সকল মতের বিরুদ্ধে অন্যমতও আছে। Dr. G. W. Guinness নামক একজন মেডিক্যাল মিশনরী ২৭ বৎসর চীনদেশে বাস করেছিলেন। তিনি বলেন তিনি চীনা গুলিখোরকে আফিঙের জন্য স্ত্রী-পরিবার বিক্রী করতে দেখেছেন। ইংরেজ বহুমতের পক্ষপাতী, সুতরাং তিনি উপরি লিখিত বহুমত গ্রহণ করে International Opium Conventionএর জেনিভা অধিবেশনের প্রতিবাদ করেছেন।

এই প্রস্তাবটা উপস্থাপিত হয়েছিল আমেরিকার অনুরোধে। ১৯২০ সালে ইউনাইটেড ষ্টেট্সে মদ প্রস্তুত ও বিক্রী করা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার ফলে সেখানে মরফিয়া, কোকেন প্রভৃতি আফিঙ থেকে প্রস্তুত নানাপ্রকার মাদকদ্রব্যের প্রচলন খুব বেড়ে গিয়েছে। আমেরিকা সন্দেহ করে যে ইংরেজই ভারতবর্ষ থেকে এই আফিঙ সেখানে পাঠিয়ে দেয়। ইংরেজ এই অপবাদের প্রতিবাদ করে বলে যে মরফিয়া, হিরোইন (heroin) কোকেন প্রভৃতি বিষময় মাদকদ্রব্য ভারতবর্ষ আমেরিকায় পূর্ব্বেও কখন পাঠায় নাই, এখনও পাঠায় না। এর মধ্যে বিশেষ করে দেখবার বিষয় এই যে যে-সকল মাদকদ্রব্য পাঠান হয় না বলে ইংরেজ বড় গলা করে গর্ব্ব করেছেন আফিঙ তার মধ্যে নাই। যা'হক, এইরূপ নানা গোলযোগে ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সচিব এবারকার বজেটে আফিঙের আয় ধরেছেন ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ ৮৫ হাজার অর্থাৎ গত বৎসরের চেয়ে ১২ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা কম।

আবকারী বিভাগের আয়সম্বন্ধে আর একটা সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য কথা আছে। গবর্ণমেণ্ট বলেন (India in 1923-24) আবকারী বিভাগ এখন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হস্তান্তরিত বিষয়ের

মধ্যে এবং দেশীয় মন্ত্রীদের কর্ত্তৃত্বাধীন, তাঁরা ইচ্ছা করলে মাদক দ্রব্যের উপর খুব গুরুতর কর স্থাপন করতে পারেন। তাঁরা আরও বলেন যে আফিঙের ব্যবহার ভারতবর্ষীয়েরা ইচ্ছা করলেই যথেচ্ছ কমিয়ে দিতে পারেন। সে বিষয়ে ভারতবর্ষীয়দের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। এর উপর মনের মধ্যে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে "সত্যই নাকি? তবে মন্ত্রীরা তা করেন নি কেন?"

বজেটটা একটা বৃহৎ সাম্রাজ্যের। সুতরাং ব্যয়ের অঙ্কগুলাও আয়ের অঙ্কের মত কোটি বা লক্ষের নীচে বড় একটা নামে না। এদিকে আমরা এত দরিদ্র যে অত বড় বড় অঙ্ক আমরা ধারণাই করতে পারি না। আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি "সে ক' কুড়ি?" তাই বোঝাবার সুবিধার জন্য খরচের প্রত্যেক টাকাটার কত অংশ কিসে ব্যয় হয় নীচে তার একটা তালিকা দেয়—

(১৯২২-২৩ সালে) সামরিক বিভাগের ব্যয় এক টাকার এক শ' অংশের ৩৩ অংশ

রেলওয়ে	১২	"
বিচার, পুলিস, জেল	৯	"
সাধারণ ঋণ (সুদ, বাটা ইত্যাদি)	৮	"
শাসন	৫	"
পূর্ত্ত	৫	"
শিক্ষা	৫	"
রাজস্ব সংগ্রহ	৩	"
বন	২	"
জলসেচন	২	"
সাধারণ স্বাস্থ্য	২	"
অন্যান্য	১৪	"
	১০০	"

সব চেয়ে বড় বলে সামরিক ব্যয়টিকেই শীর্ষস্থান দেওয়া হল। ১৯২৪-২৫ সালে এটি ছিল—

ভারতবর্ষের ভিতর	৪৫,৯১,৬০,০০০
ইংলণ্ডে (ভারতের জন্য সৈন্যসংগ্রহ, তাদের শিক্ষা ইত্যাদিতে)	১০,৬৩,৩৯,০০০
ইংলণ্ডে যা' ব্যয় হয়, তার বাটা	৩,৯৪,৯৭,০০০
মোট	৬০,৪৯,৯৬,০০০ টাকা মাত্র

বর্ত্তমান বৎসরে (১৯২৫-২৬ সালে) আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে—

ভারতবর্ষের ভিতরে	৪৬,৭৪,৫৬,০০০
ইংলণ্ডে	১০,১৩,৭৯,০০০
বাটা	৩,৩৭,৩০,০০০
মোট	৬০,২৬,১৭,০০০ টাকা মাত্র

১৯২৩-২৪ সালে এই ব্যয় হয়েছিল ৬১,০৪,৩২,০০০৲ ; সুতরাং ১৯২৪-২৫ সালের ব্যয় হয়েছিল এর চেয়ে ৫৪,৩৬,০০০ চুয়ান্ন লক্ষ ছত্রিস হাজার কম ; আর বর্ত্তমান বৎসরে হবে ২৩,৭৯,০০০ তেইস লক্ষ উন-আশী হাজার কম। ইঞ্চকেপ কমিটি যে সাড়ে দশ কোটি টাকার খরচ কমাতে বলেছিলেন তার মধ্যে ১৯২৪-২৫ সালে কম করা হয়েছে, ২,৫০,০০,০০০, আর এবৎসর আশা করা যাচ্ছে কম হবে ২৩,৭৯,০০০ টাকা। এই হিসাবে চললে ইঞ্চকেপ কমিটির প্রস্তাবিত সাড়ে দশ কোটি টাকা কমাতে কত দিন লাগবে ? ততদিন পৃথিবীতে শান্তি থাকবে ত ?

সাধারণ শাসনবিভাগের ব্যয় ১৯২৩-২৪ সালে হয়েছিল		৯,৩৩,৯৭,০০০
	১৯২৪-২৫ সালে	১০,২৬,৮৭,০০০
	বেশী	৯২,৯০,০০০ টাকা মাত্র।

১৯২৫-২৬ সালে অর্থাৎ বর্ত্তমান বৎসরে হবে ১০,৯৭,৯৮,০০০ অর্থাৎ ১৯২৩-২৪ সালের খরচের চেয়ে বেশী ১,৬৪,০১,০০০৲ টাকা ; বজেটে এই বৃদ্ধির কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় নি ; কিন্তু অনুমান করলে অন্যায় হবে না যে এটা লী-কমিশনের অনুগ্রহে সিভিলিয়ান কর্ম্মচারীদের বেতনবৃদ্ধির ফল। ইঞ্চকেপ কমিটি এই বিভাগে ৫০ লক্ষ টাকার খরচ কমাতে বলেছিলেন।

ভারতবর্ষীয় কৃষিবিভাগ সাধারণ শাসনবিভাগের মধ্যেই, এর ব্যয় কিন্তু কম করেই ধরা হয়েছে। সম্ভবতঃ এই বিভাগ এবং এইরূপ দু'একটা অন্য অনাবশ্যক বা অল্পাবশ্যক বিভাগের ব্যয় না কমালে সিভিলিয়ানপ্রধান অন্য বিভাগের ব্যয় বাড়ান যায় না। ইঞ্চকেপ কমিটির সুপারিসও এই ব্যয়হ্রাসের জন্য কতকটা দায়ী। কৃষিবিভাগের ব্যয় ছিল ১৯২৩ ২৪ সালে ২৩,৭০,৮০০৲ টাকা ; ১৯২৪-২৫ সালে ধরা হয়েছিল ৩১,৪৭,০০০৲, আর এ বৎসর (১৯২৫-২৬) ধরা হয়েছে ২৮,১১,০০০ টাকা অর্থাৎ ১৯২৪-২৫ সালের চেয়ে ৩,৩৬,০০০ টাকা কম। এর মধ্যে একটি বিষয় সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য আছে। কৃষিটা হবে ভারতবর্ষে কিন্তু এর জন্য বিলেতে খরচ হবে ১,৫৪,০০০ টাকা আর তার বাটা দিতে হবে ৫১,০০০ একান্ন হাজার টাকা। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় কৃষির গুরুত্ব যে গবর্ণমেন্ট বোঝেন না, তা' নয়। গবর্ণমেণ্ট জানেন যে প্রতি চার জন ভারতবাসীর মধ্যে তিন জন কৃষিজীবী ; সেই কৃষিজীবীর এমন আর্থিক সামর্থ্য নাই যে সে ক্ষেতে ভাল করে চাষ দেয়, সার দেয় বা আবশ্যক হলে জল সেচন করে। গবর্ণমেণ্ট এ কথাও বলেন যে এ দেশে বৈজ্ঞানিক কৃষিকর্ম্মের জন্য যে অর্থের আবশ্যক গবর্ণমেণ্ট তা দিতে পারেন না। সেই জন্য ভারতীয় কৃষির শ্রাদ্ধটা তিলকাঞ্চনেই মারতে হয়। পুষাতে যে ভারতীয় কৃষিবিভাগ আছে তার বাৎসরিক ব্যয় ন' লক্ষ টাকা, আর প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি সকলে মিলে ব্যয় করেন ১৫ পনর লক্ষ টাকা অর্থাৎ একার প্রতি বাৎসরিক অর্দ্ধ আনা মাত্র। (India in 1923-24).

স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যয়টাও কমান হয়েছে। ১৯২৩-২৪ সালে এই বিভাগের ব্যয় হয়েছিল ১১,৪৭,০০০ টাকা; ১৯২৪-২৫ সালে ১৩,৭৭,০০০ অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে ২,৩০,০০০ দু' লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা বেশী। কিন্তু তার পর বৎসর অর্থাৎ বর্ত্তমান বৎসরে হঠাৎ এই বৃদ্ধির স্থানে হ্রাস হয়ে গেল ৬৫,০০০ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা। এ বৎসরের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ১৩,১২,০০০ তের লক্ষ বার হাজার টাকা। পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট প্রায় হতাশ। গবর্ণমেণ্ট বলেন এ দেশের পল্লীগ্রাম মানে একটা গোবরের ঢিবির উপর কতকগুলা অস্বাস্থ্যকর কুটীর—"a collection of insanitary dwellings situated on a dung-hill." (India in 1923-24)

শিক্ষা—এ বিভাগটি এখন হস্তান্তরিত বিষয়ের মধ্যে। প্রাদেশিক শিক্ষা এখন প্রাদেশিক মন্ত্রীদের অধীন। মন্ত্রীরা কিন্তু অর্থের জন্য সপারিষদ গবর্ণরের অধীন। ইউরোপীয়দের শিক্ষা এবং শিক্ষা বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারীদের (I. E. S.) বেতন ইত্যাদি ভারতগবর্ণমেণ্টের অধীনেই আছে। আর, ভারতগবর্ণমেণ্টই হন, আর প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টই হন, অর্থের অনটন সকলেরই। কাযেই শিক্ষা বিভাগেও আবশ্যক-অনুযায়ী বা ইচ্ছা-অনুযায়ী উন্নতি হয় না। এ দেশে উন্নতির প্রধান অর্থ বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের বিশেষতঃ উচ্চ কর্ম্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি। যা'হক, ভারতগবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কিছু উন্নতি করেছেন। ১৯২৩-২৪ সালে এই বিভাগের ব্যয় ছিল ৩০ লক্ষ ৬১ হাজার; ১৯২৪-২৫ সালের ব্যয় ৩১ লক্ষ ৯৪ হাজার—পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে একলক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা বেশী। এ বৎসর (১৯২৫-২৬) ধরা হয়েছে ৩২,৮৮,০০০ বত্রিস লক্ষ অষ্ট-আশী হাজার টাকা পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে ৯৪ হাজার টাকা বেশী। পূর্ব্বেই বলেছি এটা কেবল ভারতগবর্ণমেণ্টের ব্যয়। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ব্যয় স্বতন্ত্র। কিন্তু তাঁদেরও অবস্থা স্বচ্ছল নয়। সুতরাং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শিক্ষার অবস্থার চিত্র এইরূপ—
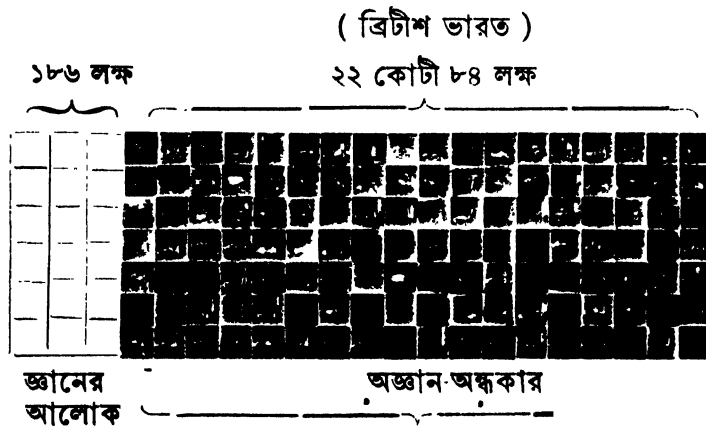
(ব্রিটীশ ভারত)

ব্রিটিশ ভারতের লোক সংখ্যা ২৪ কোটি ৭০ লক্ষ, তার মধ্যে নিরক্ষর ২২ কোটি ৮৪ লক্ষ এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত ১ কোটি ৮৬ লক্ষ। প্রত্যেক সাদা চৌকায় ১০ লক্ষ। এই শিক্ষাপ্রাপ্তের

মধ্যে শতকরা তিনজন প্রাথমিক পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্ত করে এবং তার পর আর কখন লেখাপড়ার চর্চ্চা করে না। কাযেই তারা পুনর্মূষিক হয়ে নিরক্ষরের দল বৃদ্ধি করে।

কিন্তু দেশের এই অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্নতার কারণ কি? কারণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বলেন জনসাধারণের দারিদ্র্যই প্রধান। আর একটি কারণ গবর্ণমেণ্টের অর্থের অনটন। শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের ব্যয় ২০ কোটি টাকারও কম; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বলেন এটা অন্য দেশের তুলনায় নিতান্ত নিন্দনীয় নয়। গবর্ণমেণ্টের কথা—"Compares not unfavourably with proportions devoted by other lands to the same purpose." (India in 1923-24) কিন্তু এ কথার সমর্থনের জন্য অন্য দেশের কত ব্যয় হয় তার কোন উল্লেখ নাই। নিম্নের তালিকায় সেই অভাব পূরণ করবার চেষ্টা করা হ'ল :—

	লে প্রতি ব্যয়		লোক প্রতি ব্যয়
ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে ...	১২ টাকা	বেলজিয়মে	৪৲
সুইট্‌জারল্যাণ্ডে	১০।০	নরওয়েতে	৩৮/০
অষ্ট্রেলিয়াতে	৮।৶০	ফ্রান্সে	৩।৵০
ইংলণ্ডে	৭॥০	অষ্ট্রিয়ায়	২।/১০
কানাডায়	৭।/০	স্পেনে	১।৵০
স্কটলণ্ডে	৭।০	ইটালীতে	১৶০
জারমানিতে	৫৵০	সার্ভিয়ায়	৮৵০
আয়ারল্যাণ্ডে	৪৮/০	জাপানে	৮৵০
হল্যাণ্ডে	৪৸০	রুশিয়ায়	।৶১০
সুইডেনে	৪৶০	**ভারতবর্ষে**	/০ এক আনা মাত্র

(From the speech of G. K. Gokhale delivered on 16th march 1911 in the Imperial Legislative Council)

উচ্চ শিক্ষায় ১৯০১-২ সালে মোট ব্যয় হয়েছিল ২৫ লক্ষ ৭০ হাজার, তার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট দিয়েছিলেন ৮ লক্ষ ৯৬ হাজার। এই সময়ে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য সেখানকার গবর্ণমেণ্টের ব্যয় হয়েছিল ২৩, ৩৪, ০০০ তেইস লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা। একা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয় ১,২০,০০০ একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। ১৯০৩ সালে বার্লিন-বিশ্ববিদ্যালয়কে তার গবর্ণমেণ্ট দিয়েছিলেন ২, ৫০, ০০০ দু' লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা, আর টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়কে জাপান গবর্ণমেণ্ট দিয়েছিলেন ১৯, ৪৫, ০০০ উনিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। এ অঙ্কগুলি কিছু পুরানো, আজ কাল আমাদের গবর্ণমেণ্ট অবশ্য অনেক বেশী দিচ্ছেন, কিন্তু তুলনায় অন্য দেশও ততোধিক বেশী দিচ্ছেন।

গবর্ণমেণ্ট লোকশিক্ষার উপকারিতা অবশ্য বেশই বোঝেন। দেশ মূর্খ থাকলে, গবর্ণমেণ্ট বলেন "the masses of the population must continue poor and ignorant, the women-folk must remain for the most part consumers rather than producers adding little either to intellectual or to moral wealth ; the progress of sanitation and the conquest of disease must be indefinitely post-poned' (India in 1923-24)

এর মধ্যে একটী কথা সবিশেষ দ্রষ্টব্য আছে—আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা না পেলে আমাদের ধনস্থানে শনি হয়েই থাকবেন। দেশের শিক্ষাকার্য্যে স্ত্রীলোকের সহায়তা সম্বন্ধে ঐ পুস্তকের লেখক অধ্যাপক Rushbrook Williams বলেন, পাশ্চাত্য দেশে নারীর সহায়তা ভিন্ন জনশিক্ষা সম্ভব হয়নি "No western country has found it possible to carry through a mass programme of popular education without the employment of a predominant proportion of women-teachers." এ কথাগুলিও আমাদের সবিশেষ প্রনিধান যোগ্য।

এই আয় ব্যয় আলোচনা উপলক্ষ্যে ভারতীয় assembly এবং প্রাদেশিক কৌন্সিল অরণ্যে দেশের প্রতিনিধিরা যথারীতি সাম্বৎসরিক রোদন করেছেন এবং বাকী সমস্ত কথাই বলেছেন। তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

১৩৩২　　　　শ্রী হৃষীকেশ সেন

তুফান ও তৈল

(গল্প)

দুই বোন্, শশী আর শ্যামা—

দুইবোনে মোটে মিল নাই, যেন শিরীষ কাগজের দু'পিঠ।

গর্‌মিলের ব্যূহ শ্যামাই ভাঙ্গিতে গিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। গর্‌মিলের কোনোটা বিদ্ধ করে, সূঁচের মত ; কোনোটা কাটে, ক্ষুরের মত ; কোনোটার ভাঙ্গাই কেবল কাজ—গদার মত। অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া শ্যামা ফিরিয়া আসিয়াছে।—গোঁজামিলের কাজ নয়।

শশী বড়, শ্যামা ছোট ; শশী সধবা, শ্যামা বিধবা—শিশুকাল হইতে ; শশীর স্বামী উপার্জ্জন করে, শ্যামা তারই অংশ খায়।—এ ত' বাহিরের গরমিল ; ভিতরের গরমিল আরো ঘোরাল' আর জোরাল' ; শশী তরল, শ্যামা গাঢ়, কঠিনের কাছাকাছি।.........

রূপ দুইবোনের নাই বলিলে অস্বীকার করা হয়, আছে বলিলে বাড়াইয়া বলা হয়; নাই আর আছের মাঝামাঝি দু'জনেই চলনসই; তবে শ্যামার বয়সের পুলকটুকু দেহে যেন আছে।......

দুলালহরি মুখ বুজিয়া এই গরমিলের ঘরে থাকে।

জলে ঢিলটি পড়িলে ঢিলের উদ্দেশ পরমুহূর্ত্তেই থাকে না, কিন্তু জলের ঢেউ যেন আর থামিতে চাহে না।......শশী ঠিক্ তেম্‌নি—কিছু একটা টুপ্ করিয়া পড়িলেই হয়, অম্‌নি শশীর ঢেউ চলিতে থাকে, ছোট বড় অসংখ্য; কোথায় যাইয়া সে-ঢেউ তট ভাঙ্গিতেছে তাহা সে চাহিয়াও দেখে না।......

শ্যামা বলে,—দিদি, কি রাঁধ্‌বে' এ-বেলা, বলো, গুছিয়ে দি।

শশী বলে,—রোজই কি শেখাতে' হবে?

শ্যামা হাসিয়া বলে,—গিন্নি যে তুমি। না শুনে'—

শ্যামার মুখের কথা ঐ-পর্য্যন্তই রহিয়া যায়; অম্‌নি শশীর ঢেউ চলিতে থাকে। বলে,—যার যেমন কপাল; ভগবান্ দশজনের ওপর গিন্নিপণা ক'র্‌তে দিয়েছেন, কর্‌ছি; মানুষের তাতে বুক ফাট্‌লে' আমি কি ক'র্‌ব তার। শত্তুরের শাপে আমার সুখের সাগর শুকিয়ে যাবে না, তারই বুক জ্বল্‌বে'; ভগবান যেদিন নারাজ হ'য়ে সুখ কেড়ে' নেবেন সেই দিনই যাবে, তার একটি দিন আগে নয়; কারুর কথায় তা' যাবে না—

—কি হ'লো গা তোমাদের? বলিয়া সুমুখের বাড়ীর ঝি আসিয়া দাঁড়ায়।

শশী বলে,—শুনেছিস্, বামা, কষ্টের কথা!—আমি যে আমার বাড়ীর গিন্নি তা' আবার কারু কারু প্রাণে সয় না! তোরা ত' দশ বাড়ী বেড়াস্—কারু মুখে শুনেছিস্ এমন অধর্ম্মের কথা?—

মুখ অত্যন্ত ব্যাজার করিয়া বামা ঘাড় নাড়ে—এমন অধর্ম্মের কথা সে ইতিপূর্ব্বে উচ্চারিত হইতে শোনে নাই।

শশী বলে,—তোরাই বল্, কে কারে দেয়, বাপু! দেনেআলা ঐ।—বলিয়া আকাশ দেখায়। বলে,—একমাত্তর ঐ উনি। যার কপালে যেমন লিখেছেন সে তেমনি সুখে আছে। একটা লোক বিয়ে করে' এনেছে, সুখে রেখেছে, ছেলের মা হয়েছি, গিন্নিপণা কর্‌ছি। ছেলের মা হওয়াও কি কম ভাগ্যির কথা?—কত মাগী আকাশ পাতাল তপ্ জপ্ ক'র্‌ছে একটি ছেলের জন্যে;—আমি ত' না চাইতেই কোলে একটি পেয়েছি। আর স্বামীর সোয়াগই কি সবারই অদেষ্টে থাকে!— এ ত' তোদেরও আহ্লাদের কথা'। বল্ দেখি, বামা, তুই-ই বল্, আমার কথা ঠিক্ কি না?

বামা বলে,—আহ্লাদের কথা নয় আবার! শত আহ্লাদের কথা। একটু দুধ দেবে, বৌঠাক্রুণ ; বাবুর চায়ের দুধ—

শশী বলে,—দে, বাটিটা দে।

ঝি দুধ লইয়া চলিয়া যায়।

শ্যামা নিজের কাজ করে।...

শশী গালে হাত দিয়া বসিয়া বলিতে থাকে,—এত অসহ হ'য়ে থাকে এই মাগীর গিন্নিপণা, যা না, বাপু, যেখানে গিন্নি হ'য়ে থাকৃতে পারিস্। 'এই ত' এসেছিল ঝি মাগী—দুধ চাইলে কার কাছে?—এই মাগীর কাছেই ত, আর কারু কাছে ত' চাইলে না; ছিল ত' আর সবাই—

তুল্সী আসিয়া বলে,—মাসি, খেতে দাও, ক্ষিদে পেয়েছে।

শ্যামা বলে,—আমি কাজে আছি, তোর মার কাছে চা। বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসে।

তুল্সী বলে,—মা কার সঙ্গে ঝগ্ড়া কর্ছে যেন। তুমিই ওঠো।

শ্যামা বটি ছাড়িয়া ওঠে।

শশীর ঢেউ চলে,—আমি ত' দিনরাত ঝগ্ড়াই করি—আমার ঝগ্ড়ারই মুখ। মানুষের কথার বিষে যার বেহ্মাণ্ড জ্বলে সে-ই জানে ঝগ্ড়া আসে কি না।

একটু থামে।.........

আবার বলে,—নিয়ে গেল দুধ ছটাক্ খানেক। এই মাগ্যি দুধ, গরুটা না থাকৃলে পয়সা দিয়ে কিনেই ত' খেতে' হ'ত।......বলুক দেখি লোকে, একাদশীর দিন আমি দই পেতে' রাখি কি না; বলি, বুক শুকিয়ে থাকৃবে, পেতে রাখি একটু দই, জিউ ঠাণ্ডা হবে পেটে গেলে।—সেটা ত' এই চক্ষুঃশূল গিন্নিই করে, না পাড়ার আর কেউ এসে করে।—

তুল্সী মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে বলে,—একদিন ত' পেতেছিলে সেই কবে, আমাদের দিলে, নিজে খেলে, মাসীর জন্যে একটুখানি উদোষ্ ফেলে' রেখেছিলে তা' বেড়ালে খেয়ে' গেল।

ঘরের ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়া অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিয়া শশী বলে,—মিথ্যেবাদী বেইমান্ ছোঁড়া, দূর হ' এখান থেকে।

ছোঁড়া দূর হয় না, হাসে। শ্যামা তার গাল টিপিয়া দেয়।

পাশের বাড়ীর মেয়েটা আসিয়া বলে,—কাকীমা, চার্টি বড়ি দাও, মা চাইলে।

শশী বলে,—চাও ঐ গিন্নির কাছে, ভেতরে আছেন; আমি কিছু জানিনে এ-বাড়ীর। বলিয়া আরো আঁটিয়া বসে।

মেয়েটি ঘরে ঢুকিয়া বলে,—মাসি, বড়ি দে।

বড়ি লইয়া সে চলিয়া যায়।

শশী বলে,—আমি এই দিব্যি করলাম যদি সংসারের কোনো কথায় আমি থাকি। যাক্ সংসার উড়ে পুড়ে......

পরক্ষণেই বলে,—দুধ দাও, বড়ি দাও, এ কি রে বাপু সকাল থেকে। আর একজনের আবার গিন্নিপণা করা হ'ল, আমায় না দেখিয়েই বড়ি দান করা হ'ল। এ মাগী কোথা-কার কে! বলে, নেপো' মারে দই। আমি যেন হ'য়েছি ঠাট্টার মানুষ—কাজের বেলায় বুড়ো আঙ্গুল, মুখে গিন্নি গিন্নি করে' ঠাট্টা করা হয়! আসুক্ সে, আমি তাকে বল্‌ব খালি এই কথাটি যে, তোমার সংসার ভূতে লুঠে' খাক্, জা'ন্নমে যাক্, শেষে আমায় কিন্তু দুষী ক'র্‌তে পার্‌বে না···

শ্যামা বলে,—দিদি, আঁচ ব'য়ে যাচ্ছে।

শশী বলে,—বড়ি ত' নিখর্‌চায় আস্‌মান থেকে আসেনি, কারু শ্বশুরবাড়ী থেকে তত্ত্বও আসেনি' হাঁড়ি ভরে' যে জিজ্ঞেসা নেই বাদ নেই মুঠো ভরে' দিয়ে দে'য়া হল আপন হাতেই। দশটা দিলে কি বিশটা দিলে কি পঞ্চাশটা দিলে তা' একবার এ-মাগীকে দেখিয়ে দিলে কি অপরাধটা হ'ত তা' কেউ বলুক ত আমাকে। আমি ত' একেবারে মরিনি'—আগে মরি তারপর এ সংসার লুটের মহাল করিস্—

তুলসী জল খাইয়া গ্লাস্ নামাইয়া বলে, মাসী বড়ি দেয়নি, বাঁ হাতে করে' হাঁড়ি থেকে তুলে' আমি দিয়েছি, সাতটা।

বলিয়া খেলিতে যায়।

শশী বলিতে থাকে,—মানুষকে নাহাতক্ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রলেই হয় না, বুকের পাটা থাকা চাই। কই, আমার বড়ির হাঁড়িতে হাত দিতে ত' কারু সাহস হ'ল না; নিজের জিনিষ হ'ত, হাত দিতে, বিলিয়ে দিতে, ভিখিরী বোষ্টম্ মুচি-মেথরকে দিয়ে খাওয়াতে—কার বাঁ পায়ের গরজ পড়ত কথা কইতে। রোদে পুড়ে পুড়ে—

অন্য ঘরে দুলালহরির পায়ের আওয়াজ হয়, শশী দৌড়াইয়া যায়; নালিশ করে,—শুনেছ, আমার গিন্নিপণা আর একজনের সইছে না—

দুলাল বলে,—কার?

—কার আবার, তোমার শালীর। ভাঁড়ারের চাবিটি তাঁর চাই, সেই মতলবে ফির্‌ছেন। যে-রকম বাড়ন্ত নোলা দেখ্‌ছি, কবে তোমাকেই—

তাড়াতাড়ি জিব কাটিয়া দুলাল বলে, ছি ছি। জিব্‌টার একটু ইয়ে নেই তোমার।

শশী বলে,—দেখনা তা-ই। সকালবেলা পরমেশ্বরের নাম না নিতেই ঝগ্‌ড়া বাধিয়ে নিলে—

—মিছিমিছি?

—আমি কাঠি দিতে যাইনি। সব খুইয়ে আমার কাঁধে পদস্তর করে' বসেছেন, এখন গিন্নি হয়ে বস্‌বার সাধ হ'য়েছে। নাম হিষ্টু কিচ্ছু নেই—শুধু মুখের কথাটা বলেছি, গুছিয়ে দে, শ্যামা, রান্না চড়াই। কথা ত' এই—বলেছি কি না বলেছি, সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে যেন মারমুখী হ'য়ে উঠ্‌ল। ব্‌ল্‌লে, নাওনা তুমি, গিন্নি হয়েছ। শুন্‌লে কথার ধরণটা!—

দুলাল বলে,—শুন্‌লাম। ভারি অন্যায় ত'। তুমি কি ব'ল্‌লে?

শশী বলে,—কি আর ব'ল্‌ব বল; শুনে আমি একেবারে অবাক্। যা' বল্‌ছি তোমার কাছেই। শুন্‌বে আসল কথাটা?

— বল, শুনি।

—আমাদের ও হিংসে করে—

চম্‌কিয়া দুলাল বলে,—সে কি!

শশী বলে,— ঠিক্ তা-ই। আমি মানুষ চিনিনে! নিজের সাধ আহ্লাদ ত জন্মের মত ফুরিয়েছে; আমরা সাধ আহ্লাদ কর্‌ছি দু'টীতে—

মর্ম্মাহত হইয়া দুলাল বলে,—তোমাকে তাড়াবে দেখ্‌ছি।

চোখ ঘুরাইয়া শশী বলে,—আমাকে? আমার ঘর থেকে তাড়াবে আমাকে? আমি-ই তাড়াব ও-কে চুলের ঝুঁটি ধরে, তবে আমার নাম—

দুলাল বলে,—শশী, কিন্তু তুলসী যে বল্‌লে, তুমি তার মাসীকে যাচ্ছেতাই বক্‌ছ!

তুল্‌সীর উদ্দেশে গর্জ্জন করিয়া শশী বলে,—হারামজাদা বেইমান্ ছেলে, এতবড় মিছেকথা আমার নামে লাগিয়েছে; শত্তুর পেটে ধরেছিলাম। আসুক সে হারামজাদা, তোমার সাম্‌নে তাকে শুধিয়ে তবে আমি বাসি মুখে জল দেব। পেটের ছেলে—এমন শত্তুর হ'ল! সৎমা ত' নই—আপন মায়ের নামে এমন কলঙ্ক দেয়, পেটের সন্তান!—

শশী কাঁদে।

দুলাল রাগিয়া বলে,—ব্যাটাকে পিট্‌তে হবে! কিন্তু আমার ত আর সহ্য হয় না। কেঁদ না তুমি। পাঠিয়ে দাও ত' গিয়ে শ্যামাকে। কথার একটা এস্পার্ ওস্পার্ এখনই হোক্। চট্‌পট্ যাও—আমার সকাল সকাল ভাত চাই কিন্তু।

চোখের জল মুছিয়া শশী রাঁধিতে যায়।

সগর্ব্বে বলে,—বলে' এলাম সব গুণের কথা। রেগে টং হয়ে গেছে। ডাক্‌ছে, একবার শুনে' এলে হ'ত দয়া করে'।

শ্যামা জড়সড় হইয়া শুনিতে যায়।

দুলাল বলে,—চেন ত' মানুষকে; চুপচাপ স'য়ে থেক'।

শ্যামা কথা কয় না ; লাল হইয়া ওঠে— একটুখানি হাসে।

দুলাল দুরু দুরু বুকে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যায়।

রান্নাঘরে শশী বলে, পাঁচটার ঘরে পড়িনি, বেশ আছি। কপালে লেখা ছিল—তাই স্বামি-সোয়াগিনী হ'য়ে সাধ-আহ্লাদ কর্‌ছি।......

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

বৌদ্ধ গানে কাহ্নুর রচনা

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মহম্মদ শহীদুল্লা সানুরাগে ভাষাতত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রকাশিত "বৌদ্ধ গান ও দোঁহা" গ্রন্থে যে সকল গান ও দোঁহা কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নুর নামে নামাঙ্কিত, সেগুলি আলাদা একখানি পুস্তিকায় ব্যাখ্যা ও টীকা প্রভৃতি দিয়া শহীদুল্লা মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। যেরূপ ব্যাখ্যায় গান ও দোঁহাগুলির আদৎ অর্থ প্রকাশ পায়, তিনি ইচ্ছা করিয়াই সেরূপ ব্যাখ্যা দেন নাই; কেবল ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া গান প্রভৃতিতে ব্যবহৃত শব্দগুলির বিচার করিবার জন্যই একটা টীকা লিখিয়াছেন। টীকার হিসাবে যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতেও ব্রীড়া ও জুগুপ্সাব্যঞ্জক কথা বাদ দিয়া মোটা মুটি বাহ্যিক অর্থ স্পষ্টতর করিয়া লেখা যাইতে পারিত; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই।

দৃষ্টান্ত স্বরূপে কাহ্নুর নামের বার নম্বরের চর্য্যাগানটি উল্লেখ করিতেছি। এ গানটিতে দাবাখেলার বর্ণনার ছল করিয়া যে নিগূঢ় কথা উক্ত হইয়াছে তাহার গায়ে হাত না দিয়া অনায়াসে দাবাখেলার কল্পনায় কি ভাবে পদগুলি রচিত হইয়াছে তাহা বলা চলিত; কিন্তু অধ্যাপক শহীদুল্লা তাহা না করিয়া এমনভাবে পদগুলির অর্থ লিখিয়াছেন, যাহাতে ভাষাতত্ত্ব শিখিবার লোকেরাও উহা পড়িয়া তেমন উপকৃত হইতে না পারেন। মূলের "করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅ বল" প্রভৃতির যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা এই:

"করুণা দূর করিয়া (আমরা) নয় বল খেলি। সদ্‌গুরু বোধে (আমরা) ভববল জিতিলাম। দুই দূরে যাউক। তুই ঠাকুরকে কিছুই দিস্‌ না" ইত্যাদি।

এরূপ অনুবাদে মূলকে অধিকতর অস্পষ্ট করা হইয়াছে,—আর গানটী যে কিরূপ কল্পনা ধরিয়া রচিত তাহা একেবারেই বোঝা যায় না। এইরূপ ব্যাখ্যায় ও টীকায় যে, ভাষাতত্ত্ব ধরিবার পথেও অনেক স্থলে গোল ঘটিয়াছে, তাহা দেখাইতেছি, কারণ, এরূপ সমালোচনা শ্রীযুক্ত শহীদুল্লার মত অকপট জিজ্ঞাসুর কাছে অপ্রীতিকর হইবে না।

চর্য্যার অন্যান্য গানগুলির মত এই দাবাখেলার উপমা দিয়া রচিত বার নম্বর গানটীতে

কথার শ্লেষে যে দুই-তিনটী করিয়া অর্থ সূচিত হইয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত শহীদুল্লা ঠিক বুঝিয়াছেন, মনে হইল; গানটীর সপ্তম ছত্রে যে শব্দের jingle-রূপ ধ্বনিতে দাবা খেলায় রাজাকে (এখানে ঠাকুরকে) "মাত" করিবার কথা আছে তাহা শহীদুল্লা মহাশয় স্পষ্ট বুঝিয়া ঐ ছত্রের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"মাত দ্বারা (আমরা) ঠাকুরকে পরিনিবৃত্ত করিলাম।" "মাত" শব্দটী যে নির্ভুল আরবী শব্দ তাহা যে শ্রীযুক্ত শহীদুল্লা কেন ধরিতে পারিলেন না, ইহা আশ্চর্য্য। মূলে দাবা খেলা খাঁটি ভারতবর্ষের বটে, কিন্তু মুসলমান যুগে ঐ খেলায় অনেক বিদেশী কথা ঢুকিয়াছিল; গজটি অনেক স্থানে "পিল" (আরবী "ফিল্"=হাতী) নাম পাইয়াছে, চতুরঙ্গ খেলার যে বলটি "রথ" ছিল তাহা নৌকা (কিস্তি শব্দের তর্জমায়) নাম পাইয়াছে, আর রাজাকে অচল করার নাম হইয়াছে "সাহ-মাত" (রাজার মৃত্যু) অথবা শুধু মাত; ইংরেজী Checkmate কথাতেও mate শব্দটি ঐ মাত হইতে হইয়াছে, কারণ ঐ খেলা আরবের পথেই ইউরোপে গিয়াছিল।

এখানে রাজাকে পরিনিবৃত্ত ও অবশ করিবার অর্থে মাত শব্দটির ব্যবহার হইতেই নির্ভুল রকমে বলা চলে যে এই বার নম্বরের গানটি কিছুতেই পঞ্চদশ শতাব্দীর আগেকার হইতে পারে না, কেননা উহার পূর্ব্বে বাঙ্গলা, ওড়িশা প্রভৃতিতে মুসলমানদের সঙ্গে সেইরূপ সামাজিকতা ঘটে নাই, যাহার ফলে দাবাখেলার মাত কথাটি লোকসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিত হইয়া প্রচলিত হইতে পারে। নিদান পক্ষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে যে ঐ শব্দের আমদানি হইতে পারে নাই তাহা অতি নিশ্চিত। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, যে সময়ে এ কালের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গভাষা ও ওড়িয়া ভাষা সম্পূর্ণ প্রচলিত হইয়াছে, এ গান সেই সময়ের লেখা, অথচ গানের ভাষার মূল কাঠামখানি এক সময়ের Obsolete বা মৃত ভাষায় লিখিত। পূর্ব্বে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহাতে বুঝাইয়াছি যে চর্য্যাগানের সহজিয়ারা তাহাদের সমাজের রীতি অনুসারে বা ফেশন অনুসারে বিস্মৃত যুগের ভাষায় গান রচনা করিয়াছে আর অনেক স্থলে বাধ্য হইয়া অতর্কিত ভাবে নিজের নিজের প্রাদেশিক শব্দ দু-চারিটী করিয়া গুঁজিয়াছে। স্বীকার করিতেই হইবে যে এ গান হালের লেখা আর উহার কাঠামে যে অতীত কালের প্রাকৃত বা অপভ্রংশ আছে, তাহা কোন রচয়িতার নিজের ভাষা নয়, আর সেই Obsolete ভাষাও ঠিক কবে কোন্ প্রদেশে ব্যবহৃত ছিল তাহা ধরিবার কোন উপায় এই চর্য্যাগানগুলির মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে না।

ঠিক খাঁটী একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের Obsolete ভাষায় যে, গানগুলির কাঠাম গড়া হয় নাই,—বিভিন্ন অতীত সময়ের বিভিন্ন ব্যাকরণের পদ যে একই গানে আছে, তাহা যে কোন গানের ভাষা পরীক্ষা করিলেই ধরা যায়। ধরুন, যে সময়ে কৃ ধাতুর অসমাপিকা ক্রিয়া 'করিয়া' হইয়াছিল সে সময়ে কিছু একই ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন যুগের ও ভিন্ন প্রদেশের পদগুলি

প্রচলিত থাকা অসম্ভব; একথা নিশ্চয়ই শহীদুল্লার মত পণ্ডিত স্বীকার করিবেন। "কৃত্বা" ভাঙ্গিয়া গোড়ায় একটা প্রাকৃতে হইয়াছিল 'করিঅ', আর সেই 'করিঅ' হইতে আমাদের 'করিয়া' ও সেই 'করিয়া'র সংক্ষিপ্ত রূপ হইল 'করি'; অন্যদিকে আবার খুঁজা অন্য প্রাদেশিক প্রাকৃতে 'করিউ' হইয়াছিল, যাহার সংক্ষিপ্ত রূপ 'করু' বা 'করুন'। উপরের দৃষ্টান্তের বার নম্বরের গানে প্রথমে পাইতেছি পিহাড়ি=পিহাড়িয়া, তাহার পরে পাইলাম তোড়িআ=তুলিয়া অথবা ত্রুটিত করিয়া; এই দুইটী এক সময়ের বলা চলে; কিন্তু তাহার পরে 'মরাড়িইউ'= 'মারিয়া ফেলিয়া' আছে। ঠিক এই কানুর রচনাতেই আবার নবম গানের প্রথম ছত্রেই 'মোড্ডিউ=মুড়িয়া ও দ্বিতীয় ছত্রে 'তোড়িউ'='তুড়িয়া' আছে। আবার তের নম্বর গানে 'তরিয়া' (উত্তীর্ণ হইয়া) অর্থে 'তরিত্তা' আছে যাহা কি একেবারে অতিবড় প্রাচীন 'তরিত্বা' শব্দের অতি নিকটবর্ত্তী। ঐরূপ আবার 'কৃত' অর্থে 'কিঅ' আছে, 'কিউ' আছে ও হালের ব্যাকরণের "ল" প্রত্যয় দিয়া পদ আছে। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি। কাজেই অতি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সহজিয়ারা যে বিস্মৃত ভাষায় গানের কাঠাম গড়িয়াছিল, সে ভাষা মিথ্যা ভাষা নয় বটে, কিন্তু খাঁটীভাবে সেই ভাষাটী তাহাদের হালের রচনায় ওত্রাইতে পারে নাই। অর্থাৎ কোনক্রমেই এই চর্য্যাগানের ভাষাকে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের ও নির্দ্দিষ্ট প্রদেশের বিশেষ ভাষা বলা অসম্ভব।

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লা দোঁহার ভাষা সম্বন্ধে পণ্ডিত হরপ্রসাদকে সমর্থন করেন নাই, আর আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহার সহিত তাঁহার উক্তির মিল আছে। তিনি বলিয়াছেন যে দোঁহার ভাষা বাঙ্গলা নয়,—অতি দূর সম্পর্কেও নয়। এই স্বীকৃতিতে পরোক্ষভাবে খাসা স্বীকৃত হইয়া গেল যে, চর্য্যা ও দোঁহার অবধূতেরা এমন অপ্রচলিত ভাষায় রচনা করিতে অভ্যস্ত ছিল যাহার সহিত তাহাদের নিজের ভাষার সম্পর্ক ছিল না। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লা চর্য্যার কাহ্নু ও দোঁহার কাহ্নুকে এক ও অভিন্ন বলিয়াছেন, আর চর্য্যার ভাষা যে দোঁহার ভাষা হইতে ঝাড়ে-বংশে আলাদা, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। অপ্রচলিত একটা ভাষা সহজিয়া সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যে ধর্ম্মের কথা লিখিবার জন্য চলিত ছিল, তাহা নিশ্চয়, আর একই কাহ্নুর রচনার চর্য্যা গানের ভাষা দোঁহার ভাষা হইতে যে সম্পূর্ণ আলাদা তাহাও নিশ্চিত; তবে প্রশ্ন এই কাহ্নুর গানের ভাষা খাঁটি রকমে তাহার নিজের ব্যবহারের প্রাদেশিক ভাষা কিনা। কাহ্নু নামে আর কয়েকজন সহজিয়া এই কাহ্নুর পূর্ব্বে ছিল কিনা, তাহার বিচার না করিয়া এই কথাটী স্থির করিতে হয়,—যে কাহ্নু তাহার গানে মুসলমান আমলের শব্দ ব্যবহার করিয়াছে, সে কোথাকার লোক, ও তাহার রচিত গানগুলির অপ্রচলিত ভাষার কাঠামের মধ্যে সে কোন্ প্রদেশের ভাষা কিছু কিছু গুঁজিয়াছে।

উত্থাপিত প্রশ্নের প্রথম অংশটুকুর উত্তর শহীদুল্লা মহাশয় নিজেই যাহা দিয়াছেন তাহা

প্রথমে বলিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন : "যখন আমরা পাইতেছি যে চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ের কৃষ্ণাচার্য্যপাদ জালন্ধরি পার শিষ্য এবং তিব্বতীয় ইতিবৃত্তের কহন বা বড় কৃষ্ণাচার্য্য জলন্ধর গুরুর শিষ্য এবং তিনি উড়িষ্যা হইতে আগত ব্রাহ্মণ, তখন চর্য্যা সমূহের কাহ্নুপাদ যে তিব্বতীয় ইতিবৃত্তের কহন বা বড় কৃষ্ণাচার্য্য ও নাম-সূচীর কাহ্নুপাদ হইতে অভিন্ন তাহা বোধ হয় স্বীকার করা যাইতে পারে।"

এখানে স্বীকৃত হইল যে কাহ্নু খাঁটি ওড়িশার লোক ; তবুও আবার বিনা কারণে এই কাহ্নুকে অন্যত্র বাঙ্গালী বলা হইল কেন, তাহা একেবারে দুর্ব্বোধ্য। লোকটী ওড়িয়া ব্রাহ্মণ, আসিল ওড়িশা হইতে, অথচ সে একটা "অপ্রচলিত" ভাষায় রচিত গানের কাঠামের মধ্যে হাজার বছরের আগেকার বাঙ্গলা বুলি গুঁজিয়া গেল। এই সিদ্ধান্তটীর বিচার করিতেছি। কাহ্নু যে সকল একালের ভাষার শব্দ "অপ্রচলিত" ভাষার সঙ্গে জুড়িয়াছে, তাহা যে ওড়িয়া, তাহা দেখাইবার আগে একটী কথা বলি। অবশ্য ইহা নিশ্চিত যে সহজিয়াদের চর্য্যায় যে মূল ভাষার ভিত্তি আছে তাহা একটা অনির্দ্দিষ্ট সময়ের অপ্রচলিত ভাষা ; সহজিয়াদের মধ্যে ঐ ভাষা ব্যবহারের ধারাবাহিক ফেশন্ ছিল বলিয়া সেটী ঘটিয়াছে। তাহার উপর কি আবার স্বীকার করিতে হইবে যে ওড়িয়া কাহ্নু অবধূত হইবার পর বঙ্গভাষার একটা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করিয়া তাহার নিজের আবির্ভাব কালের অনেক পূর্ব্বের প্রাচীন বাঙ্গলা বহুকষ্টে জড় করিয়া নিজের রচনায় গুঁজিয়াছিল ?

অত্যন্ত সোজা পদ্ধতিতে ওড়িয়া কাহ্নুর ভাষার বিচার করিতেছি। কথার কথার হিসাবে ধরিয়া নিন্ যে ওড়িশার সম্বলপুর এলাকায় একজন লোকের নাম "আসি" ও আর একজন লোকের নাম "কালি" ; তাহারা দুইজন একটি লোকের পথ রোধ করার দরুণ সে ঠিক যে ভাষায় এই ১৯২৬ অব্দে অতি নিরক্ষর দূর পল্লীতে তাহার বক্তব্য জানাইতে পারে তাহা লিখিতেছি। সম্বলপুর অঞ্চলের এমন স্থান নাই যেখানে কেহ উহার পূর্ণ অর্থ নিজেদের ভাষা বলিয়া না বুঝিতে পারে। উক্তিটি এইরূপ হইবে :—মোহর (আমার) অঙ্গনার (আঙ্গিনার) দুয়ার ফিটাই (খুলিয়া) আলিএ কালিএ মোহর বাট রুন্ধিলা ; গালি দেলারু দোষ মানি নেই মোহর আগরে লাঙ্গ হই পড়িলা। [গায়ের কাপড় ফেলিয়া দীনতা জানাইয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িবার নাম—"লাঙ্গ" হইয়া পড়া।] কলা কাম উল্টে নাহি ; দুহিলা দুধ কি বেণ্টরে সমায় ?

এই সঙ্গে ওই অঞ্চলের আর একটি কল্পিত উক্তি লিখিতেছি। একজন উঁচু ঘরের স্ত্রীলোক কড়া ভাষায় একটি ডোমের মেয়েকে তাহার দুর্ব্যবহারের জন্য নিরক্ষর দূর পল্লীতে এই ১৯২৬ অব্দের ১৫ই নবেম্বর তারিখে গালি দিতেছে :—"আলো ছিনাগি ডোম্বি, গাঁ-বাহাররে তোহর কুড়িয়া ; তু কাঁহিকি মোহর ঘরে পশি মোরে ছুঁই ছুঁই চালি গলু ? তোতে ছুঁই কি মু পানি "পিইমি" আউ ঘরর কাম করিমি ?"

১৯২৬ অব্দের এই দুইটি খাঁটি ওড়িয়া উক্তি যদি সন তারিখ না দিয়া সাহিত্য পরিষদের আফিসে ফেলিয়া রাখা যায় তবে এমন পণ্ডিত পাওয়া যাইবে যিনি ঐ উক্তি দুইটী হাজার বছরের আগেকার বাঙ্গলা বলিয়া প্রচার করিবেন। উল্লিখিত উক্তি দুইটীতে যত শব্দ ও পদ আছে সে সকল গুলিই যে চর্য্যাগানের ব্যাখ্যার সময় প্রাচীন বাঙ্গলা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা চর্য্যা গানগুলির পাঠকেরা জানেন। এক সময়ে যে ঐরূপ ভাষা বঙ্গে চলিত থাকা অসম্ভব ছিল না, ইহাই হইল ব্যাখ্যাকারের কল্পনায় জোড়া যুক্তি; খাঁটি সেই ভাষা যে একটা প্রদেশে চলিতেছে তাহা একেবারে উপেক্ষিত হইল,—যদিও লেখকটী ওড়িয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত; এটী ঘটিল কেবল এই যুক্তিতে যে, একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত সে লেখা কুড়াইয়া আনিয়া বাঙ্গলার ছাপাখানায় ছাপিয়াছেন। আশা করি শ্রীযুক্ত শহীদুল্লা এরূপ যুক্তি অগ্রাহ্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লা তিব্বতীয় দলিলের অনুবাদ উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন যে ওড়িয়া কাহ্নুর নিবাস ছিল "সোমপুরে"; ঐ সোমকে অন্যত্র "সোন"রূপে পাওয়া যায় ও"পুর"কে পুত্ররূপে পাওয়া যায়; এই স্থান যে সম্বলপুর এলাকার সোনপুর নয় তাহা জোর করিয়া বলা কঠিন। সম্বলপুর অঞ্চলের ওড়িয়ারা লরিয়া-হিন্দী-ভাষীদের অতি নিকটস্থ প্রতিবেশী, ও সেখানকার ওড়িয়া ভাষায় লরিয়া কথা অনেক চলে। এই লরিয়া ভাষায় কর্ত্তৃকারকের পদে "লা" খুব অধিক যুক্ত হইয়া থাকে; এই "লা" খাঁটি হিন্দীর "নে" কথাটীর সম্পূর্ণ অনুরূপ। চর্য্যাগানে কর্ত্তৃকারকে "কাহ্নিলা" পাইতেছি; এটী ত ঠিক সম্বলপুরের লরিয়াদের রীতি সিদ্ধি (Idiom)। এই অঞ্চলের পাহাড়েই শবরদের বাস, আর চর্য্যা গানগুলির শবর পন্থার বিবরণে যাহা আছে তাহা ঐ স্থানের পাহাড়ের সঙ্গে ও সামাজিক রীতির সঙ্গে মেলে। উহাও কি বাঙ্গলার ?

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লা ঠিকই বলিয়াছেন যে, চর্য্যাগানগুলিতে বৌদ্ধদের যে সকল পারিভাষিক শব্দ আছে, সেগুলির অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা ও সহজিয়াদের ধর্ম্মমতের সঙ্গে বৌদ্ধমতের কিছুমাত্র মিল নাই। আমাদের আগেকার প্রবন্ধেও তাহাই লিখিয়াছিলাম। তাহা হইলেই আমরা আবার স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি যে গান ও দোঁহাগুলির বৌদ্ধ নাম দেওয়া ভুল, উহার ভাষাকে হাজার বছরের আগেকার বাঙ্গলা বলা ভুল।

অনেক স্থানে শহীদুল্লা মহাশয়ের ব্যাখ্যা ঠিক হয় নাই; কেবল দু-চারিটি ত্রুটির উল্লেখ করিব। দশ নম্বরের গানের দ্বিতীয় ছত্রে আছে—ছই ছই যাই সো বাহ্ম নাড়িআ। টীকায় স্পষ্টভাবে ইহার ব্যাখ্যায় লেখা হইয়াছে—হে ডোম্বি, তুই ব্রহ্মনাড়ীকা (বাহ্ম নাড়িআ) ছুঁইয়া চলিস্; আদি টীকায় ব্রহ্ম নাড়ীকার অর্থ দেওয়া হইয়াছে "শুক্রনাড়ী"; উহার অর্থ বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। এত স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকিতেও শ্রীযুক্ত শহীদুল্লা ভুল করিয়া এইরূপ

ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—তুই ব্রাহ্মণ ও নেড়ে ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাইস্। নাড়ীকাকে করিয়াছেন নেড়ে আর পণ্ডিত শাস্ত্রীকে অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে বৌদ্ধদিগকে আগে নাড়িয়া বা নেড়ে বলা হইত ; আবার নিজে বলিয়াছেন যে সেই নেড়ে শব্দটা হিন্দুরা এখন মুসলমানের নামে প্রয়োগ করে। এ রকমের মোটা ভুল দেখিয়া দুঃখিত হইলাম।

"হের" শব্দটী বাঙ্গলার বিশেষ সম্পত্তি নয়, এমন কি নেপালে ও আসামে উহার ব্যবহার আছে ; প্রাচীন প্রাকৃতে উহার জন্মের ইতিহাস এইরূপ :—নির্দ্ধারণ = নিদ্ধারণ = নিহারণ, আর নিহার হইতে নেহার ও হের শব্দের উৎপত্তি। "ভনতি" শব্দটী আদপে সংস্কৃত নয়। "বর্ণন" হইতে প্রাকৃতে হইয়াছিল ভণন, আর ঐ ভণন-কেই পচা সংস্কৃতে ভণতি রূপে পাই। "মাঙ্গ" শব্দটী মার্গ শব্দের অপভ্রংশ নয়। চর্য্যার গানের অর্থেই স্পষ্ট দেওয়া আছে উহা নৌকার গলুই ; ঠিক এই নৌকার গলুই অর্থে এই মাঙ্গ শব্দটী সম্বলপুর অঞ্চলের ওড়িয়ায় প্রচলিত আছে, আর মেদিনীপুরেও ওই অর্থে "মঙ্গ"রূপে প্রচলিত আছে। উহার উৎপত্তি খুব সম্ভব শবরদের ভাষা হইতে। এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

অতল পথের যাত্রী

——দূর প্রান্তর গিরি
অজানার মাঝে জানারে খুঁজিয়া ফিরি।
হৃদয়ে হৃদয়ে বেদনার শতদল
ঘিরিয়া রেখেছে অজানার পদতল।
পথে পথে ফিরি, সাথে ফেরে দিবা নিশা
কোথা তাঁর পথ—খুঁজে নাহি মেলে দিশা।
কাঁদিয়া বৃথাই আমার নয়নজল
সাগর হইয়া—করিতেছে টলমল।
সে সায়রে দুলে আমার অশ্রুমতী
আমার গানের বেদনা-সরস্বতী।
নিয়ত তাহারি মৌন কাঁদন ঝরে
আমার প্রাণের হাসির পান্না 'পরে।

আমার অশ্রুমতীরে শুধাই মিছে,
বৃথাই ছুটিনু মোর অজানার পিছে।
উঠিছে পড়িছে ভাঙিছে জানার ঢেউ,
হেরিতেছে ঢেউ—সাগর হেরেনা কেউ!
কূলে কূলে ফিরি, ঢেউএ ঢেউএ কাঁদি আমি
অতল গভীরে টেনে লও মোরে স্বামি।
দেখিবনা ঢেউ, দেখিব সিন্ধুতল
যথা নাই ঢেউ—শুধু সে অতল জল।

নজরুল ইস্‌লাম

মায়ি

দর্জ্জিপাড়ার বোসেদের বাড়ীতে ঝি এবং চাকরে মিলিয়া তা বোধ হয় ডজন খানেকেরও উপর ছিল; কিন্তু কন্সার্টের আর সকল যন্ত্রকে অনায়াসে ছাপাইয়া উঠিয়া পিক্‌লোর আওয়াজ যেমন মানুষের কানে সোজা আসিয়া পৌছায়, ঠিক তেমনি করিয়া এই ডজনখানেক ঝি-চাকরের ভিড়ের মধ্যে থাকিয়াও গোলাপী-ঝি আর সকলকে ছাপাইয়া অতি সহজেই লোকের নজরে আসিয়া পড়িত।"

আজ বৎসর খানেক মাত্র হইল এই উড়িয়া ঝিটি এখানে আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে, কিন্তু ইহারি মধ্যে বাড়ীর অতিবড় পুরাতন দাসদাসীদিগকে পর্য্যন্ত সে এমনি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাহার নেতৃত্বাধীনে আনিয়া ফেলিয়াছিল, যে এই বনিয়াদি বসুগৃহে তাহার শুভাগমনের প্রাচীনত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া অতিবড় বিচক্ষণ ঐতিহাসিককেও বোধ হয় অল্প-বিস্তর বিপদে পড়িতে হইত। সুতরাং ভিতরের কথা একটু খুলিয়া বলা দরকার, এবং তাহা সংক্ষেপে এই:—

আজ ঠিক এক বৎসর হইল এই বনিয়াদি বসুবংশের বর্ত্তমান কর্ত্তা রায়বাহাদুর হরচন্দ্রের বৃদ্ধবয়সে হঠাৎ পত্নী-বিয়োগ ঘটে, এবং তাহারি ফলে এই পত্নী-গত-প্রাণ বৃদ্ধটি সহসা সর্ব্বপ্রকারে এমনি একান্তভাবে অসহায় এবং অনাথ হইয়া পড়িবার লক্ষণ দেখাইতে সুরু করিয়া দেন যে, এই দারুণ ও আকস্মিক শোকের বেগ সামলাইয়া তিনি যে দয়া করিয়া এই নশ্বর ধরাধামে অধিকদিন আর টিকিয়া থাকিবেন সে বিষয়ে আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেরই মনে দারুণ সন্দেহের উদ্রেক হয়। ঠিক এমনি ধারাটা যখন তাঁহার অবস্থা সেই সময় হঠাৎ একদিন তাঁহার পেয়ারের খানসামা ঈশ্বরা কি একটা অছিলা করিয়া কিছুদিনের ছুটি লইয়া দেশে চলিয়া যায়, এবং কয়েকদিনের মধ্যেই গোলাপী নাম্নী তাহার এই বিধবা ভাইঝীটিকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসে। ইহার পর সহসা এই পত্নীগতপ্রাণ রায়বাহাদুরটির পক্ষে গৃহিনীহীন অন্দর মহল এমনি অসহ্যরূপে ফাঁকা ফাঁকা এবং খালি খালি ঠেকিতে থাকে যে অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বাহির মহলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ইহার পরও যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, "এই উড়িয়া ঝিটি কি করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে বাটীর পুরাতন দাস-দাসীদের উপর পর্য্যন্ত এতখানি আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল, তাহা হইলে মানবের ভাষা ছাড়িয়া দেবভাষায় আমাকে বিধাতার নিকট গিয়া ধন্না দিয়া পড়িয়া বলিতে হয়—"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।"

গোলাপীর চেহারাখানা যে খুব ভাল ছিল তাহা নয়; কিন্তু তার যৌবন ছিল একবারে অপর্য্যাপ্ত। এক একটা কলুমে ফুলের গাছ আছে, ফুল দেবার সময় তাহারা সহসা এমনি

বাড়াবাড়ি সুরু করিয়া দেয়, এবং শিকড় হইতে আরম্ভ করিয়া ডগা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ফুল ফুটাইয়া ফুটাইয়া এমনি একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসে, যাহার দিকে চাহিয়া মানুষকে বলিতে হয়—হয়ত বা অতটা না হইলেও চলিত। গোলাপীর যৌবনটা ছিল অনেকটা সেই ধাঁচের। তাহার দিকে চাহিয়া মনে হইত সে যেন অতিরিক্তভাবে যুবতী এবং হয়ত বা অতটা যৌবন না হইলেও কিছু আসিয়া যাইত না।

গোলাপীর স্বভাবই ছিল, সে যেখানে থাকিবে সেখানে সে আর সকলকে ধাক্কা দিয়া, দলিয়া দাবাইয়া নিচে নামাইয়া দিবে, এবং প্রতি কথায় ও কার্য্যে, কারণে ও অকারণে তাহাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবে—সে তাহাদের অপেক্ষা অনেক বড়। ঠিক এই কারণেই সধবা অবস্থায় সে কোন দিন শ্বশুর ঘর করিতে পারে নাই, এবং বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে আসিয়াও কাহারও সহিত তাহার বনিবনাত হয় নাই। এহেন গোলাপসুন্দরী—এই বনিয়াদি সংসারটিতে পদার্পণ করিয়াই সহসা নিজমূর্ত্তিধারণ করিয়া বসিল, এবং তাহার সহকর্ম্মী দাসদাসীদিগকে যখন তখন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বকিয়া ঝকিয়া গাল দিয়া একবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। বাটীর পুরাতন দাসদাসীরা প্রথম প্রথম ইহার পাল্টা জবাব দিতে ছাড়ত না—ছাড়িবেই বা কোন্ দুঃখে? কোথাকার কে হরির খুড়ী মাধাই দাসী বৈত নয়! কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাহারা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল,—কান টানিলে মাথাটা যেমন অতি সহজেই আগাইয়া আসে, ঠিক তেমনি করিয়া এই নূতন ঝিটিকে লইয়া একটু টানাটানি করিতে গেলেই খোদ কর্ত্তাতে পর্য্যন্ত গিয়া টান পড়ে। সুতরাং পরম বিজ্ঞের মত তাহারা "ছাড়িয়া দিল পথটা" এবং সঙ্গে সঙ্গে মতটাও বদলাইয়া গেল। অতঃপর তাহারা এক জোট হইয়া এমন-ই একটা ভাব দেখাইতে সুরু করিয়া দিল, যেন আজন্মকাল ধরিয়া গোলাপীনাম্নী এই উড়িয়া রমণীটির তাঁবেদারী করিয়া করিয়া তাহারা সম্প্রতি পেন্সন্ পাইবার অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ঝি এবং চাকরদের মধ্যে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশেরই প্রতিনিধি বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু গোলাপীর যজ্ঞ অশ্ব ধরিয়া তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে কেহই সাহস করিল না;—সুতরাং ভিতরে ভিতরে সে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিল।

অবস্থাটা যখন এতদূর পর্য্যন্ত গড়াইয়া আসিয়াছে, সেই সময় হঠাৎ মথুরা কিম্বা কাশী, কিম্বা ভোজপুর কিম্বা ঐরকম আর একটা কোন্ সুদূর ছাতুর দেশ হইতে এক পেল্লায় বীর আসিয়া 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া দাঁড়াইল, এবং গোলাপীকে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন তখনকার মত বন্ধ করিয়া দিয়া যুদ্ধের আয়োজনে মনোনিবেশ করিতে হইল। ব্যাপারটা আসলে দাঁড়াইয়াছিল এই:—আজ কয়েকদিন হইল এবাটীর অনেককেলে চাকর রামদীন তাহার পুত্রের সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়া দেশে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়,

এবং যাইবার সময় ভগ্নু কাহার নামক মল্লুক হইতে সদ্য আগত একটি আস্ত মেড়ুয়াকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিয়া যায়। এই পাট্‌ভাঙ্গা আনকোরা ছাতুটির দেহে ছিল একটা আস্ত বুনো মহিষের বল, এবং মগজের মধ্যে ছিল বিরাটরাজের গোশালার একমাসের সংগৃহীত গোময়স্তুপ। সে খাটিতে পারিত ভূতের মত এবং ফাঁকি দিতে জানিত না একেবারেই। ইহার উপর তাহার মেজাজটা ছিল অত্যন্ত রুক্ষ, যাহা শতকরা নিরেনব্বই জন খাঁটি লোকের হইয়া থাকে, এবং যাহার জন্য এই শ্রেণীর জীব দুনিয়ার নিকট হইতে কোনদিনই আপনার পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া পায় না।

ভগ্নু আসিয়া কার্য্যে বাহাল হওয়া অবধি গোলাপীর সহিত তাহার সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে রাত দিনই খিটিমিটি লাগিতে লাগিল, এবং এই কাটখোট্টা জীবটার আধিপত্য চালাইতে আসিয়া গোলাপী বুঝিয়া গেল—ইহাকে দাবাইতে গিয়া তাহাকে রীতিমত বেগ পাইতে হইবে।

সেদিন বেলা তখন প্রায় একটা হইবে, ভগ্নু আপনার কক্ষে বসিয়া রুটি পাকাইতেছিল, এমন সময় কোথা হইতে ঝড়ের মত আসিয়া পড়িয়া চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া অত্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে গোলাপী চেঁচাইতে সুরু করিয়া দিল—"হারামজাদা গুয়োরব্যাটা কোথাকার,—একদিন না বলে দিয়েছি—আমার খাওয়া হয়ে গেলেই এঁটো বাসন মেজে দিয়ে আসবি—কানে শোনা হয় না; নয়?—জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো তা জানিস্।" তাহার পরই সহসা চীৎকার করিতে করিতে গোলাপ-সুন্দরীর দ্রুত পলায়ন, এবং তৎপশ্চাৎ প্রকাণ্ড একটা লাঠি উঁচাইয়া কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া গিয়া ভগ্নুচন্দ্রের নিজকক্ষে পুনঃ প্রবেশ,—এই দুইটি মাত্র দৃশ্যেই এই বীররসাত্মক নাটকটি সহসা অসময়ে সমাপ্ত হইয়া গিয়া সমবেত কৌতূহলী দর্শকমণ্ডলীকে নিরাশা ও দুঃখে যুগপৎ অভিভূত করিয়া ফেলিল।

গোলাপী কর্ত্তার নিকট গিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া চুল ছিঁড়িয়া, বুক চাপড়াইয়া একটা প্রলয় কাণ্ড বাধাইয়া বসিল, এবং তাহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের নামে শপথ করিয়া ঘোষণা করিয়া দিল—ভগ্নু নামক এই অসভ্য বর্ব্বর চাকরটা এ বাটীর ত্রিসীমানার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিতে সে জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করিবে না। এই পরম সতীসাধ্বী উড়িয়া রমণীটিকে উপবাসী রাখিয়া ছেলেপুলের ঘরে যাচিয়া অকল্যাণ ডাকিয়া আনিতে আর যে সাহস করে করুক—হরচন্দ্র কিন্তু করিলেন না, এবং সরকার মহাশয়কে ডাকাইয়া বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন—তদ্দণ্ডেই যেন এই অতিবড় বেয়াদপ অসভ্য চাকরটাকে মাহিনা চুকাইয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হয়।

বাটীর অন্যান্য ঝি চাকরদের নিকট এই ঘটনাটাকে অনাবশ্যকরূপে ফাঁপাইয়া বাড়াইয়া এতখানি করিয়া বর্ণনা করিয়া গোলাপী মনে মনে খুব খানিকটা গর্ব্ব অনুভব করিল, এবং সে যে ইচ্ছা করিলে যাহা খুসী তাহাই করিতে পারে, ইহারি গর্ব্ব এবং আত্মপ্রসাদে ভিতরে

ভিতরে ক্ষণে ক্ষণে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। বাটীর ঝি চাকরেরা এই ঘটনাটাকে উপলক্ষ করিয়া মাথায় হাত দিয়া, চক্ষু কপালে ঠেলিয়া তুলিয়া এমনি ভাবটা প্রকাশ করিতে লাগিল, যেন এতবড় দুঃসাহসিকের কার্য্য মান্ধাতার আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন বাড়ীর কোন ভৃত্যের দ্বারা কোনকালে কখনও সংঘটিত হয় নাই—এবং ভবিষ্যতে কখনও যে হইবে সে বিষয়ে দারুণ সন্দেহ আছে।

গোলাপীর মনে মনে বড়ই ইচ্ছা হইতেছিল, সে নিজে গিয়া দেখিয়া আসে, এই অসভ্য জংলী ভূতটা চাকরী খোয়াইয়া কামারশালার হাপোরের মত মাঝে মাঝে এক একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কেমন করিয়া পাত্তাড়ি গুটাইয়া অন্যত্র যাইবার ব্যবস্থা করিতেছে;—কিন্তু তাহার সাহসে কুলাইল না। সে কল্পনায় দেখিতে লাগিল—এই যমদূতের মত যণ্ডামার্কা জীবটা তাহার সেই অন্ধকার ঘরটার মধ্যে বসিয়া বসিয়া নিস্ফল আক্রোশে থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে এবং তাহার সেই বড় বড় গোল গোল চক্ষু দুটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কাহাকে অন্বেষণ করিতেছে। সুতরাং সে নিজে না গিয়া সৌরভী-ঝিকে মজা দেখিতে পাঠাইয়া দিল, এবং নিজে না গিয়াও সৌরভীর চক্ষু দিয়া কল্পনায় দেখিতে লাগিল—সেই কিম্ভূতকিমাকার কাট্‌খোট্টা জীবটা তাহার সেই লম্বা লম্বা শিরাবহুল কেঠো হাতজোড়ার একটি দিয়া চক্ষু মুছিতেছে এবং অপরটি দিয়া জিনিষপত্তর বাঁধাবাঁধি করিতেছে। এই পরম উপভোগ্য রমণীয় দৃশ্যটি সে যতই কল্পনা করিতে লাগিল, তার বুকখানা ভিতরে ভিতরে ততই আহ্লাদে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

সৌরভী ফিরিয়া আসিতেই সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—"ভূতটা কি করছে দেখ্‌লি?" ইহার উত্তরে সৌরভী যাহা বলিল তাহা সংক্ষেপে এই যে, সে সজ্ঞানে এবং স্বচক্ষে এইমাত্র দেখিয়া আসিল, সেই আবাগের বেটা ভূতটা ঠিক ভূতের মত করিযাই বিকট নাসিকাগর্জ্জন পূর্ব্বক পরম নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে, এবং তাহার জিনিষপত্তর যেরূপ এলোমেলো ভাবে এদিক ওদিক ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া আদপেই মনে হয় না,—তিনি দয়া করিয়া সম্প্রতি এখান হইতে গাত্রোৎপাটন করিবেন।

গোলাপী এবার কর্ত্তার নিকট গিয়া একবারে তর্জ্জন গর্জ্জন সুরু করিয়া দিল—কেন এখন পর্য্যন্ত তাহাকে তাড়ান হয় নাই! কর্ত্তা সরকার মহাশয়কে ডাকাইয়া কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন—অন্দরমহল হইতে তাঁহার বিধবা কন্যা হিরণ হুকুম পাঠাইয়াছে—এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পরিশ্রমী বিশ্বাসী ভৃত্যটিকে কোনও মতে যেন তাড়ান না হয়, এবং এ বিষয়ে সরকার মহাশয় যেন কাহারও কথা কানে না তোলেন। হাইকোর্টের উপরও যে প্রিভিকাউন্সিল আছে সে খবরটা গোলাপীর জানা ছিল না।

এই ব্রহ্মচারিণী বিধবা কন্যাটীকে রায় বাহাদুর বরাবরই মনে মনে ভয় করিতেন, এবং

গোলাপী আসা অবধি তাঁহার এই ভয়ের মাত্রাটা সহসা অতিরিক্ত রকম বাড়িয়া গিয়াছিল। অন্য কোনও ঘটনা হইলে তিনি তাঁহার কন্যাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া হয়ত বা আপোষে একটা রফা করিয়া লইবার চেষ্টা দেখিতে পারিতেন -এক্ষেত্রে কিন্তু ততদূর পর্য্যন্ত আগাইতে তাঁহার সাহস হইল না। এই নীচ প্রসঙ্গটা লইয়া তাঁহার সেই সৌম্যমূর্ত্তি ব্রহ্মচারিণী কন্যাটীর সুমুখে গিয়া দাঁড়াইবার কল্পনা করিয়া হরচন্দ্র বার বার মনে মনে পিছাইয়া আসিলেন।

ভগ্ন এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল বটে, কিন্তু অতঃপর তাহার উপর যে সকল উপদ্রব অত্যাচার চলিতে লাগিল, তাহা অপদেবতাদের উপদ্রবের মতই অশরীরী এবং আকস্মিক—সুতরাং লাঠির ভয় দেখাইয়া জিতিবার আশা তাহার আর রহিল না। উনানে ডাল চড়াইয়া দিয়া সে হয়ত কোনও কাজে বাহিরে গিয়াছে—ফিরিয়া আসিয়া দেখিল সমুদয় ডালটা তাহার জঠরাগ্নি প্রশমিত করিবার পরিবর্ত্তে উনানের অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়া একটা তীব্র চোঁয়া গন্ধে সমগ্র কক্ষটাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। আর একদিন দড়িতে কাপড় শুকাইতে দিয়া সে বাজারে গিয়াছিল -ফিরিয়া আসিয়া দেখে তাহার মুল্লুকের বাঁদরগুলা যেমন করিয়া কাপড় পাইলে দাঁত দিয়া চিরিয়া ফাড়িয়া তাহাকে একজিবিসনে পাঠাইবার উপযোগী করিয়া তুলে - ঠিক তেমনি করিয়া কে তাহার কাপড়টাকে দশদশা গ্রস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছে। ইহার উপর আবার মাঝে মাঝে তাহার জিনিষপত্তর খোয়া যাইতে লাগিল, এবং অবশেষে তাহার সখের লাঠিটী পর্য্যন্ত একদিন সহসা ঘর হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।—রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে ফুলিতে ফুলিতে ভগ্নু গিয়া হিরণের নিকট নালিশ করিল—এবং তাহার মাহিনা চুকাইয়া লইয়া তদ্দণ্ডেই বিদায় হইতে চাহিল। সকল কথা শুনিয়া হিরণ তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া একখানি নূতন কাপড়ের দাম ধরিয়া দিলেন, এবং অন্যান্য যে সকল জিনিষপত্তর খোয়া গিয়াছিল তাহার মূল্যবাবদ আরও কয়েকটী টাকা দিয়া, অভয় দিয়া তাহাকে কার্য্যে বাহাল রাখিলেন। সুতরাং এ যাত্রাও ভগ্নু জিতিয়া গেল। এমনি করিয়া তাহাকে তাড়াইতে গিয়া বার বার লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া, গোলাপী যখন নূতন এবং অভিনব একটা কিছু উপায় আবিষ্কার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে—ঠিক সেই সময় সহসা একদিন এই আপদ বালাইটা নিজে হইতেই আসিয়া কর্ত্তার নিকট দেশে যাইবার জন্য ছুটি চাহিয়া বসিল।—তাহার স্ত্রীর বাড়াবাড়ি অসুখ, দেশ হইতে তার আসিয়াছে—তাহাকে পত্রপাঠ মাত্র রওনা হইতে হইবে।

এই ঘটনার পর প্রায় মাসাধিক কাল চলিয়া গিয়াছে; হঠাৎ একদিন ভগ্নুচন্দ্র দেশ হইতে ফিরিল—স্কন্ধে প্রকাণ্ড এক লাঠি এবং কোলে জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার মাতৃহারা শিশু। দেখিয়া শুনিয়া গোলাপী ভিতরে ভিতরে রাগে একবারে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতে লাগিল। সে মনে করিয়াছিল চাকরীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য এই জংলী ভূতটাকে কর্ত্তার

নিকট আসিয়া আর্জ্জি করিতে হইবে ; এবং ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল— এই ন্যাংলা কুৎসিত ছেলেটার প্রসঙ্গ তুলিয়া এ বিষয়ে সে যথাসাধ্য প্রাণপণ বাধা দিবে ; কিন্তু এই হাড়জ্বালানে হতচ্ছাড়া মিন্‌ষেটা কর্ত্তার নিকট না আসিয়াও অনায়াসে নিজের কার্য্যে বহাল হইয়া গেল, এবং পরম নিশ্চিন্তমনে সপুত্র আপনার নির্দ্দিষ্ট ঘরখানি দখল করিয়া বসিল। এই বনিয়াদি বস্থুসংসারে এতদিন সে কেবল মাটির তলায় শিকড় গাড়িতেছিল—আজ কিন্তু উপর হইতে ঝুরি পর্য্যন্ত নামাইতে সুরু করিয়া দিল।

ভগ্গু এ যাত্রা টিকিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার এই মাতৃহারা চিররুগ্ন শিশুটীকে লইয়া সে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। এই শীর্ণ মস্তকসার ছেলেটা জন্মিয়া অবধি ভুগিয়া ভুগিয়া সম্প্রতি এমনি একটা সাম্য অবস্থায় আসিয়া পৌছাইয়াছিল, সেখান হইতে সে না পারিতেছিল সুমুখ দিকে আগাইতে,—না পারিতেছিল পশ্চাৎ দিকে ফিরিতে। তাহার বয়স হইয়াছে তিন বৎসরেরও কিছু বেশি, কিন্তু সেই দুই বৎসর বয়সের সময় তাহার কাঠামোখানা দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে ঠিক যেমনটী ছিল আজও হুবহু তাহাই রহিয়া গিয়াছে—সময় করিয়া একটু বাড়েও নাই—রোগে ভুগিয়া একটু কমেও নাই। কেবল মস্তকখানি কোনও অজানিত কারণে সহসা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত পরামর্শ না করিয়াই দিন দিন নিজেকে অনাবশ্যকরূপে বাড়াইয়া তুলিতেছিল। এ হেন নির্জ্জীব পদার্থটীর বিরুদ্ধে সম্প্রতি বাটীর দাসদাসীদিগের তরফ হইতে ভগ্গুর নিকট যে সকল অভিনব এবং অদ্ভুত অভিযোগ আসিতে লাগিল তাহা জমলার্জ্জুন ভঙ্গকারী বালক শ্রীকৃষ্ণের পরম অলৌকিক এবং অত্যাশ্চর্য্য বাল্যলীলাকেও বোধ হয় হার মানাইয়া দেয়। এবং অতঃপর যমরাজের নিকট হইতে কাঁদিয়া কাটিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া ফিরাইয়া আনা এই শিশুটীকে উদ্দেশ করিয়া চারিদিক হইতে যে সকল তীব্র গালাগালি এবং অভিসম্পাত বর্ষিত হইতে লাগিল—তাহা শুনিয়া ভগ্গু ভিতরে ভিতরে বার বার শিহরিয়া উঠিল, এবং এই কঙ্কালসার জীর্ণ শীর্ণ মাতৃহারা শিশুটীকে তাহার বিরাট বক্ষ দেশে প্রাণপণ বলে চাপিয়া ধরিয়া চোখ বুজিয়া বার বার রামচন্দ্রজীকে স্মরণ করিল।

সেদিন কি একটা কাজে ভগ্গুর ঘরের সুমুখ দিয়া যাইতে যাইতে গোলাপী দেখিল যে লাল্লু নামক সেই মাথাবড় কুৎসিত মানবকটি তাহাদের ঘরের সুমুখকার রকটার উপর পরম বিজ্ঞের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। সে তাহার দিকে একবারমাত্র চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছিল—হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে অত্যন্ত ক্ষীণ এবং করুণ কণ্ঠে আওয়াজ আসিল—"মায়ি।—এ মায়ি!"

কি মনে করিয়া ফিরিতে গিয়াও গোলাপী ফিরিল না, এবং হন্ হন্ করিয়া চোখ কান বুজিয়া নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া বার বার আপন মনে আওড়াইয়া যাইতে লাগিল— "মাগো।—কি কুৎসিত এই ছেলেটা—দেখিলে যেন ঘ্যাকার আসে।"

ইহার কিছুদিন পর একদিন প্রাতঃকালে কেন কে জানে গোলাপীর ইচ্ছা হইল—দেখিয়া আসে, সেই কুৎসিত ছেলেটা একলাটী তাহাদের কক্ষে বসিয়া বসিয়া কি করিতেছে। তাহার জানা ছিল, এ সময় ভগ্লু বাজার করিতে চলিয়া যায়, সুতরাং তাহার সহিত চোখো-চোখি হইয়া যাইবার ভয় ছিল না।

ভগ্লুর ঘরের সুমুখে আসিয়া দরজার আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া সে দেখিল—সেই কুৎসিত ছেলেটা তাহাদের ঘরের স্যাঁৎসেঁতে মেঝের উপর আদুড় গায়ে পড়িয়া তাহার রোগশীর্ণ দেহযষ্ঠিখানিকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া ঘুমাইয়া রহিয়াছে, এবং তাহার শীর্ণ পাণ্ডুর গণ্ডদেশে ক্ষীণ একটি অশ্রুধারা কখন একসময় শুকাইয়া গিয়া সূক্ষ্ম একটী রেখামাত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সেইদিকপানে অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ একসময় কি মনে করিয়া সে ধীরে ধীরে সেই অন্ধকার কক্ষটার মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং সহসা ঘরের কোণ হইতে একটা ছিন্ন মলিন কম্বল টানিয়া লইয়া সেই কুৎসিত ছেলেটাকে তাহার উপর শোয়াইয়া দিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া চোরের মত কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল।

নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া গোলাপীর নিজের উপর ভয়ানক রাগ হইতে লাগিল।—কেন সে মরিতে এই জংলী ছেলেটার জন্য মাথাব্যথা দেখাইতে গেল?—হউক না সে মাতৃহারা? তার কি?—এখুনি যদি বাটীর দাসদাসীদের কেহ তাহার এই বিশ্রী কদর্য্য দুর্ব্বলতাটা দেখিয়া ফেলিত, তাহা হইলে তাহার লজ্জা রাখিবার যে আর যায়গা থাকিত না!—তার মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা যাইতে লাগিল, এবং ভগ্লু নামক হতচ্ছাড়া হাড়হাবাতে লোকটার উপর বিতৃষ্ণায় এবং রাগে তাহার চিত্তখানা ভিতরে ভিতরে বিষাক্ত হইয়া পুড়িয়া যাইতে লাগিল।—এই হতচ্ছাড়া জংলীভূতটা বার বার তাহাকে অপমানিত লাঞ্ছিত করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া—অবশেষে দেশ হইতে তাহার গোষ্টিবর্গ আমদানি করিয়া তাহাদের নিকটও তাহার মাথাটাকে হেঁট করিয়া দিবার জন্য আজ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে,—আর সে কিনা ইচ্ছা করিয়া যাচিয়া সাধিয়া সেই অপমানের নোংরা বোঝাটা স্কন্ধে চাপাইয়া লইবার জন্য মুটের মত লালায়িত হইয়া ফিরিতেছে।—ঘৃণায় লজ্জায় রাগে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া পুড়িয়া একেবারে খাক্ হইয়া যাইতে লাগিল। সে মনে মনে তাহার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষকে নরকস্থ করিবার ভয় দেখাইয়া দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল—এই ভূতের মত কুৎসিত নোংরা ছেলেটাকে সে জীবনে আর কখনও ছুঁইবে না—এমন কি মরিয়া গেলেও না।

ইহার পর প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে;—গোলাপী ইহার মধ্যে একটী দিনেরও জন্য ভগ্লুদের ঘরের দিকে যায় নাই—পাছে সেই হ্যাংলা ছেলেটাকে চক্ষে দেখিতে হয়।

আজ সকাল হইতে বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। চারিদিকেই কেমন যেন একটা নিরানন্দময় বিষণ্ণভাব। দ্বিপ্রহরে আহার সারিয়া আপনার শয়ন কক্ষে বসিয়া গোলাপী পান সাজিতে-

ছিল—সহসা কিসের মৃদু শব্দে দরজার দিকে চাহিয়া দেখে—সেই ন্যাংলা কালো ছেলেটা দরজার একটী পাশে চুপটি করিয়া চোরের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার দিকে চাহিতেই সে অত্যন্ত ক্ষীণ এবং করুণ কণ্ঠে ডাকিল—"মায়ি!"

অতর্কিত-ভাবে কি একটা কোমল স্নেহ সম্বোধন গোলাপীর কণ্ঠ অবধি আগাইয়া আসিয়াছিল, সেটাকে জোর করিয়া গলা টিপিয়া নিচের দিকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া নামাইয়া দিয়া গলাটাকে অস্বাভাবিকরূপে কর্কশ এবং কঠোর করিয়া তুলিয়া গোলাপী ধমকাইয়া উঠিল—"দূর হয়ে যা এখান থেকে—দূর হয়ে যা বলছি!"

এই হাড়জ্বালানে আপদ বালাই ছেলেটা কিন্তু নড়িল না, এবং আরও করুণ এবং কাতর কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—"মায়ি!—এ মায়ি।"

গোলাপী আরও কর্কশ কণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল,—"বেরো বলছি হারামজাদা—নইলে খুন করে ফেলবো!"

এই অদ্ভুত ছেলেটা তাহার সেই কর্কশ মুখখানার দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর সহসা কি মনে করিয়া কে জানে—তাহার সেই প্রকাণ্ড মাথাটা লইয়া টলিতে টলিতে ছুটিয়া আসিয়া গোলাপীর কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দারুণ অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। –সে অভিমানের বুঝি অন্ত নাই! যেন আজন্ম কাল ধরিয়া এই সম্পূর্ণ অপরিচিতা স্ত্রীলোকটীর নিকট হইতে স্নেহ এবং আদর পাইয়া মানুষ হইয়া আসিয়া আজ সহসা তাহারি নিকট হইতে অনাদর এবং অবজ্ঞা পাইয়া দারুণ অভিমানে এবং দুঃখে তাহার ক্ষুদ্র বুকখানি ফাটিয়া যাইতে বসিয়াছে। গোলাপী একটী কথাও বলিল না—কেবল প্রাণপণ বলে সেই নোংরা কালো ছেলেটাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচ বৎসরের বালিকার মত ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কতক্ষণ সে এইভাবে বসিয়াছিল তাহা সে নিজেই জানিতে পারে নাই—সহসা বাহির হইতে মোটা কর্কশকণ্ঠে কে ডাকিল—"লাল্লু!"—ধড় মড় করিয়া এক নিমেষে ছেলেটাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত কর্কশ এবং কঠোর কণ্ঠে গোলাপী চেঁচাইয়া উঠিল—"ফের কোন দিন তোর ছেলে আমার ঘরের চৌকাঠ মাড়ায় ত খুন করে ফেলবো—।" কথাটা শেষ করিয়াই সে রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই শীর্ণকায় কঙ্কালসার শিশুটাকে নড়া ধরিয়া টানিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

নিজের কক্ষে লইয়া আসিয়া ভগ্‌লু তাহার এই নির্ব্বোধ অপগণ্ড ছেলেটাকে ভয় দেখাইয়া ধমকাইয়া চোখ মুখ পাকাইয়া অনেক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল—গোলাপী নাম্নী এই যে আওরাৎটার কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে এইমাত্র মার খাইয়া ফিরিয়া

আসিল,—সে মানুষ নয়—একবারে আস্ত একটী ছেলেখাগী ডাইনি, এবং তাহার ঢাকাই জালার মত প্রকাণ্ড এবং ফাঁদালো পেট্‌টার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে লাল্লুর মত বিশ বিশটা লেড়কা বেকসুর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে;—এমন আরও কত কি বিভীষিকাময় ঘটনার অবতারণা করিয়া সে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিল—এই নর-রাক্ষসীটার ত্রিসীমানায় সে যেন আর কোনও দিন ভুলিয়াও না গিয়া পড়ে।

সকল কথা শুনিয়া লাল্লু কিছুক্ষণ পরম বিজ্ঞের মত চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া কি ভাবিল,—তাহার পর সহসা মনে মনে এই অতিবড় জটিল সমস্যাটার কি একটা সমাধান করিয়া ফেলিয়া অত্যন্ত কাতর এবং করুণ দৃষ্টিতে তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণ এবং আর্দ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"মায়ি"। ভগ্গু তাহাকে প্রাণপণে বুঝাইতে চাহিল—সে ভুল করিয়াছে,—এই অতিবড় দুষ্ট স্ত্রীলোকটা তাহার মা নয়, তাহার মা তাহাকে কত আদর করিত, কত ভাল বাসিত—ইহার মত করিয়া মারিয়া তাড়াইয়া দিত না,—কিন্তু তথাপি এই অবুঝ ছেলেটা পরম বিজ্ঞের মত তাহার সেই প্রকাণ্ড মাথাটা নাড়িয়া বলিল—"মায়ি।"

* * * * *

আরও একটা সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে;—ইহার মধ্যে গোলাপীর সহিত লাল্লুর একবারও সাক্ষাৎ হয় নাই। গোলাপী নিজে প্রাণান্তে ভগ্গুদের ঘরের দিকে যাইত না, এবং ভগ্গুও প্রাণান্তে তার এই অবুঝ ছেলেটাকে গোলাপীর ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইতে দিত না। সে কাজে যাইবার সময় লাল্লুকে ঘরের মধ্যে পুরিয়া বাহির হইতে শিকলি বন্ধ করিয়া দিয়া যাইত—পাছে এই অবুঝ ছেলেটা আবার কোনদিন 'মায়ি' বলিয়া ভুল করিয়া এই ডাকিনীটার খপ্পরে গিয়া পড়ে।—সুতরাং এই সাতদিনের মধ্যে লাল্লুর সহিত গোলাপীর দেখা হইবার কোন সুযোগই ঘটে নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল,—বর্ষাকালের অন্ধকার অপরিচ্ছন্ন সন্ধ্যা। মাত্র কিছুক্ষণ হইল বৃষ্টিটা একটু ধরিয়াছে, কিন্তু পশ্চিম গগনপ্রান্তে নূতন করিয়া মেঘসঞ্চার হইয়া একটা এলোমেলো জোলো বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছিল। আপন কক্ষের বাতায়নের ধারটিতে অন্ধকারে সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া গোলাপী চুপ করিয়া বসিয়াছিল;—কেন কে জানে তাহার আজ কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। তাহার বাতায়নের সুমুখেই বোসেদের গোয়ালঘর। আজ প্রাতঃকালে এই গোয়ালটার মধ্যে একটা বাছুর মারা গিয়াছিল,—মৃতবৎসা গাভীটা উদাসভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া কাতর কণ্ঠে বার বার হাম্বা হাম্বা করিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া ক্লান্তবর্ষণ সন্ধ্যার অবসাদময় ক্ষণটীকে আরও যেন করুণ এবং বিষাদময় করিয়া তুলিতেছিল।—সবই যেন কেবল কান্না আর কান্না।

আজ প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়াই সে লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিল—গতরাত্র হইতে লাল্লুর খুব জ্বর হইয়াছে, এবং এই একরাত্রের জ্বরেই সে নাকি একবারে শয্যার সহিত

মিশিয়া যাইবার মত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পর সমস্ত দিন সে আর তাহার কোন সংবাদ পায় নাই।—সহসা গোলাপীর কেমন যেন ভয় হইতে লাগিল—গোয়ালের ঐ বাছুরটার মত করিয়া এই শীর্ণ রুগ্ন শিশুটীও যদি—হঠাৎ কি মনে করিয়া সে ধড় মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং পাশের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া রন্ধন-নিরতা সৌরভীকে একটা ঠেলা মারিয়া সসব্যস্তে বলিয়া উঠিল—"ভগ্গুর ছেলেটা এবেলা কেমন আছে ছুটে গিয়ে একবার দেখে আয় দেখি—যাবি আর আসবি, বুঝলি!" অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে একবার মাত্র চাহিয়াই—সৌরভী চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পর আসিয়া সংবাদ দিল—সেই শীর্ণ মাতৃহারা ছেলেটা তাহার পিতার কোলের উপর শুইয়া বিকারের ঝোঁকে মাঝে মাঝে লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিতেছে এবং তাহার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানা যন্ত্রণায় ক্ষণে ক্ষণে নীলবর্ণ হইয়া উঠিতেছে। গোলাপী কোন কথা বলিল না—ধীরে ধীরে আপনার কক্ষে আসিয়া অন্ধকারে শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।—তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল,—মনে হইতেছিল, ছুটিয়া গিয়া সেই মাতৃহারা রুগ্ন শিশুটাকে কোলে লইয়া বসে; কিন্তু সেই হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ভগ্গুটার নিকট গিয়া কোন লজ্জায় সে আজ হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া বলিবে—"তোমার ঐ রুগ্নশিশুটীকে দয়া করিয়া একবার আমার কোলে তুলিয়া দাও—আমি কৃতার্থ হই।"—না না, সে কিছুতেই এ হীনতা স্বীকার করিতে পারিবে না—মারিয়া ফেলিলেও না।—সে কল্পনায় দেখিতে লাগিল সেই মাতৃহারা রুগ্ন শিশুটী সেই জ্যোতিহীন নিষ্প্রভ চক্ষুদুটী দিয়া বার বার কাহাকে খুঁজিতেছে, এবং বিকারের ঝোঁকে মাঝে মাঝে 'মায়ি!' 'মায়ি।' বলিয়া শুষ্ক কাতর কণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া উত্তর না পাইয়া অবশেষে নিরাশ এবং শ্রান্ত হইয়া চক্ষু মুদিতেছে। "মাগো!" বলিয়া বুকভাঙ্গা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া গোলাপী দুইহাতে নিজের বুকখানা চাপিয়া ধরিল।

তখন অর্দ্ধরাত্র। বাহিরে শন্ শন্ শব্দে ঝড় বহিতেছিল এবং তাহার সহিত পাল্লা দিয়া মুষলধারে বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত হইতেছিল। কক্ষের সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া মুমূর্ষু শিশুটিকে কোলে লইয়া ভগ্গু কাঠের মত শক্ত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল—সে যেন যমদূতের সহিত লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। ঘরের এক কোনে একটা হ্যারিকেন জ্বলিতেছিল—তাহারি ক্ষীণ আলোকে দেখা যাইতেছিল—মুমূর্ষু লাল্লু জ্বরের ঝোঁকে মাঝে মাঝে চমকাইয়া চমকাইয়া উঠিতেছে।—হঠাৎ একসময় বাহির হইতে কে যেন দরজায় ঘা দিল। ভগ্গু একবার চমকাইয়া উঠিল—তাহার পর হাঁকিল—"কোন্ হ্যায়?"

কোন সাড়া আসিল না। ঝড়ের শব্দ মনে করিয়া ভগ্গু আবার চুপ করিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ পর আবার দরজায় ঘা পড়িল।—এ ঝড়ের শব্দ নয় নিশ্চয়ই।—সে আবার হাঁকিল—"কোন্ হ্যায়?"—কোন সাড়া আসিল না—কেবল কড়্ কড় শব্দে দিগন্ত কাঁপাইয়া

বাহিরে একটা বজ্রধ্বনি হইয়া গেল।—মুমূর্ষু লাল্লুকে প্রাণপণবলে নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ভগ্নু চক্ষু মুদিয়া রামচন্দ্রজীকে বার বার স্মরণ করিতে লাগিল।

—আবার সেই দ্বারে করাঘাত—এবার পূর্ব্বাপেক্ষা জোরে জোরে।—কি মনে করিয়া ভগ্নু তাহার মুমূর্ষু শিশুটিকে শয্যার উপর শোয়াইয়া দিয়া উঠিল, এবং মাথার শিয়রের জানলাটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া সহসা পাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠিল "লছ্‌মিয়া লছ্‌মিয়া!" তাহার পরই সহসা দরজাটা ঝণাৎ করিয়া খুলিয়া ফেলিয়া সেই দুর্যোগ এবং অন্ধকারের মধ্যে কাহাকে যেন ধরিবার জন্য ক্ষিপ্তের মত ঘর হইতে ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া গেল।

সেই ভীষণ দুর্যোগের রাত্রে অন্ধকারে একাকী সমস্ত উঠানটা হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাহার মৃতপত্নীকে ধরিতে না পারিয়া, আপাদমস্তকে বৃষ্টিতে ভিজিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াই ভগ্নু সহসা আবার ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল—"লছ্‌মিয়া! লছ্‌মিয়া!"—সে দেখিল, যাহাকে ধরিবার জন্য সে এতক্ষণ এই দুর্যোগ এবং অন্ধকারের মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছিল—সেই তাহার বড় আদরের লছ্‌মিয়া কখন এক সময় পাশ কাটাইয়া চুপি চুপি তাহার কক্ষে আসিয়া তাহাদের বড় স্নেহের লাল্লুকে কোলে লইয়া বসিয়াছে।—ছুটিয়া গিয়া দুইহাতে তাহার গলাটা প্রাণপণ বলে জড়াইয়া ধরিয়া ভগ্নু আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—"লছ্‌মিয়া—লছ্‌মিয়া!" চাপা কান্নার স্বরে উত্তর আসিল—"তোর পায়ে পড়ি ভগ্নু, ঘরের ভেতর অমন করে চেঁচাস্ নে—ছেলেটা ভড়্‌কে উঠবে যে!"

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

পুস্তক-পরিচয়

সরোজ নলিনী—শ্রীগুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস্, প্রণীত। ১৭৬ পৃঃ; ভাল কাগজে ছাপা ও ভাল বাঁধা; মূল্য আট আনা।

এরকম ভাবে ভাল বাঁধা এত বড় বইয়ের দাম আট আনা হওয়া অসম্ভব, তবে গ্রন্থকার তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর জীবন-কথা প্রায় বিনা মূল্যে বিলাইবার জন্যই এত অল্প মূল্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দত্ত-জায়া সরোজ-নলিনী এদেশের নারী-সমাজে সুশিক্ষা ও উন্নতির জন্য অনেক পুণ্যময় অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন আর, সেই জন্য সরকার বাহাদুর তাঁহাকে এম্, বি, ই, উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই পুণ্যময়ীর অকাল মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিতে তাঁহার স্বামী নারী-জাতির কল্যাণকর চিরস্থায়ী কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও তাঁহার শিক্ষাপ্রদ জীবন-চরিত সুখপাঠ্য করিয়া রচনা করিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষেরা সকলেই মনোহর জীবন-চরিত পড়িয়া সুখী হইবেন ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুরাগী হইবেন।

ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটি বৈজ্ঞানিক কারণ—অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্, এ, বি, এস্-সি, প্রণীত। ভাল বাঁধা; ১৯১ পৃঃ; মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থখানিতে যে সাতটি প্রবন্ধ আছে তাহার মধ্যে একটির নাম গ্রন্থখানির অনুরূপ; অন্য প্রবন্ধগুলিতে অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি অনেক মতবাদের সমালোচনা আছে, স্বাস্থ্য-উন্নতির প্রসঙ্গ আছে ও অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক আলোচনা আছে। গ্রন্থকার বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপক আর তাঁহার প্রবন্ধগুলিও তাঁহার বিদ্যা ও খ্যাতির অনুরূপ হইয়াছে। পাঠকেরা অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য অতি সুবোধ্য সরল ভাষায় এই গ্রন্থে পড়িতে পাইবেন।

The Universal religion of Sri Chaitanya—লেখক শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ। ৩১ পৃঃ; মূল্য ছয় আনা।

লেখক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্ম দেশ-কাল অভেদে সকলের গ্রহণীয়, ও উহা অবলম্বনে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় ও অসাম্প্রদায়িক বিশ্বপ্রীতি জন্মে।

* * *

মুক্তির আহ্বান—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত;—৬১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ ডি, এম, লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত,—২৩৪ পৃষ্ঠা,—মূল্য দুই টাকা চারি আনা মাত্র,—অঙ্গসৌষ্ঠব উৎকৃষ্ট।

পুস্তকখানি একখানি উপন্যাস। একটী গরীবের ছেলের ঘরজামাই-জীবন যাপনের বৃত্তান্তই ইহার আখ্যান-বস্তু। উপন্যাস-আমোদী পাঠক ইহা পড়িয়া আনন্দ পাইতে পারেন। কিন্তু ইহা উদ্দেশ্যবিহীন ও বিশেষত্ব-বর্জ্জিত। ইহার অধিকাংশ স্থলে চারুবাবুর "পরগাছার" ছায়াপাত হইয়াছে। লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা—তাঁহার নিকট হইতে আমরা উচ্চশ্রেণীর রচনা আশা করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তাঁহার এই রচনায় রস সঞ্চার করিতে পারেন নাই; রসাভাবে তাঁহার লেখা একঘেঁয়ে হইয়া পড়িয়াছে। পুস্তকখানিতে লেখিকার অনবধানতার পরিচয়ও স্থানে স্থানে আছে। যতীনের পিতা হরিহর মিত্র নিশ্চয়ই কায়স্থ—যতীনের মাতা নারায়ণীর শ্রাদ্ধও চিরানুগত প্রথামত একমাসেই সম্পন্ন হইয়াছিল (১৮৮ পৃঃ), কিন্তু বিজয়া নারায়ণীকে বলিতেছেন, "দিদি **ব্রাহ্মণের** মেয়ে তুমি, তোমাদের আমরা দেবীর অংশ ব'লেই জানি, ভক্তি করি"—(১২৬ পৃঃ)। অপর স্থলে লেখিকা বলিতেছেন, "এ শাসনের একটু মূল্য ছিল, যতীনদের বাড়ী ও বাগান **লক্ষ্মদের জমীতে ছিল**, যতীনের মাকে খাজনা দিতে হইত।" অথচ যতীনের যখন তাহার জমীদার শ্বশুরের সহিত বিবাদ হইল তখন তাহার শ্বশুর বলিতেছেন, "* * * * তার বাড়ী **আমারই জমীতে**। সে মনে করেনি—আমি ইচ্ছা করলে এখনই তার চালা তুলে ফেলতে পারি ইত্যাদি" (১৯৮ পৃঃ) এবং অবশেষে তিনি জামাতার নামে চৌদ্দ বছরের খাজনা মায় স্থদের জন্য নালিশ করিলেন। চৌদ্দ বছরের বাকি খাজনার জন্য নালিশ করা যায় কি? চারি বৎসরের বেশী দিনের বাকি খাজনা কি "তামাদি" হইয়া যায় না? যতীনের শ্বশুরের কর্ম্মচারী যখন আদালতের পেয়াদা প্রভৃতি লইয়া যতীনের বাড়ীতে উপস্থিত তখন কথাপ্রসঙ্গে যতীন বলিতেছে, "* * * * সবই আমার দোষ গাঙ্গুলি মশাই, দোষ আর কারও নেই।" ঠিক এই কথারই পৃষ্ঠে যতীনের স্ত্রী জমীদার-কন্যা ইলা "কে বল্লে দোষ তোমার? দোষ তোমার নয়, দোষ আমার,—(২২৫ পৃঃ)" —বলিয়া সেই স্থানে প্রবেশ করিল। ইহা ক্ষীরোদ

প্রসাদের "প্রতাপাদিত্য" নাটকে "আর আমি পক্ষীর হৃদয় বিদ্ধ করেছি"—বলিয়া বিজয়ার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু লেখিকা ভাবিয়া দেখিবেন, রঙ্গমঞ্চে তাহার যে প্রয়োজন আছে, বর্ত্তমান স্থলে স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনায় ইহার কোন সার্থকতা নাই—বরং ইহা অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকতা দোষ দুষ্ট হইয়াছে।

* * * *

ছেলেদের বিদ্যাসাগর—শ্রীযামিনীকান্ত সোম প্রণীত,—ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত,—৭৬ পৃঃ,—মূল্য ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

এই সুলিখিত পুস্তকখানি সত্যই ছেলেদের উপযুক্ত করিয়া লিখিত হইয়াছে। অতি সহজেই ছেলেরা ইহার আদ্যন্ত পড়িয়া ফেলিবে এবং যে মহাপুরুষের চরিত কথা ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হইয়া উঠিবে। ইহার ভাষা সহজ ও মনোরম, ইহার ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

"বাঙ্গালি" নামের অর্থ কি?—(১ম খণ্ড)—শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী বি, এ, প্রণীত,—ঢাকা হাটখোলা রোড, ভবানীকুটীর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত—৩০ পৃষ্ঠা—মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন,—মহানন্দা ও তিস্তা—এই দুইটী নদীর প্রাচীন নাম "আর্য্যা"। এই আর্য্যা নদীর ব-দ্বীপে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারাই আর্য্য। সুতরাং "বাঙ্গালি" শব্দ "বাঙ্গ+আর্য্য" শব্দের অপভ্রংশ। ইহার অর্থ the Deltaic Aryan, the Real Aryan.

* * * *

শিক্ষা-সঙ্ঘ পত্রিকা—ইহা বিষ্ণুপুর স্কুল হইতে প্রকাশিত। সাধারণতঃ স্কুল বা কলেজ হইতে প্রকাশিত কোন পত্রের সমালোচনা আমরা করি না। কিন্তু ২৪ পরগণার অন্তর্গত নব-প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলটী নূতন প্রথায় পরিচালিত বলিয়া এই পত্রিকাখানিরও কিছু বিশেষত্ব আমরা আশা করিয়াছিলাম। লণ্ডন ও ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের সমবেত চেষ্টায় এই স্কুল স্থাপিত হইয়াছে—ছাত্রদিগের নৈতিক উন্নতি সাধন ও তাহাদের মনে প্রকৃত শিক্ষার বীজ বপনোদ্দেশে ইহার ছাত্রদিগকে স্কুলসংলগ্ন আবাসগৃহেই শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। বাঙ্গালা দেশে এরূপ স্কুল আর বোধ করি নাই। কিন্তু এইরূপ স্কুল প্রকাশিত পত্রিকাখানির মধ্যে কোন বিশেষত্ব আমরা পাইলাম না—ইহা গতানুগতিক হইয়াছে। ছাত্রদিগের রচনাশক্তির স্ফুরণের যথার্থ চেষ্টা হইতেছে—এইরূপ পরিচয় পাইলেই আমরা আনন্দিত হইব।

* * * *

চোখের বালি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত,—বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণ,—মূল্য দুই টাকা মাত্র।

ঋতু-উৎসব—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত,—বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত,—মূল্য দুই টাকা মাত্র।

এই পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের (১) শেষ-বর্ষণ, (২) শারদোৎসব, (৩) বসন্ত, (৪) সুন্দর, ও (৫) ফাল্গুনী —আছে। এণ্টিক কাগজে আর্ট প্রেসে মুদ্রিত,—২১৬ পৃষ্ঠা।

* * * *

গল্প গুচ্ছ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত,—বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত,—মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

ইহাতে রবীন্দ্রনাথের ৩৬টী গল্প আছে। পূর্ব্ব সংস্করণের 'গল্পগুচ্ছ' 'গল্পচারিটি' ও 'গল্পসপ্তক' অন্তর্গত সমস্ত গল্প ও পূর্ব্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই এইরূপ কয়েকটি গল্প এই নূতন সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নটীর পূজা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত,—মূল্য আট আনা মাত্র।

এই নাটকখানি এই প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

সমাজ-রেণু—শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত,—গোকুলনগর গ্রাম ও পোষ্ট (মেদিনীপুর) হইতে শ্রীনিরঞ্জন বিজলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ৯৭ পৃষ্ঠা,—মূল্য আট আনা মাত্র।

হিন্দু সমাজের কয়েকটি বাস্তবচিত্র এই পুস্তিকায় পদ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজে আচারের নামে যে অনাচার, ধর্ম্মের নামে যে অধর্ম্ম, বিচারের নামে যে অবিচার ও ব্যভিচার প্রবেশ লাভ করিয়াছে এগুলি তাহারই প্রতিচ্ছবি।" সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহা পাঠ কালে ইহার মসৃণপত্রপৃষ্ঠে নিজেদের স্বরূপ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর পত্র *

মান্দালয় জেল
২।৫।২৫

প্রিয় দিলীপ,

তোমার ২৪।৩।২৫ তারিখের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তুমি আশঙ্কা করেছিলে যে মাঝে মাঝে যেমন ঘটে এবারও বুঝি তেমনি চিঠিখানাকে "double distillation" এর ভিতর দিয়ে আসতে হবে; কিন্তু এবার তা হয় নি এবং সে জন্যে খুবই সুখী হয়েছি।

তোমার চিঠি হৃদয়তন্ত্রীকে এমনই কোমলভাবে স্পর্শ করে চিন্তা ও অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করেছে যে আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সুকঠিন। এ চিঠিখানিকে যে আবার "Censor" এর হাত অতিক্রম করে যেতে হবে সেও আর এক অসুবিধা; কেননা, এটা কেউ চায় না যে তার অন্তরের গভীরতম প্রবাহগুলি দিনের উন্মুক্ত আলোতে প্রকাশ হয়ে পড়ুক। তাই এই পাথরের প্রাচীর ও লৌহদ্বারের অন্তরালে বসে আজ যা ভাবছি ও যা অনুভব করছি তার অনেকখানিই কোনও এক ভবিষ্যৎ কাল পর্য্যন্ত অকথিতই রাখতে হবে।

আমাদের মধ্যে এতগুলি যে অকারণে বা কোন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে জেলে আছি সেই চিন্তা তোমার প্রবৃত্তি ও মার্জ্জিত রুচিকে আঘাত কর্ব্বে এটা সম্পূর্ণ স্বভাবিক। কিন্তু ঘটনাগুলি যখন মেনে চল্‌তেই হচ্ছে তখন সমস্ত ব্যাপারটাকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও দেখা

* ইংরাজী হইতে অনূদিত।

যেতে পারে। এ কথা আমি বল্‌তে পারি না যে জেলে থাকাটাই আমি পছন্দ করি—কেননা, সেটা নিছক ভণ্ডামি হ'য়ে পড়ে। আমি বরং আরও বলি যে কোন ভদ্র বা সুশিক্ষিত ব্যক্তি কারাবাস পছন্দ করতেই পারেন না। জেলখানার সমস্ত আবহাওয়াটা মানুষকে যেন বিকৃত ও অমানুষ করে তোলারই উপযোগী, এবং আমার বিশ্বাস এ কথাটা সকল জেলের পক্ষেই খাটে। আমার মনে হয় অপরাধীদের অধিকাংশেরই কারাবাসকালে নৈতিক উন্নতি হয় না, বরং তারা যেন আরও হীন হয়ে পড়ে। এ কথা আমাকে বলতেই হবে যে এতগুলো জেলে বাস করার পর কারাশাসনের একটা আমূল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং ভবিষ্যতে কারা-সংস্কারই আমার একটা কর্ত্তব্য হবে। ভারতীয় কারাশাসন প্রণালী একটা খারাপ (অর্থাৎ ব্রিটিশ্‌ প্রণালীর) আদর্শের অনুকরণ মাত্র, ঠিক যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটা খারাপ, অর্থাৎ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শের অনুকরণ। কারা-সংস্কার বিষয়ে আমাদের বরং আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স্‌-এর মত উন্নত দেশ গুলির ব্যবস্থাই অনুসরণ করা উচিত।

এই ব্যবস্থার যেটি সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সে হচ্ছে একটা নূতন প্রাণ, বা, যদি বল, একটা নূতন মনোভাব; এবং অপরাধীদের প্রতি একটা সহানুভূতি। অপরাধীদের প্রবৃত্তিগুলিকে মানসিক ব্যাধি বলেই ধরতে হবে এবং সেই ভাবেই তাদের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রতিবেধমূলক দণ্ডবিধি—যেটা কারাশাসন বিধির ভিতরের কথা বলে ধরা যেতে পারে—তাকে এখন সংস্কারমূলক নূতন দণ্ডবিধির জন্যে পথ ছেড়ে দিতে হ'বে।

আমার মনে হয় না আমি যদি স্বয়ং কারাবাস না করতাম তা হলে একজন কারাবাসী বা অপরাধীকে ঠিক সহানুভূতির চোখে দেখ্‌তে পারতাম। এবং এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে আমাদের দেশের আর্টিষ্ট বা সাহিত্যিকগণের যদি কিছু কিছু কারাজীবনের অভিজ্ঞতা থাকৃত তা হলে আমাদের শিল্প এবং সাহিত্য অনেকাংশে সমৃদ্ধ হ'তো। কাজি নজরুল ইসলামের কবিতা যে তার জেলের অভিজ্ঞতার নিকট কতখানি ঋণী সে কথা বোধ হয় ভেবে দেখা হয় না।

আমি যখন ধীরভাবে চিন্তা করি তখন আমার নিঃসংশয় ধারণা জন্মে যে আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্টের অন্তরে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে। যদি আমাদের জীবনের সকল মুহূর্ত্ত ব্যেপে এই ধারণাটা প্রসারিত হ'য়ে থাকৃত তা হলে দুঃখ কষ্টের আর কোন যন্ত্রণা থাকত না, এবং বন্দী দশায়ও মানুষ আদর্শ সুখের দেখা পেত। কিন্তু তা-ত সাধারণতঃ সম্ভব হয় না, এবং তাইতেই ত আত্মা ও দেহের মধ্যে এই অবিরাম দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলেছে।

সাধারণতঃ একটা দার্শনিক ভাব বন্দী-দশায় মানুষের অন্তরে শক্তি সঞ্চার করে। আমি ত সেইখানেই আমার দাঁড়াবার ঠাঁই করে নিয়েছি, এবং দর্শন বিষয়ে যতটুকু পড়াশুনা

করা গেছে সেটুকু এবং জীবন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে তাও আমার বেশ কাজে লেগেছে। মানুষ যদি তার নিজের অন্তরে ভেবে দেখবার মত যথেষ্ট বিষয় খুঁজে পায়, বন্দী হলেও তার কষ্ট নেই, অবশ্য যদি তার স্বাস্থ্য অটুট থাকে। কিন্তু আমাদের কষ্ট ত শুধু আধ্যাত্মিক নয়—সে যে শরীরেরও কষ্ট; এবং আত্মা প্রস্তুত থাকলেও, দেহ যে সময় সময় দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। ৺লোকমান্য তিলক কারাবাস কালে গীতার সমালোচনা লেখেন, এবং আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে মনের দিক দিয়ে তিনি সুখে দিন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়েও আমার নিশ্চিত ধারণা যে মান্দালয় জেলে ছ'বছর বন্দী হয়ে থাকাটাই তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণ।

এ কথা আমাকে বলতেই হবে যে জেলের মধ্যে যে নির্জ্জনতায় মানুষকে বাধ্য হয়ে দিন কাটাতে হয় সেই নির্জ্জনতাই তাকে জীবনের চরম সমস্যাগুলি তলিয়ে বুঝবার সুযোগ দেয়। আমার নিজের সম্বন্ধে এ কথা বলতে পারি যে আমাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নই বছর খানেক আগের চেয়ে এখন যেন অনেকটা সমাধানের দিকে পৌছচ্ছে। যে সমস্ত মতামত এক সময়ে নিতান্ত ক্ষীণ ভাবে চিন্তা বা প্রকাশ করা যেত, আজ যেন সেগুলো বেশ স্পষ্ট ও পরিষ্কার হ'য়ে উঠ্‌ছে। আর কোন কারণে না হলেও শুধু এই জন্যেই আমার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অনেকখানি লাভবান হ'তে পারব।

আমার কারাবাস ব্যাপারটাকে তুমি একটা "Martyrdom" বলে অভিহিত করেছ। অবশ্য ও কথাটা তোমার গভীর অনুভূতির ও প্রাণের মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। কিন্তু আমার সামান্য কিছু "humour" ও "Proportion"এর জ্ঞান আছে (অন্ততঃ আশা করি যে আছে) এবং নিজেকে 'Martyr' বলে মনে করার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই। স্পর্দ্ধা বা আত্মম্ভরিতা জিনিসটাকে আমি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে চাই; অবশ্য সে বিষয়ে কতখানি সফল হয়েছি তা শুধু আমার বন্ধুরাই বলতে পারেন। তাই Martyrdom জিনিসটা আমার কাছে বড় জোর একটা আদর্শই হতে পারে।

আমার বিশ্বাস বেশী দিনের মেয়াদীর পক্ষে সব চেয়ে বড় বিপদ এই যে আপনার অজ্ঞাতসারে তাকে অকাল বার্দ্ধক্য এসে চেপে ধরে, সুতরাং এ দিকে তার বিশেষ সতর্ক থাকাই উচিত। তুমি ধারণাই করতে পার না কেমন করে মানুষ দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে ধীরে ধীরে দেহে ও মনে অকালবৃদ্ধ হয়ে যেতে থাকে। অবশ্য অনেকগুলি কারণই এর জন্যে দায়ী—যথা, খারাপ খাদ্য, ব্যায়াম বা স্ফূর্ত্তির অভাব, সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন থাকা, একটা অধীনতার শৃঙ্খল ভার, বন্ধুজনের অভাব, এবং সঙ্গীতের অভাব যা' সর্ব্বশেষে উল্লিখিত হলেও একটা মস্ত অভাব। কতকগুলি অভাব আছে যা মানুষ ভেতর থেকে

পূর্ণ করে তুল্‌তে পারে, কিন্তু আবার কতকগুলি আছে যেগুলি বাইরের বিষয় দিয়ে পূর্ণ করতে হয়। এই সব বাইরের বিষয়গুলি থেকে বঞ্চিত হওয়াটা অকাল বার্দ্ধক্যের জন্য বড় কম দায়ী নয়। আলিপুর জেলে ইউরোপীয় বন্দীদের জন্যে সঙ্গীতের সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত আছে কিন্তু আমাদের নেই। পিকৃনিক্, বিশ্রম্ভালাপ, সঙ্গীত চর্চ্চা, সাধারণ বক্তৃতা, খোলা জায়গায় খেলাধুলা করা, মনোমত কাব্য সাহিত্যের চর্চ্চা—এই সমস্ত বিষয় আমাদের জীবনকে এতখানি সরস ও সমৃদ্ধ করে তোলে যে আমরা সচরাচর তা বুঝতে পারি না, এবং যখন আমাদিগকে জোর করে বন্দী করে রাখা হয় তখনই তাদের মূল্য বুঝতে পারা যায়। যতদিন জেলের মধ্যে বেশ স্বাস্থ্যকর ও সামাজিক বিধি ব্যবস্থার বন্দোবস্ত না হয়, ততদিন কয়েদীদের সংস্কার হওয়া অসম্ভব, এবং ততদিন জেলগুলি আজ কালকার মত নৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর না হয়ে অবনতিরই কেন্দ্র হয়ে থাকবে।

এ কথা আমার লিখ্‌তে ভোলা উচিত নয় যে আপনার নিজের লোকের, বন্ধুবান্ধবের এবং সর্ব্ব সাধারণের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা মানুষকে জেলের মধ্যেও অনেকখানি সুখ দিতে পারে। এই দিকের প্রভাবটা নিতান্ত অজ্ঞাতসারে ও সূক্ষ্ম ভাবে কাজ করলেও নিজের মনটাকে আমি বিশ্লেষণ করে দেখ্‌তে পাই যে এই ভাব কিছুতেই কম বাস্তব নয়। সাধারণ ও রাজনৈতিক অপরাধীদের অদৃষ্টের পার্থক্যের এটা একটা নিশ্চিত কারণ। যে রাজনৈতিক অপরাধী, সে জানে মুক্তি পেলে সমাজ তাকে বরণ করে নেবে। কিন্তু সাধারণ অপরাধীদের তেমন কোন সান্ত্বনাই নেই। সে বোধ হয় তার বাড়ী ছাড়া আর কোথাও কোন সহানুভূতিই আশা করতে পারে না, এবং সেইজন্যেই সাধারণের কাছে মুখ দেখাতে সে লজ্জা পায়। আমাদের yardএ যে সমস্ত কয়েদীদের কাজ করতে হয় তাদের কেউ কেউ আমাকে বলে যে তাদের নিজের লোকেরা জানেই না যে সে জেলে বন্দী; লজ্জায় তারা বাড়ীতে কোন সংবাদও দেয় নি। এ ব্যাপারটা আমার কাছে নিতান্ত অসন্তোষজনক বলে মনে হয়। সভ্য সমাজ অপরাধীদের প্রতি আরও সহানুভূতি কেন দেখাবে না?

আমার জেলের অভিজ্ঞতা বা তার থেকে যে সমস্ত চিন্তা মনে আসে সে সম্বন্ধে পাতার পর পাতা লিখে যেতে পারি কিন্তু একটা চিঠির ত শেষ আছে। আমার যদি বেশী শক্তি ও উদ্যম থাকৃত তা'হলে একখানা বই লিখে ফেলার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সে চেষ্টার উপযুক্ত সামর্থ্য আমার নেই।

আমাদের জেলের কষ্ট দৈহিক অপেক্ষা বেশী রকম মানসিক বলে মনে করার আমি পক্ষপাতী। যেখানে অত্যাচার বা অপমানের আঘাত যথা সম্ভব কমে আসে সেখানে বন্দী জীবনটা ততটা যন্ত্রণাদায়ক হয় না। এই সমস্ত সূক্ষ্ম ধরণের আঘাত উপর হতেই আসে, জেলের কর্ত্তাদের এ বিষয়ে বিশেষ কিছু হাত থাকে না। আমার অন্ততঃ এই রকমই অভিজ্ঞতা।

এই যে সব আঘাত বা উৎপীড়ণ এগুলো আঘাতকারীর প্রতিই মানুষের মনকে আরও বিমুখ করে দেয়, এবং সেই দিক দিয়ে দেখলে মনে হয় এগুলোর উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়। কিন্তু পাছে আমরা আমাদের পার্থিব অস্তিত্ব ভুলে যাই এবং নিজেদের অন্তরের মধ্যে একটা আদর্শ আনন্দধাম গড়ে তুলি, তাই এই সব আঘাত আমাদের উপর বর্ষণ করে আমাদের স্বপ্নাবিষ্ট আত্মাকে জাগিয়ে তুলে দেখিয়ে দেয় যে আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কি কঠোর ও নিরানন্দময়।

তুমি বলেছ যে মানুষের অশ্রু দিনের পর দিন কেমন করে সমস্ত পৃথিবীর মাটিকে একেবারে তলা পর্য্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে,—এই দৃশ্য তোমাকে প্রতিদিন গম্ভীর ও বিষণ্ণ করে তুলছে। কিন্তু এ অশ্রু সবটুকুই দুঃখের অশ্রু নয়। তার মধ্যে করুণা ও প্রেমবিন্দুও আছে। সমৃদ্ধতর ও প্রশস্ততর আনন্দ স্রোতে পৌঁছবার সম্ভাবনা থাকলে কি তুমি দুঃখ কষ্টের ছোট-খাট অগভীর ঢেউগুলি পার হয়ে যেতে অরাজি হতে? আমি নিজেত দুঃখবাদ বা নিরুৎসাহের কোন কারণ দেখি না। বরং আমার মনে হয় দুঃখ ও যন্ত্রণা উন্নততর কর্ম্ম ও উচ্চতর সফলতার অনুপ্রেরণা এনে দেবে। তুমি কি মনে কর বিনা দুঃখ কষ্টে যা লাভ করা যায়, তার কোন মূল্য আছে?

তুমি কিছুদিন পূর্ব্বে যে সব বই পাঠিয়েছিলে তার সবগুলিই পেয়েছি। সেগুলি এখন ফিরে পাঠাতে পারব না, কারণ তাদের অনেক পাঠক জুটেছে। তোমার পছন্দ যে রকম সুন্দর তাতে একথা বলা অনাবশ্যক যে আরও বই সাদরে গৃহীত হবে।

মান্দালয় সেণ্ট্রাল জেল।
২৫।৬।২৫

প্রিয় দিলীপ,

আমার শেষ চিঠির পরে তোমার কাছ থেকে সর্ব্বসমেত তিনখানি চিঠি পেয়েছি। চিঠি-গুলির তারিখ হচ্ছে ৬ই মে, ১৫ই মে ও ১৫ই জুন।

তোমার প্রেরিত বইএর শেষ পার্শেলটা পেয়েছি। টুর্গেনিভের Smoke বইটা পাই নি। আপিসে পার্শেলটি খোলা হয়েছিল, সুতরাং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে এ বিষয় খোঁজ নিতে বলেছি। দরকার হলে কল্‌কাতায় C. I. D. আপিসে তিনি খোঁজ করবেন। তুমিও D. I. G., C. I. D. কে লিখে এ বিষয়ে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পার।

Bertrand Russel-এর "Prospects of Industrial Civilisation" খানি বহরমপুর জেলে কয়েকজন কয়েদীর কাছে আছে। আমাদের যখন স্থানান্তরিত করা হয়, তখন অনেকেই

সেই বইখানি কাছে রাখবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, আর বাস্তবিক একজন তখনও বইটা পড়ছিলেন। বইখানা তোমার দরকার হবে সে কথা না জেনে সেখানে রেখে এসেছিলাম। রাসেলের বইগুলির আদর এত বেশী যে একখানা পেলে কেউ শীঘ্র ছাড়তে চায় না। বহরমপুর জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে আজ লিখলাম তিনি যেন তোমার কাছে বইখানি পাঠিয়ে দেন। তুমিও তাঁকে লিখতে পার, তাতে কাজটার তাগাদা হবে। তোমার অত দরকারের সময় বইটা আটকে রাখার জন্যে দায়ী বলে বিশেষ দুঃখিত, কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ এত অসুবিধার কথা আগে আমি ভেবে উঠতে পারি নি। "Free thought and official propaganda" ত আমার কাছে নেই—এ বইটা তুমি আমাকে পাঠাও নি।

বই বেছে দেওয়ার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা সকলে আশা করি তুমি যে কাজ আরম্ভ করেছ ভগবানের ইচ্ছায় তা ভাল-ভাবেই চলবে। তোমার লেখাগুলি যে আমি সসম্মানে পাঠ করব সে কথা বিশেষ করে বলার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। বই প্রকাশ করবার সময় প্রচ্ছদপটের দিকে যেন নজর রেখো। এইমাত্র একখানা হালের "বঙ্গবাণী"তে রবীন্দ্রনাথের উপর তোমার লেখা একটা প্রবন্ধ দেখলাম। আমি এখনও সেটা পড়িনি কিন্তু বিষয়টা চিত্তাকর্ষক বলেই বোধ হল।

তুমি জান আজকের দিনে কিসে আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমার বিশ্বাস আমাদের সকলেরই আজ একই চিন্তা—সে হচ্ছে মহাত্মা দেশবন্ধুর দেহত্যাগ। কাগজে যখন এই দারুণ সংবাদ দেখি তখন এ দুটো চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু হায়! সংবাদটা নিতান্তই নির্ম্মম সত্য। আমরা সমগ্র জাতিটাই যেন নিতান্ত হতভাগ্য বলে মনে হচ্ছে।

যে সব চিন্তা আমার অন্তরকে তোলপাড় করছে সে সব চিন্তাগুলি বাইরে প্রকাশ করে মনকে লাঘব করতে চাইলেও, আমার কষ্টের সহিত সংযত হ'তে হবে। যে সব চিন্তা আজ মনে উদয় হচ্ছে সেগুলি এত পবিত্র, এত মূল্যবান যে অচেনা লোকদের কাছে তা প্রকাশ করা যায় না—আর Censor দের ত অচেনা অজানা মনে না করে পারি না। আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে সমগ্র দেশের ক্ষতি যদি অপূরণীয়ই হয়ে থাকে, বাংলার যুবকদের পক্ষে এ একটা সবচেয়ে বড় সর্ব্বনাশ—সত্যই এটা স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছে!

আজকের দিনে এত বিচলিত ও শোকাচ্ছন্ন হয়েছি এবং সেই সঙ্গে মনোজগতে সেই স্বর্গীয় মহাত্মার এত কাছাকাছি নিজেকে অনুভব করছি যে তাঁর গুণাবলী বিশ্লেষণ করে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখা মোটেই সম্ভব নয়। আমি তাঁর অত্যন্ত কাছে থেকে নিতান্ত অসতর্ক মুহূর্ত্ত গুলিতে তাঁর যে ছবি দেখেছিলাম সময় এলে জগতের সামনে তার কথঞ্চিত আভাস দিতে পারিব আশা করি। তাঁর সম্বন্ধে আমার মত যাঁরা অনেক কথাই জানেন, তাঁরা, পারলেও, আজ

কিছু বলতে সাহস করছেন না, কেন না, আশঙ্কা হয়, তাঁর মহত্ত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে না পেরে তাঁকে ছোট করে ফেলেন।

তুমি যখন ফলতঃ এই কথাটাই বল যে দুঃখ কষ্টের শেষ শুধু দুঃখ কষ্টই নয়, তখন আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত। জীবনে অবশ্য এমন সমস্ত ট্রাজেডি আছে—এই যেমন এখন একটা আমাদের উপর এসে পড়েছে—যেগুলিকে আমি সানন্দে বরণ করে নিতে পারি না। আমি এতবড় তত্ত্বজ্ঞানী বা এতবড় ভণ্ড নই যে বলব, আমি সকল প্রকার দুঃখ কষ্টই আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভেবে দেখতে হয় যে কতকগুলি এমন হতভাগ্যও আছে—হয়ত তারা সত্য সত্যই ভাগ্যবান—যারা সকল রকম দুঃখ কষ্ট ভোগ করবার জন্যেই যেন নির্দ্দিষ্ট আছে। বেশী কম যাই হোক, যদি কাউকে পাত্রভরে দুঃখ পান করতে হয় তা হলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়ে পান করা ভাল। এমনি একটা আত্মনিবেদন বা আত্ম-সমর্পণের ভাব চীনের প্রাচীরের মত অদৃষ্টের সমস্ত আঘাত একেবারে ব্যর্থ করে দিতে না-ও পারে। কিন্তু এতে নিশ্চয়ই আমাদের স্বাভাবিক সহিষ্ণুতার শক্তি অনেকখানি বাড়িয়ে তোলে। Bertrand Russel যখন বলছেন যে জীবনে এমন সমস্ত ট্রেজেডি আছে যার হাত থেকে মানুষ নিষ্কৃতিই পেতে চায়, তখনত তিনি খাঁটি সংসারী লোকের অভিমতই প্রকাশ করছেন। এবং আমার বিশ্বাস যে, কেবল নিষ্কলঙ্ক সাধু ব্যক্তি অথবা সাধুত্বের ভান করে যে ভণ্ড সে-ই, এ কথার প্রতিবাদ করবে।

যারা ভাবুক বা তত্ত্বজ্ঞানী নয় তাদের যন্ত্রণাটা সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন মনে করাটা হয়ত তোমার ঠিক হচ্ছে না। তত্ত্বজ্ঞানহীনদের (abstract point of view থেকে আমি তাদের তত্ত্বজ্ঞানহীনই বলি) নিজেদেরও একটা idealism আছে। তারা তাকে পূজার সামগ্রী মনে ক'রে শ্রদ্ধা করে, ও ভালবাসে; নানা প্রকার দুঃখ যন্ত্রণার সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় সেই ভালবাসার উৎস হতেই তারা সাহস ও ভরসা পায়। এখানে আমার সঙ্গে যারা কারা-যন্ত্রণা ভোগ করছে, তাদের মধ্যে অনেকে এমন আছে যারা ভাবুক বা দার্শনিক নয়, তবুও তারা শান্তভাবে যন্ত্রণা ভোগ করে এবং বীরের মত সহ্য করে। Technical অর্থে তারা দার্শনিক না হতে পারে, কিন্তু তাদের আমি সম্পূর্ণরূপে ভাব-বিবর্জ্জিত মনে করতে পারি না। সম্ভবতঃ জগতের সর্ব্বত্র যারা কর্ম্মী তাদের সম্বন্ধে সাধারণতঃ এ কথা খাটে।

সাধারণের মনে একটা ধারণা আছে যে, অপরাধীদের যখন ফাঁসিকাঠে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাদের একটা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য আসে, এবং যারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রাণ দেয়, তারাই শুধু বীরের মত মরতে পারে। এ ধারণাটা ঠিক নয়। এ সম্বন্ধে আমি কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ অপরাধীরা সাহসের সহিত প্রাণ দেয়, এবং ফাঁসির দড়ি তাদের গলায় বসবার আগে ভগবানের

পায়েই আত্মনিবেদন করে। একেবারে ভেঙ্গে মুষড়ে পড়াটা বড় একটা দেখা যায় না। একবার এক কারাধ্যক্ষ আমাকে বলেছিলেন যে একজন ফাঁসির কয়েদী তাঁর কাছে স্বীকার করেছিল যে সে একজনকে হত্যা করেছিল। সে তার কাজের জন্যে অনুতপ্ত কি না জিজ্ঞাসা করায় সে বলেছিল যে তার মোটেই অনুতাপ হয় নি, কারণ, হত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার ন্যায্য অনুযোগ ছিল। তারপর সে বীরদর্পে ফাঁসি কাঠে উঠেছিল এবং প্রাণ দিয়েছিল, কিন্তু একটী পেশীর সঙ্কোচনও তার বুঝতে পারা যায় নি।

অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করে আমার চোখ খুলে গেছে। আমার মনে হয় মোটের উপর তাদের প্রতি যথেষ্টই অবিচার করা হয়। সে বারে অর্থাৎ ১৯২২ সালে যখন আমি জেলে ছিলাম তখন একটা কয়েদী আমাদের yardএ ভৃত্যের কাজ করত। সে সময়ে আমি মহাপ্রাণ দেশবন্ধুর সহিত এক কারাপ্রাঙ্গণে একই ঘরে বাস করতাম। দেশবন্ধুর প্রাণটা ছিল খুবই কোমল, তাই সহজেই এই কয়েদীর দিকে তিনি কেমন আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। সে একটা পুরাণো পাপী, আটবার তার সাজা হয়। কিন্তু সেও কেমন নিজের অজ্ঞাতসারেই দেশবন্ধুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে, এবং আশ্চর্য্য রকমের ভক্তির পরিচয় দেয়। কারামুক্তির সময় দেশবন্ধু তাকে বলেছিলেন যে জেল থেকে মুক্তি পেলে সে যেন বরাবর তাঁর কাছে যায় আর তার পুরাণো সহচরদের ছায়া যেন না মাড়ায়। কয়েদীটি রাজী হয়েছিল ও কথামত কাজও করেছিল। তুমি শুনলে আশ্চর্য্য হবে যে, যে ব্যক্তি একসময়ে পুরাণো দাগী ছিল, সে এখন উপরোক্ত ঘটনার পর থেকে তাঁর বাড়ীতে বাস করছে এবং মাঝে মাঝে অভদ্র মেজাজ তার দেখা দিলেও সে যে এখন শুধু একেবারে অন্য মানুষ তাই নয়, অধিকন্তু বেশ সরল ভাবেই জীবন কাটাচ্ছে; এবং আজ এই ক্ষতি যাদের সব চেয়ে বেশী বেজেছে তাদের মধ্যে এও একজন। অনেকে বলেন যে মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনা দিয়ে তার মহত্ত্বের বিচার করা উচিত—একথা যদি সত্য হয় তবে তাঁর দেশের কাজের দিকটা বাদ দিলেও স্বর্গীয় দেশবন্ধু একজন মহাপুরুষ ছিলেন।

আমি আমার আসল বক্তব্য থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি, এবং এখন আমার থামা উচিত। তোমার চিঠির জবাব লেখা এখনও শেষ করতে পারলাম না, কিন্তু আজকের ডাক ধরতে গেলে আমাকে এইখানেই শেষ করতে হয়। আমি জানি তুমি আমার খবর পাবার জন্যে উদ্বিগ্ন থাকবে, সুতরাং আজকের ডাক ধরতেই হবে। পরের পত্রে আরও খবর লিখব। ইতি

স্নেহাসক্ত—সুভাষ

সজল ভাদরে

ওগো আমার মন-কাননের
তাপস বালিকা
ফুটেও তুমি ফুট্‌বে না যে
কিসের ভয়ে কিসের লাজে ?
ফাগুন ভোরের আধফোটা যুঁই
কমল কলিকা—!

ভ্রমর এসে গুনগুনিয়ে
যায় যে কত গান শুনিয়ে
আপন ভেবে প্রাণের কথা
শোনায় গোপনে
তোমার থাক্‌তে বুকে অঢেল মধু
ফিরিয়ে দেবে ভোম্‌রা বঁধু
যখন ফুট্‌বে জানি দখিন হাওয়ায়
বুকের কাঁপনে

তখন ফুটেই দেখ দু'দিন আগে
লজ্জা তেয়াগী—
ওগো আমার কুঞ্জ বনের
আদর সোহাগী

সহজ পাওয়ার মাঝে তুমি
সহজ হয়ে আস
নিশিদিনের দণ্ড পলে
আমায় ভালবাস
আমি তোমায় চাই কি না চাই হায়
বুকের মাঝে তোমায় রেখে বুঝতে
পারা দায় !

দৃষ্টি তোমার মিষ্টি লাগে
আড়াল হতে বাণী
এই সুদূরে মধুর লাগে
তোমার মুখের বাণী

সারা বেলার হেলা ফেলার অটুট আলিঙ্গন
আজকে দেখি নিবিড় হয়ে জড়ায় দেহ মন।
এক নিমেষের সঙ্গ লাভের
সেই যে অনুরোধ
দূর পথের ঐ হাতছানি তার
নেয় যে প্রতিশোধ

মুখের ছোট একটি কথা
অধর কোনের হাসি
বিনিময়ে নাম কিনেছ
হায়রে সর্ব্বনাশী—

আজকে দেখি তারায় তারায় লক্ষ যোজন ব্যেপে
নয়ন তারার চাউনিটুকু উঠ্‌ছে কেঁপে কেঁপে
অধর কোনের হাসিতে আজ জ্যোৎস্না ছড়ায় ফুল
কথার গাঙের জোয়ার জলে উঠ্‌ল ভরে কূল।

হায় গা রাণী, অভিমানী
মনকে করে চুরি
দূরের বঁধুর আপশোষে আজ
কিন্‌বে বাহাদুরী ?

খুলবে না দল এতই সরম
এই কি প্রিয়ে কুঁড়ির ধরম ?
ভুলে গেছ আপনাকে কি
সোহাগ আদরে
ওগো, গন্ধ মধুর কদর বেশী
সজল ভাদরে।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

প্রতিধ্বনি

বর্ত্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা

(শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

কোন একটা কথা বহু লোকে মিলিয়া বহু আস্ফালন করিয়া বলিতে থাকিলেই কেবল বলার জোরেই তাহা সত্য হইয়া উঠে না। অথচ এই সম্মিলিত প্রবল কণ্ঠস্বরের একটা শক্তি আছে এবং মোহও কম নাই। চারিদিক গম্ গম্ করিতে থাকে,—এবং এই বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশের নীচে দুই কানের মধ্যে যাহা নিরন্তর প্রবেশ করে মানুষ অভিভূতের মত তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসে। Propaganda বস্তু ত এইই। বিগত মহাযুদ্ধের দিনে পরস্পরের গলা কাটিয়া বেড়ানোই যে মানুষের একমাত্র ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য, এই অসত্যকে সত্য বলিয়া যে দুই পক্ষের লোকেই মানিয়া লইয়াছিল সে তো কেবল অনেক কলম এবং অনেক গলার সমবেত চীৎকারের ফলেই। যে দুই একজন প্রতিবাদ করিতে গিয়াছিল, আসল কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের অবধি ছিল না।

কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। আজ অপরিসীম বেদনা ও দুঃখভোগের ভিতর দিয়া মানুষের চৈতন্য হইয়াছে যে সত্য বস্তু সেদিন অনেকের অনেক বলার মধ্যেই ছিল না।

বছর কয়েক পূর্ব্বে, মহাত্মার অহিংস অসহযোগের যুগে এমনি একটা কথা এ দেশে বহু নেতায় মিলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে হিন্দু-মুসলিম মিলন চাইই। চাই শুধু কেবল জিনিসটা ভাল বলিয়া নয়, চাই-ই এই জন্য, যে এ না হইলে স্বরাজ বল, স্বাধীনতা বল তাহার কল্পনা করাও পাগ্‌লামি। কেন পাগালামি এ কথা যদি কেহ তখন জিজ্ঞাসা করিত, নেতৃবৃন্দেরা কি জবাব দিতেন তাঁহারাই জানেন, কিন্তু লেখায়, বক্তৃতায় ও চীৎকারের বিস্তারে কথাটা এম্‌নি বিপুলায়তন ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য হইয়া গেল যে এক পাগল ছাড়া আর এত বড় পাগ্‌লামি করিবার দুঃসাহস কাহারও রহিল না।

তারপরে এই মিলন-ছায়াবাজীর রোশনাই যোগাইতেই হিন্দুর প্রাণান্ত হইল। সময় এবং শক্তি কত যে বিফলে গেল তাহার ত হিসাবও নাই। ইহারই ফলে মহাত্মাজীর খিলাফৎ আন্দোলন, ইহারই ফলে দেশবন্ধুর প্যাক্ট। অথচ এত বড় দুটা ভুয়া জিনিসও ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে কম আছে। প্যাক্টের তবু বা কতক অর্থ বুঝা যায়, কারণ, কল্যাণের হৌক, অকল্যাণের হৌক, সময় মত একটা ছাড়রফা করিয়া কাউন্সিল ঘরে বাঙ্গলা সরকারকে পরাজিত করিবার একটা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নয়, অসত্য। কোন মিথ্যাকেই অবলম্বন করিয়া জয়ী হওয়া যায় না। এবং যে মিথ্যার জগদ্দল পাথর গলায় বাঁধিয়া এত বড় অসহযোগ আন্দোলন শেষ পর্য্যন্ত রসাতলে গেল সে এই খিলাফৎ। স্বরাজ চাই, বিদেশীর শাসন পাশ হইতে মুক্তি চাই, ভারতবাসীর এই দাবীর বিরুদ্ধে ইংরাজ হয়ত একটা যুক্তি খাড়া করিতে পারে, কিন্তু বিশ্বের দরবারে তাহা টিকে না। পাই বা না পাই, এই জন্মগত অধিকারের জন্য লড়াই করায় পুণ্য আছে, প্রাণপাত হইলে অন্তে স্বর্গবাস হয়। এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারে জগতে এমন কেহ নাই। কিন্তু খিলাফৎ চাই এ কোন্ কথা? যে দেশের সহিত ভারতের সংশ্রব নাই, যে

দেশের মানুষে কি খায়, কি পরে, কি রকম তাহাদের চেহারা কিছুই জানি না, সেই দেশ পূর্ব্বে তুর্কির শাসনাধীন ছিল, এখন যদিচ, তুর্কি লড়াইয়ে হারিয়াছে, তথাপি সুলতানকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হউক, কারণ, পরাধীন ভারতীয় মুসলমান সমাজ আবদার ধরিয়াছে। এ কোন্ সঙ্গত প্রার্থনা? আসলে ইহাও একটা প্যাক্ট। ঘুষের ব্যাপার। যেহেতু আমরা স্বরাজ চাই, এবং তোমরা চাও খিলাফৎ—অতএব এস, একত্র হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য মাথা খুঁড়ি এবং তোমরা স্বরাজের জন্য তাল ঠুকিয়া অভিনয় সুরু কর। কিন্তু এদিকে ব্রিটিশ্ গভর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিল না, এবং ওদিকে যাহার জন্য খিলাফৎ সেই খলিফাকেই তুর্কিরা দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল। সুতরাং এইরূপে খিলাফৎ আন্দোলন যখন নিতান্তই অসার ও অর্থহীন হইয়া পড়িল, তখন নিজের শূন্যগর্ভতায় সে শুধু নিজেই মরিল না, ভারতের স্বরাজ আন্দোলনেরও প্রাণবধ করিয়া গেল। বস্তুতঃ এমন ঘুষ দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, পিঠ চাপড়াইয়া কি স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামে লোক ভর্ত্তি করা যায়, না করিলেই বিজয় লাভ হয়? হয় না, এবং কোন দিন হইবে বলিয়াও মনে করি না।

এই ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি খাটিয়াছিলেন মহাত্মাজী নিজে। এতখানি আশাও বোধ করি কেহ করে নাই, এত বড় প্রতারিতও বোধ করি কেহ হয় নাই। সেকালে বড় বড় মুস্‌লিম পাণ্ডাদের কেহ বা হইয়াছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত, কেহ বা বাম হস্ত, কেহ বা চক্ষু কর্ণ, কেহ বা আর কিছু—হায় রে! এত বড় তামাসার ব্যাপার কি আর কোথাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে! পরিশেষে হিন্দু মুসলমান মিলনের শেষ চেষ্টা করিলেন তিনি দিল্লীতে—দীর্ঘ একুশ দিন উপবাস করিয়া। ধর্ম্মপ্রাণ সরলচিত্ত সাধু মানুষ তিনি, বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, এতখানি যন্ত্রণা দেখিয়াও কি তাহাদের দয়া হইবে না! সে যাত্রা কোন মতে প্রাণটা তাঁহার টিকিয়া গেল। ভ্রাতার অধিক, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় মিঃ মহম্মদ আলিই বিচলিত হইলেন সব চেয়ে বেশী। তাঁহার চোখের উপরেই সমস্ত ঘটিয়াছিল,—অশ্রুপাত করিয়া কহিলেন, আহা! বড় ভাল লোক এই মহাত্মাজীটি। ইহার সত্যকার উপকার কিছু করাই চাই। অতএব আগে যাই মক্কায়, গিয়া পীরের সিন্নি দিই, পরে ফিরিয়া আসিয়া কলমা পড়াইয়া কাফের ধর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া তবে ছাড়িব।

শুনিয়া মহাত্মা কহিলেন, পৃথিবী দ্বিধা হও।

বস্তুতঃ, মুসলমান যদি কখনও বলে হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।

একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুতঃ অপরের ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের পরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায় কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই।

দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নাম-জাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই। আজ মনে হয় এ সংস্কার উহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। পাবনায় বীভৎস ব্যাপারে অনেককেই বলিতে শুনি, পশ্চিম হইতে মুসলমান মোল্লারা আসিয়া নিরীহ ও অশিক্ষিত মুসলমান প্রজাদের উত্তেজিত করিয়া এই দুষ্কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু এমনিই যদি পশ্চিম হইতে হিন্দু

পুরোহিতের দল আসিয়া কোন হিন্দুপ্রধান স্থানে এমনি নিরীহ ও নিরক্ষর চাষাভুষাদের এই বসিয়া উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন যে, নিরপরাধ মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘরে দোরে আগুন ধরাইয়া সম্পত্তি লুঠ করিয়া মেয়েদের অপমান অমর্য্যাদা করিতে হইবে, তাহা হইলে সেই সব নিরক্ষর হিন্দু কৃষকের দল উহাদের পাগল বলিয়া গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিতে এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিবে না।

কিন্তু কেন এরূপ হয়? ইহা কি শুধু কেবল অশিক্ষারই ফল? শিক্ষা মানে যদি লেখা পড়া জানা হয়, তাহা হইলে চাষী মজুরের মধ্যে হিন্দু মুসলমানে বেশী তারতম্য নাই। কিন্তু শিক্ষার তাৎপর্য্য যদি অন্তরের প্রসার ও হৃদয়ের ক্যলচার হয় তাহা হইলে বলিতেই হইবে উভয় সম্প্রদায়ে তুলনাই হয় না। হিন্দুনারী হরণ ব্যাপারে সংবাদ পত্রওয়ালারা প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করেন মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনঃ পুনঃ এত বড় অপরাধ করিতেছে তথাপি প্রতিবাদ করিতেছেন না কিসের জন্য? মুখ বুজিয়া নিঃশব্দে থাকার অর্থ কি? কিন্তু আমার ত মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল। তাঁহারা শুধু অতি বিনয় বশতই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না, বাপু, আপত্তি করিব কি, সময় এবং সুযোগ পেলে ও কাজে আমরাও লেগে যেতে পারি।

মিলন হয় সমানে সমানে। শিক্ষা সমান করিয়া লইবার আশা আর যেই করুক আমি ত করি না। হাজার বৎসরে কুলায় নাই, আরও হাজার বৎসরে কুলাইবে না। এবং ইহাকেই মূলধন করিয়া যদি ইংরাজ তাড়াইতে হয় ত সে এখন থাক্। মানুষের অন্য কাজ আছে। খিলাফৎ করিয়া, প্যাক্ট করিয়া,—ডান ও বাঁ—দুই হাতে মুসলমানের পুচ্ছ চুলকাইয়া স্বরাজ-যুদ্ধে নামানো যাইতে পারিবে এ দুরাশা দুই একজনার হয় ত ছিল, কিন্তু মনে মনে অধিকাংশেরই ছিল না। তাঁহারা ইহাই ভাবিতেন দুঃখ দুর্দ্দশার মত শিক্ষক ত আর নাই, বিদেশী বুরোক্রেসির কাছে নিরন্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া হয়ত তাহাদের চৈতন্য হইবে, হয়ত হিন্দুর সহিত কাঁধ মিলাইয়া স্বরাজ-রথে ঠেলা দিতে সম্মত হইবে। ভাবা অন্যায় নয়, শুধু ইহাই তাঁহারা ভাবিলেন না যে লাঞ্ছনা বোধও শিক্ষা সাপেক্ষ। যে লাঞ্ছনার আগুনে স্বর্গীয় দেশবন্ধুর হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইত, আমার গায়ে তাহাতে আঁচটুকুও লাগে না। এবং তাহার চেয়েও বড় কথা এই যে, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে যাহাদের বাধে না, সবলের পদলেহন করিতেও তাহাদের ঠিক ততখানিই বাধে না। সুতরাং, এ আকাশ-কুসুমের লোভে আত্ম-বঞ্চনা করি আমরা কিসের জন্য? হিন্দু-মুসলমান মিলন একটা গালভরা শব্দ, যুগে যুগে এমন অনেক গালভরা বাক্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ গাল-ভরানোর অতিরিক্ত সে আর কোন কাজেই আসে নাই। এ মোহ আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে। আজ বাঙ্লার মুসলমানকে এ কথা বলিয়া লজ্জা দিবার চেষ্টা বৃথা যে সাত পুরুষ পূর্ব্বে তোমরা হিন্দু ছিলে। সুতরাং রক্ত সম্বন্ধে তোমরা আমাদের জ্ঞাতি। জ্ঞাতি বধে মহাপাপ, অতএব কিঞ্চিৎ করুণা কর। এমন করিয়া দয়া ভিক্ষা ও মিলন-প্রয়াসের মত অগৌরবের বস্তু আমি ত আর দেখিতে পাই না। স্বদেশে বিদেশে ক্রীশ্চান বন্ধু আমার অনেক আছেন। কাহারও পিতা, কাহারও বা পিতামহ, কেহ বা স্বয়ং ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু নিজে হইতে তাঁহারা নিজেদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের পরিচয় না দিলে বুঝিবার যো নাই যে সর্ব্বদিক দিয়া তাঁহারা আজও আমাদের ভাই-বোন্ নেই। একজন মহিলাকে জানি, অল্প বয়সেই তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, এত বড় শ্রদ্ধার পাত্রীও জীবনে আমি কম দেখিয়াছি। আর মুসলমান? আমাদের একজন পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। সে মুসলমানীর প্রেমে মজিয়া ধর্ম্ম ত্যাগ করে। এক বৎসর পরে দেখা। তাহার নাম বদলাইয়াছে, পোষাক

বদলাইয়াছে, 'প্রকৃতি বদলাইয়াছে, ভগবানের দেওয়া যে আকৃতি, সে পর্য্যন্ত এমনি বদলাইয়া গিয়াছে যে আর চিনিবার যো নাই। এবং এইটাই একমাত্র উদাহরণ নয়। বস্তীর সহিত যাঁহারই অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা আছে,—এ কাজ যেখানে প্রতি নিয়তই ঘটিতেছে—তাঁহারই অপরিজ্ঞাত নয় যে এমনিই বটে! উগ্রতায় পর্য্যন্ত ইহারা বোধ হয় কোহাটের মুসলমানকেও লজ্জা দিতে পারে।

অতএব, হিন্দুর সমস্যা এ নয় যে কি করিয়া এই অস্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হইবে, হিন্দুর সমস্যা এই যে কি করিয়া তাঁহারা সংঘবদ্ধ হইতে পারিবেন এবং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী যে কোন ব্যক্তিকেই ছোট জাতি বলিয়া অপমান করিবার দুর্ম্মতি তাঁহাদের কেমন করিয়া এবং কবে যাইবে। আর সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হিন্দুর অন্তরের সত্য কেমন করিয়া তাহার প্রতিদিনের প্রকাশ্য আচরণে পুষ্পের মত বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে। যাহা ভাবি তাহা বলি না, যাহা বলি তাহা করি না, যাহা করি তাহা স্বীকার পাই না,—আত্মার এত বড় দুর্গতি অব্যাহত থাকিতে সমাজ-গাত্রের অসংখ্য ছিদ্রপথ ভগবান স্বয়ং আসিয়াও রুদ্ধ করিতে পারিবেন না।

ইহাই সমস্যা এবং ইহাই কর্ত্তব্য। হিন্দু মুসলমানের মিলন হইল না বলিয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া বেড়ানই কাজ নয়। নিজেরা কান্না বন্ধ করিলেই তবে অন্য পক্ষ হইতে কাঁদিবার লোক পাওয়া যাইবে।

হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে,—এদেশে চিত্ত তাহার নাই। যাহা নাই তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়াই বা লাভ কি, এবং তাহাদের বিমুখ কর্ণের পিছু পিছু ভারতের জল বায়ু ও খানিকটা মাটির দোহাই পাড়িয়াই বা কি হইবে! আজ এই কথাটাই একান্ত করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে এ কাজ শুধু হিন্দুর,—আর কাহারও নয়। মুসলমানের সংখ্যা গণনা করিয়া চঞ্চল হইবারও আবশ্যকতা নাই। সংখ্যাটাই সংসারে পরম সত্য নয়। ইহার চেয়েও বড় সত্য রহিয়াছে যাহা এক দুই তিন করিয়া মাথা গণনার হিসাবটাকে হিসাবের মধ্যেই গণ্য করে না।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি তাহা অনেকের কানেই হয়ত তিক্ত ঠেকিবে, কিন্তু সেজন্য চমকাইবারও প্রয়োজন নাই, আমাকে দেশদ্রোহী ভাবিবারও হেতু নাই। আমার বক্তব্য এ নয় যে এই দুই প্রতিবেশী জাতির মধ্যে একটা সদ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন ঘটিলে সে বস্তু আমার মনঃপুত হইবে না। আমার বক্তব্য এই যে এ জিনিস যদি নাই-ই হয় এবং হওয়ারও যদি কোন কিনারা আপাততঃ চোখে না পড়ে ত এ লইয়া অহরহ আর্ত্তনাদ করিয়া কোন সুবিধা হইবে না। আর না হইলেই যে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল এ মনোভাবেরও কোন সার্থকতা নাই। অথচ, উপরে নীচে, ডাহিনে বামে, চারিদিক হইতে একই কথা বারম্বার শুনিয়া ইহাকে এমনিই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছি যে জগতে ইহা ছাড়া যে আমাদের আর কোন গতি আছে তাহা যেন আর ভাবিতেই পারি না। তাই করিতেছি কি? না, অত্যাচার ও অনাচারের বিবরণ সকল স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া এই কথাটাই কেবল বলিতেছি; তুমি এই আমাকে মারিলে, এই আমার দেবতার হাত পা ভাঙ্গিলে, এই আমার মন্দির ধ্বংস করিলে, এই আমার মহিলাকে হরণ করিলে,—এবং এ সকল তোমার ভারি অন্যায়, ও ইহাতে আমরা যারপর নাই ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতেছি। এ সকল তুমি না থামাইলে আমরা আর তিষ্ঠিতে পারি না। বাস্তবিক ইহার অধিক আমরা কি কিছু বলি, না করি? আমরা নিঃসংশয়ে স্থির করিয়াছি যে যেমন করিয়াই হৌক মিলন করিবার ভার

আমাদের এবং অত্যাচার নিবারণ করিবার ভার তাহাদের। কিন্তু, বস্তুতঃ, হওয়া উচিত ঠিক বিপরীত। অত্যাচার থামাইবার ভার গ্রহণ করা উচিত নিজেরা এবং হিন্দু-মুসলমান মিলন বলিয়া যদি কিছু থাকে ত সে সম্পন্ন করিবার ভার দেওয়া উচিত মুসলমানদের পরে।

কিন্তু দেশের মুক্তি হইবে কি করিয়া? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মুক্তি কি হয় গোঁজামিলে? মুক্তি অর্জ্জনের ব্রতে হিন্দু যখন আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিবে তখন লক্ষ্য করিবারও প্রয়োজন হইবে না গোটাকয়েক মুসলমান ইহাতে যোগ দিল কি না। ভারতের মুক্তিতে ভারতীয় মুসলমানেরও মুক্তি মিলিতে পারে, এ সত্য তাহারা কোনদিনই অকপটে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পারিবে শুধু তখন, যখন ধর্ম্মের প্রতি মোহ তাহাদের কমিবে, যখন বুঝিবে যে কোন ধর্ম্মই হৌক তাহার গোঁড়ামি লইয়া গর্ব্ব করার মত এমন লজ্জাকর ব্যাপার, এতবড় বর্ব্বরতা মানুষের আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু সে বুঝার এখনও অনেক বিলম্ব। এবং, জগৎশুদ্ধ লোক মিলিয়া মুসলমানের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে ইহাদের কোন দিন চোখ খুলিবে কি না সন্দেহ। আর, দেশের মুক্তিসংগ্রামে কি দেশশুদ্ধ লোকেই কোমর বাঁধিয়া লাগে? না, ইহা সম্ভব, না, তাহার প্রয়োজন হয়? আমেরিকা যখন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়াছিল তখন দেশের অর্দ্ধেকের বেশী লোকে ত ইংরাজের পক্ষেই ছিল? আয়র্লণ্ডের মুক্তিযজ্ঞে কয়জনে যোগ দিয়াছিল? যে বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট আজ রুশিয়ার শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছে দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে সে তো এখনও শতকে একজনও পৌঁছে নাই। মানুষ ত গরু ঘোড়া নয়, কেবলমাত্র ভিড়ের পরিমাণ দেখিয়াই তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হয় না, হয় শুধু তাহার তপস্যার একাগ্রতার বিচার করিয়া। এই একাগ্র তপস্যার ভার রহিয়াছে দেশের ছেলেদের পরে। হিন্দু-মুসলমান-মিলনের ফন্দি উদ্ভাবন করাও তাহার কাজ নহে, এবং যে সকল প্রধান রাজনীতিবিদের দল এই ফন্দিটাকেই ভারতের একমাত্র ও অদ্বিতীয় বলিয়া চীৎকার করিয়া ফিরিতেছেন তাহাদের পিছনে জয়ধ্বনি করিয়া সময় নষ্ট করিয়া বেড়ানোও তাহার কাজ নহে। জগতে অনেক বস্তু আছে যাহাকে ত্যাগ করিয়াই তবে পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান মিলনও সেই জাতীয় বস্তু। মনে হয়, এ আশা নির্ব্বিশেষে ত্যাগ করিয়া কাজে নামিতে পারিলেই হয়ত একদিন এই একান্ত দুষ্প্রাপ্য নিধির সাক্ষাৎ মিলিবে। কারণ, মিলন তখন শুধু কেবল একার চেষ্টাতেই ঘটিবে না, ঘটিবে উভয়ের আন্তরিক ও সমগ্র বাসনার ফলে।

—হিন্দুসঙ্ঘ—

১৯শে আশ্বিন, ১৩৩৩

যে নাম গোপন প্রাণের স্বপন

যে নাম গোপন প্রাণের স্বপন,
খবর রাখেনা তা'র,
তাইতে সেখানে কেহ নাহি মানে.
দেখা নাই মমতার।
কলির কোমল, মধুপরিমল,
পায়না ঘুরিয়া মরে,
হিয়ার দুয়ার খোলেনা সে আর
ভ্রমরের মরমরে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

"রায়তের কথা" *

কয়েক বছর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 'রায়তের কথা' নামে "সবুজ পত্রে" যে সন্দর্ভটি লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের একটি ভূমিকা সম্বলিত করে' চৌধুরী মহাশয় সেটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছেন। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যে কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছিলেন তাদের আলোচনা করে' একটি 'টীকা', ও উত্তর-বঙ্গ রায়ত কন্‌ফারেন্সের রঙ্গপুর অধিবেশনের সভাপতিস্বরূপে শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন সেই 'অভিভাষণ'ও এই পুস্তিকায় ছাপা হয়েছে।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ ও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা প'ড়ে কারও সন্দেহ থাক্‌বে না যে বাঙ্গলার মাটির স্বত্বে বাঙ্গলা দেশের রায়তের স্থান হোক না হোক, বাঙ্গলা সাহিত্যে তার স্থান হয়েছে। চৌধুরী মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, রায়তের ভাবনা বাঙ্গালী সাহিত্যিকের অনধিকার চর্চ্চা নয়, কারণ রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ও কাজ করে গেছেন। কথা ঠিক। কিন্তু পূর্ব্বাচার্য্যদের লেখায় সাহিত্যরস একটু আধটু এখানে ওখানে ছড়ান ছিল। আলোচ্য পুঁথিতে সেটি জমাট বেঁধে দানাদার হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে রায়তের কথা সাহিত্য হয়ে উঠবে এটা স্বভাবতই আশা করা যায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রায়তের দুর্দ্দশায় রায়তের মালিক জমীদারের উপর প্রচণ্ড চটে গিয়েছিলেন। চটা মনের সাহিত্যরস হয় একটু কটু, না হয় একটু তরল হয়। চৌধুরী মহাশয় "সরকারের বেতনভোগী" যে মুন্সেফবাবু ও settlement officerদের "বাঙলার রায়তের যথার্থ রক্ষক" বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাদেরই একজন। অর্থাৎ যাদের কাছে, 'জমীদারের দাখিলী কাগজ পারৎপক্ষে প্রামাণ্য নয়; আর আমলা-ফয়লার এজাহার বিলকুল খেলাপ'। চৌধুরী মহাশয় ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই বাঙ্গলার ধনতন্ত্রের অন্য জায়গার লোক। বাঙ্গলার রায়তের কথা তাঁরা যে সাহিত্যোচিত সুস্থচিত্তে ও ব্যাপকদৃষ্টিতে আলোচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তা পেরে ওঠেন নি।

চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ ও অভিভাষণ ভাল ছোট-গল্পের মত সুখপাঠ্য। শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠক ওর প্রথম পৃষ্ঠা পড়তে আরম্ভ করলে, একটানা শেষ পৃষ্ঠায় না পৌঁছে থাম্‌তে পারবে না। 'রায়তের কথা' প্রবন্ধের ৩০ থেকে ৪৪ পৃষ্ঠায় বাঙ্গলার "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের" জন্মবৃত্তান্তের যে বর্ণনা আছে ও-ঘটনার তার চেয়ে সরস ইতিহাস কি বাঙ্গলা কি ইংরেজী কোন ভাষাতেই নেই। সিভিলিয়ান অ্যাস্‌কলি সাহেবের একখানি ছোট বই এ সম্বন্ধে ইংরেজীতে খুব সুপাঠ্য কেতাব। কিন্তু অ্যাস্‌কলি সাহেবের হাতে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর

* 'রায়তের কথা'। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সম্বলিত। দাম বারো আনা।

হাতের সাহিত্যের সোণার-কলম কোথায়। বাঙ্গালী পাঠক যদি বর্ত্তমান বাঙ্গলার ধনতন্ত্র ব্যবস্থার মূল ঐ ঐতিহাসিক ঘটনাটি জান্‌তে চায়, যার ফলে "যে বৎসর ফ্রান্সের প্রজার peasant proprietorshipএর সূত্রপাত হল, সেই বৎসরই বাঙলার প্রজা জমির উপর তার সকল স্বত্ব হারাতে বসল", তবে চৌধুরী মহাশয়ের এই পুঁথিখানি পড়লে জ্ঞান ও আনন্দ একসঙ্গে লাভ হবে। চৌধুরী মহাশয় দুঃখ করেছেন, "সে ইতিবৃত্ত খুব কম লোকেরই জানা আছে। আমাদের জাতীয় স্মরণশক্তি এতই কম যে, যে-জিনিষ ইংরাজের আমলে জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে আমরা মান্ধাতার আমলের বলে মেনে নিই।" আশা করা যায় এই বই প্রকাশের পর বাঙ্গালীর সে অজ্ঞতা একটু কমে আসবে। এবং এই সম্পর্কে চৌধুরী মহাশয় দেশের মাটিতে স্বত্ব স্বামিত্ব সম্বন্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজের ধারণা ও আমাদের দেশের "মান্ধাতার আমলের" ধারণার পার্থক্যের যে আলোচনা সুরু করেছেন, যদি বাঙ্গলা সাহিত্যে সেটা কিছুদিন চল্‌তে থাকে, তবে ধার করা পলিটিক্‌স্ ও মুখস্থ করা ইকনমিক্‌সের বিদ্যার চাপ থেকে বাঙ্গালীর মনও একটু ছাড়া পাবে।

রবীন্দ্রনাথের ১২ পৃষ্ঠা ভূমিকাটি লেখককে সম্বোধন করে' পত্রের আকারে লেখা। পড়ে' মনে আনন্দের চমক লাগে। প্রথমেই মনে হয় আজ বাঙ্গলা গদ্য তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকের হাতে ভাবপ্রকাশের কি অপূর্ব্ব অস্ত্র হয়ে উঠেছে। যেমন তার দ্যুতি, তেমনি তার শক্তি। এ 'ভূমিকা' প্রকৃত পক্ষে একখানি লড়াই এর তলোয়ার। কিন্তু এর প্রতি পাকে ভাবের ছবির রামধনু খেল্‌ছে, সাত রংএর নয়, হাজার রং এর। এর অনেক মতের সঙ্গে অনেকের মনের মিল হবে না। অনেক কথায় অনেকের রাগের কারণও আছে। অনেক জিনিষের একটা দিক মাত্র দেখান হচ্ছে বলে' অনেকের সংশয় হবে। কিন্তু সাহিত্যরসের কিছুমাত্র আস্বাদন যার আছে তার কোনও মতান্তর, মনান্তর, সংশয়, এ ভূমিকা পড়ে' মনের আনন্দকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে ও রবীন্দ্রনাথ তার ভূমিকায় যে সব কথার আলোচনা করেছেন, তা আজকার দিনের রায়ত আন্দোলনে রায়তদের যে সব দাবীর কথা দেশে আলোচনা হচ্ছে অল্পবিস্তর সেই সব কথা। বাঙ্গলা দেশের জনসংখ্যার শতকরা আশী জন, বাঙ্গলার অন্ন জোগাবার মজুর, বাঙ্গালী কৃষকের দুঃখদুর্দ্দশার কথা, এবং তার কারণ ও প্রতীকারের উপায়ের কথা। বাঙ্গলাদেশের বর্ত্তমান চাষী—জমীদারের আইনের গোড়া ঠিক রেখে, ডালপালার একটু কাট ছাঁট করে', চাষের জমীতে চাষীর স্বত্ব কতটা বাড়ান যায় চৌধুরী মহাশয় তার আলোচনা করেছেন, ও চাষীদের পক্ষে গুটি কয়েক দাবী পেশ করেছেন; যেমন, রায়তী জোত হস্তান্তরের স্বত্ব, জমা বৃদ্ধি বন্ধের; অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বত্ব, গাছকাটা, পুকুর খোড়া প্রভৃতি স্বত্ব। এর একটি বাদে আর সব দাবীই রবীন্দ্রনাথের মতে এখনি গ্রাহ্য হওয়া উচিত। কিন্তু রায়তকে ঠিক আজই জোত হস্তান্তরের অবাধ স্বত্ব দেওয়া সম্বন্ধে তাঁর

সংশয় আছে। সে সন্দেহ তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর অনুপম প্রকাশ ভঙ্গীতে যা আর সব লেখকের একাধারে আনন্দ, বিস্ময় ও নৈরাশ্য। তাঁর সন্দেহের কারণ বাঙ্গলা দেশের "রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি"। এদের "জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া।" এবং এর ফলে "চাষীর জমী সরে সরে মহাজনের হাতে পড়লে আখেরে জমীদারের লোক্‌সান আছে বলে আনন্দ করবার কোন হেতু নেই। চাষীর পক্ষে জমীদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশী কড়া, - " অন্তত, "সেটা আরেকটা উপরি মুষ্টি"। অর্থাৎ "জমি হস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে" বাঙ্গলার জমীদার মহাজনের জুলুম থেকে নির্ব্বোধ, গরীব রায়তকে অনেক সময়ে বাঁচাতে পারে; রায়তী জোত অবাধ হস্তান্তরের যোগ্য করলে জমীদারের সে ক্ষমতা চলে যাবে। এ যুক্তি অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু এ সত্যকেই বা কি করে' স্বীকার না করে' পারা যায় যে বাঙ্গলা দেশের শতকরা নিরেনব্বই জন জমীদার এ ক্ষমতার প্রয়োগ করেন চাষীকে বাঁচাতে নয়, দাখিল-খারিজের নজরের পরিমাণ বাড়াতে। বাঙ্গলার জমীদারী ও জমীদারকে চাষ ও চাষীর উন্নতি ও রক্ষার প্রতিষ্ঠান করে' তুল্‌তে পার্‌লে যে রায়তের বর্ত্তমান অবস্থায় তাকে সুধু নিজের পায়ের উপর দাঁড় করানোর চেষ্টার চেয়ে সুফল অনেক সহজে ও শীঘ্র পাওয়া যেতে পারে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার কি কোনও সম্ভাবনা আছে? সম্ভাবনা যে নেই তার কারণ এ নয় যে বাঙ্গলার জমীদার অমানুষ, তার কারণ বাঙ্গলার জমীদার দেবতা নয় মানুষ। যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাকে জন্ম দিয়েছে তাতে প্রজার কাছে খাজনা আদায় করে' রাজার কোষে রাজস্ব দাখিল ছাড়া তাকে আর কোনও কাজের ভার দেয় নি। চাষ ও চাষীর হিতার্থ কোনও কর্ম্ম জমীদারের রাজ বা সমাজ বিধি নিয়ন্ত্রিত কর্ত্তব্য নয়। তিনি যদি তেমন কোনও কাজ করেন তবে সেটা তাঁর দয়া, মহানুভবতা। কিন্তু এই দায়িত্বহীন মহানুভবতা বেশী লোকের কাছে আশা করা যায় না। লাট কর্ণওয়ালিস রায়তের হিতের জন্য এর উপরেই নির্ভর করেছিলেন। ফল আমরা চোখেই দেখ্‌তে পাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভূমিকা এই বলে' শেষ করেছেন যে রায়তদের এই সব আইনের রদ বদলের দাবীর কথা "খুচরো কথা। আসল কথা, যে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না, কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই যে বাঁচাবার শক্তি, তা জীবন-যাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। * * * * পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণ সঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকে উদ্ভাবন করতে পারবে।" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এবং আমরা সকলেই জানি, "কেমন করে সেটা হবে?—সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছুকাল থেকে" তিনি ভাবছেন। তাঁর সংশয়, "ভাল জবাব দিয়ে যেতে পারব কি না জানিনে—জবাব তৈরী হয়ে উঠতে সময়

লাগে।” ভগবানের কাছে সমস্ত দেশের প্রার্থনা, এর ভাল জবাব তিনি দিয়ে যান, এবং জবাব তৈরী হয়ে উঠতে সময় লাগুক।

কিন্তু এই “খুচরো কথা” গুলোকে একবারে ছেড়ে দেওয়া চলে না। চৌধুরী মহাশয় তাঁর ‘টীকায়’ আয়ুর্ব্বেদের নজীর তুলেছেন, “মানুষের গায়ে কাঁটা ফুটলেই যদি পারত তা তুলে দিয়ো, দর্শনের সব গভীর তত্ত্বের মীমাংসা না হওয়া তক্ ও কাজ করতে নিরস্ত হয়ো না।” এবং এটাও ভেবে দেখার কথা যে রবীন্দ্রনাথ যাদের কথা বলেছেন,—যারা বলে, “আগে স্বরাজ, তারপরে স্বরাজ যাদের জন্যে” ; যারা “হাল-ফ্যাসানের উৎসাহী মানুষ, কোচবাক্সে চড়ে বসে অস্থিরভাবে পা ঘসচে ;—ঘরে আগুন লাগার উপমা দিয়ে বলচে, অতি শীঘ্র পৌঁছনো চাই, এইটেই একমাত্র জরুরি কথা। অতএব ঘোড়ার খবর নেওয়া নিছক সময় নষ্ট করা”—তাদের উপমাটা লাগসই না হতে পারে, কিন্তু কথা ঐ এক। তারা বলে, যাদের জন্য স্বরাজ যদি তাদের মধ্যে “সমগ্রভাবে প্রাণ সঞ্চারের” পর পর্য্যন্ত স্বরাজ আনার চেষ্টা মুলতুবী রাখতে হয় তবে তারা “ততকাল পর্য্যন্ত টিকবে কিনা সন্দেহ।” তাদের কথা, স্বরাজ না আনলে “সমগ্রভাবে প্রাণ সঞ্চারের” চেষ্টা বৃথা চেষ্টা, ‘খুচরো চেষ্টা’।

আইন রদ-বদলের “খুচরো কথা” নিয়ে যারা কথা তুলেছে তাদের প্রধান লক্ষ্য চাষীর ট্যাঁকের উপর নয়, চাষীর মনের উপর। চাষীর মধ্যে যে প্রাণ আনতে হবে তা প্রধানতঃ তার মনের ভিতর দিয়ে। যে আইনে চাষের জমীর উপর তার স্বত্ব কিছু বাড়িয়ে দেবে, জমীদার ও তার নায়েব, গোমস্তা, পাইক, বরকন্দাজের পায়ে মাথা খোড়ার হেতুগুলো একটু কমিয়ে আনবে—তাদের ভরসা সে আইনে তাদের মনে একটু বলাধান হবে। খুব বেশী নয়, কিন্তু যেটুকু তাকেও অবহেলা করা চলেনা।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের “রায়তের কথা” ও রবীন্দ্রনাথের “ভূমিকা” যদি বাঙ্গলা সাহিত্যে বাঙ্গলার চাষী ও চাষের কথা চল্‌তি করে তবে বাঙ্গলার চাষী ও বাঙ্গলার সাহিত্য দুই-ই উপকৃত হবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

সোণার শরত

ভোরের আকাশ বীণার সুরে ডাক দিয়ে যায় মনে,
গন্ধ আকুল কাঁচা ধানের সবুজ মঞ্জরী
চমক লাগায় উতলবায়ে কেবল ক্ষণে ক্ষণে।
মাঠের সীমায় 'আলে'র পথে হারায় আমার আঁখি
কোথায় গেচে ওই গাঁ ছেড়ে আরো সুদূর বা-কী;
বকের ঝাঁকে নীল আকাশের শুভ্র তরী বেয়ে
অলখ হতে আস্‌লো শরৎ স্বপ্নে ভুবন ছেয়ে।
ডাহুক নাচে আনন্দেতে কলমী লতার বনে,
ভোরের আলো কাঁপন লাগায় পুলক জাগায় মনে।

চামর দোলায় কা'শের জমি উছল নদীর তটে,
বিলের বুকে কুমুদ ফুটি তরুণ-রূপসী
সাদা রঙের বুলায় তুলি বিশ্ব নিখিল পটে;—
বকুল ব্যাকুল—শিউলী অধীর—যুথীর কিশোর হিয়া
বাউল বায়ের পথ চাহিবে পাতার দুয়ার দিয়া।
পাটের জমির নিঃস্বতাকে বিশ্ব শ্যামল রূপে
কৌতুকেতে ঢাক্‌লে শরৎ আঁচল কোণে চুপে।
ভুঁইচাপা সে অনাদৃতা কাঁদচে অকারণে,
ভোরের বেলায় কার কথাটি জাগ্‌লো আমার মনে।

সুদূর অতীত পেয়েছিলাম সপ্ত সাগর মণি
আজকে তারে হারিয়ে ফেলে বিপুল অন্ধকারে
ভবিষ্যতের লক্ষ্য হারা দীর্ঘ প্রহর গণি।
তাহার মুখের ছোট্ট হাসি—ছিন্ন কথার হার
একটুকু তার ব্যর্থ নহে—মোর সে পুরস্কার।
বুঝ্‌লেনা হায় বিদায় নিলে অশ্রু জলের মাঝে
আজ বুঝি সে পথ চেয়ে রয় মন বসেনা কাজে।
আস্‌তো ফিরে যদি গো এই মহোৎসবের সনে
গোপন কথা বলে যেতাম—ছিলো যা আজ মনে।

বন্দে আলী মিয়া

সেকালে বাঙ্গালীর বাণিজ্য

আজ প্রায় পাঁচশত বৎসর হইল সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের (১৬শ শতাব্দী) কঠোর শাসনে বাঙ্গালী হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা একেবারে নিষেধ হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে এতদ্দেশীয় হিন্দুগণের নিকট "কালাপানি" পার হওয়া নিতান্ত অধর্ম্মের কাজ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, ও সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার একটি গৌরবময় যুগের অবসান হইয়া গিয়াছে। সত্য বটে আজকাল অনেক হিন্দুসন্তান সমুদ্রপথে বিদেশে যাইতেছেন। কিন্তু গোঁড়া হিন্দুর নিকট তাহারা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়াই যাইতেছেন এবং এই হেতু ঘরে ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইতেছেন। যাহারা এইরূপ না করিতেছেন তাহারা হিন্দুর শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া চলিতেছেন—ইহাই রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায়ের মত। যাহা হউক রঘুনন্দনের নিষেধবিধি প্রচারের পূর্ব্বে, অতিপ্রাচীন হিন্দুযুগে, যে বাঙ্গালী অকুতোভয়ে সমুদ্রযাত্রা করিত এবং নানা দিগ্‌দেশ হইতে বাণিজ্য দ্রব্য সম্ভার আনিয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বৈদেশিক সাহিত্য ছাড়িয়া দিলেও, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আছে। যদিও এই সাহিত্যের কাব্য গ্রন্থগুলিই এসম্বন্ধে আমাদের অবলম্বন, তথাপি ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অনৈতিহাসিক কাব্যগ্রন্থসমূহের ভিতরে প্রচুর ঐতিহাসিক উপাদান আছে, সমসাময়িক ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী জীবনের সুন্দর একটি আলেখ্য এই কল্পনাপ্রসূত গ্রন্থরাজি হইতে পাওয়া যায়। প্রাচীন চণ্ডীকাব্য ও মনসামঙ্গল কাব্যগুলি সেকালের হিন্দুযুগের বাঙ্গালীর নৌযাত্রার ইতিহাসে পরিপূর্ণ। এই কাব্যসমূহের কবিগণ অধিকাংশই মুসলমানযুগে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহা সত্ত্বেও তাহাদের কাব্যবর্ণিত বিষয়সমূহ তৎপূর্ব্ববর্ণিত হিন্দুযুগকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিতেছে। মনসামঙ্গলগুলির মধ্যে বিজয়গুপ্ত (১৫শ শতাব্দী) ও বংশীদাসের (১৬শ শতাব্দী) কাব্যদ্বয় এবং চণ্ডীকাব্যগুলির মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের (১৬শ শতাব্দী) কাব্যখানির এসম্বন্ধে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।*

উল্লিখিত পুঁথিগুলির বর্ণনামতে বাঙ্গালী কবিগণ সাধারণতঃ সিংহল এবং পাটনে (গুজরাট) বাণিজ্যার্থ যাতায়াত করিতেন। তাহারা যে পথে যাইতেন তাহাতে নিম্নলিখিত বন্দরগুলি পড়িত।

(১) পুরি। (২) কলিঙ্গপত্তন (কলিঙ্গপটম)। (৩) চিল্কাচুলি (মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত চিকাকোল)। (৪) বাণপুর। (৫) সেতুবন্ধ রামেশ্বর। (৬) লঙ্কাপুরী। (৭) পাটন (গুজরাটের প্রসিদ্ধ বন্দর)।

---

* এই সম্পর্কে মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্যখানিরও নাম করা যাইতে পারে।

সমুদ্রপথের বর্ণনায় অনেক দ্বীপের নাম আছে। সেইগুলিকে এখন চিনিয়া বাহির করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ প্রলম্ব, নাকুট, অহিলঙ্কা, চন্দ্রশল্য ও আবর্ত্তন দ্বীপের নাম করা যাইতে পারে। প্রাচীন কাব্যসমূহ পাঠ করিলে দেখা যায় যে নাবিকগণ সমুদ্রগামী তরীগুলিকে উপকূলের সন্নিকট দিয়াই পাল উড়াইয়া, দাঁড় বাহিয়া চালিত করিত। তাহারা দাঁড় টানিবার সময় সারি গান গাহিতে থাকিত।

চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য যাত্রার নিম্নলিখিত বর্ণনা বংশীদাসের মনসামঙ্গলে আছে। ইহাতে কবিসুলভ উদ্দাম কল্পনার বাহুল্য থাকিলেও প্রাচীনকালে বাঙ্গালী যে ভাবে সমুদ্রযাত্রা করিত তাহার বেশ একটি বিবরণ পাওয়া যায়। যথা:—

"চলে সাধু দক্ষিণ পাটনে
চম্পকনগর মিলি,   কৌতুকেতে হুলাহুলি
জয়ধ্বনি উঠিল গগনে॥
তুলাই বলে বাও বাও,   বন্দিয়া ভবানী পাও,
প্রথমে চলিল শঙ্খচূড়।
ছোটিঘটি তার পাছে,   যাতে ভরা ভরিয়াছে,
হাঁড়ীপাগ ধুকুরা বিস্তর॥" ইত্যাদি।

এইরূপে চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর সঙ্গে নিয়া চাঁদসদাগর বাণিজ্যে চলিলেন।—

"গোপাল মিরবর চলে ঠাট আগুয়ান।
তার সঙ্গে হাত নাও ব্যাল্লিশ খান॥
পানী চরি আগে চলে ব্যাল্লিশ নাও।
ঠাঁট পাছে চন্দ্রধর বলে বাও বাও॥
নিজরাজ্য ছাড়াইল হাস্য পরিহাসে।
ছাড়ায় কাঁমারহাটী আঁখির:নিমিষে॥" ইত্যাদি।

এইরূপে ক্রমে মধ্যনগর, প্রতাপগড়, গোপালপুর, রামনগর ও পরিশেষে "কালীদ সাগরে" আসিয়া পড়িলেন। ইহা বাহিয়া ক্রমে ডাইনে গন্ধর্ব্বপুর ও বামে বীরাঙ্গনা অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে বামে পিচলতা পড়িয়া রহিল ও সম্মুখে রামবিষ্ণুপুরী দেখিতে পাইলেন। ইহার পর গঙ্গাসাগরে চাঁদসদাগরের ডিঙ্গা ভাসিল। এখানে তিনি মহা উৎসাহে পূজা অর্চ্চা করিলেন। ইহার পর চাঁদের ডিঙ্গা চম্পকনগরে পৌছিল। এখান হইতে ক্রমাগত পাঁচমাস ডিঙ্গা বাহিয়া চাঁদসদাগর গন্তব্যস্থান পাটনে পৌছিলেন। (১)

(১) দ্বারিকা চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত বংশীদাসের মনসামঙ্গল, পৃঃ ৩২৭-৩৩৯ দ্রষ্টব্য।

কবির ভাষায় :—

"নানান্ দুর্গম পথ গেল ছাড়াইয়া।
কলিঙ্গ উৎকল দেশ ডাইনে থুইয়া॥
* * *
চৌদ্দ ডিঙ্গা বায়্যা যায় দক্ষিণ পাটন।
বিষরী মুড়ান বাদ্য বায় ঘন ঘন॥
* * *
সেতুবন্ধ রামেশ্বর রাখিয়া দক্ষিণে।
সম্মুখে কণকলঙ্কা দেখে ততক্ষণে॥
* * *
দ্রুতগতি বায় ডিঙ্গা তুলাই কাঁড়ারী।
ছাড়াইল ডাইনে কণকলঙ্কাপুরী॥
তদন্তরে মলয় পর্ব্বত করি বাম।
বাও বাও করি যায় নাহিক বিশ্রাম॥
অহি নৃপতির দেশ বিজয়ানগরী।
ছাড়াইল সে বাঁক হাতের বাম করি॥
সম্মুখে রামের স্থান দেখে মনোহর।
সুভাই পণ্ডিত ঠাঁই পুছে সদাগর॥
* * *
তথা হনে চন্দ্রধর করিল গমন।
সম্মুখে নিলক্ষ বাঁক (১) দিল দরশন॥
দেখি নিলক্ষের বাঁক পরম বিস্ময়।
দিগ্বিদিক কিছু তার নাহি পরিচয়॥
পূর্ব্ব পশ্চিম আর উত্তর দক্ষিণ
কোন দিক ভেদ নাহি সব জলাকীর্ণ॥
জলের কল্লোল দেখি অতি ভয়ঙ্কর।
উঠিছে হিল্লোল যেন পর্ব্বত শিখর॥
* * *
অস্ত যায় যথা ভানু উদয় যথা হনে।
দুইতারা (২) ডাইনে বামে রাখিল সন্ধানে॥
তাহার দক্ষিণমুখে ধরিল কাঁড়ার।
সেইতারা লক্ষ্য করি বাহিল নাওয়ার॥
* * *
ছাড়ায় নিলক্ষ বাঁধ পবন গমনে।
উদ্দেশেতে কাছাকাছি পাইল পাটনে॥"
ইত্যাদি।

এইতো গেল বংশীদাসের বর্ণনা। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামও (৩) ধনপতির সিংহলে বাণিজ্য প্রসঙ্গে বাঙ্গালীর বহির্বাণিজ্য পথের কতক সন্ধান দিয়াছেন। বাঙ্গালার অভ্যন্তরের নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম (৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যস্থান অতিক্রম করিয়া ধনপতি অবশেষে—

(১) বোধ হয় আরব সাগরস্থ লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ।

(২) তখনকার দিনে কম্পাসের ব্যবহার ছিল না, তাই অকূল সমুদ্রে তারা দেখিয়া নাবিকগণ গন্তব্যপথ স্থির করিত। এই রীতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় মহাদেশে বর্ত্তমান ছিল।

(৩) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য (বঙ্গবাসী কার্য্যালয়), পৃঃ ১৯৫—২০২ দ্রষ্টব্য।

(৪) সপ্তগ্রাম একসময়ে বাঙ্গালার আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কবিকঙ্কণের বর্ণনায়—

"কলিঙ্গ ত্রৈলুঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ কর্ণাট।
মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুজরাট॥
বরেন্দ্র বন্দর বিন্ধ্য পিঙ্গল সকল।
উৎকল দ্রাবিড় রাঢ় বিজয়নগর॥"

"কলাহাটী ধূলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া।
অঙ্গারপুরের খাল বামদিগে থুয়্যা॥
গমন করিয়া গেল বিংশতি দিবসে।
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দ্রবিড়ের দেশে॥
* * *
বাহ বাহ বলিয়া ডাকে সদাগর।
হাতে দণ্ড কোরোয়াল বসিল গাবর॥
চিল্কাচুলির ডাঙ্গা পশ্চাৎ করিয়া।
বালিঘাটা বাণপুর বামদিকে থুয়্যা॥
ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারামদের ডরে॥
* * *
বুদ্ধিবলে সাধু বাত্যাদহ হৈল পার।
দক্ষিণে সুমেরুশৃঙ্গ লঙ্কার দুয়ার
মোহানে সীতাখালী প্রবেশে হাড়খাল।
বামদিকে সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল॥
সেতুবন্ধ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
চলিলেন সদাগর বুহিত বাহিয়া॥
চন্দ্রকূট পর্ব্বতখান যক্ষরাজার দেশ।
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ॥
পর্ব্বতসমান ঢেউ বহে সপ্ততাল।
দূর হৈতে দেখে সাধু লঙ্কার ময়াল॥
অলঙ্ঘ্য সাগর ডানি বামে নাহি স্থল।
পথিকে জিজ্ঞাসে কত যোজন সিংহল॥
রাত্রিদিন চলে সাধু তিলেক নাহি রহে।
উপনীত ধনপতি হৈলা কালীদহে॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
নিকট হইল রাজ্য সিংহল নগর।" ইত্যাদি।

উল্লিখিত বর্ণনাদ্বয়ে কবিকল্পনার মধ্য দিয়া আমরা বঙ্গের এক গৌরবময় যুগের সহিত পরিচিত হইয়া থাকি। কবিদ্বয়ের উদ্দাম কল্পনার মধ্যেও যেন অনেকটা সত্য নিহিত আছে। ইহারা বর্ণনা প্রসঙ্গে দেশের সমসাময়িক অবস্থারও উল্লেখ করিয়া ফেলিয়াছেন।

"ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে
রাত্রিদিন বাহি যায় হারামদের ডরে।"—

এই দুই ছত্রে কবিকঙ্কণ তাহার সমসাময়িক পর্ত্তুগীজ জলদস্যুর কথা উল্লেখ করিয়া ফেলিয়াছেন। পর্ত্তুগীজগণ ফিরিঙ্গি নামে এক সময়ে এতদ্দেশে অভিহিত হইত। তাহাদের অত্যাচারকাহিণী বঙ্গের মুসলমান যুগের ইতিহাসের একাংশ মসীলিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে।

বংশীদাস ও মুকুন্দরাম উভয়েই কালীদহের উল্লেখ করিয়াছেন। এই কালীদহ বংশীদাস বঙ্গসীমায় ও মুকুন্দরাম সিংহলের সন্নিকটে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বোধ হয় বিরাট সুনীল বারিরাশিকেই প্রাচীন কালে "কালীদহ" বলিত। এখনও সমুদ্র যাত্রা "কালাপানি যাওয়া" নামে লোকমুখে কথিত হইয়া থাকে।

প্রভৃতি দেশের উল্লেখ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন বাঙ্গালার সপ্তগ্রাম বন্দর সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহার মতে—

"এসব সফরে যত সদাগর বৈসে।
জলে ডিঙ্গা লয়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে।
সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়।
ঘরে বস্যে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥"

বাঙ্গালীবণিকগণ সম্ভবতঃ বঙ্গোপসাগরের আশেপাশের দেশগুলির সহিত সুপরিচিত ছিলেন। ইহা খুব স্বভাবিক। উদাহরণস্বরূপ বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল হইতে কতিপয় ছত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ইহাতে কবিকল্পনা, ও বিকৃতরুচির যথেষ্ট পরিচয় থাকিলেও কথাগুলির মধ্যে যে কিছু সত্য নিহিত আছে ইহা নিশ্চয়। বর্ণনাটি এইরূপ—

"উত্তরদিকের কথা শুন সদাগর।
সে দেশের রাজা আছে নামে মুক্তিশ্বর॥
বুঝিতে না পারি কিছু সেদেশের মর্ম্ম।
সে দেশের লোকে খায় মরিচের অন্ন॥
পূর্ব্ব দেশের রাজা নাম বিদ্যাসঙ্গ।
সে লোক সাধুতার যত বড় অঙ্গ॥
পরস্পর যত লোক তমরূপে থাকে।
ব্রাহ্মণ জাতি বসে যত সকলেই চর্ম্মকাটে॥
জ্যেষ্ঠ ভাইএর বধূ করে কনিষ্ঠে বদল।
ভগ্নী লইয়া ঘর করে ভাইএরে বলে শালা॥
সকল জাতির নারী বেড়ায় দীর্ঘ ছান্দে।
বিচিত্র বসন দিয়া দুইস্তন বান্ধে॥
সবজাতি একাচারী নাহিক আচার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই কুৎসিত আকার॥
পশ্চিম দেশের কথা শুন সদাগর।
সেই দেশের লোক সব বড়ই বর্ব্বর॥
সেই দেশের লোকে চলে গলায় দিয়া পাটা।
হিন্দু ব্রাহ্মণের চিহ্ন নাই সকলের কর্ণকাটা॥
ষোল বৎসরের হৈলে যুবতীর বিয়া।
পুরোহিতের বাড়ী থাকে দক্ষিণার লাগিয়া॥
বিবাহ করিয়া দেয় ভগ্নীপতির ঘরে।
অপত্যাদি হয় যদি তাহার উদরে॥
দেশেতে আনিয়া শেষে সমভাগ করে।
সেইভাগ সহ তার স্ত্রীকে নেয় ঘরে॥
ভট্টাচার্য্য হাল চষে গলায় পৈতা দিয়া।
স্ত্রীলোকেতে ঘুটা বাছে বিবস্ত্র হৈয়া॥
দক্ষিণ পাটনের কথা শুন সদাগর।
অবোধ নগর সেই পরমসুন্দর॥
সেদেশের রাজার কথা শুন সদাগর।
রাজার নাম তথা বিক্রমকেশর॥
সেদেশের লোক সব অতি বড় ধনী। (১)
দোলায় করিয়া রাখে মাণিক্য দোহারী॥"ইত্যাদি।

কবি বোধ হয় "উত্তরদেশ" অর্থে তিব্বত, চীন, প্রভৃতি বাঙ্গালার উত্তরদিকে বৌদ্ধদেশ সমূহ মনে করিয়াছেন। এই সব দেশের অধিবাসীগণের আহার্য্য দ্রব্যসমূহের মধ্যে লঙ্কার প্রতি অত্যধিক প্রীতি উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালার 'পূর্ব্বদেশ' বলিতে ব্রহ্মদেশকেই (বিশেষতঃ নিম্নব্রহ্ম) বুঝাইতেছে। জাতিবিচারহীন বৌদ্ধগণকে নিয়াই বোধ হয় কবি শ্লেষ করিয়া বলিতেছেন যে "সব জাতি একাচারী নাহিক আচার।" "ব্রাহ্মণজাতি বসে যত সকলেই চর্ম্মকাটে"—এই উক্তিটিতে ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধপুরোহিত গণের কতিপয় দিবসাবধি শবরক্ষার প্রথার প্রতি বোধ হয় কবির লক্ষ্য হইয়া থাকিবে।

"বিচিত্র বসন দিয়া দুই স্তন বান্ধে" উক্তিটিতে ব্রহ্মদেশের স্ত্রীস্বাধীনতা ও পরিচ্ছদের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়া থাকিবে। পশ্চিম দেশের বর্ণনায় "ষোল বৎসরের হইলে যুবতীর বিয়া" হইতে "দেশেতে আনিয়া শেষে সমভাগ করে" এই কয়টি ছত্রে মাদ্রাজ অঞ্চলের হিন্দুসমাজে

(১) বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল (নগেন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত সম্পাদিত) ১২৩ পৃষ্ঠা।

বিবাহের বিশেষ রীতি ও উত্তরাধিকারের বিশেষ নিয়মের প্রতি শ্লেষ করা হইয়াছে। মান্দ্রাজ প্রদেশের "নায়ার"দিগের মধ্যে অদ্যাপি যেরূপ বিবাহপ্রথা প্রচলিত, তাহাতে কবির অতি-শয়োক্তির ভিতরেও যে সত্যতা রহিয়াছে তাহাই প্রমাণিত করিতেছে। পাটন বা দক্ষিণ পাটন সম্বন্ধে যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইহা বুঝা যায় যে উহা এককালে সমুদ্রতীরবর্ত্তী খুব ঐশ্বর্য্যশালী নগরী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ভারতে "পাটন" বলিতে নগরীকে বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ বহু পাটনের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়—যথা ললিত পাটন। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পাটন বলিয়াই বোধ হয় গুজরাটের পাটন বন্দরকে "দক্ষিণ পাটন" বলিত। ইহাই সুবিখ্যাত সোমনাথ পাটন।

বাঙ্গালী বণিকগণ যে ভাবে পরিবার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন তৎসম্বন্ধে সেকালের রীতিনীতি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক ; দক্ষিণারঞ্জনের "ঠাকুরদাদার ঝুলির" একটি গল্পে ইহার বেশ একটি উদাহরণ আছে। এই গল্পটির নাম কাঞ্চনমালা। কাঞ্চনমালার স্বামী সদাগর বাণিজ্যের জন্য বিদায় হইয়া যাইবার সময় দেখা গেল নৌকা নড়ে না। এই সময় নৌকার প্রধান মাঝি কর্ণধার তুলালধন ও সকল মাঝি সদাগরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

"সওদাগর!—একি!—ডিঙ্গা কেন নড়ে না?—মায়ের কাছে তো বিদায় নিয়াছ?"

"নিয়াছি।"

"ভোগ প্রসাদ মুখে দিয়াছ?"

"দিয়াছি।"

"তবে কেন নৌকা নড়ে না?"

"কি জানি।"

"কি জানি? আচ্ছা,—

সায় সিনান বাকী নাই? পঞ্চদীপ বাদ নাই?"

"না।"

"দেব মন্দিরের অষ্টচূড়া ধন কাঞ্চন উরা পূরা?"

"হাঁ।"

"তবে নৌকা নড়িবে না কেন!"—বলিয়া, দাঁড়ে পালে টান দিল। হাল ভাঙ্গিয়া গেল, মাস্তুল ভাঙ্গিয়া পড়িল, দাঁড়ের দড়া ছিড়িয়া গেল ; নৌকা 'এক বিশ'ও গেল না।

রাগিয়া কর্ণধার মাঝি বলে,—"সওদাগর! দেবদেবতা সকলের কাছে গড়—প্রণাম বিদায় নেও নাই?"—

"তা নিয়াছি"

"যা'র যা'র খোরাক বাঁটিয়া দিয়াছ?"

"দিয়াছি।"

"তবে আর আদায় বিদায় কোন ঠাঁই—আচ্ছা,—
বিদায় নিয়াছ বৌর ঠাঁই ?"
"ওরে বাপ্ !—না !"

"হাঁ। তয়েইতো নৌকা নড়ে না !—যাও, বিদায় নিয়া আইস।" (১)

প্রাচীনকালে কোন বণিক বাণিজ্য ব্যপদেশে বিদেশে যাইতে ইচ্ছা করিলে সেই সময় তাহার স্ত্রী যদি অন্তঃসত্ত্বা থাকিতেন তবে বণিককে ইহার স্বীকারোক্তি স্বরূপ একটি দলিল লিখিয়া দিয়া যাইতে হইত। ইহাকে "জয় পত্র" বলিত (২)। কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যে ইহার উল্লেখ আছে। এইরূপ করিবার তৎকালে বোধ হয় বিশেষ কারণ ছিল। বংশীদাসের মনসামঙ্গলে ইহার ইঙ্গিত আছে।

হিন্দু বণিকগণ বাণিজ্য কার্য্য যে সর্ব্বদা খুব সততার সহিত সম্পন্ন করিতেন না, তাহার অনেক উদাহরণ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আছে। শঙ্খমালার গল্প হইতে ইহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

"কোনও বেণে দারুচিনি দিতে দরমুজ বাহির করে।
কোনও বেণে কাহনের বস্তু বেচে সিক্কার দরে॥
কোনও বেণে পাথরের টুকরা ঝাঁপিতে ভরিয়া থোয়।
মহামাণিক্য সাহামাণিক্য বলে লোকের বিকয়॥" (৩)

বংশীদাস ও কবিকঙ্কণ বাণিজ্য দ্রব্যের যে দু'টি তালিকা দিয়াছেন তাহাতে কবিদ্বয়ের কবিসুলভ অতিরঞ্জনের মধ্যে দিয়া ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যাহা হউক ইহা হইতে বাঙ্গালীর বাণিজ্য দ্রব্য সম্ভারের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। তালিকা দুইটি এইরূপ :—

(১) কাঞ্চনমালা (দক্ষিণারঞ্জনের ঠাকুর দাদার ঝুলি), পৃঃ ১৬৯—১৭০ দ্রষ্টব্য।

(২) "সিংহল চলিবা প্রভু দীর্ঘ পরবাস।
লাজ খণ্ডাইয়া বলি গর্ভ ছয় মাস।
এমত শুনিয়া সাধু জায়ার ভারতী।"
"জয়পত্র লিখিবারে সাধু কৈল মতি॥
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখেন ধনপতি।
অশেষ মঙ্গল ধাম খুল্লনা যুবতী॥
তোরে আশীর্ব্বাদ প্রিয়ে পরম পিরীতি।
সন্দেহ ভঞ্জন পত্র করিনু লিখিত।
যখন তোমার গর্ভ হইল, ছয় মাস।
সেহ কালি স্বপন দেশে যাই পরবাস"

—কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য পৃঃ ১৯০ দ্রষ্টব্য।

(৩) শঙ্খমালা (দক্ষিণারঞ্জনের ঠাকুরদাদার ঝুলি), পৃঃ ২২১ দ্রষ্টব্য।

(১) "আগে আনি গুয়াপান, থুইলেক বিদ্যমান
মূল্য বলে কাঁড়ারী ডুলাই।
একটি একটি পানে, মরকত দশগুণে,
গুয়াতে মাণিক্য যেন পাই॥
বদল করিতে চুণ, রস দিবা দশগুণ,
খয়ার বদলে গোরচনা।
সুগন্ধি এলাচি হালী, লহ মতির বদলি,
কেসর বদলে দিবা সোণা॥
শতাম্বরী কামেশ্বর, আনি বলে সদাগর,
এর গুণ কহিতে না পারি।
খাইয়া বুঝহ আগে, কিমত আস্বাদ লাগে,
তৌলি দিবা বদলে কস্তুরী॥—(১) "ইত্যাদি

(২) "কুরঙ্গ বদলে, তুরঙ্গ পাব,
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে, লবঙ্গ পাব,
শুঠের বদলে টঙ্ক॥
লবঙ্গ বদলে, মাতঙ্গ পাব,
পায়রা বদলে শুয়া।
পাটশন বদলে, ধবল চামর পাব,
কাচের বদলে নীলা,
লবণ বদলে, সৈন্ধব পাব, (২)
জোয়ানী বদলে জিরা॥—"ইত্যাদি।

বাঙ্গালীর কবি প্রাচীন হিন্দু জাহাজ সমূহের যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন তাহা সবখানিই অতিরঞ্জিত বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলে না। যবদ্বীপের বরবুদুর মন্দিরে উৎকীর্ণ জাহাজের যে প্রতিকৃতি আছে, অজান্তাগুহায় বাঙ্গালী রাজপুত্র বিজয়ের জাহাজের যে চিত্র খোদিত আছে এবং সিংহলের প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ "মহাবংশে" এ সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে তাহাতেই যথেষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে প্রাচীন সমুদ্রগামী জাহাজগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্রাকৃতি ছিল না। মিশরের পিরামিড এবং ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানের ন্যায় বৃহৎ জিনিষ প্রস্তুত করা প্রাচীনগণের স্বাভাবিক রীত্যনুযায়ীই হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে "কোশা" নামে একপ্রকার তরী আছে। তাহাও বোধ হয় ক্রোশ শব্দ হইতে আসিয়াছে এবং সেকালের একটী না হউক অন্ততঃ ক্রোশব্যাপী দীর্ঘ নৌবহরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। বিরাটকায় তরী সমূহের সম্পর্কে বিজয়গুপ্তের নিম্নলিখিত বর্ণনা অল্প কৌতূহলোদ্দীপক নহে।

"প্রথমে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
যেই নায়ে বসিয়াছে লক্ষের সদাগর॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে বিজুসিজু।
গঙ্গার দুইকূল ভাঙ্গিয়া বেকা করে উজু॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখী।
যার উপরে চড়িয়া রাবণের লঙ্কা দেখি॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা ভাড়ার পাটুয়া।
যেই নায়ে উঠাইয়া লইল তামিলের নাটুয়া॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে শঙ্খচূড়।
সমুদ্রের দুইকূল ভাঙ্গে, পাতালে ঠেকে মুড়॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা অজয় মোলপাট।
যাহার উপরে মিলিয়াছে শ্রীকল্লার হাট॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে উদয়তারা।
অনেক নায় ঝড়বৃষ্টি অনেক নায় খরা॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে টিয়াঠুটী।
যেই নায় ভরে সাধু পাট আর ভুটি॥" (৩)

প্রধান তরী "মধুকর" সম্বন্ধে আছে,—

"মাটি ভরাভরি সব করিল সুসার।
হাঁট ঘাট বসাইল সহর বাজার॥" (৪)

(১) বংশীদাসের মনসামঙ্গল (দ্বারিকা চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত), পৃঃ ৩৮০-৩৯০ ও ৩৯২-৩৯৩ দ্রষ্টব্য
(২) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য (বঙ্গবাসী কার্য্যালয়), পৃঃ ১৯১ দ্রষ্টব্য।
(৩) বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল (নগেন্দ্রমোহন সেন সম্পাদিত), পৃঃ ১৯৪-১৯৫ দ্রষ্টব্য।
(৪) ঐ ঐ

কবিকঙ্কণও তুল্যরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। যথা,—

"প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
সুবর্ণেতে বান্ধা যার বৈঠকির ঘর॥
তবে ডিঙ্গা তুলিলেন নামে দুর্গাবর।
আখণ্ড চাপিয়া তাতে বসিল গাবর॥
তবে ডিঙ্গাখান তোলে নামে গুয়ারেখী।
দুই প্রহরের পথে যার মালুম কাঠ দেখি॥
আর ডিঙ্গাখান তোলে নামে শঙ্খচূড়।
আশীগজ পানি ভাঙ্গে গাঙ্গের দুকুল॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেন নামে চন্দ্রপাল।
যাহার গমনে দুইকূল করে আল॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেন নামে ছোটিমাটি।
যাহে ভরা ছিল চালু বায়ান্ন পউটী॥ (১)

নৌকার নামকরণ সবদেশেই সর্ব্বকালে প্রচলিত আছে। বাঙ্গালা কাব্যের "মধুকর" নামক যে একপ্রকার তরীর উল্লেখ আছে উহা বণিকের নৌবহরের প্রধান তরী ছিল। বণিক নিজে ইহাতে বাস করিতেন। পাশ্চাত্য জগতে নৌসেনাপতিদের নিজের ব্যবহারের জাহাজকে "ফ্ল্যাগসিপ" (flagship) বলিয়া থাকে। "মধুকর" সর্ব্বাংশে এই "ফ্ল্যাগসিপের" সহিত তুলনীয়।

প্রাচীনকালের সমুদ্রগামী তরীসমূহের এই যে বর্ণনা পাওয়া যায় ইহা শুধু কবিকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না ইহার মধ্যে যে সত্যতা অনেক পরিমাণে নিহিত আছে, এ কথা নিশ্চিত। যেরূপে প্রাচীন তরীগুলি নির্ম্মিত হইত আমাদের কবিগণ তাহারও এক সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। নৌকা প্রস্তুত করিবার প্রারম্ভে একটি উৎসব হইত তাহাকে "দাঁড়াবিন্ধার" উৎসব বলা যাইতে পারে। চাঁদ সদাগরের নৌকা নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে আছে চাঁদ "মাহেন্দ্র সুক্ষণ" পাইয়া "সোণার জলুই" (কিলক) নিজ হস্তে হাতুরি দিয়া কাষ্ঠে বিঁধাইলেন। এই বর্ণনাতে জানা যায় নৌকার কাষ্ঠনির্ম্মিত খোলে ধাতুনির্ম্মিত "পেটপাত" লাগান হইত। ইহা ছাড়া অতি সুন্দরভাবে "মাথাকাষ্ঠ" বা সামনের দিকের গলুই নির্ম্মিত হইত। এই মাথাকাষ্ঠ নানারূপ জীবজন্তুর মুখের আকার ধারণ করিত।(২) ইহা হইতেই আমাদের দেখা শুকপঙ্খী, ময়ূরপঙ্খী প্রভৃতি নৌকার নামকরণ হইয়াছে। এই মাথাকাষ্ঠ নানারূপ বহুমূল্য প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পুষ্পমাল্য দ্বারা সুসজ্জিত করা হইত। নৌকার মধ্যে কতিপয় কক্ষ হইত; তন্মধ্যে প্রধান কক্ষকে "রইঘর" (৩) বলিত। ইহাতে নৌকার মালিক বসিতেন। নৌকার মাস্তুলকে সেকালে "মালুম কাঠ" (৪) বলিত।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে নৌকা নির্ম্মাণের নিম্নলিখিত বর্ণনা আছে।

(১) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য (বঙ্গবাসী কার্য্যালয়) পৃঃ ১৯১ দ্রষ্টব্য।

(২), (৩) ও (৪) বংশীদাসের মনসামঙ্গল (দ্বারিকা চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত) ২৮৬ পৃষ্ঠা। সংস্কৃত গ্রন্থ 'যুক্তিকল্পতরু'তে (রাজাভোজ প্রণীত) সাতপ্রকার প্রাণীর মুখযুক্ত মাথাকাষ্ঠের উল্লেখ আছে। বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত "ডিপিলন পাত্রে" অঙ্কিত "আটিক" জাহাজ, ট্রাজানের স্তম্ভে খোদিত রোমক "গ্যালি জাহাজ", এবং অজান্তা গুহার খোদিত বঙ্গরাজপুত্র বিজয়ের সিংহলে অবতরণের চিত্র—এই সমস্তই বঙ্গকবিগণ বর্ণিত নানারূপ প্রাণীর মুখের অনুরূপ করিয়া গলুই নির্ম্মাণের সহিত তুলনীয়। সুবিখ্যাত "পেরিপ্লাস" (২৪৭ পৃঃ) গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে।

"দেবকারু বিশ্বকর্ম্মা, তার সুত দারুব্রহ্মা,
শিরে ধরি চণ্ডিকার পাণ।
চারিপ্রহর রাতি, জালিয়া ঘৃতের বাতি,
সাতডিঙ্গা করয়ে নির্ম্মাণ ॥
হনুমান মহাবীর, নখে করে দুই চির,
কাঁঠাল পিয়াল শাল তাল।
গাম্ভারী তমাল বহু, নখে চিরে দিল বহু,
দারুব্রহ্মা গাঢ়য়ে গজাল ॥
শিলে শানায়ে কসি, পাটী চাঁচে রাশি রাশি
নানাফুলে বিচিত্র কলস।
গড়ে ডিঙ্গা সিংহমুখী, নাম যার গুয়ারেখী
আর ডিঙ্গা গড়ে রণজয়া।
অতি অপরূপ সীমা, গড়ে ডিঙ্গা রণভীমা
গড়িল পঞ্চম মহাকায়া ॥
পিতাপুত্রে দুঁহে আটি, গজালে বাঁধিল পাটি
গড়ে ডিঙ্গা দেখিতে রূপস ॥
প্রথমে করিল সজ্জ, দীর্ঘে ডিঙ্গা শত গজ
আড়ে গড়ে বিংশতি প্রমাণ।
মকর আকার মাথা, গজদণ্ডের বাতা,
মাণিকে করিল চক্ষুদান ॥
গড়ে ডিঙ্গা মধুকর, মধ্যে যার বই ঘর,
পাশে গুড়া বসিতে কাণ্ডার।
দুসারি বসিতে পাইট, উপরে মালুম কাঠ,
পিছে গড়ে মাণিক ভাণ্ডার ॥"
গড়ে ডিঙ্গা সর্ব্বধরা, হীরামুখী চন্দ্রকরা
আর ডিঙ্গা নামে নাটশালা।
চাঁচিয়া কাঁঠাল শাল, করে দণ্ড কোবোয়াল,
ডিঙ্গাশিরে বান্ধিল মুড়লা ॥" (১)

প্রাচীন তরী নির্ম্মাণের সুন্দর বর্ণনা চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে আছে। "ময়মনসিংহ গীতিকা"য়ও (দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত) ইহার উল্লেখ আছে। এ সম্বন্ধে ময়মনসিংহ গীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডের মুখবন্ধে সম্পাদকের গবেষণাপূর্ণ আলোচনা দ্রষ্টব্য। চট্টগ্রামে এখনও প্রাচীন প্রথায় সমুদ্রগামী পোতসমূহ দেশীয় সুতারমিস্ত্রীদ্বারা দেশীয় প্রথায় নির্ম্মিত হইয়া থাকে। "আমিনা খাতুন" জাহাজের নাম এই সম্পর্কে করা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধে চট্টগ্রামের "জ্যোতিঃ" পত্রিকার ১৭ই ভাদ্রের (১৩২৭ সন) সংখ্যায় প্রকাশিত বিস্তৃত একটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

সমুদ্রগামী প্রাচীন তরীসমূহ কাষ্ঠনির্ম্মিত হইত। যেসব কাঠদ্বারা ইহা নির্ম্মাণ করা হইত তন্মধ্যে সেগুন, গাম্ভারী, তমাল, পিয়াল ও কাঁঠালের নাম করা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে কবিগণ "মনপবন" কাষ্ঠের বিশেষরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। এই "মনপবন" সত্যই নৌকা গঠনোপযোগী কোন কাষ্ঠ ছিল—না শুধু কবিকল্পনা তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এই নামে এখন যে কাঠ পাওয়া যায় তাহা যে" মন" ও "পবনের" গতিবিশিষ্ট মোটেই নয় তাহা সুনিশ্চিত। সংস্কৃত মহাভারতেও নৌকার উল্লেখ করিতে "মনপবনের" নাম পাওয়া যায়। যথা,—

"ততঃ প্রবাসিতো বিদ্বান্ বিদুরেণ নরস্তদা।
পার্থানাং দর্শয়ামাস মনোমারুতগামিনীম্ ॥
সর্ব্ববাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তং পতাকিনীম্।
শিবে ভাগীরথীতীরে নরৈর্বিশ্রংসিভিঃ কৃতাম্ ॥" (২)

---

(১) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য পৃঃ ২২১-২২২ দ্রষ্টব্য।

"মহাকায়া", "সর্ব্বধরা","নাটশালা" প্রভৃতি নামে মনে হয় যে এই তরীগুলি আধুনিক জাহাজগুলির ন্যায়ই বৃহৎ ছিল এবং নামগুলি অনর্থক দেওয়া হয় নাই। "মহাকায়া" নামের সহিত বর্ত্তমান কালের বিখ্যাত জলমগ্ন জাহাজ "টাইটানিক" নামের বেশ মিল আছে এবং "রণজয়ার" সহিত ইংরেজবীর নেলসনের "ভিক্টরি" জাহাজের নামের মিলও কৌতূহলপ্রদ সন্দেহ নাই।

(২) মহাভারত, আদিপর্ব্ব।

প্রাচীন তরীসমূহে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কাজকর্ম্ম করিত :—(১)

(ক) গাবর—ইহারা নৌকা চালক ছিল ও গায়ে খুব জোর রাখিত। এই হেতু ইহাদিগকে "গাঠ্যার গাবর" বলা হইত। গাবরগণ বোধ হয় অনেকেই পূর্ব্ববঙ্গের লোক ছিল। কবিকঙ্কণের বর্ণনায় তাহাই মনে হয়। গাবরগণ সারি গাহিয়া বৈঠার সাহায্যে নৌকা চালনা করিত।

(খ) কাঁড়ারী—এই ব্যক্তি প্রধান মাঝি ছিল এবং আধুনিক কাপ্তেনের স্থলাভিষিক্ত ছিল।

(গ) মিরবহর—ইনি নৌকার প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। নামটী আরবী (আমির—আল্—বহর) হইলেও এইরূপ পদস্থ কোন ব্যক্তি যে প্রাচীনকালেও নৌবহরে আবশ্যক হইত তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

(ঘ) সূত্রধর—কাষ্ঠনির্ম্মিত জাহাজে এই ব্যক্তির যে নিতান্ত প্রয়োজন ছিল ইহা বলাই বাহুল্য। মধ্যযুগে য়ুরোপীয় কাষ্ঠনির্ম্মিত জাহাজগুলিতেও সূত্রধর অত্যাবশ্যকীয় ছিল।

(ঙ) কর্ম্মকার—প্রয়োজনানুসারে কর্ম্মকারও নৌকায় থাকিত।

(চ) ডুবারী—ডুবারী প্রতি সমুদ্রগামী জাহাজেই থাকিত, কেননা অনেক সময় নৌকা জলপথে আটকাইয়া যাইত- তখন ডুবারী ডুব দিয়া নৌকার তলদেশ পরীক্ষা করিত।

(ছ) পাইক—তরীগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সঙ্গে পাইক বা সৈন্য থাকিত। অনেক মান্দ্রাজী (তামিল) এই কাজে নিযুক্ত হইত। "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর" আমলেও মান্দ্রাজী সৈন্য বাঙ্গালায় প্রচুর ছিল। জলপথে দস্যুভয় প্রবল ছিল বলিয়াই তরীসমূহে সৈন্যদলের প্রয়োজন ছিল। মুসলমান আমলে পর্ত্তুগীজ দস্যুর কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

বঙ্গ সাহিত্য হইতে সংক্ষেপে প্রাচীন বঙ্গের নৌসম্পদের কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল। ইহার মধ্যে অনেক স্থলে কবির নিরঙ্কুশ কল্পনার অভিব্যক্তি থাকিলেও সেকালের নৌবহর ও বহির্বাণিজ্যের একটি সুন্দর চিত্রের আভাষ পাওয়া যায়। বোধ হয় ইহা অবহেলার যোগ্য নহে।

শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাস গুপ্ত

চেরাপুঞ্জী

ভূগোলে পড়িয়াছিলাম, ভারতবর্ষে চেরাপুঞ্জী বলিয়া আসামে একটী স্থান আছে, পৃথিবীতে সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয় ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'highest rainfall'—তখন হইতেই জায়গাটা সম্বন্ধে নানারকম আজগুবী ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু মেঘমালার দেশটা বাস্তবিকই কেমন হয় তাহা দেখিবার জন্য মনে একটা কৌতূহল ছিল। শিলংএ আসিয়া চেরাপুঞ্জী না দেখিয়া যাইবার যে একটা কলঙ্ক, তাও এবার ক্ষালণ করিতে হইবে, সুতরাং 'একদিন সুন্দর উষায়' অর্থাৎ বেলা নয়টায় মোটরকারে আমরা চারজন লাবান হইতে চেরী রওনা হইলাম।

চেরাপুঞ্জী শিলিং হইতে ৩৩ মাইল। প্রথমেই যাত্রারম্ভে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের জন্মদিন উপলক্ষে প্যারেডের রিহার্সাল করিতে যে গুর্খা সৈন্যদল আসিয়াছিল, তাহারা আমাদের পথে

(১) বংশীদাসের মনসামঙ্গল দ্রষ্টব্য।

পড়িল। রাজার মতই আগে পাছে বন্দুকধারী সৈন্যপরিবেষ্টিত হইয়া আমরা শিলং হইতে বাহির হইলাম।

প্রথম কয়েক মাইল নীরস; পথে পড়িল Meath's Convalescent Home, পথে পড়িল কৃষিক্ষেত্র, Agricultural Farm,—এই জায়গাটাকে বলে Upper Shillong। আসামে এই upper কথাটার উপর কেমন একটা মায়া দেখিতেছি, Upper Shillong, Upper Laban, Upper Assam.

ঠিক যেখানটায় বাঁ দিকে এই Agricultural Farm পড়িল সেইখানে ডানদিকে পোয়াটেক পথ গেলেই পাই "হাতীঝর" বা Elephant falls ফিরিবার পথে এই ঝরণা দেখিব বলিয়া আমরা আর না থামিয়া 'সমুখ পানে' চলিলাম। কয়েক মাইল—মাইল-দশেক—গেলে একটী বেশ সমৃদ্ধ গ্রাম পড়িল। গ্রামটির নাম 'মল্লিম'। কোঠাবাড়ী ২।১ খানা আছে, একটি নদীর ধার দিয়া যাইতে হয়, পাশেই একটী আদিম কালের সরাই—কালো টিনের টুকরার উপর ইংরাজীতে লেখা আছে, "Serai।"—আমাদের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, ২০।২২ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে একজনকে এই সরাইয়ে রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল। তখন নিকটেই জঙ্গলে ব্যাঘ্রভীতি ছিল, সঙ্গে যে সব কুলি ছিল তাহারা নাকি সারা রাত আগুণ জ্বলিয়া চীৎকার করিয়া গান গাহিয়া কাটাইয়া দেয়। মল্লিম ছাড়িয়া আরও ৮ মাইল আন্দাজ গেলে আসল চেরাপুঞ্জীর রাস্তার দৃশ্য। একটু খানি পথ, পথের উপরেই পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে পথ, নীচে একেবারে গভীর খাদ, সেই খাদের ভিতর সরু একটি সুতার মত নদী ঝিক্ মিক্ করিয়া চলিতেছে, নদী-গর্ভে বড় বড় পাথর boulders—নদীর ওধারে খানিকটা জায়গা ছাড়িয়াই আবার বড় ২ পাহাড় মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রথম বেশ লাগিল, তারপর প্রতি মুহূর্ত্ত ভয় করিতে লাগিল, বুঝি এই দণ্ডে খাদের মধ্যে পড়িয়া যাই। চালক এতটুকু অসাবধান হইলেই আর কথা নাই। মোটর তখন ঘণ্টায় ১৫ মাইল করিয়া চলিতেছে। এই ভাবে ৭।৮ মাইল কাটাইতে হয়। কি সুন্দর সে দৃশ্য। মেঘের উপর মেঘ, তার পরে মেঘ, তার পরে মেঘ, তার পরে পাহাড়, আবার মেঘ, আবার পাহাড়, আবার মেঘ, আবার পাহাড় যেন কোনও স্বপ্নরাজ্যে চলিয়াছি, মেঘমালার দেশের এই বুঝি সীমান্ত। প্রকৃতির এই গম্ভীর ভাব দেখিয়া, পৌরুষ সাজ দেখিয়া অতি বড় চপলকেও গম্ভীর হইতে হয়, নির্ব্বাক বিস্ময়ে হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার চরণে অর্পণ করিতে হয়। জনৈক পরিচিত ব্যক্তি বলিতেছিলেন শিলং এর সৌন্দর্য্য নারীজন-সুলভ, চেরাপুঞ্জী পথের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য পুরুষের। কথাটা ভারী সত্য বলিয়া মনে হইল। গাছ পাতা ফলে ফুলে, নানা বর্ণের বিচিত্রতায় শিলং এর সর্ব্বত্র একটা কমনীয় ভাব মাখান আছে, আর অনাড়ম্বর গাম্ভীর্য্যে, অভ্রভেদের তেজস্বিতায়, ধূসরের রুক্ষতায়, ভীতিকর উচ্চতায় চেরার পথের গিরিরাজির পৌরুষ যেন ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। কখনও আমরা উপরে, মেঘ নীচে, কখনও বা দূরে সাদা মেঘের স্তূপ বরফের দেশ বলিয়া মনে হইতেছে, কখনও বা সুনীল গিরিরাজি নয়ণের তৃপ্তিবিধান করিতেছে। এত সুন্দর, এত গম্ভীর, এত সম্মোহন সে দেশ, যে ভয় তিরোহিত হইয়া একটা বিস্ময়ের ভাব, একটা শ্রদ্ধার ভাব স্বতঃই চিত্তে জাগিয়া উঠে। এই ভাবে ৭।৮ মাইল গিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পথে চলিলাম। গ্রামের মধ্যে দিয়া, প্রস্তরের মধ্যে দিয়া, বনের ভিতর দিয়া, কয়লার খনির পাশ দিয়া আমরা চলিলাম—কখনও মনে কৌতূহল, কখনও আনন্দ, কখনও ভয়, কখনও বা বিস্ময়।

ক্রমে চেরাপুঞ্জী পৌঁছিলাম। ২।১টা সরকারী বাড়ী দেখিলাম, পাশেই ডাকঘর, তারঘর, থানা, মিশনারীদের গির্জ্জাঘর, সব অতিক্রম করিয়া চেরাপুঞ্জী ছাড়িয়া চলিলাম আরও ৩ মাইল, সেখানে জলপ্রপাত, Mowsmai Falls—মৎলব আগে মুসমাই দেখিয়া পরে চেরায় ফিরিব। মুসমাই যাইতে একটী খাসিয়া বস্তীর মধ্য দিয়া যাইতে হয়, এখানে মোটরের বেগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে—ঘণ্টায় পাঁচ মাইল। অনেক সময় ২।১টা মুরগী বা ছাগল গাড়ীর সামনে পড়ে, মনে হয় এই বুঝি চাপা পড়িল, কিন্তু তখনি সরিয়া যায়। মুসমাই দেখিলাম। বর্ষাকালে ঝরণা দেখার সুখ, তখনই উদ্দাম জলস্রোত দেখিয়া প্রাণে সজীবতা উপলব্ধি করিতে পারি, অন্য সময় সেই জলস্রোত অতি ক্ষীণ। তিন চারিটি ভিন্ন ভিন্ন ধারায় জল পড়িতেছে, খুব উচ্চ স্থান হইতে পড়িতেছে। কিন্তু ঝরণা দেখার চাইতে দেখিবার জিনিষ—শ্রীহট্টের সমতল ভূমি। Sylhet Plains পাহাড়ের দুর্দ্ধর্ষ ধূসর বেশ দেখিবার পর, উদ্দাম জলপ্রপাতের কল্ কল্ ছল্ ছল্ হাস্যময় চপলতাময়, সজীবতাময় নৃত্যভঙ্গের পর, এই স্নিগ্ধ শ্যামলিমা দেখিয়া চোখ দুটী যেন জুড়ায়। ঠিক যেন একটী জীবন্ত ছবি! শ্যামবর্ণ বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র, তাহার দূরে, বহুদূরে বরফের রেখার মত নদী গিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে জলাশয় খাল বিল ইত্যাদি। আর মধ্য দিয়া কুল্ কুল করিয়া দুই কূল ভাঙ্গিয়া কল্লোলিনী সরিৎ চলিয়াছে। দুই পার্শ্বের সৈকত দূর হইতে দর্শকের দৃষ্টিগোচর। এ যেন কোন নূতন জগৎ চোখে পড়িল—আমেরিকা আবিষ্কারের মত, আর্কিমিডিসের 'ইউরেকার' মত আমরা যেন নূতন বিশ্বের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। যাহা দেখিলাম তাহার স্মৃতি মন-পটে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে জীবন মধুময় হইয়া উঠিবে।

শুনিয়াছিলাম, মুসমাইএর কাছে এক গুহা আছে, এই গুহাটাও দর্শনীয়। খাসিয়া ড্রাইভার কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না, সে কখনও যায় নাই। তখন সীতা নাড়ে হাত, বানরে নাড়ে মাথা, এই রকম ব্যাপার হইল, খাসিয়া ভাষায় আমাদের দন্তস্ফুট হয় না, দন্তস্ফুট করিলেও বিপদ আছে, শেষে কি রাম বুঝাইতে শ্যাম বুঝাইব—দুর্গতির আর শেষ থাকিবে না। আমাদের দুরবস্থা দেখিয়া কাছেই একজন বাঙ্গালীর (সম্ভব পুলিসের লোক) মনে দয়া হইল, আমাদিগকে সন্ধান বলিয়া দিল। গেলাম সেই মুসমাই খাসিয়া বস্তীতে। সেখানে তিনজন লোকের জোগাড় করিলাম; তাহারাই গাইড্ মশাল জ্বালাইয়া পথ দেখাইয়া লইবে; অন্ধকার গহন গুহাপথ আলো করিবে। মুসমাই বস্তী হইতে প্রায় তিন পোয়া মাইল সেই গুহা-পথ—বনের মধ্য দিয়া। লোক জন লইয়া চলিলাম কিন্তু যদি এই দিবা দ্বিপ্রহরে 'হালুম,' 'হালুম' শব্দ শুনি, কিম্বা এই রক্ষকই ভক্ষক হয়? তবে উপায় কি হইবে? যাহা হউক, সাহসে ভর করিয়া চলিলাম, পিছল পাহাড়পথ দিয়া একটু উঠিলাম, ক্রমে গুহার সন্ধান মিলিল। যত ভীষণ লোমহর্ষণ বর্ণনা শুনিয়াছিলাম, তেমন কিছু নয়, গুহার ভিতর কই সাপ, বাঘ, ব্যাঙ, বিছা কাহারো দর্শন মিলিল না—ভিতরে নাকি হাঁটু জল, তাহাও তো কই পাইলাম না। কিন্তু গুহাটী দর্শনীয় বটে। উপরে অর্থাৎ ছাদে (ceiling) পাশে, গুহাগাত্রে এত রকম বেরকমের কাজকর্ম্ম যে দেখিয়া সন্দেহ হয় ইহা কি প্রকৃতি দেবীরই কাজ না মানুষের হাতে করা; বৃষ্টির জল পড়িয়াই এরূপ হইয়াছে, না মানুষ যন্ত্রপাতি দিয়া করিয়াছে। খাসিয়াদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, তাহাদের কি স্থপতি বিদ্যা ছিল না ছিল সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা বিচার করিবেন। কিন্তু ভারী ইচ্ছা হইল কোনও পণ্ডিত আসিয়া এই সব গুহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন, ইহা মানুষের না স্বভাবের।

চেরাপুঞ্জীতে ফিরিয়া আসিলাম। চেরাপুঞ্জীর 'পুঞ্জী' অর্থ গ্রাম। চেরা ইংরাজী রূপ, আসল কথা সরা। শিলং হইতে ইহার বিশেষত্ব এই দেখিলাম যে এখানে অত্যধিক বৃষ্টিপাত বলিয়া ঘর বাড়ী সব পাথরের; আর শিলংএ ভূমিকম্পের আতিশয্য হেতু ঘর বাড়ী সব কাঠের। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ কর্ত্তৃক আসাম বিজয় কালে এই চেরাপুঞ্জী অতি স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। বারাকপুরের জ্বরে ভুগিয়া গোরা সিপাহীরা চেরাতে গিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইত। এমন কি, একসময় সদর আফিস শিলংএ না হইয়া চেরাপুঞ্জীতেই ছিল। কারণ শ্রীহট্ট হইতে যাতায়াত সহজ ছিল।

পরে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে শিলং রাজধানী হয়। চেরার 'শিম' বা অধিপতি—চেরা হইল কতকগুলি tribes এর নাম—কখনও ইংরেজ সরকারের প্রতিকূলতা করেন নাই বলিয়া ইহাকে আর্দ্ধ স্বাধীন ধরা হইত অন্য অনেক খাসিয়া 'শিম' অপেক্ষা ইহাকে অধিক সম্মান দেখান হইত। কিন্তু সে সব আর নাই। মুড়ি মিছরীর এখন একদর। ১৮২৭ খৃঃ খাসিয়ারা ইংরাজদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে পর, আসামে বৃটিশরাজ্য সংস্থাপক ডেভিড স্কট্ এই চেরাপুঞ্জীতেই হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া রক্ষা পান, নতুবা উন্মত্ত খাসিয়ারা হয়ত তাঁহাকে কচুকাটা করিত।

চেরাপুঞ্জীতে বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী প্রায় ৩৫ বৎসর ধরিয়া খাসিয়াদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার করিতেছেন। খাসিয়ারা দেখিলাম ভারী নকলনবীশ, তারা ইংরেজী নামও যেমন নকল করিতে ভালবাসে, বাঙ্গালা নামও তেমনই। নীলমণি বাবু একজনের নাম দিয়াছেন 'রোহিণী'। ইংরেজীতেও খৃষ্টান যারা তাদের কাহারও নাম বা টমাস্, কারো নিকলস্ কারো বা Mediterranean Sea। প্রচারক মহাশয় অনেক দেখিয়াছেন। আমাদিগকে শ্রীহট্টের সমতল ভূমি আর একবার, ও "নওকালিকা" ফল্স্ (falls) দেখাইতে লইয়া গেলেন। খাসিয়া ড্রাইভার অল্প একটু আপত্তি করিয়া আমাদিগকে যতখানি পথ মোটরে যাওয়া যায়, মাইল দুইয়ের কিছু বেশী হইবে, ততখানি নিয়া আসিল। মোটর যেখানে থামিল সেখানে লোকালয় নাই, তবে কাছেই পাথরের রাস্তা নামিয়া গিয়াছে উহাকে বলে bridle path ঘোড়া লইয়া যাওয়ার রাস্তা। উপর হইতে পাহাড়ে রাস্তা কেমন সুন্দর সরীসৃপের মত দেখায়, কেমন তার কুটিল গতি, তাহার 'ভুজঙ্গপ্রয়াত', তাহার ঘন ঘন দিক্ পরিবর্ত্তন। বিশেষতঃ সারাক্ষণ মনে হয় চারিদিকের শ্যাম ও ধূসর বর্ণ হইতে পৃথক এই সাদা বা রাঙ্গা পথটী না জানি পথিককে কোন্ অজানাতে পৌঁছাইয়া দিবে।

কতকদূর নামিতেই একটী প্রপাত দেখা গেল, আর একটির আরম্ভ মাত্র। প্রচারক মহাশয় বলিলেন ঐ যেটির আরম্ভ মাত্র দেখা যাইতেছে, দুইটি পাহাড়ের জোড়ে, ঐটিই 'নৌকালিকা'। ঠিক ঠাওর পাইলাম না, তাই পাথরের ধাপ বাহিয়া প্রায় দুইশত ফিট্ নীচে নামিয়া গেলাম; খানিকটা যাই, আর ফিরিয়া তাকাই। ঝরণাটা ভাল করিয়া দেখা যায় কিনা; এইরূপে অনেকটা গেলে যখন শেষ ধাপে আসিয়া পৌঁছিলাম, যেখানে পায়ে পায়ে পথ পাহাড়ের গা বাহিয়া নামিয়া গিয়াছে, সেখানে দাঁড়াইয়া একবার দক্ষিণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নয়ন সার্থক করিলাম। উর্দ্ধ—বহু উর্দ্ধ হইতে জলকলাপ রঙ্গে ভঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়া নামিতেছে; শুদ্ধ শীর্ষে ফেণটুকু, শুদ্ধ রজত দেহটুকু, শুদ্ধ শেতাম্বরবৎ আকারটুকু এই সুদূরে দৃষ্টগোচর—উহারই নাম নৌকালিকা। যতটা নামিয়াছিলাম উঠিতে

তাহার অন্ততঃ দ্বিগুণ সময় লাগিল, কষ্ট ত হইল যথেষ্ট। প্রকৃতিদেবীর এই কুঞ্জবনে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ জন্য সদাজাগ্রত প্রহরী সূর্য্যদেব তাঁহার তীক্ষ্ণ রশ্মিতে অনাবৃত মস্তক দগ্ধ করিতে লাগিলেন। যতদুর চোখে পড়ে,—সব নিস্তব্ধ, সব শান্তি, অবশ্য প্রখর রৌদ্রটুকু ছাড়া। কিছুক্ষণ পরে সঙ্গীরা আসিয়া পৌঁছিলেন। কি সুন্দর পথ! ফিরিবার সময় বামদিকে উদ্ধত মস্তক উন্নত করিয়া গিরিরাজি দণ্ডায়মান। দক্ষিণে শ্রীহট্টের সমভূমি কখনও বা fog আসিয়া সমস্তটা ঢাকিয়া দিতেছে। তাহার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া ও রথের ধূলায় সব ঢাকিয়া মানুষকে অভিভূত করিয়া রাখিতেছে, কখনও বা সরিয়া গিয়া মানুষকে তাহার নয়নযুগল সার্থক করিবার অবসর দিতেছে।

মোটরকারে ফিরিয়া 'নোকালিকা'র কাহিনী শোনা গেল। অতি প্রাচীন কালে এই সব দেশে লোহার কাজকর্ম্ম হইত, লোহার কারখানা ছিল। নিকটে এক গ্রামে এক ঘর স্ত্রীপুরুষ কার্য্য করিত। স্ত্রীর পূর্ব্বপক্ষের একটী ছোট মেয়ে ছিল, সে মায়ের বুকের ধন ছিল, স্বামীর তাহা মোটেই সহ্য হইত না, তাহার হিংসা হইত, কেমন করিয়া স্ত্রীর সকল ভালবাসা সে একচেটিয়া করিবে, তাহাই ছিল তার ভাবনা। একদিন স্ত্রী বাহিরে কাজ করিতে গিয়াছে, তখন স্বামী স্ত্রীর জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। অন্ন, ব্যঞ্জন, মাংস ইত্যাদি। স্ত্রী কাজ হইতে আসিয়া মেয়ের খোঁজ করিল, শুনিল মেয়েটি নাকি কোথায় খেলিতে গিয়াছে। তখন সে ছিল ক্ষুৎপীড়িত, শ্রমকাতর, তাই আর দেরী না করিয়া খাইতে বসিয়া গেল। মাংসটি ভারী ভাল লাগিল, ভাবিল বুঝি কোনও কচি শূকরের মাংস হইবে। আহারের শেষে পান খাইতে গিয়া দেখে, পানের মসলা যেখানে রাখা হয়, সেখানে তার মেয়ের পায়ের আঙ্গুলগুলি পড়িয়া। স্বামী শরীরের অন্য সব অংশ ফেলিয়া দিয়া আঙ্গুল গুলি লুকাইয়া রাখিয়াছিল। হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিয়া মা শোকে উন্মত্ত হইয়া গেল; ছুটিয়া এই জলপ্রপাতটির কাছে আসিল, তারপর ঝাঁপ দিয়া পর্ব্বতনিম্নে জলগর্ভে জীবনের সকল জ্বালা জুড়াইল। সেই হইতে এই ঝরণাটির নাম হইয়াছে "নোকালিকা" 'নো' কথাটির খাসিয়াতে অর্থ নীচে পড়া, কা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের চিহ্ন, যে কোনও রমণীর নামের পূর্ব্বে কা বসে, লিকা ঐ হতভাগিনীর নাম; নোকালিকা মানে নিকা এইখানে পড়িয়া মরিয়াছিল। এই গল্পটির সঙ্গে ইংরাজী, গ্রীক্, অনেক কাহিনীরই সাদৃশ্য আছে, বিশেষতঃ Procneর গল্পের। খাসিয়া মেয়েদের মধ্যে এইরূপ আত্মবিসর্জ্জন নিতান্ত বিরল নহে, শুনিলাম একজন মেয়ে অল্পদিন পূর্ব্বেই মুসমাই ঝরণার কাছে বসিবার যে লোহার রেলিং ঘেরা পাথরের বেঞ্চ আছে, তাহা হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল।

ফিরিবার সময় চেরাপুঞ্জী হইয়া আসিতে হইল। চেরাপুঞ্জী ছাড়িয়া ৭।৮ মাইল আসিয়া আবার সেই অদ্ভুত দৃশ্য, সেই মেঘমালার খেলা, সেই অভ্রভেদী পর্ব্বতশ্রেণী, সেই গভীর খত, সেই গম্ভীর প্রকৃতিশোভা। আর দুই দিকের পাহাড়ের মধ্যদিয়া সরু ছিপ্ ছিপে একটি নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রস্তরবোঝা লইয়া চলিয়াছে, তাহার আপন মনে, কে জানে তাহার উদ্দেশ্য, কে জানে তার অভিপ্রায়। কবির সেই কথাটি বার বার মনে পড়িতে লাগিল—

"ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর,
নদীজপমালা ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হের পবিত্র
ধরিত্রীরে।"

ধ্যানগম্ভীর ভূধরই বটে, নদী জপমালাধৃত প্রান্তর, যদি কোথাও থাকিয়া থাকে, তবে এখানেই।

পথে 'হাতীঝর' বা Elephant Falls দেখিয়া আসিলাম—এই ঝরণাটি তেমন উঁচু নয়, কিন্তু অনেকটা ছড়ানো—মুসমাই ও হাতীঝর যেন দুই বিভিন্ন শ্রেণীর। হাতীঝরে পূর্ব্বেও আসিয়াছিলাম, কিন্তু বর্ষা না হইলে এসব ঝরণার সৌন্দর্য্য তেমন খোলে না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তবু যখন আমরা গিয়া পৌঁছিলাম, তখন শিলং হইতে একদল বনভোজ করিয়া ফিরিতেছিল।

শিলং যখন পৌঁছিলাম তখন অস্তায়মান সূর্য্যের স্নিগ্ধতা ছিল, প্রখর ভাব ছিল না, দীপ্তি ছিল কিন্তু তাহা দগ্ধ করে না, শান্ত করে, তপনের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দিনের শেষে প্রকৃতির এই শান্তভাব অতি উপাদেয় লাগিল।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

কার্ত্তিকে

চালাকি চলিবে না—আকাশযানের মহিমায় উন্নত হিমালয়ের উন্নতির সম্ভাবনার কথা আগের বারে লিখিয়াছি। সে উন্নতির দীপ্তিতে মোহিত হইয়া আমরা হয়ত তখন একবার সেদিকে ছুটিব,—হয়ত কৈলাসের সানুতে ও মানস সরোবরের কূলে নূতন নূতন তীর্থ বসাইবার পাণ্ডা না পাইয়া নীচু ভূমির চা-বাগানের বা ফলের বাগানের শেয়ার্ খুঁজিতে ব্যগ্র হইব, আর আমাদের বেগ্‌গাতা উপেক্ষিত হইলে অনাধ্যাত্মিক জাতিকে জব্দ করিবার জন্য রাগ করিয়া এই প্রশস্ত মাটিতে ভাত খাইব অথবা মায় উপবাস হরতাল করিব। সাহিত্যিকেরা হয়ত এ সকল কিছুই না করিয়া কৈলাসের নূতন কলেজে "মিয়সিন্" যুগের তত্ত্ব শিখিবেন, আর না হয় বঙ্গবাণীর জন্য পাহাড়ে গল্প ও চোয়াড়ে কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইবেন। যাঁহারা কংগ্রেসের চতুরঙ্গের বোড়ের চালে কিস্তি মাত করার উদ্যোগে আছেন, এ সকল ছোট কথায় মনোযোগ দিবার সময় তাঁহাদের নাই; আকাশযানের চাপের কথা শুনিলে তাঁহারা কাহার শাপ বলিয়া নিজেদের বড় খেলায় মাতিবেন। যখন আমাদের ভাবিবার অবকাশ হয় নাই যে দেশের কোন্ মাটিতে কি জন্মিতে পারে, আর অতি সুখে সন্তোষের অমৃতে তৃপ্ত ছিলাম, তখন আসামে বহু হাজার একর জমি আবাদ করিয়া বিদেশীয়েরা "ইতশ্চেতশ্চ" ধাইয়া অর্থলাভের স্থায়ী ব্যবস্থা করিল; আমরা আগে উহাদিগকে অসাধুতার জন্য গালি পাড়িলাম, পরে যথাসাধ্য নিজেরাও দুঃশীলদের অনুগামী হইয়া রোজগারের চেষ্টা দেখিলাম। আকাশযান কোন উপদ্রব না ঘটাইতে পারে, কিন্তু আমরা যে নিপুণ অনুসন্ধানে ও ধীরতায় দেশের স্থায়িত্ব রক্ষার উপায় বাহির করিতে পারি না, তাহাই আমার বলিবার উদ্দেশ্য। আমরা ইংরেজের কাজের নিন্দা করিতে পারি, উহাদের উদ্ভাবিত উপায় ধরিয়া একটু নাড়া-চাড়া করিতে পারি, কিন্তু নিজেদের বুদ্ধিতে কিছু নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারি না। আমাদের উদ্ভাবনী শক্তিতে অথবা প্রথম চেষ্টায় একটাও রোজগারের উপায় বাহির হয় নাই, আর আমরা রাজনীতি বিশারদ হইলেও দেশ পরিচালনার জন্য একটা পদ্ধতির প্রস্তাব খাড়া করিতে পারি

নাই। মণ্টেগু একটা পদ্ধতি গড়িবার পর উহার কিছু কিছু সমালোচনা করিয়াছি, কিন্তু নিজেরা দেশের অবস্থা লিখিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতির জন্য দাবী করিতে পারি নাই। উড়া কথায় স্বরাজ চাহিয়াছি, ডোমিনিয়ন ষ্টেটস্ চাহিতেছি, কিন্তু কি ভাবে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা সে অদ্ভুত পদার্থের ব্যবহার করিবে তাহা পুস্তকে লিখিয়া দশের হাতে শিক্ষার জন্য ও আলোচনার জন্য দিতে পারি নাই। চিন্তাশক্তির এই দৈন্য, জ্ঞানের এই হীনতা ও সুবুদ্ধির এই অভাব থাকিতে দেশের কোন উপকার হইতে পারিবে না। যাঁহারা দেশের খাঁটি অবস্থার বিবরণ লিখিতে পারেন নাই, কেবল উড়া রকমে আসর জম্‌কাইবার ভাষায় দেশের দুরবস্থার কথার বক্তৃতা করেন তাঁহারা নেতা হইবার অনুপযুক্ত,—দেশের প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃত হইবার অনুপযুক্ত। বুদ্ধির ও কাজের কাজ চালাকিতে সারা যায় না।

* * * *

চাষের দরবারি অনুসন্ধান—শীঘ্রই চাষের ও চাষার অবস্থার দরবারি অনুসন্ধান চলিবে; পাঠকেরা সে সংবাদ রাখেন। অনেকের বিশ্বাস যাঁহারা বঙ্গদেশের অবস্থা-সুমারির কাগজ-পত্র রাখেন তাঁহাদের প্রতিনিধিরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবেন যে, এই বঙ্গদেশের চাষারা ও নিম্নস্তরের ভূমিশূন্য শ্রমজীবীরা অভাবের তাড়নায় পীড়িত নয়। তাঁহারা দেখাইবেন যে বঙ্গের নানাশ্রেণীর শিল্পীরা শিল্পদক্ষ হইলেও সহরে সহরে শ্রম-শিল্পের কাজ করিতে যায় না, ও নিম্নস্তরের লোকেরা কল-কারখানা প্রভৃতিতে লোভজনক মজুরির কাজে আসিয়া লাগে না; এ সকল কাজের জন্য দলে দলে বঙ্গের বাহিরের লোকেরা কাজ কাজ করিতে আসে, আর এমন কি সহর হইতে অতি দূরবর্ত্তী স্থানেও রেলের ষ্টেশনে ও অন্যান্য স্থানে বিদেশীরা জুটিয়াছে,—বঙ্গের লোকেরা সে সকল কাজে হাত দেয় না। অভাবের তাড়না থাকিলে এমনটি হয় না, ইহাই হইবে প্রতিপাদ্য।

এ প্রসঙ্গে উক্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিরা ইহাও বুঝাইবেন যে এই বঙ্গের চাষারা এক দিকে সুদ-খোর নির্ম্মম ধনীদের হাতে ও অন্যদিকে জমিদারদের খামখেয়ালী অত্যাচারে পীড়িত হইয়া দুঃস্থ হয়। গবর্ণমেণ্ট যে সুদখোরদের পীড়ন দূর করিবার জন্য কোঅপারেটিভ বেঙ্ক খুলিয়াছেন, আর জমিদারদের আধিপত্য দমাইবার জন্য যে নূতন আইনের ব্যবস্থা করিবেন, তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। কিরূপ উন্নততর চাষের পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে চাষের শ্রীবৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে এই প্রতিনিধিরা হয়ত কিছু বলিবেন না।

যে যুক্তি তর্কের অবতারণা হইবে তাহার উত্তর লিখিবার জন্য এই মন্তব্য নয়; আমাদের উদ্দেশ্য যাহাতে এই বিষয়গুলির প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়ে, ও বুদ্ধিমানেরা প্রামাণিক ভাবে অবস্থা সুমারির কাগজ-পত্র নিজেরা রচনা করেন। কাজটি করিতে হইলে অনেককে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অবিলম্বে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে আরম্ভ করিতে হইবে ও সকল শ্রেণীর লোকের মাতব্বরদিগকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিবার উদ্যোগ করিতে হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে নির্ব্বাচনের ধূম পড়িবে আর সেই চকচকে আন্দোলনে এই কাজটি চাপা পড়িবার ভয় আছে।

Editor : Bejoychndra Majumdar.
Printed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Publishe' by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani Office, 77 Russa road North, Bhawanipur Calcutta.

বঙ্গবাণী

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

যীশুখৃষ্ট

শিল্পী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"আবার তোরা মানুষ হ'

৫ম বর্ষ
১৩৩২-'৩৩

অগ্রহায়ণ

দ্বিতীয়ার্দ্ধ
৪র্থ সংখ্যা

রূপ

রূপের ভেদাভেদ জ্ঞান ও রহস্য প্রকাশ হল কায আর্টিষ্টের, এই জন্যে 'আর্টিষ্ট' কথার ঠিক প্রতিশব্দ হল 'রূপদক্ষ'। কুঠার ঠিকরূপে গড়া হল তবেই সে কাটলে ঠিক মতো। প্রথম আর্টিষ্ট যখন কুঠার গড়লে তখন সে কুঠারের বাইরের আকৃতিটা ও মানপরিমাণ হয়তো একরকম দিলে, কিন্তু যে ধাতুতে কুঠার গড়লে ঠিক কাটবে কুঠার জলের মতো সেটুকুর জন্যে অনেক দিন ধরে অনেক রূপদক্ষের জন্মানো এবং মরার অপেক্ষা ছিল একথা ঠিক! শুধু এই একটি মাত্র কুঠার রূপ নয় নানা প্রহরণ তারি নানা রূপভেদ এও এক এক আর্টিষ্ট এসে দখল করলে যুগে যুগে—ক্ষুরপ্র বাণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ, শিলীমুখ কত কি রূপের ভেদ। বাঁশপাতা, গাছের কাঁটা পাখির পালক সবাই উপদেশ করলে রূপভেদের। রূপটি ঠিক হলো তবেই চল্‌লো তীর ঠিক লক্ষ্য স্থান ভেদ করতে। রূপটি এমন হল সে এমন করে বিঁধলে অমন হল রূপ বিঁধলে তেমন করে। সহজ কথা—সুরটি ঠিক বসলো গলায় রাগটি পেলে ঠিক রূপটি, ছন্দ পেলে ঠিক কথা, কথা পেলে ঠিক ছন্দ কবির কল্পিত রূপটি ঠিক ফুটলো তখন। উপযুক্ত রূপ অনুপযুক্ত রূপ এ কথা আর্টে খাটে কিন্তু সুরূপ কুরূপ বলে স্বতন্ত্র দুটো রূপ আর্টিষ্টের কাছে নেই, তার কাছে আছে শুধু নানা রূপ—কোনোটা এ কাযে উপযোগী সে কাযে অনুপযোগী

এই রকম। যেমন— বাঁকাকে নিয়ে তীর গড়া চল্লোনা তীরের অনুপযোগী সে, আবার ধনুকের বেলায় বাঁকাই যত বাঁকালো ততই দেখতেও হল চমৎকার কাযও দিলে সুন্দর! তীর সোজা ধনুক বাঁকা— সোজাতে বাঁকাতে মিলন, একই ক্ষেত্রে রূপের ভেদ ও অভেদ! এমনি ভেদাভেদ সে সঙ্গীতে সে কবিতায় রূপ ধরে প্রকাশ পায় কথার মারপেঁচ্ সুরের ঘোর পেঁচ নিয়ে। বাঁকা দিলে এক রূপ, সোজা দিলে অন্য, বাঁকায় বাঁকায় মিলে এক রূপ, সোজায় বাঁকায় মিলে অন্য—এমনি নানা ভেদ রূপের। মেঘের উপরে ইন্দ্রধনু--সে একটি মাত্র রঙ্গীন আলোর বাঁক্ তার সঙ্গে আর একটা উপযুক্ত রকম সোজা তীর তো জোড়া হল না— শুধু আলো অন্ধকার রৌদ্র ও মেঘের ভেদাভেদ নিয়ে সুন্দর ফুটলো রূপটি বর্ণপ্রধান ও বাঁকা! সমুদ্রতীরে রূপের ভেদাভেদ শব্দ ধরে ফুটলো আর স্থিতি ও গতি ধরে ফুটলো ঠিক সঙ্গীতের মতোই— আকাশ নিস্তব্ধ নিথর নীল সমুদ্র সচল সশব্দ নীল! সূর্য্যের কিরণচ্ছটায়— বাঁকায় সোজায় মিলিত রূপ, গাড়ির চাকায়— বাঁকার কোলে সোজা! ঢেউয়ের পরে ঢেউ সেখানে বাঁকায় বাঁকায় মিলন, সারি সারি তাল গাছে বৃষ্টিধারা পড়্ছে অবিশ্রান্ত— সোজায় সোজায় মিল! রূপের ঘেরে বন্দি আমরা গোড়া থেকেই এই বাঁধন থেকে মুক্তি হচ্ছে রূপমুক্তির সাধনা রূপকারের।

যে রূপ সমস্ত নিয়ে রূপকারের কারবার তারা বাঁধা রূপ, আর্টিষ্ট তাদের মুক্তি দিলে তবেই তারা পথ পেলে মন থেকে মনে চলাচলি করবার। রূপসাগরের তলায় সুপ্তি দিয়ে বন্ধ করা রূপকথার রাজকন্যা, রূপমুক্তির সাধনা হ'ল তাকে জাগিয়ে আনা! রেখা মুক্তি পেলে তো— রং ধরে বাঁধা রূপের প্রাচীর টপ্‌কে সে ভাব-রাজত্বে পালালো বন্দি।

কথা থাকে অর্থ দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা—কবি তাকে মুক্তি দেন তবে জানায় সে বেদনা গুঞ্জন করে ভ্রমরের মতো হৃদয়পদ্মের পাপড়ি খোলাতে, তখন আর শুধু থাকেনা কথা আর তার অভিধান-দোরস্ত মানেটা। যেমন এই 'বাচ্ছা' কথাটি—সে সর্ব্বজীবে সর্ব্বকালেই বাচ্ছা এইটেই বোঝায়, কিন্তু এই বাচ্ছারূপি কথাটি মুক্তি পেলে যেমনি বলা হল বাছা বাছনি! যেমন জুতা সে মুক্তি পেলে বাঁধা রূপ থেকে জুতুয়াতে, পাট—পট্ট—পট একই কথা কিন্তু রূপ দেখায় স্বতন্ত্র তেমনি, অসংখ্য কথা ছাড়া পেয়ে গেছে ও যাচ্ছে কবির হাতে বদ্ধরূপের শিকল কাটা পাখি সমস্ত!

সঙ্গীতে স্বরমালা—সাত রাজার ধন সাতটি মাত্র, কিন্তু সাতাশ লক্ষেরও বেশি রূপ পেয়ে ঝলক দেয় সাতসুর—গুণীর কণ্ঠে অপূর্ব্ব সাতনরী হার! উৎসঙ্গে লীনা বীণা—সে মুক্তস্বরা —তাকে পরিত্যাগ করে নির্গুণ যখন চলেন একটা বাক্সে বাঁধা সার্গমের অচল ঠাটের মধ্যে গলাটা বলিদান দিয়ে গান গাইতে তখন রাগ রূপ সমস্ত তারা মুক্তির স্পর্শ পায় না, কিন্তু ছাঁদ পায় বাক্সের ও সিন্দুকের, তেমনি এই এ্যানাটামির কিম্বা ফটোযন্ত্রের বাক্সের মধ্যে হাতের টান

ও মনের পরশ মিলিয়ে টানার কথা— সেসব রং রেখা তাদের যখন ঢালাই হতে দেখি তখন দেখি রূপ পাচ্ছে— এ্যানাটামি ও পারস্‌পেক্‌টিভ কিন্তু পরশ পাচ্ছে না একটুকুও মুক্তির।

যখন প্রাচীন প্রথার মধ্যে কিম্বা আধুনিক কোনো বাঁধা প্রথায় রূপকে ঢালাই হতে দেখি তখন আমার আতঙ্কের সীমা থাকে না— জলের মাছকে বঁড়শী দিয়ে গেঁথে হাঁড়ির মধ্যে মুক্তি দেওয়ার মতো ঠেকে ব্যাপারটি।

রূপ-সাধককে এই রকমের নিষ্ঠুর খেলা খেলতে হয় শুধু রূপ বদ্ধ হলে কি হয় আর ছাড়া পেলেই বা কি হয় তা জানার বেলায় কিন্তু রূপ সমস্তকে রসের স্পর্শে মুক্তি দেওয়াতেই রূপদক্ষের আনন্দ ও চরম সার্থকতা এ কে না বলবে!

একটা মাটির ঢেলা এক চাংড়া পাথর তাদের রূপ নিরেট করে বাঁধা নিয়তির নিয়মে একবারে সুনির্দ্দিষ্ট রূপ কিন্তু সেই ঢেলা আর পাথর রূপদক্ষের কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে যখন আসে অপরূপ সব মূর্ত্তি ধরে, তখন মানুষ তার পূজো দেয় তাকে প্রেমালিঙ্গন দেয়, খেলা করে মাটি পাথর মানুষের সঙ্গে। পাষাণ দিলে বর অভয় পাষাণ দিলে ভিজিয়ে মন এ অঘটন কি ঘটতো যদি না সুহস্ত রূপদক্ষ তাঁরা পাষাণকে তার জড়ত্বের কঠিন কারাগার থেকে মুক্তি না দিতেন! অনড় পাথর নটরাজ মূর্ত্তিতে নাচ্‌লো, অচেতন পাষাণ সে চেতনার স্পর্শে আর এক জীবন্ত সুন্দর মূর্ত্তির মতোই চম্‌কে উঠলো থম্‌কে দাঁড়ালো। নবজীবন দিলে রূপদক্ষ তাদের। যেখানে আলো সেখানে অন্ধকার যেখানে সোজা সেখানে বাঁকা, জড় পাষাণের কাঠিন্যের সঙ্গে মেশা সজীবতার তারল্য, এই ছন্দ রূপের জগতে মানুষ প্রথম এসেই লাভ করেছে, সহজে— —এই বাতাসের মতো সহজে! এ ছন্দ ভাংলেই সর্ব্বনাশ! এই কাঠিন্য এবং তারল্যের ছন্দে গাঁথা মানুষের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সবটাই দূরের পাহাড় সে জানায় এই ছন্দটি! চাঁদ সে আলো অন্ধকারের ছন্দ ধরে সুন্দর—রাত্রি ঘিরে আছে তবেই পূর্ণচন্দ্রের রূপ আছে, প্রতিপদের চাঁদ সে আর এক ছন্দ ধরে মনের আকাশে ভাবরূপে বিদ্যমান হল—সে আছে অথচ নেইও—এই ছন্দ! ছবিতে মূর্ত্তিতে কবিতার গানে শুধু ফুটন্ত রূপ নিয়ে কারবার নয় আর্টিষ্টের—দেখা না দেখা দুইরূপ মিলে তবে ছন্দোময় হয় কায। ফটোগ্রাফ শুধু দৃশ্যরূপের মধ্যে বদ্ধ, কাজেই ছন্দ ছাড়া রূপ দিয়ে চলে সে। রেখার কাঠিন্য ও রেখার তারল্য—এই নিয়ে অঙ্কনের ছন্দ, সুরের কাঠিন্য মিল্লো গিয়ে মীড়ের তারল্যে এই হল গায়নের ছন্দ, সবদিকেই রূপ দেবার বেলায় এই ছন্দ না ধরে উপায় নেই!

"চক্ষুগ্রাহ্যং ভবেদ্রূপম্‌" কিম্বা 'নন্নু রূপাণি পশ্যন্তি' দৃশ্য রূপের কঠিন অংশের সম্বন্ধে একথা খাটলো, কিন্তু যে সব রূপ মনে গিয়ে পৌঁছচ্ছে, চোখে পড়ছে না কিন্তু অনির্ব্বচনীয় স্পর্শ টুকুর উপরে যার নির্ভর এমন সব তরল রূপ? তার বেলায় মনশ্চক্ষু প্রাণরসনা ইত্যাদি না নিয়ে সেখানে কায চল্লোনা। রূপের এই রহস্য জেনেই বাউল কবি বলেছেন—

"চোখে দেখে প্রাণে ঠেকে ধূলো আর মাটি
প্রাণ রসনায় দেখরে চাইখ্যা রসের শাইখ্যাটি।"

চোখে দেখি একরূপ প্রাণে দেখি অন্যরূপ এই হল রূপের দুই প্রকাশ। দৃষ্টির পথে যেমনি চোখাচখি অমনি অভিসার রসরূপে মানস কুঞ্জে! হয়তো সে একটি রূপযৌবনে পরিপূর্ণ, হয়তো সে একটি রূপ ন্যুব্জ কুব্জ জরাজীর্ণ, হয়তো সে একটি গাছের তলায় হরিণশিশু, হয়তো সে একটা ছাতা মাথায় বেং কিন্তু দৃষ্টিপথ ধরে মনে পৌঁছোলো কি সেটি রসের বস্তু হল রূপদক্ষের কাছে—

"সই কিবা সে সুন্দর রূপ
চাহিতে চাহিতে পশি গেল চিতে
বড়ই রসের কূপ।

মানুষের মন বা চিত্তপট তো ক্যেমেরার প্লেট নয় যে চোখ খুল্লেই ধরলে ছবি বুকে, কার কাছে কি যে মনোরম ঠেকে কোন রূপটা কখনই বা প্রাণে লাগে তার বাঁধাবাঁধি আইন একেবারেই নেই কিন্তু মনে না ধরলে সুন্দর হল না, মনে ধরলে তবেই সুন্দর হল এ নিয়ম অকাট্য। 'মনের মানুষ মনের মতো ঘরখানিতে' এতো কথার কথা নয়! রূপের ঠাট এক বাইরের মতো আর এক মনের মতো, ফটো দেয় বাইরের ঠাট রূপদক্ষ দেন মনোমত রূপের ঠাট্ সমস্ত।

উটের কিম্বা পেঁচার ও বেংএর বাইরের ঠাট্ বিধাতার মনোমত হলেও সাধারণ লোকে দূর দূর করলে দেখে তবেই বলি—সাধারণ মানুষের মনোমতো হবার মতো রূপ পেলে না তারা,—কিন্তু রূপদক্ষের রূপসৃষ্টির নিয়ম—যা হল নিয়তিকৃত নিয়ম থেকে স্বতন্ত্র—তার রসে উটের রূপ, পেঁচার রূপ, বেঙ্গের রূপ সুন্দর হল মনোমত হল—সুন্দর তাকে ব্যঙ্গ করলে না একজনও। একটা ক্যেমেরা সে রূপকে ধরে নেয় ঠিক কিন্তু রূপ-সৃষ্টির নিয়ম মানেনা পদার্থ-বিদ্যার জল বাতাস আলো ছায়ার অকাট্য নিয়ম মানে তবুও সে কি ঠিক উট পেঁচাটাই ঠিক ভাবে দেয়?—সৃষ্ট রূপের একটা একটা অপদার্থ নকল দেয় মাত্র! নিয়তির নিয়মে সৃষ্টির কিছুতে পুনরুক্তি হতে পারে না কিন্তু কল সে বিজ্ঞান-সম্মত নিয়মে এক জিনিসের হাজার হাজার পুনরুক্তি করে চলেছে সুতরাং এ হিসেবে সেও নিয়ম লঙ্ঘন করছে কিন্তু স্বতন্ত্র কোনো এমন একটা নিয়ম নেই তার যার দ্বারায় রূপসৃষ্টি করতে পারছে সে।

নিয়তিকৃত নিয়ম থেকে স্বতন্ত্র অথচ নিয়তির নিয়ম থেকেই নেওয়া সমস্ত রূপকারের কারিগরি নিয়ম—পাষাণ তার একটা আকৃতি আছে, বর্ণও আছে কাঠিন্য ইত্যাদি গুণও আছে কিন্তু চেতনা নেই, সুতরাং তার সুখ দুঃখ মান অভিমান কিছুই নেই—এই হল নিয়তির নিয়মে গড়া সে পাষাণ কিন্তু রূপদক্ষের কাছে পাষাণী অহল্যা নিয়তিকৃত নিয়মের থেকে স্বতন্ত্র নিয়মে যখন রূপ পেলে তখনো সে পাষাণ কিন্তু তার সুখ দুঃখ মান অভিমান জীবন মৃত্যু

সবই আছে। যে মাটির খেলনা গড়লে সে মাটিকে জড়তা থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষের খেলার সাথিরূপে ছেড়ে দিলে।

পাষাণেগাঁথা গোঁসাঘর—তার মধ্যে ধরা রূপবান রূপবতী—হাতুড়ির ঘায়ে তবে ভাঙ্গে সে গোঁসাঘরের দেওয়াল, তারপর পাথরের মান ভাঙ্গাতে অসাধ্য সাধন। মাটির দেওয়াল—তার মধ্যে লুকিয়ে আছে রূপ সেও অভিমানে জলাঞ্জলী দিয়ে সহজে কি বেরিয়ে এল? সোনা সে কি কম জ্বালালে আর্টিষ্টকে? হীরক যাকে বলে বজ্রমণি সে বজ্রের মতো দুর্জ্জয় তাকে মানিয়ে তবে দিতে হল হীরের ফুল ফুটিয়ে! বিধাতার নিয়মে বাঁধা রূপ-জগৎ তার মধ্যেই আর একটা জগৎ—যেটা আপনার নিয়মে চলেছে—অথচ সেটা সত্যকার রূপজগৎ--বিশ্বামিত্রের ব্যাসকাশীর মতো ভূয়ো জগৎ নয়—সেখানে সত্যরূপ সমস্ত বিধাতার নিয়মকে কোথাও মেনে কোথাও বা আর্টের নিয়মকে ধরে সৃষ্টি হচ্ছে! যেমন এই গাছ--একে দিলেন নিয়ন্তা এক রূপ, যেমন সেই গাছ—তাকে দিলে কারিগর টেবেল, কেদারা, নৌকো, বাড়ী কত কি রূপ—একা নিয়তির নিয়মে গড়াই হতে পারে না—মানুষের চৌকি, টেবেল, বাক্স তোরঙ্গ!

আলঙ্কারিকেরা এই রকমের শিল্প-কার্য্য সমস্তকে বলেছেন বন্ধ-চিত্র। দুই সৃষ্টিকর্ত্তার নিয়ম স্বীকার করে তবে হয়েছে—টেবেল চৌকি সোণারূপার অলঙ্কার ইত্যাদি ইত্যাদি। —উনি দিলেন মাত্র কাঁচা সোণাটুকু, ইনি দিলেন পাকাসোণার কর্ণফুলের রূপলাবণ্য ভাবভঙ্গী সবই! উনি দিলেন কাঁঠালগাছ, উনি দিলেন কাঁঠালকাঠের রাজ-তক্ত! এমনি দুই আর্টিষ্ট মিলে হল গঠন সমস্ত। এই জন্যে বলা হল বেদেতে—আমাদের শিল্প দেবশিল্পির অনুরণন দেয়। এ-শিল্পির ও-শিল্পির বন্ধুতার ফলে হল এই সব নানা প্রবন্ধে নানা ছন্দে দেওয়া রূপ সমস্ত, শুধু নিয়তির নিয়ম লঙ্ঘন করেই হয় না আর্টের জগতে রূপসৃষ্টি। মনে করোনা যেই টেবিল চৌকি গড়ে সেই হয়ে ওঠে দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তা। কেননা রূপসাধন সে সহজ সাধন নয়। কোনো চৌকিতে বসলেই উঠি উঠি মন করে, কোনো কেদারা এমন আরামের যে বসতেই শ্রান্তিদূর, সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার আবেশ।

ফুটবল দেখতে মত্ত থাকি বলেই বুঝতে পারিনে ফুটবলের চার আনার বেঞ্চ একজন রূপদক্ষে গড়েনি—সে প্রায় সৃষ্টিকর্ত্তার কাঠখানাই বেঞ্চ বলে চালিয়ে বঞ্চনা করছে দর্শকদের।

রূপদক্ষ নিজের মনোমত রূপটি রচনা করেই খালাস, যে রূপ দেখবে তাদের কথা রূপদক্ষকে একেবারেই ভাবতে হয় না এ একটা কথাই নয়—আমার যা খুসি রেঁধেই খালাস তুমি খেয়ে দূরছাই কর তাতে এল গেল না—এ কোনো ভাল রাঁধুনীই বলেনা। আমার মনোমতকে দশের ও দশহাজারের মতোমত করে দিলেম—এতেই আনন্দ হল রূপদক্ষের।

রূপ দেবার শত সহস্র নিয়মের যে দেখা পাই রূপবিদ্যার চর্চ্চার বেলায় তার কোনো প্রয়োজনই ছিল না যদি না রচনা সমস্তকে তোমারো মনে ধরাবার দরকার হতো। ছেলে

কাদা নিয়ে খেলে, কত গড়ন গড়ে সেও, কিন্তু রূপের কোনো নিয়ম তার কাছে নেই, সে যথেচ্ছা গড়ে চলে কিন্তু সেও থেকে থেকে কোনো একটি দর্শকের তারিফ পেতে কায হাতে ছুটে আসে। কাজেই দর্শক ও প্রদর্শক চাই-ই থাকা।

বড় বড় কবি ও রূপদক্ষ নট ও পট-রচয়িতা তাদের কথা ছেড়ে দিই, যে লোকটা ছেলে খেলানোর পুতুল গড়ছে—বাঘ ভালুক সাহেব মেম্ পশুপক্ষী হাঁড়ি কুঁড়ি কত কি—সেই যে পুতুলওয়ালা—সে তো যথেচ্ছা গড়ছে না, ছেলে ভোলে কিসে এ তার স্মরণে রয়েছে অথচ তাকে নতুন নতুন রূপ দিতে হচ্ছে নিজের মতে। ছেলের একটি ফোঁটা প্রাণ কিন্তু বিশ্বরূপকে নিয়ে খেলার ইচ্ছা তার—সে হাতি চায়, ঘোড়া চায়, পাখি চায়, বাঘকে চায়, শেয়ালকে চায় খেলার সাথিরূপে পেতে, কিন্তু সত্যি জানোয়ার দেখে সে ডরায়, ভারি খেলনা হলে তুলতে ও টানতে হয় শিশুর প্রাণান্ত, কাচের পুতুল নিয়ে খেলতে গেলে সে হাত পা কেটে বসে, এক খেলনা নিয়ে বেশীক্ষণও সে ভুলে থাকে না—নতুনের প্রেমে পাগল তার নতুন জীবন, সবই তার বিস্ময় জাগায়!

রূপ মানপ্রমাণ ভাবভঙ্গী সাদৃশ্য বর্ণলাবণ্য কোনো দিক দিয়ে অনুকৃতির নিয়মকে মানা চল্লোনা এক্ষণে রূপদক্ষ খেলেনাওয়ালার। বাঘ ঠিক বাঘ হলে চল্লো না, এমন একটি রূপ দিতে হল পুতুলকে যা বল্লে আমি বাঘ বটে কিন্তু খেলাতে এসে যোগ দিতে পারবো এমন বাঘ আমি! লঘুভার চমৎকার বাঘ যাকে দেখতে বাহার খেলতে মজা যার সঙ্গে, এই হলোতো ছেলে ভুল্লো, নচেৎ নয়। আইনও হল এই সব ক্ষণভঙ্গুর পদার্থ দিয়ে খেলনা প্রস্তুতের।

মূর্ত্তি-শিল্পের চরম হল যেখানে পাষাণে দেবতার আবির্ভাব হল। এই সব আর এক প্রস্ত বুড়ো বয়সের খেলনা—পুতুল গড়ার নিয়ম সেখানেও খাটলো অনেকখানি তফাৎ শুধু হল মাপের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কোথাও কোথাও। ছেলের খেলনা হাল্‌কা, বুড়োর খেলনা ভারি, এটা ছোট মাপ ওটা নবতাল দশতাল এমনি তাল তাল রূপ এই যা তফাৎ। বালির স্তূপ গড়লে ছেলেতে আর পাথরের স্তূপ গড়লে বৌদ্ধ রাজা—সাজের বাহুল্য এবং রূপের সমাবেশ ইত্যাদি নিয়ে আরো অনেকখানি পরিপূর্ণ হল বৌদ্ধ স্তূপ কিন্তু রূপটা রইলো—সেই ছেলের গড়া বালির স্তূপেরই।

প্রতিকৃতি, অনুকৃতি এ সবের স্থান আছে রূপবিদ্যার মধ্যে এদের জন্যে স্বতন্ত্র নিয়ম আছে—তা হল রূপকে শত শত বার পুনরাবৃত্তির নিয়ম।

রূপদক্ষের সৃষ্টি যার পুনরাবৃত্তি নেই তার নিয়ম সমস্ত স্বতন্ত্র নিয়তিকৃত নিয়মরহিত নিয়ম বা খেলনা গড়ার নিয়মও বলতে পারো তাকে।

নিয়তির নিয়ম হল বিধাতার নিয়ম, আর নিয়তির নিয়ম থেকে খানিকটা স্বতন্ত্র নিয়ম হল আর্টের নিয়ম। কিন্তু একবারে যে নিয়তির নিয়ম লঙ্ঘন করলে সে আর্ট রূপ রস শব্দ গন্ধ

স্পর্শ নিরপেক্ষ আর্ট—হয়তো আছে হয়তো নেই! তুই সৃষ্টির নিয়মকে মানিয়ে যে আর্ট তাই নিয়েই রূপদক্ষের কারবার। একটা মাটির খেলনা তাকে ছেলের সাথি হবার উপযুক্ত করে ক্ষণিকের জীবন দিয়ে ছেড়ে দিলে আর্টিষ্ট, একটা পাথরের দেবমূর্ত্তিকে আরো বেশী পরমায়ু দিলে আর্টিষ্ট কেননা যুগ যুগ ধরে মানুষের সঙ্গে খেলার সম্পর্কে পাওয়া চাই তার! ঠিক এই নিয়ম দেখি বিধাতারও সৃষ্টির মধ্যে কায করছে—নক্ষত্র একটা গড়লেম বিশ্বকর্ম্মা যুগ যুগ ধরে ফুলঝুরি জ্বালিয়ে খেলে চল্লো, একটা খদ্যোৎ গড়লেন তিনি ক্ষণিক খেলার অবসর পেলে সে বিধাতার কাছে। আর্টিষ্টও ঠিক এর জবাব দিলে ঘরের মধ্যে তার সে ঘরের প্রদীপ তারার মতোই জল্লো—শুধু রূপটি পেলে সে ক্ষণিকের।

বিধাতার গড়া প্রজাপতি সে খেল্লে ক্ষণিক, আর্টিষ্টের গড়া পাষাণসুন্দরী সে যুগ যুগ ধরে খেলতে লাগলো, মানুষের ঘরে সোনার কাঁটায় বেধা সোনার প্রজাপতি শোভা ধরলে—একের পর এক যারা সুন্দরী জন্মালো তাদের খোঁপায় উড়ে বসলো সে বিয়ের আগে। দেবতার সভায় বাজলো মেঘের বাদল, আর্টিষ্টের সভায় বাজলো মাটির মাদোল। গাছ সে ফুলে সেজে ইসারায় জানালে আমি গাছ নয় আমি সবুজ সাড়ি পোরে বনদেবী, আর্টিষ্টের হাতের বীণা সে সুরের সাজে সেজে বল্লে আমি কি শুধু বীণাই, আমি পরিবাদিনী সুন্দরীও বটে। এমনি নিয়ন্তাতে আর রূপদক্ষে বাজিখেলা রূপসৃষ্টি নিয়ে। খেলার সময় যেমন তাসগুলো হাত বদল করে তেমনি এই রূপসৃষ্টির লীলা খেলাতে নিয়তির নিয়মগুলো আসা যাওয়া করে আর্টিষ্টের হাতে বার বার। এই নিয়ম সমস্ত জানার জন্যই Nature study করতে হয় আর্টিষ্টকে, না হলে শুধু নিজের নিয়মে চল্লে খেলা চলে না ঘুরে ফিরে অনেকক্ষণ।

অক্ষর-মূর্ত্তিতে কতক, শব্দরূপে কতক, স্পর্শরূপে কতক এমনি ভাবে রূপ সমস্ত ধরা দিচ্ছে আমাদের চেতনায়, আবার এই তিনে মিলিয়ে একটা রূপ তাও পাচ্ছি আমরা। আকাশের তারা থেকে আরম্ভ করে সমুদ্রের তলায় শুক্তির মধ্যেকার মুক্তি সবই বিধাতার স্বাক্ষরিত রূপ! মিসরের মরুভূমির মাঝে পিরামিড সেখান থেকে সমুদ্রের বুকে যে লাইট-হাউস সমস্তই মানুষের স্বাক্ষরিত রূপ তারা! বিদ্যুল্লেখা একেবারে সোনার জলে টানা অক্ষররূপ তার অনুগামী বজ্র একেবারে শব্দ দিয়ে গড়া সে। কোকিলের কুহু, শব্দরূপ মাত্রে বসন্তশ্রী রইলেন সেখানে, মলয় বাতাস স্পর্শরূপ পরিমল রূপ তাঁর। বর্ণরূপা যাঁরা তাঁদের স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের হিসেবে অক্ষরমূর্ত্তির কোঠায় ফেলা চল্লো! এই ভাবে—শুনে দেখা যায় ছুঁয়ে দেখা যায় চোখ বুলিয়ে দেখা যায় রূপ আর রূপের সমস্ত ইঙ্গিৎ ও আভাস!

পুতুলওয়ালা দুয়োরে পা দিয়েছে অমনি ছেলে ছুটেছে তার দিকে রূপের টান,—সহজে গড়া পুত্তলিকা তাদের আকর্ষণ কতখানি! ছেলে কাঁদে পুতুল চেয়ে ছেলে খায় না ঘুমোয় না পুতুল না পেলে, মায়ের কোল ছেড়ে পালায় শিশু এমন আকর্ষণ রূপের। বিধাতার

সৃষ্টিতে এক আগুনের এই ধরণের আকর্ষণ—পাখিকে টানে পতঙ্গকে টানে দলে দলে মানুষ জড়ো হয় রূপ দেখ্‌তে। পুত্তলিকার আকর্ষণের মতো এমন বিরাট আকর্ষণ সেটা কি কুড়িয়ে পায় মানুষ? পুতুল গড়ার নিয়ম আর অগ্নিশিখার নিয়ম কিন্তু একটু স্বতন্ত্র—আগুনের আকর্ষণের শেষে ভীষণ নিরানন্দ পুতুলের আকর্ষণের শেষে আনন্দ। যে পুতুল গড়ে সে বুড়ো, যে পুতুল খেলে সে ছেলে, রূপের ছাঁদে দুয়ের মিলন, আর ঐ বিশ্বকর্ম্মা—যিনি তারা গড়েন আর যে তারা বাজি পুড়িয়ে খেলে তাদের মিলন রূপের ছন্দে।

জগন্নাথের মন্দিরে একটা ঘর দেখেছি পুতুল দিয়ে ঠাসা—সৃষ্টির পশুপক্ষী জীবজন্তু গাছপালা গড়ে গড়ে ধরেছে সেখানে আর্টিষ্ট, পাল পার্ব্বণে এই সব পুতুলের ডাক পড়ে রাস দোল কত কি খেলায়—দেবতায় মানুষে পুতুলে বেধে যায় রঙ্গ তারপর খেলা শেষে রূপসমস্ত যে যার স্থানে চলে যায়। ছেলে যতদিন ঘরে নেই ততদিন খেলনার আল্‌মারিতে বন্দী সমস্ত পুত্তলিকা রূপ তারা বড় দুঃখেই আছে দেখি, যেমনি ছেলে এল আর রক্ষে নেই পুতুল গুলো হাঁফ ছেড়ে বল্লে যাক্ বাঁচা গেল এইবার খেলে যাবার অবসর এল। এমনি রূপ সমস্ত দিকে দিকে জলে স্থলে আকাশে বন্দী থাকে—আর্টিষ্ট খোঁজে তারা সবাই, তাদের নিয়ে লীলা করবে এমন এক এক জন খেলুড়ি আর্টিষ্ট খুঁজে ফিরছে বিশ্বজোড়া রূপ সকলে। সেই বিক্রমাদিত্যের আমলে একটা শুকনো গাছ মাঠের ধারে সে অপেক্ষা করছিলো—যে তাকে নিয়ে একটিবার সত্যি সত্যি খেলবে তার জন্য! রাজা গেলেন পথ দিয়ে দেখলেন শুকনো গাছ রাজার সঙ্গেই রাজকবি—তিনি কবি নয় কিন্তু পদ্যে কথা বলেন—তিনি পদ্যে বল্লেন—'এ যে দেখি শুষ্‌ক কাঠ'। ভাগ্যি ছিলেন সঙ্গে সত্যিকার কবি ও খেলুড়ি—তিনি বলে উঠলেন—'কি কও শুকনো কাঠ!'—

'ও সে তরুবর রসের বিরহে—
হুতাশে দহে!'

একটি ছেলে দেখলে—শুকনো কাঠ নয়—সে ঘোড়া সে মানুষ, সে কত কি। একজন কবি দেখলেন শুকনো গাছ নয়—রসের পাত্র সেটি, ছেলে করে রূপের আরোপ, কবি করেন রূপের আবির্ভাব শুকনো কাঠে। ছেলে রূপ আরোপ করলে যখন, তখন সে যা চায় সেই শুকনো কাঠকে শুকনো ও কাঠ থাকা চল্লো না—ঘোড়া মানুষ কত কি হতে হল। ছেলে সে, স্বমতে চল্লো—কাঠ রাখলেনা গাছও রাখলেনা—একে বলা চল্লো স্বারোপক-রূপ। কবি যখন শুকনো গাছকে তরুবর বলে দেখালেন তখন তিনি একটা ইচ্ছামতো রূপের আরোপ করলেন গাছে একথা বলতে পারিনে, কেননা, 'রূপারোপাৎ তু রূপকম্‌' এই কথা পণ্ডিতেরা বলেছেন। এখানে রূপের আরোপ হলনা রূপের নষ্ট হয়েছিল যা তা পুনর্ব্বার ফিরে এল রূপে। সুতরাং একে বল্লেম—স্বরূপক-রূপ। এই দুই নিয়মই খাটলো রূপ-সৃষ্টির কাযে।

কথা দিয়েই লিখি ছবি দিয়েই কি সুর দিয়েই বলি গাছটিকে খানিক শুকনো কাঠ বলে জানালেম তো কাঠুরের কাজে এলো খবর, রসিকের তাতে কি এল গেল? শুকনো গাছের আশা নিরাশা—কত বর্ষায় তার পাতায় পাতায় ভরে ওঠার স্বপ্ন, কত শীতে তার পাতা ঝরানোর গান ও কত বসন্তে তার ফুল দোলের স্মৃতি সব কথা জড়িয়ে থাকে মরা গাছেও, কত পাখির আসা-যাওয়ার খবর কত ছায়ার মায়া দিয়ে গড়া তার পরিপূর্ণ রূপ তাই যদি না ধরা পড়লো রূপদক্ষের মায়াজালে তবে কি হল?

কাঠুরে এবং তুমি আমিও দেখবো শুকনো কাঠ কিন্তু রূপদক্ষ সে যে দেখবে করুণ রসে সিক্ত বিরস বনস্পতিকে জীবন্তবৎ—এই হল নিয়ম। না হলে সমালোচক সেও যে পড়ে যায় রূপদক্ষের কোঠায়!

রূপ প্রকাশের পূর্ব্বে তিন অবস্থার মধ্য দিয়ে চল্লো. ঘট্টিত অবস্থা, লাঞ্ছিত অবস্থা রঞ্জিত অবস্থা। চলিত কথায় আমরা বলি— সাদা মাটা অবস্থা, ছকা অবস্থা, রাঙ্গানো অবস্থা।

সাদা মাটা অবস্থায় ঘটনা হয় রয়েছে দ্রষ্টার অগোচরে আর্টিষ্টের মনে এবং সাদা কাগজে সাদা পাথরে সোনার তালে মাটির স্তূপে। খানিকটা গোচর হল রূপ যখন নানা দাগ দোগ মাপযোপ নিয়ে একটা কাঠামো পেলে ঘটনাটি তারপর আলো ছায়া রং বেরংএ রঙ্গিয়ে উঠলো সমস্ত ঘটনাটি এই নিয়ম ধরে রূপের প্রকাশ আর্টে। যেন বৃন্ত হল কলি জাগলো ফুল ফুটলো পরে পরে!

কিম্ভূতম্ আর কিমাকারম্ Grotesque আর Caricature বৈরূপ্যশিল্পের এ দুটো প্রকাশ। কিম্ভূত যে সমস্ত রূপ এবং কিমাকার যে সমস্ত রূপ দুয়ের মধ্যে এক আইন কায করছেনা। যেখানে রেখা সমস্ত আকৃতি পাবার বেলায় একটা নিয়ম ধরে বাঁকছে সোজা হচ্ছে—মানুষ পাচ্ছে গাছের রূপ, আধা মানুষ আধা গাছ রূপ, নরসিংহরূপ, অর্দ্ধ নারীশ্বর রূপ কিন্নররূপ ভূষা ও মণ্ডন শিল্পের নিয়ম এবং ছন্দ ধরে রেখা রং সবই সেখানে প্রকাশ পাচ্ছে এবং রূপটি সেখানে একটা ভবিতব্যতা স্বীকার করছে সেখানে সেটিকে বলা চল্লো কিম্ভূতরূপ রূপ বা Grotesque রূপ। Caricature বা কিমাকার সে এক আকৃতির বৈরূপ্য করা ছাড়া আর কোনো কিছু করছেনা বা Grotesque কিম্ভূতের মতো মানানসই রূপও দিচ্ছেনা—বেমানান রূপ প্রকাশ করাই বেমানান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রেখা রং সমস্ত দিয়ে এই হল Caricature। সাদৃশ্য সম্বন্ধে যখন বলবো তখন এদের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া যাবে, এখন ভূষা-নিরপেক্ষরূপ রূপদক্ষের চরম দক্ষতা যার সৃষ্টি করার বেলায় দেখতে হয় সেই বিষয়ে বলে আলোচনা শেষ করি।

"অঙ্গান্য ভূষিতান্যেব কেনচিদ্ ভূষণাদিনা
যেন ভূষিতবদ্‌ভান্তি তদ্রূপমিতি কথ্যতে।"

রূপ জগতে কেবলি রয়েছে 'সাজ সাজ' ধ্বনি—যেন নাচ ঘরের সাজঘর সবাই সাজছে এখানে। কী সাজ কত সাজ এই বাংলা দেশটার তাই দেখনা, ঐ যে আকাশ ও কি তারার মালায় সাজেনি, সমুদ্র কি নীলাম্বরী পোরে সাজেনি, নদী সেকি জল-তরঙ্গ চুড়ি বাজিয়ে নেচে চলছেনা? পাতার বাহার দিলে উপবন, কুঞ্জবন ফুলের মালায় সাজলে —অষ্ট অলঙ্কারে ভূষিতা সখী এরা রূপদক্ষকে ঘিরেই রইলো—দিবারাত্রি সকাল সন্ধ্যা, বিচিত্র ছাঁদ বিচিত্র সজ্জা এদের। বিভূষিতা এই পৃথিবীতে কোথায় পাই নিভূষণা রূপটিকে?

নিরাভরণা নিরাবরণা সুন্দরী! রূপ-ভোজের প্রমোদ উদ্যানের গিল্টির অলঙ্কারে বাঁধা Nude study তারাই কি নির্ভূষণা সুন্দরী বলে বলাতে পারে নিজেদের—রূপজীবীদের সহচরী বলে তাদের অনায়াসে চেনা যায়।

পর্ব্বতদুহিতা উমা তিনি নিভূষণা রূপসী, শকুন্তলাও কতকটা এই ধাঁচার সুন্দরী, শ্রীরাধিকা নয়, কিন্তু মথুরার কুব্জা—তাকে ধরতে পারো নিভূষণা সুন্দরী বলে। অশোক বনের সীতা—ভূষা-নিরপেক্ষ সৌন্দর্য্য ছিল তাঁর।

এতো গেল কবিজনের সৃষ্টি করা নিভুষণা রূপসী তাঁরা। বিধাতার সৃষ্টিতে ভূষা-নিরপেক্ষরূপ কোথায় পাই দেখি—মরুভূমির নিঃসঙ্গরূপ সে একেবারে বিরাটভাবে ত্যক্ত-ভূষণ ও পরমসুন্দর! ময়ূরের সবটাই প্রায় ভূষিত—বাবু কার্ত্তিকের বাহন হল সে! মরাল নিভূষণ ও সুন্দর মানসসরোবরে পেয়ে গেল স্থান!

বৌদ্ধ শিল্প—তার মধ্যে একা বুদ্ধমূর্ত্তিটিই কেবল নিভূষণ সুন্দর রূপ, আর চৈত্যবিহার স্তূপ সবই ভূষাভারাক্রান্ত রূপ। সিংহলের কপিলমূর্ত্তি রূপেতেই সেটি রূপবান, বাংলার নিকোনো ঘর ভূষা-নিরপেক্ষ রূপের বাসা! এমনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র আর্টের মধ্যে এই পরম রূপ জায়গায় জায়গায় ধরা রয়েছে দেখবো অতি প্রাচীনকালে এবং একালেও।

রূপের অভাব দিয়ে ভূষা-নিরপেক্ষ রূপকে ফোটানো সম্ভব নয় এটি সুনিশ্চিত। কল ঘরের চিমনি সম্পূর্ণ ভূষা-নিরপেক্ষ কিন্তু তার রূপ কি? ভূষোকালি মেখে সে একটি নিভূষণ অশোক-স্তম্ভের কিমাকৃতি দিচ্ছে মাত্র রূপদক্ষের হাতে তাকে সাজতে হয় অনেকটা তবে সে স্থান পায় রূপরচনার মধ্যে! চৈতন্য ছিলেন নিজের রূপেই রূপবান, কিন্তু চৈতন-চুট্‌কিধারি বাবাজী যদিও ভূষণ পরলেনা তবু সে ভেকধারি বাবাজী কি স্বামিজী এইটেই প্রমাণ করলে। জলের উপর জেলে-ডিঙ্গি—ভূষা-নিরপেক্ষ সুন্দর সে। গাছের তলায় শুকনো পাতা শ্রীচৈতন্যের মতো নিভূষণ সোনার পুতুল সে! প্রভাতের চন্দ্রকলা—আলোর সাজ ছেড়ে পরম সুন্দর। নিভূষণা সুন্দরী সে আগ্রার তাজমহলের চেয়ে সুন্দরী, দিল্লীর প্রাসাদে পাষাণ দিয়ে গড়া অন্দরমহলের গোপনতায় ঘেরা যে এতটুকখানি মোতী-মস্‌জীদ সে হল নিরাভরণা নিভূষণা সুন্দরীর প্রতিমা—কিন্তু ঐ তাজমহল, সেও সুন্দরী কিন্তু নাতিভূষিতা একেবারে নিরাভরণা নয়।

সূঁচ সে একেবারে নিভূষণ সরল রেখাটি পরিষ্কার। ঝরঝরে কাযের উপযুক্ত রূপ তার কিন্তু তার রূপ দেখে মন মাতেনা, সূঁচে তোলা নানা কায দেখে কিন্তু চোখ মন সবই ভোলে! কুশ ও কাশ—তারাও নিভূষণ সরল কিন্তু সূঁচের থেকে স্বতন্ত্র তাদের রূপ। টিনের জলপাত্র—তার ভূষারিক্ততা, আর সাদাসিধে অথচ সুন্দর চুমকি ঘটি—তার ভূষারিক্ততা—এক ধরণের নয়—কাযেই তারা একরূপও নয়।

ভূষার অতিরেক এবং ব্যতিরেক এই দুয়ের নিয়ম অতি সাবধানে প্রয়োগ করতে হয় রূপ ফোটানোর বেলা। কতখানি সাজাবো কতখানি সাজাবোনা, কাকে সাজাবো কাকেই বা সাজাবোনা—এর বিচার রূপদক্ষের হাতে। এই দুই মহাস্ত্র এরা রূপ ফোটায় যদি রূপদক্ষের হাতে পড়ে এবং রূপকে মারে যদি এদের নিয়ে কারবার করে রূপবিলাসী অথচ মোটেই রূপদক্ষ নয় এমন কেউ। যথাযথভাবে পুরোপুরি ভূষিত এবং অযথাভাবে ভূষণভারগ্রস্ত দুটো কায পাশাপাশি রাখি,—নারকেলডাঙ্গায় পরেশনাথ টেম্পল রঙ্গীন কাচ আর সোনার হলকারি দিয়ে মোড়া, ঠিক এমনি সোনা আর কাচে সাজানো আগ্রার শিশ্‌মহল। দুটোতে তফাৎ কতখানি হয়ে গেল! একেও দেখতে লোক জমা হয়, ওকেও দেখতে লোক ছোটে। কিন্তু শিশমহল বইলে সার্থক রূপখানি, আর টেম্পল বইলে কাচ আর গিল্টির অনর্থক ভার মাত্র! গহনা কেড়ে নিলেও যে রূপবতী—রূপসীর আদর্শ তাকে বলতে পারো। ভূষা-নিরপেক্ষ রূপ হল প্রকৃত রূপ—লাখে এক রচনায় তার দেখা পাই শিল্প-জগতে। রচনার কৌশলে বর্ণের ছটায় ভাবের সমাবেশে রূপ সমস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে আমাদের কাছে মূল্য পায়। চোখের দিক ঘেঁসা কোনো রূপ, মনের দিক ঘেঁসা কোনো রূপ। রূপের মোটামুটি ভেদ এই দুটো নিয়ে হয়, তারপর মন্দ নয়, পাঁচপাঁচি, মাঝারি এমনি অসংখ্য রূপ তারাও আছে, একেবারে কাযের ও একেবারে অকাযের এমন সব রূপসৃষ্টি এও আছে—রূপের সংখ্যা করা যায় না এত রূপ এবং তত নিয়ম রূপভেদের এরি সাধন হল রূপ সাধকের অসাধ্য সাধন বলতে পারি।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলো ও অন্ধকার

আলো কহে,—"অন্ধকার! তোর রূপ নাই,
আমার রূপেতে ভরা জগৎ-সংসার";—
"আমি যদি না র'তাম, তোমার গৌরব
কেমনে ফুটিত বল?"—কহে অন্ধকার।

শ্রীহরিধন মিত্র

দশচক্র

প্রথম ভাগ

(১)

একটী চোদ্দ পনের বছরের বালক রাস্তার কলে মুখ দিয়া জল খাইতেছে। রাস্তা হইতে আমরা দেখিতেছি কলের জলসংলগ্ন একটী নেড়া মাথা। আর ফুটপাথের উপর হইতে হারুদা দেখিতেছেন কলের তলসংলগ্ন এক জোড়া জুতা। আমাদের মনে হইতেছে সরকারী কলের সংস্পর্শে বালকের মুখ অপবিত্র হইতেছে; হারুদার মনে হইতেছে জুতার সংস্পর্শে জল অপবিত্র হইতেছে। ভিন্ন দিক হইতে দেখিলে এইরূপই দেখায়।

হারুদার পরিচয় অনাবশ্যক। তিনি নিজেও পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না। ড্রেণের গন্ধের মত সকল বাড়ীতেই তাঁর অনাহুত, অবাধ গতি, সকলের উপরেই তাঁর সমান অধিকার।

এই অধিকারের জোরে তিনি বলিলেন, "কে, শশী না?" বালক যেমন ছিল তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

হারুদা। জল খাবে ত জুতোটা খোল।

শশী। আজ্ঞে, জুতোয় করে জল খেতে আমার ভাল লাগে না। আপনি বলেন ত হাতে ক'রে খাচ্চি না হয়।

হারু। জুতোয় করে খেতে বলি নি। জুতো পায়ে কিছু খেতে নেই, তাই বল্‌চি।

শশী এবার সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল, এবং সবিনয়ে প্রশ্ন করিল, "জুতো জোড়া বগলে ক'রে নোবো?"

হারু। তোমার পৈতে হয়েছে না? বামুনের ছেলে এটা জান না যে, জুতো ছুঁয়ে খেতে নেই?

শশী। আজ্ঞে তা ত জানতুম না। খেলে কি হয় হারুদা?

হারু। কি হয় আবার? খেতে নেই। শাস্ত্রে বারণ আছে।

শশী। কোন্ শাস্ত্রে হারুদা?

হারু। কোন্ শাস্ত্রে! যেন সব শাস্ত্র পড়া আছে।

শশী। আজ্ঞে; আমার কিছু পড়া নেই। আপনি সব পড়েছেন বোধ হয়।

হারু। আমি ত পড়িনি বল্‌চি।

শশী। আমারও সেই দশা। একখানাও পড়ি নি।

হারু। যা পড় নি তা নিয়ে কথা কইতে যেয়ো না।

শশী। আজ্ঞে বুঝিছি। যা পড়ি নি তা নিয়ে কথা কওয়া উচিত নয়, যে পড়েনি তার কথা মেনে নেওয়া উচিত।

হারু। মান্‌তে হবে। এখনো রাত দিন হচ্চে।

শশী হাসিয়া বলিল, "এখন কিন্তু রাতও নয়, দিনও নয়, সবে সন্ধ্যে !"

"ওগো; অত হাসি থাক্‌বে না" এইটুকু সান্ত্বনা দিয়া ও লইয়া হারুদা স্থান ত্যাগ করিলেন।

শশীর দুর্বিনীত ব্যবহার আর কাহাকেও না হৌক, একজনকে বড় আনন্দ দিয়াছিল। ইহার নাম শ্রীনগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস; জাতি কৃশ্চান; পেশা খ্রীষ্টীয়. স্বর্গে কুলি চালান দেওয়া। এই কাজ করিয়া ইনি ইহলোকে কিছু মাসহারা পাইয়া থাকেন, এবং পরলোকে একটা মোটা মুনফার আশা রাখেন। ইনি প্রচারক। মুখের জোরে প্রচার করেন, দেহের অন্য অঙ্গ লম্বা কোট, উল্টা কলার ও যৎকিঞ্চিৎ দাড়ির সাহায্যে ঢাকিয়া রাখেন।

যেখানে শশী ও হারুদার আলাপ হইতেছিল তাহার অতি নিকটে নগেন্দ্রের বাসা। ইনি বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ভিতর হইতে ইঁহাদের আলাপ শুনিতে পান, এবং ওত পাতিয়া থাকেন। হারুদা প্রস্থান করিতেই ইনি ছুটিয়া আসিয়া শশীকে আক্রমণ করিলেন। তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন "বেশ, বেশ! তুমি রামবাবুর ছেলে, না?"

শশী। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

নগেন্দ্র। যত সব গোঁড়ামী কাণ্ড! জুতো পায়ে জল খেতে নেই! তুমি হারাধন বাবুকে বেশ দু কথা শুনিয়ে দিয়েছ।

শশী। আজ্ঞে, আমার কথায় আপনি সুখী হয়েছেন এই ত আমার পরম সৌভাগ্য। আপনারা গুরুজন।

নগেন্দ্র। হুঁম্! তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে দেখ্‌চি। তারপর কয়েকখানি সুসমাচারের বই তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই বইগুলি পোড়ো। বড় ভাল বই।"

শশী। আজ্ঞে। আর বড় ওঁচা লেখা।

নগেন্দ্র। ছি, ছি, ছি, ছি! ধর্ম্মপুস্তক নিয়ে ওরকম করে কথা কইতেআছে? এঁ? তোমার বয়স কত?

শশী। আজ্ঞে, এই পনেরো যাচ্চে।

নগেন্দ্র। হু-ম! বড় খারাপ সময়! বড় খারাপ সময়!

শশী। তবেই ত! কি করি এখন?

নগেন্দ্র। তুমি এক কাজ কোরো। শোবার ঘরে, মাথার কাছে একটী cross রেখে দিও। যখনি মনে শয়তানের প্রাদুর্ভাব হবে তখনি crossটী বুকের ওপর চেপে ধরবে। ধরে বলবে 'শয়তান, দূর হও!'

শশী। তা হলেই সে বেচারা পালাবে?

নগেন্দ্র। পালাতেই হবে। ঈশ্বর তাঁর নিজের পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন যে শয়তানকে তাড়াবার জন্য।

শশী। *শয়তানকে তাড়াবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন।*

নগেন্দ্র। করেন নি? নিজের একমাত্র ঔরসপুত্রকে পাঠালেন ঐজন্য।

শশী। এত কাণ্ড করেও কিন্তু পেরে উঠ্‌লেন না।

নগেন্দ্র। কি বল্‌চ?

শশী। আমি বল্‌চি শয়তান এখনো ঘুর ঘুর্ ক'রে বেড়াচ্চে। আজ থেকে আবার আমার ঘরে গিয়ে হাজির হবে, শুন্‌লুম।

নগেন্দ্র। হবেই ত। cross-এর আঘাত না খেলে ত ও যাবে না।

শশী। তা crossএর বাড়ি মারেন না কেন আপনারা পাঁচজনে?

নগেন্দ্র। পাঁচজন পেলুম কোথায়? লোকে কৃশ্চান হয় কৈ? প্রভুর ইচ্ছা শোনে কৈ লোকে?

শশী। প্রভুর কি ইচ্ছা আমরা সকলে কৃশ্চান হই?

নগেন্দ্র। নিশ্চয়।

শশী। শুন্‌তে পাই তিনি সর্ব্বশক্তিমান্।

নগেন্দ্র। সে কথা বল্‌তে! কত বড় শক্তি!—

শশী। তা প্রভুর যখন এত শক্তি, আর তার ওপর তাঁর ইচ্ছা রয়েছে আমরা সকলে কৃশ্চান হই, তখন আমরা কৃশ্চান হয়ে যাব-অখন। আপনি এ বৃদ্ধ বয়সে মিছে চীৎকার ক'রে মর্‌চেন কেন?

নগেন্দ্র। তুমি ত ভারি জ্যাঠা ছেলে দেখি। আমি কালই তোমার বাবার সঙ্গে দেখা কর্‌চি।

এইবারে শশী সুসমাচারের বইগুলি ছুড়িয়া ফেলিয়া নগেন্দ্রের ভাষার অনুকরণে গর্জ্জন করিল "শয়তান, দূর হও"!

এই সময়ে একটী মহিলা নগেন্দ্রের বাটী হইতে বাহিরে আসিলেন। তিনি একবার শশীর দিকে, একবার ছড়ানো বইগুলির দিকে, একবার নগেন্দ্রের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, বাবা?"

নগেন্দ্র তখন ক্রোধে প্রায় বাক্যহীন। "দেখ্‌লি, এই ছোঁড়াটা—" বলিয়া আর কথা শেষ করিতে পারিলেন না। মহিলাটী কোন কথা না বলিয়া বইগুলি কুড়াইয়া তুলিতে লাগিলেন।

শশী আর দাঁড়াইল না। তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়াছে যে তাহার মাথায় একগাছিও চুল নাই। এই নেড়া মাথাটাকে সে অবিলম্বে কোথাও লুকাইতে পারিলে বাঁচে।

(২)

তখন বাংলাদেশে কেশবচন্দ্রের যুগ। আজকালকার রাজনীতির মত ধর্ম্ম তখন একটা চর্চ্চার বিষয় ছিল। এখনকার রাজনীতির মত ধর্ম্মের পশুরাজ তখন সদ্যপ্রসূত। তাই তাহার গায়ে অনেকগুলা দাগ ছিল,—কৃশ্চান, ব্রাহ্ম, হিন্দু প্রভৃতি। এইসকল ধর্ম্মসম্প্রদায় পরস্পরের সহিত টক্কর দিয়া যখন ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন ফাঁকে ফাঁকে আর একটা দলের সৃষ্টি হইতেছিল—যাঁহারা ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল, কিছুতে বিশ্বাস করিতেন না। রামময় বন্দ্যোপাধ্যায় এই শেষোক্ত দলের লোক। তিনি নিজে নাস্তিক ছিলেন বটে, কিন্তু রাস্তার লোক ধরিয়া নাস্তিক করিবার চেষ্টা করিতেন না। ইহাতে তাঁহার গোঁড়া নাস্তিক বন্ধুরা চটিয়া যাইতেন। তাঁহারা বলিতেন, "তুমি যে আলো পেয়েছ তা পাঁচজনকে দেবে না?"

রামময় বলিতেন "তারা চাইলে দোবো। বেচারারা ঘুমুচ্চে, তাদের কাছে এখন মশাল জ্বালিয়া লাভ কি?"

গোঁড়ারা বলিতেন "তাদের জাগিয়ে আলো দেখাতে হবে।"

"জাগিয়ে দেখাতে গেলে হাতাহাতি হবে। আর কোন লাভ হবে না।" এই বলিয়া তিনি তাহাদের নিরস্ত করিতেন। তিনি মনে করিতেন ধর্ম্ম রাজযক্ষ্মার মত দুরারোগ্য। মনের মধ্যে কোথাও স্থান করিবার পর ইহাকে তাড়ান শক্ত। কোন পথ দিয়া মনের মধ্যে ইহাকে প্রবেশ করিতে না দেওয়াই সুযুক্তি। এই বিশ্বাসের বশে তিনি নিজের পুত্রদ্বয়ের শিক্ষার ভার নিজের হাতে রাখিয়াছিলেন; এবং প্রাকৃতের প্রতি আস্থা বাড়াইয়া তাহাদের মন হইতে অতিপ্রাকৃতকে দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন ছেলেদের পৈতা দিবেন না। কিন্তু গৃহিণীর মতকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। পৈতা দিলেন, তবে একটু বেশী বয়সে দিলেন। ধূমকেতু যেমন সোজা পথে আসিতে আসিতে গ্রহের আকর্ষণে বাঁকিয়া যায়, তেমনি তাঁহার অনেক বড় বড় সংকল্প গৃহিণীর কাছাকাছি আসিয়া বাঁকিয়া যাইত।

তাঁহার বড়ছেলে নিশি উপনয়নের পর বহুদিন শিবপূজা বিষ্ণুপূজাদি করিয়াছিল। ছোট ছেলে শশীর কিন্তু পূজা করিবার সুযোগ ঘটিল না। কারণ রামময় প্রথম হইতেই যত্ন করিয়া তাহাকে সন্ধ্যার মানে বুঝাইতে লাগিলেন। ইহাতে অনেকে মনে করিল তাঁহার মনে ধর্ম্মভাব ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু তিনি জানিতেন শশীর ধর্ম্মকে তিনি হাতে না মারিয়া পাতে মারিতেছেন। "অমুক মন্ত্র, অমুক ছন্দে লেখা তার অমুক দেবতা, এবং অমুকসময়ে তার প্রয়োগ"—নানাবিধ হাস্যকর অঙ্গভঙ্গীর সহিত এই কথাগুলি দিনে তিনবার করিয়া আবৃত্তি করিবার জেদ বুদ্ধিমান্ লোকের কয়দিন থাকিতে পারে? রামের উদ্দেশ্য

অসিদ্ধ রহিল না। মাসখানেকের মধ্যেই শশী সন্ধ্যা-আহ্নিক ছাড়িয়া দিল, এবং হিতৈষীদের জানাইল যে ভগবান সকাল সন্ধ্যা করিতেছেন তাই সে আর করে না।

শশী জন্মাবধি তাঁহার হাতেই মানুষ হইতেছে। নিশিকে মানুষ করায় কিন্তু তাঁহার একজন অংশীদার ছিলেন, শ্যামবাবু। শ্যামাচরণ রামময়ের সমসাময়িক, হিন্দুস্কুলের ছাত্র। পঠদ্দশায় গোলদীঘিতে দুইজনের আলাপ হয়। তারপর দুই বন্ধুতে কতদিন একসঙ্গে বেড়াইয়াছে, কতরাত্রি গল্প করিয়া কাটাইয়াছে, ধর্ম্ম সমাজ স্বদেশ সম্বন্ধে কত চিন্তা করিয়াছে, তর্ক করিয়াছে, এবং কতবার একই মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছে। শেষে এক সময় আসিল যখন তাহাদের ভাষা, ভাব ও চিন্তাধারার মধ্যে বড় একটা ভেদ খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।

রামময় বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেন। শ্যাম কিন্তু অবিবাহিতই রহিলেন। তারপর রামের যখন প্রথম সন্তান হইল তখন এই ছেলেটীকে লইয়া দুই বন্ধুতে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। নিশি এখন অনেক সময়ে শ্যামের কাছে থাকিত, তাঁহার সঙ্গে বেড়াইত এবং তাঁহার কাছে লেখাপড়া করিত।

সকল বিষয়ে একরূপ হইলেও, একটা জায়গায় দুই বন্ধুর মধ্যে গরমিল ছিল। শ্যামের ছোট করিয়া ছাঁটা মোটাচুলে ভরা কদমফুলের মত মাথা, ঘন ভুরু, চাপা ঠোঁট, ভারি মুখ ও ভরা গলার মধ্যে একটা জোর ছিল, যাহা রামের স্বভাববিরুদ্ধ।

রামময় অধ্যাপক ব্রাহ্মণের পুত্র, এবং সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তাই ধর্ম্মত্যাগ করিয়াও তিনি সমস্ত স্বদেশীয়তার উপর খড়্গহস্ত হইতে পারেন নাই। তিনি ভাগবত পাঠ মনোযোগের সহিত শুনিতে পারিতেন, এবং নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ দেখিলেই তাহার টিকি কাটিতে উদ্যত হইতেন না। ইহাতে যোগেন্দ্র প্রভৃতি আস্তিক বন্ধুরা বলিতেন, "রাম মুখে যাহাই বলুক, মনে মনে তাহার ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে।" আর উপেন্দ্র প্রভৃতি গোঁড়া নাস্তিকেরা মনে করিতেন—"রামের যথেষ্ট moral courage নাই। তিনি হিন্দুত্বকে এখনও সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই।"

বন্ধুর মানসিক দুর্ব্বলতা সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন উপেন্দ্র বলিলেন, "হিঁদুয়ানীর সঙ্গে রক্ষা কল্লে চল্‌বে না। ধর্ম্মের সংশ্রবে যা কিছু আছে সবগুলাকে ছেঁড়া কাঁথার মত টান মেরে ফেলে দিতে হবে।"

রামময় জিজ্ঞাসা করিলেন "কাঁথার ওপর যে শিশুটী শুয়ে আছে, তাকে শুদ্ধ?"

উপেন্দ্রের তখন রোখ চাপিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলন "হাঁ, তাকে শুদ্ধ।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

ভাই-দ্বিতীয়া

'ভাই-দ্বিতীয়ার ফোঁটা নেবে',—বোনটি আমায় ডাকে,—
বোনটি আমার বাংলা দেশের কোণটি নিয়ে থাকে—
ভয়ে কাঁপে বুকের আশা　　জীয়ায় তবু মুখের ভাষা
ক্ষুদ্র দুটি হাত দিয়ে সে যমের দুয়ার ঢাকে!
'ভাই দ্বিতীয়ার ফোঁটা নেবে',—বোনটি আমায় ডাকে!

হায়রে অবোধ দুঃসাহসী! সকল দুয়ার খোলা,
এমনি যদি একটি দিনে যমকে যেত ভোলা!
সত্যি যদি পড়্‌ত কাঁটা,　　ভাইটি হ'ত লোহার ভাঁটা,
হাতের চাপে পড়্‌ত আঁটা লক্ষ জীবন-ফাঁকে!—
'ভাই দ্বিতীয়ার ফোঁটা নেবে',—বোনটি তবু হাঁকে।

ঘুমিও না ভাই ঘুমিও না ভাই,—পারুল দিদির দেশ!—
দেহের পাতে জীবন হেথায় হয় না ত নিঃশেষ!—
এ দেশে ভাই মরণ কোলে　　নির্ব্বিবাদে জীবন দোলে,—
সেই জীবনের আশায় হেথায় বোনটি চেয়ে থাকে!
'ভাই দ্বিতীয়ার ফোঁটা নেবে',—তারি আশায় হাঁকে!

জীবন শুধু কামড়ে মাটি পড়ে থাকা নয়,—
অনিশ্চিতের মাঝে বোনের তাই এ অসংশয়!
উঠ্‌বে তুমি বীরের সাজে　　লাগ্‌বে দেশের দশের কাজে
কীর্ত্তি তোমার—মূর্ত্তি না হোক্—ঘুর্‌বে পাকে পাকে—
'ভাই দ্বিতীয়ার ফোঁটা নেবে',—বোনটি ত তাই ডাকে!

'ভাই দ্বিতীয়ার ফোঁটা নেবে',—বোনটি আমায় ডাকে,—
বোন্‌টি আমার কাঙাল দেশের কোণটি নিয়ে থাকে—
ভয়ে কাঁপে বুকের আশা　　জীয়ায় তবু মুখের ভাষা
দুহাত দিয়ে কীর্ত্তিনাশা যমের দুয়ার ঢাকে!
'ভাই দ্বিতীয়ার ফোঁটা নেবে',—বোনটি আমায় ডাকে!

শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

রাম ও কৃষ্ণ

রামায়ণে দেখিতে পাই যে সীতা রামের পত্নী ছিলেন। কিন্তু জৈন সাহিত্য বলে যে সীতা ছিলেন রামের ভগিনী। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় "সাহিত্যে শ্রীরাধা" শীর্ষক যে পরম উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তাহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত কৃষ্ণাবতারের অনেক বিবরণের সহিত ভাগবত, মহাভারত এবং হরিবংশের বিবরণের বিরোধ আছে। শেষোক্ত গ্রন্থগুলির মতে দেবকী ছিলেন কংসের ভগিনী কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র লিখিয়াছেন যে দেবকী কংসের পিতৃষ্বসা ছিলেন। এইরূপ পরস্পর বিরোধী বিবরণের সম্ভাবনা হয় কেন? মহামহোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, ক্ষেমেন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন তাহার প্রতিপোষক প্রমাণ হয়ত তাঁহার সময়ে বর্ত্তমান কোন কোন পুরাণে ছিল, সে সকল পুরাণ এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এই থিওরি মানিয়া লইলেও ত আমার প্রশ্নের সমাধান হয় না। সেই সকল পুরাণের সহিতই বা কেন মহাভারত ভাগবত প্রভৃতি পুরাণোক্ত বিবরণের বিরোধ হয়? এ বিষয়ে আমি একটি অনুমান বা থিওরি পণ্ডিতদিগের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করি। আমার অনুমান এই যে, রাম এবং কৃষ্ণের বিবরণ তাঁহাদের সমসাময়িক বা তাঁহাদের পরে বহুশত বৎসরের মধ্যেও কোন লেখক লিপিবদ্ধ করেন নাই। তাঁহাদের ইতিহাস মুখে মুখেই চলিয়াছিল এবং এমন অবস্থায় সর্ব্বদাই যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই ঘটিয়াছিল। অলিখিত কিংবদন্তী কালবশে নানারূপ শাখায় বিভক্ত হইয়া নানা পরস্পর-বিরোধী আকার ধারণ করিয়াছিল। কোন বিবরণই লিপিদ্বারা সংবদ্ধ না হইলে অতি অল্পকালেই, কেবল মুখে পরিচালিত হইলে, দুই এক বৎসর দূরে থাকুক দুই এক দিনের মধ্যেই তাহার যে বিকৃতি ঘটে ইহার অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। লিখিত হইবার সময়ে রাম ও কৃষ্ণের ইতিহাসও সেইরূপ বিকৃত হইয়াছিল। ইহাই আমার থিওরি এবং এইরূপেই রামচরিত লিখিতে গিয়া কেহ রাবণকে দশস্কন্ধ, কেহ শতস্কন্ধ এবং কেহ সহস্রস্কন্ধ করিয়াছেন।

বাল্মীকি গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন যে রামচরিত তিনি নারদের মুখে শুনিয়াছিলেন। নারদ তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন বাল্মীকি তাহা প্রথম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিলেন। রামায়ণের অবশিষ্ট অংশ ব্রহ্মার বরে বাল্মীকি ধ্যানে লাভ করিয়াছিলেন। ধ্যানে লাভ করিবার অর্থ এই হয় যে, রামায়ণের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে লঙ্কাকাণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই তাঁহার কল্পনাপ্রসূত। সুতরাং সমস্ত রামায়ণে রামের ঐতিহাসিক তথ্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার আশা অতিঅল্পই করা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও রামায়ণে অন্যান্য বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্যের অনেক আভাস আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি হয়ত বাল্মীকি নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ এবং কতকগুলি তিনি অন্যের মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন। ভরতকে কেকয় রাজ্য হইতে আনিবার জন্য দূতেরা যে-

পথে গিয়াছিল এবং যে-পথ দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল, সেই সমস্ত নাম ও পথের বর্ণনা দেখিলে বোধ হয় বাল্মীকির সেই সকল স্থানের সহিত সাক্ষাৎভাবে অভিজ্ঞতা ছিল। অপর পক্ষে লম্ব (বর্ত্তমান সময়ের কলম্বো) যে লঙ্কার রাজধানী ছিল তাহা তিনি গৌণভাবে অর্থাৎ লোকমুখে শুনিয়াছিলেন। কেননা তিনি যদি স্বয়ং লম্ব দেখিতেন তাহা হইলে কখনই বলিতেন না যে ভারতবর্ষ এবং লঙ্কার মধ্যস্থ সাগরের পরিসর একশত যোজন ছিল। কোন কোন স্থলে—যেমন প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য সম্বন্ধে—তাঁহার ভৌগোলিক জ্ঞান ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল। তিনি সুগ্রীবের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষ কিষ্কিন্ধ্যা হইতে চারিশত যোজন পশ্চিমে (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪ অধ্যায়)। ইহাতে বোধ হয় যে তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষ সম্বন্ধে নামটা ভিন্ন কিছুই জানিতেন না।

রামায়ণ হইতে আমরা বাল্মীকির সময়ের সামাজিক অবস্থা, ধর্ম্ম, খাদ্যাখাদ্য, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে বহু ইঙ্গিত পাই। রামের বনগমনের পূর্ব্বদিন তাঁহার রাজ্যাভিষেকের আয়োজন হইয়াছিল। সেই সময়ে কৌশল্যা যেরূপে দেবার্চ্চনা করিয়াছিলেন, সেই দেবার্চ্চনা হইতে বর্ত্তমান সময়ের দেবার্চ্চনার বড় প্রভেদ দেখা যায় না। আবার তদানীন্তন প্রচলিত ধর্ম্মের অযৌক্তিকতাও জাবালি প্রভৃতি কোন কোন পণ্ডিতের মনে স্পষ্ট উপলব্ধ হইয়াছিল। রামায়ণে বুদ্ধের উল্লেখ আছে সুতরাং বুদ্ধের পর তাহা প্রণীত হইয়াছিল। অথচ রাম নিশ্চয়ই বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।

তখন দেশে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা মারামারি কাটাকাটি হইত। সকলেই কেবল চিরজীবী হইবার জন্য এবং কোন শত্রুর অস্ত্রে নিহত না হইবার জন্য প্রার্থনা করিত।

পানাহার বিষয়ে বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা তখন অধিক স্বাধীনতা ছিল। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ অতিথি হইলে বৈদিক প্রথা অনুসারে ভরদ্বাজ তাঁহাদিগকে এক বৃষ দিয়াছিলেন। লঙ্কা হইতে প্রত্যাগত হইবার পর রাম সাদরে সীতাকে মৌরেয় মদ্য পান করাইতেন। তখন বোধ হয় ব্যঞ্জনাদিতে হরিদ্রা, জীরক, ধনিয়া, মরিচ প্রভৃতি কোন গন্ধ অর্থাৎ মসলা ব্যবহৃত হইত না। ভরদ্বাজের আশ্রমে এবং লঙ্কায় দধিপক্ব মাংসের উল্লেখ আছে কিন্তু কোন গন্ধের নাম নাই। শূল্য মাংস অর্থাৎ কাবাব প্রচলিত ছিল। ইহা এখনও বঙ্গদেশ ব্যতীত সর্ব্বত্র—এমন কি আসামেও—প্রচলিত আছে।

দেবগণের চরিত্র ছিল কিছু অদ্ভুত প্রকারের। যেখানে যুদ্ধ হইত সেখানেই তাঁহারা উপস্থিত হইতেন। কেহ কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে তাঁহাদের মহা ত্রাস হইত।

এখন রামের কথা বলিব। বাল্মীকি রাম সম্বন্ধে নারদের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তদপেক্ষা অনেক অধিক কথা রামায়ণে আছে। এই সকল বিবরণের বহু অংশ ঐতিহাসিক বলিয়া বোধ হয়। কবিরা তাঁহাদের কাব্যের নায়ক, প্রতিনায়ক প্রভৃতিকে হয় সম্পূর্ণ ভাল

না হয় সম্পূর্ণ মন্দ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবজীবনে আমরা দেখিতে পাই যে প্রত্যেক ব্যক্তিই ভালমন্দের মিশ্রণ। যে ব্যক্তি সত্যবাদী, সেও কখন কখন মিথ্যা কহে। যে সাহসী, সেও কখন কখন কাপুরুষের কাজ করে। যে ধার্ম্মিক তাহারও ধর্ম্মপথে চলিতে চলিতে কখন কখন পদস্খলন হয়। কিন্তু রামায়ণে রামের যে চরিত্র বর্ণিত আছে তাহাতে আমরা সর্ব্বত্রই তাঁহাতে সত্যানুরাগ, ধৈর্য্য, দয়া প্রভৃতি গুণ দেখিতে পাই না। ইহার দুই একটা দৃষ্টান্ত উদাহৃত করিব।

রাম পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কি সমগ্র পিতৃসত্য পালন করিয়াছিলেন? তিনি যখন অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভরদ্বাজাশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন ভরত তাঁহাকে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত করাইবার অভিপ্রায়ে সেখানে গিয়া তাঁহাকে অনুনয় করিলেন। কিন্তু রাম সম্মত না হইয়া বলিলেন "আমাদের পিতা যখন তোমার মাতাকে বিবাহ করেন তখন তিনি কেকয় রাজের নিকট এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি কৈকেয়ীর গর্ভজাত পুত্রকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী করিবেন।" বাস্তবিক যদি দশরথ এইরূপে সত্যবদ্ধ ছিলেন তবে রাম চতুর্দ্দশ বৎসর পরেই বা রাজ্য গ্রহণ করিলেন কেন? সম্পূর্ণরূপে তাঁহার পিতৃসত্য পালন হইল কোথায়? রাম বালীকে গুপ্তহত্যা করিয়াছিলেন অর্থাৎ বালীকে আত্মরক্ষার সুযোগ না দিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। মরিবার পূর্ব্বে বালী এজন্য রামকে ভৎসনা করিলেন। রাম তাহার উত্তরে বলিলেন, "তুমি স্বীয় ভ্রাতৃজায়াকে হরণ করিয়াছ বলিয়া রাজা ভরতের বধার্হ হইয়াছ; যেহেতু তুমি স্বাধীন রাজা নহ—ভরতের সামন্ত রাজামাত্র—তাঁহার প্রজা। আমি ভরতের প্রতিনিধি হইয়া সেইজন্য তোমাকে বধ করিলাম।" তাঁহার এই উত্তরে প্রতীয়মান হয় যে, গুপ্তহত্যা করা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া রাম নিজেই বুঝিয়াছিলেন এবং সেইজন্য কূটযুক্তি অবলম্বন করিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিতেছিলেন। পরে রাম রাজা হইয়া যখন লবণাসুরকে বধ করিবার জন্য শত্রুঘ্নকে পাঠাইলেন তখন তাঁহাকে বলিয়া দিলেন "লবণকে অস্ত্রধারণ করিবার অবকাশ দিবে না। অস্ত্র তাহার গৃহে থাকে। সে যখন বাহিরে যাইবে তুমি তখন গৃহদ্বারে থাকিয়া তাহার গৃহপ্রবেশ নিবারণ করিয়া তাহাকে বধ করিবে। কেননা সে একবার গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক অস্ত্রধারণ করিতে পারিলে তুমি তাহার কিছুই করিতে পারিবে না।" এই উপদেশ বালীবধ-কারীরই উপযুক্ত ছিল।

বালকাণ্ডে রাম দয়ার আধার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু রাবণ-বধের পর সীতা যখন তাঁহার সমক্ষে আনীত হইলেন তখন তিনি সীতার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার নিষ্ঠুরতার তুলনা নাই। রাম কখনই ভাবেন নাই যে, সীতা ইচ্ছাপূর্ব্বক রাবণের সহিত চলিয়া গিয়াছিলেন। কেননা তিনি জটায়ু হনুমান প্রভৃতি লোকের মুখে অবগত

হইয়াছিলেন যে, সীতা হৃয়মান হইবার সময়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে এবং স্বীয় বস্ত্রালঙ্কার ফেলিতে ফেলিতে গিয়াছিলেন। তবে কেন তিনি সীতাকে বলিলেন, "তুমি যেখানে ইচ্ছা সেইখানে চলিয়া যাও। ইচ্ছা হইলে লক্ষ্মণ বা সুগ্রীব বা হনুমানকে গ্রহণ কর।" সীতা ইহার উত্তরে বলিলেন, "রাবণ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার শরীর স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু আমার মন তোমাতেই ছিল।" এই সুযুক্তি কি রামের মনে উদিত হয় নাই? তখনকার সমাজের মনোভাব যে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের মনোভাবের মত বিকৃত ও কলুষিত হয় নাই তাহা রামের সমসাময়িক গৌতমের আচরণেই প্রতীয়মান হয়। গৌতমপত্নী অহল্যা ইচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিলেও গৌতম তাঁহাকে রামের সমক্ষেই পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদেশীয় হেলেনা ও মেনেলায়ুসের দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই।

মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতি বঙ্গীয় কোন কোন কবি এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে রাম সীতার শোকে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ইহাতে কোন কোন সমালোচক সেই কবিদিগের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। কেননা সেই সকল সমালোচকের মতে রামের মত সাহসী ও তেজস্বী বীরের পক্ষে কোন অবস্থাতেই ক্রন্দন করা অসম্ভব। কিন্তু আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই যে প্রথমে বিরাধ যখন সীতাকে হরণ করে তখন রাম অত্যন্ত ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। তাহার পর সীতা রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইলেন। তখন রামকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সুগ্রীব ও হনুমান তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিলেন। আবার দেখিতে পাই সীতাকে বনবাসে রাখিয়া লক্ষ্মণ অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে, রাম ক্রন্দন করিতেছেন। রাম সময়ে সময়ে ক্রন্দন করিতেন ভবভূতিও এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সীতাকে বনবাসে পাঠাইবার সময়ে রাম মিথ্যা আচরণ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি মুনিদের তপোবন দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছ; লক্ষ্মণ তোমাকে তপোবন দেখাইতে লইয়া যাইবেন।" লক্ষ্মণকে বলিয়া দিলেন, "তুমি সীতাকে তপোবন দেখাইবার ভাণ করিয়া তাঁহাকে এক জঙ্গলে রাখিয়া আসিবে।" একজন বঙ্গীয় সমালোচক বলেন যে, এরূপ করায় রামের নীতিকুশলতাই প্রকাশ পাইয়াছে। যেহেতু রাম যদি প্রকাশ্যভাবে সীতাকে নির্ব্বাসন করিতেন তাহা হইলে তাঁহার প্রজাপুঞ্জের মনে অত্যন্ত অসন্তোষ হইত এবং হয়ত তাহারা বিদ্রোহী হইত। কিন্তু এই যুক্তি বিচারসহ বলিয়া বোধ হয় না। সীতাকে পুনর্গ্রহণ করাতেই প্রজারা অসন্তুষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই যখন রাম তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিলেন তখন তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে ত্যাগ করিলে তাহাদের অসন্তোষের সম্ভাবনা হইবে কেন? অন্য পক্ষে, রাজারা স্বীয় পত্নীর প্রতি অনুচিত ব্যবহার করিলে কোন দেশে প্রজারা রাজদ্রোহী হয় নাই। টাইটাস তাঁহার পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, অষ্টম হেনরী স্বীয় পত্নীকে হত্যা করিয়াছিলেন, নেপোলিয়ন্ পত্নীত্যাগ করিয়াছিলেন; কই, তাঁহাদের প্রজারা

কি সেজন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে কিছু করিয়াছিল? সীতাকে নিষ্পাপ জানিয়াও যখন রাম প্রজাদের ভয়ে তাঁহাকে শাস্তি দিলেন তখন তাঁহার কার্য্যকে কিরূপে অভিহিত করা উচিত সকলেই তাহা বিবেচনা করিবেন।

বাস্তবিক রামায়ণের রামচরিত্রে সাহস এবং কাপুরুষতা, দয়া এবং হৃদয়হীনতা, সরলতা ও কূটনীতি একত্রাবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্তরকাণ্ড সমস্তটাই প্রক্ষিপ্ত হইলেও আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহাতেও কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য আছে। রাম যে দ্বিতীয়বার সীতাকে স্বীয় সমক্ষে আনয়ন করাইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি কটূক্তি করিয়াছিলেন এবং সেই কটূক্তির ফলে সীতার যে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল, রাম যে লক্ষ্মণকে কোন কারণে বর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণসহ হয়ত নৌকামজ্জনে তিনি যে অবশেষে জলমধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এগুলি সত্য ঘটনা বলিয়াই বোধ হয়; অতি শোচনীয় ঘটনা বলিয়াই বোধ হয় বাল্মীকি স্বীয় কাব্যে এগুলি ত্যাগ করিয়াছেন। কেননা, শোকসংবাদ বর্ণনা করিয়া কাব্য শেষ করা ভারতবর্ষীয় রীতি নহে। সত্য ঘটনা ভাবিয়াই আমি উত্তরকাণ্ড হইতে এগুলির উল্লেখ করিয়াছি! লবণ বধটাও সত্য ঘটনা ভাবিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

উত্তরকাণ্ডে বিবৃত রাম কর্ত্তৃক শম্বুক বধ কি ঐতিহাসিক সত্য, না ইহা ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব স্থাপন নিমিত্ত ভৃগু কর্ত্তৃক নারায়ণের বক্ষে পদাঘাত করার মত একটা মিথ্যা গল্প? যদি ইহা মিথ্যা হয় তাহা হইলে রাম-চরিত্রের একটা গুরুতর কলঙ্কের অপনোদন হয়। কিন্তু এত বড় একটা কলঙ্ক যে মিথ্যা করিয়া রামচরিতে আরোপিত হইবে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। যদি সত্য হয় তবে রামের বুদ্ধি এবং ধর্ম্মানুরাগের প্রশংসা বোধ হয় কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই করিবেন না। দ্বাপরযুগে শূদ্রের তপস্যা করিবার অধিকার নাই, অথচ শূদ্র শম্বুক তপস্যা করিতেছিল। ইহাতে পাপ হইল রামের। সেই পাপের ফলে মরিল একটা ব্রাহ্মণ বালক। রাম এই পাপস্খলন করিলেন সেই হতভাগ্য শম্বুককে হত্যা করিয়া। ইহাতে রামের কার্য্যকারণ-জ্ঞান মোটেই প্রকাশ পায় না। শূদ্র অকালে তপস্যা করিলে যদি পাপ হয় তাহা হইলে তাহা সেই শূদ্রেরই হইবে। তাহাতে রামের পাপ হইবে কেন? যদিই বা হয় তাহাতে একটি নিরপরাধ শিশু মরে কেন? যদিই বা মরে তাহা হইলে রামরাজ্যের যাবতীয় ব্রাহ্মণশিশু মরিল না কেন? এতগুলি প্রশ্নের একটাও রামের মনে উদিত হইল না। তাঁহার কিছুমাত্র ব্যক্তিত্ব থাকিলেও তিনি এইরূপে ব্রাহ্মণদের মতে আত্মসমর্পণ করিয়া এই হত্যারূপ মহাপাপ করিতেন না।

একদা কৈকেয়ীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া দশরথ বলিলেন, "তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব।" কৈকেয়ী বলিলেন, "আমি আর একসময়ে আমার ইপ্সিত বস্তু চাহিয়া লইব।" ইহার বহুদিন

পরে যখন রামের অভিষেকের কথা উঠিল তখন কৈকেয়ী চাহিয়া বসিলেন ভরতের জন্য রাজ্য এবং রামের জন্য বনবাস। অতএব রাম নির্ব্বাসিত হইলেন। এইরূপ ঘটনা কেবল গল্পেই শোভা পায় কিন্তু কোন যুগেই যে এরূপ ঘটনা বাস্তবিক ঘটিতে পারে ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। অন্যপক্ষে আমরা রামের উক্তি হইতেই জানিতে পারি যে কৈকেয়ীর পিতা এই সত্যে দশরথকে কন্যাদান করিয়াছিলেন যে, সেই কন্যাগর্ভজাত পুত্রই দশরথের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবে। ইহা হইতে আমি বনবাসের ইতিহাসটা পুনর্গঠন (recons-truct) করিতে সাহসী হইতেছি। দশরথ ও কেকয়রাজের মধ্যে পাকাপাকি নির্দ্ধারণ হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ হইলে জ্যেষ্ঠপুত্র রামের প্রতি বড় অবিচার হয়। এজন্য বহু ক্ষমতাশালী ব্যক্তির মধ্যবর্ত্তিতায় দশরথের মৃত্যুকালে এই মধ্যপন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল যে, রাম চতুর্দ্দশ বৎসর অযোধ্যায় থাকিতে পাইবেন না এবং ততদিন ভরত রাজত্ব করিবেন। এই গদ্যোচিত অনুষ্ঠান কাব্যের মোটেই উপযুক্ত নহে বলিয়া বাল্মীকি ইহাকে কাব্যোচিত বা idealize করিয়া স্বীয় কাব্যে স্থান দিয়াছেন। আমার এই মত সম্বন্ধে অপরের কি মত তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়।

আর দুই একটা কথা বলিয়াই রাম ও রামায়ণ সম্বন্ধে আমরা বক্তব্য শেষ করিব। রাবণ যখন সীতা হরণ করে তখন তাহার বয়স হইয়াছিল কত? তাহার বহু পুত্র পৌত্র হইয়াছিল। পৌত্রদেরও যুদ্ধ করিবার বয়স হইয়াছিল। রামের পূর্ব্বপুরুষ মান্ধাতার সহিত রাবণ যুদ্ধ করিয়াছিল একথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলিয়া ছাড়িয়া দিলেও রাবণ অশীতিপর ছিল। তখনও কি স্বয়ং গিয়া তাহার সীতা হরণ করিবার বয়স ছিল?

ওএবর (Weber) প্রভৃতি কেহ কেহ বলিয়াছেন যে রামায়ণে বিবৃত ঘটনা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়ের। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ৪২ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে সুগ্রীব বলিতেছেন —প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী এবং সেখানকার রাজা দুষ্টমতি নরক। মহাভারতে দেখিতে পাই যে নরক কৃষ্ণের সমসাময়িক ছিলেন এবং কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হন। সুগ্রীব ছিলেন রামের সমসাময়িক এবং কৃষ্ণ ছিলেন যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। তাহা হইলে নরক কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি হয় রামের পূর্ব্ববর্ত্তী না হয় সমসাময়িক। যদি বলা যায় যে সুগ্রীবের এই উক্তি প্রক্ষিপ্ত, তাহা হইলে এরূপ তুচ্ছ বিষয় কেন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল?

আর একটা কথা এই যে, উত্তরকাণ্ডের ৭৪ অধ্যায়ে এবং আরও দুই এক স্থানে লিখিত আছে যে রাম দ্বাপরযুগের লোক। কেন এরূপ লেখা হইল?

এখন কৃষ্ণের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিব। কৃষ্ণ ছিলেন প্রাগৈতিহাসিক সময়ের লোক, ভারত-যুদ্ধের সমসাময়িক। ভারত যুদ্ধ হইয়াছিল, ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে, খৃষ্টের চৌদ্দ পনের শত বৎসর পূর্ব্বে। কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিতগণ মহাভারতোক্ত জ্যোতিঃসংস্থান

নির্ণয় করিয়া দেখিয়াছেন খৃষ্টের চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারত-যুদ্ধ হইয়াছিল। কৃষ্ণের জীবন-কথা মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতিতে বিবৃত আছে। এইগুলির মধ্যে মহাভারতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা মনে নাই—হয়ত তৎসম্বন্ধে কিছু পাঠই করি নাই। কিন্তু পুরাণগুলি যে খৃঃ সপ্তম শতকের পর রচিত হইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত পাঠ করিয়াছি। সুতরাং পুরাণে বিবৃত কৃষ্ণচরিত তাঁহার অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পরে লিখিত। তিনি যে বর্ষাকালে জন্মিয়াছিলেন, সে কথা মহাভারতে নাই কিন্তু পুরাণে আছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে পুরাণকারেরা কেমন করিয়া জানিলেন যে, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একদিন বর্ষাকালে কৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল? তাঁহার সমকালবর্ত্তী ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, অর্জ্জুন প্রভৃতি অপেক্ষা কৃষ্ণ এমন অধিক গণ্যমান্য ছিলেন না যে, কেবল তাঁহারই জন্ম সময়টা শ্রুতিপরম্পরায় দুই সহস্র বৎসর চলিয়া আসিবার পর পুরাণকারেরা তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কোন্ শিশুর কখন জন্ম হইয়াছিল তাহা অন্যের মনে থাকা ত দূরের কথা পিতামাতার মনে থাকে না। সুতরাং বংশপরম্পরায় দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত যে তাহার স্মৃতি থাকিবে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অপর পক্ষে তাঁহার তথাকথিত জন্মকালের সহিত খৃষ্টের জন্মকালের ঐক্য আছে। খৃষ্ট যে ডিসেম্বর মাসে জন্মেন নাই ইহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত। বাইবেল পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তিনি যখন জন্মিয়াছিলেন তখন পালেষ্টীনে বসন্তকাল। পালেষ্টীনে যখন বসন্তকাল তখন ভারতবর্ষে বর্ষাকাল। ইহাতে হঠাৎ বোধ হইতে পারে যে একের বর্ষাকালে জন্ম হইয়াছে বলিয়াই অপরের জন্মে বর্ষাকাল আরোপিত হইয়াছিল। কিন্তু একটিমাত্র মিল দেখিয়া এরূপ অনুমান সঙ্গত হয় না। যদি অন্য অনেক বিষয়ে মিল থাকে তবেই এরূপ অনুমান একেবারে ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কৃষ্ণ ও খৃষ্টের জীবনে আমরা আরও কতকগুলি মিল বা সাদৃশ্য দেখিতে পাই। (১) উভয়েরই জন্মের পরে স্থানান্তরিত হওয়া—কৃষ্ণ বৃন্দাবনে এবং খৃষ্ট মিসর দেশে। (২) উভয়েরই জন্মের পর রাজশক্তি কর্তৃক শিশু হত্যা। (৩) য়িহুদীয় ধর্ম্মগ্রন্থে শয়তানকে সর্পরূপধারী বলা হইয়াছে। ইহা রূপক মাত্র। খ্রীষ্ট সেই শয়তান বা সর্পকে দমন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ কালীয় দমন করিয়াছিলেন। (৪) উভয়ের জন্ম অলৌকিক। (৫) কৃষ্ণের বিশ্বরূপ ধারণ এবং খ্রীষ্টের দিব্যরূপ ধারণ। (৬) উভয়েরই শোচনীয় মৃত্যু বৃক্ষের উপর। (৭) বাইবেলের নববিধান ও গীতায় বহু সাদৃশ্য।

দুই ব্যক্তির মধ্যে যে এতগুলি সাদৃশ্য আকস্মিক হইতে পারে অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধেই এই ঘটনা গুলি ঘটিয়াছিল এরূপ মনে করা কঠিন। অবশ্যই একজনের বিবরণ সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক অন্যে আরোপিত হইয়াছিল। এখন জিজ্ঞাস্য—কৃষ্ণজীবনের ঘটনাই খ্রীষ্ট জীবনে আরোপিত হইয়াছে, না খ্রীষ্টজীবনের কথাই কৃষ্ণজীবনে আরোপিত হইয়াছে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, কৃষ্ণের বহুশত বৎসর পরে যখন খ্রীষ্ট জন্মিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণ কোন সময়ে জন্মিয়াছিলেন, তিনি যে বাল্যকালে একটা সাপ মারিয়াছিলেন ইত্যাদি কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল কেন না এ সকল বিষয়ের লিপিবদ্ধ প্রমাণ ছিল না। থাকিলেও সেই সকল কথা যে পালেষ্টীনের লোকের জানা ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার প্রথম শতকের মধ্যেই ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রথম শতকের মধ্যেই খ্রীষ্টশিষ্য থোমা (Thomas) ভারতবর্ষে আসিয়া খ্রীষ্টীয় এক সম্প্রদায় স্থাপন করেন—এবিষয়ে কিংবদন্তী আছে, মহাভারতের আদিপর্ব্বে এমন একটা দেশের উল্লেখ আছে যেখানে লোকে উপাস্য দেবতার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই উপাস্য দেবতার মাংস ভক্ষণ যে খৃষ্টীয় সমাজের ইউকারিষ্ট (Eucharist) নামক অনুষ্ঠান, তাহাতে সন্দেহই হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ শীল মহাশয়ও এইমত ব্যক্ত করিয়াছেন। খ্রীষ্টিয় সমাজ ভিন্ন কুত্রাপি এরূপ অনুষ্ঠান নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন খ্রীষ্ট স্বীয় শিষ্যদিগের সহিত যখন ভোজন করেন তখন তিনি তাহাদের প্রত্যেককে একখণ্ড রুটি এবং একটু মদ্য দিয়া বলিলেন যে এই রুটি এবং মদ্য তোমরা আমার মাংস এবং রক্ত বিবেচনা করিয়া খাও। সেই সময় হইতে এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়েই এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ইহা হইতে স্বতঃই সিদ্ধান্ত হয় যে রক্তমাংস ভক্ষণ অনুষ্ঠানের সহিত খ্রীষ্ট চরিত্রের অন্যান্য বৃত্তান্তও ভারত-বর্ষের লোকের বিদিত ছিল।

কোন ব্যক্তিতে কিছু অসাধারণত্ব লক্ষিত হইলে তাঁহাকে ঈশ্বর বা অবতারের পদবীতে আরূঢ় করাইয়া দেওয়া ভারতবর্ষীয় লোকের প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান সময়েও ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় লোকের প্রকৃতির আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা বিজাতীয় কোন বস্তু স্বকীয় করিয়া লইতে বড় অনিচ্ছুক। এই জন্য তাঁহারা খ্রীষ্টের দেবত্ব দেখিতে পাইয়াও খ্রীষ্ট বিদেশীয় বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের চক্ষে একটা সুযোগ পড়িয়া গেল। কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের নামের ধ্বনিগত সাদৃশ্যই এই সুযোগ। তাঁহারা খ্রীষ্ট-চরিত্রের উল্লিখিত বিবরণগুলি বহুগুণিত করিয়া কৃষ্ণ-চরিতে আরোপ করিয়া অবশেষে কৃষ্ণকে একেবারে ঈশ্বরের পদে স্থাপন করিলেন।

দুইটি অনুমানের মধ্যে এইটিই আমার অধিকতর সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। মহাভারতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়—তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। যাহা হউক ইহা আমার একটা থিওরী মাত্র। প্রার্থনা করি সুধীগণ এ বিষয়ে স্বমত প্রকাশ করিবেন।

খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে য়িহুদী ধর্ম্মেরও দুই একটা ভাব কৃষ্ণধর্ম্মে বা বৈষ্ণবধর্ম্মে দেখা যায়। ঈশ্বরকে য়িহুদীগণ এত ভক্তি ও ভয় করিত যে তাঁহার হিব্রীয় নাম যিহোবা Jehovah) তাহারা উচ্চারণ করিত না। তৎপরিবর্ত্তে আদোনাই (Adonai) বলিত।

যিহোবা বলিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টের ভাব মনে আসে; আর আদোনাই বলিতে পতি-পত্নীর ভাবের ব্যঞ্জনা হয়। খ্রীষ্টও তাঁহার মণ্ডলীকে পত্নীরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। হয়ত এই রূপক অনুসরণ করিয়াই সার ব্যাম্‌ফিল্‌ড্‌ ফুলর্‌ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে তাঁহার হিন্দুস্ত্রী ও মুসলমান স্ত্রী বলিয়া অবিহিত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ কিন্তু এই ভাবটাকে পরাকাষ্ঠায় লইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা ভাবেন যে, কৃষ্ণ তাঁহাদের স্বামী এবং তাঁহারা কৃষ্ণের স্ত্রী। এই জন্যই তাঁহারা কাছা না দিয়া এবং তিলকধারণ করিয়া নারীরূপ ধারণ করেন।

কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু একটা গুরুতর বৈসাদৃশ্যও আছে। খ্রীষ্ট স্পষ্ট বলিয়াছেন যে তাঁহাতে কোন পাপ নাই। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই যে যখন অপহৃত স্যমন্তক মণির পুনরুদ্ধার হইল তখন কে সেই মণির অধিকারী হইবে ইহা আলোচনা করিবার সময়ে কৃষ্ণের নিম্নলিখিত মর্ম্মে উক্তি আছে,—"যিনি নিষ্পাপ যিনি সচ্চরিত্র তিনি ভিন্ন কেহই এই মণির অধিকারী হইতে পারে না। আমি ইহার অধিকারী হইতে পারি না, কেন না আমি বহুপত্নীক। আর বলরাম দাদাও ইহার অধিকারী হইতে পারেন না, যেহেতু তিনি মদ্যপায়ী।"

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

প্রকাশ

ভালো হ'ল নাথ!
আমার এ অন্ধকার হৃদয়ের স্তরে স্তরে কুহরে কুহরে
পড়ে' গেল তব নেত্র-কিরণ-সম্পাত।
অকথিত পুঞ্জীকৃত জঞ্জালের মত
কামনা বেদনা শত শত
অকৃত কর্ম্মের যত বোঝা,—
আমি না দেখাতে তুমি সব দেখে নিলে,
মুক্তি দিলে,
বাঁকা পথ করে দিলে সোজা।

সব যে জানিতে হবে ওগো মোর দেব অন্তর্য্যামি!
অন্তরের তলে আছে যাহা,—
গ্লানি লজ্জা দুঃখে ক্লেশে যেকথা কহিতে নারি, আমি,
আপনি চাহিয়া দেখ তাহা।
তোমার ও দীপ্তদৃষ্টি অন্তরের কক্ষে কক্ষে পড়ি'
ঝলকিল
মুক্তি দিল গোপন কথারে,
হালছাড়া পালহারা পঙ্কবদ্ধ ছিল যেই তরী
হরি হরি!
ভেসে গেল অকূল পাথারে।

চেয়ে দেখ চেয়ে দেখ নগ্ন মোর কাঙ্গাল বাসনা
লুকাইতে চাহে লজ্জাভরে,—
বক্ষের কোটরে মর্ম্মতলে।
তোমার চরণ ছাড়ি' ধরণীর ধূলি উপাসনা—
মিথ্যা এই বঞ্চনার বাঁধ
ভেঙ্গে ফেল, ভেঙ্গে ফেল নাথ!
সরমে মরমে মরি জ্বলে'।

আমার জীবন বন্ধু!
তোমা হ'তে আড়ালে থাকিয়া—
লুকাইয়া—লুকাইয়া,
কাঙ্গাল হইয়াছিনু আমি।
তুমি মোরে বাঁচাইলে,—
দেখে' নিলে জানিলে সকল,
পরশি' ও চরণ শীতল
বাঁচিনু—বাঁচিনু—অন্তর্য্যামি!

শ্রীসুশীলাসুন্দরী দেবী

পূজারী

চাডুয্যেদের ভাঙা ঘাটের ঠিক পাশেই অনেক দিনের একটা পুরাতন শিবমন্দির—তাহার অশ্বত্থ-বট-আচ্ছাদিত জীর্ণ মাথাটা তুলিয়া কোনরকমে দাঁড়াইয়া ছিল। মন্দিরের বাহিরের অবস্থা দেখিলে ইহার অভ্যন্তরস্থ দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হইত।—চাডুর্য্যেদের পূর্ব্ব-পুরুষের সমৃদ্ধ অবস্থায় মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। আজ সেই বনেদী বংশ যে লক্ষ্মীর করুণা বাঞ্চত হইয়া শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে, এই জীর্ণ মন্দিরটীই তাহার সাক্ষ্য।

এককালে মন্দিরে খুব জাঁকজমকের সহিত পূজা হইত।—চাডুর্য্যেরা একান্ত ধর্ম্মভীরু ছিলেন বলিয়া এই জাগ্রত দেবতার তুষ্টি বিধানের জন্য অর্থব্যয় করিতে কখনও কৃপণতা করিতেন না। ক্রমে ক্রমে সে সকল উঠিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সকাল সন্ধ্যা উপাসনার ব্যবস্থাটা মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত রুদ্রদেব উঠাইয়া দিতে পারেন নাই যদিও এজন্য এখানে চাডুর্য্যে বাড়ী হইতে এক পয়সাও আনুকূল্য পাওয়া যায় না। মন্দির স্থাপনার প্রথম দিন হইতেই রুদ্রদেব এই মন্দিরের পূজা করিয়া আসিতেছেন! এই মন্দিরের সহিত তাঁহার জীবনের অনেক সুখ দুঃখ জড়িত হইয়া রহিয়াছে তাই আজিও বৃদ্ধ বয়সে ইহার আকর্ষণ তিনি অঙ্গে অঙ্গে অনুভব করেন।

সে অনেক দিনের কথা! একটী মাতৃ-পিতৃহারা বালিকা দেবতার পূজার জন্য নিয়মিত ফুল লইয়া আসিত। জল ঝড় কোন কিছুতেই সে তাহার দৈনিক ফুল যোগানোর কাজ ভুলিত না! ক্রমে ক্রমে সে রুদ্রদেবের পূজায় বসিবার পূর্ব্বেই চন্দন বাটিয়া, কোসাকুসি প্রভৃতি সাজাইয়া সমস্ত উপকরণ ঠিক করিয়া রাখিত! পূজায় আসিয়া রুদ্রদেব সেই লক্ষ্মী মেয়েটীর পানে একবার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিতেন! মেয়েটী তাঁহাব পায়ের ধুলা লইয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইত। রুদ্রদেব ভাবিতেন মেয়েটী কে? এমন নিষ্ঠা, এমন ভক্তি! তাহার সুন্দর নির্ম্মল মুখখানি এই জন্ম-পূজারীর পূজার মধ্যেও মাঝে মাঝে ব্যাঘাত ঘটাইত! এক একবার তিনি চকিতে মেয়েটীর মুখের দিকে চাহিয়া ফেলিতেন। সমস্ত মুখখানা রাঙা করিয়া মেয়েটী মন্দিরের বাহিরে চলিয়া যাইত।

একদিন রুদ্রদেব মেয়েটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। নত মুখে সে ধীরে ধীরে প্রশ্ন কয়টীর উত্তর দিয়া গেল। তাহার নাম ভবানী। দরিদ্র ব্রাহ্মণের অনূঢ়া কন্যা সে। তাহার পিতা মৃত্যুকালে তাহাকে এই মন্দিরের দেবতার পায়ে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। রুদ্রদেব বলিলেন তোমার কি আর কেউ নেই ভবানী? তুমি একা? মাথা নীচু করিয়া ছলছল চোখে ভবানী ঘাড় নাড়িল।

ইহার পর পিতার অনুমতি লইয়া রুদ্রদেব ভবানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নদী-

তীরের বিজন ক্ষুদ্র কুটীরখানি ভবানীর রূপে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই ব্যাপার লইয়া রুদ্রদেবের সহিত তাহার জ্ঞাতি-বন্ধু প্রভৃতির দারুণ মতভেদ ও গৃহবিবাদের সৃষ্টি হয়। সকলেই রুদ্রদেবকে পরিত্যাগ করে এবং ক্রমে ক্রমে সে-মন্দিরে সাধারণের যাওয়া আসাও বন্ধ হইয়া যায়। রুদ্রদেব ইহার জন্য দুঃখিত হন নাই। চারিদিকে মতভেদের অশান্তি লইয়া বাস করা অপেক্ষা এই নির্ব্বান্ধব শান্ত জীবন তিনি শ্রেয়ঃ মনে করিলেন।

সেদিন সকালে পূজার সিঁড়িতে বসিয়া রুদ্রদেব অনেকক্ষণ অন্য মনে এই সকল কথা ভাবিতেছিলেন! সে সব আজ কত দিনের কথা! কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুমধুর স্মৃতিকণাগুলি আজিও মন্দিরকে দশদিকে ঘেরিয়া রহিয়াছে! কন্যা নারায়ণী ফুলের থালাটী পিতার সামনে রাখিয়া প্রণাম করিল। রুদ্রদেব মুগ্ধভাবে অনেকক্ষণ কন্যার মুখের দিকে পরম স্নেহভরে চাহিয়া রহিলেন! ঈষৎ লজ্জিতভাবে নারায়ণী বলিল, কি ভাব্‌ছ বাবা!

গলা ঝাড়িয়া রুদ্রদেব বলিলেন—অনেক দিনের অনেক কথা মনে পড়ছে মা। ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইয়া তিনি পূজায় মনোনিবেশ করিলেন! অলক্ষ্যে এই সময় তাঁহার চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িয়াছিল।

নারায়ণী সমস্ত বুঝিল। কতদিন নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—কুটীর অলিন্দে পিতার পদতলে বসিয়া সে কত অতীত কাহিনী শুনিয়াছে। তরুণ বয়সের সুখ দুঃখের কথা বলিতে রুদ্রদেব কন্যার কাছে কোন দ্বিধা বোধ করিতেন না! আপনার সাধ্বী জননীর কাহিনী শুনিতে শুনিতে নারায়ণীর সমস্ত বুক গর্ব্বে ভরিয়া যাইত। কথা কহিতে কহিতে রুদ্রদেব কন্যার কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িতেন; পরম শ্রদ্ধাভরে নারায়ণী পিতার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিত! তাহার চোখের সামনে পশ্চিম আকাশের তারাটী দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত। পাশের নদী অশ্রান্ত কলরোলে বহিয়া যাইত, নারায়ণী কান পাতিয়া শুনিত এ যেন তাহার মায়েরই কণ্ঠস্বর! আকাশের পানে চাহিয়া হাতযোড় করিয়া সে বলিত, ওগো ঠাকুর আমি যেন মায়ের মতন হ'তে পারি!

কয়দিন হইল রুদ্রদেবের অল্প অল্প জ্বর হইতেছিল! কিন্তু নিত্য প্রাতঃস্নান ও সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা তিনি বন্ধ করেন নাই। ইহাতে জ্বর না কমিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা মন্দির হইতে আসিয়া তিনি কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন! নারায়ণী পিতার মাথা টিপিতে টিপিতে ব্যাকুলভাবে বলিল, বাবা এভাবে ত শরীর টিক্‌বে না! পূজোর অন্য একটা ব্যবস্থা যে করতে হবে—

রুদ্রদেব কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—কি করব মা। এ মন্দির যে সবার ত্যক্ত; আমি দেবীকে বরণ করে' মন্দিরে এনেছিলুম বলে' আজ এখানে কউ পূজা দিতে আসে না।

"অন্য কেউ কি দু'এক দিনের জন্যে পূজো করতে পারেন না?"

"কে করবে মা! আমি সবার একঘরে, আমার মন্দিরে কে আস্‌বে?"

নারায়ণী কি একটা কথা বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিল না। সে বুঝিল ইহাতে পিতার দুঃখের স্মৃতি বাড়িয়াই যাইবে। বাহিরে খড়মের শব্দ হইল। পরিচিত শব্দ। মুখ হইতে কম্বল সরাইয়া রুদ্রদেব ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, কে?

দ্বারপ্রান্ত হইতে উত্তর হইল—আমি, জ্যাঠামশাই!

স্নিগ্ধকণ্ঠে রুদ্রদেব কহিলেন—কে, নলিনাক্ষ? এসো বাবা!

নারায়ণী তাড়াতাড়ি একটী পিড়ি পাতিয়া তাহার উপর একখানি আসন বিছাইয়া দিল। একটী সৌম্যদর্শন যুবক ঘরে প্রবেশ করিল।

রুদ্রদেব বলিলেন—এ অসময়ে কেন বাবা? সব কুশল ত?

নলিনাক্ষ বলিল—আজ্ঞে হাঁ—আপনি অসুস্থ শুনেই এসেছিলাম।

কেবল এই একটী কথাতেই রুদ্রদেবের হৃদয় জুড়াইয়া গেল, তাঁহার যেন রোগযন্ত্রণার অর্দ্ধেক লাঘব হইল! অগণিত আত্মীয় বান্ধবের ভিতর এই একটী যুবকই তাঁহার খোঁজ খবর রাখে! নলিনাক্ষের পিতা জয়দ্রথ রুদ্রদেবের প্রধান শত্রু ছিলেন। তাঁহারই প্ররোচনায় ও চেষ্টায় রুদ্রদেব আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রুদ্রদেব তাঁহাকে কোন দিনই আপনার শত্রুভাবেই দেখেন নাই। সৌহার্দ্দ্যের মাধুর্য্য জয়দ্রথ চিরদিনই বিদ্বেষের বিষে কটু করিয়া আসিয়াছেন। নলিনাক্ষের জন্মের পর রুদ্রদেব তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু নারয়ণীর জন্মের কয়দিন পরেই যেদিন তাহার মা ঘর অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেলেন সেদিন কেহ তাঁহার ঘরের দিকে পা' ত বাড়ায় নাই, অধিকন্তু জয়দ্রথ বিদ্বেষের হাসি হাসিয়া সকলের কাছে প্রচার করিয়াছিল, এইই পাপের প্রায়শ্চিত্ত! এই সকল কথা মনে করিয়া নলিনাক্ষের প্রতিও তাঁহার অন্তর মাঝে মাঝে কঠিন হইয়া উঠিত! কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিলেই সে সমস্তই পূর্ণিমারাত্রে অন্ধকারের মত গলিয়া গলিয়া পড়িত। নলিনাক্ষকে তিনি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন।

নলিনাক্ষ উদ্বেগের সহিত বলিল, আপনার জ্বর হচ্ছে জ্যাঠা মশাই?

রুদ্রদেব কহিলেন—হাঁ বাবা, মনে করেছিলুম দু'এক দিনেই ছেড়ে যাবে. কিন্তু তার ত লক্ষণ দেখছি না।

"এর উপর ত স্নান পুজো সবই চল্‌ছে?"

"চল্‌ছে বৈ কি! সে সব কি বাদ দেওয়া যায় বাবা?"

"আমি যদি নিজে না আস্‌তাম তা' হ'লে আমাকে খবরটা দেওয়াও বোধ হয় দরকার বলে' মনে করতেন না; আজ থেকে আপনার সম্পূর্ণ বিশ্রাম।"

রুদ্রদেব যেন কি বলিতে গিয়া কুণ্ঠিত হইলেন—নলিনাক্ষ হঠাৎ তাঁহার পায়ের উপর

একখানি হাত রাখিয়া বলিল, আমার দ্বারা পূর্ণাঙ্গ পূজা হবে কিনা, তাই কি ভাবছেন জ্যাঠামশাই ?

ব্যস্ত হইয়া রুদ্রদেব বলিলেন, না বাবা, সে কথা ভাবিনি, তোমার মত দেবতার যোগ্য সেবক কোথায় পাব। আমি ভাবছিলাম তোমার বাপের কথা। এতে তাঁর সম্মতি তুমি নিশ্চয়ই পাবে না। আমার জন্যে তুমি পিতার অবাধ্য হবে নলিনাক্ষ ?

নলিনাক্ষ ঈষৎ উষ্মার সহিত বলিল, তাই বলে ত অন্যায়কে মাথা পেতে নিতে পারিনে জ্যাঠামশাই পিতৃবিধান বলে। আমি ভেবে আশ্চর্য্য হই যে এতটুকু বিষয়কে এঁরা কি করে এতখানি করে তুলেছেন। আর তাই নিয়ে বছরের পর বছর বিভেদের গণ্ডি সৃষ্টি করে' রেখেছেন, সমস্যার উদ্ভব করলেই ত হয় না, তার সঙ্গে সঙ্গে সমাধানের ব্যবস্থা করা চাই। এই করেই না সমস্যা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। আমি যদি সেটা না মানি জ্যাঠামশাই ?

আনন্দোজ্জ্বল চক্ষু দুটী নলিনাক্ষের প্রদীপ্ত মুখের দিকে রাখিয়া রুদ্রদেব কহিলেন—তা'হলে তোমাকে যথার্থ মানুষ বল্‌ব বাবা। কিন্তু এর জন্যে তোমাকে অনেকের বিরাগভাজন হতে হবে। পট্টবস্ত্রের মৃদু খস্ খস্ শব্দ শুনিয়া নলিনাক্ষ পাশে চাহিয়া দেখিল নারায়ণী দাঁড়াইয়া আছে—তাহার এক হাতে পাথরের পাত্রে মিছরির সরবৎ, অপর হাতে একখানি রেকাবে কাঁচা মুগের ডাল, শসা প্রভৃতি ফল সাজান রহিয়াছে। সেগুলি নলিনাক্ষের সম্মুখে রাখিয়া সে গঙ্গাজল ভরা কোশাকুশিটীও তাহার সামনে ধরিয়া দিল। মুগ্ধ বিস্ময়ের সহিত নলিনাক্ষ বলিল এসব জোগাড় কখন করে ফেল্‌লে নারায়ণী ? এই ত এখানে ছিলে !

রুদ্রদেব বলিলেন ও আমার লক্ষ্মী মা! সন্ধ্যা সেরে ওগুলো খেয়ে ফেল বাবা। লক্ষ্মীর দান ফেল্‌তে নেই।

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নারায়ণীর মুখের দিকে চাহিয়া নলিনাক্ষ সন্ধ্যা করিতে বসিল। অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলিয়া নলিনাক্ষ চাহিয়া দেখিল নারায়ণী তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যার আকাশের মত সে দৃষ্টি সুন্দর ও করুণ। তাহার দিকে চাহিয়াই নারায়ণী মুখ নত করিল। প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে নলিনাক্ষ দেখিল সে মুখখানি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। থালাটা তুলিয়া লইয়া সে তাহার শেষ বিন্দুটী পর্য্যন্ত খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইল। যাইবার সময় রুদ্রদেবের পায়ের ধূলা লইয়া সে বলিল এ কেবল দুদিনের জন্যে নয় জ্যাঠামশাই! একই জনের ওপর একই কাজের ভার চিরদিনের জন্য রাখা একান্ত অন্যায়। আজ থেকে আমি আপনার শিষ্যত্ব নিলাম। এখন থেকে আপনার বিশ্রাম!—বলিয়া সে নারায়ণীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রুদ্রদেব ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন ঘরে বাইরে যেচে শত্রু করতে চাইছ কেন বাবা ? এতে কি মঙ্গল হবে ? কথাটা নলিনাক্ষ শুনিতে পায় নাই, সে ততক্ষণে বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল।

মন্দিরের সে দৈন্যদশা যেন একটু একটু করিয়া অপসৃত হইতেছিল। চাড়ুয্যেদের বাড়ী হইতে এখন সকাল বিকাল ভোগ আসে। সান্ধ্য আরতির সময় এখন ক্রমে ক্রমে অনেকেই দেবতার চরণে ভক্তি নিবেদন করিতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। নলিনাক্ষ প্রত্যহ সায়ংসন্ধ্যা পূজা করিতে আসিত। তাহার আসিবার আগেই নারায়ণী সমস্ত উপকরণ ঠিক করিয়া রাখিয়া দিত। পূজাশেষে নলিনাক্ষ প্রশান্ত বদনে মন্দিরের বাহিরে আসিলে নারায়ণী পরম শ্রদ্ধাভরে তাহার পায়ের কাছে মাথা ঠেকাইয়া পদধূলি গ্রহণ করিত—মৃদুস্বরে নলিনাক্ষ বলিত, কি বলে তোমায় আশীর্ব্বাদ করব নারায়ণী?—নারায়ণী সলজ্জ মৃদু হাসিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইত।

সেদিন নলিনাক্ষ সবে মাত্র পূজায় বসিয়াছে। ফুলের থালাটী সাজাইয়া দিয়া নারায়ণী বাহিরে আসিতেছিল হঠাৎ কি দেখিয়া যেন ভয় পাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। নলিনাক্ষ তাহার ভীত ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল, কি হয়েছে নারায়ণী? নারায়ণী কিছু বলিতে পারিল না। দ্বারপ্রান্ত হইতে নলিনাক্ষ পিতার গম্ভীর কণ্ঠ শুনিতে পাইল। জয়দ্রথ বলিলেন—উঠে আয় নলিনাক্ষ এখনি ওখান থেকে—আমার কথা অমান্য করলে তোর ওই পূজো যেন তোর বাপের শ্রাদ্ধের উপকরণ হয়।—নলিনাক্ষ আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া পিতার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল—এতবড় অভিশাপ দিওনা বাবা। দেবতার পুণ্যপীঠে অন্তরের হীনতা প্রকাশ করতে তোমার মাথা কি নুয়ে পড়ছে না? নলিনাক্ষ পিতাকে দেবতার মত ভক্তি করিত।

জয়দ্রথ বলিলেন—আমার অমতে আমি কখনই তোকে চল্‌তে দোবোনা, তোকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে—এত ক্ষমতা রুদ্রদেবের?—বলিয়া তিনি নারায়ণীর মুখের পানে একবার অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মূহূর্ত্তে নারায়ণীর সুন্দর মুখখানি একবার ফ্যাঁকাসে হইয়া গেল। পরক্ষণে সে দেয়াল অবলম্বন করিয়া কোনরূপে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইল।

নলিনাক্ষ ধরা গলায় কহিল, বাবা তোমার এই মিথ্যা উষ্মার তাপটুকু একজন নিরপরাধীর ওপর বর্ষণ করতে চেয়োনা। আমার ব্যক্তিত্ব বলে' জিনিষটাকে অন্তরাল করে' রেখো না। তোমার কাছে হয়ত আমার এই অপরাধ মার্জ্জনার নয় কিন্তু অন্তর আমার কত ব্যথায় তোমার অনাদরকে ও মাথা পেতে নিতে চেয়েছিল।

জয়দ্রথ আরো রাগিয়া গেল, বলিল, দেখ্ নলিন তোর কাছে আমি ত উপদেশ নিতে আসিনি, তুই এখুনি বেরিয়ে আয় ওখান থেকে, ও দেবতার মন্দির নয়। নিদারুণ অপমানে নলিনাক্ষ সহসা ছিট্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল,—কঠিন কণ্ঠে বলিল—এখুনি তুমি মন্দির থেকে বেরিয়ে যাও বাবা। দেবতার নিন্দাকারীর স্থান এ পবিত্র আঙিনা নয়।—বলিয়া বরাবর আসিয়া আসনে বসিয়া পড়িল এবং পূজায় মনোনিবেশ করিল।

একান্ত বিরুদ্ধ মনেই নলিনাক্ষ সেদিন পূজা সারিয়া উঠিল। ছল ছল নেত্রে নারায়ণী

মন্দিরের এক পাশে বসিয়াছিল। তাহার দিকে চাহিবামাত্র তাহার মুখ আপনিই নত হইয়া গেল। সে কিছু বলিতে পারিল না। একবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে দ্বিতীয়বার পিছন দিকে না চাহিয়া সোজাপথে নিজেদের গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। নলিনাক্ষ চলিয়া যাইতেই যেন নারায়ণীর চমক ভাঙ্গিল। মিছরির পানা প্রভৃতি তাহার সযত্ন-সজ্জিত দ্রব্যগুলি পাশে মেজের উপর পড়িয়াছিল। সেগুলি ত সে তাঁহার সামনে ধরিয়া দেয় নাই।

বুকের মধ্যে কি একটা বেদনা যেন গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। এ কি অভিশাপ ঠাকুর —বলিয়া সে দেবতার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

সেদিন অধিক রাত্রেও নারায়ণী পিতার মাথা টিপিয়া দিতেছিল। সহসা রুদ্রদেব চোখ খুলিয়া বলিলেন—এখনো ঘুমুস্ নি মা! রাত যে অনেক হল। নারায়ণী কিছু বলিতে পারিল না। একদৃষ্টে রুদ্রদেব কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ঈষৎ লজ্জাভরে নারায়ণী বলিল কি ভাবছ বাবা—রোগ শরীরে ভাবতে নেই যে।

নিশ্বাস ফেলিয়া রুদ্রদেব কহিলেন—ভাবছিলাম মা অনেক কথা—হঠাৎ কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তিনি বলিলেন আচ্ছা মা আমার এ রোগ যদি না সারে—

নারায়ণীর চোখের কোণে জল আসিল—মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, ছিঃ ওকথা বলোনা বাবা! ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ আছে আমাদের ওপর।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রুদ্রদেব সহসা বলিলেন—আচ্ছা মা নলিনাক্ষ ছেলেটা বড় ভাল, না? নারায়ণীর চোখ দুইটী একবার অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া ক্ষণপরেই বর্ষার মেঘের মত করুণ হইয়া উঠিল, তাহার ঠোঁট দুইটী যেন নিদারুণ অভিমান ভরে কাঁদিতে লাগিল।

আজ দুইদিন নলিনাক্ষ পূজা করিতে আসে নাই। সেদিন সে দেবতার সম্মুখে তাহার কর্ত্তব্যবোধের গরিমা অতি উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছিল। ঘরে গিয়াই বুঝি তাহার সে মহানুভবতার শেষ হইয়া গিয়াছে। মানুষ বহুবর্ষ ধরিয়া একটু একটু করিয়া তাহার সাধের নগর নির্ম্মাণ করে, কিন্তু একদিনের ভূমিকম্পেই তাহা যেমন সমস্ত সম্পদ সহ একটা বিশাল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়, এই দুইদিনের মধ্যে নারায়ণীর অন্তর নলিনাক্ষের প্রতি তেমনই একান্ত বিরূপ হইয়া তিক্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে কেবলই ভাবিতেছিল এ বুঝি ছলনা, কেবল আত্ম-প্রবঞ্চনার চেষ্টা। দেবতার প্রতি ভক্তি নিষ্ঠা,—সমস্তই মিথ্যা—ও ভান মাত্র। দিনে রাতে নারায়ণীর কেবলই মনে পড়িতেছিল তাহার প্রতি জয়দ্রথের সেই বিদ্রূপ ভাষণটী। রুগ্ন পিতার নিকট নারায়ণী এ সমস্ত কথাই গোপন রাখিয়াছিল। সে জানিত এ কথা শুনিলে অতি কঠিন রোগশয্যা ত্যাগ করিয়াও রুদ্রদেব স্নান করিবেন এবং পূজায় বসিবেন। অভুক্ত দেবতার জ্বলন্ত অভিশাপ তাহা হইলে বুঝি একদিনেই সফল হইবে। গভীর রাত্রে পিতার শিয়রে বসিয়া নারায়ণীর বুক কেমন একটা অজ্ঞাত ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

কন্যার একখানি হাত বুকের উপর রাখিয়া রুদ্রদেব বলিলেন—রোগটা সারলে অনেকগুলো কাজ সেরে ফেল্‌তে হবে। আমার মনের সঙ্কল্পের ফুলগুলো কাজে ফুটিয়ে না তুল্‌তে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব না। নিজের ওপর আমি আর একটুও বিশ্বাস করিনে মা। জয়দ্রথের সঙ্গে দেখা করাটা আমার একটা বড় কর্ত্তব্য।—নারায়ণী কিছু বলিল না। পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রুদ্রদেব বলিয়া যাইতে লাগিলেন—আমি এখন ভাবি মা, এমন অবস্থাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে কেবল আমারই দোষে। তারা আমার প্রতি অন্যায় করেছে, আমার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করেছে কিন্তু আমিও ত তাদের কখন ক্ষমা করতে পারিনি। ব্রাহ্মণ হয়ে' এতবড় অধর্ম্মটা এতদিন মনে প্রাণে পুষে এসেছি। তার যন্ত্রণা আমার ওপর কিছু আসেনি বটে কিন্তু সুদে আসলে তা যে পুষিয়ে নিচ্ছে তোর ওপর মা। বিনা অপরাধে এতবড় শাস্তিটা তুই কি মাথা পেতে নিবি? রুদ্রদেবের রুদ্ধ চোখের কোণ বহিয়া অজস্র জলবিন্দু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও নারায়ণী অশ্রুর উৎসমুখ রুদ্ধ করিতে পারিল না। পিতার মুখ চক্ষের উপর পতিত হইলে অশ্রুর বেগ দ্বিগুণভাবে বহিয়া চলিল। রুদ্রদেব কন্যাকে টানিয়া লইয়া বুকের কাছে জড়াইয়া ধরিলেন।

নারায়ণী মন্ত্র জানিত না। অন্তরের নিবিড় ভক্তি চন্দনে সিক্ত করিয়া সে সযত্ন চয়িত পুষ্পগুলি দেবতার চরণে নিবেদন করিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেবতার চরণমূলে মাথা ঠেকাইয়া যখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল তখন তাহার মুখ একটা অপূর্ব্ব প্রশান্ত ও স্বর্গীয় সুষমায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। নৈবেদ্যের থালাটী লইবার জন্য সে মাথা নীচু করিল, এই সময় পাগলের মত ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া নলিনাক্ষ মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিল। পূর্ণ সাতদিন পরে আজ সে প্রথম মন্দিরে প্রবেশ করিল। এই সাতদিনে তাহার যেন সাতবৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সে প্রদীপ্ত মুখপ্রভা নাই। চোখ যেন শুকাইয়া বসিয়া গিয়াছে। দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার চরণদ্বয় উত্তেজনা ভয়ে কাঁপিতেছিল। উন্মাদের মত সে শুষ্কস্বরে বলিয়া উঠিল—নারায়ণী—নারায়ণী এগিয়ে এসে আমার হাত দুটো ধর, পেছনে আমায় তাড়া করে আস্‌ছে রাক্ষসের মত সেই অন্ধ বিশুষ্ক নীতিজ্ঞান। আমি তোমার কাছে আশ্রয় নিতে এসেছি।—কাঁপিতে কাঁপিতে সে বসিয়া পড়িল।

নারায়ণী কিছুই বুঝিল না। ব্যাপারটা তাহার কাছে রাত্রিশেষের স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। সে যেন কত আশায় ভরা, কত আনন্দের বেশে মধুময়। ধীরে ধীরে সে নত হইয়া নলিনাক্ষের পায়ের ধূলা লইতে গেল। নলিনাক্ষ পাগলের মত দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিল। কিন্তু পরক্ষণেই হাত ছাড়িয়া দিয়া নারায়ণীর পায়ের কাছে লুটাইতে লুটাইতে বলিতে লাগিল—তুমিই ধন্য নারায়ণী। দেবতা জাগ্রত হয়ে' তোমার কাছেই দেখা দেছেন। আমরা যুগ যুগ ধরে পূজো করে কেবল সেই মুহূর্ত্তটুকুই অবহেলায় হারিয়েছি।—

এসব কি প্রলাপের মত কথা—হঠাৎ একটা কথা ভাবিয়া নারায়ণী শিহরিয়া উঠিল। নলিনাক্ষ প্রবল জ্বরের উপর বিকারের ঘোরে ছুটিয়া আসে নাই ত। পাশে বসিয়া সে নলিনাক্ষের মাথাটী কোলের উপর টানিয়া লইল। নারায়ণীর কোলে মাথা রাখিয়া এতটুকু সময়ের মধ্যে নলিনাক্ষ ঘুমাইয়া পড়িল। সূর্য্যের আলো মন্দিরের সঙ্কীর্ণ বাতায়ন পথে তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। দারুণ রণে ক্লান্ত হইয়া আজ সে মুখ যেন বিরামের শান্তি পাইয়াছে। কয়দিনের সন্দেহ ও ঘৃণার অন্ধকার একমুহূর্ত্তে নারায়ণীর সমস্ত অন্তর হইতে কাটিয়া গেল। তাহার সমস্ত বুকটা গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে নলিনাক্ষ চোখ মেলিয়া চাহিল। নারায়ণীর সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইতেই সে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নারায়ণীর চোখে একটা শীর্ণ অশ্রুরেখা তখনও দেখা যাইতেছিল। সহজ ভাবে নলিনাক্ষ বলিল আমি বুঝি একটা স্বপ্ন দেখছিলাম নারায়ণী— নারায়ণী শ্রদ্ধাভরে নলিনাক্ষের পায়ের ধুলা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নলিনাক্ষ বলিল—সেদিন এইখানে দাঁড়িয়েই আমি বড় গর্ব্ব করেছিলাম। দেবতার রুদ্ররোষ আমার প্রতি আজ উদ্যত হয়ে রয়েছে।—জানো নারায়ণী সঙ্কীর্ণ ঘরটার মধ্যে দিনে রাতে কেবল ছটফট করে বেড়িয়েছি—বাহিরে আস্‌তে গেলেই জ্বলন্ত অক্ষরে চোখের সামনে ফুটে উঠেছে বাবার সেই ভীষণ অভিশাপের কথাটা,—বাবা দূর থেকে দেখে দেখে হেসেছেন আর বলেছেন—এই ত সন্তান বটে।—সে হাসি আমার বুকে শেলের মত বিঁধেছে। আমি বলেছি দেবতা অভুক্ত থাক্‌বে শুধু দুদণ্ডের জন্য আমায় পূজা সেরে আস্‌বার অনুমতি দিন। তিনি বলেছেন দেবতা কোথায়? কলঙ্কিতার হাতে কখন পাষাণে দেবতার সঞ্চার হতে পারে? সমস্ত জীবন শাস্ত্র অধ্যয়নের এই কি অভিজ্ঞতা? দেবতাও কি আজ কলঙ্ক অকলঙ্ক বিচার করতে বসেছেন। তিনিও কি শেষে ভক্তের জাতিভেদ করতে লেগেছেন—না, কিছুতেই মানতে পারলাম না। মনে হল, সবই মিথ্যা। সমস্ত অন্তর পাগলের মত হয়ে উঠল। তাইত সে মিথ্যার কারা থেকে ছুটে আস্‌বার ক্ষমতা পেয়েছি আজ? নারায়ণী ওখান থেকে বিদায় নিয়ে আজ আমি মন্দিরের নির্ভয় আশ্রয়ে এসেছি। বাবার ক্ষমার আশা আমি করি না, আমাকে কি দুয়ার থেকে ফিরিয়ে দেবে? সুমুখের দেবতা আজ প্রসন্ন হয়ে চেয়ে রয়েছেন। নারায়ণী মন্দিরের দেওয়াল ধরিয়া কোনমতে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার দুই চোখ বাহিয়া জল পড়িতেছিল। একবার জোর করিয়া মুখ তুলিতে গিয়া সে ধীরে ধীরে ভূমিতে বসিয়া পড়িল। লাঠিতে ভর দিয়া রুদ্রদেব এই সময় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। নারায়ণীর অশ্রু-সজল মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া তিনি কহিলেন—কাঁদিস কেন মা। বাইরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ আমি তোদের কথা শুনে সব বুঝতে পেরেছি। দেবতার মুখের পানে চেয়ে আমি দিনে দিনে একান্তে এই কামনাই যে করেছিলুম। আজ সে অভয়বর হয়ে এসেছে, তাকে বিমুখ করিস্‌নে মা।—বলিতে বলিতে তিনি স্খলিত চরণ দুটী কোনরূপে টানিতে টানিতে মন্দিরের বাহির হইয়া গেলেন।

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালার হিন্দু

আমাদের দেশে আজকাল হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা ক্রমেই জটিল হইয়া আসিতেছে। ইহার পর নারী-নির্য্যাতন, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ সমাধানের একটা চেষ্টাও ফল্গুর মত চলিয়াছে। এই সকল সমস্যার সমাধান না করিলে আস্তে আস্তে হিন্দুসমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, শিক্ষিত এবং তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ এদিকে মোটেই নজর দিতেছেন না। তাঁহারা কি তাঁহাদের স্থান কোথায়, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন? আজ আমরা হিন্দুদের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, তাহারা বাঙ্গালার বুকের উপর সমুদ্রের ফেনার মত ভাসিতেছে।

সমগ্র বাঙ্গালা দেশে মোট ৪৭৫৯২৪৬২ জন লোক বাস করে। ইহার ভিতর নিম্নলিখিত ধর্ম্মাবলম্বী লোক আছে—

হিন্দু	২০৮০৯১৪৮
মুসলমান	২৫৪৮৬১২৪
ব্রাহ্ম	৩২৮৪
শিখ	২৩৮০
জৈন	১৩৩৬৯
বৌদ্ধ	২৭৫৭৫৯
পার্সী	০৭৭০
খ্রীষ্টান	১৪৯০৬৯
ইহুদি	১৮৫১
আদিম	৮৪৯০৪৫
অন্যান্য	১৬৮৩

বাঙ্গালা দেশে যত লোক আছে মুসলমান তার অর্দ্ধেক হইতেও ১৬৮৯৮৯৩ জন অধিক। সমস্ত লোকসংখ্যার অর্দ্ধেক হইতে হিন্দু ২৯৮৭০৮৩ জন কম; আবার মুসলমান হইতে মোট ৪৬৭৬৯৭৬ জন কম; প্রায় অর্দ্ধকোটী কম। বাঙ্গালা দেশে আট শত বৎসর পূর্ব্বে হয়তো একশত জন মুসলমান খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। সেদিন পুরাণ একখানা মাসিক পত্রিকায় পড়িয়াছিলাম—বোধ হয় প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখা—যে, আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে শতকরা পাঁচজন মুসলমান ছিল কিনা সন্দেহ। এই আড়াই শত বৎসরের মধ্যে অর্দ্ধেকের অধিক লোক মুসলমান হইল কি প্রকারে? ইহাদের কেহই আরব, পারস্য, ইরাণ প্রভৃতি দেশ হইতে আসে নাই। ইহাদের প্রত্যেকের শরীরেই হিন্দুরক্ত প্রবাহিত। এই যে আড়াই

শত বৎসরের মধ্যে অর্দ্ধেকের অধিক লোক মুসলমান হইল, ইহার মূল খুঁজিয়া দেখিলে দেখিব যে ইহা সমাজের অত্যাচার;—নীচ জাতীয় হিন্দুগণকে অপমান লাঞ্ছনা, ঘৃণা করার ফল। আজও হিন্দুগণ তাহাদের হিন্দুজাতীয় নীচ ভাইগণকে কিরূপ ঘৃণা করে, এবং হিন্দুসমাজে কয়জন লোক জলচল নীচের তালিকা হইতেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে।

হিন্দুজাতির উপজাতির তালিকা

উপজাতি			সংখ্যা	বিবরণ	
আগরওয়ালা	...	...	৬২১১	...	
বাগ্দি	...	...	৮৮৬৮২১	...	
বৈদ্য	...	...	১০২৮৭০	জলচল	
বৈষ্ণব	...	...	৩৭৭৬৯২	জলচল (সমস্ত নয়)	
বারুই	...	...	১৮৫৫২৬	...	
বাউরি	...	...	৩০৩৬১৩	...	
ভুইমালী	...	...	৮১৭৯৬	...	
ভুইয়া	...	...	৬৪৫৮৪	...	
ভূমিজ	...	...	৭৯১২৪	...	
ব্রাহ্মণ	...	...	১৩১৪৪৩০	জলচল	
চামার	...	...	১৪৭৬৫৪	...	
চাষা ধোপা	...	...	১৩০৪৪	...	...
ধোবা	...	...	২২৭২৯৫	...	...
ডোম	...	...	১৪৭৮৫৯	...	...
ডোসাধ	...	...	৩৯৫২৯	...	...
ডামই	...	...	৬৯০৫	...	...
গন্ধবণিক	...	...	১৩৯৯৮১	...	...
গারো	...	...	৪৪৬১	...	...
গোয়ালা	...	...	৫৬২৫৯৭	জলচল	
গুরাঙ্গ	...	...	১৪৭২৭	...	...
হাড়ী	...	...	১৪৩৫৯৩	...	...
যুগী	...	...	৩৬৫৮৯১	...	...
কাহার	...	...	১২০৮৪১	...	...
চাষী কৈবর্ত্ত	...	...	২২০৬৩৪৮	জলচল	
জালী কৈবর্ত্ত	...	...	৩৮৩২২৫	...	...

উপজাতি			সংখ্যা	বিবরণ	
কালু	...	...	৯৫৭৯৬	...	...
কামার	...	...	২৫৬৮৫৩	জলচল	
কাউরা	...	...	১১০১৪১	...	..
কাপালী	...	...	১৫৪৮৪৫	...	..
কায়স্থ	...	...	১২৯৩৯০৩	জলচল	
খাম্বু	...	...	৫৬৭৪৪	...	..
কামী	...	...	১৫৩৬১	...	..
খান	...	...	৬৮৫৯	...	..
ক্ষত্রিয়	...	...	২৬১১৬	জলচল	
কোচ	...	...	১৩১২৭২	...	..
কুমার	...	...	২৮৪৫১৪	জলচল (অল্পাংশ)	
কুর্ম্মী	...	...	১৭৯৩৬০	...	..
লিম্বু	...	...	২১৪৭৪	...	..
লোহার	...	...	৬৫০৯২	...	..
মাল	...	...	১১৭২৭১	...	.
মালী	...	...	৫৬৫১৩	...	..
মালো	...	...	২২১১৯২	...	..
মানসর	...	...	১৭৩৭৮	...	..
মুচী	...	...	৪১৭২৫০	...	..
মুণ্ডা	...	...	৩৬৫৫২	...	..
নমশূদ্র	...	...	২০০৪৯১১	...	..
নাপিত	...	...	৪৪৪০২৩	জলচল	
নেওয়ার	...	...	১১০৬৭	...	..
নুলিয়া	...	...	৫৪৭১২	...	..
ওরায়ন	...	...	৬৩৮২২	...	..
পাটনী	...	...	৪৩৭৮৪	...	..
পোদ	...	...	৫৭৫৯৯৪	...	..
রাজবংশী	...	...	১৬৬৩৯৪৮	জলচল	
রাজপুত	...	...	১২৩৪২২	জলচল	
সদগোপ	...	...	৫৩৩২২০	জলচল	
সাঁওতাল	...	...	১৫৮২৮০	...	
সরকী	...	...	২০৩৬	...	

উপজাতি			সংখ্যা	বিবরণ	
সাহা	...	...	৩৫৪৭৭০	...	...
সোনার	...	..	৪৫৬৬৪	...	...
সুবর্ণবণিক	...	...	১১৬৩২৬	জলচল (কিছুঅংশ)	
শূদ্র	...	...	৯৬০৮২	...	...
সুনরী	...	...	৯২২৪৬	...	...
সুনওয়ার	...	...	৪৩৬৪	...	...
সুত্রধর	...	...	১৬৪৩৬৩	...	...
তাম্বুলী	...	...	৪৬০০৪	...	...
তাঁতি	...	...	৩১৮০৪৮	...	...
তেলী / তিলি	...	...	৩৯৫৩৫৩	... জলচল	...
টিপারা	...	...	১২০৬৫৭	...	...
টিয়ার	...	...	১৭৫৬২২	...	...
৭০			২০৮০৯১৪৮	১৫	

২০৮০৯১১৮ জন হিন্দু ৭০টী উপজাতিতে বিভক্ত। ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। মিল থাকা তো দূরের কথা, এক উপজাতি অন্য উপজাতির হাতের জলপান করিতে নারাজ। ৭০টী উপজাতির মধ্যে মাত্র পনরটী জাতি জলচল। মোটামুটি একটা হিসাব করিলে ৮০০০০০০ লোক জলচল। অন্যান্য ৫৫টী উপজাতি তথাকথিত উচ্চজাতি দ্বারা ঘৃণিত, নিষ্পেষিত, অপমানিত। তাহারা যেন একটা পৃথক্‌জাতি; তাহাদের সহিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চজাতির কোন সম্বন্ধ নাই। এমন কি তাহারা বাড়ীর ভিতর উঠানে প্রবেশ করিলে, বা বসিলে, সেস্থানে গোময় দেওয়া হয়, এমন নিকৃষ্ট তারা। এক কথায় তাহারা অস্পৃশ্য। গৃহে কুকুর বিড়ালের স্থান আছে, কিন্তু হিন্দু হইয়া তাহারা হিন্দুর বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারে না। আজকাল হিন্দুগণ অনেকেই খ্রীষ্টান এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, ইহার প্রধান কারণ, তাহারা হিন্দু হইয়াও হিন্দুর নিকট অস্পৃশ্য। আজ যদি উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ তাহাদিগকে বুকে টানিয়া লইত, অস্পৃশ্য বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা না করিত, তাহা হইলে হিন্দুসমাজ আজ এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িত না। আজ যদি হিন্দুগণ এই সকল অস্পৃশ্য হিন্দুগণকে বুকে তুলিয়া না লয়, তাহা হইলে হিন্দুর পতন অবশ্যম্ভাবী। দুদিন পরে ইহা হইবে যে, অস্পৃশ্য হিন্দুগণ উচ্চবর্ণের হিন্দুগণকে কোন বিষয়েই সাহায্য করিবে না। মুসলমানগণ যদি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতীয় লোককে জোর করিয়া মুসলমান করে, তাহা হইলেও অস্পৃশ্য হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে বাধা দিবে না। বাধা দিবেই বা কেন, হিন্দু মরিলেই বা কি

বাঁচিলেই বা তাহাদের কি ? এরূপ করাটা অস্বাভাবিক নহে। আজ যদি হিন্দু জাতি-হিসাবে বাঁচিতে চায়, তবে তাহাকে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিয়া সকলের সহিত একাসনে বসিতে হইবে। আজ হিন্দুসমাজ সংগঠনের একটা প্রচেষ্টা চলিতেছে; কিন্তু যতদিন না উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ চামার, মুচি, নমশূদ্র প্রভৃতি উপজাতিকে সমাজে টানিয়া লইবে ততদিন হিন্দু-সংগঠন সম্ভবপর নহে।

হিন্দুর সংখ্যা দিন দিন কমিতেছে, আর অন্যান্য সমাজের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার প্রধান কারণ হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন নাই। সমস্ত বাঙ্গালা দেশে ৯৯৫০৮২৫ জন স্ত্রীলোক আছে। ইহার ভিতর ২৫২৮৮০৩ জন বিধবা স্ত্রীলোক অর্থাৎ এক চতুর্থাংশের অধিক স্ত্রীলোক বিধবা। সমস্ত বঙ্গে ১২৩৯১৮১৭ জন মুসলমান স্ত্রীলোক আছে; উহার মধ্যে মাত্র ১৯২৪০১১ জন বিধবা; অর্থাৎ মাত্র এক সপ্তমাংশ স্ত্রীলোক বিধবা। আমরা নীচে একটা তালিকা দিতেছি উহা হইতে বুঝা যাইবে যে বিধবা বিবাহ না দিয়া হিন্দুগণ কি ভাবে দিন দিন ধ্বংসের দিকে যাইতেছে।

(০—৫)	পাঁচ বৎসরের	নীচের	বয়সের	১৪৩৯	জন	বিধবা
৫—১০	১০	„	„	৮৭৫৯	„	„
১০—১৫	১৫	„	„	৬৬৩২৩	„	„
১৫—২০	২০	„	„	৯৬৪৭০	„	„
২০—২৫	২৫	„	„	১৫১০৮৬	„	„
২৫—৩০	৩০	„	„	২৩০৭৯৩	„	„
৩০—৩৫	৩৫	„	„	২৬৫৪৮২	„	„
৩৫—৪০	৪০	„	„	২৬৮৮৬১	„	„
				১০৫৫২৪৫		

এই সাড়ে দশ লক্ষাধিক বিধবার বয়স ৪০ বৎসরের কম। ইহারা সকলেই সন্তান প্রসব করিতে সমর্থ। ইহাদিগকে জোর করিয়া সমাজ নির্য্যাতন করিতেছে, অকারণে শিশুহত্যা, ভ্রূণহত্যা করিয়া ধরিত্রীর পাপ বৃদ্ধি করিতেছে। ইহারা যদি বিবাহ করিতে পারিত তাহা হইলে হিন্দু-জনসংখ্যা যে বৃদ্ধি পাইত তাহা বলাই বাহুল্য।

মুসলমান সমাজে ৪০ বৎসরের কম মাত্র ৬৫৩৬৯২ জন বিধবা আছে। ইহারা বিধবা হইলেও জনসংখ্যা হ্রাস হইবে না; কেন না ইহারা পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে। হিন্দু আজ একবার চাহিয়া দেখ তোমরা কোথায় চলিয়াছ। আবার দুদিন পরে কোথায় গিয়া পৌঁছিবে। হয়তো তখন তোমার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। যদি জাতি হিসাবে বাঁচিতে চাও তবে কুসংস্কারগুলি দূর কর। তোমরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পার তবেই তোমার মুক্তি; তবেই হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্ভব।

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

তৃপ্তি

(১৫)

বৃন্দাবনে তীর্থানন্দ বাবাজির আশ্রমে গিয়া মিনতি মুগ্ধ হইল। সেখানে মন্দির আছে, পূজার্চ্চনা আছে, পুরোহিত আছে, পুণ্য আছে, পাপ আছে, বুজরুকি ঠকামি প্রভৃতি ধর্ম্মস্থানের অপরিহার্য্য যে সকল উপকরণ সবই আছে,—সে সব মিনতি চাহিয়াও দেখিল না,—সে দেখিল কেবল তীর্থানন্দকে। প্রকৃত সাধক বটে! সুখ দুঃখে তাঁর সমজ্ঞান, বাহ্যিক কোন বস্তুর প্রতিই তাঁর আসক্তি নাই। অহোরাত্র কেবল সাধন-ভজন লইয়াই আছেন—শিষ্যগণ ভজন গাহিতেছে আর মাঝে মাঝে তিনি ধ্যানস্থ হইতেছেন।

মিনতি তাঁর কাছে অনেক অনুনয় করিল। তিনি অনেক দিন ঘুরাইয়া শেষে মিনতিকে বলিলেন, "তু সকোগী মাই, তুঝকো মৈঁ দীক্ষা দুঙ্গা।"

মিনতি তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা লইয়া কৃতার্থ হইয়া ফিরিল।

ফিরিবার পথে তাহারা হরিদ্বারে গেল। সেখান হইতে প্রয়াগ। মিনতি বলিল, প্রয়াগে থাকা হইবে না, কেবল ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া এক বেলা আহার করিয়াই কাশী যাত্রা করিতে হইবে। রমেন ইহাতে অপ্রসন্ন হইল। তবু এই সুযোগ টুকুর যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিবার জন্য সে একবার ফাঁক পাইয়া ছুটিয়া গেল শিশিরের ঠিকানায়।

শিশির সে দিন স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। রমেন হতাশ হইয়া ফিরিল। রামধারী বাড়ী ছিল, তার কাছে খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিয়া সে ফিরিল।

তার পর কাশী ঘুরিয়া তাহারা চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসিল। আত্মীয় স্বজনদের আশা পূর্ণ হইল না।

ফিরিয়া আসিয়া মিনতি পরিপূর্ণরূপে ধর্ম্মজীবনে আত্ম সমর্পণ করিল। গুরুর উপদেশ অনুযায়ী সে সাধন ভজন করিতে লাগিল। বৃন্দাবন হইতে লক্ষ্মীনারায়ণের এক ধাতুময়ী মূর্ত্তি সঙ্গে আনিয়াছিল, ঘরে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে তার সেবা পূজা করিতে লাগিল। অবসর সময়ে পূর্ব্ববৎ তোতারামের সঙ্গে সে ধর্ম্মালোচনা করিত।

তার দিনগুলি বেশ একরকম কাটে, কিন্তু দিদি ও বৌদিদিরা তার দশা দেখিয়া অশ্রু-মোচন করেন।

শিশিরের যে শুইবার ঘর ছিল সেখানায় তালা বন্ধ থাকিত। তাহা ঠিক পূর্ব্বের মত সাজান-গুজান ছিল। দেয়ালের উপর ছবির ভিতর হইতে ঠিক আগের মত, অপূর্ব্ব ভ্রূভঙ্গীর সহিত বিদ্যুৎ চাহিয়া থাকিত। রোজ দুবেলা তালা খুলিয়া ঘরখানা ঝাড়া-পোঁছা হইত, তার পর আবার তালা বন্ধ হইত। মিনতি এঘরে বড় আসিত না।

সেদিন মিনতি নিজেই ঘর খানা ঝাড়িতে গেল। সকাল হইতে তার মনটা খাঁ খাঁ করিতেছিল। শেষ রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, শিশির আসিয়া তাকে ভয়ানক তিরস্কার করিতেছেন, বলিতেছেন যে তোতারাম দিলীপ নয়, তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে। ঘুম ভাঙ্গিয়া তার মনটা এই জন্য ভারী খারাপ হইয়া গেল। সে দিন সে তোতারামের রামায়ণ পাঠ শুনিতে গেল না। স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া নিজেই সব ঝাড়া-পোঁছা করিতে লাগিল।

ঘরে ঢুকিতেই বিদ্যুতের ছবিখানার উপর তাহার চোখ পড়িল। সে চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া তার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। ক্রমে অশ্রু দুই গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

সেদিকে চাহিয়া সে আপন মনে বলিল, "ভাগ্যবতী, তোমার হিংসা ক'রেছিলাম আমি। বড় দর্প ক'রে তোমার আসনে ব'সতে এসেছিলাম তোমার গৌরব ম্লান ক'রে দেব বলে। তাই বুঝি ভগবান নিঃশেষ করে চূর্ণ করে' দিলেন আমার সব দর্প!" অনেক ক্ষণ সে দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইল।

টেবিল ঝাড়িতে গিয়া তার এক পাশে দেখিল একথাক বই পড়িয়া রহিয়াছে। তুলিয়া দেখিল, এ তারই সেই "লেখা"।

কত স্মৃতি, কত দুঃখ, কত অভিমান এই বই খানা দেখিয়া তার অন্তরে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অবাধে তার অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। একখানা বই হাতে করিয়া সে খাটের উপর শুইয়া পড়িল।

শুইয়া শুইয়া সে একটি একটি করিয়া কবিতা গুলি পড়িল। শিশির যে গুলির ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিল, সে গুলি সে বার বার পড়িল। "মাতৃহারা" কবিতাটা পড়িতে পড়িতে বার বার তার চোখ জলে ছাপাইয়া উঠিল।

সে বার বার সে কবিতাটা পড়িয়া গেল। যে মাতৃহৃদয়ের প্রথম আভাস সে পাইয়াছিল তার বিশবৎসর বয়সে, আজ সে হৃদয় পল্লবিত হইয়া ফুলে ফলে শোভিত হইয়াছে। কিন্তু যে একদিন এ হৃদয়ের অসামান্য সম্মান করিয়া তাহাকে ধন্য করিয়াছিল সে আজ কোথায়? আজ তার এ মাতৃত্বের সমাদর করিবার তো কেউ নাই। তার একথা বুঝিতে বাকি নাই যে তার আত্মীয় স্বজনের ভিতর কেহই তোতারামের প্রতি তার অপরিসীম স্নেহের বিশেষ কোনও সমাদর করেন না। অনেকে বরঞ্চ একথা লইয়া তাকে গঞ্জনাই দিতে চান।

তার মনে পড়িল যে স্বামীর কাছে যেদিন সে শুনিল যে তিনি এই কবিতা পড়িয়া স্থির জানিয়াছিলেন মিনতি দিলীপের মা হইবার যোগ্য, সেদিন তার বুক কি আনন্দে ফুলিয়া উঠিয়াছিল। সে সেই দিন মনে মনে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিল যে পরের ছেলের মা কেমন

করিয়া হইতে হয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত সে জগতে রাখিয়া যাইবে। কিন্তু বিধাতা তার অন্তরের সে দর্প শুনিয়াছিলেন, তাই ঠিক সেই সময়েই তিনি তার সে গৌরবের অবসর হরণ করিলেন। আর যখন সে অশ্রুজলে ভিজিয়া সে অবসর সংগ্রহ করিল, যখন তার হৃদয় পরের ছেলের উপর মাতৃস্নেহে ছাপাইয়া উঠিতেছে, তখনও বিধাতা তার গৌরব সম্পূর্ণ হরণ করিয়া লইয়াছেন। তার এ কাজে তাকে ভাল বলিবার তো কেউ নাই।

কে বলিবে? কার গরজ? স্বামী যাকে ত্যাগ করে, স্বামী যার সমাদর করে না, সে নারী যে জগতে কারও কাছে কোনও সম্মান পায় না। তার যে কোনও মূল্যই নাই। হোক না সে বিদুষী, মহীয়সী—হোক না সে দেবী! হায় স্বামী, এত লোভ দেখাইয়া অবোধ বালিকাকে মুগ্ধ করিয়া এমন করিয়া তার সকল প্রতিষ্ঠা সব সম্পদ হরণ করিয়া লইলে? ইহাই কি ধর্ম্ম? ভগবান কি অন্ধ?

তার পর তার যেন দিব্য চক্ষু খুলিয়া গেল। মূর্খ মূর্খ সে! কি মায়ায় অন্ধ হইয়া ভগবানকে অন্ধ বলিতেছে! এ যে লীলাময়ের লীলা। দর্পহারী যে চিরদিন এমনি করিয়া দাম্ভিকের দর্প হরণ করিয়াছেন।

"অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতিমন্যতে"--এই মোহ হইতেই জীবের যত দুর্গতি। যার এ মোহ আছে তাকে যে ভগবান চিরদিনই এমনি শাস্তি দিয়াছেন। স্বয়ং অর্জ্জুনও এ শাস্তি হইতে মুক্তি পান নাই। এ যে তাঁর একটা খেলা। তাঁর প্রিয়তমা রাধাকেও যে তিনি প্রেমের অভিমানের জন্য কাঁদাইয়াছিলেন, দাম্ভিক মিনতির কেন এ শাস্তি হইবে না?

তীর্থানন্দ বাবাজী তাকে খুব অল্প উপদেশই দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি একটা কথা তাকে বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "মা, অভিমানের চেয়ে বড় শত্রু নেই, অভিমানের চেয়ে পাপ নেই। কে আমি? ভগবানের এ বিচিত্র লীলায় একটা সামান্য খেলার সামগ্রী। গোলা নিয়ে ছেলেরা খেলা করে—খেলাটা সার্থক হয় এই জন্য যে—ছেলে গোলাকে যেমন ক'রে গড়িয়ে দেয় সে গোলা তেমনি গড়িয়ে যায়। কিন্তু যদি গোলার একটা অভিমান থাকে, সে যদি মনে করে আমি নিজেই গড়িয়ে যাচ্ছি, স্পর্দ্ধা ক'রে যদি সে উল্টা পথে যায়, তবে কি হয় বল দেখি। খেলা মাটি হ'য়ে যায়, আর যে খেলে সে সেই গোলাটাকে গুঁতো মেরে ঠিক পথে টেনে নিয়ে আসে। জীবকে নিয়ে ভগবানের লীলা ঠিক এমনি। অভিমান ক'রেছ কি ম'রেছ।"

এ কথা মনে হইয়া মিনতির চিত্ত অপূর্ব্ব শান্তিতে ভরিয়া উঠিল। সে হাত জোড় করিয়া ভগবানের পায় আপনার প্রণাম জানাইয়া বলিল, "আমাকে তোমার আপনার ক'রে নেও প্রভু, মুছে দেও আমার অভিমান! তোমার খেলার পুতুল আমি, আমার উপর দয়া কর প্রভু।"

সে উঠিল। বিছানা হইতে উঠিয়া সে বিছানাটা ঝাড়িয়া পাট করিয়া রাখিল। পরম আদরের সহিত সে বিছানা পাট করিল, যেন সে একটা জীবন্ত জিনিষ। এ শয্যার উপর কত না লোভ ছিল তাঁর, কত আশা করিয়া সে এ শয্যার পানে চাহিয়াছিল। কিন্তু একদিনও সে এ শয্যায় স্বামীর পাশে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। লীলাময়, এমনি করিয়া দীনা নারীকে শাস্তি না দিলেই কি চলিত না? আবার অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

তারপর ধীরে ধীরে ঘর দুয়ার পরিষ্কার করিয়া সে টেবিলের কাছে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

ভাবিয়া ভাবিয়া সে স্থির করিল যে শিশিরকে এখন সংবাদ দেওয়াই ভাল। সে আসিয়া একবার দেখিয়া যাক। ইহাই তার স্পষ্ট কর্ত্তব্য। ইহাতে যদি তার যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইতে হয় তাও সহিতে হইবে। শ্রীভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।

সে ড্রয়ার হইতে একখানা পুরাতন টেলিগ্রাফের ফরম বাহির করিয়া শিশিরের নামে একখানা টেলিগ্রাম লিখিল। তার পর অনেকটা প্রশান্ত চিত্তে বাহির হইয়া সে ঘর বন্ধ করিয়া রাখিল। চাকরকে দিয়া টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিয়া সে তোতারামের ঘরে গেল।

তোতারাম তখনও রামায়ণ পাঠ করিতেছিল। প্রসন্ন হাস্যে তোতারাম তাহাকে অভিনন্দন করিল। মিনতি স্থিরভাবে বসিয়া শুনিয়া গেল। তোতারাম পড়িতেছিল নির্ব্বাসিতা সীতার বিলাপ কাহিনী। শুনিতে শুনিতে মিনতির দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

(১৬)

কাশীতে বাস করা স্থির করিয়া শিশির রীতিমত কাশীবাসী হইয়া গিয়াছিল। সে গঙ্গাস্নান করে, বিশ্বনাথ দর্শন করে, তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ায়, সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ করে, ভাণ্ডারা দেয়।

ক্রমে তার দুঃসহ ব্যথার ঝোঁক এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। সে এই সব লইয়াই বেশ মাতিয়া গেল। এ জীবনে সে এমন একটা তৃপ্তি পাইল যে তাতে আর তার ঘরে ফিরিবার কোনও আকাঙ্ক্ষা রহিল না। তা ছাড়া দিলীপের প্রথম গৃহত্যাগের সংবাদের ধাক্কায় তার মনে মিনতির উপর হঠাৎ যে বিরাগ উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিরাগ তার মন হইতে কিছুতেই দূর হইল না। মিনতির নাম স্মরণ করিতে তার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া একটা প্রচণ্ড আগুন জ্বলিয়া উঠিত, তার অসহ্য জ্বালায় সে অস্থির হইয়া উঠিত। মিনতির কোনও দোষ সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিত না, তাকে শাস্তি দিবার কোনও হেতু খুঁজিয়া পাইত না, কিন্তু তার সঙ্গে বাস করাও তার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই মিনতি যখন তাহার ঘরে রহিয়াছে তখন তাহাকেই ঘর ছাড়িতে হইল।

কিছুদিন পরে শিশিরের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ক্রমে ফিরিয়া আসিল। ক্রমে সে পড়াশুনা

খেলাধূলা আড্ডা প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ চালাইতে লাগিল। পুত্রের অভাব-দুঃখ এক এক সময় তার মনের তলা হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস টানিয়া আনিত। কিন্তু সেকথা এখন মনে হইত কম।

ধর্ম্মজীবনে সে খুব বেশী অগ্রসর হইতে পারিল না। বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের ধর্ম্ম বিষয়ে সে যথেষ্ট অবহিত হইল। সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখাশুনা ও আলাপ করা সে ধর্ম্মের অঙ্গ স্বরূপে করিত। কিন্তু ধর্ম্মকে গভীর ভাবে জীবনের ভিতর গ্রহণ করিয়া গভীর চিন্তার সহিত তার তত্ত্ব আত্মগত করিবার কোনও চেষ্টা সে করিত না। দার্শনিক সে কোনও দিনই ছিল না, তার চিত্তের গভীরতার চেয়ে প্রসার ছিল অনেক বেশী। সে রাজ্যের বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করিত, কিন্তু কোনও বিষয়েরই তলা পর্য্যন্ত আলোচনা করিতে পারিত না। দারুণ দুঃখে গৃহত্যাগ করিবার পর হইতে তার এই ভাবটা আরও বাড়িয়া গেল। সে কোনও জিনিষেই মনটা ডুবাইয়া দিত না, জীবনটাকে উপর উপর ভাসা ভাসা ভাবে সে নাড়াচাড়া করিত, ভাবনা চিন্তা করিতে সে ভয় পাইত।

তার পূজা-অর্চ্চনা ছিল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। পূজার প্রত্যেক পদের পরিপূর্ণ সৌষ্ঠবের প্রতি, মন্ত্রোচ্চারণে প্রত্যেক অক্ষরের শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি সে এত বেশী মনোযোগ করিত যে তার অর্থের ভিতর প্রবেশ করিবার তার অবসর হইত না। দিনে সে সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিত। কাশীর পণ্ডিতদের কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ সম্বন্ধে সে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। নিখুঁত পরিশুদ্ধ ভাবে সে প্রত্যেকবার মন্ত্র উচ্চারণ করিত। কর গণনায় কোনও ভুল ভ্রান্তি যাহাতে না হয় সেদিকে তার দৃষ্টি প্রখর ছিল। কিন্তু সহস্রবার 'ধীমহি' বলিয়া জপ করিয়াও গায়ত্রীর উপাস্য দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধে ধ্যান সে কোনও দিনই করিত না, ধ্যান করিবার কোনও প্রয়োজনই সে অনুভব করিত না।

পরিণত বয়সে এমনি অনেক ভদ্রলোক কেবলমাত্র কাশী বাস করিয়া পুণ্যার্জ্জন করিবার লোভে এখানে থাকেন। শিশির তাদের দলে মিশিয়া গেল এবং দল জাঁকাইয়া তুলিল।

শিশির তার বন্ধুদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া মাঝে মাঝে নানা তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইত। এমনি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানাস্থান বেড়াইয়া সে কিছুদিন প্রয়াগে গিয়া বাস করিল।

মাঝে মাঝে সে খবরের কাগজ পড়িত। একদিন একটা কাগজে সে মিনতির প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখিল। তোতারাম আসিবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত মিনতি সে বিজ্ঞাপন বরাবরই প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। বিজ্ঞাপনটা দেখিয়া শিশিরের মনে একটা ধাক্কা লাগিল। একবার তার মনে হইল সে মিনতির উপর দারুণ অবিচার করিয়া তার জীবনটা ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। তার তো কোনও দোষ নাই, সে তো দিলীপকে তাড়ায় নাই। বরং দিলীপ তার প্রতি অবিচার করিয়া গিয়াছে—বিজ্ঞাপন পড়িয়া তার মনে হইল যে তাহাতে মিনতির অন্তরের ব্যথা অতি করুণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

একবার তার মনে হইল, ভাল হইতেছে না। মিনতির কাছে তার ফিরিয়া যাওয়াই উচিত। এতদিন পর তার একবার মনে হইল মিনতির অশেষ গুণ, অসাধারণ বুদ্ধি ও হৃদয়ের অতল গভীরতার কথা!—যেসব গুণে সে মুগ্ধ হইয়া প্রথমে আত্মহারা হইয়াছিল সেগুলি তার মনের তলা হইতে ফুঁড়িয়া বাহির হইল। মিনতির অনেকগুলি কবিতা যাহা সে সহস্রবার আবৃত্তি করিয়াছে, তাহা তার চিত্ত আলোড়িত করিয়া তুলিল। একবার ইচ্ছা হইল মিনতির কাছে ফিরিয়া যায়।

কিন্তু ছি! কোন মুখে আজ সে ফিরিয়া যাইবে? বড় দম্ভ করিয়া সে মিনতিকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল; প্রেমের চেয়ে তার কল্পিত পিতৃত্ব-গৌরবকে বড় করিয়া সে খুব একটা পৌরুষ দেখাইয়া আসিয়াছে। আজ আবার সে কোন লজ্জায় দাঁতে কুটা লইয়া ফিরিয়া যাইবে। উপায় ছিল যখন মিনতি তাকে দেশে ফিরিতে লিখিয়াছিল। তখন তো সে সে-নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তার উত্তর পর্য্যন্ত দেয় নাই। তারপর তো মিনতি আর চিঠি লেখে নাই, আর অনুরোধ করে নাই।

সঙ্গে সঙ্গেই তার একথাও মনে হইল যে মিনতির প্রথম পত্রের ভিতরও বিশেষ অনুনয়ের ভাব ছিল না, বরং ঔদ্ধত্যই বেশী ছিল। সে নিজের জন্য কিছু চায় নাই, ক্ষমা চায় নাই, করুণা ভিক্ষা করে নাই, শুধু লিখিয়াছিল, "তুমি ফিরে এসো আমি চলে যাচ্ছি।" কি দম্ভ! মিনতির তাকে দিয়া কোন প্রয়োজনই নাই! তবে? তবে কেন সে ফিরিবে? মিনতিকে দিয়া কি তারই এত প্রয়োজন? কেন? সে পুরুষ নয়?

সুতরাং তার পৌরুষের সকল গর্ব্ব লইয়া শিশির মিনতিকে অগ্রাহ্য করিল। বিজ্ঞাপন-খানা তখনও তার হাতে ছিল। সে তাহা ফিরিয়া পড়িল। এখন সে তার ভিতর মিনতির স্পর্দ্ধা ও তেজটাই বেশীর ভাগ দেখিতে পাইল। তার মনে হইল, মিনতি তাকে এবং দিলীপকে অনায়াসে অপরাধী স্থির করিয়া তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়াছে এবং অশেষ ঔদার্য্যের সহিত তাহাদিগের ধনসম্পদ ও তাহাদের সংসর্গ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিতেছে। ইস্, এত দর্প! কাগজখানা দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া সে ফেলিয়া দিল।

হাঁ! মিনতি কথা গাঁথিতে জানে বটে! কবির বাক্‌চাতুরী সে শিখিয়াছে ঠিক। মনে যে কোমলভাবের অংশও নাই সে ভাব কথার মার পেঁচে সে ফুটাইতে জানে। কিন্তু শিশিরের কাছে তার মনের কথা লুকাইবে, এতখানি চাতুরী তার নাই। শিশির মিনতির চিন্তা মন হইতে একদম মুছিয়া ফেলিল। সে যে পুরুষ—সে দিলীপের পিতা—বিদ্যুতের স্বামী! মনের ভুলে একটা মায়াবিনীর মোহে মুগ্ধ হইয়া সে একটা কুকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে সত্য। তার জন্য সে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছে—আর তার প্রতিজ্ঞা, স্ত্রী ও পুত্রের স্মৃতির প্রতি তার নিষ্ঠা, কখনও টলিবে না।

সুতরাং শিশিরের জীবন যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল। এলাহাবাদে তার অনেক বন্ধু জুটিল। দাবা, তাস ও সতরঞ্চ বেশ জমিয়া উঠিল—আড্ডা জমিল, ধর্ম্মের আচার নিষ্ঠা ষোল আনা চলিতে লাগিল।

একবার সে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলিয়া কাশ্মীর গেল। মহা আনন্দে সেখানে দুই মাস কাটাইয়া, হিমালয়ের দুঁরারোহ স্থান সমূহ ঘুরিয়া সে প্রয়াগে ফিরিয়া আসিল। ইহার ফলে তার একটা দেশ পর্য্যটনের নেশা লাগিয়া গেল। সে দল জুটাইয়া ক্রমে ক্রমে নানা স্থানে ঘুরিতে লাগিল। তীর্থ অতীর্থ সকল স্থানে সে সমান নিষ্ঠার সঙ্গে পর্য্যটন করিল। একবার এক দল বাঁধিয়া তারা তিব্বত যাত্রা করিল। তারপর নেপাল গেল। সঙ্গে সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিল—সেই সব ধর্ম্মমতের সঙ্গে বঙ্গীয় তান্ত্রিক মতের বাহ্য সাদৃশ্যগুলি লক্ষ্য করিয়া তার মনে হইল বাঙ্গালার তান্ত্রিক ধর্ম্মের বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্বন্ধ স্থাপন করা যাইতে পারে। সে এসম্বন্ধে গবেষণা কবিতে লাগিল।

তাহার পর সে বেলুচিস্থানে গেল, সেখান হইতে ফিরিয়া বরাবর দক্ষিণদিকে গিয়া দক্ষিণাপথ পর্য্যটন করিতে করিতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত গিয়া উপস্থিত হইল। এই ভ্রমণের ফলে সে আবিষ্কার করিল যে ভারতের উত্তর সীমান্ত হইতে দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত হিন্দু নামধারী ব্যক্তিদের সামাজিক আচার বাবহারের অশেষ বৈচিত্র আছে। সে পথে যাইতে যাইতে এই সব আচারের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া চলিল, কাশ্মীর হইতে পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে পরিবর্ত্তন এক ধারায় চলিয়াছে, আবার সিন্ধু গুজরাট মহারাষ্ট্রের ভিতর দিয়া আর একটা পরিবর্ত্তনের ধারা চলিয়া গিয়া অনেকটা ধীরে ধীরে মালাবার উপকূলের মরুমকাট্টায়াম ও আল্যা সন্তানম্ বিধির ভিতর মিলাইয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম ও আচারের এই বিবিধ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া তার চিন্তার ধারা ভারতের লোক-ইতিহাসের ক্রম-বিকাশের পথে প্রবাহিত হইল। তার মনে অনেকগুলি থিওরী গড়িয়া উঠিল। পণ্ডিতদের সঙ্গে সে এসব বিষয়ে আলোচনা করিল, আর ভারতের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাস ও জাতিতত্ব বিষয়ে নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া দিল।

যখন তীর্থ ঘুরিতে ঘুরিতে মিনতি প্রয়াগে আসিল তখন শিশির এই সব গবেষণার ভিতর ডুবিয়া রহিয়াছে। সে দিনরাত বসিয়া বসিয়া পড়াশুনা করে। তার তাস পাশার ঝোঁক কাটিয়া গেল—আড্ডায় তাকে প্রায় দেখাই যায় না। সে কেবল পূজার্চ্চনা ত্রিবেণী স্নান প্রভৃতি ধর্ম্মাচার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমস্ত অবসর অধ্যয়নে নিযুক্ত করিতে লাগিল।

(১৭)

রামধারী ছিল শিশিরের অনেক দিনের পুরাতন চাকর। যতদিন বিদ্যুৎ বাঁচিয়া ছিল ততদিন সে তার স্বামীর কাছে চাকর বাকর বড় ঘেঁসিতে দিত না। শিশিরের কাজকর্ম্মের

অবসরে যতটুকু সময় সে বাড়ীতে থাকিত ততক্ষণ বিদ্যুৎ তাকে সম্পূর্ণ একচেটে করিয়া রাখিত। স্বামীর যখন যে সেবার প্রয়োজন তাহা সে নিজেই করিত। তামাক সাজা হইতে আরম্ভ করিয়া কাছারীর পোষাক ঠিক করিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত সবই সে করিত— রামধারী কেবল তফাৎ হইতে সে সেবার জোগান দিত মাত্র।

বিদ্যুৎ মারা যাইবার পর তার ছেলের ভার লইল মালতী, আর স্বামীর ভার আসিয়া পড়িল রামধারীর হাতে। তখন হইতে রামধারীর একান্ত সাধনা হইল বাবুর সেবা। সে বিদ্যুতের সেবা নিত্য নিত্য দেখিয়াছে ;— তার সেবার সে সৌষ্ঠব ও মাধুর্য্য জোগাইবার সাধ্য তাঁর ছিল না, কিন্তু মাইজীর জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে রামধারী এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে বাবুর যখন যে সেবাটুকুর অভ্যাস তাহা সে যথাসাধ্য জোগাইবে। তাই বিদ্যুৎকে হারাইয়া যখন শিশির জগৎ অন্ধকার দেখিল, তখনই সে সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাইল যে এই নীরব কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কদাকার পশ্চিমা ভৃত্যের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বিদ্যুতের অভাবে তার দৈহিক সেবায় কোনওখানেই কোনও ত্রুটী হইতেছে না। কাজেই রামধারী ক্রমে তার কাছে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল।

যখন শিশিরের পুনরায় বিবাহ করিবার প্রস্তাব হঠাৎ বাড়ীতে প্রকাশ হইয়া গেল, তখন মালতী তার পরলোকগতা পালয়িত্রীর জন্য কাঁদিতে বসিল, কিন্তু রামধারী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কেন না রামধারী শিশিরকে তন্ন তন্ন করিয়া চিনিত, তাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। তার নিত্য অক্লান্ত সেবার ভিতর দিয়া সে প্রতিমুহূর্ত্তেই শিশিরের অন্তরের পরিচয় পাইত। সে জানিত যে তার প্রভুর অন্তরের অনেকটা স্থান একেবারে মরুভূমির মত শূন্য উদাস। সে বিরাট মরুভূমির তপ্ত নিঃশ্বাস থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ আসিয়া রামধারীকে দগ্ধ করিত। সে প্রভুর অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া মরিত। সে তার সেবার নিষ্ঠা বাড়াইয়া দিল—যাহাতে শিশিরের আনন্দ, সেই বিষয়ের সন্ধান করিয়া তার আয়োজন করিতে লাগিল। দাবা খেলায় শিশিরের ভয়ানক ঝোঁক—দাবা পাইলে সে আর কিছু চায় না। কিন্তু দাবা তার সঙ্গে খেলিতে পারে কেবল দুটী লোক, একটি দোকানদার এবং এক উকীল। তারা রোজ আসে না, তাই আসরও জমে না। রামধারী রোজ বাবুকে কাছারী পাঠাইয়া ইহাদের সন্ধানে বাহির হইত এবং উপরোধ অনুরোধ করিয়া প্রায় রোজ ইহাদের একজনকে হাজির করিতে লাগিল। ক্লাবে গেলে শিশিরের দিনটা কাটিত ভাল তাই যেদিন বাড়ীতে আড্ডার আয়োজন হইত না সেদিন রামধারী বাবুকে সত্য মিথ্যা নানা কথা বলিয়া ক্লাবে পাঠাইয়া দিত। এমনি করিয়া তার যতদূর সাধ্য সে বাবুর আনন্দ বিধানের আয়োজন করিত, কিন্তু সে বুঝিত তার এসব চেষ্টা মরুভূমে শিশিরবিন্দুর মত।

তাই যখন সে শুনিল যে শিশির বিবাহ করিবে, তখন সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল।

সে বুঝিল যে শিশিরের ক্লিষ্ট হৃদয়ে এতদিনে অজস্র ধারায় শান্তিবারি সেচন হইবে। সে বাঁচিল। মনের আনন্দে সে বাবুর সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিল। বাবুকে বিনোদের বাড়ী পৌঁছাইয়া সে এক ঘণ্টার জন্য ছুটি লইয়া বিনোদের বড় ছেলেকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং তার যত্ন সঞ্চিত অর্থ দিয়া সে নূতন মায়ের জন্য এক জোড়া সোণাবাঁধা শাঁখা ও একটা রূপার সিঁদুর কৌটা কিনিয়া আনিল। বিবাহের পর সে শাঁখা জোড়া ও কৌটাটি মিনতির পায়ের তলায় রাখিয়া সে তাকে প্রণাম করিল। মিনতির প্রসন্ন হাস্য দেখিয়া সে চরিতার্থ হইল—সে বুঝিল এ মা আমার বাবুকে সুখী করিতে পারিবে।

কিন্তু খোকা বাবু যখন সব এলোমেলো করিয়া দিয়া পলায়ন করিল তখন রামধারী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। বাবুর রকম সকম দেখিয়া সে থ' হইয়া গেল। তার ভয় হইল, বুঝি বাবু ক্ষেপিয়া যাইবে। সে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বাবুর পিছু পিছু ছুটিল।

এতদিন যে-শিশিরকে সে চিনিয়াছে, জানিয়াছে তাহাকে সে যেন আর খুঁজিয়া পাইল না। এতদিন যে-সেবায় তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে সে-সেবায় এখন শিশির বিরক্ত হইয়া উঠে। এতদিন শিশিরের কাছে যে-কথা শুনিয়া সে অভ্যস্ত এখন আর সে-কথা শুনিতে পায় না, যে-কাজ করা তার অভ্যাস সে-কাজ শিশির করে না। শিশিরের আহারাদির সৌষ্ঠব সম্বন্ধে বিদ্যুতের যত্নে কতকগুলি অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। নিয়মিত সময়ে আহারাদি না হইলে সে অসুবিধা বোধ করিত। অভ্যস্ত বস্তু খাইতে না পাইলে তার খাওয়া হইত না। তার খাওয়া দাওয়ার ভিতর প্রচুর পরিমাণে সৌকুমার্য্য ছিল। তাই অনেক দেশ ঘুরিয়া অনেক কষ্ট সহিয়া যখন তারা গয়ায় আসিয়া উঠিল তখন রামধারী তার মনের মত করিয়া খাওয়ার আয়োজন করিয়া তার সামনে পরিবেশন করাইল। কিন্তু সে যত্নরচিত খাদ্য দেখিয়া শিশির ক্ষেপিয়া উঠিল। সে খাবারের থালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কিছু ছাতু ও গুড় খাইয়া উঠিল। সুরচিত শয্যা ছাড়া শিশিরের ঘুম হইত না, সে এখন ভূমির উপর মাদুরে শুইয়া রাত কাটায়। আগে শিশিরের মুখে রূঢ় কথা কেউ কোনও দিন শোনে নাই, এখন সে দিনরাত রামধারীর উপর খেঁচ খেঁচ করে।

অনেক দিন রামধারী বাবুর এ নূতন খেয়ালের থই পাইল না। সে সকল দেবতার কাছে মানত করিতে লাগিল, বাবুর সুমতি হউক। একবার বাড়ী ফিরিতে পারিলে নূতন "মাইজির" সেবায় যে তার মতিগতি ফিরিয়া যাইবে সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না। সুতরাং সে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদেবতার কাছে মাথা খুঁড়িয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল বাবু দেশে ফিরুন। খোকাবাবুকে পাওয়া যায় সে ভাল কথা, কিন্তু পাওয়া যাক বা না যাক, শিশিরকে একবার মিনতির হাতে লইয়া ফেলিয়া দিতে পারিলে রামধারী বাঁচে।

যখন বছর কাটিয়া গেল, রামধারীর সকল অনুরোধ তুচ্ছ করিয়া বাবু কাশীতে স্থায়ী

হইয়া বসিয়া গেলেন, তখন রামধারী একেবারে বসিয়া পড়িল। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া কূল পাইল না। একদিন সে রাগ করিয়া বাবুকে বলিল, "এ সব কি ক'রছেন আপনি? ঘর সংসার ভাসিয়ে দিয়ে আপনি এখানে পড়ে র'য়েছেন, যত সব ভণ্ড সাধু সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে হাঁ ক'রে পড়ে থাকছেন, খাওয়া নেই দাওয়া নেই, কাজ কর্ম্ম নেই, এতে আপনার শরীর টিকবে কেন?"

শিশির বলিল, "আর শরীর টিকবার দরকার কি রামধারী?"

"বালাই, ও কথা বলবেন না, ছি। আপনার দুঃখ কিসের? ধন দৌলত আছে, ঘর বাড়ী আছে, লক্ষ্মী মাইজী আছেন—এক ছেলে গেছে, আর কত ছেলে হবে"—

ভয়ানক ধমক দিয়া শিশির বলিল, "চুপ রও হারামজাদা—বড় আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে তোর—শয়তান!"

রামধারী একেবারে ভ্যাবাচেকা খাইয়া গেল। প্রথমতঃ সে কখনও শিশিরের কাছে এমন গালি খায় নাই। তা' ছাড়া গালি খাইবার মত কি কথা সে বলিয়াছে তাহাও সে বুঝিতে পারিল না। সে মুখখানা চূণ করিয়া নীরবে রহিল এবং একটু পরে স্থানান্তরে গিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাটিয়া সে স্থির করিল যে বাবুর আর কোনও আশা ভরসা নাই। সে আর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাবুর দুর্দ্দশা দেখিতে পারিবে না। সে মাইজীর কাছে ফিরিয়া যাইবে। পরের দিন তার এ সঙ্কল্প টিকিল না। সে চলিয়া গেলে যে শিশিরের পক্ষে অচল হইয়া উঠিবে ইহা সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সে তবু বাবুকে কতকটা খাওয়াইয়া পরাইয়া রাখে—এবং যত রাজ্যের কাশীর গুণ্ডা ছাই মাখিয়া বাবুর উপর বাণিজ্য করিতে চায়, তাহাদিগকে কথঞ্চিৎ ঠেকাইয়া রাখে। সে চলিয়া গেলে শিশিরকে সবাই ছিঁড়িয়া খাইবে। তাই সে রহিয়া গেল।

এখন রামধারীর অবসরের অন্ত নাই। বাবুর সেবা শুশ্রূষার বেশী দরকার হয় না, তিনি বাড়ীতেও বেশীক্ষণ থাকেন না। কাজেই রামধারীর সময় আর কাটে না। সে রোজ একবার বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়া বাবুর সুমতির জন্য মাথা খুঁড়িয়া আসে, মাঝে মাঝে জ্যোতিষী ও সামুদ্রিকদের কাছে পয়সা দিয়া বাবুর মতিগতি সম্বন্ধে গণনা করায়, আর বসিয়া বসিয়া গল্প গুজব করে। তার এক দোস্ত জুটিয়া গেল। সে পানওয়ালা, শিশিরের ঘরের নীচের তলায় তার বৃহৎ পানের দোকান—তার নাম ভিখনলাল।

যখন সময় কাটে না তখন রামধারী ভিখনলালের দোকানে বসিয়া গল্পসল্প করে, এক আধটা খরিদ্দারকে পানটা সিগারেটটা হাতে করিয়া দেয়, আর সন্ধ্যাবেলায় সিদ্ধিটা আসটা খায়, কখনও বা দু এক ছিলাম "কড়া তামাক" খায়।

ভিখনলালের কাছে রামধারী মনের সব দুঃখ ঝাড়িয়া ফেলে। তার গল্পের প্রধান বিষয় তার বাবু। রামধারীর সঙ্গে আলাপের এক সপ্তাহের মধ্যে ভিখনলাল শিশিরের সমস্ত জীবনের খুব বিস্তারিত ধারণা সংগ্রহ করিয়া লইল। তারপর তাদের শিশির সম্বন্ধে আলোচনার আর কোনও অসুবিধা রহিল না। ভিখনের কাছে রামধারী সকল লোক ও সকল বিষয় সম্বন্ধে খুব স্বচ্ছন্দ মতামত প্রকাশ করিত, এবং ভিখনলালও তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হইত।

একদিন রামধারী বলিল, "বলো তো ভাই, এতো ছেলে নয় ডাকু। ছেলে ছিল রামচন্দ্র। বাপ বল্লে আর অমনি সে রাজ্য ছেড়ে বনে চলে গেল। আর তুই শালা করলি কি? বাপ বেটা-ছেলে—পুরা জোয়ান, বউ ম'রে গেছে সাদী ক'রেছে—কি মন্দটা ক'রেছে বাপু? তুই শালা অমনি ঘর ছেড়ে চলে গেলি? আরে শালা, যে বাপ তোকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রলে, তোর মুখ চেয়ে চেয়ে বেচে থাকে যে, তাকে এমনি ক'রে তুই মারবি তাই। ছেলে! ঝাড়ু মার অমন ছেলের মুখে! অমন ছেলে আমার হ'ত তো গলা টিপে তাকে মারতাম।"

ভিখনলাল বলে "বেশক্ বেশক্। এমন ছেলে তো ছেলে নয় দুষ্‌মন্।"

রামধারী বলে, "আর তুই বেটা, সুখী মানুষ এত দিন সুখে সুখে থেকেছিস তোর কি এই সাজে। ঘরে এমন বহু আছে এত ধন দৌলত! কিসের দুঃখ তোর। এক ছেলে গেছে এখনো তোর দশ ছেলে হ'বার বয়স আছে। ঘরে যা,' খা' দা' 'বহু' নিয়ে স্ফূর্ত্তি ক'রে থাক। তা নয় এই বিদেশে এসে না খেয়ে দেয়ে যত শালা শয়তান গুণ্ডা ছাই মেখে গাঁজা খেয়ে টং হ'য়ে আছে সবার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াবি; এ তোর পোষাবে কেন বল দেখি?"

শিশিরের মতিগতি যখন কতকটা বদলাইয়া গেল তখন রামধারী অনেকটা আশ্বস্ত হইল, কিন্তু বাবু বাড়ী ফিরিবার নামও করে না দেখিয়া সে অপ্রসন্ন হইয়া রহিল। এখন যেসব বন্ধু বান্ধব বাবুর কাছে আসিতে লাগিল, তাহাদেরকেও রামধারী প্রসন্নদৃষ্টিতে দেখিতে পারিল না।

"আরে বেটা, ঘরে তোর দুঃখ কিসের। সেখানে কত সব আমীর লোক তোর কাছে আসে, কত খাতির তোর! তা না এখানে যত সব লর্জ্‌ঝড়্ নিষ্কর্ম্মা ইয়ার জুটিয়ে তাদের নিয়ে হৈ হৈ, আজ দিল্লী কাল কাশ্মীর পরশু গুজরাট—কোথায় বোম্বাই, কোথায় কন্যাকুমারী—হৈ হৈ ক'রে ছুটে বেড়াস্! কিসের দুঃখে রে বাপু? আর পড়ছেন। বই আনছেন আর পড়ছেন। পড়ে পড়ে হাড় কালি হ'য়ে গেল। আরে তোর সুখের শরীর তাতে এত সইবে কেন? এই শালা রামধারী না থাকতো তো এতদিন শুঁটকী লেগে মরে থাকতিস্। ঐ সব ইয়ার বন্ধুদের কেউ ফিরে দেখতে আসতো না। তখন বুঝতিস বেটা।"

এলাহাবাদের তামাকুওয়ালা ওসমান মিঞার কাছে সে এই মর্ম্মে নানা রকম নালিশ করিয়া তার দোকানে বসিয়া দুই-চার ছিলিম পোড়াইত।

তার নালিশ ছিল সমস্ত বিশ্বের বিরুদ্ধে, স্বয়ং 'মাইজি' মিনতিও তাহাতে বাদ পড়িত না। সে প্রায়ই বলিত, "আর তোকেও বলি, ধন্যি মেয়ে মানুষ তুই। এমন সোণার সোয়ামী তোর ভেবে ভেবে না খেয়ে দেয়ে শুকিয়ে মরছে, আর তুই হারামজাদী কোন সুখে বাড়ীতে ব'সে আছিস। ধন দৌলত নিয়ে ডুবে আছেন—আরে বেটী, বাবুই যদি ফৌত হ'য়ে যায় তবে ধন দৌলতে তোর কি হবে বল। তখন তো এক বেলা ভাতে ভাত খেয়ে সাদা থান প'রে কাটাতে হবে। এ সোজা আক্কেলটুকু তাকে দেননি ভগবান? মেয়েমানুষ, তাদের কতটুকুই বা আক্কেল বল। নইলে সে যদি আসতো বাবুর কাছে, ঘর-দুয়ার সকল ফেলে যদি বাবুর পায়ে লুটিয়ে পড়তো, তবে সব মিটে যেতো। তা' সে হারামজাদার বেটীর তো এদিকে আসবার নামটাও নেই। এত বচ্ছর হ'য়ে গেল, একটাবার মনে হ'ল না—দেখে আসি সোয়ামীটা কি হালে আছে? কলিকাল ভাই কলিকাল। সীতাদেবীর দিন থাকতো মিঞা, তবে কি এমনি হ'তে পারতো? আর এই বাঙ্গালী বাবুদের জাতটাই মেয়েদের সব খারাপ ক'রে দিয়েছে আদর দিয়ে দিয়ে। আমার ঘরে এমন হ'ত তবে জুতা মেরে শালীকে ঢিট্ বানিয়ে দিতাম।"

ওসমান বলিত, "বেশক' এতে আর কি কথা আছে।" এবং সে নিজে যে তার দুই দুইটা স্ত্রীকে কি অপূর্ব্ব পৌরুষের সহিত জুতা মারিয়া ঢিট্ করিয়া রাখিয়াছে সে কথা বিশদরূপে বর্ণনা করিত।

একদিন সে ওসমানের সঙ্গে উমার সম্বন্ধে এইরূপ স্বচ্ছন্দ সমালোচনা করিতেছিল। "সে বেটী আছে আসল শয়তান। বাবুর ঘাড়ে ব'সে বেটী তাঁর রক্ত শুষে খায়। আর চুরি ক'রে ক'রে পেট মোটা ক'রে ফেলেছে। সে পারতো সব ঠিক ক'রে দিতে। আরে তোর তো বুদ্ধি আছে—তুই কোন বহুটাকে নিয়ে বাবুর কাছে এলি? তা নয়—সে বেটী বাড়ী ঘর আগলে বসে আছে—খেয়ে খেয়ে খালি পেট মোটা ক'রছে—একটা বেটা আছে—তার পেট মোটা ক'রছে—আর বাড়ীতে ব'সে আছে। ভাইটা ম'রছে তাতে তার কি আসে যায়?—আসল শয়তানি! কি বলবো ভাই, এই মেয়েমানুষ জাতটার উপর আমি বেজায় চটে গেছি। আর সেই শালা—তার বেটা"—

এমন সময় রমেন আসিয়া বলিল, "এই যে রামধারী ভাই? মামা বাবু কোথায়?"

রামধারী বসিয়া ছিল, তড়াক করিয়া উঠিল। রমেনের সম্বন্ধে তার মতামত চট্ করিয়া বদলাইয়া গেল। যা' হ'ক এ তো অন্ততঃ বাবুর একটা খবর করিতে আসিয়াছে। না করিবে কেন? এরা মায় পোয়ে তো বাবুর খাইয়াই মানুষ। মানুষ তো? এর কি একবার না মনে হইয়া যায় যে, যে তাদের অন্নদাতা সে বেচারা এই কষ্টে আছে।

সে মহাসমাদরে রমেনকে ঘরে লইয়া বসাইলেন। তাহাকে জল খাওয়াইল—খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিল।

বাবু বিন্ধ্যাচল বেড়াইতে গিয়াছেন শুনিয়া রমেন দমিয়া গেল। কিন্তু সে সব কথা খুলিয়া বলিতে সাহস করিল না। তার কাছে রামধারী শুনিল যে মিনতি প্রয়াগে আসিয়াছে। সে উৎফুল্ল হইল, বলিল, "চল বাবু, তাঁকে গিয়ে এখানে নিয়ে আসি। আপনার ঘর থাকতে তিনি পাণ্ডার ঘরে কেন থাকতে যাবেন।"

"আমরাও তো তাই ভেবেছিলাম ভাই ? কিন্তু বাবু নাই, তিনি কি মনে ক'রবেন জানি না, তাই আনতে ভরসা হ'য় না।"

"আর কি মনে ক'রবে ? মনে ক'রলেই হ'ল আর কি ? মাইজী আসুন এসে এখানে সুস্থ হ'য়ে থাকুন, আমি আজ দুপুরের গাড়ীতে গিয়ে বাবুকে নিয়ে আসছি। দেখা শুনা হ'ক।"

"না রামধারী, সে হ'বে না। বাবু না বল্লে মামীমা আসবেন না।"

"হুঁ" বলিয়া রামধারী গম্ভীর হইয়া গেল। সে কতকটা বুঝিল। মিনতি যখন কষ্ট করিয়া এতটা দূর আসিয়াছে তখন আর রামধারীর তার উপর রাগ রহিল না। সুতরাং মিনতির এ অভিমান সে বুঝিল—বুঝিয়া মিনতিকে দোষ দিতে পারিল না। স্বয়ং জানকী মাইওতো অভিমান করিয়াছিলেন। কেনই বা মিনতি না করিবে অভিমান ?

সে বলিল, "হুঁ বুঝেছি। আচ্ছা দেখি ! মাইজী কোথায় আছেন ?"

রমেন বিস্তারিত ঠিকানা লিখিয়া দিল। রামধারী তাহা তার আঙ্‌রাখার পকেটে রাখিয়া দিল।

তারপর রমেন বিদায় হইয়া গেলে রামধারী দরজায় চাবী লাগাইয়া তার লোটা লইয়া পাগড়ী বাঁধিয়া ষ্টেসনে চলিয়া গেল।

বিন্ধ্যাচলে পৌঁছিয়া সে সহজেই বাবুর সন্ধান পাইল। বাবু তখন তার বন্ধুদের লইয়া বনভোজনের আয়োজনে ব্যস্ত।

শিশিরকে নিভৃতে ডাকিয়া রামধারী বলিল, "মাইজী এসেছেন, আপনি এখন চলুন, দুই ঘণ্টা বাদে গাড়ী আছে।"

শিশির খবরটা শুনিয়া এক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তারপর সে বলিল, "তুই সেই গাড়ীতে ফিরে যা' তাঁদের দেখা শোনা করগে' যাতে কোনও অসুবিধা না হয়। আমি আজ ফিরতে পারবো না।"

রামধারী অবাক্ হইয়া গেল। সে একটু মাথা চুলকাইয়া বলিল, "সে ভাল হয় না বাবু"—

ধমক দিয়া শিশির বলিল, "দেখ তুই আমাকে ভালমন্দ শেখাতে আসিস না। চুপ ক'রে যা বলছি তাই ক'রে যা। মুনিবের কথার উপর কথা কইতে সাহস করিস না।"

রামধারীর মাথা কাটা গেল। এমনটা যে হইবে সে তাহা কল্পনা করে নাই। এবং

এজন্য পূর্ব্ব হইতে সে কোনও ভাবনা চিন্তাও করে নাই। উপস্থিত বুদ্ধির বলে কোনও অপ্রত্যাশিত অবস্থার যোগ্য কথা বলা বা যোগ্য কাজ করিবার জন্য রামধারী বিখ্যাত ছিল না। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে একেবারে অকূলে পড়িয়া গেল। সে ঝোঁকের মাথায় বলিয়া বসিল যে সে বাবুকে সঙ্গে না লইয়া ফিরিবে না।

শিশির ভয়ানক চটিয়া গিয়া তাকে গালিগালাজ করিয়া উঠিল এবং যাহা বলিল তাঁহা সংক্ষেপতঃ এই যে যদি সে তা' না পারে তবে সে বিদায় হইয়া শিশিরের দৃষ্টি বহির্ভূত হউক। পরে সাদা বাঙ্গলায় শিশির বলিল "বেরো বেটা! বেরো এখান থেকে।"

রামধারী খুব চটিয়া বাহির হইয়া গেল। সে তখন স্থির করিল যে সে বাড়ী ফিরিয়া তার তল্পী তল্পা লইয়া মাইজীর সঙ্গে চুঁচুড়ায় ফিরিয়া যাইবে। এমন অমানুষ মুনিবের কাছে এমন করিয়া পড়িয়া থাকিবে না।

বাড়ীতে ফিরিয়া কিন্তু সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শিশিরকে ফেলিয়া যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব তাহা সে বুঝিল, কাজেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার বিফল দৌত্যের লজ্জা লইয়া কালামুখ মাইজীর কাছে দেখাইতে তার ইচ্ছা হইল না।

(১৮)

শিশির বিন্ধ্যাচলে ইচ্ছা করিয়া দুদিন দেরী করিয়া ফিরিল। বাড়ীতে আসিয়া উঠিতে তার সঙ্কোচ বোধ হইল। মিনতি হয়তো আছে। সে যখন এতটা পথ আসিয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই শিশিরের সঙ্গে দেখা না করিয়া যাইবে না। দেখা হইলে শিশির কি করিবে? কেমন করিয়া তার সম্মুখে দাঁড়াইবে? কি কথা তাকে বলিবে? এখন মিনতির সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় তার মনে নিজের সাফাই করিবার মত কোনও কথাই জুটিল না।

মিনতি তাকে কি কথা বলিবে তার সে নানারকম মুশাবিদা করিয়া ঠিক করিল। কিন্তু যে কথাই সে মনে করিল তার কোনওটার উত্তরে তার নিজের বলিবার মত কোনও কথাই তার মনে হইল না। এখন তার মনে হইল যে মিনতিকে বিবাহ করা অবধি এপর্য্যন্ত তার সমস্তটা ব্যবহারই অত্যন্ত গর্হিত ও অমানুষিক হইয়াছে। কিন্তু এখন সে আর কি করিতে পারে? এখন মনে হইল যে সব দিক রক্ষা হয় যদি মিনতি ঠিক আদর্শ সতীসাধ্বী বঙ্গ রমণীর মত কোনও কথাবর্ত্তা না কহিয়া অতীত সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন না করিয়া চুপচাপ এখানে থাকিয়া তার সেবা করিতে লাগিয়া যায়। তাহা হইলে সে কৃতার্থ হইয়া মিনতিকে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু তার সন্দেহ হইল মিনতি সে শ্রেণীর মেয়ে নয়। তাহা যদি সে হইত তবে ইহার অনেক পূর্ব্বে সে আসিত। একখানা চিঠি মাত্র সে লিখিয়াছিল, তাতেও সে আপনাকে নত করে নাই। তার উত্তর না পাইয়া এপর্য্যন্ত সে আর চিঠি লেখে নাই,

কোনও সংবাদই সে দেয় নাই। এত বড় যার প্রতিজ্ঞার জোর, এত দর্প যার, সে যে একদম চুপচাপ, যেন কিছু হয় নাই এমনভাবে তার গৃহস্থালীর ভার লইয়া বসিয়া যাইবে এমন সে মনে করিতে পারিল না। তাই সে আসন্ন সাক্ষাতের ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল।

সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ভাবে সঙ্কুচিত পদক্ষেপে সে উপরে উঠিয়া আসিল। রামধারী একপাশে জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল। বারান্দায় বসিয়া মুখ হাত ধুইয়া শিশির সঙ্কুচিত হইয়া তার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। সেখানে কেহ নাই দেখিয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে ঘরে চারিদিকে অত্যন্ত অপরিচ্ছন্নভাবে রাশি রাশি বই ছিল, তার মাঝে একখানা ময়লা চাদর পাতা বিছানা ও তাকিয়া। সেখানে বসিয়া সে বইগুলি লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল, আর বার বার সে পাশের শুইবার ঘরের দরজার দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিল।

রামধারী আসিয়া বলিল, "বিকালে কি রুটী হ'বে না কয়েকখানা লুচী বানাব?"

কি জ্বালা! একথা এ হতভাগা তাকে জিজ্ঞাসা করে কেন?

শিশির বলিল, "লুচিই কর।"

রামধারী আদেশ পাইয়া বাজারে চলিল। শিশিরের বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। এখন তো এ শূন্য গৃহে সে ও মিনতি ছাড়া আর কেহ নাই। এখনি বোধ হয় মিনতি আসিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিবে। সে বেশ সোজা ভাবে খুব গম্ভীর হইয়া বসিল—একখানা মোটা বই খুব মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিল।

ছাই মনোযোগ! তার মন সহস্র আশঙ্কায় পীড়িত হইয়াও সারা বাড়ীময় কেবল খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল একটা পায়ের শব্দ, একটু চুড়ির ঠুনঠুন। অনেকক্ষণ তার কোনও সাড়া না পাইয়া শিশির বইখানা ছুঁড়িয়া ফেলিল। ক্রমে সে উঠিল এবং নিঃশব্দে পায় পায় তার শুইবার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। অত্যন্ত সন্তর্পণে মুখ বাড়াইয়া সে ঘরের চারিদিক দেখিল—মিনতির চিহ্নমাত্রও নাই!

সে তখন ঘরটা একরকম উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল—কোথাও এমন কিছুই দেখিতে পাইল না যাহাতে এ ঘরে কোনও স্ত্রীলোক আসিয়াছিল বলিয়া সন্দেহ হয়।

তারপর শিশির বাহির হইয়া গেল। এই দুটি ঘর ছাড়া এ বাড়ীতে ছিল শুধু রামধারীর থাকিবার একটা ঘর এবং নীচে রান্নাঘর। নীচের অবশিষ্ট ঘর সব দোকান। শিশির ক্রমে ক্রমে সমস্ত বাড়ীটা দেখিয়া আসিল।

অবসন্ন হইয়া সে তার পড়ার ঘরে বিছানার উপর বসিয়া পড়িল।

মিনতির সঙ্গে সাক্ষাতের আশঙ্কায় সে সঙ্কুচিত হইয়াছিল। কিন্তু সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তার মন প্রসন্ন হইল না। সে ভয়ানক দমিয়া গেল। রামধারীর কাছে শুনিয়া

মিনতি নিশ্চয় রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—হয় তো বা কাঁদিয়া গিয়াছে। এ কথা ভাবিতে তার ভয়ানক অনুশোচনা হইল।

রামধারী ফিরিয়া আসিলে তার মনটা ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল তার কাছে মিনতির কথা জিজ্ঞাসা করিতে। কিন্তু কোন লজ্জায় জিজ্ঞাসা করিবে? জিজ্ঞাসা করিলে রামধারী ভাবিবে কি? সে হয়তো একটা শক্ত কথাই বলিয়া বসিবে।

অনেক কষ্টে সে তার উদ্বেগ দমন করিয়া বসিয়া রহিল। আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল, ভাবিতে মন তার ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে চিন্তা করিয়া দেখিল মিনতির সঙ্গে সে নিজের কার্য্যে এতবড় একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে যে কোন মতেই সে তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিবে না।

রাত্রে খাইবার সময় অনেকবার বলি বলি করিয়া, অনেকবার ঢোঁক গিলিয়া শেষে শিশির জিজ্ঞাসা করিল, "এঁরা সব কখন চলে গেল রে রামধারী?"

রামধারী ভ্রূকুটি করিয়া বলিল "পরশু দিন।" আর কিছু বলিল না।

বস্, ফুরাইয়া গেল। আরও তার অনেক কথা জানিবার আছে—মিনতি কি বলিয়াছে, কি করিয়াছে সে সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাস্য আছে কিন্তু কেমন করিয়া সে-কথা জিজ্ঞাসা করিবে?

অনেক কষ্টে শেষে শিশির বলিল, "তা' হ'লে মাত্র একদিন ছিল এখানে?"

রামধারী পূর্ব্ববৎ বিরক্ত ভাবেই বলিল, "তা' হ'বে। আমি জানি না, তাঁরা তো এ বাড়ীতে উঠেন নি।"

এ বাড়ীতে উঠেন নি? বটে? মিনতি ভাবিয়াছিল সে এখানে আসিলেই শিশির ছুটিয়া গিয়া তাকে আদর করিয়া আনিবে। আর সে আদর সে করে নাই বলিয়া অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছে। দুদিন তার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াও যায় নাই। এত তেজ! এত দর্প। কেন? মিনতি তাকে ভাবিয়াছে কি? স্বামী সে, স্ত্রীর উচিত তাকে প্রসন্ন করা, স্বামী যদি রাগ করে তবে নত হইয়া তাকে জয় করা।—তাহা করা দূরে থাকুক মিনতি যখন দেখিল যে শিশির বাড়ী নাই সে একটা দিন অপেক্ষাও করিল না, রামধারীর মুখের একটা কথা শুনিয়াই চলিয়া গেল। ইস্ এত দর্প ভাল নয়। কেন? সে কি পুরুষ মানুষ নয়? মিনতিকে ছাড়া তার এতদিন চলিল আর জীবনের বাকী কয়টা বৎসর চলিবে না?

শিশির ধরিয়া লইল যে রামধারী আসিয়া তার সঙ্গে শিশিরের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা মিনতির কাছে বলিয়াছে এবং তাহাতেই মিনতির রাগ হইয়াছে। সে বিষয়ে সে রামধারীকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিল না। রামধারীর উপর সে ইহাতে অত্যন্ত চটিয়া গেল—সে হতভাগার ত সব কথা বলিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তার চেয়ে বেশী চটিল মিনতির উপর—তার এত রাগ দেখিয়া।

রামধারী ইহাতে বাঁচিয়া গেল। তার মনে এ বিষয়ে অনেকটা অনুশোচনা ছিল। তার মনে হইতেছিল যে সে যদি বিন্ধ্যাচলে না গিয়া মিনতির সঙ্গে দেখা করিত, তবে মাইজীকে শিশিরের অবস্থার কথা বলিয়া কহিয়া মন ভিজাইয়া সে তাহাকে বাড়ীতে আনিতে পারিত। তার পর দিন বাবু আসিলেই সব মিটিয়া যাইত। তার মনে হইতেছিল যে তার চালের ভুলেই মিনতি এত কাছে আসিয়াও ছিটকাইয়া দূরে চলিয়া গেল। সে এ কথা ভাবিয়া অনেকবার আপনাকে তিরস্কার করিয়াছে।" শিশির তার কাছে এসব কথা খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে যে কিরূপে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার সাফাই গাহিবে তাহা সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই। তাই শিশির এসব কথা না জিজ্ঞাসা করায় সে বাঁচিয়া গেল।

ইহার পর শিশিরের মনটা কয়েকদিন ভারী খারাপ অবস্থায় রহিল। কিন্তু তার ফলে সে একেবারে কাঠের মত শক্ত হইয়া তার কাজ কর্ম্মে মনঃ-সংযোগ করিল।

দুই মাস পর শিশির Thomas Cook & Co র ব্যাঙ্ক হইতে একখানা রেজেষ্টারী চিঠি পাইল। চিঠিখানা তার হুগলীর ঠিকানা ঘুরিয়া আসিয়াছে।

চিঠি পাইয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া শিশির তাহা খুলিল। তার ভিতর একখানা পঞ্চাশ টাকার চেক ও সঙ্গে একখানা চিঠি পাইল। চিঠি লিখিয়াছে টমাস কুক কোম্পানী। তার মর্ম্ম এই যে কোম্পানী মিঃ ডি মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শিশিরকে এই পঞ্চাশ টাকা তাঁর ঋণশোধ বাবদ পাঠাইতেছেন। এবং মিঃ মুখার্জ্জী তাঁহাকে এসংবাদও জানাইতে বলিয়াছিলেন যে তিনি ভাল আছেন এবং তাঁর অবস্থা এখন বেশ ভাল। এ পত্রের কোনও উত্তর আবশ্যক করে না।

অনেকক্ষণ আবিষ্টের মত চেক ও চিঠির দিকে শিশির চাহিয়া রহিল। সে তার যেন অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

অনেকক্ষণ পর সে অর্থ পরিগ্রহ করিল। দিলীপ যাইবার সময় ৫০ টাকা শিশিরের বাক্স হইতে কোনও উপায়ে বাহির করিয়া লইয়াছিল, এবং যাইবার সময় যে চিঠি লিখিয়াছিল, তাহাতে জানাইয়াছিল যে, দিন পাইলে সে ইহা পরিশোধ করিবে। আজ সে স্নেহময় পিতার সেই সামান্য অর্থের তুচ্ছ ঋণ পরিশোধ করিয়া আপনাকে ঋণমুক্ত মনে করিতেছে।

নিদারুণ ক্ষোভে শিশিরের সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। দিলীপকে সে হারাইয়াছে এবং তার কোনও অমঙ্গল হইয়াছে যত দিন শিশিরের মনে এই ধারণা ছিল, ততদিন সে মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিয়াছিল। এবং যখনই তার কথা ভাবিয়াছে তখনই শিশির আপনাকেই এ ব্যাপারের জন্য সম্পূর্ণ দোষী করিয়াছে। দিলীপের উপর কোনও অভিযোগ অনুযোগ সে এক দিনের তরেও করে নাই।

আজ সে জানিল দিলীপ ভাল আছে, সে পয়সা উপায় করিয়া বেশ স্বচ্ছল অবস্থায় আছে। আর সে তার অর্জ্জিত অর্থে পিতার ঋণ পরিশোধ করিবার স্পর্দ্ধা করিয়াছে। শিশিরের সমস্ত অন্তর পুত্রের উপর অভিমানে গর্জ্জিয়া উঠিল। হতভাগ্য অকৃতজ্ঞ পুত্র পিতার যে অপরিসীম স্নেহ লাভ করিয়াছে—এই তার প্রতিদান! তার তো কোনও ক্ষতিই হয় নাই। সে ভাল আছে, সুখে আছে। তার চক্ষে তার পিতারও ক্ষতি হইয়াছিল মাত্র পঞ্চাশ টাকা—সেই পঞ্চাশ টাকা সে তাকে ফেরত পাঠাইয়াছে। উন্মত্ত ক্রোধে শিশির চেক এবং চিঠি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

তেরটি বৎসর জীবনের সকল স্নেহ দিয়া, সে অশেষ যত্নে দিলীপকে মানুষ করিয়াছিল। বিদ্যুৎ ও শিশির দুজনের অপরিসীম স্নেহ দিয়া তার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত, শরীরের প্রত্যেকটি অণু গঠিত। একমুহূর্ত্তের ক্রোধে সেই পুত্র তার সে সকল স্নেহের স্মৃতি একেবারে লুপ্ত করিয়া পিতার হৃদয়ে যে তুষানল জ্বালিয়া গেল, এতদিন তিল তিল করিয়া শিশির তাহাতে পুড়িয়াছে। তার সমস্ত জীবনটা ছাই হইয়া পুড়িয়া গিয়াছে পুত্রের হাতে এই মর্ম্মান্তিক শাস্তি পাইয়া। তার আশা ভরসা উবিয়া গিয়াছে, জীবনের আনন্দ উজাড় হইয়া গিয়াছে—সে জীবনের সব হিসাব চুকাইয়া আজ পঞ্চাশ বছর বয়সেই মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে—কেবল আদরের দুলাল দিলীপের অমঙ্গলের হেতু হইয়াছে বলিয়া। আর সেই পুত্র—একটি দিনও তার একথা মনে হয় নাই—একটা খোঁজও সে লওয়া আবশ্যক মনে করে নাই—পিতার যে কি দশা হইল সে কথা একটি বার ভাবে নাই। সে জীবনে উন্নতি লাভ করিয়া এই পুরস্কার পিতাকে পাঠাইয়াছে। পঞ্চাশ টাকায় সে পিতার সমস্ত জীবনের ভস্ম দিয়া গড়া সেবা ও স্নেহের ঋণ শোধ করিয়াছে।

অসহ্য বেদনায় শিশির ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। সে ঘরে বসিয়াছিল, উঠিয়া পড়িল—ছুটিয়া নদীর ধারে গিয়া খুব নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিল। এই পুত্র! ইহার জন্য সে তার জীবনটা নষ্ট করিয়াছে—মিনতিকে জীবন্ত সমাধি দিয়াছে, তার আত্মীয় বন্ধু পরিজন সকলের হৃদয়ে অশেষ ব্যথা দিয়াছে! ইহারই জন্য! এই তার জীবন-যজ্ঞের পুরস্কার!

পুত্রের এ নির্ম্মম অপমানে চারিদিক দিয়া তার ব্যর্থ জীবন হাহাকার করিয়া উঠিল। তার মনে হইল কত সুখে তার জীবনের আরম্ভ হইয়াছিল, কত সুখের আশা লইয়া সে যৌবনে উপচীয়মান সুখ সম্ভোগ করিয়াছিল। মনে পড়িল তার প্রথম জীবনের আশা-উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। পড়া শেষ করিয়া সে চাকরী স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিল—অন্নের জন্য নয়, প্রতিপত্তির জন্য নয়,—অন্নের তার অভাব ছিল না, প্রতিপত্তির অন্য পথ তার বিস্তৃত ছিল—সে কেবল আশা করিয়াছিল যে ডেপুটীর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সে দরিদ্রের উপকার করিবে, লোকের সেবা করিবে। চাকরী আরম্ভ করিবার পরই সে তার জীবন-সঙ্গিনীরূপে পাইয়াছিল বিদ্যুৎকে।

পরিপূর্ণরূপে বিদ্যুৎ তার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিল। গৃহে বিদ্যুৎ গড়িয়া তুলিয়াছিল অফুরাণ সুখের আয়োজন, হাসি দিয়া সে তার জীবন ভরিয়া রাখিয়া ছিল। আবার সচিবরূপে সে তার সর্ব্ব কর্ম্মে সহায় ছিল। সকল কর্ম্মে সকল চিন্তায় তাদের চিত্ত ছিল এক সুরে বাঁধা। সেবা ছিল দুজনের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নানা দেশে ঘুরিয়া নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিয়া তারা দুজনে কাজ করিয়াছে, দুঃখীর দুঃখমোচন করিয়াছে, নিরন্নের অন্নদান করিয়াছে, অত্যাচারিতকে রক্ষা করিয়াছে, আর্ত্তকে ত্রাণ করিয়াছে। যেখানে গিয়াছে সেখানেই তারা নানারকম লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছে; রাজদত্ত অধিকার নির্ভয়ে পরিচালন করিয়া শিশির রাজশক্তিকে প্রজার রক্ষা ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ত নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে গিয়াছে সেইখানেই তারা লোকের হৃদয় ক্রয় করিয়াছে,—তাদের দুজনকে বিদায় দিতে সব স্থানেই লোকে কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে। এই সার্থকতার আনন্দে তারা পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলিয়া গণ্য করে নাই, ত্যাগকে পরমলাভ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে —জীবন তাদের আনন্দের, আশার রঙ্গিন আলোকে উজ্জ্বল হইয়া কাটিয়াছে।

তার পর বিদ্যুৎ হঠাৎ বিদায় লইল। তার লক্ষ্মী চক্ষের নিমিষে তাহাকে ছাড়িয়া গেল। সেই বিদায়ের ব্যথা আজ আবার নিবিড় হইয়া শিশিরের হৃদয় মথিত করিল। তার মনে পড়িল বিদ্যুতের বিদায় কাতর চক্ষের সেই শেষ করুণ দৃষ্টি। সে দৃষ্টি যে শিশিরের অন্তরের ভিতর তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত বিঁধিয়াছিল। তার একটু পূর্ব্বে বিপুল চেষ্টায় বিদ্যুৎ বলিয়াছিল খোকাকে আনিতে। খোকা আসিলে শিথিল মুষ্টিতে তার হাত ধরিয়া সে ব্যাকুল নয়নে স্বামীর দিকে চাহিয়াছিল, কি জানি বলিতে তার মন আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছিল। কিন্তু তার সে মধুর কাকলী যে চির দিনের তরে তখন রুদ্ধ হইয়াছে! তাই কেবল বিস্ফারিত চক্ষুর আকুল করুণ দৃষ্টি দিয়া সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ছিল— তার শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সে সেই দৃষ্টি দিয়া শিশিরকে কত কথাই বুঝাইয়াছিল। সে বুঝাইয়াছিল—দিলীপ রহিল, বাপ মা হইয়া শিশির যেন তাকে পালন করে। বুঝাইয়াছিল, "আমি গেলাম, কিন্তু দিলীপ রইলো। এর মুখ চেয়ে তুমি আমার জন্য দুঃখ শান্ত করো।" বুঝাইয়াছিল, দিলীপকে মানুষ করাই তাদের দুজনের জীবনের ব্রত ছিল, সে ব্রত যেন শিশির পালন করে। আরও কত কথা বুঝাইয়াছিল। সুধু কথায় তার সব প্রকাশ করা যায় না, দিলীপকে আশ্রয় করিয়া মুগ্ধ পিতামাতার যত আশা আকাঙ্ক্ষা, তাদের অন্তরে অন্তরে যে অনির্ব্বচনীয় একটা সংযোগ, তাদের সমস্ত জীবন-মরণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল—সে সমস্ত সে ঐ এক শেষ দৃষ্টির ভিতর ঢালিয়া দিয়াছিল।

সেই দৃষ্টির স্মৃতিতে অনেক দিন শিশির আপনাকে সঙ্কুচিত অনুভব করিয়াছে। অনেক দিন সে আপনাকে অপরাধী মনে করিয়াছে,—বিদ্যুতের সে বিশ্বাস, তার সে চরম অনুনয়ের পূর্ণ-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই বলিয়া শিশির মনে মনে মরিয়া গিয়াছে।—কিন্তু আজ সে

সঙ্কুচিত হইল না, আজ আর তার আপনাকে অপরাধী মনে হইল না। আজ মনে হইল যে শিশির যাহা করিবার করিয়াছে। সামান্য যে বাহ্যিক ত্রুটি হইয়াছিল, সমস্ত জীবনে জলাঞ্জলি দিয়া সে তার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। এ কয় বৎসরের সঞ্চিত অশ্রুর ডালি লইয়া আজ সে নির্ভয়ে বিদ্যুতের আত্মার সম্মুখে দাঁড়াইল—অসঙ্কোচে সে তাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমার যা করিবার করিয়াছি—কিন্তু তোমার ছেলে হইয়া দিলীপ আমার স্নেহের এই অপমান করিয়াছে।" পুত্রের ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া সে আজ বিদ্যুতের কাছে অভিযোগ করিল। আজ যেন তার অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল বিদ্যুতের সহানুভূতি, তার করুণার্দ্র সান্ত্বনার বাণী। বিদ্যুত যখন বাঁচিয়াছিল, তখন যখনি শিশির কোনও ব্যথা পাইয়াছে তখনি ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া গিয়াছে বিদ্যুতের কাছে—আর বিদ্যুৎ তার অপরিসীম প্রীতি দিয়া সান্ত্বনা বিলাইয়া তার মনের সকল ব্যথা নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়াছে। আজও তার তেমনি মনে হইল। মনে হইল, বিদ্যুৎ যেন তার সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া বলিতেছে, "কোনও দুঃখ নাই প্রিয়তম! তোমার কাজ তুমি করিয়াছ, অকৃতজ্ঞ অল্পবুদ্ধি বালক তার মর্য্যদা রাখে নাই, সে তারই দুর্ভাগ্য, তোমার কিছু নয়।" শিশিরের মনে হইল যে আজ যদি বিদ্যুৎ বাঁচিয়া থাকিত তবে সে শিশিরের মাথা বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া ঠিক এই কথাই বলিত। বিদ্যুতের এ আশ্বাসবাণী সে অন্তরের ভিতর অনুভব করিয়া তার নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় আশ্চর্য্যরকম শান্তি অনুভব করিল।

সে উঠিল। মনটা অনেকটা ঠাণ্ডা করিয়া বাড়ী ফিরিল। তবু মাঝে মাঝে তার বুকের ভিতর রুদ্ধ অভিমান দারুণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। দিলীপের উপর সে থাকিয়া থাকিয়া ক্ষেপিয়া উঠিতে লাগিল।

দিলীপের চিঠি অনেক দিন ধরিয়া শিশিরের চিত্তের তলায় বিষক্ষরণ করিতে লাগিল, কিন্তু সে তাহার সম্বন্ধে কোনও কিছুই করিল না। একবার তার মনে হইয়াছিল যে টমাস কুক কোম্পানীর কাছে অনুসন্ধান করিয়া দিলীপের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানিবার চেষ্টা করে—কিন্তু পর মুহূর্ত্তে সে ঘৃণার সহিত এ চিন্তা দূরে সরাইয়া দিল। সে স্থির করিল দিলীপের সঙ্গে আর সে কোনও সম্বন্ধ রাখিবে না।

ইহার চার মাস পরে সে হঠাৎ মিনতির টেলিগ্রাম পাইল, "দিলীপ ফিরিয়া আসিয়াছে, তুমি ফিরিয়া এসো।"

এই টেলিগ্রাম পাইয়া তার সমস্ত অন্তর দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এখন দিলীপ ফিরিয়া আসিয়াছে। দেখাইতে আসিয়াছে যে সে পিতার উপর কঠিন প্রতিশোধ লইয়াছে। বাপকে ত্যাগ করিয়া গিয়া তার কোনও ক্ষতি হয় নাই, সে মানুষ হইয়াছে—তার জন্য বাপের সাহায্যের কোনও দরকার হয় নাই, এই কথাটা দর্প করিয়া দেখাইবার জন্য সে ফিরিয়া

আসিয়াছে। এ কথা ভাবিতে শিশিরের অন্তরে যে জ্বালা উপস্থিত হইল তাহাতে সে দারুণ অশান্তি বোধ করিল। সে তাড়াতাড়ি চাদর লইয়া বাহির হইয়া গেল। তিন মাইল দূরে এক উকীল বাবুর বাড়ী গিয়া দাবা খেলিতে বসিল। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত দাবা খেলিয়া সে বাড়ী ফিরিল।

রাত্রে সে ছটফট করিয়া কাটাইল—তার কাছে সব চেয়ে বড় হইয়া উঠিল অকৃতজ্ঞ পুত্রের এই অশোভন দম্ভ। ইহা তার বঞ্চিত জীবনের স্মৃতির সঙ্গে মিশিয়া তার সমস্ত অন্তর ভরিয়া এমন তপ্ত বিষ ঢালিয়া দিল যে তার জীবন অসহ্য বোধ হইল।

তৃতীয় প্রহর রাত্রে নিদ্রাহীন শয্যাত্যাগ করিয়া সে রামধারীকে উঠাইল। তল্পী তল্পা বাঁধিতে হুকুম করিল। ভোরের ট্রেণে সে পশ্চিমদিকে যাত্রা করিল, টিকিট করিল পেশাবরের।

যাইবার সময় মিনতিকে সে লিখিয়া গেল,

"দিলীপ আসিয়াছে, বেশ কথা। এখন তোমরা দুজনে বন্দোবস্ত করিয়া যে ভাবে তোমাদের থাকিবার সুবিধা বিবেচনা কর তাই কর। তুমি যেখানে থাকিতে ইচ্ছা কর সেখানেই থাকিতে পার, যত টাকা তোমার দরকার তাহা সম্পত্তি হইতে লইতে পার।

"আমি এতদিনে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইলাম। দিলীপ এখন বিষয় সম্পত্তি বুঝিয়া লইতে পারিবে, এখন আর সংসারে আমার কোনও কাজ নাই। আমি এখন চলিলাম। আমি কোথায় থাকি কি করি সে সম্বন্ধে কোনও খোঁজ তোমরা করিও না। খোঁজ করিলেও পাইবে না। জীবনের অবশিষ্ট ক'টা দিন সব ভুলিয়া একটু শান্তিতে কাটাইতে চেষ্টা করিব।"

ক্রমশঃ

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

বাংলায় ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরেজ শাসনের ইতিহাস

বাংলার ইংরাজীশিক্ষার প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা দেখিয়াছি—এদেশের শিক্ষার জন্য পার্লিমেণ্ট যখন প্রথমে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন তখন বহুদিন পর্য্যন্ত এখানকার গভর্ণমেণ্ট কিছুই করিতে রাজী হন নাই, কারণ তাহাদের প্রাণে ভয় ছিল কি জানি ইংরেজী শিখিয়া 'এদেশের' লোকের মনের গতি যদি এমন ভাবে বদলিয়া যায় যাহাতে তাঁহাদের দেশরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে। তখন তাঁহারা খোলাখুলি এসব কথা বলিতেন, এমন কি মেজর স্মিথ নামক একজন ইংরেজ পার্লিমেণ্টের সামনে খোলাখুলি

বলিলেন—আমরা যে ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতে পারিতেছি তাহার প্রধান কারণ—সে দেশে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায় রহিয়াছে—যাহারা কখনও পরস্পর মিলিত হইতে পারিবে না, আর হিন্দুদের মধ্যে নানা জাতি রহিয়াছে, এই ভেদের উপর আমাদের রাজ্য ও প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠিত, ইহাদিগকে যদি লেখাপড়া শিখান যায় তাহা হইলে তাহারা ক্রমে ক্রমে এই ভেদ বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিবে, ভেদ নষ্ট হইলে ভারতবর্ষে আর আমাদিগকে প্রভুত্ব করিতে হইবে না। এইজন্য এখানকার গভর্ণমেণ্ট এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বা কোন শিক্ষা দিতে রাজী ছিলেন না, তবে পার্লামেণ্ট যখন টাকা বরাদ্দ করিয়াছে তখন একটা কিছু না করিলেই নয়, এইজন্য তাঁহারা ঠিক করিলেন মুসলমানদের মাদ্রাসার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে আরবী পার্সি এবং হিন্দুদিগের জন্য সংস্কৃত স্কুল করিয়া তাহাদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া যাইবে, কোন নূতন স্কুল কলেজ স্থাপন না করিয়া ভদ্রলোকদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাহাতে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় তাহার চেষ্টাও তাঁহারা করিবেন। রাজা রামমোহন রায় এই প্রস্তাবের ঘোরতর প্রতিবাদ করেন ১৮২৩ ইংরেজীতে। তিনি লর্ড আমহার্ষ্টকে যে চিঠি লেখেন তাহাতে তিনি বলেন—আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল কথা আছে তাহার দ্বারা জাতিটা গড়িয়া উঠিতে পারে না। বেকনের পূর্ব্বে ইউরোপীয় শিক্ষার সাধনার সাহিত্যের যে অবস্থা ছিল আমরা এখনও সেই অবস্থায় আছি। বেকনের পূর্ব্বে ইউরোপে স্কলেষ্টিসিজম্ বা পাণ্ডিত্য ছিল, নিতান্ত কাল্পনিক ভাবে বিজ্ঞানাদির আলোচনা হইত, একটা দৃষ্টান্ত সেদিন দিয়াছিলাম—বরকন্যার যখন engagement হয়, বিবাহ হইবে ঠিক হয়, তখন বর ক'নের আঙ্গুলে একটা আংটা পরাইয়া দেন, সে আংটা বাঁ হাতের এই (অনামিকা) আঙ্গুলে পরাইয়া দেন, আধুনিক শরীর-তত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, শবব্যবচ্ছেদ করিয়া এখন শরীরের ভিতরকার যে সমস্ত ব্যাপার জানা গিয়াছে তাহা জানা যাইবার পূর্ব্বে, সে কালের ইউরোপীয়দের ধারণা ছিল—বাঁ হাতের ঐ অঙ্গুলী হইতে একটা নাড়ী সোজা হৃদয়ে গিয়া পৌঁছিয়াছে, সুতরাং ঐ অঙ্গুলে আংটা দিলে তাহা ক'নের হৃদয়কে স্পর্শ করিবে। এই প্রথা এখনও প্রচলিত আছে, এইরূপ ভাবের বিজ্ঞান সেকালে ছিল, বেকন তাহা উল্টাইয়া দেন, এবং নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্বারা ইউরোপ অসাধারণ অভ্যুদয় লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে সে অভ্যুদয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে কেবল যে সাংসারিক অভ্যুদয় লাভ হইয়াছিল তাহা নহে, মানুষের বুদ্ধি উন্মীলিত হইয়া গিয়াছিল। বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে হইলে প্রত্যক্ষের উপর সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, আর তখন প্রত্যক্ষপ্রধান প্রমাণ হইয়া উঠে, সেখানে কল্পনা জল্পনার স্থান থাকে না। বিজ্ঞান যখন জ্ঞানের নেতা হইয়া কোন সমাজে বা কোন দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহাদের বুদ্ধিকে শাস্ত্র বা অন্য কোন শাসন দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারা যায় না, তাহারা সব বিষয় যুক্তির কষ্টি পাথরে কষিয়া সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে চাহে,

ইহার ফলে ইউরোপের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি প্রথমতঃ স্বাধীন হইয়া উঠিল, আর মানুষ যদি একবার বুঝে—

যদি না দেখ আপন নয়নে
বিশ্বাস না কর কভু গুরুর বচনে।

আমার বুদ্ধি দ্বারা, যুক্তির দ্বারা যাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিব তাহা বিশ্বাস করিব না,—এই ধারণা যদি বদ্ধমূল হয় তাহা হইলে তাহার প্রথম ফল এই হয়,—শাস্ত্র ও পৌরোহিত্যের বন্ধন মোচন হয় আর রাজার বন্ধনও বেশীদিন তিষ্ঠিতে পারে না। সমাজ বন্ধন যদি মোচন হয়, শাস্ত্র ও ধর্ম্মের অতিপ্রাকৃত আধিপত্য এবং প্রামাণ্য যদি লোকের চিত্ত হইতে অপসৃত হয় তাহা হইলে রাজা যা ইচ্ছা করিবেন প্রজা তাহা মানিয়া চলিবে—ইহা হইতে পারে না। বেকনের পরে ইউরোপের বুদ্ধি বিচারশক্তি ও মনোবৃত্তি যে মুক্তিলাভ করিয়াছিল, যাহাকে ইংরেজীতে 'রিনিসেন্স' বলে, তাহার ফলে ফরাসী এনসাইক্লোপেডিষ্ট চেষ্টা ও আন্দোলন ঘটে —যাহার পরিণাম ফল—ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব, সমগ্র ইউরোপের প্রজাশক্তি জাগ্রত হইয়া আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠে এবং সর্ব্বত্র গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, ইহা ইউরোপের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে।

আমাদের এখানে রাজা রামমোহন রায় বলিলেন—বেকনের পূর্ব্বে ইউরোপের যে অবস্থা ছিল, তাহার ঐহিক অভ্যুদয় তেমন ছিল না, সাধনার শ্রীবৃদ্ধি তেমন হয় নাই, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি ঘটে নাই—সেই অবস্থায় যদি আমাদিগকে রাখিতে চাও তাহা হইলে আমাদের প্রাচীন ন্যায়, দর্শন, মীমাংসাদি শাস্ত্র শিখাও, কিন্তু আধুনিক জগতে যদি ভারতবর্ষকে কোন স্থান অধিকার করিতে হয় তাহা হইলে ঐ শিক্ষায় চলিবে না, তাহাকে আধুনিক শিক্ষা লাভ করিতে হইবে, ইউরোপ যে পথে গিয়া অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে ভারতবর্ষকেও সেই পথে চলিতে হইবে। রাজা বলিলেন—যখন শুনিলাম এদেশের লোকের শিক্ষার জন্য পার্লিমেণ্ট কতকগুলি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন তখন ভাবিয়াছিলাম—আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার পথেই ঐ টাকা খরচ হইবে এবং ঐ শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে—এই ভাবে রাজা চিঠি লিখেন। তাহার পর হইতে একদল লোক রাজাকে সমর্থন করিতে আরম্ভ করিলেন, আর একদল লোক বলিতে লাগিলেন—এদেশের লোককে আরবী পার্সী ও সংস্কৃতই শিখাইতে হইবে, ঐ শিক্ষাই এদেশে প্রচলিত থাকুক, প্রচারিত হউক, গভর্ণমেণ্ট এই ভাবের শিক্ষায় টাকা খরচ করুন। এই শিক্ষার ইতিহাসে ইহাদিগকে অরিয়েণ্টেলিষ্ট বলে, আর যাহারা ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান এদেশে প্রচারিত হউক তাহার পক্ষপাতী ছিলেন তাহাদিগকে এংলিসিষ্ট বলে। এংলিসিষ্ট প্রবর্ত্তক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সর্ব্বপ্রধান সমর্থক ও নেতা ছিলেন মেকলে। তিনি ১৮৩৪ খৃঃ

এদেশে আসেন, ১৮২৩ খৃঃ রাজা যে পথ ধরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন মেকলে সেই পথ অবলম্বন করেন ও তাহার মত সমর্থন করেন এবং শেষটা মেকলের মতই প্রতিষ্ঠিত হয়।

লর্ড বেন্টিঙ্ক একটা ইস্তাহার জারি করিয়া বলেন গভর্ণমেণ্ট যে শিক্ষা দিবে তাহা ইউ-রোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা, ইংরেজী ভাষার সাহায্যে সে শিক্ষা দিতে হইবে। বেন্টিঙ্ক যে কেবল এদেশের লোকের কল্যাণের জন্য এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি এবং ইংরেজ এংলিসিষ্টরা কি উদ্দেশ্যে রাজার মত সমর্থন করিয়াছিলেন, তখনকার কাগজপত্র ঘাটিলে তাহা বাহির হইয়া পড়ে। মেকলের ভগ্নিপতি স্যার জন ট্রেভেলিন মেকলের নথীপত্র ও মতামত ভাল করিয়াই জানিতেন। ১৮৫৩ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ বদলাইবার যখন কথা হয়—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কিছুকালের জন্য ভারতবর্ষ শাসন করিবার সনন্দ দেওয়া হইত এবং সেই কালের ভিতর কিরূপ শাসন হইয়াছে তাহার তদন্ত করিবার জন্য পার্লেমেণ্টরী কমিটি বসিত, তাঁহার তদন্তের পর নূতন সনন্দ দেওয়ার সময় কি সর্ত্তে দেওয়া হইবে তাহা ঠিক করিতেন—তখন সেই কমিটির সমক্ষে স্যার চার্লস ট্রেভেলিন সাক্ষী দিতে গিয়া বলেন—আমরা যে নিঃস্বার্থভাবে ইহা করিতেছি তাহা নহে, ফলতঃ এই পৃথিবীতে একেবারে নিঃস্বার্থ কাজ অতি অল্পই আছে, বিধাতার নিয়ম এমন বিচিত্র যদি সত্যভাবে নিজের স্বার্থ সাধন করিতে হয় তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপরের স্বার্থও রক্ষা করিতে হয়, নিজের স্বার্থকে অবলম্বন করিতে যাইয়া যদি আমি প্রতিবাসী, পরিবারবর্গ অথবা স্বজাতির স্বার্থকে উপেক্ষা করি তাহা হইলে পরিণামে আমার স্বার্থ সিদ্ধ হয় না, তাহাদের স্বার্থ ত নষ্ট হয়ই। সুতরাং আমার স্বার্থ সত্যভাবে রক্ষা করিতে হইলে আর দশ জনের স্বার্থকে রক্ষা করিতে হইবে, তাহাই বিধাতার নিয়ম।

ট্রেভেলিন বলেন—আমরা নিঃস্বার্থভাবে এই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে যাইতেছি না, এই শিক্ষায় আমাদের যেমন উপকার হইবে এদেশের লোকেরও তেমনি উপকার হইবে, আমাদের রাজ্যরক্ষা হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের লোকের জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত হইবে। ভারতবর্ষে দুই সম্প্রদায় আছে (১) হিন্দু, (২) মুসলমান। মুসলমানদের সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা ছিল সেই অনুসারে বলিলেন—ইহারা অত্যন্ত রাষ্ট্রলোলুপ, পররাষ্ট্র দখল করিয়া নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হইতে চায়। ইহারা ধর্ম্মকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য, নিজেদের সুখ সমৃদ্ধি বাড়াইবার জন্য ইহারা ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত প্রয়োগ করে, যাহারা মুসলমান নয় তাহাদিগকে ইহারা কাফের মনে করে। এই সসাগরা বসুন্ধরার যাহা কিছু সম্পদ সব মুসলমানের ভোগের জন্য খোদাতাল্লা দিয়াছেন, অন্য কেহ যদি তাহাতে ভাগ বসায় তাহা হইলে সে পরস্ব অপহরণ করে—এইরূপ তাহারা মনে করে। সুতরাং আমরা ভারতবর্ষে গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছি ইহা মুসলমানদের একেবারে অসহ্য, কি করিয়া আমাদিগকে পরাস্ত করিবে, কেমন করিয়া

আমাদের হাত হইতে এই সুন্দর দেশ ফিরিয়া পাইবে—তাহারা সর্ব্বদা সেই জল্পনা কল্পনা করে। তাহার পর, হিন্দুরা আমাদিগকে ম্লেচ্ছ মনে করে, তাহারা মনে করে ক্ষত্রিয়েরাই কেবল রাজ্য শাসনের উপযুক্ত, ম্লেচ্ছদের রাজ্যশাসনে কোন অধিকার নাই। মুসলমান এবং হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের যদি এইরূপ মনের ভাব থাকে তাহা হইলে রাজ্য রক্ষা করা আমাদের অসম্ভব হইয়া উঠিবে। ক্রমে, ইহারা যখন সংঘবদ্ধ হইবে, আত্মস্থ হইবে, ইহাদের জ্ঞান যখন পরিস্ফুট হইবে, নিজেদের শক্তি সামর্থ্য যখন বুঝিতে পারিবে তখন ভারতবর্ষে আমাদের প্রভুশক্তি রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। ইহাদিগকে যদি আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দিই তাহা হইলে আমাদের সঙ্গে ইহাদের সহানুভূতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমাদের বিদ্যা লাভ করিয়া তাহারা আমাদের সভ্যতাকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে, আমাদের শাস্ত্র ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হইবে। আমাদের সাধনায় পারদর্শী হইলে আমাদের প্রতি তাহাদের সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি পাইবে। সেক্‌স্‌পিয়র ও মিল্টন এবং যাহারা আমাদের সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাদিগকে আমরা যেমন শ্রদ্ধা করি, ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন দ্বারা ভারতবর্ষের নূতন শিক্ষিত সম্প্রদায় আমাদের সাহিত্যরথীদিগকেও সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে। আমাদের চিন্তাধারার সঙ্গে তাহাদের চিন্তাধারা যুক্ত হইয়া যাইবে। আমাদের আদর্শের সঙ্গে তাহাদের আদর্শ মিলিত হইয়া যাইবে। এইভাবে তাহারা আমাদের বিরোধী না হইয়া সর্ব্বদাই স্বপক্ষে থাকিবে, আমাদের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের নিজেদের উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করিবে। এই শিক্ষা লাভ করিলে একটা অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইবে প্রাচ্য দেশে যে একতন্ত্র যথেচ্ছাচার শাসন-পদ্ধতি সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে, তাহার প্রতি তাহাদের ঘৃণা জন্মিবে, আমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আবার সেই একতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হউক—এই ইচ্ছা কখনও তাহারা করিবে না। এই ভাবে আমাদের স্বার্থের সঙ্গে তাহাদের স্বার্থ সম্মিলিত হইবে এবং তাহারা আমাদের শাসনের সহায় হইবে, তাহারা আমাদের সাহায্য করিবে, যদি কোন দিন তাহাদের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদও ঘটে বন্ধুভাবে রফা করিয়া তাহাদের দেশ হইতে চলিয়া আসিতে পারিব। তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের শিক্ষার সূত্রে আবদ্ধ করিয়া সুদূর ভবিষ্যতে সেদেশ ছাড়িয়া আসিতে হইলে আসিতে পারিব। এই পথে যদি না চলি আমরা রাজ্য রক্ষা করিতে পারিব না। সুতরাং ট্রেভেলিন বলেন—এখানে আমাদের স্বার্থ ও তাহাদের স্বার্থ এক।

আর একজন ইংরাজ—স্যার জন মেলকলম—যিনি ক্লাইবের জীবনচরিত লিখিয়াছেন—পার্লামেন্টরী কমিটীতে সাক্ষ্য দিতে গেলে—একজন কমিটীর মেম্বর তাঁহাকে জেরা করেন—ভারতবর্ষের লোকদিগকে ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান যদি শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা হইলে সেদেশে আমাদের প্রভুশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাহাতে আমাদের কোন প্রকার রাজনৈতিক সুবিধা লাভ হইবে—ইহা কি তুমি মনে কর? মেলকলম বলেন—এই শিক্ষা দ্বারা আমাদের কোন রাষ্ট্রীয়

স্বার্থসিদ্ধি হইবে তাহা আমি মনে করি না, কারণ আমি জানি ভারতবর্ষের প্রজাদের পরস্পরের মধ্যে যে অনৈক্য আছে, ভেদ আছে, বিরোধ আছে,—হিন্দু মুসলমানে বিরোধ, হিন্দুদের ভিতর জাতিতে জাতিতে যে বিরোধ আছে—এই বিরোধের উপর আমাদের শক্তি এবং শাসন প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষা পাইলে এই বিরোধ নষ্ট হইয়া যাইবে। মেলকলম জানিতেন না, ট্রেভেলিন জানিতেন না, এত কালের মধ্যেও—১৮৫৩ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যেও—বিরোধ ত মিটলই না বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে; এই বিরোধের উপর তাহাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত—ইহাই তাঁহাদের ধারণা ছিল। তাহার পর মেলকলমকে জিজ্ঞাসা করা হইল—এই শিক্ষা দ্বারা তাহাদের কোন উপকার হইবে কিনা। তিনি বলেন—ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারের ফলে ভারতবাসীর মানসিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী,—একথা স্বীকার করিতেই হইবে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সাংসারিক অভ্যুদয়, ইহলোকে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে একথা অম্লানবদনে স্বীকার করি, কিন্তু তাহাতে আমাদের রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে মনে করি না। এই এই সকল মন্তব্য সত্ত্বেও শেষটা তাঁহারা ইউরোপীয় শিক্ষা প্রচলন করিতে বাধ্য হইলেন।

আদর্শের কথা, মতামতের কথা বলিলাম, তৎসত্ত্বেও কার্য্যতঃ তাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা দিতে বাধ্য হইলেন। শাসনভার গ্রহণ করিয়া প্রথমত তাঁহারা বিলাত হইতে ইংরেজী কর্ম্মচারী আমদানী করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে উৎকোচ এবং লোকের উপর অত্যাচার এত বাড়িয়া গেল—পিট পার্লিমেণ্টে দাঁড়াইয়া বলিলেন ভারতবর্ষ যে ভাবে শাসিত হইতেছে তাহা ন্যায়ের পরিপন্থী, তাহাতে আমাদের জাতীয় চরিত্রের অপযশ বৃদ্ধি পাইতেছে, ন্যায়ের পথ একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, সুতরাং তিনি বলিলেন—বিলাত হইতে আর ইংরেজ গিয়া ভারতবর্ষ শাসন করিলে চলিবে না। এজন্য চুনো পুটী হইতে রুই-কাতলা পর্য্যন্ত ইংরেজ কর্ম্মচারীর এদেশে আসা বন্ধ হইয়া গেল, কেবল উপরওয়ালা কর্ম্মচারীই আসিতে লাগিলেন, নীচের কাজে দেশের লোক নিযুক্ত হইতে আরম্ভ হইল, কিন্তু তাহার মুস্কিল দাড়াইল এই—একে অন্যের ভাষা বুঝে না, ঠারে ঠুরে কথা কহিতে হয়, তাহাতে কতদিন চলিবে? দোভাষী ছিল,—রাধাবাজারে তাহাদের ভাষা ছিল—টেক্ টেক্ ন টেক্ ন টেক্ অন্‌লী একবার সি (নিতে হয় নিও, না নিতে হয় না নিও, সাহেব জিনিসটা একবার দেখে যাও)। এইভাবে বেশীদিন চলিল না, বিশেষতঃ ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা ইংলিশ ল এবং ইংরেজের পদ্ধতি প্রচলিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই পদ্ধতি অনুসারে রাজ্যশাসন করিতে হইলে ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা লাভ করা এদেশের লোকের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিল অর্থাৎ নিম্নতম কর্ম্মচারী-সৃষ্টির জন্য ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। শিক্ষা দিলে তাহাদের ঔদার্য্য প্রমাণিত হইবে—এ সব ত বাহিরের কথা, মূল কথা শাসন কার্য্য অসম্ভব হয়,—যাহারা সেই শাসন কার্য্যে সাহায্য করিবে তাহারা যদি ইংরেজের ভাষা না শিখে এবং তাহাদের শাসন পদ্ধতির মূল

প্রকৃতি ধরিতে না পারে, সুতরাং আমলা কেরাণী প্রভৃতি নিম্নতম কর্ম্মচারী যাহারা শাসন কার্য্য পরিচালনা করিবে শাসন কার্য্যে সাহায্য করিবে তাহাদের শিক্ষা দেওয়া অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল, এই এই কারণে তাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত করিলেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্ক পরোয়ানা জারী করিলেন, পার্লিমেণ্ট যে টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন তাহা ইংরাজী শিক্ষা এবং ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারে ব্যয়িত হইবে। সেজন্য স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তার আগে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশের লোক, স্বর্গীয় রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল প্রভৃতি কলিকাতা সহরের সমাজপতিরা মিলিত হইয়া ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা রামমোহন রায়ও ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন, বেদাদি প্রচার করিয়া তিনি ধর্ম্মের সংস্কারে বদ্ধপরিকর ছিলেন, এইজন্য যাঁহারা গোড়া হিন্দু তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ ছিল, তাহা সত্ত্বেও রামমোহন রায় যে চক্ষে ইংরেজী শিক্ষা দেখিয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহার বিরোধী ছিলেন তাঁহারাও সেই চক্ষে দেখিয়াছিলেন, দেশে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

মুসলমানেরাও নিহাৎ পশ্চাৎপদ ছিলেন না, কেবল যে হিন্দুরাই ইংরেজীশিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিয়াছিল তাহা নহে, মহম্মদ মসীন এই শিক্ষার জন্য অনেকগুলি টাকা দান করেন। এই মহসীন ফণ্ড হইতে মুসলমানদিগকে অনেকগুলি বৃত্তি দেওয়া হয়, ইহা হইতেই হুগলি কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। হিন্দুদের মধ্যে ভূ-কৈলাসের ঘোষাল মহাশয়েরা ছিলেন, তাঁহাদের একজন পূর্ব্বপুরুষ কাশীতে নিজ খরচে একটী ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, ইহা ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের আগে হয়। কিন্তু লর্ড বেন্টিঙ্ক যখন পরোয়ানা জারী করিলেন তখন হইতে নূতন নূতন কলেজের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল, তবু বহুদিন পর্য্যন্ত কাজে বেশী কিছু অগ্রসর হইল না। নথীপত্র ও কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন্ নামে একটী কমিটি গঠিত হইল। যাঁহারা তাহার কর্ত্তা হইলেন তাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না। এইভাবে বহুদিন ১৮৩৫ হইতে ৫৪ পর্য্যন্ত ১৯ বৎসর কাল বিচার আলোচনায় কাটিয়া গেল, ইতস্ততঃ করিতে করিতে চলিয়া গেল। যদিও ঠিক হইল ইংরেজী শিক্ষা দিতে হইবে তথাপি কোন নীতি বা পলিসি প্রতিষ্ঠিত হইল না, সুতরাং কাজেও কিছু হইল না।

১৮৫৪ খৃঃ স্যার জন উড্—যিনি পরে লর্ড হালিফেক্স নামে পরিচিত হন—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদের আফিসে একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি সেই বৎসর একটা ডিস্‌পেচ্ পাঠান, তাহাকে স্যার জন উড ডিস্পেচ বা এডুকেশন্ ডিস্‌পেচ্ বলে। গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে উচ্চশিক্ষার যে ব্যবস্থা হয় অর্থাৎ আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি বা বনিয়াদ স্যার জন উডের ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ডিস্‌পেচ্। তাহার ভিতর দুইটী বড় কথা আছে, একটী কথা

এই—ডিস্‌পেচে লেখা হইয়াছে—আমরা (ইংরাজেরা) যে আমাদের তত্ত্বাবধানে অথবা আমাদের রাজস্ব হইতে টাকা খরচ করিয়া এত বড় দেশে এত লোকের মধ্যে এই শিক্ষা বিস্তার করিতে পারিব তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, তবে আমরা গ্রেণ্ট ইন্ এইড্ দিব অর্থাৎ যে পরিমাণে দেশের লোকেরা নিজে প্রবৃত্ত হইয়া স্কুল কলেজ স্থাপন করিতে রাজী হইবে সেই পরিমাণে আমরা টাকা দিব। কিন্তু শিক্ষার ভার তাহাদের উপর থাকিবে, স্কুল কলেজের কর্ত্তৃত্ব তাহাদের হাতে থাকিবে। এই ডিস্‌পেচের পর হইতে স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নূতন নূতন স্কুল-কলেজ সৃষ্টি হইতে লাগিল। কি ভাবে পড়া হইবে, কি শিক্ষা দেওয়া হইবে, কি কিতাব পড়া হইবে, পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারণ কিরূপে হইবে—এই সকল ব্যবস্থার ভার আমাদের হাতে ছিল—স্কুল যাঁহারা স্থাপনা করিতেন তাঁহাদের হাতে ছিল। এই ব্যবস্থা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়া আসে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আমরা প্রথম সিলেটে প্রাইভেট নেশানেল স্কুল করি,—আগে নেশানেল স্কুল ছিল কিনা মনে পড়ে না, -তাহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আমাদের হাতে ছিল। তাহা না থাকিলে আমার মত লোকের পক্ষে শিক্ষক হওয়া অসম্ভব ছিল। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিদ্যা আমার নাই, দুই বার ফেল হইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসি, ইংরাজী স্কুলে হেড মাষ্টার হওয়ার কোন সম্ভাবনাই আমার ছিল না। আজকালকার মত ইন্‌স্পেক্টরদের প্রভুত্ব তখনকার দিনে আমাদের উপর ছিল না, আমরা আমাদের ইচ্ছামত বহি সিলেক্‌ট্ করিতে পারিতাম, পদ্মিনীর উপাখ্যান, রঙ্গলালের কাব্য, হেমচন্দ্রের কবিতা পুস্তক হইতে আমরা সিলেকসান্ করিতাম —

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
　　　　কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
　　　　কে পরিবে পায়!

অথবা—

বাদলের বারি ধারা প্রায়—
চর্ম্মে বর্ম্মে ঠেকে বাণ অবিরাম পড়িছে ধরায়

এই সকল কবিতা ছেলেদিগকে মুখস্থ করাইতাম; আর রাজস্থান হইতে নূতন স্বদেশ-প্রেমের প্রেরণা শিক্ষা দিতাম, আমাদের এই অধিকার ছিল, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমাদের উপর কোন হাত দিতেন না। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহার ফলে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিক্ষা বিষয়ে আমাদের স্বাধীনতা ছিল। গভর্ণমেণ্টের স্কুলে যে শিক্ষা দেওয়া হইত তাহার কর্ত্তৃত্ব করিতেন ডিরেক্টর ও ইনস্পেক্টরেরা। বেসরকারী স্কুলে তাহাদের আসিবার কোন অধিকার ছিল না, যদি না আমরা তাহাদিগকে আসিতে দিতাম,—আমাদের অনুমতির উপর, সদাশয়তার

উপর তাহারা বেসরকারী স্কুল পরিদর্শন করিতে পারিতেন। কোন অধিকার তাঁহাদের ছিল না। আমি যখন কটকে হেড মাষ্টার হইয়া যাই তখন ভূদেব বাবু ঘটনাক্রমে ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন, তিনি সেখানকার রাভেনসা কলেজ দেখিতে গিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলাম আমাদের স্কুলটী যেন দেখিয়া যান, আমার আমন্ত্রণে তিনি স্কুল দেখিতে আসেন। আসিয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—এখানে গভর্ণমেণ্ট স্কুল থাকা সত্ত্বেও কেন আপনারা আর একটী স্কুল করিয়াছেন। আমি বলিলাম—গভর্ণমেণ্ট স্কুলে কোন প্রকার নীতিশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। তিনি বলিলেন আপনারা কি রকম নীতিশিক্ষা দেন? কেতাবে পড়া নীতিশিক্ষা কি? আমি উত্তর দিলাম—আমরা সেজন্য কোন কেতাব পড়াই না—সাধারণ শিক্ষার ভিতর দিয়া, সাহিত্য ও ইতিহাসের ভিতর দিয়া—নীতিশিক্ষা দিই, আলাদা কিছু দিই না। কোন বাইবেল আমরা তৈয়ার করি নাই, প্রতিদিন ছেলেরা যাহা পড়ে তাহার ভিতর দিয়া এই শিক্ষা দেওয়া হয়। ভূদেব বাবু চুপ করিয়া গেলেন, এণ্ট্রেন্স ক্লাসের ছেলেদের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পাঠ্যপুস্তকে এডিশনের একটা প্রবন্ধে ছিল—God is our dearest and best friend; ভূদেব বাবু একটা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মানে কি বল দেখি। ছেলেটী বলিল—ডিয়ারেষ্ট মানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, আর বেষ্ট মানে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বা শ্রেষ্ঠ, ফ্রেণ্ড—বন্ধু। ভূদেব বাবু বলিলেন—আচ্ছা, দুটী বিশেষণ না দিয়ে একটী দিলে কি হয়, বেষ্ট না বলিলে কি হয়? ছেলেটী বলিল—আমাদের বেষ্ট ফ্রেণ্ড সে, যে আমাদের কল্যাণ অন্বেষণ করে। ডিয়ারেষ্ট ফ্রেণ্ড অনেক সময় আমাদের সুখ অন্বেষণ করে। ঈশ্বর যে কেবল আমাদের সুখই অন্বেষণ করেন তাহা নহে, কল্যাণও অন্বেষণ করেন এইজন্য তিনি ডিয়ারেষ্ট এবং বেষ্ট ফ্রেণ্ড। ভূদেব বাবু বলিলেন এখন বুঝিয়াছি কি ভাবে আপনারা নীতিশিক্ষা দেন—এই বলিয়া তিনি লম্বা চওড়া মন্তব্য লিখিয়া গেলেন।

১৮৮০ পর্য্যন্ত শিক্ষা-বিষয়ে আমাদের স্বাধীনতা ছিল। পাঠ্যপুস্তক আমরা নির্দ্ধারণ করিতাম। শিক্ষার প্রণালী আমরা ঠিক করিতাম। গভর্ণমেণ্ট আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিতেন না। যখন এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিতে যাইতে হইত তখন ইয়ুনিভার্সিটী যে পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারণ করিত তাহা আমাদিগকে মাথা পাতিয়া নিতে হইত। তাহা ছাড়া শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বা ইন্‌স্পেক্টারদের আর কোন ক্ষমতা আমাদের উপর ছিল না। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের এডুকেশন ডিস্‌পেচএ যে নীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই নীতি অনুসারে তখন পর্য্যন্ত (১৮৮০ পর্য্যন্ত) চলিয়া আসিয়াছিল। সেই নীতির মূল কথা—এই শিক্ষার বিস্তার দেশের লোকের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিবে, আমরা (ইংরেজেরা) বাহির হইতে তাহাদিগকে সাহায্য করিব। এখন সব উল্‌টিয়া গিয়াছে, এখন নীতি হইয়াছে—দেশের লোক কিছু করিবে না আমরা সব করিব, তখন ছিল দেশের লোকের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা তাহারা নিজেরা করিবে।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ডিসপেচে একথা বলা হয়—ক্রমে ক্রমে এদেশে যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। ডাক্তার মাওয়েট নামক একজন ইংরেজ কোম্পানীর অধীনে চিকিৎসক হইয়া এদেশে আসেন। আমার যতদূর মনে পড়ে কিছুদিন তিনি মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশনের সেক্রেটেরী হন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলে তিনিই ছিলেন। তখন মফঃস্বলে অনেকগুলি স্কুলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। হুগলি বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঢাকা কলেজ তখনও হয় নাই, দুই একটী কলেজও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন কমিটির সেক্রেটেরী হিসাবে ডাক্তার মাওয়েটকে স্কুল কলেজ পরিদর্শন করিতে হইত। এ সম্বন্ধে তিনি একটা মন্তব্য লিখিয়া এখানকার গভর্ণমেণ্টকে দেন। তাহাতে তিনি বলেন—ক্রমশঃ ইংরেজী শিক্ষা এদেশে বিস্তৃত হইতেছে, ইহার মধ্যে একটী প্রধান অভাব এই দেখিতেছি—সব শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে এক সূত্রে গ্রথিত করিবার কোন চেষ্টা হইতেছে না। সবগুলি আলাদা আলাদা চলিতেছে। দ্বিতীয় অভাব এই—যাহারা শিক্ষা পাইতেছে তাহাদের শিক্ষার যথোপযুক্ত পুরস্কার ও প্রোৎসাহিত করিবার কোন ব্যবস্থা নাই,—এক সরকারী চাকুরী ছাড়া আর কিছুই নাই—এইজন্য তিনি প্রস্তাব করেন এদেশে ইউনিভার্সিটী প্রতিষ্ঠিত হউক। কেমেরেণ সাহেব পাবলিক ইনষ্ট্রাক্শন কমিটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, তিনি সে প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বিলাতে পাঠান। বিলাতের কর্ত্তারা বলেন—না না, ওদেশে এসব করিলে চলিবে না। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ বদলাইবার কথা হয় তখন যে পার্লিমেণ্টরী কমিটি বসে তাহাতে এদেশের শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা হয়, যাহারা সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে এডুকেশন কমিটির সভাপতি হিসাবে কেমেরেণ সাহেব ছিলেন। তিনি বলেন—ভারতবর্ষে বিশ্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। তাঁহাকে জেরা করা হয়,—কমিটির একজন সভ্য জিজ্ঞাসা করেন, ভারতবর্ষের লোকের কাছে আমাদের বি এ, এম এ উপাধির কোন মূল্য আছে? তাহারা কি ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে? বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়া তাহারা কি রাজা মহারাজা ইত্যাদি উপাধি চাহিবে না? কেমেরেণ বলেন—না, তাহা নহে, বি এ, এম এ উপাধি দিতে হইবে। আমাদের দেশে যে সকল অসাধারণ পণ্ডিত বিদ্যালঙ্কার, তর্কালঙ্কার, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত ছিলেন তাঁহারা যে ইউরোপীয় উপাধিধারী পণ্ডিতগণের মাথার উপর পা তুলিয়া দিতে পারেন—এই ধারণা কমিটীর মেম্বরদিগের ছিল না। আমাদের দেশে কত বড় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল স্বপ্নেও তাঁহারা তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই। কমিটিতে সমস্যা উপস্থিত হইল, রাজা মহারাজা উপাধি দিতে হইবে, না বি এ, এম এ উপাধি দিতে

হইবে। শেষটা কেমেরেণ সাহেবের সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ঠিক হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি কলিকাতা মাদ্রাজ ও বোম্বাইএ তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই তারিখে প্রতিষ্ঠিত না হইলে পরে আর হইত কিনা সন্দেহ, কেননা মে মাসে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। ১লা জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়—আগেকার কেলেণ্ডার খুলিয়া দেখিলেই সকলে তাহা জানিতে পারিবেন। এই বিশ্বিদ্যালয়ের প্রথম ফেলো ছিলেন—প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আর একজন মুসলমান, আরও একজন, এই ৬ জন, বাকী কয়েক জন সাহেব ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দ্বারা নূতন একটা শিক্ষার ব্যবস্থা হইল, লাট্ কুর্জ্জনের সময় পর্য্যন্ত যে ব্যবস্থা ছিল আগামী বারে তাহা বলিতে চেষ্টা করিব।*

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

আধুনিক বাংলাসাহিত্যে বাউল-প্রভাব

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতার ইতিহাস বলিতে আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবের কথাই বুঝিয়া থাকি। মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস ত বটেই, বাংলার চিরপ্রচলিত নীতি-কবিতাকে আমরা হুবহু ইউরোপীয়-মার্কা-মারা মনে করি। এসব বাদ দিয়া বাংলা গানকেও আমরা আমাদের জাতীয় হৃদয়-মনের অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া লই কিনা সন্দেহ। নিধুবাবুর টপ্পা, কবি-আলাদের গান, ঢপ, ও কীর্ত্তনের পরে ঈশ্বর গুপ্তের নীতিবিষয়ক কবিতা ও আধ্যাত্মিক আদিযুগের ব্রাহ্মসঙ্গীতকেই অনেকে ইউরোপের আমদানি বলিয়া মনে করেন। এই যুগ কাটিয়া গেলে ক্রমে ক্রমে একদিকে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনসেন প্রভৃতির পৌরাণিক মহাকাব্য, ও রঙ্গলাল ও অন্যান্যের ঐতিহাসিক কাব্য,এবং আর এক দিকে কবিগুরু বিহারিলাল, ও তাঁহার পথানুসারী নবভাবের গীতি-কবির-দল, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত করেন। এই ধারার প্রবলবেগে বাংলার প্রাচীন রূপক-রহস্য-মূলক গানের স্রোতে ভাটা পড়িয়া যায়। নতুন যুগের নতুন জাগরণ ও উপযোগের জন্য নতুন প্রকারের সাহিত্যই বাঙালীর মনকে আকৃষ্ট করে। এই সাহিত্য মানবীয় প্রেম, স্বদেশপ্রীতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রভৃতির দিকে নতুন করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে শিখাইয়াছে—প্রাচীন পরকাল মূলক ও দেবলীলা-মূলক সাহিত্যকে আসর হইতে সরাইয়া দিয়াছে।

---

* থিওজফিক্যাল সোসাইটি হলে ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা—শ্রীইন্দ্রকুমার চৌধুরী কর্ত্তৃক সংক্ষেপ-লিপিবদ্ধনপদ্ধতিক্রমে লিখিত।

কিন্তু আজ এই বিংশ শতাব্দীতে অতীতের দিকে চাহিয়া দেখি—উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য আলোকে যে নানা বর্ণ ও গন্ধময় কবিতার ফুল ফুটিয়াছিল—তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন রহস্যমূলক বাউলপ্রভাবান্বিত একটি প্রবল সাহিত্য তৈরি হইয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু কেহ তাহাকে গ্রাহ্য করে নাই—কেহ তাহাকে আমল দেয় নাই। এই যে চিরকালের সসীম-অসীমের লীলার প্রশ্ন—যাহা আধুনিক শিক্ষিত ও মার্জ্জিতরুচি বাঙালীর মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল—তাহা বহুকাল ধরিয়া অযত্নে বাঙালীর ঘরের অন্ধকার কোণে অল্প কয়েকটি বাঙালীর মানস-রসে লালিত হইতেছিল, তাহাকে কেহই কবিতার আম্-দরবারে উপস্থিত করিবার জন্য উপযুক্তভাবে সাজাইয়া তোলে নাই। যাঁহারা এই ধারাটি গুপ্তভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা সমাজে অপরিচিত বা প্রাচীন ও সম্প্রদায়ী বাউলদের মত উপেক্ষিত না হইলেও তাঁহাদের অন্যান্য গদ্য-পদ্য রচনাকে অন্যের সম্মুখে উপস্থিত করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না, কিন্তু বাউল প্রভাবান্বিত গানগুলিকে যেন সেরূপ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এগুলি যেন তাঁহাদের দরদের জিনিস ছিল।

এইখানে একটি কথা বলা দরকার। দেশে ও বিদেশে প্রাচীন ও সম্প্রদায়ী বাউলদিগের গানের আলোচনা করিয়া ও ইহার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যানুরাগীর ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার কবি-দৃষ্টির ও হৃদয়ানুভূতির কাছে বাউলের আসল রস ও রূপ ধরা দিয়াছে। তাই তিনি বাউলের কথা বহু যায়গায় আলোচনা করিয়া—এমন কি দার্শনিকদিগের গুহার দ্বারে বাউলের একতারার ধ্বনি জাগাইয়া যে সত্য সেখানে মুখ-ঢাকা হইয়া আছে তাহাকে বাউলের স্পষ্ট সুর ও রসের অলোকে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়া—নিজের কবি-জীবনের একটি গূঢ় রহস্যের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি গত শতাব্দীর শিক্ষিত বাউলপন্থীদের সাহিত্যের আলোচনা করেন নাই। এই প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া এই নতুন বাউলদের কথাই আলোচনা করা গেল।

প্রথমে প্রাচীন বাউলদের কথা ও তাহাদের রচিত সাহিত্যের কিছু বলিলে ভাল হয়। এখনও যে বাউলদিগকে আমরা দেখিতে পাই তাহারা বাউল বৈষ্ণব বা সহজিয়া বৈষ্ণব। ইহারা বড় কম দিনের প্রাচীন সম্প্রদায় নহে। ইহারা বোধ হয় নিতান্ত ঠেকায় পড়িয়াই অথবা কাল প্রভাবেই বৈষ্ণবভাব গ্রহণ করিয়াছে। চৈতন্য-যুগের পরে রচিত সহজিয়া সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের লীলার কথা আছে বটে—কিন্তু ক্রমে ক্রমে রাধাকৃষ্ণের কথা উহারা ছাঁটিয়া ফেলিয়া মানুষ ও ঈশ্বরের প্রেম-লীলার চিরন্তন রহস্যকেই গানের বিষয় করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বহু প্রাচীন মতের ধারা আসিয়া মিলিয়াছে। বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, নাথ এমন কি মুসলমানী ভাব ও সাধনার অঙ্গ ইহারা গ্রহণ করিতে ত্রুটি করে নাই। অর্থাৎ ধর্ম্মজীবনের মূল উৎস যে পরম রহস্যানুসন্ধান তাঁহার জন্য ইহারা

কোন মত বা পথকেই চরম ও একতম বলিয়া মনে করে নাই। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি 'তত্ত্ব' গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের ভাষাও নিছক রূপকের ভাষা—ইহারা যেসব তত্ত্বের তল্লাস করে তাহা অন্যের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিবার জন্য প্রহেলিকার মত ভাষা ব্যবহার করে। ইহা প্রাচীন বৌদ্ধ 'সন্ধ্যাভাষা' ও বৈষ্ণব 'আর্য্যা-তর্জ্জা' বা "প্রহেলীর" ভাষার মত। বৈষ্ণবদের মধ্যে যাহারা 'ভাবক' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের কথাও এই সঙ্গে মনে পড়ে।

বাউল সম্প্রদায় সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। এখানে শুধু তাহাদের সাহিত্য সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। বাউলদের রচিত সাহিত্যে দুইটি ভাগ আছে—একটি তত্ত্ব প্রকাশের জন্য, আর একটি রসানুভূতি প্রকাশের জন্য। প্রথমটি Mystic বা মরমী বা ভাবক দিক—দ্বিতীয়টী কবিত্বের দিক। ইহার প্রথমটি সম্প্রদায়ী লোকের সাধন পথের সাহায্যের জন্য রচিত বলিয়া বোঝা যায়। সুতরাং এই প্রকারের তত্ত্ব-কণ্টকিত রচনাকে "সাহিত্য" বলা যায় কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। এইজন্য "দেহতত্ত্বের" দুর্গের মধ্যে লোকে সহজে প্রবেশ করিতে চায় না। আর যখন তত্ত্ব বা সত্য সাধকের অন্তরালোকে উদ্ভাসিত হইয়া সৌন্দর্য্যময় ও মাধুর্য্যময় হইয়া উঠে, তখন এই দ্বিতীয়টির অর্থাৎ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হয়। বাউলদের রচিত "অনুরাগতত্ত্বের" গানগুলি তাই সাহিত্য-শিল্প হিসাবেও খুব উচ্চ ধরণের। বাউলের গানে সাধারণের অত্যন্ত অসুবিধাজনক ব্যাপার এই যে এই দুইটি ভাগ প্রায়ই পরস্পর এরূপ ভাবে জড়াইয়া থাকে যে ইহাদিগকে আলাদা করা যায় না এবং তত্ত্বের মেঘঘটার মধ্যে রসের বিদ্যুৎ-লীলা কাব্য-সন্ধানীকে অনেকটা ধাঁধিয়া ফেলে। অধিকাংশ গানেই তত্ত্বের ভাগ এত বেশী থাকে যে রস নির্ম্মমভাবে ব্যাহত হইয়া শুকাইয়া যাইতে বাধ্য হয়। "নিশীথে যাইওরে ভোম্‌রা ফুলবনে," এই কথার পরেই যদি আমরা শুনি যে "নয় দরজা কইর‍্যা বন্ধ, লইওরে ভাই ফুলের গন্ধ" তবে এই গানের ও কবির প্রতি আমাদের মনের দরজাও বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। বাউলগান হইতেই আমরা বাউল কবির পরিচয় পাইতে পারি—যাঁহার সূক্ষ্ম রসানুভূতি ও প্রকাশক্ষমতা ছিল তাঁহার কবিতায় রসের ভাগই বেশী পাই, তত্ত্বের ভাগ কম।

উনবিংশ শতাব্দীর বাউলপ্রভাবান্বিত সাহিত্যে আমরা বাউলের এই দোষ ও গুণ দুইটিই দেখিতে পাই। যাঁহারা এই সব বাউল-সঙ্গীত লিখিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই হয় ইংরেজীতে না হয় বাংলা ও সংস্কৃতে বেশ শিক্ষিত ছিলেন অথচ তাঁহারা কেন যে আদৌ বাউল গান লিখিতে গেলেন, এবং গেলেন ত অনেক গানে প্রাচীন তত্ত্বের বাড়াবাড়ি করিতে গেলেন তাহা বুঝিয়া উঠা বড় সহজ নহে। তখনকার দিনের ব্রহ্ম-সঙ্গীত ও নতুন ধরণের নীতি-কবিতা বর্ত্তমান থাকিতেও কোন্ প্রেরণায় তাঁহারা এই বাউল-পন্থা অবলম্বন করিলেন তাহা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি সমস্যা। তখন একটি নব-হিন্দুবাদ

গড়িয়া উঠিতেছিল—তাহাতে প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও শক্তিপূজা নতুন আকার ধারণ করিতেছিল। এই নব হিন্দু ধর্ম্ম উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুর মনের উপযোগী করিয়া নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করিতে ছিল। এমন দিনে কয়েকজন নব মতের ব্রাহ্ম ও প্রাচীন মতের হিন্দু বাউল গান লিখিতে চেষ্টিত হইলেন কেন—ইহা আমাদের লক্ষ্য করিয়া দেখা দরকার। শুধু এক জন দুই জন নয় পরম্পরাক্রমে এই বাউলের ধারা নব্য সমাজের ভিতর দিয়া একেবারে বিংশ. শতাব্দীতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আর একটি বিষয় এই যে, শিক্ষিত ব্যক্তির লিখিত এই সব গান সেকালের শিক্ষিত ব্যক্তিরা ঠিক গ্রহণ করেন নাই—বোধ হয় এই কবিদিগকে একরকমের খেয়ালী মনে করিয়াছিলেন। এই সব সখের (?) বাউলেরা কিন্তু প্রাচীনপন্থীদের মত নির্জ্জনবাসী ছিলেন না—ইঁহারা সমাজেই বাস করিতেন, কলিকাতা বা ঢাকা সহরেই বাস করিতেন। কেহ কেহ অবশ্য দল বাঁধিয়া গান করিতেন। ইঁহারা 'বৈরাগী' ছিলেন না—বোধ হয় 'বিরাগী'ও ছিলেন না। ইঁহারা সহজিয়া মতে চলিতেন না—আর রাধাকৃষ্ণ লইয়াও গান রচনা করেন নাই। এই কবিদের রচনার মালমশলা যেরূপ প্রাচীনতত্ত্ব—তাঁহাদের গানের সুরও পুরাণো বাউলের সুর। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত কর্ম্মরত বাঙ্গালী জীবনের জ্বলন্ত মধ্যাহ্নে বাউলের এই দূর-হতে-ভেসে-আসা নিশীথরাতের উপযুক্ত কাঁপানো কাঁপানো সুরটি আজ আমাদের কাছে যেন কেমন খাপছাড়া ঠেকে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাউলপন্থীরা যদি পাশ্চাত্য-পন্থী সাহিত্যিকদের মত খুব ক্ষমতাপন্ন হইতেন তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা শুধু প্রাচীন ধরণে না লিখিয়া একটি নতুন ধরণের সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই দলে কেহই মাইকেল, নবীন, হেম, বিহারিলাল প্রভৃতির মত ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাই ইঁহারা প্রাচীন বাউলদের তত্ত্বের গণ্ডীকে সহজে ছাড়াইয়া তাহাদের রসভাণ্ডারকে বিশ্বজনের উপভোগ্য করিয়া তুলিতে পারেন নাই।

গত শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে সেকালের কাব্য রসিকদের মধ্যে যাঁহারা mysticismএর পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারা অনেকে ফার্শী সুফীদিগের কবিতা ও বিশেষতঃ হাফিজের কবিতার ভাবে ভরপুর ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, অশ্বিনীকুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়দিগের কথা সকলেরই জানা আছে। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে সে সময়েও কাব্যের অন্যান্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে মরমী সাহিত্যেরও কিছু আদর ছিল, কিন্তু শিক্ষিত বাঙালীরা নবযুগের পাশ্চাত্য ভাবান্বিত সাহিত্য'ও সাধারণে প্রাচীন কীর্ত্তন, ঢপ, যাত্রা ও পাঁচালীই'(যথা—কৃষ্ণকমল গোস্বামী, মধুকাণ, দাশুরায় প্রভৃতির) বেশী পছন্দ করিত। এ যুগের প্রাচীন বাউলদের গান দুচার জনের কাছে আদর পাইত। রামকৃষ্ণ পরমহংস সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের মধ্যে বাউলদেরও স্থান দিয়াছিলেন, আর নিজে বাউল গানও গাহিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ধর্ম্ম বিষয়ে উদাসীন হইয়াও বাউল গান শুনিতেন।

যেসব কবি ভাবুকতায় উচ্চস্থানীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারেন নাই তাঁহারা গত শতাব্দীর ইংরেজের আমদানি নতুন নতুন জিনিষের রূপক দ্বারা অধ্যাত্ম-তত্ত্ব প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন।" কেহ রেলগাড়ী, কেহ ষ্টিমার, কেহ বেলুন, কেহ ইস্কুল, কেহ জলের কল প্রভৃতি নিতান্ত কাজ চালানো ও গদ্যময় জিনিষকেও কবিত্ব প্রকাশের মালমশলা রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। এঁদের মনে ভাবের জন্য কোন ভাবনাই নাই—কোন জিনিষ উপলক্ষ্য রূপে পাইলেই হইল।

এইবার ক্রমে ক্রমে আমি এই যুগের বাউলপন্থী সাহিত্যের পরিচয় দিব। পূর্ব্বে যেরূপ দেখান গিয়াছে বাউল-সাহিত্য দুইভাগে বিভক্ত— তত্ত্ব ও রস। সেই বিভাগ অনুসারে এখানে প্রথমে তত্ত্বপ্রধান সাহিত্যের পরিচয় দিয়া পরে রসপ্রধান সাহিত্যের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ক্রমে ক্রমে তত্ত্ব খসিয়া যাইয়া রস প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

স্যর কে, জি, গুপ্তের পিতা কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় বাউল ধরণের গান রচনা করিতেন। তাঁহার রচিত "ভাবসঙ্গীত" নামে একটি গানের বই আছে। তাঁহার একটি গান দেওয়া আছেঃ—

> দেখ্ জহুরা নয়ন খুলে, ভগবান কি করে রে।
> কেমন আজব সলি আজব নলী, আজব গড়ন গড়ে রে॥

অক্ষয়কুমার গুপ্ত নামে একজন লেখকের একটি গান—

> দেহ গোপীযন্ত্র বাজাও জোর করে।
> বাজারে খুব, গুব্ গুবাগুব্, গৌরাঙ্গ প্রেমের ভরে॥

নবকিশোর গুপ্তের একটি গান—

> চাল দিয়ে মুড়ি খাওয়া নয়,
> মানুষ উড়্তে গেলে মর্তে হয়।

আনন্দচন্দ্র দাস রচিত একটি গান—

> আরে তোর দিল্‌কা ভিতর,
> সোণার কেতাব নয়ন বাগানখানা, আরে তোর দিল্‌কা ভিতর।

এই ভাবের সঙ্গীতরচয়িতাদের মধ্যে আমরা গোলোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে দীন বাউল, প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী ওরফে ফিকিরচাঁদ প্রভৃতিকে গণ্য করিতে পারি।

একটি অজ্ঞাত কবির গান—

> স্বরূপের বাজারে থাকি।
> শোন্‌রে ক্ষেপা, বেড়াস্ একা, চিন্‌তে নার্‌বি ধর্‌বি কি।

এই গানগুলির সঙ্গে নীচের গানগুলি তুলনা করিলে দুইটি স্তরের মধ্যে কতটা তফাৎ তাহা স্পষ্ট দেখা যাইবে। তত্ত্ব ক্রমে ক্রমে রসের দিকে আসিতে চেষ্টা করিতেছে।

আনন্দচন্দ্র মিত্র সেকালের একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন—তাঁহার বহু লেখা আছে। বাউল সঙ্গীত রচনা কালে তিনি 'পথিক' নাম গ্রহণ করিতেন। তাঁহার একটি বাউল গান :—

দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোণা।
তারে ধরি ধরি মনে করি, ধর্‌তে গেলাম, আর পেলাম না॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন সেকালের একজন ধর্ম্মান্দোলনের নেতা ও বাগ্মী ছিলেন। তাঁহার একটি বাউল গান :—

স্বপনে, মন যে কেমন মানুষ রতন দেখিয়াছে।
সে যে, অ-ধর মানুষ, দেয়না ধরা, ধরিতে মন হার মেনেছে।

একজন অজ্ঞাত কবির গান—

বল কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে।
আঁধার ঘরে জল্‌ছে বাতি, দিবারাতি নাই সেখানে॥

কৃষ্ণকান্ত পাঠক প্রাচীনতন্ত্রের লোক হইলেও তাঁহার গান বাউল-রসে রসিয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়াছে—

(১) যারে মন দিলে মন পাইতে পার তারে দিলে কই।
আমি হলেম আমার মত তার মনের মত হলেম কই॥

(২) প্রেমের দাগ মাখা রাগ অন্তরে যার তার তুলনা কই!
নয়ন মন তার কাছে কাছে সে বিনে প্রাণ বাঁচে কই॥

(৩) জানি কার রূপ সাগরে ঝাঁপ দিয়ে ও গৌর হয়েছে।
তারে ধর্‌বে বলে ঝাঁপ দিলে, থাই পেলেনা, নদেয় উঠেছে॥

(৪) যার যার যে রূপের উদয় হয় মনে, সময়ে সে রূপের দেখা দিলে কই।
সদানন্দ রূপ, রূপেরই স্বরূপ, সে রূপ বিহনে সদানন্দ কই।

(৫) খোঁজে তায় কোন্ স্বরূপে মনের মানুষ মিশে গেছে।
ও তায় পায় না দেখা, তাইতে একা, দেখার লেগে কাঁদ্‌তে আছে॥

চন্দ্রনাথ দাসের একটি গান—

এমন আজব বিষয় ভাব্‌তে যে মন অবাক্ করে।
ওরে আকার বিকার নাই কিছু যার সে কেমনে চিত্ত হরে?

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী mystic-দিগের মধ্যে হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের স্থান খুব বৈশিষ্ট্যময়। তাঁহার রচনায় পূর্ব্বোক্ত দুইটি ধরণই বর্ত্তমান আছে। তাহার তত্ত্বমূলক বাউল সঙ্গীত গুলিতেও নিজের একটা আলাদা ছাপ আছে দেখা যায়। নীচে এরূপ কয়েকটি গান দেওয়া গেল—

(১) শূন্য ভরে একটি কমল আছে কি সুন্দর।
নাই তার জলে গোড়া, আকাশ-জোড়া, সমান ভাবে নিরন্তর।

(২) আমি বুঝ্‌তে নারি, ভেবে মরি, ঘটিল একি!
আমি ডিমে এলেম্, ডিমে রলেম্, হোতে নারিলাম পাখী॥

(৩) দুনিয়ার আজব গাছে সদা বসে আছে দুই পাখী;
কেহ বাসা ছেড়ে নাহি নড়ে দুজনে মাখামাখি, (ভালবাসায়)।

(উপনিষদের সেই প্রসিদ্ধ অধ্যাত্ম রূপক)

(৪) ডাকে করুণ স্বরে, পাখীর হল কি?
একে ঘোর রাতি, মাঝে নদী, দু' পারে দু' পাখী।

(৫) কেমন করুণ স্বরে ডাক্‌ছে ওরে, দুই ঘুঘু পাখী।
বসি বিজন বনে, ও দুইজনে, কর্‌ছে রে ডাকাডাকি, (পরস্পরে)।

(৬) মরি কার এ বালিকা ধূলাখেলা খেলিতেছে।
এই যে অসীম জগতের মাঝে একাকিনী বসে আছে, (অভয়া হয়ে)।

('প্রকৃতি' সম্বন্ধে এরূপ কথা বেশ নতুন ও কবিত্বময়)

(৭) দেখ আসমান জুড়ে আছে আজব পুরুষ একজনা!......
আকাশ তারে বেড়ে নাহি পায়, তাই সে পুরুষ চিরকালই লেংঠা হয়ে রয়......।

(৮) ভয় কি আছে, বিরজাতে, পদ্ম ফুটেছে।
পদ্ম সুনিরমল, সহস্রদল, টলমল ঐ করিছে, (ভক্তিরসে)।

আবার কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের গানে বিশুদ্ধ অনুভূতির কথাও আছে—

(১) নাইরে প্রাণবল্লভ আমার এ ঘরে।
ওরে, তাই বলি বিরহ রে, তুমি রহ হৃদ্‌মন্দিরে।

(২) ওরে সরোবরে রসভরে কমল ফুটেছে।
ঐ যে, মধু আশে উড়ে এসে, ভ্রমরা সকল জুটেছে, (রসিক মন)।

(৩) আমারে পাগল করে যে জন পালায়, কোথা গেলে পাব তায়।
তারে না হেরে প্রাণ কেমন করে, হিয়া আমার ফেটে যে যায়।

এই যুগেই বাঙ্গালী mystic-দিগের মধ্যে যেন নূতন একটা প্রাণ আসে। তাঁহারা প্রাচীন তত্ত্বটিকে একেবারে বাদ দিয়া নিজেদের অধ্যাত্মাকাঙ্ক্ষার আকুলতাকে এমন একটি রূপ দিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহাদিগকে প্রাচীন বাউলদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলিয়া বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না, অথচ সেই সঙ্গেই দেখি উহাদের ব্যবহৃত বাহিরের symbol বা রূপকগুলি ইহারা বর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন।

একটি অজ্ঞাত কবির গানে আছে—

না জানি হরি কেমন, নামটী এমন মিঠা এত।
দয়ালের নাম শুনে হয় মন উচাটন, দেখ্‌লে জানি কেমন হত!

পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ দাসের একটি গান দেওয়া হইয়াছে। এবার তাঁর আর একটি গানে দেখা যাইবে হঠাৎ কোন কোন সময়ে মানুষের জীবনে যে এক "মহাভাব" ক্ষণকালের জন্য প্রকাশিত হয় তাহার আগমনীর কি একটি সুন্দর আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে।—

কে যেন কি ভাবে আসে জানি না, কিছু বুঝি না,
সে ভাব জীবনে প্রায় ঘটে না।
চকিতে চপলা প্রায়, চিক্ দিয়ে চলে যায়,
হৃদি যন্ত্র বাজে বাজে বাজে না।

এখন আমরা উনবিংশ শতাব্দীর একটি শ্রেষ্ঠ mystic ইন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইহার নাম বোধ হয় খুব কম লোকেরই জানা আছে। ইনি অতি গোপনভাবে জীবনকে গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন—আর নিজের পুস্তকে নিজের নাম দিতে অনুমতি দেন নাই। বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "রসলীলা" নামে যে গানের বই প্রকাশ করেন তাহাতে "প্রকৃতি" "গায়িকা" এইরূপ লেখা আছে। তাঁহার এই সব গান সেকালের রসজ্ঞ রাজনারায়ণ বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতির কাছে অত্যন্ত আদর পাইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য কাব্য-চেষ্টার চাপে পড়িয়া এই মরমী কবি ও সাধকের গানগুলি আমাদের সাধারণ শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টির অন্তরালে কাগজের পাতা আশ্রয় করিয়া কোন রকমে টিকিয়া আছে—কেহই আদর করে নাই, উপভোগ করে নাই। ইঁহার গানগুলি আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে ইহাতে একটা নতুন ও আধুনিক ধরতা আছে। আর ইনি পুরাণো বাউলের সুরটি ব্যবহার করেন নাই। ইনি প্রাচীন ও সম্প্রদায়ী বাউলদের মত সাধনতত্ত্ব ও পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া গান রচনা করেন নাই—বিশ্বাত্মার দিকে মানুষের মন উন্মুখ হইয়া উঠিলে নানা অবস্থায় মানুষের জীবনে যে একটি গভীর রসের সঞ্চার হয় ইনি সেই রসেরই কারবারী। এই রস-ঘন অনুভূতিই যুগে যুগে mystic সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষকে এই রস-তৃষ্ণা কোন যুগেই স্থির থাকিতে দেয় না—আকুল করিয়া তোলে—তাই দেখি উনবিংশ শতাব্দীতেও আমাদের দেশের সাহিত্যে যখন বান ডাকিয়াছিল তখনও mystic ভাবের ফল্গু ধারাটি একেবারেই শুকাইয়া যায় নাই; বরং উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ইন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের গানে একেবারে অজস্র ধারে বহিয়া চলিয়াছিল। ঝরণা-ধারার মাঝে মাঝে যেরূপ নুড়ী বহিয়া চলে, সেইরূপ ভাবের স্রোতে দুই একটা তত্ত্বসূচক কথা গানে আছে বটে, তবুও তাতে রস-স্রোতের বাধা হয় নাই। নীচে ইন্দ্রনাথের কয়েকটী গান দেওয়া গেল—

(১) ভিতরে অতিদূরে বাজে বাঁশী।
ওই আমি চাই, ছেড়ে দাও যাই, প্রাণ উদাসী, (হ'ল)

(২) ওরে, ওই ওকি শুনিরে, ও যে সেই স্বর!
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আকুলিয়ে হিয়ে, ছুটে দূর দূরান্তর।

(৩) প্রাণ মাঝে কেন ওঠে গো এ করুণ স্বর,
ও স্বর শুনিয়ে এ পাষাণ হিয়ে কেমন করে গো।

(৪) মায়াপুরে প্রাণময় ঘরে
কে জাগে অই! নাহি দিবা কিবা রজনী।

(৫) একি আজ কিরে, আইল ফিরে, সখা আমারি;
আঁধার ঘরে আলো নামিল।

(৬) ভোমরা রে! কি মধু পিয়িয়ে হলি ভোর।
ওরে তরল পরাণ তোর জমাট বাঁধিল রে!

(৭) কাল কি সুন্দর সে মোর কি জানি কেমন কই?
অনন্ত রূপের মাঝে ক্ষুদ্র প্রাণ হারা হই।

(৮) সে কোন্ জোছনা দেশ সইরে?
অগণন চকোর, মধুপানে বিভোর, নাহি জানে নিত্যসুখ বই রে।

(৯) এতদিন পরে এলি ফিরে ঘরে
হারান মণি দয়া কিরে হল এতদিনে।

(১০) বঁধুয়া রে,—ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলি তুই মোর।
তোরে বুকে করি আমি পাগলিনী তোর।

(১১) এমন ক'রে মজাইয়ে (এখন) ফাঁকি দিতে চাও আমারে।
আমি মজেছি ত মজেইছি নাথ ছাড়্ব না আর তোমারে।

(১২) মরণের বিষ সই কই রে?
আদরে তুলিয়ে মুখে, তৃষায় চুমিব সুখে,........।

এ যুগে আরও কত জনে যে বাউল গান লিখিয়াছিলেন তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। পাঁচালীকার রসিকচন্দ্র রায় ও হাস্যরসিক রূপচাঁদ দাস ওরফে রূপচাঁদ পক্ষীর বাউল গানের কথা জানা যায়। প্যারীচাঁদ মিত্রেরও দু একটা গানে বাউলভাব দেখা যায়। কবি বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীর "বাউল বিংশতি" নামে কতকগুলি গান আছে। ইহা "সকের বাউল কুড়ি জনের" গান। ইহার একটু নমুনা—

(১) এ চাঁদ কোথায় পেলে! বল এ চাঁদ কোথায় পেলে।
ত্রিভুবন আলো কোরে পদ্মফুলে খেলা করে সোণার ছেলে।

(২) প্রেমের সাগরে ফুলতরণী, চিরবিকশিত নলিনী!
সৌরভেতে স্বর্গ হাসে, আকাশে থেমে দাঁড়ায়—
দেখতে তোমায়, থেমে দাঁড়ায় দামিনী।

সীতানাথ দত্ত রচিত ভাটিয়াল সুরের একটি গান অনেকেরই জানা আছে—

হৃদয় দুয়ারে আজি কে আইল ও
কাহার মধুর বাণী শুনিলাম ও……।

এবার আমরা আজকালকার হইলেও প্রায় প্রাচীন তন্ত্রের একজন লেখকের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া লইব। ইঁহার নাম মনোমোহন দত্ত। ইঁহার রচিত "মলয়া" নামে গানের বই আছে। ইনি পল্লীগ্রামবাসী ও তেমন শিক্ষিত নহেন। ইঁহার গানে বাউল-প্রভাব ও Mystic স্পর্শ আছে বলিয়া ইঁহাকে উপেক্ষা না করাই ভাল। ইঁহার কয়েকটি গান দেওয়া গেল :—

(১) ধীরে ধীরে আঁখিনীরে, কি জানি কি কথা কয়।
সপ্তস্বরে তিনগ্রামে, অনাহত ধ্বনি হয়।

(২) তাঁরে কাছে ডেকে আন্; তাঁরে কাছে ডেকে আন্।
যাঁরে দেখ্‌লে জুড়ায় পোড়া আঁখি, ডাক্‌লে জুড়ায় প্রাণ।

(৩) বাঁশী বাজিলে কি হবে—
আমি ত শুনি না বাঁশী, যে শুনে সে যাবে।

(৪) বললো সজনি আমার সে কই সে কই—
যাহার লাগিয়ে উদাসী হইয়ে, পাগলিনী সেজে রই।

(৫) যাবনা সজনি আর সে দেশে।
যে দেশের মানুষের সনে মন না মিশে।

(৬) যে যারে নিয়ত ভাবে সে তার স্বভাব পায়।
প্রেমিকের এম্‌নি ধারা, চোখ দেখ্‌লে তা চিনা যায়।

(৭) অচেনা এক পাখী আমার খাঁচার ভিতর করে খেলা।
ধর্‌তে পার্‌লে মন বেড়িতে, বেঁধে ফেল্‌তাম এই বেলা।

উপরে যাহা লেখা হইল তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে আমি এই প্রবন্ধে রাধাকৃষ্ণ লীলামূলক Mystic কবিতার লেখকদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করি নাই। সেইজন্যই গত শতাব্দীর শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের "কালাচাঁদ-গীতা" ও এ শতাব্দীর লেখক-দিগের মধ্যে ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী প্রভৃতির কবিতা বা গানের প্রসঙ্গ উঠে নাই। বৈষ্ণবতত্ত্ব ও বাউলতত্ত্ব দুইটি ধারা আলাদা হইয়া পড়িয়াছে—আমি এই প্রবন্ধে দ্বিতীয়টির কথাই বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার যে নিধুবাবুর গানের মত একটু

একটু দেখাইলেও এ গানগুলি অপ্রাকৃত প্রেমের কথা লইয়া রচিত এবং নিধুবাবুর গানে স্বধু প্রাকৃত প্রেমেরই কথা।

আমার প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে একটি কথা বলিতে চাই। এ পর্য্যন্ত আমরা উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজের বাউল-ধরণের Mystic লেখকদের সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু আমরা জানি যে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন পন্থী বাউলদের রচিত যে একটি সাহিত্যের সন্ধান ক্রমে ক্রমে পাওয়া গিয়াছে তাহার তত্ত্বপ্রধান গানগুলিকে না ধরিয়া শুধু ভাবপ্রধান গানগুলি দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে সেই সব অশিক্ষিত ও অনাদৃত কবিরা মানুষের অন্তরতম সত্য ও গোপনতম রহস্যের রসিক ও সন্ধানী হিসাবে আধুনিক লেখক-দিগের অনেকের মতন উচ্চ স্থান অধিকার করিবার দাবী রাখেন। এই যুগের এই শ্রেণীর বাউলদের কয়েকটি গান দেখিলেই আমার এ কথার অর্থ বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হইবে না :—

(১) চোখে দেখে গায়ে ঠেকে ধুলা আর মাটি।
প্রাণ রসনায় দেখ্‌রে চাইখা রসের সাঁই খাঁটি।

(২) কোন্ ফুলের্ সৌরভ রে নিতাই এনে জগৎ মাতালিরে।

(৩) মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা।
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।

(৪) ওগো দরদী—ওগো দরদী,
আমার মন কেন উদাসী হইতে চায়।

(৫) বন্ধু এবার খেল্‌বে হোরি শুধু তোরি আঙিনায়,
ওরে তোর দুয়ারেই ফুল ফুটেছে, আর কোথাও ফুল যে নাই।

(৬) পরাণ আমার সোতের দীয়া, (আমায় ভাসাইলে কোন্ ঘাটে)।

(৭) ব্রেথা তারে খুইজে মরা মাটির এই বৃন্দাবনে।
ভূইঞে নি সে বস্‌বারি ধন, বস্‌বে হিঞের সিংহাসনে।

(৮) মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পার্‌লাম না।
আমি জনম ভইর‍্যা বাইলাম্ বৈঠা রে—
তরী ভাইটায় সয় আর উজায় না।

(৯) আমার ডুব্‌ল নয়ন রসের তিমিরে,
কমল যে তার দল গুটালো আঁধারের তীরে।

(১০) আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তাঁর উদ্দিশে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

(১১) আকাশের গায়ে আলো ফুটেছে, এবার দয়াল ফুটেছে আখীর।
আমি প্রভাতে জাগিয়া দেখি দয়াল আমার সম্মুখে জাহির রে, সম্মুখে জাহির।

এই ধরণের অন্যান্য বহু গান লোকের সম্মুখে ধরিয়া তুলিয়া রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুত যোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত প্রভৃতি, ও "প্রবাসী", "প্রতিভা" প্রভৃতি অনেক মাসিক পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন।

সামাজিক অবস্থা, পদমর্য্যাদা, বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞান এই সমস্ত হিসাবে পরস্পর সম্পর্কশূন্য আধুনিক বাংলার দুইটী দলের ভাবুকতা ও সাহিত্যচেষ্টা তুলনা করিয়া দেখিলে আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারি যে মানুষে মানুষে বাহিরে যতই তফাৎ থাকুক না কেন, যেখানেই মানুষ চরম ও চিরন্তন প্রশ্ন শুধু শাস্ত্রবাদ দিয়া মীমাংসা করিতে না চাহিয়া, নিজের হৃদয় লইয়া, অনুভব লইয়া উহার সম্মুখে উপস্থিত হয় তখনই নিজের অন্তর হইতে একটি জ্যোতির, একটি রসের সঞ্চার হয় তাহাতে সত্য ও মনুষ্য-জীবন দুইই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—সেখানে মানুষে মানুষে কোনই তফাৎ হয় না—তবে এই যে অন্তরিন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা ইহা যে ভাষায় বাহির হইয়া আসে তাহা মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা অনুসারে তফাৎ হয় বটে। আর একটি কথা এই যে যখন মানুষের এই অবস্থা হয় তখন তাহার গলার সুরেই আমরা ধরিয়া ফেলিতে পারি। এই জন্যই বোধ হয় দেশ কাল ও পাত্র হিসাবে পৃথিবীর যে কোন দেশের খাঁটি Mysticকে চিনিতে আমাদের ভুল হয় না।

একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিলে আমরা এখন আশ্চর্য্যান্বিত হই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গোঁড়া হিন্দুগণ যখন কবি, আখ্ড়াই, হাফ্ আখ্ড়াই, দাঁড়া কবি, ঢপ, পাঁচালী, কথকতা প্রভৃতি দ্বারা প্রাচীন পৌরাণিক ও পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের চর্চ্চা বজায় রাখিতেছিলেন—তখন পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মগন্ধি হিন্দুদিগের রচনার মধ্য দিয়াই বাউলের ধারা অক্ষুণ্ণভাবে বহিয়া আসিতেছিল। এই বাউলদের যাঁহারা বরণ করিয়াছিলেন তাঁহারা অবশ্য না জানিয়া বুঝিয়াই করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে চিত্তরঞ্জন দাশের মধ্যে বাউলভাব ছিল। এই জন্যই তিনি সাহিত্যে "রূপান্তরের" কথা বলিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার "সাগর সঙ্গীতে" সাগরের কথা খুবই কম, তাঁহার চিত্ত-সাগরেরই তরঙ্গের আভাস পাওয়া যায়। অতুলপ্রসাদ সেনও তাঁহার গানে বহু যায়গায় বাউলের কথা ও সুর কাজে লাগাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের গানে বাউল ভাবের মুক্তধারা তাঁহার নিজস্ব mysticismকে ছাপাইয়া উঠিয়া কি করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আপনার পথ করিয়া লইয়া বিশ্বভারতীর চরণে পৌঁছিয়াছে তাহা পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীরমেশ বসু

"জরথুষ্ট্র" *

(১)

প্রণাম তোমায়! প্রণাম তোমায়! আর্য্যজাতির আদিম গুরু!
বহ্নি-যাগের উদ্দীপনা, প্রথম তোমার বুকেই সুরু!
প্রাচীর পটে, বুকের তটে, জাগা'লে যে রুদ্রগীতি—
মানব-মনের অগ্নিকণা, একসাথে সব আন্‌লে নিতি;
প্রথম তোমার দীপ্ত আলো, জাগ্‌ল মানব-শতদলে—
পাপড়ি 'পরে রক্ত-রাঙ্গা বজ্রবেদন উঠ্‌ল জ্বলে!
রুদ্রদেবের হুঙ্কা বুঝি, জাগছে আজো আকাশ-পুরে,—
ভবন ভরে' যা' ছিল সব, বিলিয়ে দেছ ভুবন জুড়ে'?

(২)

প্রথম তুমিই বাঁধলে রাখী, ধর্ম্ম আনি' নীতির সাথে—
মুখের কথা রাখলে দূরে, বুকের বাণী তুল্‌লে মাথে!
বাক্যে, কাজে, চিন্তাধারায়, শুদ্ধি সুধা মন্ত্র দিয়া,—
কালের কালি ধৌত করি' উঠালে দেশ সঞ্জীবিয়া!
সংস্কারেরি সর্পপাশে পাষাণ-যুগের প্রাণের ব্যথা—
বীরাচারের গরুড়বাণে, শুনা'লে তায় মুক্তিকথা!
বিশ্বরূপী ভীষ্ম-লাগি' অস্ত্র হেনে ধরার বুকে—
সুরধুনীর সুধার ধারা, ফেললে এনে ক্লিষ্ট মুখে!

---

* [জরথুষ্ট্র বা জরোষ্টার ইরাণ দেশের ধর্ম্মপ্রচারক। কোন্ সময়ে যে তাঁহার আবির্ভাব হয় তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। কেহ বলেন খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে, কাহারও মতে খৃষ্টের জন্মের চতুর্দ্দশ শতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। ইরাণ দেশের তৎকালপ্রচলিত ধর্ম্মমতের সংস্কার করিয়া জরথুষ্ট্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে পৃথিবীতে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে অহুরো মাজ্‌দা (অর্ম্মজ=হিতকারী শক্তি) ও অঙ্গ্রো মইন্যুস্ (শয়তান) এর দ্বন্দ্ব চলিতেছে। অর্ম্মজ মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার অধিকার প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগকে এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। সুতরাং তাহারা নিজ নিজ প্রবৃত্তি বশেই অর্ম্মজের বা শয়তানের পূজা করে, এবং মৃত্যুর পরে নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। পৃথিবীতে বাস কালে তাহারা যে সুচিন্তা করে, সুকথা বলে ও সুকার্য্য করে তাহা জমার ঘরে এবং তাহাদের কুকার্য্যাবলি খরচের ঘরে লিখিত থাকে এবং মৃত্যুর পরে তাহাদের হিসাব দৃষ্টে জমার ঘরে বেশী হইলে স্বর্গে ও খরচের ঘরে বেশী হইলে তাহাদিগকে নরকে পাঠান হয়। স্বর্গে যাইবার সাধন পথ সাতটি স্তরে বিভক্ত। এই সাতটি স্তর যথাক্রমে (১) অহুরো মাজ্‌দা=সর্ব্বজ্ঞ শক্তির পূজা, (২) বহু মনো=সুবুদ্ধি অর্থাৎ সৎকার্য্য করিবার প্রবৃত্তি, (৩) আশা-বহিস্তা=সত্যানুবর্ত্তিতা, (৪) ক্ষত্র-বৈর্য্য=অর্ম্মজের রাজ্য, (৫) অর্ম্মাইটি=শিক্ষা-প্রবণতা ও নত্তানুবর্ত্তিতা, (৬) হাউরভাতাত =সম্পূর্ণতা, (৭) অমরেটাট্=অবিনশ্বরত্ব।

জরথুষ্ট্র-ধর্ম্মশাস্ত্রে এই সাতটি স্তর অর্ম্মজের সাতটি কর্ম্মচারী বলিয়া কথিত এবং স্বেচ্ছাচারী নরপতির সাতজন মন্ত্রীর সহিত তুলিত। পৃথিবীতে বাসকালে এই সাত শক্তির অধিনায়কত্বে মানুষ যাহা করে, যাহা ভাবে বা যাহা বলে, মৃত্যুর পরে তাহার হিসাব করিয়া তাহাকে স্বর্গ বা নরকে প্রেরণ করা হয়। অগ্নি অর্ম্মজের পুত্র ও সহকারী বলিয়া কথিত। এই সপ্তস্তরে বিভক্ত মুক্তিপথ "জরথুষ্ট্রের সম্পূর্ণতার অধিরোহণী" (Zoroaster's Ladder of Perfection) নামে খ্যাত।

জরথুষ্ট্রের অধিরোহণী

সূর্য্যসমান সপ্ত বাহু আকর্ষিত পুষ্পরথে,—
মহাব্যোমে সপ্তধাপে ; ছড়াও সুধা দ্যুলোক-পথে
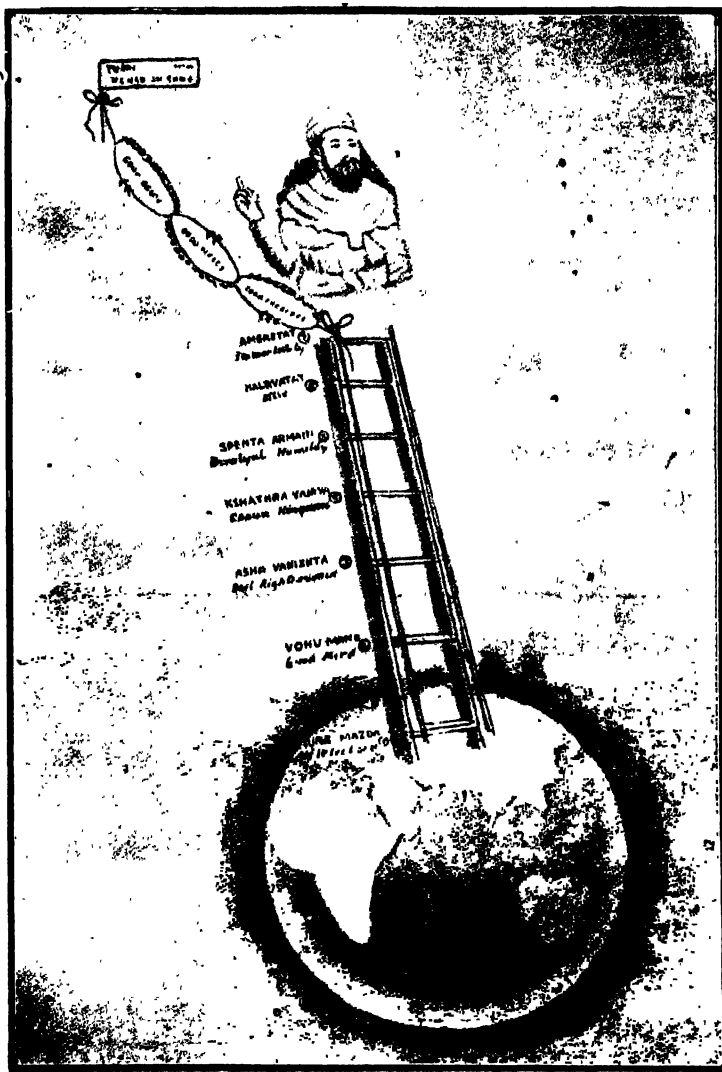
(৩)

জাগলে প্রথম জগত কোলে, কৃষক কুলের গর্ব্ব নিয়া—
ধরার শিশু, মায়ের বুকে, প্রথম সুধা স্তন্য পিয়া !
মানব মনের আকাঙ্ক্ষা-বীজ, হলের মুখে বপন করি' ;—
সত্যব্রতে, শ্যামলিমায় ছড়িয়ে দেছ জগত ভরি' ।
ফুলের বাসে, ফলের শাসে, তোমার বাণী আজো জাগে—
বুকে, মাথে, চোখের পাতে, এখনো সে পরশ লাগে ।
প্রণাম তোমায় ! প্রণাম তোমায় ! আর্য্য জাতির আদিম গুরু ;
বহ্নি যাগের উদ্দীপনা, প্রথম তোমার বুকেই সুরু !

(৪)

সপ্ত সায়র মন্থ করি'—বিশ্ববাসী জীবের লাগি'—
চিরামৃতে করলে সবে, অমর লোকের বিভবভাগী।
'অহুর মজ্‌দা' 'অমৃতাৎ' এ, 'ক্ষত্রবৈর্য্য' কল্পবীজে—
আদিম বেদের বোধন-যাগে পূর্ণাহুতি করলে নিজে।
সূর্য্য সমান সপ্ত-বাহ আকর্ষিত পুষ্পরথে,—
মহাব্যোমে সপ্তধাপে ; ছড়াও সুধা দ্যুলোক পথে।
বজ্রে দহি' ধরার কলুষ, আন্‌তে টানি' জগৎগুরু।
সাগ্নিক হে। বহ্নি-বোধন প্রথম তোমার বুকেই সুরু !

(৫)

হিংসা ছিল সুপ্ত মনে, পাথর যুগের মোহান্তরে,
মানুষ সবে মানব দেহী, পশু দেহের রূপান্তরে !
ভোলেনি সে রক্ততৃষা, মাংস মদে অস্থিরতা—
ভোলেনি সে হত্যা-আমোদ, সৃষ্টি-সুখের বর্ব্বরতা।
তার মাঝে কোন পাথর ভেদি', অত্যাচারের বহ্নি হ'তে—
জাগলে প্রথম মানব-গুরু, ধ্বংসরূপী জীবন-স্রোতে।
সেদিন বুঝি উপ্ত হ'ল সত্যযুগে কল্পলতা—
তড়িৎ যুগের মানব-মনে, মূর্ত্ত আজি সেসব কথা।

(৬)

ইরাণ হ'তে ভারত হ'তে, অর্ঘ্য তোমার পড়ল পায়ে—
অমল স্নেহ-রশ্মি দিয়ে, বাঁধলে দোঁহে স্নেহের ছায়ে।

স্বর্গ হ'তে আনলে লুটে, বসন্তকাল প্রথম গানে,—
আকুল মানব-চিত্ত-কোকিল, ঝঙ্কারিয়া উঠল প্রাণে।
বুদ্ধ, তুমি, কৃষ্ণ, নানক, বুনলে দেশে যে বীজ ক'টি—
প্রাচ্য-জগৎ ভাবছে কবে, জাগবে হ'য়ে পঞ্চবটী।
প্রণাম তোমায়! প্রণাম তোমায়! আর্য্যজাতির আদিম গুরু;-
বহ্নি-দেবের উদ্দীপনা, তোমার বুকেই প্রথম সুরু।

(৭)

আবার জ্বালো! আবার জ্বালো! তোমার রক্ত আলোক-শিখা।
আদিম জাতির গৌরবেতে, বিশ্ব পড়ুক ললাটিকা!
তপের বহ্নি নির্ব্বাপিত, অগ্নি মৃত জড়ের প্রাণে—
কোথায় হোতা! কোথায় হোতা! জ্বালাও পাবক, দীপক গানে!
তোমার 'গাথা' সূত্রে জাগুক, বুদ্ধদেবের 'ধর্ম্মপদে'—
গীতার শ্লোকে, গৃহে গৃহে, মাতুক সবে বহ্নিমদে!
প্রথম কৃষক! কণ্ঠ তোমার আর্য্য জাতির বার্ত্তা কহে—
যে না পূজে তোমায় সেতো আর্য্য নহে—হিন্দু নহে!

শ্রী সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

গৌরী

(১)

গলির মোড়েই প্রকাণ্ড চারতলা একটা বাড়ী— সেটা নাকি কোন্ বড় জমীদারের। বড় বড় গালপাট্টা-ওলা দরওয়ানগুলা দেউড়ীর সম্মুখে দিবারাত্র সিদ্ধি ঘোঁটে ও ভজন গান করে। এই মোড়ের ভিতর কিছুদূর গেলেই একটা খোলার বস্তি, সেখানে সহরের যত জীবন্ত আবর্জ্জনা সব একসঙ্গে তাল পাকাইয়া স্তূপীকৃত হইয়া আছে। চোর, বদমায়েস, শয়তান, লম্পট, ফেরার-আসামী,—সব ঐ তল্লাটে অন্ধকারের রাজত্ব পাতিয়া বসিয়াছে। শহর যাহাকে দূর করিয়া দেয়, ঐ গলির ভিতরকারের নিবিড় অন্ধকারসঙ্কুল বস্তিগুলি তাহাকে আদর করিয়া বরণ করিয়া লয়। এইরূপ একটী ক্ষুদ্র খোলার ঘরে মাসিক দুই টাকা ভাড়ায় সুবোধ মজুমদার সস্ত্রীক বাস করে। শোনা যায় সে এম, এ পাশ,—কিন্তু রাজপুরুষগণের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া সে বোমা প্রস্তুত করার অপরাধে ইতিমধ্যে জেল খাটিয়া আসিয়াছে। পুলিশের টিকটিকি

এখনও তার উপর কড়া নজর রাখিয়াছে; সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সহরের এই পরিত্যক্ত দিকে তরুণী স্ত্রী কুমারী, ও পাঁচ বছরের মেয়ে গৌরীকে লইয়া বাস করিতেছে।

শহরে কোনও উৎপাত হইলেই পুলিশের লোকেরা সর্ব্বাগ্রে এই দাগী জায়গাটার সন্ধানে ছুটিয়া আসে। হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা—দেখ, ঐ বস্তিপাড়া! উত্তরপাড়ায় বোমা পাওয়া গেল—খোঁজ ঐখানে। মেকী টাকা বাজারে চলিতেছে—ঐখানেই বুঝি কল আছে! পোষ্ট অফিসে টাকা চুরি—ঐখানে নিশ্চয়ই চোর লুকাইয়া আছে! মেদিনীপুরের জেল হইতে একজন রাজবন্দী ফেরার—নিশ্চয়ই বস্তিপাড়ার নির্জ্জন রন্ধ্রে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে! চার নম্বর জেটী হইতে এক কেস কোকেন পাওয়া যাইতেছে না—ঐখানে, ঐখানে নিশ্চয়ই! এইরূপ দিবারাত্র পুলিশের যাওয়া আসার জন্য জমিদার মহাশয়ও একদল বিরাটকায় ভোজপুরীর দ্বারা আপনার প্রাসাদদুর্গটী সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এই জমিদারের বিধবা মেয়ে চপলার মনটী নাকি ফুলের মত কোমল, তাই সে গৌরীকে অত ভালবাসিত। কিন্তু জমিদার মহাশয় দাগী লোকের সংস্রবে থাকিতে নিতান্ত নারাজ, তবে নিঃসন্তান কন্যার উপর কোনও কথা কহিতে তিনি সাহস করিতেন না, পাছে অজ্ঞাতে তার মনে কোনও কষ্ট দিয়া ফেলেন।

একদিন গৌরী আসিয়া বলিল, 'মাসীমা, বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে।'

কয়দিন ধরিয়া পুলিশ্ এত যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিল যে পাড়ার লোকে একরূপ নিঃসন্দেহ হইয়াছিল যে সুবোধ মজুমদারের এবার আর নিষ্কৃতি নাই। ঐ যে পাপের আড্ডা বস্তিটা,—উহার বীভৎস আবরণের নীচে একটা মহাপ্রাণ ছিল, তাহা সকলেরই এই দুঃস্থ পরিবারটীর প্রতি গভীর সহানুভূতি।

বেলা নয়টার সময় ফেরারী আসামী গণেশ সুবোধের দুয়ারে আসিয়া কহিল, 'ও গৌরী, এই চালটালগুলো নিয়ে যা ত মা!'

দুপুরবেলা গলা-কাটা গোবর্দ্ধন আসিয়া হাঁকিল, 'গৌরীমা, তোমাদের কাপড় নিয়ে যাও!'

সন্ধ্যায় মাতালদের সর্দ্দার ও গুণ্ডাদের নেতা মোহনলালজী আসিয়া ডাকিল, 'এ খোঁকি, দুধ লিয়ে লেও!'

এইরূপ সমবেদনার উৎসে কুমারীর শোকদগ্ধ অন্তঃকরণটী স্নিগ্ধ হইয়া গেল। চপলা কুলমহিলা,—সে দেউড়ী পার হইত না বটে, কিন্তু গৌরীর মারফতে কুমারীকে নানা উপঢৌকন পাঠাইত ও দাসীদের দ্বারা সর্ব্বদাই সংবাদ লইত।

বস্তিটা একেবারেই নারী-বর্জ্জিত ছিল, তাই গৌরী হইয়াছিল সকলের মা। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই পাখীর মত, কেবলমাত্র দিন বা রাতটা কাটাইবার জন্যই অনেকে এই ছিদ্রপথে প্রবেশ করিত। তাই—সর্ব্বত্রই যেন ঐখানে কিসের একটা অস্ফুট চলাফেরা

চলিতেছে, যেন একটা চাপাগলার অস্পষ্ট আন্দোলন চলিতেছে। এখানকার ব্যাপার বেশ যেন বোঝা যায় না, অথচ যাহাকে এই গলিতে একবার প্রবেশ করিতে দেখা যায়, আর তাহাকে বাহির হইতে দেখা যায় না; আর যে বাহির হইয়া যায়, সে রাজার হালেই রাজার লোকলস্কর সঙ্গে লইয়া কড়া পাহারায় সহসা বাহির হইয়া যায়। এখানকার আকাশে উল্কা, ধূমকেতু, বাতাসে বাত্যা, নিঃশ্বাসে গরল ও চারিদিকে বিভীষিকা। মাঝখানে সরু পথ আবর্জ্জনায় ভরা, দুইধারে ছোট ছোট খোলার ঘর, তারি পাশে প্রকাণ্ড নাল্য চলিয়া গিয়াছে; তাহার দুর্গন্ধে কাকগুলাও যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। সভ্যতার পতাকা স্কন্ধে করিয়া এই গলির মধ্যপথে একটা গ্যাসপোষ্ট মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আলো নাই, হাওয়া নাই, আনন্দ নাই, শোক নাই,—যেন জীবনের গতি, পৃথিবীর কোলাহল, মানুষের প্রচেষ্টা এই খানটায় আসিয়া হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে! মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নের মত এক একটা খোলার ঘরের মধ্য হইতে দারুণ হাহাকার উঠে—যেন জগতের বুক-ফাটা কান্না।

অন্ধকারের এই মহারাজ্যে আলোকের ফুল—গৌরী। গৌরী সকলেরই মা। যারা বুক দিয়া ভালবাসে, তারাই মা হইতে জানে। গৌরী সকলের দুঃখেই কাঁদিত, তাই তার হাসি এত সুন্দর। সেদিন একটা পেশোয়ারী একটা লোকের বুকে ছুরি দিয়া রক্তমাখা হাতে সেই গলি পথে আশ্রয় লইয়াছিল। গৌরী জল আনিয়া সস্নেহে তার হাত ধোয়াইয়া দিল। বলিল, 'সাহেব তোমার ক্ষিদে পেয়েছে?' পেশোয়ারীর পাথরের চোখ গলিয়া গেল—ধারা ছুটিল। গৌরী তাহার পাগ্‌ড়ীতে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, 'চল আমাদের ঘরে,—বলিয়া তাহাকে কুমারীর নিকট লইয়া গেল। প্রতি প্রভাতে সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া এই পঞ্চাশ ষাট খানা ঘরের দ্বারে দ্বারে করাঘাত করিত; ভিতরের মরা মানুষগুলার দেহে মনে সঞ্জীবনীমন্ত্র প্রয়োগ করিত। তারা মনে মনে বলিত, 'আর না, এইবার অন্যপথ ধরি।'

কুমারী মেয়েকে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। সে যে বড় সুন্দর! তাই তার উপর জোর খাটে না।

(২)

গৌরীর খেলা—সকলের মা হওয়া। বস্তি-রাজ্য মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। আমাদের বাহিরের মনের নীচে যে ভিতরের একটা গভীর মন আছে, সেই মনটার সন্ধান দোষী, অপরাধী ও লাঞ্ছিতদের নিকট বেশ সুস্পষ্ট। তাই যে-কেহ একবার এই নিদারুণ তীর্থস্থানটীতে একবার আসিত, সে-ই তার ভিতরকার মনে গৌরী-মার মহিয়সী মূর্ত্তির ছাপ লইয়া ফিরিয়া যাইত। এখানকার অভিশপ্ত বাতাস তাই চোর ডাকাতদের এত ভাল লাগে। এখানে আসিয়া তাহাদের যেন সব গুলাইয়া যাইত, তাহাদের প্রাণ দারুণ বেদনায় চীৎকার করিয়া উঠিত—'আর না, আর না!' গৌরী তাহাদের এই রুদ্ধপ্রায় অবস্থা দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিত, সে হাসির উপল আঘাতে তাহাদের প্রাণের পর্দ্দা ফাটিয়া যাইত। তাই একদিন সনাতন

ডাঁকাত গৌরীকে বলিল, 'যা, যা, এখুনি চলে যা, নইলে তোর টুঁটি ছিঁড়ে ফেল্‌ব।' গৌরী আবার হাসিল,—সে হাসি সব প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করিয়া দেয়। তখন সনাতন তার পায়ের নিকট আছাড় খাইয়া পড়িল, আর ব্যর্থস্বরে কহিল, 'মাগো!'

'ছি, সনাতন, কেঁদো না। এসো মার কাছে।'

কিন্তু কুমারীকে একদিনও কেহ ঘরের বাহিরে দেখে নাই। তার অস্তিত্বও বোঝা যাইত না। বস্তির ধারে খোলা একটু মাঠ আছে, সেইখানে যে শাড়ীখানি প্রত্যহ শুকাইতে দেওয়া হইত, তাহাই তাহার অস্তিত্বের একমাত্র নিশান। স্বামীকে পাইয়াও সে হারাইল; কত সুখের স্বপ্ন সে রচনা করিয়াছিল, আজ তাহা সব ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; সে 'এই মেয়েটীকে বুকের মাঝখানে টানিয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, 'গৌরী, মা. মা!'

'তুমি কেবল কাঁদবে! ছাড়ো—আমি যাই। সনাতন, ভুলু সেখ, কদমদাদা, মীনা, রশিদ—ওদের আজ খাওয়াতে হবে। আমি বলে আসিগে, যাও, তুমি রাঁধো গে যাও!' তার সেই নীল রংএর শাড়ীখানা পরিয়া সে পরীর মত যেন উড়িয়া গেল। তার টানা চোখে যেন পদ্মফুলের স্নিগ্ধতা, আকাশের নীলিমা ও তারকার দীপ্তি জাগিয়া আছে।......

'মাসী, তুমি না আমাদের বাড়ী যাবে বলেছিলে?'

'কখন যাই মা - আচ্ছা পরশু যাবো। পরশু কি বার রে? মঙ্গলবার? ওঃ, সেদিন একাদশী! আচ্ছা, পরশুই যাবো।'

'মাসী, তোমাদের দরোয়ানগুলো বড় দুষ্টু, আমায় আসতে দেয় না। বলে—হঠ্ যাও, হঠ্ যাও!'

'বটে? কে বলেছে রে? মাধো সিং, না হরিয়া? আচ্ছা, আমি ধমকে দিচ্ছি।'

'না, না মাসী, তাকে বকোনা, সে ভারি ভাল গান করে।'

'হাঁরে, তুই বুঝি গান ভালোবাসিস?'

'হাঁ মাসী, আমার মা আমায় অনেক গান শিখিয়েচে! তুমি একটা শুনবে?'

'আচ্ছা, এখন থাক, কাল শুন্‌ব।'

গৌরী সেখান হইতে আবার সেই বস্তিপথে ঢুকিল। পথের দুইধারে ছেঁড়া গ্যাকড়া, ভাঙ্গা হাড়ি, লোহা-বার-করা ভগ্ন প্লেট, ছেঁড়া জুতা, কুণ্ডলীকৃত খবরের কাগজ, মাছের আঁশ, তরকারীর কুটো—আরও কত রকমের বিচিত্র জিনিষ পড়িয়া আছে। নালায় জল বদ্ধ হইয়া আছে, তাহাতে মাছি ও পোকা। কিন্তু সেই পথ গৌরীর আগমনে শিব হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যায় গৌরী বলিল, 'মা, আমার জ্বর হয়েছে।'

কুমারীর বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

(৩)

যাহার কেহ নাই, তাহার লোকের অভাব হয় না। চারিদিনের জ্বরে গৌরী অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। চপলা গোপনে কুমারীকে টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে। বস্তির সেই হৃদয়-হীনেরা সহরের সেরা ডাক্তারকে নিত্য দুবেলা আনাইতেছে। কুমারীর ঘরের বাহিরে অন্ততঃ দশ বারো জন খুনে, ডাকাত ও জুয়াচোর দিবারাত্র পালা করিয়া বসিয়া আছে ও সকলের মুখেই একটা উদ্বেগের কালিমা পড়িয়াছে। বিকারের ঘোরে গৌরী কমলালেবু ও আম খাইতে চাহিয়াছিল, বর্ষাকালে অসময়ের ফলও তাহারা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে,—এমনি তাহাদের প্রীতি। 'গৌরীমা একটু ঘুমিয়েচে কি?' 'গৌরীমার জ্বরটা কি নরম পড়ল গা?' 'তেষ্টাটা এখন বোধ করি একটু কম?'—এমনি কতশত প্রশ্ন সেই অর্দ্ধভগ্ন দরজার গায়ে আসিতেছে; চপলার একটী দাসী ভিতর হইতে মাঝে মাঝে উত্তর দিতেছে। 'ছোট্ট মেয়ে--কি চুল গো! কালো কুচ্‌কুচে ভোমরার মত চুল! আহা, মার আমার হাসিটুকু সদাই মুখে লেগে আছে।' দাসী আনমনে বকিয়া যাইতেছে। গুণ্ঠনবতী কুমারী গৌরীর শিরোদেশে স্থিরনেত্রে অবনতমুখে বসিয়া আছে।

সন্ধ্যা হইতে আবার বর্ষা নামিল! গলিপথ জলের প্লাবনে নদীর আকার ধারণ করিয়াছে। ল্যাম্পপোষ্টটার মাথায় বৃষ্টিধারা যেন ফুলঝুরি কাটিতেছে। ভীষণ ঝড়—সেই ঝড়ের সঙ্গে আলোটা যেন পাল্লা লাগাইয়া দিয়াছে। জমিদারের দরোয়ানগুলো একযোগে গৌড় মল্লারে সুর ভাঁজিয়া খুব উচ্চকণ্ঠে গাহিতেছে—

'গরজি গরজি উমড়ি উমড়ি বরসত বদরারে।
দামিনকী দমক চমক ধরকত হিয়রারে॥
দাদুর কোকিল ময়ূর ঝংগুর ঝনকারে।
নিত উঠি দই চড়ত কাম দয়া নদী ধারে॥
শ্যামসুন্দর পিয় হমারে ঐ সে নিঠুরারে।
সৌতি ন লে ছায়ু জায় দৈ দুঃখভারে॥'

চোর-গাঁটকাটা-দাগী-খুনেরা বাহিরে একটা বেঞ্চিতে বসিয়া একান্তমনে ভিজিতেছে। এত লোকের নজর এড়াইয়া কত রকমের দুষ্কার্য্য করিয়া সিদ্ধকাম হইয়া তাহারা ফিরিয়াছে, আর আজ এই পাঁচবছরের মেয়েটাকে তাহারা বাঁচাইতে পারিবে না? হুঁ! ডাক্তার-সাহেব ত বলেই গেছেন যে ভোরটা যদি কোনরকমে কাটানো যায়—!

ঝড়ের বেগে দু'একখানা খোলার ঘর হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেল। শন্‌শন্‌ শব্দে পাগল বাতাস যেন মাদল বাজাইয়া গেল। আকাশের মাঝখানটা কি ফুটো হইয়া গেল? পৃথিবী কি রসাতলে যাইবে? যাক্‌ ক্ষতি নাই—মেয়েটা যদি বাঁচে। কাল দুপুরে কালীঘাটে মানতের পাঁটা দুটা—!

সনাতন বলিল, 'আরে থাম, থাম, কাল ভোরটা কাটলেই বেরুতে হবে। মেয়েটার মুখ চেয়েই এখানে পড়ে আছি।'

বুড়া রশিদ কহিল, 'এই হাতে অনেক ছাবাল কেটেছি কর্ত্তা, আর আমার হাত উঠেনা। আহা, মেয়েটা যদি বাঁচে।'

বাবুলাল নামজাদা বেশ্যার দালাল,—সে বলিল, 'যদি কি রে, গাধা? আলবৎ বাঁচবে।'

ভোরের দিকে আকাশের এক কোণে একটুখানি পরিষ্কার হইল। সেইখানে দুই একটী তারা দেখা দিল। ল্যাম্পপোষ্টের গায়ে তখন বৃষ্টিধারা অবিরাম গতিতে ধাক্কা দিতেছে। কুমারী গৌরীর পাণ্ডুর ওষ্ঠে একটী গভীর চুম্বন করিল। গৌরী ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া হাসিল—বড় সুখের, তৃপ্তির হাসি সে। তাহার শিথিল দেহ যেন পরিমৃদিত মৃণালের মত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। চপলা ঝি বলিল, 'আর এক পহর কাটিয়ে দাও, মা, তোমার মেয়ে তোমার কোলে ফিরে পাবে।' পেশোয়ারীটা বাহিরে বলিতেছে, 'রশিদ সাহেব, খোঁকী আচ্ছা আছে?' বৃষ্টি তখন অনেকটা থামিয়াছে, গঙ্গার ওপারে মিলগুলার জাগরণ-ধ্বনি বংশীশব্দে সূচিত হইতেছে, সমস্ত পৃথিবী যেন জড়তার বাস উন্মোচন করিবার চেষ্টা করিতেছে, গৌরী তখন সহসা চক্ষু চাহিল—অতি সকরুণ অথচ স্পষ্ট চাউনি। যেন তার বড়ই যন্ত্রণা। একটা অব্যক্ত শব্দ করিয়া সে হঠাৎ শক্ত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে নিস্তেজ হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। কুমারী কহিল, 'গৌরী, চলে গেলি, মা?' ল্যাম্পপোষ্টটা তখন নিবিয়া গিয়াছে, তখন হামিদ-রশিদ-বাবুলাল চীৎকার করিয়া কহিতেছে, 'সব ঝুটা, সব ঝুটা!'

জমীদারের দারোয়ান তখন গম্ভীরকণ্ঠে ভজন ধরিয়াছে, 'মোরা হিরা হেরায়ে গয়ে।'

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

শাহ্ লালন ফকিরের গান

[**সংক্ষিপ্ত জীবনী**—লালনচন্দ্র রায় নদীয়া জেলার কুমারখালী থানার অন্তর্গত ভাঁড়ারা নামক একগ্রামে এক কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

লালনচন্দ্র ছেলেবেলা হইতেই ধর্ম্মভীরু ছিলেন। বিবাহের পর মাতার সঙ্গে নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিতে যান এবং তথায় ভীষণভাবে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন, এবং দুই একদিনের মধ্যে মৃতবৎ প্রতীয়মান হন। তখন তাঁহার মাতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা অনুসারে তাঁহাকে অর্দ্ধগঙ্গা করিয়া রাখিয়া আসেন। এদিকে লালন তিনদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞান অবস্থায় নদী-কিনারায় পড়িয়া থাকেন। তৎপরে তাঁহার জলপিপাসার উদ্রেক হয় এবং জ্ঞান সঞ্চারিত হয়। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখেন যে একজন মুসলমান স্ত্রীলোক জল লইতে নদীতে আসিয়াছে। তিনি তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া জলপ্রার্থী হন। স্ত্রীলোকটী দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে

বাড়ী লইয়া যান। স্ত্রীলোকটীর স্বামী একজন ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমান ফকির ছিলেন এবং তাঁহাদের কোন সন্তানাদি ছিল না। খোদাতালার অনুগ্রহে এবং উভয়ের সেবা, শুশ্রূষা ও যত্নে তিনি আরোগ্য লাভ করেন, ঐ ফকিরের নিকট মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎপরে তিনি তাঁহার অনুমতি লইয়া স্বগ্রামে আগমন করেন এবং স্ত্রীকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে আনিতে প্রয়াস পান। কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া দেশভ্রমণে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। ইহার পরে ধর্ম্মপিতা সেই নবদ্বীপবাসী ফকিরের আদেশ-অনুযায়ী গুরু তালাস করিতে থাকেন। অনেক চেষ্টার পর নদীয়া জিলার কুমারখালি সহরের নিকটবর্ত্তী হরিনারায়ণপুর গ্রামনিবাসী সেরাজ সাঁই নামক এক বেহারীর নিকট ফকির শিক্ষা করিতে থাকেন। যাহা হউক সেরাজ সাঁইএর নিকট উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী ছেওড়িয়া গ্রামের মধ্যে যে একটী গভীর বন ছিল সেই বনের মধ্যে একটী আমগাছের তলায় সাধনা সুরু করেন; এবং সেই সময় হইতে তিনি লোকালয়ে বহির্গত হইতেন না। এবং দিনান্তে আনমেথল নামক একপ্রকার কচু খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। পরে গ্রামের লোকেরা যখন তাঁহার অনুসন্ধান পাইল তখন তাঁহার অনুমতি লইয়া তাহারা তাঁহার জন্য একটী আখড়া তৈয়ারী করিয়া দিল। শুনা যায় তিনি নির্জ্জন স্থানে অবস্থান করিয়া নিজতত্ত্বে মগ্ন থাকিতেন এবং গান রচনা করিতেন। ইঁহার শিষ্যের অবধি নাই। আজ প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ইঁহার গান অতীব মধুর। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ইঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তিনি যখনই শিলাইদহে আসিতেন তখন তাঁহার গান শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। এমন কি তিনি স্বয়ং প্রবাসীতে তাঁহার গান প্রকাশ করিয়াছেন।

লালনের কয়েকটি গান "ভারতবর্ষে" প্রকাশার্থ প্রেরণ করিলে "ভারতবর্ষ"-সম্পাদক রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর আমাকে একখানি পত্র লিখিয়া লালনের বিস্তৃত জীবনী ও তাঁহার গান সংগ্রহ করিবার জন্য আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও আমি তাঁহার বিস্তৃত জীবনী সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। বর্ত্তমানে তাঁহার তিনটী গান নিম্নে প্রকাশ করিলাম।]

(১)

রূপের ঘরে অটল রূপ বিহারে
চেয়ে দেখনা তোরা।
ফণী-মণি জিনি, রূপের বাখানি
ও সে দুইরূপে আছে একরূপ হলকরা॥
যে অটলরূপে সাঁই,
ভেবে দেখ তাই,
নিত্যলীলা কভু,
সেরূপের নাই।
যে জন পঞ্চতত্ত্বরসে,
লীলারূপে মজে
যে জানে কি অটল রূপ কি ধারা॥
যে জন অনুরাগী হয়,
রাগের দেশে যায়,
রাগের তালা খুলে
সেরূপ দেখ্‌তে পায়।
মহারাগেরই করণ
বিধি বিস্মরণ—
আছে নিত্যলীলা উপর রাগ নিহারা॥
ও সে রূপের দরজায়
শ্রীরূপ মহাশয়,
রূপের তালাচাবি,
তার হাতে সদা;
যে জন শ্রীরূপগত হবে
তালা চাবি পাবে
ফকির লালন বলে অধর ধর হে তারা।

(২)

আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা। (১)
'আহমদ' (২) 'আহাদ' (৩) বিচার হলে যায় জানা॥
আহমদ নামেতে দেখি,
মিমহরফ লেখেন নবি,
মিম গেলে আহাদ বাঁকী
আহমদ নাম থাকে না॥
যখন সাঁই নৈরাকারে,
ভেসেছিল ডিম্ব ওরে,
'আহমদ' এ মিম বসায়ে
'আহমদ' নাম হল সে না॥
এই কথার অর্থ ঢোঁড়ে
যার জ্ঞান বচ্ছে ধরে,
সব বলে লালন ভেড়ে
'ফাকৃরিমি' বই বোঝে না॥

(৩)

আয় গো যাই "নবীর দীনে" (৪)।
দীনের ডঙ্কা সদা বাজে মক্কা মদিনে॥
অমূল্য দোকান খোলেছে নবি,
যে ধন চা'বি সে ধন পাবি ;
সে বিনা কড়ির ধন,
সেধে দেয় এখন,
না লইলে আখেরে পস্তাবি মনে॥
তরীব (৫) দিচ্ছে নবিজী জাহের বাতনে (৬)
যেথা যোগ্য লোক জেনে।
সে রোজা আর নামাজ,
ব্যক্ত এহি কাজ,
গুপ্ত পথ মেলে ভক্তির সন্ধানে॥
নবির সামনেতে ইয়ার ছিল চারিজন। (৭)
নূরনবী চারকে দিল চার যাজন।
নবি বিনে পথে,
গোল হল চারিমতে (৮)
ফকির লালন যেন গোলে পড়িস নে॥

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

(১) উপাস্য।

(২) হজরত মহম্মদ (দঃ) এর অন্য নাম।

(৩) খোদার নিরানব্বই নাম মধ্যে ইহা একটী। আরবীতে আহমদ লিখিতে আলিফ, হে, মিম ও দাল অক্ষর লাগে। আহমদ হইতে মিম হরফ বাদ দিলে আহাদ হয়।

(৪) ইসলাম ধর্ম্ম ; নবী হজরত রসুলকরিম মহম্মদ মোস্তাফা সাহেব।

(৫) পথ ; ইসলাম ধর্ম্মে সাধনার পথ চারিটী—শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারেফাৎ।

(৬) ব্যক্ত ও অব্যক্ত—আধ্যাত্মিককে বাতন পথ কহে, ইহা মারেফাতের অন্তর্গত। জাহের শরিয়তের অন্তর্গত।

(৭) হজরত আবুবকর (রাঃ) হজরত আলী (কেঃ) হজরত ওসমান (রাঃ) ও হজরত ওমর (রাঃ)।

(৮) মুসলমানধর্ম্মে চারিটী মজ্‌হার (ধর্ম্মমত) আছে। হানিফী, হাম্বলী, শাফি।

বাংলা সাহিত্যে 'ওমর' পরিচয়

একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ওমর খৈয়াম, ইংরাজ কবি ফিট্‌জিরাল্ডের প্রচেষ্টায় কবি-খ্যাতি লাভ কর্লেন। তখনকার দিনে তিনি যে কবিরূপে বিশেষ আদর পাননি, তার কারণ খুব সম্ভব তাঁর চিন্তাধারা তখনকার দিনের জন-চিন্তাকে বহু পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল! সুতরাং সময়ের আগে যাওয়ার অসুবিধাটুকু তাঁকে সম্পূর্ণ ভোগ কর্ত্তে হয়েছিল। তাঁর স্বাধীন চিন্তা, তাঁর দর্শন, তাঁর বস্তু ও জীবনের কার্য্য-বিচার সে-যুগের জন-ধারণার পরিপন্থী হয়ে ওঠায়, তারা তাঁর মতবাদ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়নি। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর মানুষ যখন সেই একাদশ শতাব্দীর এই প্রতিভার মধ্যে বর্ত্তমানের দিন-উপযোগী জ্ঞান, সংশয়, জিজ্ঞাসা প্রভৃতির মূল সূত্রধারা আবিষ্কার কর্লে তখন তারা মুগ্ধ হয়ে গেল। ইউরোপে দেশে দেশে 'ওমর সঙ্ঘ,' 'ওমর সমিতি' গঠিত হয়ে উঠল। এঁদের কাজ হল—ওমরের জীবনী সম্বন্ধে নব তথ্য আবিষ্কার করা, তাঁর নতুন রচনার সন্ধান করা ও ওমর দর্শনের আলোচনা করা। এই সকল সমিতি ও সঙ্ঘের চেষ্টায় আজ পর্য্যন্ত প্রায় বারোশত রোবাই আবিষ্কৃত হয়েছে। অবশ্য শোনা যাচ্ছে এই বারোশতের মধ্যে মাত্র তিনশত হচ্ছে ওমরের। ইংরাজ কবি ফিট্‌জিরাল্ড মাত্র ১১০টি রোবাই অনুবাদ করেই যশস্বী হয়ে গেছেন। ওমর-জহুরীরা বলেন যে, ফিটজিরাল্ড ওমরের প্রতি মস্ত বড় অবিচার করে গেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি ওমরের মূল ধারণার এক অংশকে আশ্রয় করে নিজের কল্পনার সাহায্যে তাকে একটা রূপ দিয়ে গেছেন। এতে অবশ্য কবিত্বের দিক থেকে জিনিষটা উপভোগ্য হয়ে উঠলেও অনুবাদের দিক থেকে জিনিষটার দাম অনেক কমে গেছে বলে বোধ হয়। ফিট্‌জিরাল্ডের এই ফাঁকি নিয়ে আলোচনা করে ওমর-সাগর-রত্নাকররা এই মত দিয়েছেন যে ফিট্‌জিরাল্ডের মাত্র চল্লিশটা রোবাই অনেকটা মূলানুগত কিন্তু বাকী সত্তরটার সঙ্গে মূলের ভাবগত অনৈক্য হয়ত না থাকতে পারে, কিন্তু দেহগত বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। সুতরাং ফিট্‌জিরাল্ডের রচনা সুন্দর কবিতা নামের যোগ্য হইলেও ওমরের অনুবাদ নয়। সুতরাং ওমরের অনুবাদ কর্ত্তে হলে আর শুধু ফিট্‌জিরাল্ডের কবিতার ওপর নির্ভর কর্লে চলবে না। কারণ তাতে 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হয়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী। অথচ এতদিন পর্য্যন্ত বাংলাতে ওমরের যতগুলি অনুবাদ হয়ে এসেছে তার সবগুলিই ফিট্‌জিরাল্ডের কবিতার ভাষান্তর এবং সেগুলি সংখ্যায় বড় কম নয়। সেই সকল অনুবাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষের 'রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ম'। অবশ্য কান্তিবাবুর পূর্ব্বে ও পরেও রোবাইয়ের অনেক অনুবাদ হয়েছে এবং বাংলার অনেক খ্যাতনামা কবিই এ কার্য্যে রত হয়েছেন। আমি যতদূর জানি কান্তিবাবুর পূর্ব্বে বাংলা পাঠকদের ওমর কবিতার রসাস্বাদন প্রথম করাইয়া-

ছিলেন বোধ হয়—৺অক্ষয়চন্দ্র বড়াল। বাংলা ভাষায় ঠিক ক'খানা ওমর-গীতি আছে জানি না। তবে এই ক'জনের অনুবাদই বোধ হয় সাধারণে প্রচলিত—৺অক্ষয়চন্দ্র বড়াল, শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ও শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়। সম্প্রতি শ্রীনরেন্দ্র দেব ওমরের রোবাইগুলির একটী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন এবং এই অনুবাদটী পূর্ব্বোক্ত অনুবাদগুলির থেকে একটু বিভিন্ন ও বিশিষ্ট হয়েছে।

শ্রীনরেন্দ্র দেবের এই অনুবাদটীতে মোট রোবাইয়ের সংখ্যা হচ্ছে তিনশ দশটী এবং এগুলি তিনি প্রধানতঃ সংগ্রহ করেছেন Whinfield, Payne, Talbot, Johnson, Gallienne প্রভৃতির প্রামাণ্য অনুবাদ থেকে। এর সঙ্গে তিনি Fitzgeraldয়েরও মোহ কাটাতে পারেন নি। সুতরাং সংগ্রহের দিক থেকে এই অনুবাদখানি বাংলা সাহিত্যের একটী রত্ন সম্পদ হ'ল বলা যেতে পারে।

এইবার অনুবাদের কথা—সংস্কৃতে যেমন চতুষ্পদী, ফার্সীতেও তেমনি রোবাই। এই চতুষ্পদী কবিতার একটী বিশেষ রূপ আছে এবং সেই রূপটী এই চারটী পদেরই মধ্যে মুর্ত্তি হয়ে উঠেছে। এক একটি রোবাই চারটী চরণের মধ্যেই সম্পূর্ণ ও স্বাধীন। একের সঙ্গে অপরের কোন বিশেষ যোগসূত্র নেই বল্লেই হয়। অথচ এর অন্তর্নিহিত সুরটি যেন কোথায় একটী রাগিণীর জাল বুনে দিয়েছে।

রোবাইয়ের গঠনেও একটী বৈশিষ্ট্য আছে—তার প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের মিল একই এবং সাধারণতঃ তৃতীয় চরণটী মুক্ত, এমন কি অনেক সময় এই তৃতীয় চরণের ছন্দ পর্য্যন্ত বিভিন্ন। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। এই গঠন-পারিপাট্যের জন্য চতুষ্পদী রোবাইয়ের মধ্যে যে প্রাণ-শক্তির লীলা দেখতে পাওয়া যায়, ইংরাজ কবি ফিট্জিরাল্ডও তাঁর কবিতায় এই গঠন বৈশিষ্ট্যের সাহায্য নিয়ে তার মধ্যে শক্তি-সঞ্চার করেছেন। কিন্তু বাংলা অনুবাদ কর্ত্তে গিয়ে নরেন্দ্রবাবু রোবাইয়ের এই গঠন-বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দেননি। অবশ্য এ দোষে কান্তিবাবুও দোষী। এই দিক্ থেকে, অর্থাৎ রোবাইয়ের গঠনের দিকে লক্ষ্য করে বাংলায় দু'টী অনুবাদ আছে—একটী শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়ের ও অপরটী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষের।

কার খেয়ালে, কোথা হ'তে এলাম ভূতলে,
কারে শুধাই, সেই কথাটা, কেইবা তা' বলে ?
পেয়ালা পরে, উড়িয়ে দেরে, মদের পেয়ালা,
ব্যথা ডুবুক রাঙা মদের নিবিড় অতলে।

(হেমেন্দ্রলাল)

উদ্ধৃত কবিতার মধ্যে আমরা রোবাইয়ের গঠন-সৌন্দর্য্যের খানিকটা পরিচয় পাই। এঁরা দুইজনে Fitzgeraldকে যথাযথভাবে ভাষান্তরিত কর্ব্বার চেষ্টা পেয়েছেন। কিন্তু কান্তিবাবু

আবার সে পথ অবলম্বন করেন নি। কান্তিবাবুর কবিতাগুলিও চতুষ্পদী কিন্তু তার মধ্যে রোবাইয়ের গঠন-বৈশিষ্ট্য নেই। তার চতুষ্পদীর মিল প্রথমের সঙ্গে দ্বিতীয়ের ও তৃতীয়ের সঙ্গে চতুর্থের। কিন্তু গঠনের এই বিভিন্নতা সত্ত্বে কান্তিবাবুর কবিতার মধ্যে যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত শক্তির লীলা দেখতে পাওয়া যায়, তার কারণ তাঁর নির্ব্বাচিত ছন্দ এবং ভাষা। অনেক স্থানে তিনি ভাষাকে মুচ্‌ড়ে বেশ সুন্দর একটা শব্দ তৈরি করে নিয়েছেন। যেমন Old Barren Reason এই কথার অনুবাদে তিনি লিখেছেন—'বন্ধ্যা বধূযুক্তি দেবী' এই একটী 'বন্ধ্যা বধূ' কথার মধ্যে Old Barren এই বিশেষণটীর সমস্ত ভাব ভারী সুন্দর ফুটে উঠেছে। এইস্থানে 'বন্ধ্যা' কথাটীর চেয়ে 'লাগসৈ' আর কোনো বিশেষণ বোধ হয় হতে পারে না। আবার from what once lovely lips it springs unseen এই সমস্ত পদটীর ভাবটী তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর স্বকৃত একটী কথা দিয়ে—

কোন রূপসীর পাতলা ঠোটের 'জীয়ান-রসে' জন্ম এর।

এই 'জীয়ান-রস' কথাটী তাঁর স্বকৃত এবং এই একটী কথার ভিতর দিয়ে সারা পদটীর রহস্য-মাধুর্য্য প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু ওমরের অনুবাদ কর্ত্তে গিয়ে Fitzgerald যে দোষ করেছিলেন, Fitzgeraldয়ের অনুবাদ কর্ত্তে গিয়ে কান্তিবাবুও ঠিক ততটা না হলেও, সেই দোষই করেছেন। Fitzgeraldয়ের ভাবের অংশবিশেষকে নিয়ে কান্তিবাবু তার নিজের কল্পনা অনুসারে জিনিষটীকে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন—

Then to the rolling Heav'n itself, I cried
Asking "What lamp had Destiny to guide,
Her little children stumbling in the Dark ?"
And "A blind understanding" Heav'n replied.

কান্তিবাবু লিখেছেন—

তিমির পথের যাত্রী মোরা—দীপ্ত আশার রশ্মি কই ?
মর্ত্ত্যে হ'য়ে লক্ষ্যহারা—স্বর্গ পানে তাকিয়ে রই।
কর্ণে পশে দৈববাণী—কোথাও যে নাই আলোক পথ।
অন্ধ নিয়ত চালিয়ে বেড়ায় ভাগ্যদেবীর বিশ্ব-রথ।

অনুবাদকের হাত পা অনেকটা বাঁধা, সেই বন্ধনকে স্বীকার করে নিয়ে চলার মধ্যেই অনুবাদকের বাহাদুরী। উপরোক্ত কবিতাটী কবিতার দিক থেকে খুব সুন্দর হলেও মূল থেকে যে বহুদূরে সরে গিয়েছে একথা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। নরেন্দ্র বাবুর সব চেয়ে কৃতিত্বও এই খানে। তিনি অনুবাদকের সকল বন্ধন স্বীকার করে নিয়েও প্রত্যেকটী

রোবাইয়ের যথাযথ কবিত্ব-রস-মধুর অনুবাদ কর্ত্তে পেরেছেন। উপরোক্ত স্তবকের ভাবটীতে রূপের বিশেষ পরিবর্ত্তন না ঘটিয়ে, বাংলায় তিনি যে ভাবে প্রকাশ করেছেন তা তাঁর শক্তির পরিচায়ক—

শুধাইনু গগনে গগনে
এ দুখ-লগনে
বল মহারথ—
কোন্ দীপ হাতে লয়ে ভাগ্যদেবী নির্দ্দেশিবে পথ
এই তাঁর ভ্রান্তমতি শিশু পুত্রদের?

আঁধারে চলিতে পথে স্খলিত চরণে
জীবনে মরণে
নিত্য যারা ব্যথা পায় ঢের?
আকাশ উত্তর দিল মেঘ-মন্দ্রে মোরে
"শুধু অন্ধ বিশ্বাসের জোরে!"

এইখানে 'মেঘমন্দ্রে' কথার সার্থকতা একটা লক্ষ্য কর্ব্বার বিষয়। Rolling Heav'nয়ের idea এই কথাটীর মধ্যে অতি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

বিষয় বস্তুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রোবাইয়ের যেমন ছন্দের পরিবর্ত্তন ঘটেছে, এই অনুবাদের মধ্যে তদনুসার ছন্দ-পরিবর্ত্তন শুধু বৈচিত্র্যময় নয়, মনোহারীও বটে। প্রেমের কবিতা ও ক্ষোভের কবিতার মধ্যে শুধু যে ভাবের বিভিন্নতা আছে তা নয়, গঠনেরও একটা পার্থক্য আছে এবং এক্ষেত্রে গঠন একটা মস্ত বড় factor বা সহায়। ওমরের রোবাইত শুধু 'চার্ব্বাকদর্শন' বা মানুষের প্রেম নিবেদন নয়; তার মধ্যে এর বাইরের অনেক বিষয় আছে। এবং সেই সময় বিষয়ের পরিচয় দেওয়া উচিত বিভিন্ন ছন্দে। এই নানা ছন্দ-নৈপুণ্যও এই অনুবাদে একটা লক্ষ্য কর্ব্বার বিষয়।

এ সম্বন্ধে আলোচনা কর্ত্তে গেলে জানা দরকার ওমরের কবিতার বিষয়-বস্তুর দিক থেকে স্তর বিভাগ। এ সম্বন্ধে নরেন্দ্র বাবুর পুস্তকের ভূমিকাটী পাঠকের অনেক কাজে লাগবে।

ওমরের কবিতার মধ্যে সব চেয়ে যে সুর আমাদের আগে স্পর্শ করে, তা হচ্ছে তাঁর অভিযোগের সুর—নিয়তির দুর্ব্বার চক্রের বিরুদ্ধে, জগতের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে, মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও অলঙ্ঘনীয় ললাট লিপির বিরুদ্ধে নিষ্ফল ক্ষোভ:—

এই নিষ্ফল ক্ষোভে কখনও সে বিদ্রোহ কর্ত্তে দাঁড়ায়, তখন সে আক্ষেপ করে বলে—

নিয়ত দেবীর চরকা সুতোর ধরতে পারি খেইটা আজ
ভাগ্য সাথে ষড় করে তার ঢুকতে পারি দুয়ার মাঝ,
নিঠুর পায়ে চূর্ণ করি বিশ্বসৃজন কল্পনায়
নূতন সৃষ্টি গড়তে প্রিয়া পার্ব্বনাকো দু'জনায়।—(কাঃ-চঃ ঘ)

এই অনুযোগের মধ্যে যে শক্তি আছে সেই শক্তিতে মত্ত হয়ে কবি যে বিদ্রোহ আনে, সেই বিদ্রোহ প্রকাশ কর্ব্বার ছন্দ বিভিন্ন—

রোষরক্ত আঁখি হেরি ভয়েতে কি তার
দয়া ব'লে মেনে লব যত অবিচার?

বলিব কি জোড় করে ওগো ভগবান
একমাত্র জানি হেথা তুমিই প্রধান
জগতের ন্যায়বান প্রভু ?
সে কাজ আমার দ্বারা হবেনাকো কভু ! (ন, দে)

আবার কবি যখন দেখে এ হুঙ্কার নিষ্ফল, এ বিদ্রোহ বৃথা, তখন নিস্তেজ নৈরাশ্যে ভিন্ন ছন্দে সে বলে—

—চিররুদ্ধ নিয়তির দ্বার
সহস্র সন্ধানে তবু মেলে না লো উন্মোচনী তার,
দৃষ্টিরে আড়াল করি, গুণ্ঠন রহে সে মুখে টানা,
তারে যেন নেহারিতে মানা। (ন, দে)

এর পর কবি বিরক্ত হয়ে বিদ্রূপ আরম্ভ করেছেন। মানুষের ভণ্ডামি, যুক্তিহীনতা, অজ্ঞতা, গোঁড়ামি, স্পর্দ্ধা—এর বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রূপ কষাঘাত কর্লেন।

সিদ্ধ সাধু সকল লোকে
স্বর্গ-নরক এই দুটোকে
নিত্য ব'সে জ্ঞানীর মতো ক'রতো বিচার যা'রা
পীর-দেওয়ানা—আগা-ফকীর—কোথায় গেল তারা ?

সন্তবাণী শুনছ কে আর
আজ যে তাদের বচন অসার
চলছে না আর, কেউ তা এখন ভক্তিভরে মানি !
অবহেলার ধুলায় লোটে উপদেশের বাণী।

এই বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর দর্শনের আভাস দিয়ে গেছেন—ধর্ম্ম কি, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, জন্ম-মৃত্যু, এর বিচার—কত অহেতুকী এসব। জীবনের মূলে আছে আনন্দ, সেই আনন্দকে উপভোগ কর——বর্ত্তমানই সব, ভবিষ্যৎ কেউ জানে না, সুতরাং তার সম্বন্ধে চিন্তা করা বৃথা।

'কাল কি হবে—ভাববো কেন ?' 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও।' এটা তাঁর দর্শনের মস্ত একটা কথা। কিন্তু এইটাই তাঁর দর্শনের সবটা নয়। শুধু Fitzgerald পড়লে ওমর সম্বন্ধে মাত্র এইটুকুরই ধারণা হয়। এবং অনেক সময় ওমর সম্বন্ধে এইটুকু জেনেই লোকে তাঁকে ফরাসী কবি ও দার্শনিক Voltaire য়ের সঙ্গে তুলনা করেন। কিন্তু আসলে তিনি পারস্যের Voltaire নন। তাঁর সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ওমর-অনুবাদক Whinfield তাঁর পুস্তকের ভূমিকায় বলেছেন—He has much of flippancy of irreverence of Voltaire. But Omer also possessed what Voltaire did not, strong religious emotion which at times over-rode his rationalism and found expression in those devotional and mystical quatrains, which offer such a strong contrast to the rest of his poetry.

তাঁর রোবাইগুলি আলোচনা কল্লে ওমরের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণার বেশ স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। চার্ব্বাক বা Voltaireয়ের মতো ওমর নাস্তিক নয়—তিনি স্পষ্ট বলেছেন—

'তোমার সন্ধানে ফিরি
যুগে যুগে হতাশ ভুবন।
পায়না তোমার দেখা
জগতের ধনী ও নির্ধন।
আছ তুমি আমাদের
একান্ত নিকটে জানি প্রভু
বধির এ কর্ণ মোর
নাহি পায় পদশব্দ তবু।
আমাদেরই দৃষ্টি পথে
জেগে আছ অপূর্ব্ব প্রভায়
তবু এই অন্ধ আঁখি
রূপ তব দেখিতে না পায়।

(ন, দে)

এবং তাঁর ভগবানের ধারণা সম্বন্ধেও তিনি স্বীকার করেছেন—তিনি দয়াল, তিনি স্নেহময়, তিনি ক্ষমাপ্রবণ—

হে আমার রাজরাজেশ্বর
কী কাজ তোমার বলো
দীন এই ভৃত্যপরে করিছে নির্ভর ?
আমার অন্যায় কোনও দোষ ত্রুটী অপরাধে প্রভু
তোমার কি অপমান হতে পারে কভু ?
ক্ষমা করো দয়া করো, দুর্ব্বলেরে দেব
ভ্রান্তজনে শাস্তি দেওয়া তোমার কি সাজে
তুমি যে দয়াল দাতা, স্নেহপূর্ণ প্রাণ
অক্ষমের ব্যথা যে গো বুকে তব বাজে।

(ন, দে)

ভগবানের এমন ধারণা করলেও, 'মায়াময়মিদমখিলম্' এ তত্ত্বও ওমরের দর্শনে বাদ পড়েনি—

উর্দ্ধে অধে, ভিতর বাহির দেখছ যা সব মিথ্যা ফাঁক
ক্ষণিক এসব ছায়ার বাণী পুতুল নাচের ব্যর্থ জাঁক।
পৃথিবীটাতে মায়ার খেলায়—সূর্য্য বাতির ফানুষ খোলে,
ছায়ার পুতুল আমরা সবাই চৌদিকে তার কর্চ্ছি গোল।

(কাঃ চঃ ঃঃ)

শুধু এই নয়, জগতে আরও কত তত্ত্ব আছে—কেন এলুম এই 'জগতে' 'কার আদেশে কোথা হ'তে'—এমনিতর কত জটিল ব্যাপার—সে সম্বন্ধে কবি তাঁর মত দিলেন—

যাক্ গে ওসব জটিল ব্যাপার
জীবন গেলেও মিটবে কি ?
আয়লো সখী সুরায় আজি
ভাবনা যত ডুবিয়ে দি।

(ন, দে)

কবি তখন সাকি, সুরা ও প্রেম নিয়ে একটু খেলা করছেন। প্রেম সম্বন্ধে বলেছেন—

চির-অন্ধ তমসায় সে হৃদয় থেকে যায় কালো
জ্বলে না যেখানে কভু প্রেমের অম্লান স্নিগ্ধ আলো।

(ন, দে)

আর প্রেমে পড়লে মানুষের যে কি অবস্থা হয়, তাও তিনি দেখাতে ছাড়েন নি—:

যেদিন প্রথম প্রেম অভিভূত করিল আমারে
মূর্ত্তি ধরি এল যেন সুখ
অন্তর চাহিল কত, কহিবারে অকথিত বাণী
রসনা রহিল তবু মূক

নির্ঝরের তীরে আসি তৃষ্ণাতুর হৃদয় তথাপি
মরিল অতৃপ্ত পিপাসায়
এহেন বিস্ময়কর সকরুণ কাতরমরণ
দেখেছ কে জগতে কোথায়?　(ন, দে)

এইভাবে তিনি 'প্রেম'-সম্বন্ধে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। এইবার সুরা ও সাকী—তিনি বলেছেন যে সুরা ও সাকী এই মরুভূ স্বর্গ করে তুলবে।

এইখানে এই তরুতলে
তোমায় আমায় কুতূহলে
এ জীবনের যে কটা দিন কাটিয়ে যাবো প্রিয়
সঙ্গে রবে সুরার পাত্র
অল্প কিছু আহার মাত্র
আর একখানি ছন্দ মধুর কাব্য হাতে নিয়ে
থাকবে তুমি আমার পাশে
গাইবে সখী প্রেমোচ্ছ্বাসে
মরুর মাঝে স্বপ্ন স্বরগ করবে বিরচন;
গহন কানন হবে লো সই নন্দনেরই বন।

(ন, দে)

—এই যে তিনি সুরা ও সাকীকে তাঁর পাশে স্থান দিয়েছেন এটা নিছক প্রেমের খাতিরে নয়। এদের তিনি পাশে বসিয়ে 'জীবনের কটা দিন কাটিয়ে যাবার' মন করেছেন, কারণ তিনিই বলে গেছেন—

—পূর্ণ করে দাও সখী! পানপাত্র মোর
অফুরন্ত হ'য়ে থাক স্বপনের ঘোর;
বার বার মিছে আর বোল না আমায়
কেমনে চরণ তলে
পলে পলে
জীবনের দিন বহে যায়
বিদায়-সঙ্কেত বাণী হায়,
নিশিদিন ভীত মনে প্রতিক্ষণে কে শুনিতে চায়?

(ন, দে)

কাজেই ওমরের কাব্যে আমরা যেখানে প্রেমের কথা পাই, তার মধ্যে মনে হয় যেন—: প্রেম থেকে স্বার্থের সুরই বেজেছে বেশী। সুরা ও সাকীতে তিনি মশগুলি হ'তে পারেন নি,

যেমন পেরেছিলেন আর সব ফার্সী কবিরা, বিশেষ করে হাফেজ। হাফেজের প্রেমের গানের তুলনায় ওমরের প্রেমের কবিতার তুলনাই হয় না। হাফেজ 'প্রিয়া' 'প্রিয়া' করে পাগল হয়েছেন। তাঁর প্রিয়ার সঙ্গে জগতের কিছুরই তুলনা হয় না—

O opening buds, her cheeks more fair
For ever rosy blushing are
Narcissus ! thou art pale of hue.
Her eyes that languish, sparkle too
I tell thee, gently waving pine !
More graceful is her form than thine.

এমনি করে তুলনা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, এর উপরেও তিনি গেছেন,—

লাল সে গালের কালো তিনটীর বদলে গো
দিয়ে দিতে পারি সমরকন্দ ও বুখারা আর।

কাজেই প্রেমের কবিতা হিসাবে ওমরের কবিতা কোনো দিন উচ্চ স্থান পাবে না। ফার্সী-কবিতা-সুলভ ফাল্গুন, বুল্‌বুল্‌, সাকী, সুরা এদের তিনি তাঁর কাব্য হতে দূর করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর আসল কথা হচ্ছে— আয়ু বিহগ, খোঁজ রাখ কি মেলিয়ে ডানা উড়ন হয়ে। সুতরাং 'পেয়ালাটুকু শেষ করে নাও', ভোগ কর।

জগতে অনেক তত্ত্ব আছে কিন্তু তার মীমাংসা কে জানে। সে সব চির অন্ধকারে লুপ্ত। মানুষের কোন হাত নেই। তখন মানুষ কী কর্ত্তে পারে, এই বর্ত্তমানটাকে ভোগ করা ছাড়া। খুব মোটামুটিভাবে এই হচ্ছে ওমরের দর্শন। সুতরাং এর থেকে বেশ বোঝা যায় যে—ওমর হচ্ছেন "জ্ঞানমার্গের" কবি। এখন এই 'জ্ঞানমার্গী' কবি তাঁর কাব্যে যে দর্শনের আভাস দিয়েছেন, সে দর্শনের মূল কোথায়? এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতের বিভিন্নতা আছে। John Payneয়ের মতো অনুবাদক ৮৪৫টী রোবাই অনুসন্ধান করে বলেছেন যে ওমরের এ ভাব-ধারার উৎস হচ্ছে ভারতীয় বেদান্ত-দর্শন। এবং তাঁর এই যুক্তির সারবত্তা প্রমাণ কর্ব্বার জন্যে তিনি বলেছেন—......it is absolutely certain that the Vedantic doctrines must have found their way in the full height of their vivacity to the adjoining country of Iran, so closely akin, in race, position, and spirit to the Hindu Aryans ; and Nishapas, being an early and important stage of the great caravan-route between India and Persia, must, we may be assured, have been one of the first places to recieve the new knowledge in all its vigour and purity.

অবশ্য এই সঙ্গে তিনি ভুরি একটা স্বীকার করছেন তাও উল্লেখযোগ্য —In stating my coviction that Kheyyam's philosophic and religious opinions were,

in their essential paints, based upon the teachings of the Vedantas, I do not for a moment pretend to miantain that he possessed all the niceties of the Vedantic doctrines as propounded by the Indian Schoolmen."

আবার অনেকে বলেন যে তখনকার দিনে 'খোরাসান' ছিল 'পারস্য কৃষ্টির' মূল উৎস। সুতরাং খোরাসানের বাসিন্দা হয়ে তৎকালিক মুসলমান দার্শনিকের চিন্তাদ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া তাঁর পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। কারণ যুবা বয়সে তিনি সুন্নি ধর্ম্মে শুধু ইমাম খুয়াফিকের কাছে জ্ঞানলাভ করেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকেই খুব সম্ভব 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই জ্ঞানলাভ করেছেন। কিন্তু ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি জগতের দুঃখ বেদনার কারণ নির্দ্দেশ কর্ব্বার চেষ্টা করেন এবং ক্রমশঃ স্বাধীন চিন্তার দ্বারা তখনকার দিনের প্রচলিত মতবাদ থেকে ভিন্নমত স্থাপন করেন এবং সারাজীবন এই সম্বন্ধেই আলোচনা করে কাটিয়েছেন। তাই আমরা দেখতে পাই তাঁর রোবাইয়াতের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী উক্তির অভাব নেই। জীবনে একদিন যে মত তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন পরে হয়ত ভূয়োদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিবত্তা দ্বারা সে মতের বিরোধী মন্তব্য প্রকাশ করে গেছেন। এই থেকেই তাঁর মতো সত্য-সন্ধানীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশেষ করে এই দিক থেকে অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর এই সত্য-সন্ধানীর সত্যানুসন্ধান চেষ্টার আভাস আমরা পূর্ণমাত্রায় পাই, নরেন্দ্র বাবুর অনুবাদ থেকে। তিনি যে তিনশ দশটী 'রোবাই'র তাঁর অনুবাদে সন্নিবেশ করেছেন তার মধ্যে ভাবানুগত নানা ছন্দের বিকাশ দ্বারা ওমরের নানা স্তরের ভাববৈচিত্র্যের সন্ধান পাবার সুবিধা করে দিয়েছেন। কাজেই ওমর দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পথে ও মূলের সম্পূর্ণ রসাস্বাদনের পক্ষে এই অনুবাদটী যে বিশেষ সহায় হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

এই অনুবাদটী বাংলা ভাষার কাব্য সম্পদের মণিমঞ্জুষা আরও সমৃদ্ধ করে তুলল।

শ্রীভূপতি চৌধুরী

মিনতি

এ মম, স্বপন-সাধনা সফল করিতে দয়িত দাওগো ধরা!
তোমার, সুঠাম মূরতি সুন্দর অতি অন্তর মন ভরা!
　　দেহ ধরা মম মানস-ছন্দে,
　　দেহ ধরা দেহ বাহুর বন্ধে,
তোমারে আপন করি' নিতে দাও, হে বঁধু আকুল-করা!
সঙ্গীতে মম মূরতি ধরগো, নেমে এস মোর গানে!
আনন্দ-রথে এসহে বন্ধু, এস নেমে এস প্রাণে!
　　মঞ্জু সবুজ রাখীর ডোরায়
　　আঁখির কাজল, এস শ্যামরায়!
তোমার বিরহে সজল হয়েছে সকল বসুন্ধরা!

নীলাকাশে এস নীলমণি, এস অবনী তোমারে মাগে,
কাশের ক্ষেত্রে নবনীর শোভা নেত্র মোহিয়া জাগে!
　　বাতাসের বুকে শুনিতেছি আজি
　　আগমনী তব উঠিয়াছে বাজি'
উৎসব রাতে, উৎসব প্রাতে, উৎস সুধাক্ষরা!
বিপুল পুলকে উলসে বক্ষ, স্বপন ভাসিছে চোখে,
ভূলোক উঠেছে দ্যুলোকে, দ্যুলোক নেমেছে মর্ত্ত্যলোকে!
　　ফুলের ফসল ফলেছে বাহিরে,
　　অন্তরে তারো অন্ত নাহি রে!
আজিকে দৃপ্ত চরণের তলে নিহত মরণ, জরা!

শ্রীরামেন্দু দত্ত

পুস্তক-পরিচয়

বাঙালীর খাদ্য—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ প্রণীত ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত;—মূল্য আট আনা মাত্র।

পুস্তকখানিতে বাঙালার খাদ্য-সমস্যার যথাসম্ভব বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। আজকাল খাদ্য সম্বন্ধে দু'একখানি পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে,—সাময়িক পত্রাদিতেও খাদ্য-তত্ত্বের আলোচনা হইয়া থাকে! কিন্তু তথাপি এই পুস্তকখানির কিছু বিশেষত্ব আছে। বিজ্ঞানবিদ্ গ্রন্থকার বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সবিশেষ নিপুণতার সহিত সহজে ও সরল ভাষায় বাঙালীর খাদ্য-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। কেন আমাদের আহার প্রয়োজন,—কোন্ খাদ্য পুষ্টিকর,—কেন পুষ্টিকর,—কাহাকে বলে প্রোটিন্,—ভাইটামিন পদার্থটাই বা কি,—ভাইটামিন 'এ', ভাইটামিন 'বি', ভাইটামিন 'সি' প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগের অর্থই বা কি,—কার্ব্বোহাইড্রেট ফ্যাট্ ও লবণজাতীয় দ্রব্য কোন্‌গুলি এবং সেগুলি আমাদের কোন্ প্রয়োজন সাধন করে,—এই সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। সুস্থ শরীরে কোন্ খাদ্য দেহের পুষ্টিসাধন করে,—কোন্ রোগে কোন্ খাদ্যের প্রয়োজন এবং কেন প্রয়োজন—তাহা এই পুস্তকে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। লেখকের বর্ণনা-ভঙ্গিও চমৎকার,—সহজ, সরল ও সুন্দর। দেহের কথাটা ভাবিবার সময় মনটাকে যে উপেক্ষা করা চলে না, পরিপাক কার্য্যে সুস্থ মন ও রুচির আবশ্যকতা যে সুস্থ দেহ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে তাহা রুসিয়ার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পাওলো একটি কুকুরের কখনও পেট ছ্যাঁদা করিয়া খাদ্য দিয়া, কখনও মুখবিবর হইতে খাদ্য প্রবেশ করাইয়া, কখনও বা গলায় একটা ছ্যাঁদা করিয়া তাহার মধ্য দিয়া নলযোগে খাদ্য দিয়া, প্রমাণিত করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার পাওলোর গবেষণা-প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ দিয়া এবং অন্যান্য স্থানে প্রাণী-তাত্ত্বিকগণের অনুষ্ঠিত পরীক্ষার বর্ণনার সমাবেশ করিয়া—এই নীরস বৈজ্ঞানিক পুস্তকখানিও সরস করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

মাস-ফল—জ্যোতি-বাচস্পতি প্রণীত ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত,—১০২ পৃষ্ঠা,—মূল্য এক টাকা।

কোন্ মাসে জন্ম হইলে মানুষের প্রকৃতি, মতিগতি, ভাগ্য ও উন্নতি-অবনতি কিরূপ হয় তাহা বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া ধারাবাহিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আমরা কেহ কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম কতক কতক মিলিল বটে।

বার্ষিক শিশুসাথী (সচিত্র)—ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম্‌-এ, পি-এইচ্-ডি সম্পাদিত ও ৫নং কলেজ স্কোয়ার হইতে আশুতোষ লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত—১৮৫ পৃষ্ঠা,—মূল্য দেড় টাকা।

মাসিক শিশুসাথীর কর্ত্তৃপক্ষগণ এই বৎসর বার্ষিক শিশুসাথী বাহির করিয়াছেন। ইহার সম্পাদক,—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা প্রোফেসর,—ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। ইহার লেখকগণ,—রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বঙ্গের খ্যাতনামা মনীষী-বৃন্দ। শিশু জগতের তুষ্টির জন্য যাহা সম্ভব তাহার কোন আয়োজনেরই অভাব ইহাতে নাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালিদাস রায়, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, জলধর সেন, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, মনোরম গুহ ঠাকুরতা, জগদানন্দ রায়, গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য, সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতির নানাবিধ উপাদেয় রচনায় ইহার কলেবর পূর্ণ। ইহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি সরল ও সুপাঠ্য,—শিশুগণও যে আনন্দের সহিত

ইহা পাঠ করিবে তাহা অকুণ্ঠিত-চিত্তে বলা যাইতে পারে। ইহার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ছবি,—ছবির সাহায্যে ইহার প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধই ব্যাখ্যাত। তা'ছাড়া চিত্তাকর্ষক রঙ্গীন ছবির প্রাচুর্য্যে ইহা আরও শিশুরঞ্জন হইয়াছে। শিশুসাথীর এই অপূর্ব্ব বার্ষিকী একবার শিশুর হাতে পড়িলে সত্যই তাহার সাথী হইয়া থাকিবে—তবে তাহার মা ও বয়স্ক ভাই ভগিনীগণ তাহাকে পাছে বঞ্চিত করে—এই যা ভয়।

দার্জ্জিলিংএর পার্ব্বত্য জাতি•(সচিত্র)—শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার বি,-এ, এম,-আর,-এ-এস্ (লণ্ডন), এম,-ডি (হোমিও), বিদ্যারত্ন, বিদ্যাবিনোদ, মেম্বর—বারেন্দ্র রিসার্চ্চ সোসাইটি, রাজসাহী প্রণীত, ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড সন্স ও কমলা বুক ডিপো প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য ;—৮৫ পৃষ্ঠা ;—উত্তম বাঁধান,—মূল্য পাঁচ সিকা।

পুস্তকখানি দার্জ্জিলিংএর নেপালী, লেপ্‌চা, তিব্বতীয়, ভুটিয়া প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতির অভিনব জীবন-যাপন-প্রণালী ও অত্যাশ্চর্য্য সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতির সুলিখিত বিবরণ। বর্ণনা কৌতূহলোদ্দীপক, সরল, সহজ, ও চিত্তাকর্ষক। ছবির সাহায্যে পুস্তকখানির উপযোগিতা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বিবি বউ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত ;—৪।৪এ কলেজ স্কোয়ার হইতে বুক কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত ;—মূল্য সাত সিকা।

একখানি ছোট গল্পের বই। ইহাতে মোট আটটি গল্প আছে,—তন্মধ্যে শেষের গল্পটি শ্রীমতী রেণুকার লেখা। রেণুকার গল্পটি বাদ দিলে অবশিষ্ট গল্পগুলি ঝরঝরে ও সুখপাঠ্য—লিখিবার গুণে আড়ম্বরহীন আখ্যান বস্তুও যে সরস ও তৃপ্তিদায়ক হয়,—তাহার পূর্ণ নিদর্শন।

গল্পগুচ্ছ—(দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত,—বিশ্বভারতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত নূতন সংস্করণ। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ব প্রকাশিত গল্পগুচ্ছ, গল্পসপ্তক গল্প চারিটি ও অন্যান্য অপ্রকাশিত গল্পগুলি লিখিবার তারিখ অনুসারে সাজাইয়া চারি খণ্ডে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রথম খণ্ড পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানি দ্বিতীয় খণ্ড। ইহাতে ২৭টি গল্প আছে।

যোহান বোয়ার

আজ বিশ্বসাহিত্যে যোহান বোয়ারের নাম দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ক্ষুদ্রায়তন দেশ হইলেও যুরোপের সাহিত্যে নরওয়ের দান নগণ্য নহে। ইবসেন, হামসুন ও বোয়ারের মতন প্রতিভাশালী লেখক যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার নাম চিরদিনই সাহিত্যজগতে সমাদৃত হইবে। এই পৃথিবীর সকল দেশেই তরুণ হৃদয় বোয়ারের ডাকে সাড়া দিয়াছে,—বিশ্বজগত ভরিয়া নবীন কণ্ঠে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বাণী বোয়ার জাগাইয়া তুলিয়াছেন।

বোয়ারের সাহিত্য-সৃষ্টি সমালোচনা করিবার আগে আমাদিগকে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। যাঁহারা বলেন যে আর্ট কেবল আর্টেরই জন্য, সাহিত্য আপনার মুখ্যে আপনিই পূর্ণ, তাঁহাদের কাছে হয়ত বোয়ারের এই অনন্তনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনার মূল্য অনেক কমিয়া যাইবে।

Art for art's sake, বা সাহিত্য কেবল প্রকাশেই সার্থক, একথা বোয়ার স্বীকার করেন না। তাঁহার লেখার প্রতি ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে জীবনের প্রতি গভীর প্রেম, মানবের জন্য অনন্ত ভালবাসা, মানুষকে উন্নততর মহত্তর করিবার জন্য বিপুল আবেগ, দুর্ব্বার চেষ্টা। বোয়ারের উপন্যাস তাই জীবনকে বেড়িয়া গড়িয়া উঠিলেও কেবল মাত্র জীবনের প্রতিবিম্ব নহে। জীবনের প্রতিবিম্ব যতই নিখুঁত হোক না কেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা কেবল প্রতিলিপি মাত্র, ততক্ষণ তাহারা প্রকৃত আর্টের জগতে স্থান পাইতে পারে না। এই খানেই আলোক-চিত্রের সহিত কলাচিত্রের প্রভেদ। আর্ট মানুষের জীবনকে লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু মানুষের জীবন ত কেবল আর্টেরই মধ্যে সম্পূর্ণ নয়। তাই যে আর্টে মানুষের অন্তরের কোন আবেগকে তৃপ্ত করিবার চেষ্টা নাই, যে আর্টে মানব-মনের গভীর গহন কক্ষের অন্ধকার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে নাই, সে আর্ট অসম্পূর্ণ, সে আর্ট অসুন্দর। সাহিত্য-সৃষ্টি যখন শাশ্বত মঙ্গলকে সুন্দরের সঙ্গে মিশাইতে পারে, তখনই তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া ওঠে, তখনই আমরা আর্টের চরম বিকাশ দেখিতে পাই।

এই খানে হয়ত প্রশ্ন উঠিবে যে, আর্টকে কি তবে কেবল শুধু নীতিমূলকই হইতে হইবে? যদি নীতিশিক্ষাদানই আর্টের চরম উদ্দেশ্য হইত, তবে শিশুপাঠ্য নীতিকথাই আর্টের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইত। কারণ শিক্ষার প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটী কথাও তাহাতে নাই। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে বাহুল্যটুকু সমস্ত হৃদয়কে মাধুর্য্যে পরিপ্লুত করিয়া দেয়, সেই টুকুই ত আর্টের প্রাণ। উদ্দেশ্যমূলক রচনার অর্থ শুধু নীতিশিক্ষাদান নহে, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে জীবনের এমন একটী সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, যাহাতে আমাদের সকল হৃদয় বেদনায় দুলিয়া ওঠে, আনন্দে সাড়া দেয়, সুখদুঃখের মধ্য দিয়া তাহাকে উপলব্ধি করিতে চায়। Galsworthy বলিয়াছেন, যেখানেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ জটিল বা বেদনাসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে, সেখানেই তাহার মধ্যে একটী নীতি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে,—রূপদক্ষের কাজ সেই নীতিকে খুঁজিয়া বাহির করা। বোয়ারের সাহিত্য-সাধনাও তাই উদ্দেশ-বিহীন বা কেবল সৌন্দর্য্যসম্ভোগেই পরিপূর্ণ নহে, তাঁহার প্রত্যেক উপন্যাসের প্রত্যেক চরিত্র, সকল ঘটনা সংস্থানই একটী বিশেষ উদ্দেশ্য ইঙ্গিতে আভাসে ব্যক্ত করিতেছে। এই ইঙ্গিতের মাধুর্য্য, এই প্রকাশের মোহন ভঙ্গিতেই বোয়ারের আর্ট।

বোয়ার তাঁহার সাহিত্য-সাধনায় মানুষের জীবনকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন। তরঙ্গায়িত জীবনসিন্ধুর কূলকিনারা খুঁজিয়া কে কোথায় সীমানা পাইবে? অনন্ত জীবন সমুদ্রে কত তরঙ্গ দিবসরাত্রি উঠিতেছে, পড়িতেছে ভাঙ্গিতেছে, তাহার সন্ধান কে রাখে? আমাদিগকে প্রতিনিয়ত এড়াইয়া, আমাদের আকুল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া, "জীবন" পলাইয়া বেড়াইতেছে, মায়ামৃগের মতন আমাদের আঁখিপল্লবে নৃত্য করিতেছে, কিন্তু জীবনের শেষ কোথায়? তাই

আমরা হাসি, কাঁদি, ঘর বাঁধি, ঘর ভাঙ্গি, কিন্তু আমাদের অন্তরের কোন দুর্জ্জয় বিপুল আবেগ যে আমাদিগকে এসব করাইতেছে আমরা নিজেরাই তাহা জানি না। সমস্ত অন্তর দিয়া আমরা যাহা কিছু চাই, সমস্ত হৃদয় যাহার অভাবে কাঁদিয়া ওঠে তাহাও ত আমাদের মেলে না। তবু সহস্র বাধা সহস্র বিপত্তি, ব্যর্থতা হতাশাকে জয় করিয়া আমরা অন্ধ নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধ করি, কখনই হার মানি না। জীবনের পাত্র যখন শুকাইয়া যায়, দিনের আলোক যখন আমাদের নয়নে নিবিয়া আসে, তখনো আমরা আশা করি, আকাঙ্ক্ষা করি, বেদনা পাই। সকল ব্যথা, সকল আঘাত সকল ব্যর্থতার চেয়েও মহৎ, সকলের চেয়ে গভীর এই যে জীবন কণা আমাদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে তাহাকেই বোয়ার রূপ দিতে চাহিয়াছেন, জীবনের সেই চিরন্তন মুর্ত্তিই তাঁহার উপন্যাসে কায়া ধরিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

বিশ্ব সাহিত্যে বোয়ারের সকলের চেয়ে বড় দান এইখানে। ভগবান আছেন কি নাই, নিয়তির ক্রূরতায় মানুষ বেদনা পাক্, কিম্বা নাই পাক্, সেগুলি তাঁহার চোখে সত্য নহে। জীবনের অদম্য পিয়াসা, অপ্রকাশকে প্রকাশ করিবার আকুল আকুতি আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিবার যে বিপুল প্রয়াস, তাহাতে বোয়ারের রচনা কেবল মধুরই হইয়া ওঠে নাই, সুখ-দুঃখের আঘাত সংঘাতে তাহা মহীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত চেতনা, তাহার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে মানবত্বের এক বিরাট রূপ।

তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয় যে সাধারণতঃ ভগবান বলিলে যাহা বোঝা যায়, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান, কিন্তু মানবাত্মার এই দেবত্বে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই, কোন দ্বিধা নাই। আমাদের মধ্যে যাহা কিছু মহত্তম, যাহা কিছু উন্নততম, তাহারাই ভগবানের প্রকাশ,—সেখানেই তাঁহার অধিষ্ঠান। অন্ধ নিয়তির সঙ্গে নিয়তই মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে যে সকল সময়েই মানুষ জয়লাভ করিতেছে, তাহা নহে; বেদনার মধ্য দিয়া, মরণের মধ্য দিয়া মানুষ মরিয়া বারে বারে প্রমাণ করিয়াছে যে সে অজয়, সে অমর! এই যে মানবাত্মার দেবত্ব deification of the human spirit, ইহাকেই বোয়ার প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়াছেন, তাহাকেই তিনি আমাদের চোখে প্রতিভাত করিতে চাহিয়াছেন। বিশ্বজগতের আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়াও মানুষ সকলকে ছাড়াইয়া মহত্তর বিপুলতর হইয়া উঠিয়াছে; সেই মানবাত্মার পূজায় তাঁহার হৃদয় ভরপুর।

Great Hungerএ পিয়ার হোল্ম একে একে সকলি হারাইল। মানুষ যাহা কিছু চায়, যাহা কিছু লইয়া সুখী হয়, আপনার বলে, সকলি অর্জ্জন করিয়া তবু সে সুখী হইতে পারে নাই,—এক বিপুল বুভুক্ষায় তাহার সমস্ত হৃদয় প্রাণ কাঁদিয়াছে। শান্তি চাই, শান্তি ত মেলে না! কিসের জন্য মানবাত্মার এ আকুল ক্রন্দন—যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ কি চাহিয়াছে? ভগবান? সে ত শুধু মানুষের আদর্শের প্রতিমূর্ত্তি মাত্র। তারপরে যখন দুঃখ প্লাবনে একে

একে পিয়ারের সর্ব্বস্ব ভাসিয়া গেল, তখনো কি সে একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে? যশসম্ভ্রম, সম্পত্তিবিভব, অর্থ ধন জন মান সকলই একে একে হারাইয়া যখন যে পথের ভিখারী হইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনো ক্ষুধায় তাহার সমস্ত অন্তর জ্বলিয়াছে,—সে ত কেবল শুধু হারানো ঐশ্বর্য্যের জন্য নহে। স্নেহহীন আত্মীয়স্বজনের করুণার দান ভিন্ন যখন আপনার সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণ করিবার আর তাহার ক্ষমতা রহিল না, তখন তাহার মনে ঝড় বহিয়াছিল, আগুন জ্বলিয়াছিল, কিন্তু তখনো মানবাত্মার মহত্ত্বকে বাঁচাইয়া রাখিতে তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে; মানুষ যে দুঃখ বেদনার চেয়ে বিরাট, সেই দুঃখকে জয় করিয়া তাহা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে। জীবনের শেষ সম্বল, পিতামাতার হারাণো আনন্দের একটী মাত্র কণিকা আষ্টাও যখন নিষ্ঠুর শত্রুর নীচতায় তাহার জীবনকে একেবারে অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেল, তখন কি বিষে তাহার সমস্ত হৃদয় জ্বলিয়া যায় নাই? হিংসায় কি তাহার সমস্ত অন্তর জর্জ্জর হইয়া ওঠে নাই? কিন্তু সেই বিষের তলায়ও যে কোন অমৃত লুকানো ছিল, তাহার সন্ধান কি পিয়ার নিজেই রাখিত? বেদনায় তাহার সমস্ত হৃদয় কাঁদিয়াছে, ক্রোধ আসিয়া তাহাকে রোষ উদ্দীপ্ত করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে বিষ সে সবলে জয় করিল, শত্রুকে সে ভালবাসিল। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত শত্রুর ক্ষেত্রে আপনি গিয়া ফসল বুনিয়া আসিল।

কিসের জন্য পিয়ারের এ মহত্ত্ব,—কেন সে শত্রুকে প্রেম দিয়া জয় করিতে গেল, তাহার উত্তর বোয়ার নিজেই দিয়াছেন। মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক জগৎকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে, প্রকৃতিকে জয় করিয়া, তাহার বন্ধনকে লঙ্ঘন করিয়া মানুষের বিজয়রথ নিয়তই সম্মুখে চলিয়াছে, তাই পিয়ার প্রকৃতির নিদেশকে জয় করিয়া শত্রুকে ভালবাসিল। জ্ঞানের সন্ধানে তাহার আত্মা তৃপ্ত হয় নাই, ঐশ্বর্য্যবিভবের মধ্যে সে কল্যাণ খুঁজিয়া পায় নাই, এমন কি প্রেমের স্বপ্নস্বর্গেও সে সুখী হইতে পারে নাই। কিন্তু দুঃখ বিপদের আঘাতসংঘাতের মধ্যে যখন আপনার অন্তরের আদর্শকে পূর্ণ করিতে চাহিল, যখন সংস্কারকে জয় করিয়া সে আপনার মানবত্বকে মহীয়ান্ করিয়া দেখিল, তখনই তাহার জীবনে শান্তির সন্ধান মিলিল।

Face of the Worldএ-ও বোয়ার এই একই কথা বলিতে চাহিয়াছেন। এ সংসারে অনেক দুঃখ আছে, অনেক অন্যায়, অনেক অত্যাচার, অনেক আঘাত-সংঘাত রহিয়াছে। সবলেরা চিরদিনই দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষের জীবনে কি সেই শেষ কথা? Harold Mark যতই দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চাহিয়াছে, জীবনের তন্ত্রীগুলি ততই যেন আরো বেশী করিয়া জড়াইয়া গিয়াছে—বেদনার ত কোন লাঘব হয় নাই। তাহার সাধনা কোনদিনই পরিপূর্ণ হইতে পারে নাই, কোনদিনই তাহার সমাপ্তি হইতে পারে না। কিন্তু সকল দুঃখ-আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়াও মানুষের আত্মা যে বিপুল মহিমায় আপনাকে সমুন্নত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার মূল্য কি কম? সংসারে মায়ের বুকে শিশু মরিতেছে,

নিষ্ঠুরের অন্যায় উৎপীড়নে হতভাগ্যের জীবনের ধারা শুকাইয়া যাইতেছে, স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাধিয়া মানুষ ক্ষুদ্রতা, নীচাশয়তার পরিচয় দিতেছে, ইহাও যেমন সত্য, তেমনি অন্যদিকে মানুষের আত্মা মানুষের জন্য কাঁদিতেছে, আপনার জীবনের সকল সুখ, সকল আশা হাসিমুখে বিসর্জ্জন দিয়া মানুষ অপরের দুঃখ বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহাও কি তেমনি সত্য নয়? মানুষ যুগ যুগ ভরিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছে, রঙের পরে রঙ মিশাইয়া যে ছবি আঁকিয়াছে, তাহাতে কালিমার রেখাটুকু দেখিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে, আপনার অন্তরের আনন্দ উৎসারিত গীতিমুখে প্রকাশ করিয়াছে। এই যে এষণা, এই যে গভীর সৌন্দর্য্যপ্রীতি, এই যে অনুভূতির তীব্রতা, ইহাই যুগে যুগে মানুষকে অমর করিয়াছে! মানুষ আপনাকে ভুলিয়া গিয়া বিপুল আদর্শের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া তবে সার্থক হইতে পারিয়াছে।

এখানে বোয়ারের realism'র সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। এ সংসারের বেদনাকে, আঘাত-সংঘাতকে তিনি তুচ্ছ করিয়া দেখেন নাই, যেখানে যাহা কিছু খুঁত, যাহা কিছু ত্রুটী রহিয়াছে, নির্ম্মম করে পাষাণে তিনি তাহা খুঁদিয়া তুলিয়াছেন। মানুষের সহিত প্রকৃতির যে সংঘাত তাহাতে যে বেদনা, বারে বারে তাহা তাঁহার হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছে, বারে বারে অশ্রুজলে তাহা তিনি আঁকিয়াছেন। God and the Womanএ Martha সকল জীবন ধরিয়া যে সন্তানের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিল, সেত কোনদিনই আসিল না, তাহার শূন্য কোল চিরদিন শূন্যই রহিয়া গেল। এই যে ব্যর্থতার বেদনা, এই যে বুভুক্ষার তীব্র তপ্ততা—তাহাতে কি আমাদের হৃদয়ও অশ্রুসজল হইয়া ওঠে না? তাহার সমস্ত জীবনের সাধনা কেন পূর্ণ হইল না, তাহার উত্তর কে দিবে?

Treacherous Groundএ Evje আপনার আদর্শ পূর্ণ করিতে আজন্ম সাধনা করিয়াছিল, কিন্তু নৈসর্গিক শক্তির সংঘাতে ত তাহার সকল প্রয়াস ভাঙ্গিয়া গেল। বহুদিবস ধরিয়া ধীরে ধীরে যত্নে সে যাহা গড়িয়া তুলিয়াছিল এক নিমিষে তাহা চূর্ণ হইয়া ধূলায় লুটাইল। জীবনের স্বপ্ন ত এমনি করিয়া টুটিয়া যায়—এমনি করিয়া চক্ষের পলকে পৃথিবীর আনন্দ ধুইয়া মুছিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়।

Pilgrimageএ Regina দেশে দেশে আপনার হারানো ছেলেকে খুঁজিয়াছিল, কত দিন রজনী মাস পথ চাহিয়া চাহিয়া তাহার কাটিল, মায়ের হৃদয়ে কি সে বেদনা চিরন্তন নহে? নির্দ্দোষী প্রতিনিয়ত বেদনা পাইতেছে, একের পাপে,—একের দোষে অপরে মরিতেছে, আমাদের জীবনে ত তাহা আমরা প্রত্যেক দিনই দেখিতে পাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহাতে কোন বেদনা নাই? Frau Wangen (Power of a Lie) কোন অপরাধে সমস্ত জীবন ধরিয়া বেদনা সহিল, আমরা তাহা জানিনা, কিন্তু তাঁহার বেদনায় আমরাও কাঁদি, আমাদের হৃদয়ও সহানুভূতিতে সাড়া দিয়া ওঠে। ক্ষণিকের ভুলে যে কেমন করিয়া জীবনের পাত্র বিষে ভরিয়া

ওঠে,—জীবনে যে কত বেদনা, কত অসত্য, কত মিথ্যা, তাহা তিনি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। অসত্য সত্যকে জয় করিতেছে, ধর্ম্মের ধ্বজা অধর্ম্মের কাছে অবনত—কিন্তু তবু মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বোয়ার হতাশ হইয়া পড়েন নাই। সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে যে এক দুর্জ্জেয় রহস্য রহিয়াছে। জীবনের সকল আঘাত সংঘাতেই মানবের যে বিরাট রূপ প্রতিভাত হইয়া ওঠে, তাহার ছবি বোয়ারকে মুগ্ধ করিয়াছে, অন্ধকার রজনীর ভয়ের মোহকে জয় করিয়া তাহার হৃদয় সেখানে আলোকের সন্ধান পাইয়াছে।

কিন্তু কেবলমাত্র বাস্তবের ছবি আঁকিয়া বোয়ার সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, কারণ তিনি কেবল ঔপন্যাসিকই নহেন—তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক ও কবি। আমাদের মনের গহন গহ্বরে কত সুখদুঃখ বাসা বাঁধে, কত গোপন আশা, কত গভীর বেদনা যে সেখানে নিয়ত প্রকাশ মাগিয়া কাঁদিয়া ফেরে, আমরা নিজেরাই কি তাহার সন্ধান রাখি? প্রতি দিবসের জীবনে যে কত অসম্পূর্ণ আশা, কত অর্দ্ধপরিস্ফুট স্বপ্ন অগোচরে ঝরিয়া পড়িতেছে, একবার যদি তাহারা ভাষা পাইয়া বাহির হইয়া আসিত! একটী জীবনের ক্ষুদ্র সীমানা লঙ্ঘন করিয়া আমাদের অন্তর আপনাকে উৎসারিত করিয়া দিতে চাহিতেছে, জীবনের বিচিত্র লীলার বহুমুখী প্রকাশকে সম্ভোগ করিতে চাহিতেছে, কিন্তু আমরা সমাজের শাসনে নীতির বন্ধনে আপনাকে বাঁধিয়া রাখি। Prisoner who sang-এ একবারের জন্য বোয়ার তাহাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন। জীবনের যে অদম্য পিয়াসা, আপনাকে প্রকাশ করিবার যে বিপুল আবেগ আমরা প্রতিদিন গোপন করিয়া রাখি, Andreas তাহাদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখে নাই। তাই জীবনের বিচিত্র প্রকাশ তাহার অন্তরকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল, সকলের জীবনে যত আশা, যত ভরসা, যত স্বপ্ন—সকলই আপনার মধ্যে উপলব্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু সে কি সে শান্তি পাইয়াছে?

বোয়ার বারে বারে এক কথাই বলিয়াছেন,—আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই। নিবৃত্তি ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন উপায় নাই। নিজের মধ্যে নিজেকে বাঁধিয়া রাখিলে, আপনাকে লইয়া আপনার স্বপ্ন রচনা করিলে সুখ মিলিবেনা, আপনাকে ভুলিয়া জগতের স্বপ্নে আপনাকে মিলাইয়া না দিতে পারিলে তৃপ্তি নাই। Norby (Power of a Lie) অন্যায় করিয়াছিল, তাহার জন্য তাহাকে দুঃখ সহিতে হইয়াছে। কিন্তু যখন আপনার অন্যায়ের কথা ভুলিয়া অপরের বেদনায় তাহার হৃদয় কাঁদিল, অন্যের ভাবনা আসিয়া যখন তাহার অন্তরে আর নিজের চিন্তার স্থান রহিল না, তখন তাহার প্রাণে সকল দ্বিধা, সকল সন্দেহের অবসান হইল, অন্যায় করিয়া ভুল করিয়াও সে শান্তি পাইল।

Pilgrimage-এ Regina-ও তাই কোনদিন সুখ পায় নাই—কোনদিনই সে সুখ পাইতে পারে না। আপনাকে লইয়া সে এতই বিভোর, আপনার বেদনায় সে এতই আহত, যে

বাহিরের বিপুল জগতে অন্যেরও যে দুঃখ আছে, সে কথা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। Flatten তাহাকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু Regina-র মনে তাহার ছায়ারেখাটুকুও পড়ে নাই। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত সে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, তন্দ্রাঘোরে নিষ্ঠুর আঘাতে সে কোমল হৃদয় কাঁদাইয়াছে, কিন্তু তাহার অন্বেষণের কোন দিন কিনারা মিলে নাই,—সে সুখ পায় নাই।

Andreas-ও (Prisoner who sang) অবশেষে মুক্তি পাইল তখন, যখন সে Sylvia-কে ভাল বাসিয়া Sylvia'র সুখের জন্য আপনার সুখ বিসর্জন দিল। আপনার ভালোমন্দের সংঘাতশেষে তাই গিয়া সে আপনাকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া, অপরের প্রীতির বন্ধনে বন্দী হইয়া তবে শান্তি পাইল। ভালোমন্দের তন্ত্রীগুলি জীবনে জড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু সকল ভালোমন্দকে অতিক্রম করিয়া মানবের মহত্ত্ব প্রেমে আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে—সেখানেই মানবের কল্যাণ।

এই মহৎ আদর্শ, এই মহান্ বাণী তাঁহার সকল লেখাকেই অনুপ্রাণিত করিয়াছে, মানুষের আত্মার বিজয় গানে তাঁহার কণ্ঠ অন্যায় অবিচারের ক্রন্দন-গর্জ্জনকে ছাপাইয়া ধ্বনিত হইয়াছে। আদর্শের জন্য, অন্তরের স্বপ্নকে মূর্ত্ত করিবার জন্য প্রাণদান মানুষের নিত্যকার অধিকার, মৃত্যুর পথে মানুষ নিয়ত জীবনের সন্ধানে চলিয়াছে। আত্মসমাহিতের সুখ নাই, —এই বাণী চিরদিনই স্বার্থান্ধের মনে ভীতিসঞ্চার করিবে। আমাদের অন্তরের অসীম কামনা তাঁহার লেখায় প্রকাশ পাইয়া সার্থক হইয়া ওঠে, হৃদয় দুঃখ-বেদনার ভার বহন করিয়া সন্নত মস্তকে অগ্রসর হইতে চাহে।

কিন্তু বোয়ারের সকলের চেয়ে বড় কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি তাঁহার বাণী মানুষের জীবনের সুখদুঃখের জালে বুনিয়া প্রচার করিয়াছেন। অন্তরের নিগূঢ়তম অন্ধকারে যে কামনা আপনাকে লুকাইতে চাহে, তাহা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই; গভীর হৃদয়ে গোপনে যে স্বপ্ন পুষ্পের মত ফুটিয়া ওঠে, তাহাকেও তিনি প্রভাতের আলোকে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা হাসি, কাঁদি, বেদনা পাই সকল অভিজ্ঞতার অন্তরালে যে গভীর আবেগ লুকাইয়া রহিয়াছে, বারে বারে তাহার সন্ধান পাইয়া আমাদের অন্তরের অন্ধকার শিহরিয়া ওঠে নবীন জগতের নূতন আলোকে আমাদের হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে।

হুমায়ূন কবির

বেঙ্গল স্পেক্টেটর

এই সংবাদ পত্রখানি ইংরাজী ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাস হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথমে ইহা মাসিক, পরে পাক্ষিক ও তৎপরে সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইত। কোন্ সংখ্যা কিরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল নিম্নে তাহার একটি তালিকা দিলাম।

প্রথম ভাগ

এপ্রিল সংখ্যা	১২ পৃষ্ঠা
মে হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৪ সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা	৬৪ „
ডেভিড হেয়ার সাহেবের মৃত্যুতে ১৮ জুন অতিরিক্ত সংখ্যা	৪ „
১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৮ সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১২ পৃষ্ঠা	৯৬ „
	১৭৬ „

কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে বিশেষতঃ যখন সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইত তখন তারিখের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দেখা যাইত। এইজন্য দ্বিতীয় ভাগে যে কয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল নিম্নে তাহার তালিকা প্রকাশ করিলাম। পাঠক মহাশয় আরও দেখিতে পাইবেন যে যদিও পত্রিকাখানি সাপ্তাহিক ছিল সময়ে সময়ে ইহা নয় দিন অন্তর ও সময় সময় ছয়দিন অন্তর প্রকাশিত হইত।

দ্বিতীয় ভাগ

১লা জানুয়ারি ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ	১২ পৃষ্ঠা
১৫ই ঐ	১২ „
১লা ফেব্রুয়ারী	১২ „
১৫ই ফেব্রুয়ারী ও ১লা মার্চ্চ, (৪ ও ৫ সংখ্যা একত্রে)	২৬ „
৮ মার্চ্চ	১২ „
১৬ই মার্চ্চ	১০ „

২৪শে মার্চ্চ, ১লা এপ্রিল, ১০ই এপ্রিল, ১৭ই এপ্রিল, ২৫শে এপ্রিল, ১লা মে, ৮ই মে, ১৭ই মে, ২৫শে মে, ১লা জুন, ৮ই জুন, ১৬ই জুন, ২৪শে জুন, ১লা জুলাই, ১১ই জুলাই, ১৬ই জুলাই, ২৪শে জুলাই, ১লা আগষ্ট, ৯ই আগষ্ট, ১৬ই আগষ্ট, ২৪শে আগষ্ট, ১লা সেপ্টেম্বর, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮ই সেপ্টম্বর, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১লা অক্টোবর, ১০ই অক্টোবর, ১৭ই অক্টোবর, ২৪শে অক্টোবর, ১লা নবেম্বর, ৯ই নবেম্বর, ২০শে নবেম্বর—এই ৩২ সংখ্যার প্রতি সংখ্যায় ৮ পৃষ্ঠা, মোট ৩৮ সংখ্যায় ৩৪০ পৃষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছিল।

পত্রিকার শিরোনামায় কেবল ইংরাজিতে নাম থাকিত, এবং আমরা ইহার কোনও সংখ্যায় বাঙ্গালা তারিখ দেখিতে পাই না, কেবলমাত্র ইংরাজি তারিখ দেখিতে পাই।

রেভেরণ্ড জে লং সাহেবের মতে ইহার পরিচালক কেবলমাত্র দুইজন ছিলেন,—রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র। তবে রামগোপাল ঘোষের জীবনীতে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, তিনি মধ্যে মধ্যে ইহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন, পত্রিকা সম্পাদনের ভার প্যারীচাঁদের হস্তেই ছিল। Civis নাম স্বাক্ষর করিয়া রামগোপাল "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকাতে ও এই পত্রিকাতে

Inland Transit Duty* সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লিখিতেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষিত অনেকগুলি ছাত্র "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকা পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বেঙ্গল স্পেক্টেটরে আমরা কেবল-মাত্র দুইজন দেশহিতৈষী মাহাত্মার নাম পাই। পত্রিকার অকালমৃত্যু যে ইহার অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে বেঙ্গল স্পেক্টেটর যতদিন জীবিত ছিল ততদিন নিজের নামের অব্যর্থতা বজায় রাখিতে পারিয়াছিল এইটুকুই আমাদিগের আনন্দের বিষয়। যৎকালে কলিকাতায় বেঙ্গল স্পেক্টেটর প্রকাশিত হইয়াছিল তখন প্রবন্ধ-সৌন্দর্য্যে ও ভাব-প্রাচুর্য্যে উহা শিক্ষিত-সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। এমন কি সুদূর ইংলণ্ডেও ইহার পাঠক ছিল। বিলাতে লাঙ্কাষ্টর ও ম্যানচেষ্টর নগরীতে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের দুঃখ মোচনার্থে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে দুইটি সভা স্থাপিত হইয়াছিল। পরে লণ্ডন মহানগরীর এই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রযত্নে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে আদম সম্পাদিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া আডভোকেট নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। এই সকল ভারতহিতৈষী ইংরাজদিগের জ্ঞাপনার্থে বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকা বিলাতে প্রেরিত হইত। এতদ্ব্যতীত বিখ্যাত জর্জ্জ টমসন মহোদয় তাঁহার ইংলণ্ডস্থিত অপর বন্ধুদিগের ও জনসাধারণের গোচরার্থে অনেক কাপি স্পেক্টেটর সেখানে পাঠাইতেন।

রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন, শিক্ষা-বিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলন, ধর্ম্মাধিকরণে অসঙ্গত বিচার প্রভৃতি নানারূপ বিষয় ন্যূনাধিক ইহাতে স্থান পাইত।

কিন্তু অসহায় দুর্ব্বল অশিক্ষিত রাইয়তকে পরাক্রান্ত ভূস্বামীর কবল হইতে রক্ষা করার চেষ্টা ইহার গৌরব মুকুট ছিল। রাইয়তের বদ্ধমূল দারিদ্র্য ব্যতীত প্রবল ঝটিকা, বন্যা, অনাবৃষ্টি, মহামারী প্রভৃতি দুর্ব্বিপাকের জন্য তাহার অবস্থা সময়ে সময়ে গুরুতর হইত। অবশ্যম্ভাবী দেবতার প্রকোপ ব্যতীত তাহাকে সময়ে সময়ে আরও সঙ্কটে পড়িতে হইত। তৎকালীন নব-প্রচলিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও আনুষঙ্গিক আইন কানুনের জন্য তাহাকে প্রায়ই বিব্রত হইতে হইত। অশিক্ষিত রাইয়তের পক্ষে কৃত্রিম দলিলের রহস্যোদ্ঘাটন করা একেবারে অসম্ভব ছিল। ধর্ম্মাধিকরণে উৎকোচ প্রদান করিয়া ভূস্বামী স্বকার্য্য সাধন করিতেন কিন্তু রাইয়ত এই সমুদায় কৌশল জানিত না। ঠিক এই সময়ে বেঙ্গল স্পেক্টেটর রাইয়তের পক্ষ সমর্থন করিতে আসরে অবতীর্ণ হইলেন। ইহাতে কিরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত তাহার নিদর্শন স্বরূপ ৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১লা ও ২০শে নবেম্বরের একটি আখ্যায়িকা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

১লা নবেম্বর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত

বঙ্গদেশীয় রাইয়তদিগের অবস্থা দেখিয়া অনেকের মনে দুঃখ উপস্থিত হয়; ইহাদিগের ক্লেশের কারণ

---

* নবাবী আমল হইতে পণ্য দ্রব্যাদির প্রতি শুল্ক গ্রহণ করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। কোন এক স্থানের দ্রব্য স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হইলে অগ্রে মাশুল দিয়া রোয়ানা বা ছাড়পত্র লইতে হইত। পরন্তু গন্তব্য স্থানের ছাড়পত্র লইলে অব্যাহতি ছিল না। পথের মধ্যে মধ্যে প্রধান প্রধান নগরে ডিপো (Depot) থাকিত এবং সেই সেই স্থানে কিছু কর স্বরূপ আদায় হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই মাশুলের দায় হইতে মুক্ত থাকিয়া অপরাপর বণিকগণকে ঐ দায়ের অধীন রাখিবার নিমিত্ত অনেকবার অনেক চেষ্টা করেন। পরে তাঁহারা দেশের শাসনকর্ত্তা হইলেন এবং পার্লিয়ামেণ্ট সভাও তাঁহাদিগকে বণিকবৃত্তি রহিত করিয়া দিলেন। সুতরাং এই মাশুল প্রচলনের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন চলিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস একবার ইহা রহিত করেন। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা লর্ড ওয়েলেসলি ইহা পুনঃ-প্রবর্ত্তিত করেন। পরে লর্ড মেটকাফের সময় হইতে এই প্রথা একেবারে উঠিয়া যায়।

জানা এবং তন্নিবারণের উপায়ান্বেষণ ও ইহাদের পক্ষে সাহায্য প্রদান করা অতিশয় সন্তোষজনক বটে কিন্তু এই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করা অতি কঠিন এবং এ বিষয়ে ক্ষমতাও অত্যল্প লোকের আছে।

রাইয়তেরা অতিশয় দীন ও নিরাশ্রয়, এক্ষণে এ প্রকার হইয়াছে যে রাইয়ত এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই দরিদ্র মনুষ্য বুঝা যায়, তাহারা বিজাতীয় পরিশ্রম করে তথাচ স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না, তাহারা যে ক্লেশে প্রাণধারণ করে পশুদিগের সহিত তুলনা করিলে বরঞ্চ পশুদিগকে সুখী বোধ হয়, কারণ পরমেশ্বর পশুদিগের গ্রাসাচ্ছাদন একেবারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। আমার দুঃখের বিষয় এই যে রাইয়াতেরা পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে প্রধান মনুষ্যের তুল্য হইয়াও কেবল দরিদ্রতা হেতুক শারীরিক ও মানসিক অপর্য্যাপ্ত ক্লেশ ভোগ করে।

জমীদারদের দৌরাত্ম্যেতেই প্রজাগণকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়; লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ি বন্দোবস্ত কালীন জমীদারদিগকে ক্ষমতা প্রদান করাতেই তাহাদের রাইয়তের উপর দৌরাত্ম্যকরণের পন্থা হয়। ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ২ প্রকরণ দ্বারা ভূম্যধিকারিরা যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন তাহাতে জমীদারেরা রাইয়তের উপর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। অতএব ঐ আইনের দ্বারা প্রজাগণের পক্ষে কেবল অহিত হইতেছে, আমাদের বোধ হয় আইনকর্ত্তা মহাশয় মহৎ ছিলেন অতএব ঐ আইনে মহৎ লোকদিগের উপকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আপন অধীনস্থ দরিদ্র প্রজাগণের দুঃখ ভাবেন নাই, কিরূপে স্বসমান লোকেদের মঙ্গল হইবেক কেবল ইহা বিবেচনা করিয়াছিলেন। ভূম্যধিকারিদিগকে এতাদৃশ ক্ষমতার্পণের অন্য কারণ এই যে গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগের নিকট হইতে অনায়াসে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন, সমারি স্যুটে মোকদ্দমা হইবার যে প্রথা হইয়াছে তাহাতেও রাইয়তেরা ক্লেশ পায় আমার অনুমান হয় ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার নিমিত্ত উক্ত প্রকার মোকদ্দমার আইন করিয়াছেন, এবং খাজানার জন্য রাইয়তদিগকে অবরোধ করণের আইন করাতে জমীদারেরা প্রকাশ্যরূপে প্রজাগণকে যন্ত্রণা দেয়। ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ২১ প্রকরণানুসারে খাজানা আদায়ের নিমিত্ত রাইয়তদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিত না কিন্তু ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৮ ধারাতে তাহা রহিত হইয়া এই হুকুম হইয়াছে যে যদি কেহ অন্তঃপুরে মালামাল লুকাইয়া রাখে তবে পোলিসের একজন লোক সমভিব্যাহারে লইয়া অন্বেষণ করিতে যাইতে পারিবেক; পোলিসের লোকদের চরিত্র সকলেই জ্ঞাত আছেন, অতএব ঐ আইনে রাইয়তদিগের পক্ষে যে কি পর্য্যন্ত মন্দ হইয়াছে সকলে জানিতে পারিতেছেন।

জমীদারদের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ ও প্রজাগণের দুঃখ মোচনার্থ ১৭৯৩ সালের ১২।১৩।১৪।১৫।১৬ ধারাতে যে উপায় করিয়াছেন তাহা প্রায় মফঃসলের ভূম্যধিকারিরা মান্য করেন না অর্থাৎ তদনুসারে কার্য্য হয় না। লিডেনহালের লোকেরা রাইয়তদিগের পরিশ্রম দ্বারা সুখ ভোগ করেন ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্ট প্রজাগণের এতাদৃশ দুঃখ দেখিয়া যদি তন্নিবারণের উপায় না করেন তবে আমরা তাঁহাদিগকে দোষী করিতে পারি, আর গভর্ণমেণ্ট আপনি কহিয়াছেন যে যুদ্ধসম্পর্কীয় সৈন্যগণ দ্বারা এতদ্দেশ রক্ষিত হইয়াছে এক্ষণে এমত কহিতে পারিবেন না অপ্রতুলের জন্য রাইয়তদিগকে ক্লেশ দিয়া ধনাহরণ করিতেছেন অতএব প্রজাগণের দুঃখ দেখিয়া সভ্য গভর্ণমেণ্টের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত হয় না যাহাতে প্রজার ক্লেশ দূর হয় শীঘ্র তাহা করা কর্ত্তব্য কিন্তু এখানকার সভ্যতা নাম মাত্র তদ্দ্বারা ফল কিছুই হয় না।

(২০ নবেম্বর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত)

যে সকল ব্যক্তিরা মফঃসলের বৃত্তান্ত অবগত আছেন তাঁহারা জানিতে পারেন যে মফঃসলের প্রজাগণের দুরবস্থা গবর্ণমেণ্ট হইতে হয় না কিন্তু গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সম্পর্কীয় প্রথায় জমীদার নামে যে এক শ্রেণী হইয়াছে তাঁহাদের হইতেই হয়। জমীদারের প্রতি অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদত্ত হওয়াতে প্রজার পক্ষে প্রায় সর্ব্বদা অনিষ্ট ঘটে, জমীদারদের ক্ষমতা দ্বারাই যে দীন রাইয়তগণের হানি হয় ইহাতে কাহারো সন্দেহ নাই। আমি উপরি লিখিত বিষয় সপ্রমাণ করণার্থে শ্রীযুক্ত বাবু—জমীদারির নিম্নলিখিত ইতিহাস প্রকাশ করিতেছি মহাশয়ের নগরস্থ পাঠকবর্গ পাঠ করিলে সপ্রমাণ বোধ করিতে পারিবেন।

তিন বৎসর গত হইল,—গ্রামে একখানি পর্ণকুটীর ছিল, এ গৃহ ইংলণ্ডীয়দিগের কুটীরের ন্যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও লতা পত্রাদির দ্বারা সুশোভিত নহে, এবং সম্মুখে বিবিধ কুসুম শোভিত উদ্যানও নাই, মৃত্তিকা

নির্ম্মিত সামান্য খড়ুয়া ঘর, একটী পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে ছিল, গাছ হইতে সর্ব্বদা শুষ্ক পত্রাদি পতিত হওয়াতে ঐ গৃহ অতি নির্জ্জন স্থান হয় আর ঐ ঘর গ্রামের যে প্রদেশে লোকের বসতি আছে সে দিকে ছিল না মাঠের মধ্যে ছিল, ঐ ঘরের পশ্চাতে বার্ত্তাকু মূলা ইত্যাদি কতিপয় সামগ্রী জন্মাইত তাহা দ্বারা ঐ গৃহের অধিকারী লোচন ধাড়া নামক একজন উক্ত গ্রামস্থ পাইকস্তা রাইয়তের সপরিবারের জীবিকার সাহায্য হইত এবং ঐ গ্রামে ঐ ব্যক্তির যে একাদ্ম বিঘা ভূমি ছিল তাহাতেই দিনপাত হইত; তাহার এক কন্যা এবং দুই পুত্র, কন্যাটীর বয়ঃক্রম ১২ বৎসর, সে জননীর গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিত, দুই সন্তান অতি শিশু, একটীর বয়স ৫ বৎসর, অপরটীর ২ বৎসর; ঐ গ্রামের মণ্ডলের পুত্র রঞ্জন নামক এক ব্যক্তির সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হয়। লোচন আপনার দেয় রাজস্ব নিয়মিত সময়ে প্রদান করিত এবং কোন আবওয়াব উপস্থিত হইলে অস্বীকার করিত না অর্থাৎ সে মনে করিত যে আমি দরিদ্র লোক আমার অস্বীকারে কি ফল দর্শিবেক। ঐ ব্যক্তি কন্যার বিবাহকালীন জমীদারের পদাতিকদের নিকট তাহাদের প্রার্থনা সফল করিতে আপনার অক্ষমতা জানাইয়াছিল তথাচ পদাতিকেরা তাহাকে পরিত্যাগ না করাতে একজন মহাজনের নিকট শতকরা ৩০ টাকা হারে কর্জ্জ করিয়া তাহাদিগকে দেয়।

লোচন আপনার বাটী হইতে দেড় ক্রোশ অন্তর এক মাঠে প্রতিদিন কর্ম্ম করিতে যাইত, সে জাতিতে তিয়র ছিল অতএব কখন কখন পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরিয়াও জীবিকা চালাইত যদিও তাহার সকল প্রকার জীবিকা ক্লেশ সাধ্য ছিল তথাচ তাহার পরিবারের অন্ন বস্ত্রের অপ্রতুল ছিল না। ঐ ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া কর্ম্মে যাইত এবং দুই প্রহরের পর শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বাটীতে আসিত তৎকালে তাহার শিশুরা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এবং সে আপনার স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখিয়া আপনাকে সুখী বোধ করিত।

লোচন শ্রীযুক্ত—বাবুর অধিকারে ক'এক বৎসর পর্য্যন্ত এই প্রকার সুখে কালযাপন করে। সে বিস্তর পরিশ্রম করিত তথাচ তাহার কিঞ্চিৎ অসুখ বোধ হইত না, প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত শ্রম করা তাহার অভ্যাস ছিল অতএব পরিশ্রম করিতে কখন কাতর হইত না; স্ত্রী পুত্রাদির মুখ দেখিলে পরিশ্রম করিতে তাহার দ্বিগুণ বল হইত।

ডিসেম্বর মাসের একদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়কালীন জমীদারের একজন পিয়াদা তাহার বাটীতে আসিয়া দ্বার খোল দ্বার খোল এই শব্দ করিল লোচন নিদ্রিত ছিল চীৎকার শব্দেতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বস্ত্র পরিধান করিল ও আপনার স্ত্রীকে উঠাইল, ঘরের ভিতর একটা ছিদ্র দ্বারা দেখিল যে কতকতগুলিন লোক কোন অনিষ্ট করণাভিলাষে গৃহের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়াছে ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল এ অত্যাচারের কারণ কি? গোমাস্তা কি জন্য এত লোক সমভিব্যাহারে আমার বাটীতে আসিলেন, এবং চাপরাসিরা কেন গোমস্তার সহিত মৃদুস্বরে ও ইঙ্গিতে কথোপকথন করিতেছে? এই ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িল যে "আমার নিকট দুই মাসের খাজানা বাকী আছে" তাহার কন্যার বিবাহকালীন জমীদারের পদাতিকেরা অধিক দাওয়া করাতে তাহাকে অধিক সুদে টাকা কর্জ্জ করিতে হইয়াছিল এবং ঐ ঋণ পরিশোধে তাহার সমুদায় বিষয়ের উপস্বত্ব নিঃশেষ হইত।

লোচনের অনুমান সত্য।

লোচনের ভাবনার শেষ না হইতে হইতে তাহার বাটীর দ্বারভগ্ন হইয়া পড়িল এবং কয়েকজন চাপরাসী তাহার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিল, পরে গোমাস্তা জিজ্ঞাসা করিল তুমি বাকী খাজানা দিবে কিনা? লোচন ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া উত্তর করিল আমি এতদিন আপনকার খাজানা পরিশোধ করিতে পারিতাম, গোমাস্তা কহিল তুমি জাননা বাকীদারদের পক্ষে কি আইন হইয়াছে? লোচন গোমাস্তার চরণ ধরিয়া কহিল হে গোমাস্তা মহাশয় আমি জানি, কিন্তু আপনি দয়া করিয়া আমার কথা শ্রবণ করুন, আমি এপর্য্যন্ত রীতিমত খাজানা দিয়া আসিতেছি, যে দুই মাসের খাজানা পাওনা হইয়াছে তাহাও বাকী পড়িত না আমার কন্যার বিবাহকালীন মহাশয়দের প্রার্থনা সফল করিতে অধিক সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলাম ঐ সুদ দিতে আমার সব টাকা গিয়াছে। গোমাস্তা বলিলেন এবিষয়ের এক্ষণে আর কোন উপায় নাই; তৎপরেই তাহার বাটী লুঠ হইতে লাগিল, গৃহে যে কিছু দ্রব্য

ছিল 'সকলি আক্রমণ করিলেক এবং ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৯ ধারা এবং ১৮৪২ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারাতে নিষেধ থাকিলে লাঙ্গল কোদাল এবং এক যোড়া কাতান ইত্যাদি কতক দ্রব্য বাকী খাজনার জন্য লইয়া গেল।

এইরূপে সর্ব্বস্ব হৃত হইলে পর লোচন কিঞ্চিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গোমাস্তাকে কহিল তুমি আমার জানানা মহলে কেন প্রবেশ করিলে? গোমাস্তা উত্তর করিল "তোর আবার জানানা কি? পিয়াদা ইহাকে কাছারিতে লইয়া যাও, আমি ইহার পুষ্করিণ্যাদি ক্রোক করিতে যাই।" ইহার পরের বৃত্তান্ত উল্লেখের আবশ্যক নাই কারণ তাহা কেবল বর্ণিত বিষয়ের পুনর্ব্বর্ণন মাত্র। পিয়াদা গোমাস্তার আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্রে লোচনকে ধরিয়া নানা প্রকার আঘাত করত কাছারিতে লইয়া গেল এবং জমীদারের নিকট গিয়া বলিল "এ ব্যক্তি বলে আমার জনানা মহলে কেন প্রবেশ করিলে" এই কহিয়া সেখানেও উত্তমরূপে প্রহার করিল, লোচন অনেক দিন পর্য্যন্ত হাজতে কয়েদ থাকিল পরে তাহার নামে এক কৃত্রিম কবুলিয়ৎ প্রস্তুত করিয়া কালেক্টারির কাছারিতে লইয়া গেল এবং তাহার বিপক্ষে ডিক্রী বাহির করিয়া তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করিল ইহাতে তাহার পরিবারের যে ক্লেশ হইল তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

ছিটে-ফোঁটা

(১)

কানাই বলাই

(ত্যাগস্বীকারের মনোহর গল্প)

আমাদের গ্রামের লোকেরা বলিত, কানাই চক্কত্তি ছিল ধর্ম্মিষ্ঠ সাধু, আর বলাই ঘোষ ছিল পাপিষ্ঠ। বেল্লিক। কেন এক-একজনের নামে সুখ্যাতি বা অখ্যাতি রটে, তাহাই এই গল্পে লিখিব।

কানাই ও বলাই দুই জনেই বাপ্ ঠাকুরদাদার সম্পত্তি পাইয়াছিল অনেক; রোজ্‌গারের ভাবনা ছিল না। যে ধরণের দরাজ গলায় কাঁদুনে সুরের ঢেউ খেলিলে কীর্ত্তন গাইবার উপযোগী হয়, কানাইএর গলায় সেই সুর ছিল; সে অনেক আখ্‌ড়া মাতাইয়া গাইত—আমি মরিব মরিব সখি। অন্যদিকে বলাই তাহার সরু গলায় আসর জমাইয়া গাইত—ডুবেছ ত ডুবে দেখ। এ গেল তাহাদের গান কপ্‌চাইবার প্রথম যুগের কথা।

পরে যে কিসে কি হইল, তাহার খাঁটি ইতিহাস মেলে না; তবে ইহা জানি যে একদিন কানাইকে টানিলেন স্বর্গের হরি—আর বলাইকে টানিল পাড়ার পাপিষ্ঠা হরিমতী। দুইজনেরই বাঁধা সংসার ছিল, স্ত্রীপুত্র ছিল; আর দুইজনই নিজেদের ত্যাগের বুদ্ধিতে ঘর-বাড়ী ও স্ত্রী-পুত্র ছাড়িল। কানাই চেঁচাইয়া সংস্কৃত আওড়াইয়া বলিত -কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ; বলাইও ঠিক তাহাই বলিত, তবে নিজের মনে মনে, বাঙ্গলা ভাষায়।

দুইজনেরই ঘর-সংসার উড়িয়া পুড়িয়া গেল; কানাইর সম্পত্তি উড়িল ভক্ত-পুষ্টির মালসা ভোগে, আর বলাইএর সম্পত্তি উড়িল নক্ত তুষ্টির পর সালসা ভোগে।

কানাই পৃথিবীর কোন লোকের সঙ্গে কথা কহিত না; হয় উর্দ্ধ নয়নে, না হয় চোখ্ বুঁজিয়া হরিমন্দিরের দেয়াল ঠেস্যান্ দিয়া চব্বিশ ঘণ্টা কাটাইত ও মাঝে মাঝে তাহার "তনু হ'ত রোমাঞ্চিত,—প্রেমরসে বিগলিত।" বলাইএর চব্বিশ ঘণ্টার বিবরণে ঐরূপ কিছু ছিল কিনা, তাহার সাক্ষী নাই, তবে সে হরিমতীর বাড়ী ছাড়িয়া পাদমেকম্ কোথাও যাইত কিনা সন্দেহ।

একই ত্যাগ-নদীর দুইটি ধারা ঐ কানাই ও বলাই শেষে মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা কোথাও বিলীন হইয়া গেল। শোনা যায় যে বলাইএর ছেলেরা পাপিষ্ঠা হরিমতীর কাছে তাহার পাপের টাকা কিছু পাইয়াছিল, কিন্তু হরিমঠের পুণ্যাত্মা অধিকারী কানাইএর পরিবারের কাহাকেও পাপময় সাংসারিকতার তিলমাত্র প্রশ্রয় দেন নাই। হরিমতী কিছু দিল, কিন্তু হরি কিছু দিলেন না কেন, এই পাপ কথা একবার কানাইএর স্ত্রী বলিয়াছিল, আর তাহা শুনিয়া মঠের অধিকারী ঠাকুর কানে আঙ্গুল দিয়া বলিয়াছিলেন—হরি বল, হরি বল, হরি বল।

(২)

ধর্ম্মের খেলা

(লাভ শিকারের কুৎসিৎ গল্প)

কেদারনাথ, রমণকৃষ্ণ ও ঈশান একদিন বুদ্ধি আঁটিল তাহারা মুসলমান হইবে। অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল এই, কেদারের ডিপুটিগিরি পাইবার চেষ্টা বিফল হইয়াছিল, মক্কেলহীন রমণকৃষ্ণের মুন্সিফি পাইবার আবেদন নামঞ্জুর হইয়াছিল, আর ঈশান বেচারার কপালে একটা মাষ্টারিও জোটে নাই। তাহারা যেদিন বুঝিল যে উত্তর-পূর্ব্ব ছাড়িয়া পশ্চিমের দিকে মুখ ফিরাইয়া আরবী ভাষায় ঈশ্বরকে ডাকিলে সরকার বাহাদুরের নেকনজরে পড়া যায়, তখন তাহারা একদিন কল্‌মা পড়িয়া মুসলমান হইল; কেদারের নাম হইল কাদের, রমণকৃষ্ণ নাম পাইল রহমন্, আর ঈশান হইল ঈশা।

তিনজনেরই কপাল খুলিল; তাহারা যথাক্রমে ডিপুটি, মুন্সেফ ও প্রোফেসর হইল। নসীবের জোরে তিনজনই যখন এক বৎসরের মধ্যে আপনাদের কাজে পাকা হইল, তখন আবার তাহারা ভোল্ ফিরাইয়া হিন্দু হইবার উদ্যোগ করিল। ঈশানের ইচ্ছা ছিল, বিশুদ্ধানন্দকে ডাকিয়া শুদ্ধির হুজুগ করিবে, কিন্তু কেদার বুঝাইল যে শুদ্ধির চেয়ে বুদ্ধির জোর অধিক। একালের হিন্দু-সমাজে পুরুষদের কোন লীলা-খেলায় যে কিছু বাধে না, তাহা তাহারা গোড়াগুড়িই জানিত, আর জানিত বলিয়াই চাকুরি পাইবার ফিকিরে কল্‌মা পড়িয়াছিল। রমণকৃষ্ণের উপদেশে তিনজনেই এফিডেবিট দাখিল করিয়া আপনাদের আগেকার নাম ও ধর্ম্ম ফিরাইয়া নিল।

এই কাণ্ড দেখিয়া আঞ্জুমান্-উল্-জাহান্ বেইমানদিগকে চাকুরি হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তখন সরকারের কাছে তাহাদের চাকুরি হইয়াছিল Factum valet, আর তাহা ছাড়া ধর্ম্মের অদল বদলে চাকুরি যাইবার কোন বিধান নাই। ধর্ম্মের খেলায় পোয়াবার চালাইয়া তিনজনই কিছুদিনের জন্য বড় বড় টিকি রাখিয়াছিল ও এক বৎসর ব্রাহ্মণ সভার কল্যাণে দু-দশ টাকা চাঁদা দিয়াছিল।

গোলে পড়িলেন আঞ্জুমান্-উল্-জাহান্। একালের হিন্দুদের কিছুতেই জাত যায় না; এঅবস্থায় বেইমান ফেরেববাজদের চালাকি এড়াইয়া কিরূপে বিশ্বাসীদের পবিত্র শতকরা পঞ্চান্ন বজায় রাখা যায়, তাহাই হইল চিন্তা ও আন্দোলনের বিষয়। এমন নিয়ম করা চলেনা যে যাহারা গোড়ায় উৎপত্তিতে হিন্দু ছিল তাহারা মুসলমানের অধিকার পাইবে না, কারণ তাহা হইলে আপনাদের সম্প্রদায়রূপ কম্বলখানা টেকান যায় না।

এবিষয়ে হিন্দু সমাজেও একটা তর্ক উঠিয়াছিল। সকলেই স্বীকার করিল, কোনরূপ খাদ্য-অখাদ্য খাইলেও নীলকণ্ঠ মহাদেবের পূজকদের ক্ষতি হয় না, অথবা টুপির মাথাটা

পশ্চিম অঞ্চলের মেটে ঘরের ছাতের মত না রাখিয়া হিন্দু মন্দিরের চূড়ার মত উঁচু করিলে কিম্বা পায়জামা পরিলে বা উল্টা দিক দিয়া জামার বোতাম আঁটিলে জাত যায় না, কিন্তু কেদার প্রভৃতি যদি মুসলমানী বিবাহ করিত তবে জাত যাইত কিনা। এ তর্ক শুনিয়া রমণকৃষ্ণ সকলকে তালাকের আইন পড়িয়া শুনাইল। দেখা গেল, একালের হিন্দু সমাজে দুর্ব্বৃত্তদের দমন করা চলে না।

অগ্রহায়ণে

আগামী ব্যবস্থাপক সভা- ভোটের উৎসব শেষ হইয়াছে; আগামী ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে যাঁহারা সদস্য হইবেন তাঁহাদের নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। ভোটের নির্ব্বাচন ইউরোপীয় পদ্ধতি; ইউরোপের উন্নততম দেশেও বলা চলে না যে, যাঁহারা জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, অভিজ্ঞতায় প্রবীণ ও প্রয়োজনের কাজ চালাইতে দক্ষ ও চতুর, কেবল তাঁহারাই জনসাধারণের ভোটে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। যদি কোন কোন স্থলে উপযুক্ত ব্যক্তিরা ভোটের আসরে পরাজিত হইয়া থাকেন তবে তাঁহাদের ক্ষুণ্ন হইবার কোন কারণ নাই। অপেক্ষাকৃত উপযোগিতা বা অনুপযোগিতার বিচার ছাড়িয়া দিয়া মনে করিতে পারি, যাঁহারা সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার জন্য উদ্যোগী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই চালিত হইয়াছিলেন হিতৈষণার বুদ্ধিতে—দেশসেবার সঙ্কল্পে, নিজের নিজের পদ-গৌরব বাড়াইবার জন্য নয়। অন্যদিকে যাঁহারা জয়ী হইয়াছেন নিশ্চয়ই তাঁহারা উল্লাসের উৎসব ভুলিয়া আপনাদের দায়িত্বের দিকে দৃষ্টি দিবেন। এই দায়িত্ব-জ্ঞানের সঙ্গে ১৯২৯ এর পাকা ফলের সহিত কোন সম্পর্ক নাই; ব্রিটিশ্ দাতারা আমাদের কর্ম্ম-পদ্ধতিতে অসন্তুষ্ট হইয়া হাতের মুঠা বন্ধ রাখিবেন কি না তাহা তিল মাত্র না ভাবিয়া সুবিবেচিত কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে হইবে।

এদেশ হইতে যাঁহারা বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারা অন্য প্রদেশের কৃতীদের আসরে বাঙ্গলার গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন কি না অনেকে সে কথা ভাবিতেছেন। বিজ্ঞতায়, কর্ম্মদক্ষতায় ও বাগ্মিতায় কেহ আর এখন বঙ্গের প্রাচীন খ্যাতি ও গৌরব রক্ষা করিতে পারিতেছেন কি না,—বঙ্গের কোন রাজনীতিজ্ঞ আর আগেকার মত ভারতের নেতৃত্বে বৃত হইতে পারেন কি না, তাহাতে অনেকের সন্দেহ জন্মিয়াছে। বঙ্গদেশ এখন যদি যথার্থই কিছু হঠিয়া গিয়া থাকে তবে আমরা কেবল বিলাপ করিয়া বঙ্গকে জয়ী করিতে পারিব না। যাহা হউক কয়েক বৎসরের ব্যবস্থাপক সভার বিবরণী পড়িয়া একটি বিষয়ে যাহা মনে হইয়াছে তাহা বলিতেছি। দেশসেবার জন্য যাঁহাদের অকৃত্রিম অনুরাগ আছে ও যাঁহাদের হিতৈষণাব্রত নিঃস্বার্থ, এমন কয়েকজন তরুণ বয়স্ক সদস্যের অনেক উক্তি পড়িয়া স্পষ্ট ধারণা হয় যে তাঁহাদের উক্তিগুলি ক্রোধের উত্তেজনায় চঞ্চল। সাধারণ লোকের পক্ষে উত্যক্ত হওয়া ও অধীর হওয়া স্বাভাবিক, সদস্যদের পক্ষে সেখানে ধীরতা ও স্থিরপ্রাণতা হারাইলে চলে না। উত্তেজিত মস্তিষ্ক সুবুদ্ধির জনক নয়, আর প্রসন্নতা হারাইয়া কথা কহিলে অতি সারগর্ভ বাণীও অন্যের মন আকর্ষণ করিতে পারে না। ভারতের নেতৃত্বে বঙ্গদেশের এখন দাবি না থাকিতে পারে, রাজনীতির ক্ষেত্রে এখন তাহার শ্রেষ্ঠত্ব না থাকিতে পারে, কিন্তু সে যেন কর্ত্তব্য পালনের সময় ধীরতা ও প্রসন্নতা না হারায়।

এবারকার নির্ব্বাচনে প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্বরাজ্য-নামাঙ্কিত দলটি এদেশে সর্ব্বাধিক লোকপ্রিয়। এই দল হইতে নির্ব্বাচিত সদস্যেরা কংগ্রেসের নির্দ্ধারিত বিধান অনুসরণ করিয়া কাজ করিবেন; কাজেই ইঁহাদের পন্থা ও পদ্ধতি প্রায় সুনির্দ্দিষ্ট বলিলে চলে। আশা করি আগামী গৌহাটির কংগ্রেসে ধীরভাবে সকল প্রয়োজনের পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইবে।

* * * *

ইউরোপে যুদ্ধের আশঙ্কা—১৯১৪ অব্দে যে মহাসমর বাধিয়াছিল, তাহা কি জার্ম্মানদের অদম্য ক্ষমতা-পিপাসার ফলে, না, সারা ইউরোপের কোন অবস্থাবিশেষের ফলে,—ইহা এখন পর্য্যন্ত কেহ ভাল করিয়া বুঝান নাই; হয়ত ঠিক কারণটি বুঝিতে ও বুঝাইতে বিলম্ব আছে। মহাসমর থামিবার পর তুর্কিরা মাথা তুলিয়াছে, অষ্ট্রিয়া ক্ষীণবল হইয়া মাথা নোয়াইয়াছে, ইতালির প্রভাব বাড়িয়াছে, দক্ষিণ আয়র্লণ্ড স্বাতন্ত্র্য পাইয়াছে, আর রুসদের দেশে ঘটিয়াছে প্রবল বিপ্লব। ইউরোপে এখন রুসদেশের বিপ্লব হইয়াছে সকল সমস্যার বড় সমস্যা, রুসের রাষ্ট্রনীতি কি, ও তাহার বিপ্লবের গতি কোন দিকে, তাহার এমন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই, যাহাতে অসোঙ্কচে সে বিপ্লবের ও রাষ্ট্রনীতির পূর্ণ সমালোচনা করা চলে।

দেশে রাজা থাকিবে না, ধনীর প্রভাব থাকিবে না, কোন ধর্ম্মমতের আদর ও প্রভাব থাকিবে না, ও প্রাচীনকালের সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি আমূল উপ্‌ড়াইয়া ফেলিতে হইবে, এইগুলি হইল মোটামুটি রুসের নূতন বিপ্লবের কয়েকটা প্রধান মূলমন্ত্র। রুসদেশের ক্ষমতায় বলিষ্ঠ বিপ্লবপন্থীদের একটি পদ্ধতি নানা বিবরণে কতকটা সুস্পষ্ট; বিপ্লবকারীরা তর্কে ও উপদেশে অন্যের মন ভুলাইতে বা অন্যকে বশে আনিতে চেষ্টা করেন না,—তাঁহারা অস্ত্রের আঘাতে ভিন্ন বুদ্ধির লোকদিগকে নিজেদের মত স্বীকার করান, আর স্বীকার করাইতে না পারিলে তাহাদিগকে শিকার করেন। পরবাদ না সহিয়া পরকে জোর করিয়া দাবাইয়া রাখার পদ্ধতিটি একালে এদেশেও একটু দেখা দিয়াছে; রাজনীতির ক্ষেত্রে এই আত্মবুদ্ধির ঝাঁকেও ক্রোধের অধীরতা, খানিকটা রুসদেশের আচরণের অনুকরণে ঘটিয়াছে মনে হয়। সে যাহাই হউক, রাজা কাটিয়া ও রাজসিংহাসন ভাঙ্গিয়া বল্‌শেভিকেরা যে শাসন চালাইয়াছেন তাহাতে নাকি লোক-পীড়ন এত বাড়িয়াছে যে রাজা থাকার আমলে তাহার সিকি ভাগও ছিল না।

বল্‌শেভিকেরা যদি কেবল তাঁহাদের নিজেদের দেশে ইচ্ছামত নিজেদের পাঁটা যেমন করিয়া খুসি কাটিতেন, তাহাতে হয়ত ইউরোপের অন্য দেশের লোকেরা উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত হইতে না পারিতেন; কিন্তু বল্‌শেভিকেরা এই পদ্ধতি ধরিয়াছেন যে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে তাঁহাদের মনের মত করিয়া প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ নীতি দূর করিবেন। বল্‌শেভিকদের এই পরহিতৈষণা ইউরোপে বড় বাধিয়াছে। ইউরোপের ও এসিয়ার নানাদেশে বল্‌শেভিকেরা গুপ্তচর পাঠাইয়া ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পৃথিবীর মুক্তির জন্য বিপ্লবের বীজ ছড়াইতেছিলেন, কিন্তু এখন নাকি এই কাজ যথাসাধ্য গায়ের বলে চালাইবার উদ্যোগে রুসদেশে বিপুল সামরিক আয়োজন হইতেছে। হইতে পারে যে রুসের বাহিরের ইউরোপীয়েরা বল্‌শেভিকি নীতিতে বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া চট্ করিয়া একদিন রুসকে দমাইতে চেষ্টা করিতে পারেন মনে করিয়াই ঐরূপ যুদ্ধের উদ্যোগ হইতেছে। একথা কিন্তু সত্য যে ইউরোপে লীগের পুষ্টি যতই অধিক হইতেছে, ততই বল্‌শেভিকেরা উত্যক্ত হইয়া উঠিতেছেন; জার্ম্মাণেরা এখন লীগে জুটিলেন, আর হয়ত লীগের এই পুষ্ট বল নানাদিক দিয়া বল্‌শেভিকদের প্রভাব ধ্বংস করিতে উদ্যোগী

হইবে। যে পক্ষের বিরক্তি ও আতঙ্কের ফলেই হউক না কেন একটা ভীষণ যুদ্ধ না হইলে যে ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হইতে পারেনা, ইউরোপের অনেকের মনেই এই ধারণা বাড়িতেছে।

* * * *

উকিল বেরিষ্টারের নূতন সুবিধা—কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে খাঁটি এদেশীয় উকিল বেরিষ্টারদের মধ্য হইতে দুইজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে ডিষ্ট্রিক্ট্-সেসন্স্ জজের পদে নিযুক্ত করা হইবে। এই বড় চাকুরি মুখ্যভাবে পাইয়া আসিতেছেন ও পাইবার কথা সিবিল সর্বিসের লোকেদের, তবে ঐ পদের কয়েকটি চাকুরি সব্ জজ ও ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট্-দিগকে উপযোগিতার বিচারে দেওয়া হইয়া থাকে। বিলাতে স্বাধীন আইন-ব্যবসায়ীরাই বিচার বিভাগের সকল হাকিমি পদ পাইয়া থাকেন, কিন্তু এদেশে মুন্সেফ নিয়োগ ছাড়া এনিয়মে কখন কাজ করা হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের নূতন বিজ্ঞাপন পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি; মনে হয় যেন ধীরে ধীরে এদেশে বিলাতি নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট যদি নিয়োগের সময়ে কোন সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দিকে না তাকান ও খাতির এড়াইয়া যথার্থ উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করেন, তবে যাঁহারা আইনে অভিজ্ঞ ও দেশের অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত সেইরূপ দক্ষ লোককেই ডিষ্ট্রিক্টের জজিয়তির জন্য পাইবেন। আমরা বলি না, বলিতেও পারিনা যে, সিবিল সর্বিসের লোকেরা ও প্রাদেশিক সার্বিসের লোকেরা এ চাকুরি পাইবেন না বা পাইবার অনুপযোগী; তবে যদি ধীরে, ধীরে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা একেবারে তুলিয়া দেওয়া হয় ও অভিজ্ঞ উকিল বেরিষ্টারদিগকে হাকিমি কাজে নিযুক্ত করা যায় তাহা হইলে বিচার বিভাগে যথার্থ উন্নতি হইতে পারে।

* * * *

দেশের গৌরব—স্যার্ জগদীশচন্দ্র যে পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একজন, আমাদের এরূপ ধারণায় পক্ষপাত থাকিতে পারে, কিন্তু বিদেশীয়েরা নিঃস্বার্থভাবে একথা বলিলে আমরা নিজেদের বিশ্বাসে সন্দিহান থাকিতে পারি না। সুইট্জর্লণ্ড বিজ্ঞানচর্চ্চার অতি প্রধান স্থান; সেদেশের জেনেবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত বিলাতের ষ্টেট্ সেক্রেটারিকে জানাইয়াছেন যে, জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জগতে একজন প্রধান ব্যক্তি ও তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া মনে হয় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-চর্চ্চা চলিয়াছে। এইজন্য তাঁহাদের অনুরোধ যে, ভারতকে দূরে না রাখিয়া যেন ইউরোপীয় বিজ্ঞান-সঙ্ঘের সঙ্গে যোগ করা হয় ও যাহাতে বিলাতের ও ভারতের মধ্যে জ্ঞানের চর্চ্চায় সহকারিতা ও সহযোগিতা চলে, তাহার ব্যবস্থা করা হয়। এ সংবাদে আমরা উৎফুল্ল হইয়া স্যর্ জগদীশ-চন্দ্রের দীর্ঘজীবন ও অধিকতর উন্নতি কামনা করিতেছি।

অন্যদিকে কবি রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের সকল দেশেই আদরে অভ্যর্থিত ও সম্মানিত হইতেছেন। ইউরোপের সকল স্থানের পণ্ডিতেরা যাহাতে এদেশের পণ্ডিতদের সঙ্গে সহযোগে কাজ করেন ও বিশ্বের পণ্ডিত সমাজের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়, তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রভৃত চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। যাঁহারা তাঁহাদের কৃতিত্বে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন তাঁহাদের গৌরবে ও সম্মানে আমরা গৌরবান্বিত ও সম্মানিত। রবীন্দ্রনাথ কৃতকার্য্য হউন ও দীর্ঘজীবী হউন।

Editor : Bejoychndra Majumdar.

Printed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.

Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani Office, 77 Russa road North, Bhawanipur Calcutta.

বঙ্গবাণী
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

কলেজষ্ট্রীট মার্কেট

মহিলাদিগের বসিবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে

আওরঙ্গজেবের দরবারে পারসিক দূত

শ্রীহরিহর শেঠ ও শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দে
মহাশয়দ্বয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

"আবার তোরা মানুষ হ'

৫ম বর্ষ
১৩৩২-'৩৩

পৌষ

দ্বিতীয়ার্দ্ধ
৫ম সংখ্যা

ছন্দের কথা

স্বর-ব্যঞ্জনের ঝঙ্কারময় তরঙ্গিত সমবায়ে ও তাহাদের কারুশৃঙ্খলাময় সন্নিবেশে কাব্যের ছন্দের জন্ম। ছন্দ মানবভাষার সাধারণ সম্পত্তি,—বিশ্বসরস্বতীর বীণায় ছন্দগুলি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে—তাই ভাষামাত্রকেই একই ছন্দে বাঁধা যায়। সে জন্য ছন্দঃশিল্পী এক ভাষায় প্রচলিত ছন্দকে সহজেই অন্য ভাষায় দেহান্তরিত করিতে পারেন। ভাষায় ভাষায় স্বর-ব্যঞ্জনে বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও উচ্চারণভঙ্গি, অক্ষরসমবায়,—শব্দের ধ্বনি ইত্যাদিতে প্রভেদ আছে,—সেজন্য প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ছন্দ সার্ব্বভৌম ও সার্ব্বজনীন হইলেও, যে ভাষাকে অবলম্বন করে, সেই ভাষার বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব উচ্চারণভঙ্গি এবং তদুপযোগী গতি যতি স্পন্দনলীলা ইত্যাদি লাভ করে। তখন ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ভূষণে একই ছন্দ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। যে কর্ণের সূক্ষ্ম স্বর-পার্থক্য জ্ঞান নাই, সে কর্ণ তখন তাহাকে একই ছন্দ বলিয়া ধরিতে পারে না।

বাংলাভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা হইতে জন্মিয়াছে। বাংলাভাষা আজ তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিলেও সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ঋণ তাহার সর্ব্বাঙ্গে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার বহু ধর্ম্মই বাংলা ভাষায় রূপান্তরে থাকিয়া গিয়াছে—তন্মধ্যে ছন্দ একটি।

সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অনেক ছন্দ বাংলাভাষায় এমন রূপান্তরিত হইয়াছে এবং বাংলা ভাষার পক্ষে এমন সহজ স্বাভাবিক ও উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাদিগকে সংস্কৃতজ বলিয়া চিনা যায় না—বাংলারই নিজস্ব বলিয়া মনে হয়।

যে সকল ছন্দ বাংলাভাষায় রূপান্তরিত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে, কবিগণ সেই সকলগুলি লইয়াই সন্তুষ্ট নহেন। তাই যুগে যুগে কবিগণের নবনব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধি সংস্কৃতের নিজস্ব ছন্দগুলিকে অবিকৃত ভাবেই বাংলায় প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন - এবং এই চেষ্টার ফলেই আবার ক্রমবিবর্ত্তনে নূতন নূতন সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় রূপান্তরিত হইয়াছে। বংলাকাব্যে অবিকল সংস্কৃত ছন্দোরচনা একপ্রকার শব্দশিল্প মাত্র উহা কাব্য-দেবতার কারুকার্য্যময় অচল মন্দিরস্বরূপ—সচল রথ হইয়া উঠে নাই। সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় না চলার একটি প্রধান কারণ—সংস্কৃতে যে স্বরের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের প্রভেদ আছে তাহা বাংলায় নাই। সংস্কৃত ছন্দে স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ ভেদে কোথাও স্বরিত—কোথাও ত্বরিত, কোথাও বিলম্বিত, কোথাও বিসর্পিত। মৈথিলী ভাষায় ঐ নিয়ম থাকায় কোন কোন সংস্কৃত ছন্দ মৈথিলীতে বেশ চলিয়াছে। বাংলা কাব্য তাই স্বরমাত্রিক না হইয়া অক্ষর মাত্রিক হইয়া উঠিল—নির্দ্দিষ্টসংখ্যক অক্ষর—স্বরান্ত হোক্ হসন্ত হোক যুক্তাক্ষর হোক, প্রত্যেক পংক্তিতে থাকিলেই হইল। ইহাই সাধারণ নিয়ম। দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ দৈর্ঘ্যের মর্য্যাদা কোথাও যে দেওয়া হইত না তাহাও নয়—কিন্তু সে কেবল তাহাকে দুইমাত্রা ধরিবার জন্য। যেমন—

কাল চিকুর শোভে মাথার উপরে কাল ভুরুহী শোভে বদন কমলে।

(চণ্ডীদাস)

এখানে 'কাল' শব্দের 'আ' দুইমাত্রা।

চকোর অলি করত কেলি অমিয়া মধুতে মাতিয়া।
রমনীমণি লাজে অমনি নিরখে বদন ঝাঁপিয়া।

(জগদানন্দ)

এখানে—'কো'—'কে' 'নী' ও 'লা'তে দীর্ঘস্বরের জন্য দুইমাত্রা ধরা হইয়াছে।

এক হাতে শোভে ফণী ভূষণ একহাতে শোভে মণিকঙ্কণ
আধমুখে ভাঙ ধুতুরা আধই তাম্বুল পূরিবে।

(ভারত চন্দ্র)

এখানে 'আধ মুখে' শব্দের 'আ' 'খে' ও ভূষণের 'ভূ', 'ভাঙ'এর 'ভা' এই অক্ষরগুলির দীর্ঘস্বরকে দুইমাত্রা ধরা হইয়াছে।

কিন্তু 'স্বপ্নপ্রয়াণের' কবি কেবল মাত্রাবৃদ্ধির জন্য নয়, ছন্দোহিল্লোলসৃষ্টির জন্যই দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ চাহিয়াছেন।

বৃক্ষগণ | হেলিত সু | শীতল স | মীরণে,
পুষ্প যত | প্রস্ফুটিত | পুষ্পময় | কাননে।
স্বপ্নকবি | কাহিনি লু | কায় মুখ | আবরি,
জাগিল বি | হঙ্গকুল | ভাগিল বি | ভাবরী।

বর্ত্তমানকালের কবিদের কোনো কোনো রচনাতে দীর্ঘস্বরকে দুইমাত্রার কাজ করিতে দেখা যায়, কিন্তু তাহার প্রত্যেকটিই গান। গানে যত ব্যঞ্জনবাহুল্য না থাকে—গায়কের পক্ষে ততই সুবিধা। সেজন্য গায়ন-কবিগণ অযথা ব্যঞ্জনবৃদ্ধি না করিয়া অনেক স্থলে স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা* —

১। শেফালিবনের মনের কামনা।

২। বসন্ত জাগ্রত দ্বারে,
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কর'না বিড়ম্বিত তারে।

৩। হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে,
নাচে ছন্দ ভালমন্দ তালে তালে।
—রবিবাবু

৪। স্নেহবিহ্বল করুণা ছলছল
শিয়রে জাগে কার আঁখিরে।

৫। শ্যাম সুরণী সুরসা
ঊর্দ্ধে চাহ অগণিত মণি রঞ্জিত নভোনীলাঞ্চলা ইত্যাদি
(রজনীকান্ত)
আমার কুটীর রাণী সে যে গো আমার হৃদয় রাণী।
(দ্বিজেন্দ্রলাল)

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে বাংলা সঙ্গীতে দীর্ঘ উচ্চারণের জন্য দীর্ঘস্বর যোজনার উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যায়। আজকাল ক্বচিৎ কোথাও দেখা যায়—তাও অধিকাংশ স্থলে পদের শেষাক্ষরে অথবা তাহার অব্যবহিতপূর্ব্বের অক্ষরে।

বহুদিন পরে, রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিলেন—বাংলায় আ, ঈ, ঊ, এ, ও, এই পাঁচটি দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ করা হয় না, কিন্তু ঐকার ও ঔকারের উচ্চারণ দীর্ঘই আছে—ঐ—অ+ই, ঔ=অ+উ বা ও+ই এ দুটীর হ্রস্ব উচ্চারণ সম্ভব নয়। ঋকারও অনেক স্থলে দুই মাত্রার মত উচ্চারিত।

(১) শ্যামল তৃণের মসৃণ অঙ্গে শিশির গড়ায়ে পড়ে।
(২) পিতৃগণ লভি তর্পণবারি তৃপ্ত অমৃত লোকে।

এখানে 'তৃণ' 'তৃপ্ত' ও 'অমৃত' শব্দের ঋকার হ্রস্ব বটে কিন্তু 'মসৃণ' ও 'পিতৃগণে' ঋকার বাংলায় দুই মাত্রা। হেমচন্দ্র অমৃতের ঋকারকেও দুই মাত্রা ঠিক করিয়া লিখিয়াছিলেন—

জলনিধি মন্থনে অমৃত উছলিল যত সুর বাঁধিল তাহে।

এখানে অমৃত উচ্চারণে 'অম্রিত'। শব্দের প্রথমে যুক্তাক্ষরের জন্য হ্রস্ব উচ্চারণ চলে—কিন্তু শব্দের অন্ত্য ও মধ্যবর্ত্তী যুক্তাক্ষর. এবং ও ঃ এর জন্য দীর্ঘ উচ্চারণ অপরিহার্য্য। পূর্ব্বে বাংলা কবিতায়, হ্রস্ব স্বর, দীর্ঘ স্বর, ং—ঃ—যুক্তব্যঞ্জন ও যুক্তাক্ষর সমস্তই এক একমাত্রারূপে ব্যবহৃত হইত এবং

* এগুলি পড়িতে যাইলে কোন' কোন' দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে হইবে।

কবিতার পদ নির্দ্দিষ্টসংখ্যক অক্ষরের 'অনুযতি' সন্নিবেশে নিষ্পন্ন হইত। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ ঐ গুলিকে ক্বচিৎ কখনো দুই মাত্রাস্থানীয় বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

১। কাল আঁখরে তীন ভুবন বিচার। কাল মেঘের জলে জীএ সংসার। (চণ্ডীদাস)

২। "সমুচিত ঔষধে না রহে বেয়াধি।"

৩। ধনপতি ভায়া যাও গৌড় নগরে।

৪। তোমার প্রসাদে করি মন্ত্র স্মরণে।

এখানে 'কাল' 'সংসারে' 'ঔষধে' 'গৌড়' ও 'মন্ত্র' এই শব্দগুলিতে একমাত্রা করিয়া বেশী ধরা হইয়াছে, কিন্তু ইহাকে পরবর্ত্তী কবিগণ দুর্ব্বলতা মনে করিয়া একেবারেই বর্জ্জন করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র ত, রীতিমত সাবধানই হইয়াছেন—যত যুক্তাক্ষরই থাক্ অক্ষর সংখ্যা সমান রাখিবার দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল। যে ছন্দে যুক্তাক্ষরের জন্য একমাত্রা ধরিলে রীতিমত শ্রুতিকটু হয়—সেই ছন্দের কবিতা হইতেই উদাহরণ দিই—

আনন্দে ত্রিনয়ন সহিত দেবগণ
পূজেন নানা আয়োজনে।
সুধন্য চৈত্রমাস অষ্টমী সুপ্রকাশ
বিপদে পক্ষ শুভক্ষণে।

পরেই আছে—

বিবিধ উপচার অশেষ উপহার
অনেকবিধ বলিদান। ইত্যাদি।

সুধন্য চৈত্রমাস ইত্যাদি লালিত্যে ও মাধুর্য্যে অন্যান্য পংক্তির সহিত না মিলিলেও কবি আক্ষরিক নিয়ম রাখিতে যেন বাধ্য। ভারতচন্দ্রের পর হইতে বাংলা কবিতায় অক্ষর সংখ্যা ঠিক রাখার প্রথা বিধিবদ্ধ ও সুদৃঢ় হইল। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত যুক্তাক্ষরাদির জন্য দুই মাত্রা ধরা কবির দুর্ব্বলতার চিহ্নস্বরূপ ছিল। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিলেন—আ-ঈ-উ-এ-ও এইস্বর গুলি বাংলাভাষায় দীর্ঘ উচ্চারিত হয়না বটে কিন্তু ঐ, ঔ, ং, ঃ ও যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর উচ্চারণের দীর্ঘতা রক্ষা করিয়াছে—সেজন্য তিনি—ঐ সকল ক্ষেত্রে দুইমাত্রা ধরিতে আরম্ভ করিলেন, পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদীর ও উভয়ের মিলনপ্রসূত ছন্দে পূর্ব্বনিয়মই থাকিল—কিন্তু ষান্মাত্রিক পাঞ্চমাত্রিক সাপ্তমাত্রিক ইত্যাদি ছন্দে নূতন নিয়ম প্রচলন করিলেন। পৃথক প্রবন্ধে এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। ছন্দে এইরূপ মাত্রিক পরিবর্ত্তনের ফলে বাংলার ছন্দের রূপ পরিবর্ত্তিত হইল এবং বাংলা কাব্যে যে ছন্দোহিল্লোলের অভাব ছিল তাহারও কতকটা পূরণ হইল। এ নিয়ম ছন্দঃস্পন্দ-সৃষ্টির অনুকূল হওয়ায় বাংলাভাষায় কোন কোন সংস্কৃত ছন্দের প্রচলন সম্ভব হইয়া উঠিল। কিন্তু সংস্কৃতছন্দ চলিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট নয় সংস্কৃতছন্দে দীর্ঘ হ্রস্ব উচ্চারণের ভেদ ত আছেই, তা ছাড়া অক্ষরে অক্ষরে ছন্দো বিধিনির্দ্দিষ্ট হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের

ধ্রুব সন্নিবেশ আছে। বাংলায় সেই সন্নিবেশের নিয়ম রক্ষা করিতে হইলে, হয়—যুক্তাক্ষর, অনুস্বার, বিসর্গ, ঐকার—ঔকারের বহুল প্রয়োগ করিতে হইবে, নয়—দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে হইবে। প্রথমটীতে ভাষা দুরূহ ও সংস্কৃতবহুল হইয়া পড়িবে, ২য়টিতে অস্বাভাবিক ও বিকৃত শুনাইবে। আর একটি অসুবিধা, –সংস্কৃতছন্দে শব্দের মধ্যেও যতি দেওয়া চলে, মৈথিলী বা ব্রজবুলিতেও শব্দের মধ্যেও যতি চলিয়াছে। বাংলা কাব্য শব্দের মধ্যে যতি সহ্য করেনা, প্রাচীন পয়ারাদি ছন্দে যে শব্দের মধ্যে মধ্যে যতি দেখা যায়, তাহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ কবির দুর্ব্বলতাই মনে করিয়াছেন। মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দে শব্দের মধ্যে যতি চালাইয়াছেন—কিন্তু পরে তাহা চলে নাই—মাইকেলের পরবর্ত্তী কবিগণ যাঁহারা অমিত্রাক্ষর রচনা করিয়াছেন তাঁহারা যতদূর সম্ভব শব্দের মধ্যের যতি বা অর্দ্ধযতি ত্যাগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ শব্দের মধ্যে যেখানে যতি দিয়াছেন সেখানে অতি সন্তর্পণেই দিয়াছেন এবং অধিকাংশ স্থলে সঙ্গীতেই এ সাহস করিয়াছেন।—আর সাহস করিয়াছেন,—ছড়ার ছন্দে। ছড়ার ছন্দে শব্দের মধ্যে যতি দেওয়ায় বাধা নাই—বরং তাহাতে ছন্দের স্পন্দন বাড়িয়া যায়। সংস্কৃত ছন্দের পদে স্বরসংস্থানের কঠোর নিয়ম, সমাস ও সন্ধির ঘনসন্নিবিষ্ট গ্রন্থনের উপর নির্ভর করিয়া ক্রিয়াশীল। বাংলায় সমাস ও সন্ধির আদৌ বাহুল্য নাই, –বাংলা পদে শব্দাবলীর বিশ্লিষ্ট ভাবে থাকাই স্বাভাবিক সেজন্য সংশ্লিষ্ট শব্দাবলীর উপযোগী নিয়ম বিশ্লিষ্ট শব্দাবলীতে অকৃত্রিম হইয়া উঠেনা। ইহা ছাড়া সংস্কৃতের শব্দ গুলির অধিকাংশ স্বরান্ত, বাঙ্গালায় কিন্তু হসন্তান্ত,—শব্দের উচ্চারণের এই ভেদও সত্যেন্দ্রনাথের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সংস্কৃত ছন্দ প্রচলনে বাধাস্বরূপই ছিল

নানাপ্রকার অসুবিধা সত্বেও অনেক সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় চলিয়াছে—প্রাকৃতভাষা বাংলা-ভাষার অনেকটা কাছাকাছি,—প্রাকৃত ভাষার অনেক ধর্ম্ম বাংলায় বর্ত্তমান আছে—সেজন্য প্রাকৃতের ছন্দ বাংলায় আরো বেশী চলিয়াছে। উভয় ভাষার কোন্ কোন্ ছন্দ বাংলায় চলিয়াছে আমার আরব্ধ প্রবন্ধাবলীতে তাহাই দেখাইব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি অক্ষরে অক্ষরে স্বরসন্নিবেশের কঠোর নিয়মের জন্য সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় চলে না। কিন্তু একপ্রকার ছন্দ আছে যাহাকে বলে মাত্রাসমক—এ ছন্দে অক্ষরে অক্ষরে দীর্ঘ বা হ্রস্বস্বরের সংস্থান ধ্রুব নির্দ্দিষ্ট নহে। প্রত্যেক দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রা ধরিয়া, প্রত্যেক পংক্তিতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রা থাকিলেই চলিবে। এই মাত্রাসমক শ্রেণীর মধ্যে পড়ে বানবাসিকা, বিশ্লোক, চিত্রা, পাদাকুলক, পজ্ঝটিকা ইত্যাদি ছন্দ। এগুলি বাংলায় চলিতে পারে। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়-কথার ছন্দের ৪ পংক্তিকে দুই ভাগ করিলে প্রত্যেক অংশে সাকল্যে ৩৮টি করিয়া মাত্রা পড়ে। ভাগবতের—"পাদৈর্নং শোচসি মৈকপাদং" ইত্যাদি শ্লোকে প্রত্যেক পদযুগলে মিলাইয়া আছে ৩৬ মাত্রা। এদুটী ছন্দে স্বর সন্নিবেশের ধ্রুব নির্দ্দেশ নাই। কিন্তু এ দুটি চলেনা,—কারণ এদুটীতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক

মাত্রায় গঠিত পর্ব্ববিভাগ নাই এবং যতির বিরতি সম্বন্ধেও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। কিন্তু গাথা /শ্রেণীয় জয়দেব প্রবর্ত্তিত ১৫। ১৭। ২৪। ২৭। ২৮।·২৯। মাত্রার ছন্দগুলিতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক মাত্রায় গঠিত পর্ব্ববিভাগ আছে। এগুলি বাংলায় বেশ চলিয়াছে। আর একপ্রকারের সংস্কৃত ছন্দ আছে-তাহাকে গীত্যার্য্যাশ্রেণীয় বলে, ইহাতে হ্রস্বমাত্রারই সংখ্যা বেশী। গৌরী, প্রহরণ কলিতা, চন্দ্রাবর্ত্তা, মাল্গা ও মণিগুণনিকর ইত্যাদি ছন্দে ২। ১টী ব্যতীত সমস্ত মাত্রাই হ্রস্ব। এই ছন্দ গুলির বাংলায় চলা সহজ—কারণ বাংলায় দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ না থাকায় প্রায় সবই হ্রস্ব স্বর,—দীর্ঘ স্বরের কোন বাধা এছন্দগুলিতে নাই। এছন্দগুলি কি-রূপে বাংলায় কি ভাবে আসিয়াছে সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা হইবে।

স্বর-সংস্থানে স্বাধীনতা থাকায়, পর্ব্বে পর্ব্বে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক মাত্রার ব্যবস্থা থাকায় ও দীর্ঘস্বর দুইটী হ্রস্বের সমান হওয়ায় জয়দেবের ছন্দ গুলি অবিকৃত, ও ঈষৎ বিকৃত হইয়া বাংলায় কিরূপে চলিয়াছে তাহাই প্রথমে দেখাইব। প্রথমতঃ, ২৮ মাত্রায় ছন্দটি ধরা যাক। জয়দেবের—

ললিত লবঙ্গ ল। তা পরিশীলন। কোমল মলয় স। মীরে,
মধুকর নিকর ক। রম্বিত কোকিল। কূজিত কুঞ্জ কু। টীরে।

১মপংক্তির *১মপর্ব্বের 'ব' এ একটি দীর্ঘস্বর, ২য় পর্ব্বে ২টী।* তৃতীয় পর্ব্বে ১টী। ২য় পংক্তির ১মপর্ব্বে দীর্ঘস্বর নাই। ২য় পদকে ২টী, ৩য় পদকে ২টি। স্বর সংস্থানের কোন ধ্রুব নিয়ম নাই—মোটের উপর প্রত্যেক পর্ব্বে ৮টি করিয়া মাত্রা এবং শেষ পর্ব্বে ৪টি। প্রত্যেক পংক্তিতে ২৮টি করিয়া মাত্রা।

প্রাকৃতের ভরহট্টা ছন্দ ও জয়দেবের এ-ছন্দ একই।

জস্থ—মিত্তধনেসা। সুস্থর গিরীসা। তহবিহু পীধন। দীস।
জই—অমিঅহ কন্দা,। ণিঅরহি চন্দা। তহবিহু ভোঅন। বীস।
জই—কণঅ সুরঙ্গা। গৌরি অদ্ধঙ্গা। তহবিহু ডাকিনি। সঙ্গ।
জো—জসহি দিআবা। দৈবসহাবা। কবহু ন হো তস্থ। ভঙ্গ।

উপরের ৪ পংক্তিতে পর্ব্বের বাহিরে দুই মাত্রা করিয়া রাখা হইয়াছে এবং প্রত্যেক পংক্তিতে ১ম দুই পর্ব্বে মিল আছে—জয়দেবের "ললিতলবঙ্গলতা" ইত্যাদির সঙ্গে অন্য কোন বৈষম্য নাই। পর্ব্বে পর্ব্বে মিল জয়দেবেরো আছে—

মুখর মধীরং। ত্যজ মঞ্জীরং। রিপুমিব কেলিষু। লোলং
চল সখি কুঞ্জং। সতিমির পুঞ্জং। শীলয় নীল নি। চোলং।

তুলসীদাসে—এই ছন্দ,—

সহস্র বাহু দশ। বদন আদি নৃপ। বচে ন কাল ব। লীতে।
হম হম করি ঘন। ধাম সঁবারে। অন্ত চলে উটি। রীতে।

সম্পূর্ণ অক্ষরে অক্ষরে জয়দেবের অনুসরণে হ্রস্বদীর্ঘের যথানির্দ্দিষ্ট উচ্চারণ রক্ষিত হইয়াছে। তুলসীদাস মাঝে মাঝে দীর্ঘস্বরকে হ্রস্বও ধরিয়াছেন। যথা-

বেদ বিদিত পা | বন কিয়ে তে সব | মহিমা নাথ তুম্ | হারী।

এই পংক্তি ২য় ও ৩য় পর্ব্বে দুইটী দীর্ঘস্বরকে হ্রস্ব উচ্চারণ করিতে হইবে। নানকও মাঝে মাঝে সুবিধামত ২।১টী দীর্ঘ স্বরকে হ্রস্ব ধরিয়াছেন যথা—

কাম ক্রোধ জেহি | পরসৈং নাহিন | তেহি ঘট ব্রহ্ম নি | বাসা।

'তেহি' ও 'জেহি'র দীর্ঘস্বরকে হ্রস্ব উচ্চারণ করিতে হইবে। কবীরে

১। চলত ফিরত মে | পাঁব দুঃখিত ভয়ে | যহ দুঃখ কহাঁ স | মায়ে।
সাঁচে কে সঙ্গ | সাঁচ বসত হৈ | ঝুঠে মার হ | ঠায়ে।

২। তনরত করি মৈঁ | মন রত করি হৌঁ | পঞ্চতত্ত্ব তব | রাতী।
বানম মেরে | পাহুন আয়ে | মৈঁ জোবনমেঁ মাতী।

১ম দোঁহাটিতে দীর্ঘস্বরকে প্রয়োজনমত হ্রস্বও ধরিতে হইবে। ২য় দোঁহা সম্পূর্ণ হ্রস্বদীর্ঘের নিয়মানুসারী। কবীরের এই ছন্দের অধিকাংশ পদই ২য় শ্রেণীর।

বিদ্যাপতিতে এই ছন্দ —

আজু রজনি হাম | ভাগে পোহায়নু | দেখনু পিয়া মুখ | চন্দা,
জীবন যৌবন | সফল করি মাননু | দশদিশ ভেল নির | দন্দা।

১ম পর্ব্বের 'আ', ২য় পর্ব্বের 'ভা' ও 'হা', ৩য় পর্ব্বের 'পে' ৫ম পর্ব্বের 'জী' ও 'যৌ', ৬ষ্ঠ পর্ব্বের 'মা' এইগুলিকে দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে হইবে—বাকী দীর্ঘস্বরের হ্রস্ব উচ্চারণ ব্যবস্থা। হিসাবে প্রতি পর্ব্বে ৮ মাত্রা এবং প্রতি পংক্তিতে ২৮ মাত্রা।

পাঁচ বাণ অব | লাখ বাণ হউ | মলয় পবন বহু | মন্দা।

এই পংক্তির প্রত্যেক দীর্ঘস্বরকে দীর্ঘ উচ্চারণ করিলে সম্পূর্ণ সংস্কৃতের নিয়মই প্রতিপালন করা হইল। বিদ্যাপতি ঠাকুর প্রয়োজনমত দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ বা হ্রস্ব উচ্চারণ করিয়াছেন—আবার প্রয়োজনমত হ্রস্ব স্বরকেও কোন' কোন' স্থলে দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়াছেন।

বৌদ্ধ গান ও দোঁহাতে মাঝে মাঝে এই ছন্দের পংক্তি আছে, কোন' দোঁহাতেই আগাগোড়া সামঞ্জস্য দেখা যায় না—

মাআ মোহা | সমুদারে…… | অন্ত ন বুঝসি | যাহা
অগে নাবন | ভেলা দীস অ | ভন্তি ন পুচ্ছসি | নাহা।

১ম পংক্তির ২য় পদকে ২টী, ৩য় পদকে ১টী, ২য় পংক্তির ১ম পদকে ১টী মাত্রা অল্প আছে। ঠিক ২৮ মাত্রার পংক্তিও আছে যথা—

বাহতু ডোম্বী | বাহল ডোম্বী | বাটত ভইল উ | ছারা |

আবার ২।১টী দীর্ঘস্বরকে হ্রস্বও পড়িতে হইবে যেমন—

কিন্তো মন্তে | কিন্তে তন্তে | কিন্তো রে ঝাণ ব | খানে।

জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস জগদানন্দ ইত্যাদি বৈষ্ণবকবিগণ ব্রজভাষার পদে বিদ্যাপতিকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

অঞ্জনগঞ্জন | জগজনরঞ্জন | জলদপুঞ্জ জিনি | বরণা
তরুণারুণ থল | কমলদলারুণ | মঞ্জরী রঞ্জিত | চরণা। (গোবিন্দদাস)

প্রথম পংক্তিতে কেবল যুক্তাক্ষরের সাহায্যেই মাত্রা ঠিক রাখিয়াছেন। ২য় পংক্তিতে দীর্ঘস্বরের সাহায্য লইয়াছেন। প্রতি পংক্তির শেষ পদকে ২টী দীর্ঘস্বরের বদলে ১টীর প্রয়োগ করিয়া একটি হ্রস্বস্বরান্ত অক্ষর বাড়াইয়াছেন, তাহাতে ছন্দের ঈষৎ বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে। বিদ্যাপতির ন্যায় ইনিও প্রয়োজনমত হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘ উচ্চারণ এবং কোন' কোন' দীর্ঘস্বরকে হ্রস্ব উচ্চারণ করিয়াছেন, যথা—

১। রোখবি রাই | তুহি পুন হরি উরে | কুচ কাঞ্চনগিরি | হান।
২। দুহুঁ দুহুঁ গণ্ড মু | কুরে নিজ ছাহা হেরি | ভরমহি দুহুঁ করু | দংশ।

১ম পংক্তির একটি হ্রস্বকে দীর্ঘ উচ্চাবণ করিতে হইবে। ২য় পংক্তির ২য় পদকের দীর্ঘস্বর হ্রস্ববৎ। শব্দের মধ্যে যতি দিতে ইঁহাদের আপত্তি ছিল না। বিদ্যাপতির ন্যায় গোবিন্দদাস এই ছন্দেই অধিকাংশ পদ রচনা করিয়াছেন। গোবিন্দদাস স্থলে স্থলে জয়দেবের মাত্রাগত নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করিয়াছেন।

রাধা মাধব | কুঞ্জহি পৈঠল | রতিরণরঙ্গ র | সালা,
রণ বাজন ঘন | কোকিল কলরব | ঝঙ্করু মধুকর | মালা।

জ্ঞানদাস মাঝে মাঝে ২।১টী মাত্রা অল্প রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। ছন্দের নিয়ম রক্ষার দিকে জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের মত সতর্ক নহেন। জ্ঞানদাসের ভাষাও চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির মাঝামাঝি,—খাঁটি মৈথিলী নয়।

স্বজনি, তুঁহু সে কহসি মঝু হিত,
হিত অহিত সবহু হাম বুঝিয়ে আনে ছোয়ত বিপরীত।
লঘু উপকার করয়ে সব সুজনক মানয়ে শৈল সমান,
অচলহিত করয়ে মূরুখ জনে মানয়ে সরিষা প্রমাণ।
কানুর রীত ভীত মঝু চিতহি না জানি কি হবে পরিণামে,
ঐছন পিরীতিক রস নাহি হোয়ত যৈছন কি রস মানে।

শব্দের মাঝখানে যতি দিতে বৈষ্ণব কবিগণের আপত্তি ছিল না—কিন্তু ২য় পর্ব্বান্তের যতি প্রায় সর্ব্বত্রই শব্দান্তেই দিয়াছেন। ১ম পর্ব্বান্তের যতি মাঝে মাঝে ইচ্ছা করিয়াই শব্দের মাঝেই দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়—ইহাতে যে বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে তাহা সমগ্র পদটিকে 'একঘেয়ে' হইতে দেয় নাই। পর্ব্বান্তে যেখানে যেখানে মিল আছে সেখানে সেখানে যতি অবশ্য শব্দের শেষেই পড়িয়াছে—মিলই আবার একটি নূতন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু মুহুর্ম্মুহুঃ সপ্তম

মাত্রায় শব্দ-শেষ দেখিয়া এবং কোথাও কোথাও অষ্টম মাত্রায় দীর্ঘস্বর দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা ৭মাত্রায় ১ম পর্ব্ব ও ৯ মাত্রায় ২য় পর্ব্ব গঠন করিতেও চাহিয়াছেন। যেখানে অষ্টম মাত্রায় দীর্ঘস্বর আছে এবং দ্বিতীয় পর্ব্বের মাত্রা গণনায় দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রায় ২য় পর্ব্বেই নিতে বাধ্য, সেখানে ৭ম মাত্রায় যতি দিতেও আমরা বাধ্য। মাঝে মাঝে এই যতির স্থানপরিবর্ত্তন এ ছন্দে বৈচিত্র্যেরই সৃষ্টি করিয়াছে। ৮মাত্রা করিয়া পর্ব্ববিভাগ না করিয়া ৭+৯ মাত্রায় পর্ব্ব বিভাগ জয়দেবে দৃষ্ট হয় না। তবে ৮ম মাত্রায় যে পংক্তিতে নূতন শব্দ আরম্ভ হইয়াছে সে পংক্তি ৭+৯+৮+৪ এইরূপ ভাগ করিয়া পড়া যায়, যেমন—

ললিত লবঙ্গ | লতা পরিশীলন | 　ইত্যাদি

অথবা

অধিগতমখিল | সখীভিরিদং তব | বপুরপি বতিরণ | সজ্জং।

এজন্য পিঙ্গল প্রাকৃতভাষায় পৃথক ছন্দই দিয়া গিয়াছেন :—

ফুল্লিঅ কেসু | চম্প বহপঅলিঅ | মঞ্জরি তেজ্জিঅ | চুআ।
দক্খিণ বাউ | সীঅ ভই পবহই | কম্প বিওইনি | হোআ।
কেঅই ধূলি | সব্ব দিস পসরিঅ | পীঅরু সব্বউ | ভাসে।
আউ বসন্ত | কাই সহি করিহউ | কন্ত ন থক্কই | পাসে।

ছন্দের নাম ‘বৃত্তনরেন্দ্র’। অষ্টম মাত্রায় দীর্ঘস্বর থাকায় ৮+৮ ভাগ করিবার উপায় নাই! ৮+৮ মাত্রার পর্ব্ব বিভাগের সহিত ৭+৯ মাত্রার পর্ব্ব বিভাগের মিলন হিন্দী কবিতায় যথেষ্ট।

সাধন হীন | দীন নিজ অব বস | সীলা ভই মুনি | নারী।
কপি সুগ্রীব | বন্ধু ভয় ব্যাকুল | আয়ো সরণ পু | কারী।
কহি লগি কহোং | দীন অগণিত জিন | কো তুম পিবতি নি | সারী।
কলিমল গ্রসিত | দাস তুলসী পর | কাহে কৃপা বি | সারী।

ইহার সঙ্গে মাঝে মাঝে ৮+৮+৮+৪ মাত্রার পংক্তি মিশ্রিত আছে।

২৮ মাত্রার এই ছন্দের সঙ্গে জয়দেবের ২৮ মাত্রার ছন্দ মিলাইয়া বৈষ্ণব কবিগণ পদ রচনা করিয়াছেন—নিম্নলিখিত পংক্তিগুলিই তাহার প্রমাণ—

অভিনব হেম | কল্পতরু সঞ্চরু | সুরধুনী তীরে উ | জোর
চঞ্চল চরণ | কমল তলে ঝঙ্করু | ভকত ভ্রমরগণ | ভোর। (গোবিন্দদাস)
শ্যামর অঙ্গে | নীল অম্বর কিয়ে | জলদে জলদ মিলি | গেল
দূরহি দীগ | বসন জনু হেরিয়ে | ঐছন মরমহি | ভেল।
টলমল চরণ | যুগল মণি মঞ্জির | ঝনর ঝনর ঝন | বাজে।
কহ বল রাম | দাস ইহ বিপরিত | হেরত নাগর | রাজে। (বলরামদাস)
এত কহি দুহুঁক | মন্দিরে পরবেশল | দুহুঁজন ভেল এক | ঠাম।
মনমথমন্ত্র | পঢ়াওল দুহুঁজনে | পূরল দুহুঁ মন | কাম। (বিদ্যাপতি)

জয়দেব তাঁহার ছন্দে ১ম পংক্তির ২য় পর্ব্বের ৬ষ্ঠ মাত্রার সহিত ২য় পংক্তির ঐ স্থানীয় মাত্রার মিল দিয়া একটী গানে ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

কোকিল কলরব | কূজিতয়া জিত | মনসিজ তন্ত্র বি | চারং।
শ্লথ কুসুমাকুল | কুন্তলয়া নখ | লিখিত ঘনস্তন | ভারং।

মিলের অনুরোধে নিম্নলিখিতরূপ সাজাইয়া পড়িলে ছন্দের বৈচিত্র্য ঘটে।

কোকিল কলরব কূজিতয়া
জিত—মনসিজ তন্ত্রবিচারং।
শ্লথ কুসুমাকুল কুন্তলয়া
নখ—লিখিত ঘনস্তনভারং।

জগদানন্দ গোবিন্দদাসের মত পর্ব্বে পর্ব্বে মিল দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। শব্দালঙ্কারে জগদানন্দ গোবিন্দদাসের মতই সিদ্ধহস্ত। অনুপ্রাসে পদগুলি রসডগমগ।

গৌর কলেবর | মৌলি মনোহর | চিকুর ঐছে নে | হারি,
হেম মহীধর | শিখরে চামর | দেই উর পর | ডারি।
ইন্দীবর বর | গরভ গরব হর | রুচির কলেবর | কাঁতি,
চাঁচর চিকুর | চূড়পরি চঞ্চল | মোর শিখণ্ডক | পাঁতি।

শেষের স্বরটি ইঁহারা দীর্ঘ রাখিবার জন্য তত সচেষ্ট নহেন কিন্তু তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের স্বরটি প্রতি পংক্তিতেই দীর্ঘ আছে। শেষাক্ষরের পূর্ব্বস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণের নিষ্ঠা বাংলার বহু ছন্দেই সংস্কৃতের মতই থাকিয়া গিয়াছে। ঐ স্বরটির দীর্ঘত্ব রক্ষা না করিলে ২টি অক্ষরের স্থলে ৪ মাত্রার ৩টি অক্ষর দিলে ক্ষতি হয় না যেমন --

আকুল চিকুর | চূড়োপরি চন্দ্রক | ভালহি সিন্দুর | দহনা,
চন্দন চন্দ্র নাহ | লাগল মৃগমদ | তাহে বেকত তিন | নয়না।

শেষের দীর্ঘস্বরের বদলে ভারতচন্দ্র ২টি হ্রস্ব স্বরান্ত অক্ষর দিয়াছেন।—

কুঞ্জরগামিনি | কুঞ্জবিলাসিনি | লোচন খঞ্জন | গঞ্জিনি,
কোকিল নাদিনি | গীঃ পরিবাদিনি | শ্রীপরিবাদ বি | ধায়িনী।

ভারতচন্দ্রের এ ছন্দকে সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত বলা যায়।

ভারতচন্দ্র পরিচিত ভাষায় এ ছন্দে যে কবিতাটি রচনা করিয়াছেন তাহা হইতে নিদর্শন উদ্ধরণ করিলে মার্জ্জিতরুচি পাঠকেরা ছন্দোমাধুর্য্যের খাতিরেও আমাকে ক্ষমা করিবেন না। ভারতচন্দ্র, প্রয়োজনমত দীর্ঘস্বরকে কখনো দীর্ঘ কখনো হ্রস্ব ধরিয়াছেন। চতুর্থ পর্ব্বের দুটী স্বরকেই প্রতি পংক্তিতেই দীর্ঘ রাখিয়াছেন এবং ভাষাকে অন্যান্য কবিতার মত খাঁটি বাংলা রাখেন নাই। এ ছন্দ খাঁটী বাংলায় মানাইবে না বলিয়াই হোক অথবা আদিরসের উপযোগী হইবে বলিয়াই হউক বাংলাকে ব্রজভাষার সঙ্গে মিশাইয়াছেন।

রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীতের মাঝে মাঝে আলোচ্যমান ছন্দের পংক্তি পাওয়া যায়, যথা—

নখর নিকর হিম | করবর রঞ্জিত | ঘন তনু মুখ হিম | ধামা
নবনব রঙ্গিণী | নবরস রঙ্গিণী | হাসত ভাষত | নাচত বামা।

রামপ্রসাদও খাঁটী বাংলায় এ ছন্দ অস্বাভাবিক শুনাইবে ভাবিয়া সংস্কৃত সমাস ও মৈথিলী ক্রিয়ার আশ্রয় লইয়াছেন, অথচ এই সঙ্গীতেরই অন্যান্য পংক্তি গুলিতে খাঁটী বাংলা বিশেষ্য বিশেষণ ও বাংলা ক্রিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

করে করে ধরে তাল　　বম বম বাজে গাল
ধাঁ ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজিছে দামামা।

কবি উপরের যুগ্মকের ২য় পংক্তির চতুর্থ পর্ব্বে ৪ মাত্রার স্থলে ৮ মাত্রা ব্যবহার করিয়াছেন। এবং ঐ পংক্তির সহিত মিল রাখিতে, "করে করে······দামামা" ইঃ পংক্তিতে আরো মাত্রা বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন। ফলে হ্রস্বোচ্চারিত দীর্ঘস্বর বহুল পংক্তি সাধারণ দীর্ঘায়ত ত্রিপদীতে পরিণত হইয়াছে। আবার—

১। মরকত মুকুর | বিমল মুখমণ্ডল নূতন জলধর | ধরণী
২। গিরিবর কন্যে | নিখিল শরণ্যে | মম জীবন ধন | জননী।
৩। কলয়তি কবিরঞ্জ | জন করুণাময়ী | করুণাং কুরু হর | মোহিনী।

১মে—৭+৯+৮+৪ এই ভাগ করিয়া পড়িলেই ভাল হয়। ২য়ে, ১ম –২পর্ব্বান্তে মিল আছে। ৩য়ে—যুক্তাক্ষরের মাঝে যতি দিতে হইতেছে—২য় পর্ব্বে ৯ মাত্রা আছে ৪র্থ পর্ব্বেও ১ মাত্রা বেশী। ভাষা একপ্রকার সংস্কৃতই। বৈষ্ণবকবিগণের মত শাক্তকবিও অক্ষরে অক্ষরে ছন্দের নিয়ম পালন করিয়া চলেন নাই। প্রাচীন মুসলমান কবিও এই সুমধুর ছন্দের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই—জয়দেবের অনুকরণে তিনিও সংস্কৃতকল্প ভাষায় লিখিয়াছিলেন -

নবচূত অঙ্কুর কিশলয় মঞ্জুল রঞ্জিত তরুলতা পুঞ্জে।
কোকিল কাকলী কলকল কূজিত ললিত সুললিত নিকুঞ্জে।

ভারতচন্দ্রের অনুকারক বিলুপ্তযশা কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় এ ছন্দে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও সংস্কৃত নামমালা।

কালিয় মর্দ্দন | কংস নিসূদন | কেশি-মথন কং | সারে,
ঘনঘন ঘুঙ্গুর | ঘোষক ঘনতনু | ঘোর তিমির সং | হারে।

বাংলা ভাষায় তারপর কিছুকাল যিনিই এ ছন্দ রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তিনিই অনুস্বার বিসর্গহীন সংস্কৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। বাংলাভাষা স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছিল, যুক্তাক্ষরের জন্য মাত্রাবৈষম্য স্বীকার করিত না—সেজন্য খাঁটী বাংলায় এ ছন্দ রচনা সম্ভব হয় নাই। এ ছন্দ স্তবস্তুতির ছন্দ হইয়াই ছিল—এবং তাহার ভাষা কতকগুলি সমাসবদ্ধ সম্বোধন পদের সমষ্টি। যাত্রা ও থিয়েটারের নাট্যাভিনয়ে এই ছন্দে দেবদেবীর স্তবস্তুতি আজিও শোনা যায়।

তারপর হেমচন্দ্র যখন লিখিলেন—

রে সতি রে সতি | কাঁদিল পশুপতি | পাগল শিব প্রম | থেশ।
যোগমগন হর | তাপস যতদিন | তাবদিন না ছিল | ক্লেশ।

তখন তাঁহাকে দীর্ঘস্বরগুলির মাথায় একটি করিয়া রেখা টানিয়া দিতে হইয়াছিল। বাঙালী পাঠক দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণে অভ্যস্ত ছিল না বলিয়াই ঐ ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহাছাড়া কবি সকল দীর্ঘস্বরকেই আবার দীর্ঘ ধরেন নাই—সেজন্যও দীর্ঘত্বের চিহ্নযোগের প্রয়োজন হইয়াছিল।

হেমচন্দ্র খাঁটী বাংলাতেই ঐ ছন্দ রচনা করিয়াছিলেন, কতকটা আস্বাভাবিক শুনাইলেও উহার জন্য দশমহাবিদ্যা অনেকের ভাল লাগিয়াছিল। হেমচন্দ্রের সময় অমিত্রাক্ষর ছাড়া অন্য ছন্দে ছন্দোহিল্লোল ছিলনা।—দশমহাবিদ্যার এই ছন্দ সেজন্য বাঙালী পাঠকের শ্রুতিরঞ্জন করিয়াছিল। কিন্তু এছন্দে দীর্ঘ কবিতা রচনা সম্ভব নয়—পদে পদে কবিতার প্রবাহ ক্ষুণ্ণ হয়—কয়েক পংক্তি অগ্রসর হওয়ার পরই একঘেয়ে মনে হয়—কর্ণও ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। হেমচন্দ্র গোটা দশমহাবিদ্যা এই ছন্দে লিখিয়া যাইলে পাঠকের সহানুভূতি হারাইতেন। তিনি এছন্দে যতটা অগ্রসর হইয়াছেন তাহাতেই ইহার স্বাভাবিক গতির সীমা অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ৺গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'যমুনা' এ ছন্দের একটি সফল সার্থক রচনা। তাহাতে ২টি করিয়া মাত্রা বেশী আছে বলিয়া পরবর্ত্তী প্রবন্ধের আলোচ্য হইয়া রহিল। তারপর হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী ছাড়া দীর্ঘ কবিতায় কেহ এ ছন্দ প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার দশাননবধ কাব্যের বহু পৃষ্ঠাই এই ছন্দের নর্ত্তনে চঞ্চল। দশাননবধ কাব্য আগাগোড়া নানাবিধ সংস্কৃতছন্দে লেখা; দুষ্পাঠ্য বলিয়া উহা জনপ্রিয় হয় নাই। সংস্কৃত ছন্দে গ্রন্থ রচনা করিতে গিয়া কবি গ্রন্থের ভাষাকে একপ্রকার সংস্কৃতই করিয়া ফেলিয়াছেন,—ভাষা স্বচ্ছও নয়, অবাধপ্রবাহশীলও নহে,—ছন্দের কঠোর নিয়মরক্ষার দিকে দৃষ্টি করিতে গিয়া কবি রচনাকে কবিত্বে সরস বা অর্থালঙ্কারে মণ্ডিত করিবার অবসর পান নাই। তবু বঙ্গসাহিত্যে দশাননবধের স্থান আছে। কাব্য-হিসাবে ইহার মূল্য যাহাই হোক্, ছন্দঃশাস্ত্রের গ্রন্থ হিসাবে ইহার মূল্য আছে, প্রয়োজনীয়তাও আছে। সংস্কৃত ছন্দ দশাননবধের ভঙ্গি ও ভাষায় কিরূপ চলে তাহার পরীক্ষা হইয়া গেছে,—অন্যান্য ভঙ্গি ও পদ্ধতির আবিষ্কারের পথে হরগোবিন্দ বাবু কবিদিগকে অনেকটা আগাইয়া দিয়াছেন। দশাননবধ হইতে ২।৪ ছত্র তুলিয়া দিই—

মধুকর গুঞ্জন | মুখরিত মঞ্জুল | কুসুমপুঞ্জ উড় | গন্ধে,
মধুর বাদ্যরত | সজ্জিত কিন্নর | সদৃশকুঞ্জ চিত | রঙ্গে।
তপন কনক কর | মাল্যসুসজ্জিত | হইল অবনি | অবিলম্বে,
মরকত কান্তি স | দৃশ পরিসজ্জিত | জলনিধি বিপুল নি | তম্বে।

কবি সংস্কৃতের স্বরমাত্রার নিয়ম অভ্রান্তভাবে পালন করিয়া গিয়াছেন। ছন্দের নাম দিয়াছেন করকাগতিছন্দ।

৺ভুবনমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় বাংলায় সকল প্রকার সংস্কৃত ছন্দই রচনা করিয়াছিলেন। সে সকল ছন্দ চলে নাই। তাঁহার করকাগতি ছন্দের উদাহরণেই তাঁহার বক্তব্য লিপিবদ্ধ আছে।—

হরিচরিত ভুবন | মোহন রায় ক | হে কত ললিত র | হস্তে,
বহুবিধ নব নব | পদ্য মনোহর | রুচিকর বিক্র ম | শ্লোকে।
চলিত বচন অনু | রোধ বিসর্জ্জন | করিয়া অক্ষর | পঠিলে,
শ্রাব্য মধুর হ | ইবে পরমাদৃত | উচিতোচ্চারণ | করিলে।

দুঃখের বিষয়, কেহ উচিতোচ্চারণ করিয়া পাঠ করেন নাই, পদ্য পরমাদৃতও হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে ব্রজভাষায় এ ছন্দ প্রয়োগ করেন, মৈথিলী-ভাষার কবিদের রচনার মতই তাহা সুন্দর হইয়াছিল।

প্রেমপূর্ণ তনু | পুলকে ঢল ঢল | বিগলিত বিলসিত | তোয়,
আকুল কাকলি | ভুবন ভরলরে | উতল প্রাণ উত | রোয়।

রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দে দীর্ঘকবিতা রচনার প্রয়াস পান পান নাই। তিনি বুঝিলেন ইহা গীতির ছন্দ— সঙ্গীতেই ইহা বরাবর চলিয়া আসিয়াছে, বাংলা সঙ্গীতে দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরের বৈষম্য রক্ষিত হয়। সঙ্গীতে ইহা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে না। রবীন্দ্রনাথ সেজন্য সংস্কৃতের হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের নিয়ম রক্ষা করিয়া এই ছন্দের উপযোগী অন্তরা যোগ করিয়া ভারতের জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। ভাষা অস্বচ্ছ জটিল অস্বাভাবিক এবং সংস্কৃতাত্মক হইয়া উঠে নাই, এমনকি, অধিক সমাস ব্যবহারও করিতে হয় নাই, শব্দের মধ্যে মাঝে যতি দিতে হয় নাই, —প্রবাহ ক্ষুণ্ণ হয় নাই, অথচ সংস্কৃতের নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে রক্ষিত হইয়াছে।

বাংলাভাষায় এ ছন্দে ইহাই আদর্শ রচনা।

রাত্রি প্রভাতিল | উদিল রবিচ্ছবি | পূর্ব্ব উদয় গিরি | ভালে,
গায় বিহঙ্গম | পুণ্য সমীরণ | নবজীবন রস | ঢালে।
তব করুণারুণ | রাগে　　নিদ্রিত ভারত | জাগে,
তব চরণে নত | মাথা।
জনগণ পথ পরি | চায়ক জয়হে | ভারত ভাগ্য বি | ধাতা।

তারপর দ্বিজেন্দ্রলালের গঙ্গাস্তোত্র রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতের পরেই উল্লেখযোগ্য।

নারদকীর্ত্তন | পুলকিত মাধব | বিগলিত করুণা | ক্ষরিয়া,
ব্রহ্মকমণ্ডলু | উচ্ছলি ধূর্জ্জটি | জটিল জটা'পর | ঝরিয়া।

* * * *

পরিহরি ভব সুখ | দুঃখ যখন মা | শায়িত অন্তিম | শয়নে
বরিষ শ্রবণে | তব জল কলবর | বরিষ সুপ্তি মম | নয়নে।

প্রথম দুই পংক্তিতে একটু সমাসবাহুল্য আছে, শেষ দুই পংক্তি খাঁটী সাধারণ বাংলা—দীর্ঘ হ্রস্ব উচ্চারণ বৈষম্যের জন্য আদৌ আস্বাভাবিক শুনাইতেছে না। ১মাংশের ছন্দঃস্পন্দের রেশ শেষাংশের হ্রস্বমাত্রাধিক্য ও ব্যঞ্জন বাহুল্যকেও ছন্দের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল সংস্কৃতানুযায়ী হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের নিয়ম অতি কঠোরভাবে অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করিতে গিয়া কোন' কোন' সঙ্গীতকে দুষ্পাঠ্যও করিয়া তুলিয়াছেন। 'যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ত্তী খাঁটী বাংলা শব্দের শেষের হসন্ত অক্ষরের উচ্চারণ অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। কোন' কোন পর্ব্বে দীর্ঘ-স্বরবাহুল্য ও ব্যঞ্জনাল্পতায় পাঠের অসুবিধাও ঘটিয়াছে।

একি শ্যামল | সুষমা মধুময় | বিশ্ব, শিশির ঋতু | অন্তে,
নব ঘন পল্লব | কোকিল মুখর নি- | কুঞ্জ সুমধুর ব- | সন্তে।
সুন্দর ধরণী | সুন্দর নীল সু | নির্ম্মল অম্বর | ভাতি।
অরুণ কিরণ অস্তু | রঞ্জিত তরুণ জ- | বা বন মালতি | জাতি—
আনে কার স্ | পর্শ সুখ স্মৃতি | মলয়জ করি অস্তু | কম্পা,
কার' হাস্য টুকু | করি পরিলুণ্ঠন | গর্ব্বিত বিকসিত | চম্পা।
কার প্রেম ম | ধুর মৃদু অস্ফুট | বাণী জাগে | প্রাণে,
চপল পবন বি | কম্পিত কিসলয় | পল্লব মর্ম্মর তানে।

যতি সংস্থানের সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকিলে এটি পাঠ করা কঠিন। অবশ্য গাহিতে কোন অসুবিধা হয় না।

কবিবর বিজয়চন্দ্র ললিত মধুর শব্দনির্ব্বাচনের চাতুর্য্যে সংস্কৃত ছন্দগুলিকে বাংলায় অবিকৃত সহজ সুন্দররূপ দান করিয়াছেন। বিজয়বাবু সংস্কৃত ছন্দে দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন নাই, সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় স্বভাবসুন্দর রূপদানের কারু কৌশলটী শিখাইয়াছেন এবং আদর্শ স্বরূপ কতকগুলি উদাহরণ দিয়াছেন। আলোচ্য ছন্দের উদাহরণ—

স্বচ্ছ সুনির্ম্মল জলতল মুকুরে বিম্বিত কানন কান্তি,
গীতি মুখর বন মথি অতি মৃদুরে স্তব্ধ পবন লভি শান্তি।
ফুলদল চুম্বিত রবিকর বিম্বিত ঝলকিল'কত হিম বিন্দু,
নির্ম্মল গগনে কুসুমিত বদনে তাতিল হিমকর ইন্দু।

অধিক দীর্ঘস্বর ব্যবহার না করিয়া কবি হস্বস্বরান্ত অক্ষর ও যুক্তাক্ষরই বেশী ব্যবহার করিয়াছেন। ১ম পংক্তির ষোড়শ মাত্রার সহিত ২য় পংক্তির ষোড়শ মাত্রার মিল আছে, ৩য় ও ৪র্থ পংক্তিতে ১ম দুই পর্ব্বে মিল আছে। কবি হ্রস্বদীর্ঘস্বরগত মাত্রিক নিয়ম অভ্রান্ত ভাবেই রক্ষা করিয়াছেন, তবু বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক শুনাইতেছেনা। শব্দগুলি এমন কৌশলে ও সন্তর্পণে নির্ব্বাচন করিয়াছেন যে প্রচলিত বাংলা হইলেও এ ছন্দের পক্ষে সম্পূর্ণ পংক্তেয়। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিজয় বাবুও লক্ষ্য করিয়াছেন, দীর্ঘ-উচ্চারণে-চির-অনভ্যস্ত বাংলা ক্রিয়া

পদই এ ছন্দে যত গোলযোগ বাধায়—সেজন্য ইনি রবিবাবুর মত যতদূর সম্ভব ক্রিয়াপদ,—বিশেষতঃ দীর্ঘস্বরান্ত ক্রিয়াপদ বর্জ্জন করিয়াছেন ; 'এ' ও 'আ' যে ক্রিয়া পদের শেষে বা মাঝে আছে তাহার স্থান ইহাদের ছন্দে নাই বলিলেই হয়। 'ইল'যুক্ত সমাপিকা ও 'ই'-অন্ত অসমাপিকা ছন্দের পক্ষে বেশ উপযোগী। এই শ্রেণীর ক্রিয়ার দ্বারাই ইনি অধিকাংশ বাক্য বন্ধন করিয়াছেন। এই ছন্দে ইহার কয়েকটি সুমধুর সঙ্গীত আছে।

ভুজঙ্গ বাবু এই ছন্দ রচনায় সিদ্ধহস্ত,—পাছে আস্বাভাবিক শুনাইবে বলিয়া তিনি মৈথিলী ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়াছেন—তাহাতে বৈষ্ণবপদের মত মধুর শুনায়।

গাঢ় তিমিরময় তমাল তরুতল নাহি কি বিসরল পন্থ,
দীর্ঘ দিবস ঘন স্মরি মঝু বেদন বাট কি মুরুছল কন্ত ?
উয়ল মনোহর চাঁদ গগন'পর বিহিত সময় চলি গেল,
রসইতে অন্তর কানন পথ'পর নূপুর রব নহি ভেল ॥

কবি অক্ষরে অক্ষরে হ্রস্ব দীর্ঘের মাত্রিক রীতি অনুসরণ করিয়াছেন।

কান্তকবির

পীযূষ সিঞ্চিত | সমীর চঞ্চল | কাঞ্চন অঞ্চল | দোলেরে
সংশয় নিরসন | ধীস্মৃতি বিতরণ | চরণে জনমন | ভোলেরে।

যুক্তাক্ষর-ও-সমাসবহুল।

কিন্তু— ধীর সমীরে | চঞ্চল নীরে | খেলে যবে মন্দ হি | লোল,
বিগলিত কাঞ্চন | সন্নিভ শশধর | জল মাঝে খেলে মৃদু | দোল।

ইহাকে রীতিমত সরস বাংলা বলা যায়।

যতীন্দ্রমোহনের—

গঙ্গাগোদাবরী-সিন্ধু-সরস্বতী তরলধারাবলিহারা।
বিন্ধ্যা-হিমাচল-কাঞ্চি-মুকুটধরা মলয়বলয়শোভাসারা।

এই দুই পংক্তি সমাসবহুল,—পরে

অম্বর পরে চিরগম্ভীর মন্দ্রে বাজিছে কালের ডঙ্কা,
ধাবিত মানব যুগে যুগান্তরে, অন্তরে সঙ্কট শঙ্কা।

সরল বাংলায় রচিত।

উপরিউক্ত পংক্তিগুলিতে প্রত্যেক দীর্ঘ স্বরকেই দুই মাত্রা ধরা হয় নাই—প্রয়োজনমত কোন' কোন' দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে হইবে। রজনীকান্ত সংস্কৃত শব্দের দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণের পক্ষপাতী—কিন্তু বাংলা শব্দে—বিশেষতঃ বাংলা ক্রিয়ার দীর্ঘস্বরকে হ্রস্বই ধরিয়াছেন। মৈথিলী ভাষার কবিদের রচনার ন্যায় ইহাতে যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে—এই স্বাধীনতা এ ছন্দ রচনাকে খুবই সহজ করিয়া তুলিয়াছে—এই স্বাধীনতা পাইয়া কবি অনায়াসে

কবিতার অন্যান্য উপকরণগুলিতে মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইতে পারেন। কিন্তু ইহার একটি দোষ এই যে কোন্ দীর্ঘস্বরটিকে দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে হইবে কোনটিকে হ্রস্ববৎ গণ্য করিতে হইবে—পাঠক সহজে ঠিক করিতে পারিবেন না। তা'ছাড়া স্বর সম্বন্ধে একটি বিশেষ নিয়ম থাকাই ছন্দঃশাস্ত্রানুগত—সঙ্গীতে স্বাধীনতা থাকিলেও আবৃত্তিযোগ্য কবিতায় একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকাই উচিত।

দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ একেবারে বাদ দিয়া কেবলমাত্র শেষে যুক্তাক্ষর রাখিয়া বাকী তিন পদকের ২৮ মাত্রাকে ২৪টি অক্ষরে পরিণত করিলে কি হয়?

> অপসারি কুহেলিকা ব্যোমে ব্যোমে নীলিমার ভূমার ভূতিতে কর পূর্ণ,
> হরি মোহ প্রহেলিকা রবি সোমে অসীমার আভাস আনো গো দেবি তূর্ণ।

বাংলায় দীর্ঘস্বর হ্রস্ববৎ—শেষে ছাড়া যুক্তাক্ষর নাই অতএব গণনায় মাত্রা ঠিক আছে। কিন্তু ইহাতে আলোচ্য ছন্দকে পাওয়া যাইতেছে না। আলোচ্য ছন্দের যাহা প্রাণস্বরূপ সেই ছন্দোহিল্লোলই ইহাতে নাই—উচ্চারণের উচ্চাবচতা নাই—আগাগোড়া অনুদঘাতিনী। প্রত্যেক অক্ষরটি লঘুস্বরান্ত হইলেও একই ফল হইত। ইহাই বাংলার দীর্ঘ ত্রিপদী। এত অক্ষর বাহুল্য ঘটিলে এ ছন্দের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য থাকে না। এ ছন্দের প্রত্যেক পংক্তিতে ২৭।২৮ মাত্রা হইলেই চলিবে—কিন্তু কেবলমাত্র দীর্ঘ স্বর হইতে অথবা কেবলমাত্র হ্রস্বস্বর হইতেই পাইলে চলিবে না, দুই প্রকারের স্বর মিলাইয়া পাওয়া চাই - তবে যে ছন্দোহিল্লোলের জন্য ইহার বৈশিষ্ট্য তাহাই পাওয়া যাইবে। বিদ্যাপতি সকল দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ করেন নাই। বাংলা ভাষায় দীর্ঘ উচ্চারণ চলে না বলিয়াই বোধ হয়, চণ্ডীদাস অধিকাংশস্থলে সব স্বরকেই হ্রস্ব উচ্চারণ করিয়াছেন। দীর্ঘ উচ্চারণ বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্যমান ছন্দের দীর্ঘমাত্রা গিয়াছে কিন্তু তাহার স্থলে দুইটী করিয়া হ্রস্বমাত্রা আসিয়া জুটিয়াছে। সব স্বরই যখন হ্রস্ব তখন দুটী করিয়া যে কোন' স্বরান্ত অক্ষর হইলেই চলিত। যুক্তাক্ষরগুলি ভাঙিয়া একটি দীর্ঘ মাত্রার বদলে দুইটি করিয়া হ্রস্বমাত্রা দিয়াছে। এমন কি ঔকার অ+উ এ পরিণত হইয়াছে। পৌষ—পউষে, যৌবন—জউবনে পরিণত হইয়াছে। ক্রমে এ ছন্দের প্রত্যেক পদক আটটি করিয়া স্বরান্ত ব্যঞ্জনে নীরন্ধ্র নিরন্তরাল হইয়া উঠিয়াছে। চণ্ডীদাসের অনেক পদকে অক্ষর ২।১টী কম আছে—কিন্তু দীর্ঘস্বর দীর্ঘ উচ্চারণে অক্ষরের অভাব সারিয়া লইবে এই ভরসায় তিনি অক্ষর কম দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না—কারণ যে পদাংশে একেবারে দীর্ঘস্বর নাই সে পদাংশেও অক্ষর কম দিয়াছেন—তিনি বরং সঙ্গীতে সে অভাব পূর্ণ হইয়া যাইবে এই ভরসাই করিয়াছেন। দীর্ঘ স্বরের গুরু মাত্রার প্রতি তাঁহার লোভও ছিলনা, কারণ অধিকাংশ পদাংশে আটটি করিয়াই অক্ষর আছে—কোন' কোন' পদে ৯টিও আছে। চণ্ডীদাসের ভাষায় যুক্তাক্ষর অতি অল্প—যেখানে যেখানে আছে তাহার জন্য একমাত্রাই ধরা হইয়াছে—ফলে তাঁহার

ছন্দে ব্যঞ্জনবাহুল্য ঘটিয়াছে। চণ্ডীদাসের হাতে ও বাংলা ভাষার ধাতে আলোচ্য ছন্দ দীর্ঘ ত্রিপদীতে পরিণত হইয়াছে জয়দেবে, বিদ্যাপতির ছন্দঃস্পন্দ হারাইয়া নূতন ছন্দের রূপ ধরিয়াছে—কেবল মাঝে মাঝে

বাসলী চরণ | শিরে বন্দি আঁল | বড়ু চণ্ডীদাস | গাএ।

এইরূপ পংক্তি ইহার পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করায়।

১। না বোল বড়ায়ি হেন | অতি নিঠুর বচন | এ তোহ্মার বএসের | দোষে,
আলিসের পরসাদে | দুখ সুখ নাহি জান | তে তোহ্মাত উপজএ | রোষে।

২। বিষম পুরুষ জাতী | কপট পূরিত মতী | নানা বোলে সে তিরিক | রঙ্গে
হেন মতে পড়িহাসে | সে আন যুবতী লঞা | কাহ্ন রতি ভূঞ্জে কুঞ্জে | কুঞ্জে।

চণ্ডীদাসের এই ছন্দের পদগুলিতে ১ম পদকের শেষাক্ষরের সহিত ২য় পদকের শেষাক্ষরের সহিত মাঝে মাঝে মিল আছে, মাঝে মাঝে নাই—জয়দেবে কেবল "রতি সুখ সারে গতমতিসারে" গানটিতে ১ম দুই পর্ব্বে মিল আছে। "সমুদিত মদনে রমণী বদনে" গানটিতে ঐরূপ মিল আছে বটে কিন্তু শেষপর্ব্বে ১মাত্রা কম থাকায় ভিন্ন ছন্দের রূপ ধরিয়াছে। বিদ্যাপতিতে মিল নাই। চণ্ডীদাসে মিল আরম্ভ হইল। পরে এ মিল অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল, ছন্দোহিল্লোলের বিনিময়ে পংক্তির মধ্যে একটি করিয়া মিল, "মুকুতার বদলে শুকুতা।" চণ্ডীদাস সংস্কৃত ছন্দের আর একটি বৈশিষ্ট্য প্রায় সর্ব্বত্রই রাখিয়াছেন—শেষ দুই অক্ষরের অন্ততঃ একটিতেও দীর্ঘস্বর রাখিয়াছেন এবং তাহার দীর্ঘ উচ্চারণই প্রত্যাশা করিয়াছেন—পরের দীর্ঘ ত্রিপদীতে এ নিয়মও আর থাকে নাই। পংক্তির শেষ অক্ষরদ্বয়ের দীর্ঘমাত্রার আয়ত উচ্চারণ এই দীর্ঘ ত্রিপদীকেও ঈষৎ হিল্লোলিত করে—উহা পরবর্ত্তী পংক্তিকে এমন একটি দোলা দেয় যাহাতে সমস্ত পংক্তিটি চঞ্চল হইয়া উঠে। ১ম পংক্তির পাঠান্তে ২য় পংক্তির প্রারম্ভেই পাঠককে পাঠভঙ্গি ঈষৎ তরঙ্গিত করিয়া লইতে হয়। পরবর্ত্তী দীর্ঘ ত্রিপদী এ সুযোগটিও হেলায় হারাইয়াছিল। চণ্ডীদাসের ভাষায় যুক্তাক্ষর বেশী ছিল না তাহাতে ছন্দোহিল্লোলের সুবিধা না হোক, ছন্দে লালিত্যের অভাব ছিল না। পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে যুক্তাক্ষর অবাধে প্রবেশ লাভ করিল—কিন্তু এক মাত্রার অধিক মর্য্যাদা লাভ করিল না—কাজেই ছন্দোহিল্লোলের সৃষ্টি-ত হইলই না—অজস্র ব্যঞ্জনের ভিড়ে, পূর্ব্বে যে লালিত্যটুকু ছিল তাহারও স্খালিত্য ঘটিল। ক্রমে দীর্ঘ ত্রিপদীর ক্ষীণস্বর ব্যঞ্জনের অরণ্যে জয়দেবের সাধের ছন্দকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বিদ্যাপতির ছন্দঃস্পন্দ কিরূপে বাংলাভাষায় ত্রিপদীতে মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে, নরহরিদাসের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি দুটীতেই প্রমাণিত হইবে।

যা কর নাম দ | রশ সুখ সম্পদ | দরশ পরশ রস | পূর,
পরশে যে সুখ তাহা | কি বলিতে পারিগো | স্নে যে বাণী অনুভব | দূর।

১ম পংক্তি, দুইটী দীর্ঘস্বর ও একটি যুক্তাক্ষরের জন্য হিল্লোল লাভ করিয়াছে! প্রথম পংক্তির

তরঙ্গ ২য় পংক্তি দাম্পত্য-সূত্রে কতকটা পাইয়াছে। ১ম পংক্তির হাত ধরিয়া আছে বলিয়া, ১ম পংক্তির নর্ত্তনে, ২য় পংক্তিকে অনিচ্ছাতেও একটু নাচিতে হইয়াছে। কিন্তু ২য় পংক্তিকে তাহার সপাংক্তেয়গণের সংসর্গে নিঃস্পন্দ হইয়াই থাকিতে হইবে। দরশের—'দ' এর পর যতি পড়ায় হিল্লোল বাড়িয়া গিয়াছে—দরশ শব্দটি তাহার 'দ'কে আপন অঙ্গ হইতে ছাড়িয়া দিতে গিয়া এবং প্রথম পদকের ধাক্কা খাইয়া উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে—তাহাতে তরঙ্গ নূতন বেগ লাভ করিয়াছে। ২য় পংক্তির নিজস্ব ছন্দোহিল্লোল কিছুই নাই, উহা সাধারণ দীর্ঘ ত্রিপদীর পংক্তি। শব্দের মধ্যে যতি দিলে ছন্দঃস্পন্দ কিরূপ বাড়ে—অন্য ছন্দের পংক্তি হইতেও দেখান যাইতে পারে।

অন্তর মম | তব পদে নিস্ | পন্দিত করহে,
নন্দিত কর | নন্দিত কর | নন্দিত করহে।

এখানে 'নিস্' উপসর্গের পর যতি সংস্থানে নিঃস্পন্দিত ও স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে—নতুবা—নিস্পন্দিত দেবতার পদে ও কবিতার পদে দুইয়েতেই নিস্পন্দিত রহিয়া যাইত। ছন্দোহিল্লোলসৃষ্টি-বিষয়ে শব্দের মধ্যে যতি পড়ায় যে লাভ তাহা বাংলার ত্রিপদী পংক্তি হারাইয়াছে—মৈথিলী ভাষার ছন্দে যাহা গুণস্বরূপ, বাংলা ভাষার ছন্দে তাহা দোষ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

বাংলায় যখন ঐকার ঔকার ছাড়া দীর্ঘস্বর নাই, তখন ঐকার ঔকার ছাড়া অন্য দীর্ঘস্বরকে হ্রস্ববৎ গণ্য করিয়া কেবল যুক্তাক্ষরের সাহায্যেই এই ছন্দকে চালান যায়।

উশীরাম্বুচর্চ্চিতা | ধূপদীপে অর্চ্চিতা | কুন্দকোরক চারু দশনা,
গিরিবন্ধুরদেহা | বেতসকুঞ্জ গেহা | বিরচিতমীনযূথ | রশনা। (ক্ষুদকুঁড়া)

—একটু সমাসবাহুল্য ঘটিল,—কিন্তু পাঁচটীর বেশী যুক্তাক্ষর নাই, যুক্তাক্ষর আরো বাড়ান চলে—কিন্তু সমাস কমাইলে ভাল হয়।

ছিলে বিধুমল্লীতে | ছিলে মধুবল্লীতে | নখরুচি-কিংশুক | কুঞ্জে
ছিলে মৃদু গুঞ্জনে | বনভরা | শিঞ্জনে | নিখিলের সব শোভা | পুঞ্জে। (ঋতুমঙ্গল)
অথবা—বিহঙ্গ সঙ্গীত | চন্দ্রিকা পুলকিত | উচ্ছল চঞ্চল | প্রাণ।
প্রাপ্ত সে বন্দিত | সুরনর বাঞ্ছিত | মঞ্জুল অঞ্জনিত | প্রাণ।
মানবের কথা যেন | মধুকর গুঞ্জন | বিস্তৃত বক্ষের | দ্বার।
অন্যায়ে গর্জ্জন, | ন্যায়ে প্রাণ বর্জ্জন, | কল্পনে সর্জ্জন | সার। (যতীন্দ্রপ্রসাদ)

এই কয় পংক্তিতে সমাস মাত্র ২।১টী আছে। সমাস একেবারে বর্জ্জন করা যায়—যুক্তাক্ষর পংক্তির মধ্যে ২।১টা দিলেও চলে কিন্তু শেষে (দীর্ঘস্বর বাংলায় হ্রস্ববৎ বলি।) যুক্তাক্ষর চাই-ই।

'মরীচিকার' কবি যতীন্দ্রনাথের—

চির ক্রন্দনময়ী গঙ্গে,
কুলুকুলু কলকল প্রবাহিত আঁখি জল
দেব মানবের এক সঙ্গে। ইত্যাদিতে

যুক্তাক্ষরে পংক্তি দুটী শেষ করায় এবং যুক্তাক্ষরের জন্য ২ মাত্রা ধরায় কবিতাটি দীর্ঘ ত্রিপদী হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে—ক্রমে কবিতাটি শেষ দিকে যুক্তাক্ষর-শূন্য হইয়া ২৭টি লঘু মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ১মে যুক্তাক্ষরের জন্য কবির 'গঙ্গা' যে অপূর্ব্ব তরঙ্গ লাভ করিয়াছে তাহা শেষের অনুদ্ঘাতিনী বেলা ভূমিতেও একেবারে এলাইয়া পড়ে নাই। তরঙ্গ যে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে, কবি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাই শেষ দুই পংক্তিতে আবার দীর্ঘস্বরের ব্যবধান সৃষ্টি করিবার জন্য যুক্তাক্ষরবহুল শব্দের ঘন ঘন ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

বন্দি ত্রিকাল জয়ী, গঙ্গে মূর্ত্তিময়ী　　অনন্ত জীব ব্যথা প্রবাহ।
অনাদি ও ক্রন্দনে মিশাইনু ক্রন্দন　　বুঝে নে-মা এ প্রাণের কি দাহ।

ইহার সুর তটে প্রতিহত স্রোতের ন্যায় তরঙ্গায়িত হইয়াছে।

শেষের যুক্তাক্ষরই পরবর্ত্তী পংক্তির ছন্দঃস্পন্দ নিয়মিত করে, পংক্তির মাঝে একটি মাত্র যুক্তাক্ষরও যদি দুই মাত্রায় প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলেও সমস্ত পংক্তিকেই আন্দোলিত করে। নিস্তরঙ্গ তড়াগে তরঙ্গ তুলিতে হইলে একটি মাত্র লোষ্ট্রের ক্ষেপণই যথেষ্ট। দুই মাত্রায় ব্যবহৃত একটি মাত্র যুক্তাক্ষরের উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমস্ত পংক্তিই হিল্লোলিত হইয়া উঠে এবং নর্ত্তিত চলন ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করিয়া বলে যে, সে ত্রিপদী নহে—

১। সুন্দর তব পায় | নিবেদিনু আপনায় | গাব তব গুণ নব | ছন্দে
২। তটে তটে বৈভব | মঠে মঠে পূজা তব | দেশে দেশে যশোরব | ঘোষণা।

উপরের ১ম পংক্তিতে ১মেই যুক্তাক্ষর, ২য় পংক্তিতে যুক্তাক্ষরের স্থানীয় ঐকার আছে—ঐ দুটী দীর্ঘ মাত্রা পংক্তি দুটীকে ত্রিপদী হইতে স্বাতন্ত্র্যদান করিতেছে এবং পাঠভঙ্গিকে হিল্লোলিত করিয়া তুলিতেছে। 'সুন্দর' শব্দের যুক্তাক্ষরের জন্য প্রত্যেক পদকের ১ম অক্ষরে একটি করিয়া স্বরোদ্ঘাত হইতেছে। ঐ সব স্থলে একটি করিয়া যুক্তাক্ষরলাভের নিষ্ঠার সৃষ্টি হইতেছে। আবার 'বৈভবের' ঐকারের জন্য ২য় পংক্তির বাকী দুই পদকের পঞ্চমাক্ষরে ঐরূপ স্বরোদ্ঘাত পড়িতেছে। যেখানে যেখানে যুক্তাক্ষরলাভের নিষ্ঠা জন্মিতেছে সেখানে সেখানে যুক্তাক্ষর দিলে ছন্দোহিল্লোলকে সুনিয়ন্ত্রিত করা হয়—

সুন্দর তব পায়—অর্পিনু আপনায় | সঙ্গীত—গাব নব | ছন্দে
তটে তটে বৈভব | বনে বনে সৌরভ | দেশে দেশে গৌরব | ঘোষণা।

যতিশেষে হসন্ত না থাকিলে আলোচ্যমান ছন্দের পক্ষে অধিক উপযোগী হয়। মিল না থাকিলেও চলে।

মঞ্জরী মধুপিয়ে | সঞ্চরে যত অলি | গুঞ্জরে মধুবন | কুঞ্জে
সুস্বরে গায় পাখী | নিঃশ্বসে মধুবায়ু | নিঃশেষ মনসিজ- | তূণ যে।

পংক্তির পথ অতি দীর্ঘ, সেজন্য ছন্দোহিল্লোলে দোলা দেওয়ার জন্য অন্ততঃ প্রত্যেক পদকে

একটি করিয়া যুক্তাক্ষর দিলেই ভাল হয়। কিন্তু যুক্তাক্ষর বাদ দিয়াও কি ছন্দের হিল্লোল রাখা যায় না? বর্ত্তমান বঙ্গভাষা হসন্তান্ত শব্দবহুল। ছন্দে হসন্ত বহুকাল 'লঘ্বী মাত্রা' বলিয়া অনাদৃত ছিল—রবীন্দ্রনাথ ও তৎশিষ্য সত্যেন্দ্রনাথ এই হসন্তের প্রচ্ছন্ন শক্তি লক্ষ্য করিয়া ছন্দে উহাকে আভিজাত্য দান করিয়াছেন। হসন্ত ছন্দের কুঞ্জে বসন্তের সমাগম ঘটাইয়াছে। হসন্ত কি এই ছন্দের হিল্লোল রাখিতে পারে না? লঘুস্বরান্ত ব্যঞ্জন এক মাত্রা, দীর্ঘস্বরান্ত ব্যঞ্জন দুই মাত্রা—এই দ্বিবিধ বিষম মাত্রার মিলনে সংস্কৃত ছন্দোহিল্লোলের সৃষ্টি হইয়াছে। হসন্তান্ত ব্যঞ্জনকে অর্দ্ধ মাত্রা ধরিলে স্বরান্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে মাত্রার বৈষম্য ঘটিতেছে—এই বৈষম্য বাংলায় একপ্রকার ছন্দোহিল্লোল সৃষ্টি করে। যদি যুক্তাক্ষরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাজান যায়—

র-বি-মন্-ড-ল-ছ-বি। জি-নি-ম-ণি-কুন্-ড-ল। সুন্-দ-র-সিন্-দূ-র। বিন্-দু।
জ-ল-দ-প ট-ল-ব-ল। দিন্-দু-বি-নিন্-দ-ক। চন্-দ-ন-তি ল-ক, ল। লা-টং।

প্রত্যেক পর্ব্বে আটটি করিয়া ব্যঞ্জন আছে এবং তাহার কতকগুলি আছে হসন্ত। ঠিক আট আটটি ব্যঞ্জন এবং মাঝে মাঝে হসন্ত দিয়া খাঁটী বাংলায় লিখিলে বাহ্যতঃ এই ছন্দই হইবে—

কে জানেলো রীত্ ওর্ | কে জানে চরিত্ ওর | যাবেনা সে মানা মোর্ | লজ্জি,
সাতাশের্ ঘর করে | সাতালি বাসর্ ঘরে | বাতাসে মাতাল্ করে | রঙ্গী।
শোন্ সখি শোন্ মুহু | কুহু কুহু কুহু কুহু | বুক্ ভরা সুখ নারে | বৈতে।
সে সুরের মনোহরে | জোছনার্ সরোবরে | শত তারা এলো জল সৈতে।

(সত্যেন্দ্র নাথ)

আবার—আরো হসন্ত বাড়াইলে—

কে গেছে কে যায়্ আর্ | অতশত ভাবনার | ফুর্সুৎ নেই আজ্ | বন্ধু,
তুমি আছ এই খুব | ধ্যানে ধরে ওই রূপ | ভর্পুর্ চিত্তের্ | তন্তু।

(সত্যেন্দ্রনাথ)

আলোচ্যমান ছন্দে আর এই ছন্দে মাত্রাগত কোন তফাৎ নাই। একই ছন্দ হইলেও দুয়ের মধ্যে বৈষম্যও যথেষ্ট। দীর্ঘস্বরমাত্রার সঙ্গে হ্রস্বস্বরমাত্রার মিলনে যে ছন্দঃস্পন্দ, হ্রস্বস্বরের সহিত হসন্তের মিলনে সে ছন্দঃস্পন্দ প্রবুদ্ধ হইতে পারে নাই। ১মটীর ছন্দঃস্পন্দ গুরুগম্ভীর ও মৃদুমন্থর, ২য়টির তরলচটুল ও দ্রুতসত্বর। যুক্তাক্ষরকে ভাঙিলে একটি হসন্ত আর একটি স্বরান্ত ব্যঞ্জন পাওয়া যায় এবং হসন্ত ব্যঞ্জন পরবর্ত্তী স্বরান্ত ব্যঞ্জনের সহিত মিলিয়া যুক্তাক্ষরের কাজ করে ইহা সত্য। কিন্তু যুক্তাক্ষর ভাঙিয়া যেমন একেবারে অনাত্মীয় ভাবে থাকিতে চাহে না—এক শব্দের হসন্ত ব্যঞ্জন তেমনি আত্মীয়বোধে অন্য শব্দের স্বরান্ত ব্যঞ্জনের সহিত সম্পূর্ণ মিলিতেও চাহেনা। ফলে যুক্তাক্ষর এ ছন্দে যে কাজ করে—হসন্ত, পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনের সহিত উচ্চারণে মিলিয়াও, সে কাজ করেনা। যুক্তাক্ষরবাহুল্য এই ছন্দকে মন্থরতার সঙ্গে শারদশ্রী দান করে,—হসন্তবাহুল্য চাঞ্চল্যের সঙ্গে বসন্ত-মাধুর্য্য দান করে। সত্যেন্দ্রনাথের

ছন্দের শব্দগুলির সহিত আমাদের অতিপরিচয়ও মূল ছন্দটিকে ভুলাইয়া দেয়। শব্দের গ্রাম্যতায় মূল ছন্দের নাগর বৈদগ্ধ্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এ ছন্দে পর্ব্বে পর্ব্বে মিলের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ নাই—অনুপ্রাসেরই প্রয়োজনীয়তাই অধিক। এ ছন্দের বর্ত্তমান রূপে অনুপ্রাসবাহুল্য অস্বাভাবিক লাগিবে—ভাবানুগতও হইবেনা। সমাসবদ্ধ পদ ও স্বরান্ত অক্ষর বাহুল্য যাহা এ ছন্দের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিকরে—তাহার স্থানও বর্ত্তমান রূপে নাই, স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ যাহা এ ছন্দকে শ্রুতিসুভগ করে—তার-ত কোন উপায়ই নাই।

যখন বাংলা ভাষায় আলোচ্যমান ছন্দোরচনা সঙ্গীত ছাড়া অন্যত্র তেমন স্বাভাবিক ও সহজপাঠ্য হইয়া উঠে নাই খাঁটী চল্‌তী বাংলায় ইহার পূর্ব্ব মর্য্যাদা রক্ষা করাও একেবারে অসম্ভব, তখন সত্যেন্দ্রনাথের দেওয়া রূপটিকেই উহার প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া জীবন্ত বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা চলিতে পারে। আলোচ্যমান ছন্দের কথা এ প্রবন্ধে শেষ হইল না—চতুর্থ পর্ব্বে মাত্রা বৃদ্ধিতে ও পর্ব্ব-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিতে এ ছন্দ যে নব নব রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহার কথা বারান্তরে হইবে। অন্যান্য ছন্দের কথা ক্রমশঃ বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকালিদাস রায়

চাঁদের আলোয়

আকাশ ছেয়ে ফুল ফুটেচে—তারারা সব রয় জেগে,
গঙ্গাজলে মাণিক জ্বলে চাঁদের আলোর রং লেগে,
ও পারেতে ঘুমিয়ে আছে নীরব নিঝুম গ্রামখানি,
জেলের ডিঙি ইলিশ মাছের চল্‌চে ছুটে তীরবেগে।

এলোমেলো হাল্কা হাওয়ায় মনের যত জোড়গুলো
আল্‌গা হয়ে যাচ্চে খসে—ভূঁইচাঁপা যূঁই বেলফুলও;
খুন বুঝি গো করবে ওরা সৌরভেরি শর হানি,
মর্ত্ত্যটাকে স্বর্গ বলে চোখে কে আজ দ্যায় ধূলো!

লাফিয়ে এসে আছড়ে ভাঙ্গে ঘুমপাড়ানি ছন্দেতে
ঢেউগুলি সব সানের ঘাটে—পাশেই উপবন যেতে
সোনার সরু হারের মত পথের রেখা যায় দ্যাখা,
আলোকের এই ঝরনাতলায় চোখ ফিরে পায় অন্ধেতে!

মরচে-পড়া প্রাণের তারে উঠচে বেজে করুণ সুর—
যৌবনেরি দিনগুলি সব পালিয়ে গেছে অনেকদূর,
অতীত শত স্মৃতির আগুন আঁতে দারুণ দ্যায় ছ্যাঁকা,
মুখখানি কার জেগে ওঠে চোখের আগে তন্দ্রাতুর!

অতীত কথা স্মৃতির ব্যথা মনের থেকে ফ্যাল্ ঝেড়ে,
দ্যাখ্ না কেমন চাঁদ উঠেচে মেঘের কোলে ফুল-পেড়ে!
প্রাণখানাকে ঝালিয়ে ফিরে নতুন করে রাঙিয়ে তোল্,
অন্ততঃ এই আজকে রাতে দিসনে ক্ষ্যাপা হাল ছেড়ে!

লে আও সুরা গোলাপ-রাঙা লে আও সেরা সুন্দরী,
বিফল যাবে আজ রজনী? আয়না উপভোগ করি;
দোহাই তোদের তুলিসনেকো ধর্ম্মনীতির গণ্ডগোল,
নীতি তোদের ফোঁপরা ভূয়ো—ধর্ম্মে গেছে ঘুণ ধরি!

ছুটবে হাসির প্রবল বন্যা—কোরবনাক অশ্রুপাত,
আজ নিশীথে গীতা মোদের ওমরখাঁয়ের রুবৈয়াত;
পরকালে নরক আছে? করবে সমাজ এক-ঘরে?
চোখ রাঙানির ভয়ে কাঁপে যে জন বেকুব হয় নেহাৎ!

* * * * * *

পাইনেকো স্বাদ রঙীন সুরায় ওষ্ঠসুধায় সুন্দরীর,
ঘনিয়ে আসে ম্লান অবসাদ, বিকল ক'রে দ্যায় শরীর,
বিষের বাটি চুমুক দিলি হায়রে বোকা ভুল কোরে!
ইঙ্গিতে ঐ কইচে আকাশ—ফেলচে তারা অশ্রুনীর!

চল্ ফিরে মন চলরে ফিরে প্রেমের যেথা প্রস্রবণ,
যেথায় রাধা রাসেশ্বরী বংশীধারী বৃন্দাবন,
কালিন্দীর ঐ কালো জলে মনের কালী ফ্যাল ধুয়ে,
মিলবে সুধা মিটবে ক্ষুধা টুটবে বাধা আর বাঁধন!

দ্যাও হে দ্যাখা যুগলরূপে হে পীতাম্বর শ্রীহরি!
চরণতলে হৃদয় আমার উঠুক ফুটে মুঞ্জরি,
বাজাও বাঁশী, আঘাত কর আমার প্রাণের তার ছুঁয়ে,
তোমার রূপের চাঁদের আলোয় ভুবন আমার দিক ভরি!

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতির সুখ

(১)

বেলা আন্দাজ আটটা কি সাড়ে আটটা হইবে। এইমাত্র বেশ জোর একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এবং বর্ষণটা আপাততঃ একটু থামিলেও শীঘ্রই যে আবার জোর করিয়া নামিবে, আকাশের অবস্থা দেখিয়া তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতেছিল।

মাণিকতলার বাজারটার ভিতর লোকের ঠেলাঠেলির অন্ত ছিল না। অনেকেরই বাজার করা শেষ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি আসিয়া পড়ায় বাহির হইতে না পারিয়া বাজারের মধ্যেই তাহারা এতক্ষণ গুলতুনি পাকাইতেছিল—সম্প্রতি একটু ধরিবার সম্ভাবনা দেখিয়া হুড় হুড় শব্দে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, এবং আকাশের পানে একবার তাকাইয়াই হন্ হন্ করিয়া যে যাহার গন্তব্য স্থলের দিকে পা চালাইয়া দিল।

বাজারের এই এক ঝলক্ ভিড়ের সহিত দুইটি স্ত্রীলোকও বাহির হইয়া আসিল,—একটি প্রৌঢ়া, অপরটি যুবতী। দুজনেরই হাতে বাজারের পুঁটলী, এবং তাহারি ভিতর হইতে একটা করিয়া পুঁই-ডগা বাহিরের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়া চলার দমকে দল্ দল্ করিয়া দুলিতেছিল।

স্ত্রীলোক দুটির পশ্চাতে হাতদশেক তফাতে একটি মোটাসোটা কালো লোক কাপড়টাকে হাঁটুর উপর তুলিয়া গুঁজিয়া একটা ছেঁড়া আধময়লা গেঞ্জি গায়ে বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে মৃদু-মন্থর-গতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে অগ্রবর্ত্তিনী স্ত্রীলোকদুটির দিকে নিতান্তই দয়া করিয়া বারেক চাহিয়া লইয়াই পরক্ষণেই পথের দুইপার্শ্বস্থ অট্টালিকাশ্রেণীর প্রতি এমনি একটা পরম চিন্তাশীল এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সঞ্চালিত করিতেছিলেন, যাহার দিকে চাহিয়া প্রত্যেকেরই সন্দেহ হইতে পারিত, কলিকাতা সহরের এই অঞ্চলটিতে সর্ব্বসমেত কয়টি বাড়ী আছে, প্রত্যেক বাড়ীর বিশেষত্ব কি, কোন বাড়ীটার কিরূপ আকার এবং গঠন-প্রণালী, বাড়ীগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণ আলো ও বাতাস খেলিতে পায় কি না ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক একটা অতিবড় গভীর এবং মৌলিক গবেষণায় উপনীত হইবার জন্য সম্প্রতি ইনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্ত্রীলোকদুটি ভিজিবার ভয়ে হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া চলিতেছিল, কিন্তু অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই চড়্ বড়্ চড়্ বড়্ করিয়া বৃষ্টি আসিয়া পড়ায় অদূরবর্ত্তী একটা গাড়ীবারান্দা লক্ষ্য করিয়া রীতিমত ছুটিতে সুরু করিয়া দিল।

একটি লোক অনেকক্ষণ হইতেই এই গাড়ীবারান্দাটার তলায় ফুটপাথের উপর একখানা খবরের কাগজ বিছাইয়া বসিয়া শতছিদ্র একটা পাতলা উড়ানী সুমুখে মেলিয়া পাতিয়া ভাঙ্গা

একটা হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছিল—সম্প্রতি বরুণদেবের কৃপায় বারান্দার তলায় যথেষ্ট পরিমাণ শ্রোতা পাইয়া, চক্ষু বুজিয়া, মস্তক নাড়িয়া, মুখবিকৃতি করিয়া এমনি একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিল, যেন মা-সরস্বতীর সহিত একটা চূড়ান্ত রকমের বোঝাপড়া না করিয়া সে আজ কিছুতেই এস্থান ত্যাগ করিয়া উঠিবে না।

স্ত্রীলোকদুটি ভিজিতে ভিজিতে গাড়ীবারান্দাটার তলায় আসিয়া যখন পৌঁছিল, তখন গানটি অস্থায়ী হইতে অন্তরায় গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং গায়কপ্রবর প্রাণপণ শক্তিতে মরিবাঁচি করিয়া চেঁচাইয়াও হারমোনিয়মের চড়াসুরের সহিত গলা ভিড়াইতে না পারিয়া নিতান্তই নিরুপায়ভাবে এমনি অদ্ভুত এবং বীভৎস একটা আর্ত্তনাদ কণ্ঠনালি দিয়া বাহির করিতেছিলেন, যাহা শুনিয়া এই দিবাভাগেও দূর হইতে যে কোনও ভদ্রলোক ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই ভয় পাইতে পারিতেন এবং হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গার জের যে এখনও পর্য্যন্ত সহর হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই, সে বিষয়ে সহরবাসী ভ্রাতৃবৃন্দকে অনায়াসেই সাবধান করিয়া দিতে পারিতেন।

স্ত্রীলোকদুটি বারান্দাটার তলায় আসিয়া পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল,—গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত অট্টালিকাতত্ত্ববিৎ সেই মোটা লোকটিও কখন এক সময় সেখানে আসিয়া মোতায়েন হইয়াছেন, এবং সম্প্রতি বারান্দাসংলগ্ন বাসভবনটির দেয়ালস্থিত অসংখ্য থিয়েটার এবং বায়স্কোপের প্ল্যাকার্ডগুলির ভিতর হইতে তাঁহার গবেষণার উপযোগী মালমসলা সংগ্রহে নিতান্তই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

সেই দিক পানে একবার তাকাইয়াই যুবতী তাহার সঙ্গিনীকে ঠেলা দিয়া কি একটা ইঙ্গিত করিতে যাইতেছিল—প্রত্যুত্তরে সংক্ষিপ্ততর একটা ইঙ্গিত পাইয়া হঠাৎ এমনি একটা ভাব ধারণ করিল যেন এরূপ লোক প্রতিদিন দুইবেলা ভিড় করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া থাকে, এবং এরূপ ঘটনা তাহাদের পক্ষে এমনই পুরাতন এবং একঘেয়ে যে এ বিষয়ে কোনরূপ আগ্রহ বা কৌতূহল প্রকাশ করাটা তাহাদের পক্ষে নিতান্তই অস্বাভাবিক এবং অশোভন দেখায়।

বাহিরে সমানভাবেই বৃষ্টি চলিতেছিল এবং ওস্তাদজী একটা গান শেষ করিয়া দ্বিতীয় একটি ধরিবার পূর্ব্বে গুন্ গুন্ করিয়া সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। লোকটির গায়ে একটা ছেঁড়া আধময়লা আদ্দির পাঞ্জাবী, মাথায় একরাশ তৈলহীন রুক্ষ চুল চক্ষু পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। চক্ষু দুটি বড় বড়, কিন্তু সম্প্রতি পরম নিঃস্বার্থভাবে কোটরপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়া স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ নাসাদণ্ডটির তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিবার পথ অনেকখানি সহজ এবং সুগম করিয়া দিয়াছে। গোঁফদাড়ি কামান, কিন্তু অনেকদিন যাবৎ ক্ষৌরকর্ম্ম না হওয়ায় অশৌচ অবস্থায় মানুষের গোঁফদাড়ির যে অবস্থা হয় তাহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মোটের উপর

সব জড়াইয়া সে যেন মূর্ত্তিমান একটা বিশৃঙ্খলা এবং অনাচার। লোকটিকে দেখিলে মনে হয়, হয়ত বা এককালে সে দেখিতে ভালই ছিল, এবং শরীরের দুই একটা স্থান একটু আধটু মেরামত এবং অদলবদল করিয়া লইলে হয়ত এখনও ভদ্রলোকের পাতে দেবার মত হইয়া দাঁড়ায়।

লোকটির চারিদিকে শ্রোতার দল ভিড় করিয়া মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়া থাকায় স্ত্রীলোকদুটি এই গায়কপ্রবরটিকে দেখিতে পাইতেছিল না;—দেখিবার আগ্রহও যে তাঁহাদের বিশেষ ছিল তাহা নয়। তাহারা ভিড় হইতে কিঞ্চিৎ তফাতে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে ঘন ঘন চাহিতেছিল, একটু ধরিলেই বাহির হইয়া পড়ে এইরূপ ভাবটা। ইতিমধ্যে সুরভাঁজার পালা শেষ করিয়া গায়কপ্রবর কখন এক সময় দ্বিতীয় গানের প্রথম কলি সুরু করিয়া দিয়াছিলেন এবং গানটি বেশ একটু নাচুনি ছন্দে চলিতে থাকায় শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিতর অনেকেই করতালি দিয়া, ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া, তুড়ি দিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী সঙ্গীর পিঠ চাবড়াইয়া এমনি একটা ভাব দেখাইতেছিল যেন একটা তবলা কিম্বা ঢোল কিম্বা মৃদঙ্গ, কিম্বা শ্রীখোল কিম্বা জগঝম্প, অথবা ঐ শ্রেণীর যে কোনও একটা চর্ম্মবাদ্য পাইলে তাহারা এতক্ষণে পিটিয়া, চাবড়াইয়া, এবং অবশেষে ফাঁসাইয়া সঙ্গতের একবারে চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িত।

গানটা বেশীদূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই হঠাৎ এক সময় বয়ঃজ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোকটি তার যুবতী সঙ্গিনীটির দিকে একবারমাত্র চাহিয়াই একটু বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "মরতে এগুচ্ছিস্ কোন্ চুলোয় ?"—এবং কোন উত্তর না পাইয়া কতকটা বিরক্ত এবং কতকটা বিস্মিত হইয়া যুবতীটির হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"মর্ যাচ্ছিস্ কোথায় শুনি ?"

হঠাৎ যেন সচেতন হইয়া উঠিয়া যুবতী মুহূর্ত্তমধ্যে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইল, এবং ব্যাপারটা যে নেহাতই সহজ এবং সাধারণ, তাহাই যেন প্রমাণ করিবার জন্য জোর করিয়া টানিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"দেখিই না—কে গান গায়।"

বিরক্ত হইয়া তার সঙ্গিনী বলিল, "তাই ব'লে একরাশ পুরুষমানুষের ভিড় ঠেলে যেতে হবে নাকি ?"

"তা বটে।"—বলিয়া যুবতী যেমন দাঁড়াইয়াছিল, তেমনিই দাঁড়াইয়া রহিল।

গান পুরাদমে চলিতেছিল;—বাহিরে বৃষ্টিরও বিরাম নাই। পথে একটি লোকও দেখা যাইতেছিল না,—কেবল কিছুদূরে মোড়ের মাথায় ওয়াটারপ্রুফে আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া সাদা রংএর ছাতি মাথায় দিয়া একটি পাহারওয়ালা গাড়ি-ঘোড়ার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল। হঠাৎ এক সময় প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি কি একটা কথা বলিয়া তাহার প্রত্যুত্তর না পাইয়া পার্শ্বে ফিরিয়া দেখে তাহার সঙ্গিনীটি সেখানে নাই। বিরক্ত হইয়া চারিদিকে চক্ষু ঘুরাইয়া অবশেষে আবিষ্কার করিল, যে-বাড়ীর বারান্দার তলায় তাহারা আশ্রয় লইয়াছে তাহারি উঁচু রকটার উপর

কখন এক সময় উঠিয়া পড়িয়া তাহার সঙ্গিনীটি একদৃষ্টে কাহার দিকে চাহিয়া এক জোড়া ক্ষুধার্ত্ত চক্ষু দিয়া তাঁহাকে যেন গিলিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিতেছে

ঠিক এই সময় বৃষ্টিটা হঠাৎ থামিয়া যাওয়ায় শ্রোতৃমণ্ডলী একমুহূর্ত্তে যে যেদিকে পারিল ছুটিতে সুরু করিয়া দিল; এবং দেখিতে দেখিতে বারন্দার তলদেশটি মেলা-শেষের বারোয়ারি-তলার মত খালি হইয়া গেল।

হঠাৎ এই আকস্মিক হট্টগোল এবং ঠেলাঠেলিতে সচকিত হইয়া উঠিয়া যুবতী যখন রকটার উপর হইতে নামিয়া আসিতেছিল—তখন তাহার সঙ্গিনী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"তোর আজ হয়েছে কি বল্‌ত?"—সেকথায় কর্ণপাত পর্য্যন্ত না করিয়া যুবতী সেই গায়কভিখারীটির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। লোকটি তখন মুখ নীচু করিয়া আপন মনে সম্মুখে বিস্তৃত উড়ানীটা হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পয়সা এবং আধলাগুলি তুলিয়া লইতেছিল এবং অর্দ্ধসমাপ্ত গানটার সুরটুকু মনে মনে গুন্ গুন্ করিয়া ভাঁজিয়া যাইতেছিল;—যুবতী তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল—"বিজয় ঠাকুর!"—সে স্বর অত্যন্ত করুণ এবং সহানুভূতিপূর্ণ।

আহ্বানকারিণীর মুখের দিকে একবার মাত্র চাহিয়াই গায়কের মুখখানা এমনি ফ্যাকাসে এবং পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিল, যেন পাম্প্ করিয়া কে তাহার শরীর হইতে সমস্ত রক্ত এক মুহূর্ত্তে বাহির করিয়া লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

যুবতী আবার ডাকিল—"বিজয় ঠাকুর!"

নূতন সাঁতার শিখিয়া জলে নামিয়া হঠাৎ কোনও কারণে একবার একটু ভীত বা বিচলিত হইয়া উঠিলে হঠাৎ মানুষের যেমন হাত-পা থামিয়া যায়, এবং ফলে জলের উপর ভাসিয়া থাকিতে না পারিয়া ক্রমেই নীচের দিকে তলাইয়া যাইতে থাকে, ঠিক তেমনি করিয়া এই লোকটি কি করিবে বা কি উত্তর দিবে তাহার কোন খেই খুঁজিয়া না পাইয়া ক্রমেই যেন অতলের দিকে তলাইয়া যাইতেছিল, এবং হঠাৎ হাতের গোড়ায় কি যেন একটা পাইয়া গিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া কোনও মতে ভাসিয়া উঠিল, এবং নিজেকে একমুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া অত্যন্ত বেখাপ্পা এবং অসংলগ্নভাবে বকিয়া যাইতে লাগিল—"পূর্ব্ববঙ্গের বন্যায়ডোবা নিরাশ্রয় লোকদের জন্যে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছি।" সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল—হঠাৎ যুবতীর মুখে চোখে যে অকৃত্রিম এবং পরম আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং প্রশংসার ভাবটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহারি দিকে চাহিয়া সহসা থামিয়া গেল, এবং ইহার পরেও এই জিনিষটাকে লইয়া বক্তৃতা করিয়া হাত মুখ নাড়িয়া অধিকদূর অগ্রসর হইবার মত উৎসাহ এবং আগ্রহ তাহার আর একটুও রহিল না।

ঠিক এই সময় দুচারটি লোককে সেইদিক পানে অগ্রসর হইতে দেখিয়া লোকটি হঠাৎ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, এবং মুখ নীচু করিয়াই বলিয়া উঠিল—"তুমি তাহলে এখন যাও—

পয়ে এইখানেই দেখা হবে'খন,—ভদ্রলোকেরা এইদিক পানে আসছে—।" এক নিমিষে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত এবং লজ্জিতভাবে যুবতী সেখান হইতে চলিয়া আসিল এবং পশ্চাৎবর্ত্তিনী বয়ঃজ্যেষ্ঠা সঙ্গিনীটিকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া লইয়া মাণিকতলার রাস্তা ধরিয়া বরাবর উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

(২)

সে আজ অনেক কালের কথা,—ছাতরা গ্রামের স্বনামধন্য মহেশ অধিকারী তখনও জীবিত, এবং তাঁর বিখ্যাত যাত্রার দলটি তখনও পর্য্যন্ত পুরাদমে চলিতেছে। এমনি সময় অধিকারীর দূর সম্পর্কীয় সদ্যঃ-অনাথ এক ভ্রাতুষ্পুত্র কোথা হইতে হঠাৎ আসিয়া তাহার সংসারে আশ্রয় লইল, এবং কিছুদিনের মধ্যেই প্রমাণ করিয়া দিল, তাহার এই আকস্মিক আগমনে অধিকারীর সংসারের মাপা চাউলের ভাগ যত খানিই বাড়ুক না কেন, তাহা সুদসুদ্ধ পরিশোধ করিয়া দিবার মত ক্ষমতা ভগবান তাহাকে প্রচুর পরিমাণে দিয়াছেন—যদিও প্রথমটা সে তার এই গুপ্ত পুঁজির সন্ধান নিজেই জানিত না।

ছেলেটির বয়স ছিল তখন ১৯ কি ২০। কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি কাঁধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে;—দেহখানি ক্ষীণ অথচ কোমল এবং সুঠাম। বর্ণ গৌর, চক্ষুদুটি ডাগর এবং ভাসা ভাসা, এবং দৃষ্টি বড়ই করুণ এবং সজল। একটা স্বপ্নের আমেজ দিবারাত্র যেন চোখ দুটিতে লাগিয়া রহিয়াছে।

একরাশ সৌন্দর্য্যের পশ্চাতে এই অনাথ অসহায় সুন্দর নব কিশোরটি যে দিন করুণ এবং অশ্রুময় জীবন ইতিহাস লইয়া, তাহারি মত করুণ এবং সজল এক ক্ষান্তবর্ষণ আষাঢ় সন্ধ্যায় এই ছোট গ্রামখানির বুকে আসিয়া আশ্রয় লইল, সেদিন তাহারি করুণ এবং অবসাদক্ষুণ্ণ সুরটুকু গ্রামের প্রত্যেক নরনারীর বুকে বেশ একটু দরদের আমেজ জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

অধিকারী যখন দেখিল এই অপগণ্ড ছেলেটা নিতান্তই ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে, এবং সহজে নড়িবার কোন লক্ষণ দেখাইতেছে না, তখন সে মনে মনে স্থির করিল, ঘরে বসাইয়া, না খাওয়াইয়া, ইহাকে যাত্রার কোন কাজে লাগাইতে পারা যায় কিনা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গেই ডাক পড়িল গোবর্দ্ধন ওস্তাদের—"পরীক্ষা করুন ত ওস্তাদজী, এর গলায় গান হবে কি না।" বাজখাই-কণ্ঠ ওস্তাদজী ঘণ্টাখানেক ধরিয়া নিজে চেঁচাইয়া এবং এই নূতন ছেলেটিকে দিয়া চেঁচাইয়া লইয়া অবশেষে এই সত্যে উপনীত হইলেন যে, ছেলেটির গলা নেহাত মন্দ নয়—তবে কিনা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ কিনা, গলাটা নিতান্তই সহজ এবং সরলভাবে' মিষ্ট এবং শ্রুতিমধুর; সুতরাং ওস্তাদজনোচিত কর্কশ এবং বাজখাই

করিয়া তুলিতে একটু সময় লাগিবে ; অন্যথা, গলা বেশ সুরে আছে এবং ছোকরার মাথায় লয়ও মন্দ নাই।

পূজার সময় মহেশ অধিকারীর দল জমিদার বাড়ীতে মেঘনাদ বধের পালা গাহিল। বিজয় নামক এই আনকোরা নূতন ছেলেটিকে দেওয়া হইয়াছিল প্রমীলার সখীর ভূমিকা। নিতান্তই ছোট পার্ট। বার দুয়েক মাত্র আসরে নামিতে হইবে, এবং কাজের মধ্যে গোণা দুখানি গান গাওয়া মাত্র। কিন্তু সেদিনকার সেই আসর রামও রাখিল না, ইন্দ্রজিৎও রাখিতে পারিল না,—রাখিল সেই অপগণ্ড শিক্ষানবীশ ছেলেটি,—এক্টিনী করিয়াও নয় বক্তিমের জোরেও নয়—শুধু কেবল ছোট্ট দুটি গান গাহিয়া।

জমিদার বাবু কলিকাতার লোক। বৎসরান্তে একবার কেবল পূজার সময় গ্রামে ফিরিয়া পৈতৃক ভদ্রাসনে ধুমধাম করিয়া পূজা সারিয়া আবার কলিকাতার ফিরিয়া যাইতেন। যাত্রা শেষ হইয়া গেলে পর জমিদার বাবু প্রতিবৎসর একটি স্বর্ণপদক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে পুরস্কার দিতেন, এবারও দিলেন, কিন্তু পাইল যে ব্যক্তি, সে মহেশ অধিকারীও নয়, গোবর্দ্ধন ওস্তাদও নয়, সে ঐ শিক্ষানবীশ অপগণ্ড ছেলেটা কাঁচা গলায় দুটি মাত্র গান গাহিয়া।

ইহার কয়েকদিন পরেই অধিকারীর দল রক্ষাকালী পূজা উপলক্ষে গ্রামের বারোয়ারী তলায় যাত্রা গাহিল। পালা ছিল "সীতার বনবাস"। এবার বিজয়কে দেওয়া হইয়াছিল রামের ভূমিকা।

গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সন্ধ্যা না হইতেই বারোয়ারী তলায় আসিয়া কাতারে কাতারে বসিয়া গিয়াছে। সীতার বনবাসের পালা তাহারা অনেকবার শুনিয়াছিল। কিন্তু এবার রাম আসিয়া যখন সভায় নামিলেন—সকলে অবাক!—এত রূপ বুঝি মানুষের হয় না। ইতিপূর্ব্বে যে ছোকরা রাম সাজিত তাহার সহিত রামের সৌসাদৃশ্য ছিল কেবল বর্ণে, এবং ঐ অজুহতেই তিনি এ যাবৎকাল গাঁজা খাইয়া খাইয়া চক্ষু এবং গণ্ডদ্বয় কোটরে প্রবৃষ্ট করাইয়া দিয়াও দিব্য নিশ্চিন্তমনে হরধনু-ভঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া রাবণবধ আবধি সমস্ত দুঃসাধ্য কার্য্যই অনায়াসে সুসম্পন্ন করিয়া আসিতেছিলেন, এবং গ্রামবাসীরা এই চোয়াল-বড় দাঁত-উঁচু কালো ম্যাংলা ছেলেটার রামসাজা-রূপ দুর্ঘটনাটার সহিত এমনই একান্তভাবে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, ইহার বিপক্ষে কোনরূপ প্রশ্ন কোন দিনই তাহাদের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিত না। আজ কিন্তু তাহারা এই নূতন রামচন্দ্রটিকে আসরে নামিতে দেখিয়া সত্য সত্যই অবাক হইয়া গেল, এবং এক মুহূর্ত্তে এই নূতন রামটির মুখশ্রী এবং অঙ্গলাবণ্য সত্যকার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর এবং মনোরম হইয়া তাহাদের চিত্তকে নিমেষে অধিকার করিয়া ফেলিল। কারণ এই রূপলাবণ্যের পশ্চাতে ছিল একটি অতিবড় করুণ এবং অশ্রুময় ব্যর্থতার ইতিহাস, যাহা এই সুন্দর তরুণ ছেলেটির চারিদিকে একটি স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। তাই

এই নূতন রামচন্দ্রটিকে আসরে নামিতে দেখিয়াই স্ত্রীলোকদের চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। এবং গয়লা-গিন্নীর সহিত তার যে কিশোরী নাতনীটি যাত্রা শুনিতে আসিয়াছিল তাহার বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ দুটিও সেদিন তার পিতামহীর নিষ্প্রভ জ্যোতিহীন চক্ষু দুটির সহিত একই সঙ্গে কেন কে জানে সহসা সজল হইয়া উঠিয়াছিল।

পালা শেষ হইল সীতার পাতালে প্রবেশ দেখাইয়া। এবার পুরুষদের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল, আর মেয়েদের চক্ষে একেবারে ধারা বহিতে সুরু করিয়া দিল। সকলেরই দুঃখ জন্মদুঃখিনী জানকীর জন্য। গোয়ালাদের সেই মেয়েটাও কাঁদিল—একটু আধুট নয়,—একেবারে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া, কিন্তু সীতার দুঃখে নয়—রামচন্দ্রের জন্য। তার ছোট্ট বুকখানির মধ্যে এই কথাটাই ক্রমাগত ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতেছিল—এই ছেলেটি কি জন্মিয়াছে শুধু কেবল কাঁদিতেই?—তার মনে হইতে লাগিল—কেহ যদি কিছুমনে না করিত, তাহা হইলে সে ঐ সুন্দর তরুণ ছেলেটিকে ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আসিত, "তোমার মনে কি এতটুকুও সুখ নেই?"

গোয়ালাদের এই যে ষোড়শী মেয়েটি, ইহার ক্ষুদ্র জীবন ইতিহাসখানি যেমন করুণ তেমনি অশ্রুময়। আট বৎসর বয়সের সময় তার বিবাহ হয় ওপাড়ার চন্দর গয়লার একমাত্র পুত্র সনাতনের সহিত। চন্দরদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল—সে নিজে লোকও মন্দ ছিল না নেহাত; কিন্তু ছেলেটা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল একেবারে লক্ষ্মী-ছাড়া এবং হাড়হাবাতে। পুত্রের বিবাহের একটি বৎসর পরেই চন্দর গোয়ালার হইল স্বর্গলাভ, এবং সনাতন হঠাৎ এমনি বাড়াবাড়ি সুরু করিয়া দিল যে তার বিধবা মা অবশেষে বাধ্য হইয়া কাশীবাসী হইলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই হঠাৎ একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে মানদা তার বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিল—গায়ে তার একখানিও অলঙ্কার নাই। কিন্তু প্রহারের চিহ্ন আছে প্রচুর। মানদার মা ছিল না, ঠাকুর মার নিকটেই সে মানুষ হইয়াছিল—আজ আবার ঠাকুর মার কোলেই ফিরিয়া আসিল।

ইহার পর পাঁচ ছ'বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মানদা এখন আর বালিকাটি নাই—সে এখন ষোড়শী। স্বামীর উপর তার একটুও টান ছিল না—এতটুকুও না। তার স্বামীও আজ পাঁচ ছ বৎসর হইল তার কোন খোঁজখবর লয় নাই। মানদার বাপ অবশ্য মধ্যে মধ্যে জামাতার সংবাদ লইতে চেষ্টা করিত, কিন্তু বিশেষ কিছুই সন্ধান পাওয়া যাইত না, কেন না সে যে দেশত্যাগী হইয়া কোথায় কোথায় ঘুরিয়া মরিতেছিল কেহই তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিত না;—কেহ বলিত, কলিকাতায় গিয়া কয়েকদিনের মধ্যেই সর্ব্বস্ব উড়াইয়া দিয়া সে এখন কলিকাতারই অমুক অঞ্চলে প্রাণী বিশেষের দালালী করিয়া, এবং বড়লোকের ছেলেদের মস্তক চর্ব্বণ করিয়া কোনও রকমে দিন গুজরান করিতেছে। আবার কেহ কেহ বলিত, সে নাকি কোথায় কি একটা মহৎকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়া সম্প্রতি জেলে পচিতেছে। মোট কথা কেহই তাহার সঠিক সংবাদ জানিত না, এবং জানিতে চাহিতও না। মানদার বিবাহ হইয়াছিল

—আট বৎসর বয়সের সময়, যে সময় সে বুঝিতই না বিবাহটা কি, এবং স্বামী নামক জীবটির সহিত তাহার সম্পর্কটা কোন্ শ্রেণীর। তাহার পর ১০ বৎসর বয়সের সময় হইতে স্বামীর সহিত তাহার ছাড়াছাড়ি, আর আজ তার বয়স হইতে চলিল সতেরর কাছাকাছি, যে সময় দুনিয়াটা শুধু সুন্দর নয়, স্বপ্নময় এবং আবেশমধুর।—জীবনের এই স্বপ্নময় ক্ষণটিতে কোথা হইতে আসিয়া জুটিল এই সুন্দর তরুণ ছেলেটি, তাহার অশ্রুময় জীবন কাহিনীর মাদকতা লইয়া ;—মানদার চক্ষে সমস্ত দুনিয়াটা এক মুহূর্ত্তে করুণ এবং বেদনাতুর হইয়া উঠিল।

সেদিনকার সেই যাত্রার আসরে রামকে দেখিয়া এবং তাহার গান শুনিয়া যাহারা সত্য সত্যই মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হরিহর জ্যোতির্ভূষণ একজন। এই হরিহর পণ্ডিতটি জ্যোতিষ শাস্ত্রটাকে নাকি বেমালুম হজম করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং যে কোনও ব্যক্তির জীবনে ১০—১২ বৎসর পর কি কি ঘটনা ঘটিবে তাহা খুব জোর গলায় গণিয়া বলিয়া দিতে পারিতেন,—কারণ এই অশীতিপর বৃদ্ধ জ্যোতির্ভূষণটি খুব ভাল করিয়াই জানিতেন, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী গুলির সত্যতা যাচাই করিয়া লইবার যখন সময় আসিবে, সে সময় তিনি তাহার ফলাফল শুনিবার জন্য ইহ জগতে বসিয়া থাকিবেন না। এহেন মহামহোপাধ্যায় হরিহর জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের কেন কে জানে হঠাৎ একদিন খেয়াল হইল বিজয় নামক ঐ সুন্দর অনাথ ছেলেটির হস্তরেখা পরীক্ষা করিবেন। তাহার পরই গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, হরিহর জ্যোতিষী হাত দেখিয়া বলিয়াছেন—এই দরিদ্র অনাথ ব্রাহ্মণতনয়টি সাধারণ মনুষ্য নয়—তাহার মধ্যে মহাপুরুষের লক্ষণ বর্ত্তমান ; যার চোখ আছে সে দেখিতে পাইবে, যার নাই, সে কোথা হইতে দেখিবে ? ইহার পর কিন্তু দেখা গেল—গ্রামের সকলেরই চোখ আছে এবং সকলেই দিব্য চক্ষে দেখিতে লাগিল, এই ছেলেটি সত্য সত্যই সাধারণ মনুষ্য নয়, তাহার মুখ চোখ দিয়া কি যেন একটা দিব্য জ্যোতি বাহির হইতেছে, এবং সে যেখান দিয়া চলিয়া যায় সে স্থানের বায়ুমণ্ডল সহসা পুষ্পগন্ধী হইয়া উঠে—এমনি আরও কত কি তাহারা দেখিল ও শুনিল, এবং এই যুবকবেশী মহাপুরুষটীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তাহাদের অন্তরগুলি ক্ষণে ক্ষণে ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে লাগিল। এই কথাটা যখন মানদার কানে গিয়া পৌছিল—সে তখন এতটুকুও আশ্চর্য্য হইল না ; তার মনে হইতে লাগিল, ঠিক এই কথাটাই সে হয়ত না গুণিয়া এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্য না লইয়াও অনায়াসে বলিয়া দিতে পারিত। এই সুন্দর তরুণ ছেলেটি যে সাধারণ লোকের মত শুধু কেবল খাইয়া, ঘুমাইয়া এবং সংসারের জন্য খাটিয়া যাইবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই তাহা কেমন করিয়া কে জানে এই তরুণীটি অনেক পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিল, এবং মনে মনে এই বলিয়া প্রচুর গর্ব্ব এবং আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল যে, এই সুন্দর তরুণ ছেলেটিকে সকলের পূর্ব্বে সে চিনিয়া ফেলিয়াছে—গণনা করিয়া নয়—অঙ্ক কসিয়া নয়—একবার মাত্র চোখে দেখিয়া।

ইহার কয়েকদিন পর শরতের এক ক্ষান্তবর্ষণ মৌন সন্ধ্যায় নদীতে জল আনিতে গিয়া মানদা দেখে—নদীতীরে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছ ঠেস দিয়া সেই করুণ, অতিকরুণ যুবকটি অন্যমনস্কভাবে সূর্য্যাস্তের পানে অনিমেষনয়নে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিক তখন অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল—কোথাও জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। স্বপ্নময় সন্ধ্যা, এবং তার চেয়েও স্বপ্নময় দুটি কিশোর-কিশোরী। বাস্তব জগতের কর্ম্মকোলাহল ক্ষীণ হইতে ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল; সমগ্র সৃষ্টি তাহার রাশি রাশি বস্তুপিণ্ড সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে ঢাকিয়া ফেলিয়া স্বপ্নময় এবং অবাস্তব হইয়া উঠিয়াছে।

তরুণ ছেলেটি অনেকক্ষণ হইতেই অন্যমনস্ক হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিল—হঠাৎ কাহার পদশব্দে সচকিত হইয়া চাহিয়া দেখে—তাহার পদপ্রান্তে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেছে একটি তরুণী।

"কে?—কে তুমি?"

তরুণী কোন উত্তর দিল না—কেবল ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া করুণনয়নে একবার সেই ছেলেটির সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিশিয়া গেল। আর সেই তরুণ ছেলেটি মিনতিমাখা একজোড়া সজল চক্ষুর মুগ্ধ দৃষ্টি এবং তাহারি করুণ অতিকরুণ স্বপ্নময় আবেশ-মধুর সুরটুকু বুকে লইয়া সেই নদীতীরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্বপ্নাবিষ্টের মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া অনেক রাত করিয়া বাড়ী ফিরিল।

সে রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া মানদা মাথা ধরার ছল করিয়া কিছু না খাইয়াই শুইয়া পড়িল;—কেন কে জানে তার আজ ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিতে ইচ্ছা যাইতেছিল। একি করিল সে?—সেই দেবচরিত্র তরুণ ব্রহ্মচারিটি না জানি কি ভাবিতেছে এতক্ষণ! হয়ত তাহার সম্বন্ধে এমনই সব খারাপ ধারণা করিতেছে যাহা সে হয়ত কল্পনাও করিতে পারে না। সে অবশ্য কিছুই করে নাই—শুধু কেবল নীরবে একটি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহার মত সমস্ত মেয়ের পক্ষে অপরিচিত তরুণ একটি যুবককে গোপনে চুপি চুপি গিয়া প্রণাম করিয়া আসাটা কতদূর যে শোভন হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? তার মনে হইতে লাগিল,—হয়ত এই দেবতুল্য তরুণ যুবকটি তাহার আজিকার এই পরম আকস্মিক ব্যবহারটার মধ্যে শিষ্টতা এবং নারীসুলভ লজ্জা ও সঙ্কোচের অভাব লক্ষ্য করিয়া মনে মনে তাহার সম্বন্ধে কত কিনা ভাবিতেছে। হয়ত তাহার এই দুর্ব্বলতা দেখিয়া এই পরম উদাসীন নির্লিপ্ত ছেলেটি মনে মনে ভাবিতেছে—'ইহারা কি দুর্ব্বল'—এবং তাহার বড় বড় চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসিতেছে। জীবনের কোন্ এক স্বপ্নময় উচ্ছ্বাসময় মুহূর্ত্তে যে কাজটা সে অতি সহজে, আপনা হইতেই করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই কাজটাই বাস্তব জগতের রাশি রাশি বস্তুপিণ্ডের সহিত একত্র করিয়া দেখিবার সময় মানদার নিকট এমনই বিসদৃশ এবং কদর্য্য ঠেকিতে লাগিল, যে

এই অতিবড় নির্লজ্জের কাজটা সে যে কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে কেমন করিয়া করিল—তাহা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

আরও প্রায় এক মাস কাটিয়া গিয়াছে, মানদা আর নদীতে জল আনিতে যায় না—পাছে আবার চোখাচোখি হইয়া যায়; পাছে আবার কি একটা দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া সে এই পরম পবিত্র দেবচরিত্র তরুণ যুবকটির নিকট নিজেকে অপরাধী করিয়া তুলে।

পরদিন সন্ধ্যার সময় বিজয় আবার সেই নদীর তীরে গিয়া বসিল;—আবার সেই সূর্য্যাস্তের দেশে গাছপালা সব ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া উঠিল—সন্ধ্যার আবছায়া দেখিতে দেখিতে স্বপ্নের মত রহস্যময় এবং মদির হইয়া উঠিল। যুবক আকুল আগ্রহে বসিয়া রহিল। যদি আবার সেই এক জোড়া করুণ চক্ষু সন্ধ্যার এই আবছায়ার মধ্যে সহসা ভাসিয়া উঠে। সেদিন কিন্তু কেহই আসিল না,—যুবক অনেক রাত পর্য্যন্ত নদীতীরে বসিয়া থাকিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিল।

এমনি করিয়া প্রায় এক মাস ধরিয়া এই সুখস্বপ্নটাকে আর একবার ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিজয় সেই নদীতীরে প্রত্যহ গিয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া কোন স্বপ্নই দেখা যায় না—এ স্বপ্নটাও দেখা গেল না।

ইহার পর আরও একটা মাস কাটিয়া গিয়াছে,—সেদিন বৈকালের দিকটায় বিজয় নামক এই তরুণ ছেলেটি গ্রামের মেটে পথ ধরিয়া চলিতেছিল, হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল—"ঠাকুর!"—ফিরিয়া দেখে একটি বৃদ্ধা এবং একটি তরুণী।—বিজয় থমকিয়া দাঁড়াইল—হঠাৎ তার মনে হইল জাগিয়া জাগিয়া সে স্বপ্ন দেখিতেছে—। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে যে মিনতি-পূর্ণ সকরুণ দৃষ্টি স্বপ্নের মত একদিন তার চোখের উপর সহসা ভাসিয়া উঠিয়া স্বপ্নের মত করিয়াই সহসা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছিল, আজিকার এই তরুণীটির ডাগর ডাগর ভাসা ভাসা চক্ষু দুটি সে স্বপ্নময় করুণ দৃষ্টি কোথা হইতে কেমন করিয়া পাইল? মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজেকে ভুলিয়া গিয়া বিজয় স্বপ্নাবিষ্টের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধা আবার ডাকিল—"ঠাকুর!"

এক মুহূর্ত্তে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া, চোখ নীচু করিয়া অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং কম্পিত কণ্ঠে বিজয় বলিল—"আমাকে ডাকছেন?"

"হ্যাঁ বাবা ডাকছিলুম—একটু দাঁড়াও পায়ের ধূলো নেবো।"

বৃদ্ধা আসিয়া পায়ের ধূলো লইল—তাহারি দেখাদেখি তরুণীও প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজয় কোন কথা বলিল না—আজ প্রথম সে উপলব্ধি করিল সত্যই সে সাধারণ মানুষ নয়—এবং এই যে ষোড়শী তরুণীটি তাহাকে প্রণাম করিয়া গেল—ইহাকেও ঠিক সাধারণ ঘটনা বলিতে পারা যায় না।

ইহার কয়েক দিন পরেই হঠাৎ একদিন মহেশ অধিকারী হার্টফেল করিয়া মারা পড়িল, এবং তাহার যাত্রার দলটিও সঙ্গে সঙ্গে তাসের বাড়ীর মত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক নিমেষে তচ্ নচ্ হইয়া গেল।

অধিকারীর যাত্রার দলই যখন উঠিয়া গেল, তখন বিজয় আর এখানে থাকিয়া কি করিবে?—স্বপ্নের মত এই সুন্দর তরুণ ছেলেটি কোথা হইতে সহসা আসিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির বুকের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছিল, আবার স্বপ্নের মতই একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় যে চলিয়া গেল—কেহই তাহার সন্ধান পাইল না।

এই ঘটনার ঠিক একটি বৎসর পর সহসা একদিন কি মনে করিয়া ছাতরাগ্রামে ফিরিয়া বিজয় যাহা শুনিল, তাহাতে তার বক্ষের স্পন্দন পর্য্যন্ত সহসা বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম করিল—সে শুনিল, গোয়ালাদের সেই করুণ বড়করুণ সুন্দর মেয়েটি ও-পাড়ার কে-একটা ছোঁড়ার সহিত সহসা একদিন কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে।

ইহার পর আজ ৭।৮ বৎসর এই দুটি তরুণ তরুণী পরস্পরকে একটিবারের জন্যও দেখিল না, এবং হয়ত বা তাহারা পরস্পরকে ভুলিয়াই গিয়াছিল—তাহার পর হঠাৎ একদিন দুজনের দেখা মাণিকতলার বাজারের নিকট, কলিকাতার জনাকীর্ণ রাজপথের অসংখ্য বাস্তবতার মধ্যে। একজন ফুটপাথের ধারে বসিয়া গান গাইয়া ভিক্ষা করিতেছে,—আর অপর একজন যে কি, তাহা আর নাই বা বলিলাম।

সেই যে সেদিন মাণিকতলার বাজারের নিকট মানদার সহিত বিজয়ের হঠাৎ দেখা হইয়া গেল, তাহার পর হইতে প্রতিদিনই মানদা, সেই বারন্দাটার তলায় গিয়া খোঁজ করিত, যদি বিজয়ের সহিত দেখা হয়—কিন্তু একদিনও দেখা হইল না। তার সঙ্গিনীরা তাহাকে ঠাট্টা করিত—"এত লোক থাকতে ইত্যাদি—"। সে কোন কথা বলিত না—চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, এবং মনে মনে ভাবিত—কেমন করিয়া ইহারা বুঝিবে, কতবড় লোক এই বিজয় ঠাকুর! সে মনে মনে ভাবিল, হয়ত ইচ্ছা করিয়াই সে তাহাকে দেখা দিতেছে না—সে যে আজ—, মানদার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল। আজ কৃত উঁচুতে উঠিয়াছে তাহাদের সেই বিজয় ঠাকুর, আর কোন্ অতলে পড়িয়া সে আজ অন্ধকারের মধ্যে হাঁপাইয়া মরিতেছে। কোথায় কোন্ দেশ বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহারি দুঃস্থ বিপন্ন নরনারীদের জন্য বিজয় আজ কি দীনতাই না স্বীকার করিয়া লইয়াছে?—কাঁধে তার ভিক্ষাঝুলি—পরণে তার ছিন্ন মলিন বেশ—মুখে তার সে হাসি নাই—দেহ তার ক্ষীণ শুষ্ক লাবণ্যহীন,—পরের জন্য সে আজ সর্ব্বস্ব দিতে বসিয়াছে। মানদার চক্ষে জল আসিল। ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তার বুকখানা ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

সেদিন রবিবার। রাত তখন ৮টা কি ৮॥০টা হইবে। মানদা এবং সে বাড়ীর আরও

কয়েকটি স্ত্রীলোক প্রতিদিনকার মত সাজিয়া গুজিয়া বাড়ীর দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সহসা দূর হইতে শোনা গেল, কাহারা যেন গান গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইতেছে। পার্শ্বস্থ সঙ্গিনীটিকে ঠেলা দিয়া মানদা জিজ্ঞাসা করিল—"ও কিসের গান বেরিয়েছে দিদি ?"

বিড়িটাতে শেষটান দিয়া সেটাকে পথে ফেলিয়া দিয়া সঙ্গিনীটি উত্তর দিল—"ঐ যে বন্যায় কোন দেশ ভেসে গেছে না, তাদেরি জন্যে—"। কথাটা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সহসা কি মনে করিয়া মানদা ফুটপাথ হইতে নামিয়া পড়িল, এবং ছেলেদের সেই ভিড়ের মধ্যে নির্ব্বিকার ভাবে ঢুকিয়া পড়িয়া পাগলের মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সকলের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল--যদি তাহাদের মধ্যে সে বিজয় ঠাকুরকে দেখিতে পায়। তার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল—এই যে ভদ্রলোকের ছেলেরা পথে পথে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে, এ পথ দেখাইয়াছে সেই তাহাদের গ্রামের বিজয় ঠাকুর। কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও এই দলটির মধ্যে সে বিজয় ঠাকুরকে না দেখিতে পাইয়া, মনে মনে স্থির করিয়া লইল, আড়াল হইতে সেই এসব করিতেছে। এক মুহূর্ত্তে নিজের কান হইতে ছোট্ট দুটি ইয়ারিং খুলিয়া লইয়া ভিক্ষার জন্য বিস্তৃত বস্ত্রখণ্ডটার উপর ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে বাড়ী ফিরিয়া আসিল, এবং নিজের শয়নকক্ষে শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িয়া ছোট্ট মেয়ের মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।—হায়, কেন সে নারী হইয়া জন্মিল। পুরুষ হইলে আজ সে দুনিয়ার কত কাজেই লাগিতে পারিত।

এই যে জীবনজোড়া ব্যর্থতার শূন্যতা—ইহাকে কি দিয়া সে আজ ভরিয়া তুলিবে ? তার মনে হইতে লাগিল—এবার যেদিন বিজয়ের সহিত তার দেখা হইবে, সে তার পাদুটো জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে—এই বিশাল বিশ্বদুনিয়াটার কোন মঙ্গল-কার্য্যে তার মত পতিতার কি কোন প্রয়োজন হইতে পারে না ? না না, এমন করিয়া তিল তিল করিয়া নরকের দিকে অগ্রসর হইতে সে আর পারে না। যে করিয়া পারে সে হাতে পায়ে ধরিয়া একটা কিছু ভালো কাজে লাগিয়া যাইবে। হইলই বা সে কলঙ্কিনী, হইলই বা সে পতিতা, তাই বলিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলে সে কি তাহাকে ক্ষমা করিবে না ?—এক মুহূর্ত্তে ৮ বৎসর পূর্ব্বেকার একটি তরুণ সুন্দর ছেলের করুণ দুটি ডাগর চক্ষু তাহার চোখের উপর স্বপ্নের মত ভাসিয়া উঠিল—সে মনে মনে চীৎকার করিয়া উঠিল—"নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই !"

সহসা কে তাহার দরজায় টোকা মারিল।

"কে ?"

"আমি সরলা,—দরজাটা খুলে দে।"

দরজা খুলিয়া মানদা দেখে অন্ধকারে সরলার পশ্চাতে একটু দূরে কে একটি লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

হাতের লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিয়া সরলা বলিয়া উঠিল, "কেমন গো পচন্দ হয় কি না ?—আমার বকশিস্‌টা কিন্তু—"

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, সহসা কিসের শব্দে চমকাইয়া উঠিয়া ফিরিয়া দেখে অন্ধকারে মেঝের উপর পড়িয়া মানদা গোঁ গোঁ করিতেছে। তাড়াতাড়ি কি করিবে না করিবে স্থির করিতে না পারিয়া আগন্তুক লোকটির নিকট হইতে সাহায্যের প্রত্যাশা করিয়া কি বলিতে গিয়া সরলা দেখে লোকটি কখন এক সময় সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

নৃত্যগোপাল

নৃত্যগোপাল নৃত্য করে নন্দ-নাচে—
সৃষ্টি জুড়ে' ছন্দ বাজে!
সে নৃত্যেরি তালে-তালে
পৃথ্বী নাচে কালে-কালে,
নাচে গ্রহ উপগ্রহ,
সূর্য্য তারা চন্দ্র নাচে ;—
সৃষ্টি জুড়ে' ছন্দ বাজে!

আঁধার-আলোয় সাদা-কালোয় আকাশ নাচে—
বিনাশ নাচে, বিকাশ নাচে!
মরু-মাটির মর্ম্ম-তলে
ফল্গু নাচে নর্ম্ম-ছলে,
সাগর নাচে জোয়ার ভাটায়—
স্পন্দ-ঢেউয়ের মন্ত্র বাজে ;
সৃষ্টি জুড়ে' ছন্দ বাজে!

নৃত্যগোপাল নৃত্য করে নন্দ-নাচে—
মিলন নাচে, দ্বন্দ্ব নাচে!
স্বর্গ নাচে, মর্ত্ত্য নাচে,
'যৌবন'-জরা মত্ত নাচে,
নাচে জন্ম-মরণ অশ্রু-হাসি,
দুঃখ নাচে, নন্দ নাচে ;—
সৃষ্টি জুড়ে' ছন্দ বাজে!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

খেলার পুতুল
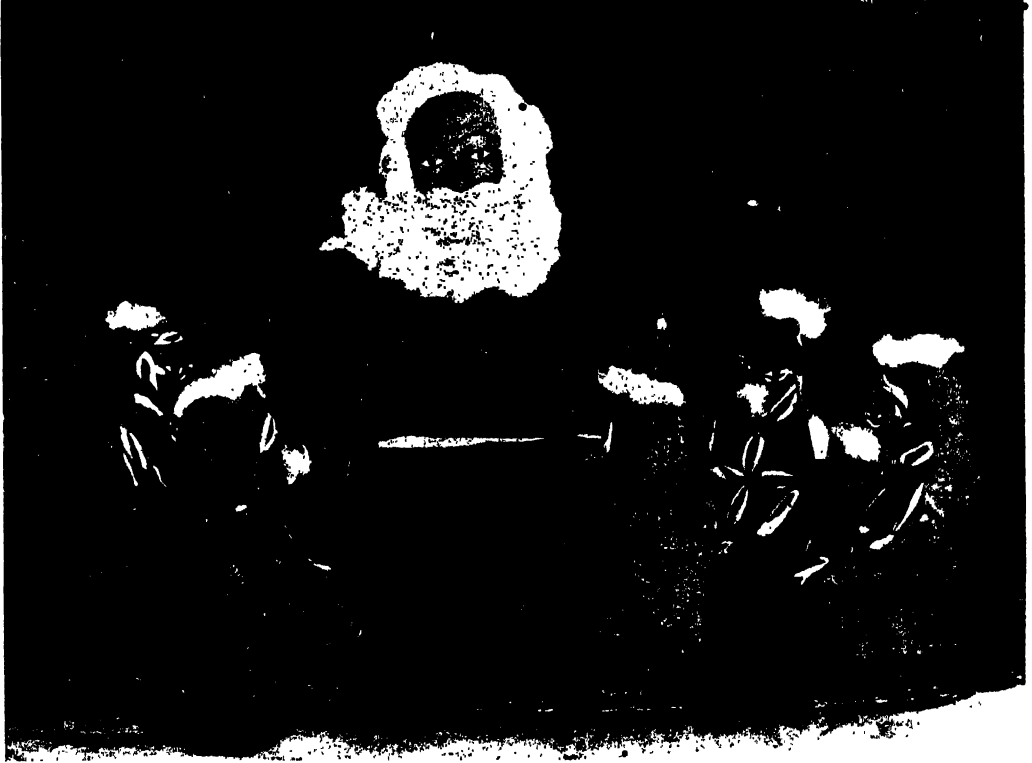
এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে হাঁ করে চেয়ে আছে—আর খাঁচায় ধরা কালো বাঘ মস্ত একটা কাঠের বারকোস নিয়ে খেলছে। এক ছেলে বলে—ও ভাই বেরাল দেখ!

সিংহের খাঁচা—সেখানে পশুরাজ,—তাঁকে দেখে বলে আর এক ছেলে—সিংহীর মামা ভোম্বল দাস বাঘ মেরেছে গণ্ডাদশ।

আর এক ছেলে—সে সবে কপ্‌চাতে শিখেছে—সমুদ্রতীরে প্রাতঃসূর্য্যকে দেখে বল্লে, চাঁদটা কী লাল দেখ।

পশুরাজ যেখানে বেরাল সেজে খেলতে আসে, উদয়াচলের সূর্য্য আসেন তেজ লুকিয়ে ছদ্মবেশে রং মেখে মন ভোলাতে; নির্ভর খেলার জগৎ—সেখানে ভয় দিতে এলনা বাঘ কিন্তু খেলে যেতে এল, অন্ধকার এল সেখানে লুকোচুরি খেলার রহস্যময় রূপ ধরে খেলতে—ভয় পাওয়াতে নয়, আলো এল কিন্তু স্বপন ভাঙ্গাতে নয়—ঝিলিমিলি রূপ রং নিয়ে নতুন নতুন স্বপ্নের জালে ঘিরে দিতে দিক্‌বিদিক্! সেখানে কি ঘরের কোণে কি বাইরে বনের তলায়, কিবা

আকাশে মেঘের ফাঁকে, নদীজলে ঢেউয়ের দোলায়,—সব জায়গাতেই খেলা ঘরটি রইলো পাতা সকল সময়ে! পড়া সেখানে খেলা—পাখি পড়ে, ঝুঁটি ঝাড়ে, মাথা নাড়ে! কায সেখানে খেলা—'আয়রে ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই, দোলায় আছে ছপোণ কড়ি গুণতে গুণতে যাই'! লড়াই সেখানে খেলা,—'ঢাল নেই—তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দ্দার,' তাল পাতার সেফাই নিয়ে যুদ্ধে আগুসার! সংসার সেখানে খেলা,—মরণ বাঁচন সেও এক খেলা!

ভাবনা-শূন্য জীবনের একটি একটি কণা, সব খিলুড়ি তারা, লঘুভার প্রজাপতির সমান উড়তে উড়তে খেলতে খেলতে হঠাৎ ডানা বন্ধ করে ঘুমিয়ে যায়—ঘরের প্রদীপ আকাশের গ্রহ নক্ষত্র খেলা ঘরের মাটির পুতুল ঠিকানা পেতে চায়, খেলুড়ির এ ওকে শোধায়—

"ভোর বেলা যে খেলার সাথী
ছিল আমার সাথে,
মনে ভাবি তার ঠিকানা
তোমার জানা আছে।"

খেলুড়ির রাজা হল মানব শিশু—নটরাজ সে নিজে নাচে বিশ্বকে নাচায়।

বিশ্বরাজের লীলা সহচর রূপ সমস্ত,—চন্দ্র সূর্য্য জীব জন্তু ফুল পাতা মেঘ বৃষ্টি—তারা সবাই এই খেলুড়ির রাজা মানব শিশুকে চিনলে—ঘিরে ঘিরে বল্লে তাকে—'হাসি কাঁদি যেমন নাচাও তেমনি নাচি'। মায়ের কোলে ধরা সেই মাটির ঘরের খেলুড়ি ছেলে মেয়ে দুটিতে ভোলে যে খেলনা পেয়ে ফেলনা জিনিষ দিয়ে তৈরি হল।। সে সমস্ত খেলা ঘরের হেলা-ফেলার পুতুল, —যে মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয় প্রাণ, যে মাটিতে মাটি হয়ে মেশে প্রাণের পাত্র দেহ, সেই মাটিতে গড়া

হল পুতুল খেলার পুতুল। মাটির ঘরের ধারেই বাইরের খেলা ঘরখানি পাতা, সেখানে আতা গাছে তোতা পাখি উড়ে বসে ডাকে—'এস খোকা খেলি এস'। মা বলেন—যেওনা। খোকা বলেন,—'যাবো'! খেলতে কাঁদে খোকা, ভোলানো শক্ত তাকে চাঁদ মুখে রোদ লাগার ভয় দিয়ে—রোদও যে ডাকছে! গাছের পাতায় আলোর ফুলঝুরি জ্বালিয়ে আর মাটি দিয়ে নিকোনো উঠানের একটি ধারে আলো ছায়ার চাকাচাকা ফুল সাজিয়ে—খেলোসে খোকা!

বাইরের মাটির পুতুল তারা সব ডাক দেয় ঘরের পুতুলটিকে—হাত ছানি দিয়ে, ইসারা

করে, কথা কয়ে, গান গেয়ে! মন ভোলালো ছেলের, সে এক মায়ের কোল ছেড়ে আর এক মায়ের ঘরে খেলতে ছুটলো বাইরে! সেখানে চলে—ধরা ছোঁয়ার খেলা—জলে স্থলে, ধরাতলে, মেঘে মেঘে আকাশ তলে।

খোকা চলে তুলতে আলো ছায়ার ফুল—তারা ছোঁয়া দেয়, কচি হাতের মুঠোয় আসে কিন্তু ধরা দেয় না। আকাশের পাখি ডাক দেয় কাছে আসতে, কিন্তু ডাকলে আসে না কাছে পাখি, আতা গাছের তোতা পাখি সে :—আগ ডালে উড়ে বসে, আঁতাপাতার নৌকো বাতাসে ভাসানোর খেলা জুড়ে দেয় একাএকাই! দড়ি ছেঁড়া রাম ছাগল—বাঁকা দুটো শিং যেন হিট্টিমাটিম্‌টিম—আতাপাতার গন্ধে গন্ধে পায়ে পায়ে এগোয় সে, দাড়ি নেড়ে বলে খোকা দেখবে মজা? এক গরাসে গোটা পাঁচ পাতার নৌকো খেয়ে খোকার দিকে চায় ছাগল—ন্যাকরে কাঁদে খোকা, টেঁ্য করে টিয়ে তাকে ভিংচায়, ন্যাঁ ন্যাঁ বলে ছাগল ভোলায় খোকাকে।

হুঁকো হাতে তামাক-খেগো বুড়ো তারা বসে বসে গল্পই করে, পাঁড়েজী পড়েন সুর করে গীতার মাথা মুণ্ডু ব্যাখ্যা, আহ্লাদী পিসি তাই শুনে হেসে যেন ফুটিফাটা হয়ে যান।

আতাতলার নাটশালার ধারে গোয়াল-পোরা গাই বাছুর, খোকা চলেন সে দিকে, কুয়ো তলার কুণো বেরাল এঁটোকাঁটা খেয়ে গোঁফ মুছে চায় টিয়াপাখীর দিকে। খোকা ডাকে আয় মেনি পুস্‌! ওদিকে টিয়ে ওড়ে ফুস্‌।

খেলার বেলা শেষ হয়ে আসে—তিন পহরের রোদ ছায়ার কাছেই মাদুর বেছায়,—খেলা ভুলে খোকা শুয়ে পড়ে রোদের কোলে মাথা রেখে, চেয়ে থাকে নীল আকাশে তাল গাছে শিয়রে বাবুই বাসার দিকে। দূরে ডাকে পুতুলওয়ালা—খেলনা চাই, চুড়ি চাই—খুকি বার হল পরণে ডুরে সাড়ি খোঁপায় ফুল—যেন চলে পুতুলটি।

খেলতে জানে সে পুতুল খেলা, চেনে তাকে পুতল-ওলা। খোকাতে খুকিতে চলেন হাটে রাসের মেলায় খেলনা কিন্‌তে।

দূর দেশের খেলনা—মাটির খেলনা, সোলার খেলনা, কেউ এল খোকার হাতে হাতে কেউ এল খুকির কোলে কোলে কেউ বা এল সাথিদের ঝুড়ি চেপে,—খেলাঘরে বাসা নিলে—অবেলার সব অতিথি তারা মেলার ফেরৎ নতুন সাজ সবার। সকালের সেই পলাতকা টিয়ে—তিনি পোরেছেন কমলাফুলির ওড়না, বাঘা মামা হয়েছেন নামাবলী তিলক ছাপা বোষ্টম, ঘোড়া হয়েছেন পক্ষিরাজ, হাতি সেজেছেন বেং, বেং সেজেছেন হাতি, সাপ হয়েছেন ময়ুর, ময়ূর হয়েছেন সর্প, কুমীর হয়েছেন নৌকা, নৌকা হয়েছেন কুমীর তার মধ্যে জলজীয়ন্ত বেরাল বৌ আর খোকা খুকি তিন জনে খেলা ঘরে সূয্যিমামার বিয়ের ডুলি ঘরের কোণে ধরা তারি কাছে খেলা ঘরের পিদুম জ্বলে—খেলেসো পিদুম দেয়ালে ছায়াবাজির নতুন খেলা—ভর সন্ধ্যায়—

আগাডুম বাগাডুম
ঘোড়াডুম সাজে
ডাং মৃদং ঝাঁঝর বাজে।

গভীর রাতে চাঁদের আলো চুপি চুপি খেলতে এসে দেখে—খেলা ঘরে ভাঙ্গা পুতুলের ছড়াছড়ি—ঘুমে অচেতন খোকা খুকি তারা!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রক্ত-গোলাপ

রুদ্ধ-ব্যথার রক্তরাগে রঙীন হ'য়ে উঠ্‌লে গো
কণ্টকাকুল কুঞ্জ-কানন কোলে,
সব্‌জে শাড়ীর ঘোম্‌টা তুলে আলোর ছোঁয়ায় ফুটলে গো
দখিন হাওয়ার মন্দ-মৃদুল দোলে !
রক্ত গোলাপ ! রক্ত গোলাপ ! তোমার রাঙা বুকের খুন
কোন্ তরুণীর তপ্ত-হিয়ার ব্যর্থ-অনুরাগ—করুণ !

কুঁড়ির কঠিন-বন্ধে তোমার শুষ্ক-নীরস ঘুম ভেজায়
শুক্লা-নিশার স্বপ্ন সরস ঝরি,
অরুণ আলোয় সিক্ত হ'য়ে ভোরের হাওয়া চুম্ দে যায়
রক্তাভ ঐ গণ্ড পরশ করি !
লাল হ'য়ে তাই উঠ্‌ল রাঙি কোন্ সে পরম লজ্জা গো !
গোপন-ব্যথার তীব্র দুখে রচ্‌লে কাঁটার শয্যা গো !

তোমার রূপে মত্ত-মধুপ কাঁটার বনে ঝাঁপায় ওই
—করুণ সুরে দিক ভরে বুল্‌বুল্ !
মানব আঁখির পিয়াস-দিঠি বুক কি তোমার কাঁপায় সই,
ফুলের রাণী, হায় বসোরাই গুল্ !
তোমার প্রভায় 'গুলিস্তাঁ নেই' 'বেহেস্ত' অপরূপ মানি
মাটির বুকে সজীব-স্বপন ! রূপরাণি গো, রূপরাণি !

রজত-ধবল পৌর্ণমাসীর মৌন-গভীর স্তব্ধতা
তোর সুবাসে মদির হ'য়ে ওঠে,
তোমার প্রাণের গোপন-বাণী অনুভূতির লব্ধতা
কবির হিয়ায় ছন্দ ভাষায় ফোটে।
অপ্সরী কি ক্রুদ্ধ ঋষির পড়্‌লি অলস চক্ষে লো !
কার অভিশাপ আন্‌ল তোরে মর্ত্ত্য মরুর বক্ষে লো !

রক্ত গোলাপ ! রক্ত গোলাপ ! পীত-পরিমল কেশর তোর
ব্যর্থ প্রেমের দীর্ঘ-নিশাস্ পেঁজা,
কোমলতম পাপ্‌ড়িগুলির বর্ণে মাখা অশ্রু-লোর
দীর্ণ-প্রাণের লাল-শোণিতে ভেজা।
কোন্ অনাদি অতীত হ'তে অযুত-হিয়ার ব্যথার চাপ্
'হারিয়ে-ফেলা' 'নাপাওয়া'রই রক্ত-রঙীন রাখ্‌ছ' ছাপ !

শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত

তৃপ্তি

(১৯)

শিশিরের এই পত্র পাইয়া মিনতির প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। এ কি হিতে বিপরীত করিয়া বসিল সে। এতদিন যা' হ'ক শিশির একরকম আরামে স্বচ্ছন্দে ছিল, কিন্তু এই নিদারুণ অজ্ঞাতবাসে সে যে কোথায় কি কষ্ট পাইবে তার কোনও ঠিকানা নাই। ভাবিতে ভয়ে মিনতির কণ্ঠতালু শুকাইয়া গেল।

সে চিঠি পাইয়া ছুটিয়া গেল তোতারামের কাছে। তোতারাম শুনিয়া একটু বিষণ্ন হইল, মিনতির দুঃখ দেখিয়া। কিন্তু সে বলিল, "মা এর জন্য দুঃখ ক'রছেন কেন? তাঁর দুঃখ পাওয়াই যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তবে জানবেন এ-ত তাঁর লীলা, আনন্দময়ের এ এক আনন্দ, এতে বিচলিত হওয়া তো আপনার উচিত নয়।"

মিনতি বলিল, "কিন্তু এ কি সৃষ্টি ছাড়া কথা বাপু! কোথায় আমি তাঁর কাছে ছেলে বুঝিয়ে দিয়ে নিজে পালাব, না তিনি আমাকে এমনি ক'রে যন্ত্রণা দিচ্ছেন। তোরা বাপ বেটায় কি আমাকে দুঃখ দিতে এতই ভালবাসিস?"

দুঃখের আবেগ ও গভীরতায় মিনতির অশ্রুজল শুকাইয়া গিয়াছিল—তার মনটার ভিতর আগুন জ্বলিতেছিল।

তোতারাম বলিল, "আমাকে কেন ব'লছেন মা, আমি তো আপনার কাছে অপরাধ করি নি।"

মিনতির হঠাৎ জ্ঞান হইল যে, তোতারামের উপর অভিমান করিলেও সে কখন তল্পী তল্পা লইয়া উধাও হইবে তার ঠিক নাই। তাই সে তাড়াতাড়ি বলিল, "না বাবা, তুমি আমার লক্ষ্মী ছেলে। তোমার উপর আমার কোনও অভিযোগ নেই।"

কিন্তু তোতারামের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মিনতির কাজ বেশীদূর অগ্রসর হইল না। সে কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তার মাথার ভিতর সব তাল গোল পাকাইয়া গেল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে রমেনকে লইয়া কলিকাতায় গেল।

বিনোদকে যখন মিনতি গিয়া পায় জড়াইয়া ধরিল, তখন বিনোদের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। এই চিরপ্রফুল্ল সুরসিক লোকটী হঠাৎ একেবারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। সস্নেহে সে মিনতিকে ধরিয়া উঠাইল। তাকে সান্ত্বনা দিয়া আস্তে আস্তে তার কাছে সব কথা শুনিল। তখনকার মত সে কিছুই বলিল না। ভাবিয়া দেখিবার সময় লইল। তারপর তারা স্বামী স্ত্রীতে মিনতিকে প্রফুল্ল করিবার জন্য চেষ্টা করিল।

সন্ধ্যা বেলায় মিনতি বলিল, "মুখুজ্জে ম'শায়, এখন কি করি বলুন।"

বিনোদ বলিল, "এত তাড়া দিলে চলবে কেন দিদি? এত বড় জটিল সমস্যা এর কি এত তাড়াতাড়ি মীমাংসা হয়? সেই ইংরাজী কথাটা জানিস তো, তাড়াতাড়ি কাজ ক'র্‌লে ধীরে সুস্থে পস্তাতে হয়। একবার জীবনে তাড়াতাড়ি একটা বড় কাজ ক'রেছিলাম। সেই থেকে পস্তাচ্চি। আর তাড়াতাড়ি আমার দ্বারা হ'বে না।"

"কিন্তু আমার তো আর সময় নেই মুখুজ্জে ম'শায়। আমার মনে হ'চ্ছে এখুনি একটা কিছু না ক'রলে যেন একটা শুভ মুহূর্ত্ত আমি জন্মের মত হারাব। আচ্ছা, যদি আমি ধাঁ ক'রে প্রয়াগে গিয়ে উপস্থিত হই, তবে কি হয়?"

"কিছুই হয় না, কেন না সে প্রয়াগে নেই—এই দেখ টেলিগ্রাম।"

মিনতির কাছে কথাটা শুনিয়াই বিনোদ প্রয়াগে জরুরী টেলিগ্রাফ করিয়াছিল। সে টেলিগ্রাফের জবাব আসিয়াছে—শিশির প্রয়াগে নেই, কোনও ঠিকানা রাখিয়া যায় নাই, কিন্তু বাড়ীতে তালা দিয়া গিয়াছে; হয়তো শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে পারে। রামধারী সঙ্গে গিয়াছে।

মিনতি এ টেলিগ্রাফ পড়িয়া একদম মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল।

"তবে আর কোনও উপায় নেই!" বলিয়া সে এলাইয়া পড়িল।

বিনোদ বলিল, "উপায় খুব ভাল আছে ভাই, কিন্তু সে কথা আমি তোর কাছে এখন বলতে সাহস পাচ্ছি না।"

ব্যগ্রভাবে মিনতি বলিল, "কি উপায় মুখুজ্জে ম'শায়, বলুন, যা হয় হোক। আমি সব শুনতে প্রস্তুত।"

বিনোদ তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিল, "এখন থাক ভাই, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বলবো।"

"কিন্তু আমার যে এখনি ফিরে যেতে হ'বে মুখুজ্জে ম'শায়। এখন না ফিরলে আবার ছেলে সেদিকে কি ক'রে ব'সবে তার ঠিক নেই। আমার তো বিপদ একটা নয়।"

"না তা নয়, স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক বৃত্তি হ'চ্ছে চারিদিকে মায়ার জাল ছড়িয়ে আপনাকে বিপদ দিয়ে খুব শক্ত ক'রে বেঁধে ফেলা, যেমন গুটিপোকা আপনাকে ঘিরে ফেলে। সে বৃত্তি তোর ষোল আনা আছে।"

"মায়া বলেন একে মুখুজ্জে ম'শায়? এই যে সত্য এই যে আনন্দ, এরই ভিতরই ভগবানের লীলা! এই স্নেহ প্রীতি আছে ব'লেই মানুষ বেঁচে আছে, আর তার বাঁচা সার্থক হ'চ্ছে। এ না থাকলে কিছুরই কোনও মানে থাকতো না।"

"তা সত্যি! অথচ তলিয়ে দেখলে এসবের ভিতর কিচ্ছুই নেই। জীবনটা, এবং তার সমস্ত ভালবাসাবাসি এ একটা ধোঁয়ার মত একদিনে মিলিয়ে যায়, তখন আর এর কোনও মানে থাকে না।"

"সব শেষ হ'য়ে যায়, কেন না লীলার স্বভাব হ'চ্ছে ক্ষণিক! কিন্তু তার মানে থাকে

না সেটা সত্য নয়। একটা লীলা ফুরিয়ে যায় কিন্তু তার থেকে আর এক লীলার আরম্ভ হয়। সমস্ত বিশ্ব এমনি একটা লীলা-স্রোত। এটা যে স্রোত, এ যে বয়ে যাচ্ছে এই তো লীলা,—এতেই এর সার্থকতা, এইটাই সত্য।"

"এ নেহাৎ বাজে কথা মিনু! Heracleitus সেকালে ব'লেছিলেন এ কথা, আর আজ সেটাকে নূতন ক'রে বলছেন Bergson, শাশ্বত চিরন্তন কিছুই নাই, একমাত্র শাশ্বত সত্য হ'চ্ছে ঘটনাস্রোত—flux—becoming. কিন্তু এ কেবল কথার মার পেঁচ মিনু। মনকে চোখ ঠারা। সত্য বলতে মানুষ চিরকালই বোঝে এমন একটা কিছু যা চিরস্থায়ী, যা নষ্ট হয় না। তেমন কিছু নেই বলা মানে এই যে জগতে সত্য কিছুই নাই সব মায়া,—সব ধোঁয়া। এর মত অশান্তিকর মতবাদ আর হ'তে পারে না।"

"ও ভাবে ধ'রলে এতে শান্তি পাবেন না সেটা ঠিক। কিন্তু যদি এইটা একবার বিশ্বাস করেন যে এ সবই এক লীলাময়ের লীলা—এর আদি নেই, অন্ত নেই, অনাদিকাল থেকে এ লীলা চলছে, অনন্তকাল এ চলবে,—আমাদের প্রত্যেকটী জীবন এই শাশ্বত লীলাপ্রবাহের এক একটা তরঙ্গ মাত্র, একবার মাথা তুলে আবার সেই শাশ্বত লীলাস্রোতের মধ্যে, সেই অফুরাণ রসধারার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছি, সম্পূর্ণরূপে আপনাকে বিলুপ্ত ক'রে সেই বিশ্বের রসপ্রবাহে ডুবে যাচ্ছি, তবে কি আনন্দ ভেবে দেখুন। যাকে ভালবাসি, তার জন্য প্রাণ চায় কি? প্রাণ চায় সেই প্রেমাস্পদের জন্য সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে। আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে, বিলুপ্ত করে দিয়ে তার পায়ের তলায় অণুকণার ভিতর মিলিয়ে যেতে। লীলাময়ের প্রেম যার মনে সত্য হ'য়ে জেগেছে সে নিজের জন্য এর চেয়ে কি বড় সার্থকতা চাইতে পারে বলুন! আমি বিলুপ্ত হ'য়ে যাব, মিলিয়ে যাব সেই অনাদি অনন্ত রূপ রসধারার মধ্যে; এর চেয়ে আর কি আনন্দ আছে। সে আনন্দের সামান্য একটু স্বাদ যে পেয়েছে তার কাছে জীবন আর বন্ধন থাকে না, ভালবাসায় কোনও ব্যথা থাকে না, সে সমস্ত কাজে সকল কথায় সেই লীলা রস সাগরের নর্ত্তন অনুভব করে, সারাটা জীবন সেই রসবোধের আনন্দে বিভোর হ'য়ে কাটিয়ে দেয়। এর চেয়ে শান্তির কথা, আনন্দের কথা আর আছে মুখুজ্জে ম'শায়?"

মিনতির সমস্ত মুখ চোখ এক অলৌকিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিনোদ অনুভব করিল যে এ সব কথা মিনতির কেবল বুদ্ধির অধিগম্য মতবাদ নয়, ইহা তার অন্তরের সাক্ষাৎ অনুভূতি, আর এ অনুভূতির আনন্দে মিনতি বিভোর হইয়া রহিয়াছে। তার মুখের দিকে চাহিয়া, তার মুখে এ তত্ত্বকথা শুনিয়া বিনোদের চিত্তও এক অপূর্ব্ব রসে ভরিয়া উঠিল। ক্ষণ-ভঙ্গুর-বাদকে এমনভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া এমন সরস করিয়া কেহ কোনও দিন বলিয়াছে বলিয়া বিনোদের মনে হইল না। সে মুগ্ধ হইয়া শুনিয়া গেল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "তাই যদি হয় মিনু। তবে তুই এত ব্যস্ত

হচ্ছিলি কেন ? এ সবই তো তবে সেই লীলার অঙ্গ ! এই খেলা তোকে খেলতে হ'বে। Be a sportsman, play the game !"

অনেকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া মিনতি বলিল, "ঠিক ব'লেছেন মুখুজ্জে ম'শায় ! Play the game. এই কথাটাই জীবনের মূল সূত্র। কথাটা সব সময় মনে থাকে না এই যা' মুস্কিল। খেলা খেলে যেতে হ'বে—কিন্তু একথা ভুললে হ'বে না যে এটা খেলা, আর এ খেলার মালিক আমরা নই। যিনি খেলছেন তার হুকুম মাথা পেতে নিতে হ'বে।"

"উঁহু, তাকে ঠিক playing the game বলে না। এইটা যদি তুমি ঠিক বুঝে থাক যে ভগবান তোমাকে নিয়ে একটা খেলা খেলছেন, তবে তোমাকে সে খেলায় পুরোপুরি যোগ দিতে হ'বে; বেলে খেলা করলে চলবে না। মনে কর তুমি আর আমি, এই ধর তাস খেলতে ব'সেছি। আমি যদি কেবলি ইচ্ছে ক'রে হেরে যাই আর তোমাকে জিতিয়ে দি, তা হলে খেলাটা একেবারেই মাটি হ'বে। তোমারও তা ভাল লাগবে না। কেন না জেতাটাই খেলার সার নয়—সার হ'চ্ছে লড়াই ক'রে জেতা। সুতরাং সংসারটা যদি ভগবানের জীবের সঙ্গে খেলাই হয় তবে যে জীব সে খবর জানে তাকে ষোল আনা পণ ক'রে খেলতে হ'বে জিতবে ব'লে, তার যতদূব শক্তি লড়তে হ'বে—খেলাকে খেলা ব'লে অগ্রাহ্য ক'রবে না—সমস্ত শক্তি দিয়ে খেলতে হ'বে। তবেই না জম্‌বে খেলা। তাকেই বলি playing the game. আমি তোমাকে তাই ক'রতে বলছি।"

"তা কি করছি না আমি ? আর আমায় কি ক'রতে বলেন ? আমার নিজের সুখ দুঃখ ভুলে গেছি—যে একটা ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়ে গেছি তাতেই ডুবে র'য়েছি—আর আমায় কি ক'রতে বলেন ?"

"করতে বলি কি সেটা যদি বুঝতে চাও ভাই, তবে এক'টা বছর মনের ভিতর থেকে মুছে ফেলে দিয়ে, জীবনটাকে আট বছরের পুরাণো চশমা দিয়ে একবার দেখতে হ'বে। মনে পড়ে কি মিনতি তখন কি আশা আকাঙ্ক্ষা তোর ছিল ?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মিনতি বলিল, "হাঁ তখন তো অনেক আশাই ছিল।"

"এখন একবার পারিস না কি মনের ভিতর সেই সব আশা আকাঙ্ক্ষা আবার জাগিয়ে তুলতে ? কেন পারবি না ? কি হ'য়েছে তোর ? তখন তোর চিন্তা ছিল নিজের জীবনটা সার্থক ও সফল ক'রে তোলবার, একটা বড় কিছু ক'রবার, একটা কাজের মত কাজ করে নাম রেখে যাওয়ার। সে সব হিসাবের মধ্যে তখন অন্য কেউ ছিল না, কেবল ছিলি তুই নিজে। বিয়ে হ'য়েছে ব'লে কি তোর সে সব ভুলে যেতেই হ'বে। তোর স্বামী তোকে ছেড়ে গেছে ব'লে তুই এতটা মুশড়ে যাবি কেন ? তুই তো সাধারণ মেয়ে ন'স, যাদের স্বামী ছাড়া সত্তাই নেই, কোনও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রই নেই।"

"নেই মুখুজ্জে ম'শায়—সংসারে নেই। সে কথা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝছি। যে দিন থেকে তিনি চ'লে গেছেন সেই থেকে যে আমি আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারিনি—সেই দিন থেকে বুঝতে পেরেছি বিবাহিতা নারীর স্বামী ছাড়া প্রতিষ্ঠার অন্য ক্ষেত্র নেই।"

"তোর মুখে এ কথা সাজে না মিনতি। এ কথা বাজে লোকের কথা।"

"তা হ'লে বাজে লোকেই সংসার ঠাঁসাঠাসি হ'য়ে আছে। সংসারে কি দেখতে পাই মুখুজ্জে মশায়? যাঁর ধনী কি পণ্ডিত ব'লে কি অন্য কোনও রকমে সংসারে প্রতিষ্ঠা আছে, তার স্ত্রীকে অমনি সঙ্গে সঙ্গে লোকে মাথা পেতে নেয়। মহারাজার স্ত্রী হয় মহারাণী, আচার্য্যের পত্নী হয় আচার্য্যানী, সমাজনেতার স্ত্রী হয় সমাজনেত্রী—তা' হ'ক না সে মুর্খ, নীচাশয়—হ'ক না সে অতি হীন। আর যে নারী আপন চরিত্রবলে মহীয়সী রাণী হ'বার যোগ্য তারও কোনও প্রতিষ্ঠা থাকে না। দরিদ্র কেরাণীর স্ত্রীর পায়ের ধুলার যোগ্য না হ'য়েও ডেপুটি বাবুর স্ত্রী তাকে অনায়াসে কৃপার চক্ষে দেখে থাকেন—আর সমস্ত সমাজ এ ব্যবস্থা মাথা পেতে নেয়। আর ডেপুটী বাবুর স্ত্রী যদি হাজার গুণবতী হন, তার স্বামী যদি আমার স্বামীর মত তাকে পরিত্যাগ করেন, তবে কীটাণুকীট যে সেও তাকে অগ্রাহ্য করে। আমাদের সমাজের এই ব্যবস্থা, স্বামীর প্রতিষ্ঠায় স্ত্রীর প্রতিষ্ঠা, স্বামী ছাড়া স্ত্রীর প্রতিষ্ঠার কোনও ক্ষেত্রই আমি খুঁজে পাই না—কেবল ধর্ম্মজীবনে ছাড়া।"

"এসব তোর অত্যন্ত সেকেলে কথা মিনতি। আজকালকার শিক্ষিত মেয়ের মুখে একথা শোভা পায় না। তোর মুখে আমি একথা শুনতে চাই না। তোর প্রতিষ্ঠা তোর নিজের হাতে। স্বামী যদি তোমাকে অগ্রাহ্যই করে, তোমারও তো তাকে অগ্রাহ্য করে' স্বতন্ত্র পথে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করবার উপায় আছে। সেইটা তোমার করতে হ'বে—তাদেরকে দেখাতে হ'বে যে তারা যে স্পর্দ্ধায় তোমাকে অপমান ক'রতে চায় তোমার গৌরবের কাছে সে স্পর্দ্ধা লাঞ্ছিত অপমানিত হ'য়ে ফিরবে। বুঝতে পারছিস আমার কথা? একবার তোর মনের ভিতর এই স্পর্দ্ধাটা জাগিয়ে তোল যে আমি কারও চেয়ে ছোট নেই, কারও জীবনের সার্থকতার উপাদান মাত্র নই, আমার একটা স্বাধীন সত্তা আছে—সেই সত্তাকে সার্থক ক'রতে হ'বে—স্বামী হউক, পুত্র হউক, যেই হউক তার এই স্বাধীন আত্মার স্বতন্ত্র পরিণতি লাভে বাধা দেবার অধিকার নেই। একবার মাথা ঝাড়া দিয়ে বলতে হ'বে, আমি স্বাধীন, আমার অদৃষ্ট আমার নিজের হাতে। বস্ তখন দেখতে পাবি কোনও কিছুতেই তোকে লজ্জা দিতে পারবে না, নিজের আত্মার দৈন্য ছাড়া। তখন প্রতিষ্ঠার জন্য পরের মুখ চেয়ে থাকতে হ'বে না, পরের প্রসাদে গর্ব্বিত হ'তে হ'বে না, পরের লাঞ্ছনা তুচ্ছ ক'রে অবজ্ঞার ভরে পায়ে ঠেলে ফেলে দিতে পারবে।"

বিনোদের কথাগুলি মিনতির শিরায় শিরায় প্রবিষ্ট হইয়া মিনতিকে উত্তেজিত করিয়া

তুলিল, তার মনে হইল, ইহাই সত্য, এই তার পথ। এতদিন কেবলি সে পরের মুখ চাহিয়া চলিয়াছে, পরের অবহেলায় পীড়িত হইয়াছে, পরের মুখ চাহিয়া আপনার কর্ম্ম নিয়োজিত করিয়াছে। সে জীবনে এই পণ করিয়াছে যে স্বামী ও সপত্নী-পুত্র তার মাতৃত্বের যে অপমান করিয়াছে সেটা যে মিথ্যা ইহা প্রমাণ করিবে। এ কয় বৎসর সে সেই অসত্যটাকে পরাজিত করিবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে। একথা তার কোনও দিন মনে হয় নাই যে যেটা নিতান্তই অসত্য তাকে আবার পরাজিত করিবার চেষ্টার দরকার কি? সে এ অপমানে লজ্জিত লাঞ্ছিত বোধ করিয়াছে, কিন্তু ভাবিয়া দেখে নাই যে তার লজ্জার কোনও হেতুই নাই—লজ্জার হেতু হইয়াছে তার স্বামী ও দিলীপের। সে এই তুচ্ছ পরের মতটাকে এত বড় করিয়া নিজের ভিতরকার বৃহৎ আত্মার অপমান করিয়াছে।

আটটি বৎসর সে বৃথা অপচয় করিয়াছে এই দুইটি অন্যায়কারীর প্রসাদ অর্জ্জন করিবার জন্য। এ আট বৎসরে সে যদি আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাধীন ক্ষেত্র খুঁজিয়া কাজ করিত তবে সে কি না করিতে পারিত?

স্বামী তাকে বিনা দোষে ত্যাগ করিয়াছেন, তাতে এতটা মুশড়াইয়া পড়া তার পক্ষে ঘোরতর দুর্ব্বলতা হইয়াছে। বেশ হইয়াছে—স্বামী তাকে চান না, তবে তো সে স্বাধীন। এখন সে কেন স্বাধীনভাবে আপনার সার্থকতা অন্বেষণ না করিবে?

সে খুব ভাবিতে লাগিল। বিনোদের কাছে তাড়াতাড়ি বিদায় হইয়া সে চুঁচুড়ায় ফিরিল। পথে সে খুব উত্তেজিতভাবে ভাবিতে লাগিল, কোন্ পথে সে জীবনে সার্থকতার সন্ধান করিতে পারে। প্রথমেই তার মনে হইল ধর্ম্মজীবনের কথা। সে মুক্ত—সম্পূর্ণ স্বাধীন—কারো কাছে তার কোনও দেনা পাওনা নাই। সে কেন মীরাবাইর মত ধর্ম্মের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করিবে? তীর্থানন্দ স্বামীর কাছে সে যে ধর্ম্মের মহাবার্ত্তার সন্ধান পাইয়াছে সেই ধর্ম্মের সাধন করিবে, জগৎকে সে বার্ত্তা শুনাইবে। মীরাবাইর মত গান গাহিয়া সে জগৎকে প্রেমে মাতোয়ারা করিয়া দিবে। তারপর তার মনে হইল সেই মাতৃহীন শিশু দেখিয়া তার অন্তরে মাতৃত্বের সেই প্রথম আভাস। সেই কবিতায় সে ভগবানকে অনুযোগ করিয়াছিল এত বড় মায়ের হৃদয় দিয়া ভগবান তাহাকে সব মাতৃহারাকে বক্ষে টানিয়া লইবার শক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন বলিয়া। জগতে মাতৃহারা তো অনেক আছে—তার শক্তিও তো কিছু আছে—সে কেন সেই মাতৃহারা শিশুদের মা হইয়া সেবা করিবে না? যতদূর তার ক্ষুদ্র শক্তি ততদূর সে না করিবে কেন?

ভাবিতে ভাবিতে তার কল্পনার চোখে তার জীবনের এই মহাকর্ত্তব্য মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল। সে গুরুর পাদপদ্মে শিক্ষা লাভ করিয়া সমগ্র ভারত ঘুরিয়া ধর্ম্মের এ চিরপুরাতন, চির নবীন বার্ত্তা প্রচার করিবে আর যেখানে যে মাতৃহারা অনাথ শিশু আছে তাহাকে

সংগ্রহ করিয়া এক বিরাট শিশুমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে। সেখানে মাতৃহীন মায়ের অভাব ভুলিবে, তারা সমুচিত শিক্ষা দীক্ষা পাইয়া জগতে বরণীয় হইতে পারিবে।

সে স্থির করিল, আর বিলম্ব নয়। বাড়ী গিয়া সে তোতারামের কাছে ছুটি চাহিবে। সে তো থাকিতে চায় না, তাকে বাঁধিয়া রাখিয়া লাভ কি? তারপর সে তীর্থানন্দ স্বামীর সন্ধান করিয়া তাঁর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া নবজীবনের সুত্রপাত করিবে।

যখন সে চুঁচুড়ার বাড়ীতে ফিরিল, তখন তার মনে হঠাৎ আশঙ্কা হইল সে সমস্ত দিন যে বাড়ী ছাড়িয়া আছে, কি জানি যদি তোতারাম ইতিমধ্যে চলিয়া গিয়া থাকে? এমনি একটা অযথা আশঙ্কা তার প্রায়ই হইত। কোথাও গেলেই সে ভয়ানক চঞ্চল চিত্তে বাড়ী ফিরিত, ভয় হইত, যদি ফিরিয়া তোতারামকে না দেখিতে পায়।

যখন বাড়ীতে ঢুকিয়া সে দেখিল, তোতারাম অপ্রসন্ন চিত্তে বাহিরের ঘরে পায়চারী করিতেছে তখন তার খুব একটা শান্তির ভাব মনে আসিল। তার অন্তর তোতারামের প্রতি উচ্ছ্বসিত স্নেহে ভরিয়া উঠিল।

তোতারাম বলিল, "কি মা, এত দেরী হ'ল আপনার? আমি তো ভেবেই ম'রছিলাম, না জানি কি হ'ল?"

সেও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

হাসিয়া মিনতি বলিল, "না বাবা, কি হ'বে আমার। হুগলী থেকে ক'লকাতা গেছি এতেই এত ভাবা বাবা—তবে এতদিন কোন দূরে কোথায় কেমন ক'রে প'ড়েছিলে আমায় ফেলে।"

তোতারাম বলিল, "এখন আর বোধ হয় পারবো না।"

তারপর মিনতি শুনিল যে সন্ধ্যার গাড়ীতে মিনতি না আসায় তোতারাম ভয়ানক অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তার সায়ং সন্ধ্যা ও পাঠাদি কিছুই হয় নাই, সে খায়ও নাই, কেবল ছট্‌ ফট্‌ করিয়া ঘর ও বাহির করিয়াছে।

মিনতির সারা চিত্ত অপূর্ব্ব পুলকে ভরিয়া উঠিল। পথে আসিতে আসিতে সে যে সব সঙ্কল্প গড়িয়াছিল এখন সে সব চাপা পড়িয়া গেল। সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া তোতারামের খাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

(২০)

মিনতির সঙ্কল্পগুলি ইহার পর মাঝে মাঝে মাথা খাড়া দিয়া উঠিত, কিন্তু তোতারামকে লইয়া সে সংসারে এত ডুবিয়া গেল যে তার কিছুই করা হইল না।

কিন্তু বিনোদের কথায় তার উপকার হইল। সে চিত্তে অনেকটা শান্তিলাভ করিল শিশিরের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু সে বিষয়ে সে অনেকটা নির্ব্বিকার হইয়া উঠিয়াছে। তার এক কারণ যে এটা তার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে সে মনকে বাস্তবিকই এমন স্বতন্ত্রতার দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিল। শিশিরের ভালয় মন্দয় তার কিছু আসে যায় না এ ভাব সে অনেকটা আয়ত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সে এখন আপন মনে সাধন ভজনে নিযুক্ত হইল।

আর এক বৎসর কাটিয়া গেল। মিনতি ধর্ম্মাচরণে সম্পুর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিল। তার ধর্ম্মাচরণে যেমন নিষ্ঠা ছিল তেমনি কঠোর নির্ম্মম আত্মজিজ্ঞাসা ছিল। তাই সে তার ধর্ম্মাচরণে ত্রুটির অন্ত পাইল না। যতই সে ত্রুটি দেখিত ততই সংশোধনে যত্নবতী হইত। এমনি করিয়া সে সাধন-পথে দ্রুত অগ্রসর হইল।

তার একটা কথা প্রায় মনে হইত। তার জীবনের আদর্শ করিয়াছিল সে মীরাবাইকে। মীরাবাইয়ের মধ্যে সে সব চেয়ে বড় কথা দেখিতে পাইল,—তার পরিপূর্ণ গভীর প্রেম ও আত্মসমর্পণ। সঙ্গে সঙ্গে সে দেখিতে পাইল যে তার নিজের ভিতর প্রেমের সে গভীরতা নাই। সে ধর্ম্মতত্ত্ব অনেক অধ্যয়ন করিয়াছে—তার চেয়ে বেশী সে জানিয়াছে আপনার মনে চিন্তা করিয়া। তার কাছে ধর্ম্মের তত্ত্ব সমস্ত জগতের এ বিপুল রহস্য চিন্তা করিলেই এত সহজ সরল হইয়া যাইত যে সে তাহাতে বিস্মিত হইত। খুব জটিল সং সমস্যা একাগ্রভাবে চিন্তা করিতে করিতে তার কাছে আশ্চর্য্যরূপে সহজ হইয়া যাইত। এত সহজে সব দুরূহ গভীর তত্ত্ব তার কাছে পরিস্ফুট হইয়া যায় যে সে ইহাতে তার নিজের কৃতিত্বে বিশ্বাস করিতে পারিত না। তার মনে হইত স্বয়ং নারায়ণ তার চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া এই সব সত্য তার চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়া তোলেন। তাই সে তার ধ্যানের সমস্ত সিদ্ধান্ত শ্রদ্ধার সহিত দেবতার প্রসাদরূপে গ্রহণ করিত। কিন্তু তবু তার মনে হইত যে তার বুদ্ধি যতই দৈবশক্তিতে আলোকিত হউক অন্তর তার সেই পরিমাণে প্রেমে সরস হয় না। তার ভগবৎ প্রেমের সে ঐকান্তিকতা, সে গভীর রসবাহুল্য নাই যাহাতে মীরাবাইর জীবন পরিপূর্ণরূপে সার্থক হইয়াছিল। সে কখনও ভগবানের সাক্ষাৎকার অনুভব করিতে পারে না—তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রেমে গদগদ হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতে পারে না। এ কথা ভাবিতে তার অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিত। তার হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম সজীব হইয়া জাগিয়া উঠে না একথা ভাবিয়া সে অন্তরে বড় দৈন্য অনুভব করিত।

সে একদিন এই কথা ভাবিতে ভাবিতে এক কীর্ত্তন রচনা করিয়া ফেলিল, এবং আপনি তাতে সুর দিয়া তোতারামের কাছে গাহিল। সে গাহিল,

(ওগো) সাগর ছানিয়া আনিয়াছি মণি,
এনেছি রতন উজাড়িয়া খনি,
রেখেছি পরাণে ভরিয়া।
স্বর্ণ অলঙ্কারে শোভে মরকত
হীরক মুকুতা তারকার মত,
আমার মন্দির ঘিরিয়া!

ওগো সকলি বিফল হ'ল
সব আয়োজন বিফল হইল,
আঁধারে ডুবিয়া গেল;
আমার বিভব মহিমা রতন গরিমা
আঁধারে ডুবিয়া গেল।

মণি-মালা শোভা অতি মনোলোভা
আঁধারে ডুবিয়া গেল;
রতন ভূষণ মণিকাঞ্চন
গরিমা মরিয়া গেল,
(ওগো) অভিমানভরা গরব আমার
লাজে মরিয়া গেল।
সকলি বিফল হল।

ওগো সব সাজ মাঝে লাজ সার হ'ল
আঁধার রহিল হিয়া;
কালিয়া পীরিতি প্রদীপের ভাতি
জ্বলেনি সুধু বলিয়া।

অশ্রুপ্লাবিত মুখে আবেগভরে মিনতি গাহিয়া গেল, তোতারাম মুগ্ধ গদগদচিত্তে শুনিল এবং মাঝে মাঝে সঙ্গে ধুয়া ধরিতে লাগিল।

গান শেষ হইলে তোতারাম মিনতির পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, "মাগো তোমার প্রাণে যদি কালিয়ার পীরিতি না থাকে তবে সে জগতে কোথাও নাই।"

মিনতি বলিল, "না বাবা সে নাই। যদি সে পীরিতি থাকতো তবে কি আমি এমন হ'তাম? তবে কি সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় আমাকে ছুঁতে পারতো? তবে কি লোকের কথা আমি গণ্য ক'রতাম?" বলিয়া মিনতি অধীর হইয়া পড়িল। সে কেবলি কাঁদিতে লাগিল।

তোতারাম সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে লাগিল।

* * *

এ সব মালতীর আর সহ্য হইল না।

মিনতি যেদিন প্রথম এ বাড়ীতে আসিল সেদিন মালতী তাকে সুচক্ষে দেখিতে পারে নাই। সে ছিল বিদ্যুতের স্নেহের দাসী, বিদ্যুতের স্থানে যে আর একজন আসিয়া জুড়িয়া বসিবে একথা তার মোটেই সহ্য হইতেছিল না, তাই সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়াছিল। কিন্তু মিনতির ব্যবহার এবং তার দুর্ভাগ্য দুয়ে মিলিয়া তাহাকে মিনতির দিকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। যখন দারুণ দুঃখে মিনতি অধীর, তখন মালতী মায়ের মত স্নেহ দিয়া তাহার সেবা করিয়াছিল, তার আহত হৃদয়ে নিরন্তর সেবা জোগাইয়াছিল।

তোতারাম যেদিন প্রথম আসিল সেদিন মালতী তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল এবং এই যে খোকা সে বিষয়ে তার বিশেষ কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল ততই সে তোতারামের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে সে দুঃখ করিয়া তোতা-

রামকে বলিল "হাঁ খোকা বাবু, কি ছিলে তুমি, যত সব ভবঘুরের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কি হ'য়ে এসেছ?' তোমার এ কি ব্যাভার? দিনরাত ঘরের কোণায় চুপটি মেরে ব'সে থাকবে—এ কি বেটাছেলের মত কথা। আচ্ছা বাপু ধর্ম্মকর্ম্ম ক'রতে হয় কর, কিন্তু বাইরে যাও, খেলাধূলা কর, কাজ কর্ম্ম দেখ—আর অবসর সময় পূজা-অর্চ্চন কর। তা নয় দিনরাত ঘরের ভিতর ব'সে ঐ এক খ্যান্ ঘ্যান্—এতও ভাল লাগে বাপু!"

অন্য লোকের কাছেও সে দিনরাত এই অভিযোগ করিত। খোকা যে এমন করিয়া বহিয়া যাইতে বসিয়াছে তাহাতে তার দুঃখের অন্ত ছিল না। সে বলিত, বাপ মিন্সে বিবাগী হ'য়ে পড়ে আছে, ওকে এখন দেখে কে বল। এ বয়সে বাপের চোখ নইলে কখনও ছেলে মানুষ হয়? যতই দিন যাইতে লাগিল ততই সে বিরক্ত হইয়া উঠিল।

শেষ পর্য্যন্ত সে স্পষ্টভাবে সন্দেহ করিতে লাগিল যে এ খোকা নয়। হাজার হউক খোকাকে সে তো কোলে কাঁখে করিয়া মানুষ করিয়াছে—সে খোকা কি কখনও এমনি হইতে পারে? হাজার হ'লেও সে ছিল একটা মদ্দা ছেলে—এত মিনমিনে ঘ্যানঘেনে মেয়েমানুষ সে হইতে পারে না।

অতঃপর সে স্থির করিল যে এ ব্যক্তি দিলীপ কিছুতেই নয়। কোথাকার এক হাঘরের ছেলে এখানে এসে রাজার হালে আছে তাই আর নড়বার চড়বার নাম নেই। সে ভারি বিরক্ত হইয়া গেল। তোতারামের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, তার যেটুকু সেবা করিতে হয় তাহাতে সে গরগর করিতে লাগিল, মিনতির উপর পর্য্যন্ত চটিয়া গেল—এবং আকারে ইঙ্গিতে সে নানাপ্রকারে কথাটা প্রকাশও করিতে লাগিল।

একদিন মিনতি তাকে তোতারামের জন্য মাষ্টার বাবুর বাড়ী হইতে একটা বাতাবী নেবু আনিতে বলিয়াছিল। মাষ্টার বাবুর বাতাবী নেবু সে পাড়ায় সুপ্রসিদ্ধ। মালতীর প্রথমতঃ রাগ হইল যে তোতারামের জন্য এখন তাকে এত রাস্তা হাঁটিয়া সেই নেবু আনিতে হইবে। তারপর সে নেবু চাহিয়া আনিতে হইবে, কেননা মাষ্টারগিন্নী নেবু বেচেন না। সে বড় মানুষের বাড়ীর ঝি, কারও কাছে কিছু চাওয়াটা ভারী অপমানের কথা মনে করিত। এই চাওয়ার হীনতায় সে বড় কষ্ট বোধ করে, অথচ তাকে দিয়াই মিনতির বার বার এই কাজ করানই চাই।

গর্‌গর্ করিতে করিতে মালতী চলিয়া গেল। মাষ্টারগিন্নী নেবু দিলেন না, বলিলেন, আর নেবু নাই, এবং মালতী স্পষ্ট বুঝিল কথাটা মিথ্যা। তার আর অপমানের সীমা রহিল না। সে ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া মিনতির কাছে বলিল, "ওগো মা, দিলে না নেবু। যত সব ছোট লোকের কাছে তোমার হাত পাতাই চাই।"—বলিয়া ভ্রূকুটি করিয়া চলিয়া গেল।

তারপর রমেনকে পাইয়া সে তার কাছে মনের যত বিষ খুব সুস্পষ্ট ঝাঁঝাল অনভিধানিক

ভায়ায় ব্যক্ত করিয়া বলিল যে "ওই হাঘরের বেটা কোথ্ থেকে এসে জুটেছে—খোকা তো এ সংসারে আগুন লাগিয়েই গেছে—এখন এই শতেক খোয়ারীর বেটা একে পাঁশ বানিয়ে তবে ছাড়বে।"

রমেন হাঁ করিয়া বলিল, "কি বলছো তুমি মালতী দি? চুপ, চুপ!"

"কেন গো, কিসের ভয়ে চুপ করবো। মালতী কাউকে ডরায় না"—

"শুনতে পেলে দিলীপ"—

"মুখে আগুন দিলীপের, ও মিন্সে যদি খোকা হয় তবে আমার"—

"আরে চুপ চুপ, মামীমা শুনলে অনর্থ ক'রবে—ও কথাও নয়।"

অনেক করিয়া বুঝাইয়া পড়াইয়া রমেন তাহাকে শান্ত করিল। রমেন নিজেও এখন মালতীর সঙ্গে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। তোতারাম যে দিলীপ নয় সে বিষয়ে তার কোনও সন্দেহই নাই। তবু মিনতির সামনে এ কথার সামান্য আভাস মাত্র করিতেও তার সাহস নাই। বাড়ীর সবাই প্রায় স্থির করিতেছিল যে তোতারাম জাল ও ভণ্ড, উহাকে লইয়া গৃহিণী অনর্থক এতটা মাতামাতি করিতেছেন। কিন্তু মিনতি তাকে লইয়া এতটা মত্ত এবং তার প্রতি সেবা যত্নে কারও সামান্য একটু ত্রুটি দেখিলে সে এত ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে যে সকলে চুপ করিয়া যায়, আর অন্তরালে যাইয়া ফিসফিস করে।

মালতীকে যখন রমেন বুঝাইল তখন সে বেশ বুঝিয়া গেল। ইহার পর যখন তোতারামকে দেখিয়া তার মুখটা বিষাইয়া উঠিত এবং তার যত্ন আত্তি দেখিয়া সে ক্ষেপিয়া উঠিত তখনই সে চেষ্টা করিয়া চাপিয়া যাইত। মনে মনে বলিত, "আমার কি বাপু! যাদের ঘর সংসার তারাই যদি সব ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে তবে আমি কেন ভেবে মরতে যাই। সে আঁটকুড়ে মিন্সে যদি মাগ ছেড়ে সংসার ছেড়ে হৈ হৈ করে রাজ্যি ঘুরে বেড়াতে পারে—পারুক।" তবু মাঝে মাঝে অমরাবতীতে এই দৈত্যের তাণ্ডব দেখিয়া সে মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়া উঠিত। চোখা চোখা কথা তার জিভের ডগায় আসিয়া ফিরিয়া যাইত।

একটা কথা তার মনে হইয়া মনটার ভিতর খচ্ খচ্ করিয়া উঠিত। মালতী সতীসাধ্বী বলিয়া লোকের কাছেও কোনও দিন জাঁক করিত না, এবং তার যে ছেলেটি পোনের বৎসর পুর্ব্বে মারা গিয়াছে, তার জন্ম যে মালতী বিধবা হওয়ার তিন বৎসর পর হইয়াছিল তাহা সকলেই জানিত—সে বিষয়ে মালতীরও খুব বেশী লজ্জা ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণী—বিশেষ বিদ্যুতের স্থলবর্ত্তী যে—সে যে বিপথগামিনী হইবে এ কথা ভাবিতে তার গা' কাঁটা দিয়া উঠিত। অথচ রকম সকম দেখিয়া তার এই সন্দেহ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল।

অনেকদিন সে গোপনে তোতারাম ও মিনতির উপর নজর রাখিয়াছে, কিছুই তার নজরে পড়ে নাই। তা ছাড়া ছেলেটা মিনতিকে 'মা' বলে, মিনতিও তাকে 'বাবা' বলে। এটা যে

খুব একটা বড় অন্তরায় তাহা মালতীর মনে হইল না, তবু কথাটায় ধোকা লাগে। কিন্তু মালতী সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। ভাবের আবেশে যখন মালতী তন্ময় হইয়া তোতারামের দিকে যায় আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে তোতারাম তার দিকে চাহিয়া থাকে তখন তার চক্ষে সে দৃষ্টিটা ভাল ঠেকে না। তার মনে হইল যে যদিও এখন ইহাদের ভিতর দূষণীয় কিছু সে লক্ষ্য করে নাই, তবু তেমন একটা হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। আর হয় তো হইতে বেশী দেরীও নাই।

এই কথা ভাবিয়া সে ভারি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। এমন একটা কিছু ঘটিয়া গেলে যে একটা ভীষণ কলঙ্ক হইবে এবং তাহার মহাসম্মানিত মুনিব গৃহিণীর নাম লোকের মুখে মুখে একটা গ্লানির সঙ্গে জড়িত হইয়া যাইবে—এ কথা ভাবিতে সে ক্ষেপিয়া উঠিত। এখনি যে বাহিরে এসব কথা লইয়া অনেক কাণাঘুষা হইতেছে—মিনতির সন্ন্যাসীকে লইয়া যার যা খুসী বলিতেছে—তাহা এ পর্য্যন্ত মালতীর শ্রুতিগোচর হয় নাই। কিন্তু সত্য সত্যই যদি একটা কিছু ঘটে তবে যে লোকের মুখ ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না তাহাতে তার সন্দেহ ছিল না।

অনেকদিন দারুণ অশান্তিতে কাটাইয়া মালতী একদিন গঙ্গার ঘাটে এমনি একটা কথাই শুনিয়া ফেলিল। একটি রসিকা অপর এক যুবতীকে তামাসা করিয়া বলিতেছিলেন, "এখন তুই আর কি করবি—ডিপুটিগিন্নীর মত একটা সন্ন্যাসী টন্ন্যাসী জোগাড় কর। এ তো এখন রেওয়াজ হয়ে গেছে।"

মালতীকে বক্ত্রী দেখিতে পায় নাই। কিন্তু মালতী কথাটা শুনিতে পাইল। সে রাগে ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু অনেক কষ্টে কোন্দলের আকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া বাড়ী ফিরিল। কেন না সে জানিত যে কথাটা যত বড় মিথ্যাই হোক ইহা লইয়া সে যদি একটা সোর গোল করিয়া বসে তবে ইহা দুদিনের মধ্যে বাজারময় রটিয়া যাইবে।

মনটা রাগ ও কান্নায় বোঝাই করিয়া সে বাড়ী ফিরিল। মিনতিকে দেখিয়া তার পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। কালামুখী মিছামিছি কর্ত্তার পর্ব্বতপ্রমাণ মান ও প্রতিষ্ঠা ভাসাইয়া দিতেছে একটা অপদার্থ হাঘরের বেটার জন্য—ইহাতে রাগ হয় না? কিন্তু এত রাজ্যের চোখাচোখা কথা তার মুখের কাছে আসিয়া জড় হইল যে কিছুই বলিতে পারিল না। অসুখ বলিয়া সে সারাদিন বিছানায় পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যা বেলায় উঠিয়া সে উপরের ঘর সারিতে গেল। দেখিল মিনতি আপনি ঘর সারিয়া শেষ করিয়াছে এবং এখন তোতারামের কাছে বসিয়া কীর্ত্তন গাহিতেছে। তার গা জ্বলিয়া উঠিল। সে আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিয়া শুনিয়া কেবলি ফুলিতে লাগিল। "'পীরিতি পীরিতি'। শতেক খোয়ায়ীর বেটার কথা শোন। তোর মুখে ঝাড়ু মেরে আজ তোর পীরিত না ছুটিয়েছি তো আমার নাম মালতী নয়।"

কোমরে কাপড় বাঁধিয়া সে অগ্রসর হইল। সে শুনিল মিনতি বলিতেছে, "তার লোক লজ্জার বড় ভয়"। মনে মনে সে বলিল "আর ভয় কি ঠাকুরুণ? লোকলজ্জার তার বাকী আছে কি?"

ব্যাঘ্রীর মত হিংস্রভাবে সে গিয়া দুজনের মাঝ খানে দাঁড়াইয়া প্রথমে তোতারামকে যা নয় তাই বলিয়া গালি দিল এবং তার পর অপেক্ষাকৃত নরম সুরে মিনতিকে বলিল, "হাঁ মা তুমি ভালমানষের মেয়ে, তোমার এ কেমন রীত। আপনার দিকে না চাইতে মন চায় তো সোয়ামীর মানের দিক তো চাইতে হয়। বাবুর আমার এমন সম্মান, এই একটা হাড় হাবাতে ডেঁপো ছোকরার জন্য তুমি তার নাম হাসাবে! ছি! ছি! মুখে আগুন তোমার পীরিতের—ঝাঁটা মার পীরিতির মুখে"—

"মালতী। বেরো ঘর থেকে—"

তীব্রকণ্ঠে এ পরুষ তিরস্কার শুনিয়া মালতী স্তব্ধ ও চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল আহত সিংহীর মত মিনতি চক্ষু লাল করিয়া তার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তার সমস্ত মুখ রক্তজবার মত লাল হইয়া উঠিয়াছে, কপালের সব কটি শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে। ওষ্ঠাধর অকথিত রোষে ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে—দৃপ্ত তেজস্বিনী সে মূর্ত্তি দেখিয়া মালতী ভয় পাইয়া গেল। এক মুহূর্ত্তে সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল।

"বেরো এক্ষুণি"—আবার মিনতি গর্জ্জিয়া উঠিল—মালতীর সর্ব্বাঙ্গ সহসা ঝাঁকিয়া উঠিল, তার মনে হইল এখনই বুঝি মিনতি তাকে ছিঁড়িয়া খাইবে। সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ মিনতির মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে দ্বারপথে অগ্রসর হইল।

মিনতি তার পিছু পিছু গিয়া বলিল, "সোজা বেরিয়ে যা' সদর দরজা দিয়ে"—

তারপর দরোয়ানকে ডাকিয়া বলিল "মালতীর যা জিনিষ পত্র আছে সব নিয়ে রাস্তায় ফেলে দাও, আর রমেন বাবুকে ব'লে দেও ওর হিসাব চুকিয়ে দিতে।" তারপর হতবুদ্ধি মালতীর দিকে চাহিয়া আবার বলিল "বেরো, বেরো, বাড়ী থেকে।"

মালতী নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল, ক্ষমা ভিক্ষা পর্য্যন্ত চাহিতে তার সাহস হইল না। দুয়ার গোড়ায় মিনতি দাঁড়াইয়া রহিল। মালতীর জিনিষ পত্র সব রাস্তায় পৌছান হইলে সে দুয়ার বন্ধ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উপরে গেল। নিজের শুইবার ঘরে খিল দিয়া সে বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ তার মুখ চোখ শুষ্ক কঠোর হইয়া রহিল—রক্তবর্ণ চক্ষু কড়িকাঠের উপর নিরর্থক রুষ্ট দৃষ্টিতে আবদ্ধ রহিল, সমস্ত অন্তর অসাড় জড়ের মত হইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পর সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুর বান ডাকিয়া গেল। সে অনেকক্ষণ ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

(২১)

প্রত্যূষে যখন মিনতির নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন সে সব ভুলিয়া গিয়াছে। একটা গভীর বিষাদ তার সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু কেন এ বিষাদ, তাহা তার চট্ করিয়া মনে হইল না।

দুয়ার খুলিয়া সে অভ্যাসমত মালতীকে ডাকিতে অগ্রসর হইল। তখন হঠাৎ কাল সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনা তার মনে হইল—নিদারুণ লজ্জায় তার সমস্ত মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। সে সঙ্কুচিত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল।

কি লজ্জা! কি কলঙ্ক! এ কথা তো আর কিছু চাপা থাকিবে না। মালতীই হয় তো আজ সমস্ত সহরময় মিনতির কুৎসা রটাইয়া বেড়াইবে। এতক্ষণ হয় তো সহরের কাহারও সেকথা জানিতে বাকী নাই। লোকের কাছে মিনতি এখন মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া?

এতদিন মিনতি একাগ্রতার সহিত তোতারামকে ঘেরিয়াছিল, সে তাহাতে পরিপূর্ণরূপে তন্ময় হইয়াছিল। তাদের সম্বন্ধের কথা সে না ভাবিয়াছে তাহা নয়, কিন্তু ভাবিতে তার অন্তর মাতৃত্বের গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিয়াছে। সে এত মত্ততার সহিত মাতৃত্বের গর্ব্ব চরিতার্থ করিতে ব্যস্ত ছিল যে তার ব্যবহারের যে এমনি একটা কদর্থ হইতে পারে সেকথা তার মনেই হয় নাই।

মালতী যখন এমনি করিয়া কথাটা মনে করাইয়া দিয়া গেল তখন ভাবিতে ভাবিতে তার মনে হইল যে, একথা লোকে বলিবেই তো। মিনতির বয়স সবে আটাশ, তাকে দেখিতে তার চেয়ে অনেক ছোট দেখায়। তোতারামের বয়স ২১।২২ আর সে সুগঠিতদেহ, বলিষ্ঠ, সুপুরুষ। তার সঙ্গে মিনতির এতটা মাখামাখি মেশামেশিতে লোকে কুকথা বলিবে না কেন? কতদিন তো তারা একাকী নির্জ্জনে থাকিয়াছে;—যখন সমস্ত বাড়ীর লোক নিদ্রিত হইয়া গিয়াছে তখনও মিনতি বসিয়া তোতারামের সঙ্গে আলাপ করিয়াছে—এসব সত্ত্বেও সে কেমন করিয়া লোককে বিশ্বাস করাইবে যে সে নিষ্পাপ, নির্দ্দোষ। কেহ তো বিশ্বাস করিবে না—তার স্বামীও তো বিশ্বাস করিবেন না। হায়, তবে মিনতির কি উপায় হইবে?

ভাবিতে ভাবিতে সে হাঁপাইয়া উঠিল। কোনও দিক দিয়া সে কোনও কূলের আভাস পাইল না, অকূল সাগরে ভাসিতে লাগিল—দারুণ হতাশায় অবসন্ন হইয়া সে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

একটা দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, খোকাবাবু মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করিতে চান।

কি লজ্জা! কাল যাহা হইয়া গিয়াছে তারপর সে আর তোতারামের কাছে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে? তার মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল।

সে বলিল, "বলগে আমার শরীর ভাল নেই, আমি এর পরে যাব'খন।"

ঝি বলিল, "তিনি চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছেন, এখনি যাবেন, তাই বিদায় হ'তে চান।"

"চলে যাবে" কথাটায় মিনতির হৃদয়ের ভিতর দিয়া একটা বিদ্যুতের শিখা জ্বলিয়া গেল। সে বলিয়া উঠিল, "চলে যাবে কিরে?"

"হাঁ মা তিনি ব'লছেন তাঁর চলে যেতেই হ'বে, একবার গুরুজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এখন না ক'রলেই নয়।"

মিনতি তড়াক্ করিয়া উঠিয়া বসিল। চলে যাবে? সে হইতেই পারে না। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে সে আবার হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। কেন সে যাইবে না? এমন মিথ্যা কলঙ্ক; এমন অপমানের পর সে যাইবে না কেন? মিনতিই বা কি বলিয়া তাহাকে থাকিতে বলিবে? ইহার পর যদি সে এখানে থাকে তবে তো কলঙ্ক আরও সহস্রমুখে ছড়াইয়া পড়িবে।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে বলিল, "ডাক তাকে এখানে।"

তোতারাম আসিতে আসিতে, মিনতি তাকে কি বলিবে তার মুশাবিদা করিতে লাগিল। কিন্তু যখন তোতারাম ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল তখন মিনতি কেবল নিদারুণ লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিল, তার মুখে একটি কথাও ফুটিল না। কাল যাহা হইয়া গিয়াছে তাতে যে তোতারামের সামনে মুখ দেখাইতেই তার লজ্জায় মরিতে ইচ্ছা হইতেছে।

তোতারামও গম্ভীর হইয়া নত-নয়নে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পর তোতারাম বলিল, "বিদায় নিতে এলাম মা। আর এখানে আমার থাকা উচিত নয়।"—বলিয়া সে নীরবে মিনতির পদধূলি লইল।

মিনতি অনেকবার মুখ তুলি তুলি করিয়াও তুলিতে পারিলনা, কথা বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। শেষে যখন তোতারাম একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল, তখন সে প্রচণ্ড চেষ্টা করিয়া বলিল, "যেয়ো না, থাম।"

তোতারাম থামিল। মিনতি মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কাল যে কথা হ'য়ে গেছে তারপর তোমাকে আমার কাছে থাকতে বলে আমি তোমাকে অপমান ক'রবো না। কিন্তু এতদিন তোমাকে রেখে আজ যদি আমি তোমাকে এ বাড়ী হ'তে যেতে দিই তবে—তবে আমি প্রাণে বাঁচবো না। তুমি যেয়ো না। তোমার ধন-দৌলত নিয়ে তুমি তোমার পূর্ণাধিকারে এখানে থাক—আমিই যাই। এ বাড়ী তোমারই। আমার এতে কোনও অধিকারই ছিল না। কোনও অধিকার পাবার অবসরও হয় নি—আমাকে এ অপরাধের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তুমি যেতে পারবে না। আমারই যেতে হ'বে। আমার প্রতি যদি তোমার এতটুকুও দয়া থাকে, যদি স্ত্রীহত্যায় তোমার একটুকুও ভয় থাকে, তবে তুমি যেয়ো না।"—

এ কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঝি দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া বলিল, "মা, বাবু!"

আর সঙ্গে সঙ্গে শিশির আসিয়া চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইল।

মিনতির সর্ব্বাঙ্গ ঝাঁকিয়া উঠিল। শিশিরের চেহারা অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। সে লম্বা দাড়ী রাখিয়াছে, চুল দাড়ী পাকিয়া গিয়াছে, মুখ শীর্ণ হইয়াছে, চক্ষু কোটরে ঢুকিয়াছে। কিন্তু তবু আজ আট বছর পরে মিনতির তাকে চিনিতে কিছুই বিলম্ব হইল না। সে চমকিত স্তব্ধ হইয়া ভূতাবিষ্টের মত এক মুহূর্ত্তে শিশিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

তারপর তার সংবিৎ ফিরিয়া আসিল। সে উঠিয়া শিশিরের পায়ের কাছে ঝুঁকিয়া প্রণাম করিল।

শিশির তিন পা পিছাইয়া গেল।

শিশির বাহির হইতেই মিনতির শেষ কথা কয়টা শুনিয়াছিল, "আমার প্রতি যদি তোমার বিন্দুমাত্র দয়া থাকে। যদি স্ত্রী হত্যার তোমার এতটুকুও ভয় থাকে, তবে তুমি যেয়ো না।"

শুনিয়া সে ভীষণ একটা আতঙ্ক লইয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল। সেখানে দেখিল মিনতির সম্মুখে এক সুদর্শন যুবক সন্ন্যাসী—আর মিনতি স্তব্ধ, ভীত, চমকিত।

শিশিরও ভয়ানক স্তব্ধ হইয়া গেল, অনেকক্ষণ সে কোনও কথা কহিতে পারিল না, কোনও সংবিৎ তার রহিল না।

যখন মিনতি তাকে প্রণাম করিতে আসিল তখন সে সর্পভীত পথিকের মত তার স্পর্শ হইতে দূরে সরিয়া গেল।

তারপর সে কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল "দিলীপ!"

পশ্চাৎ হইতে ইংরাজী পরিচ্ছদধারী এক সুন্দর যুবক আসিয়া পাশে দাঁড়াইল।

অবসন্ন হইয়া যুবকের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া শিশির এলাইয়া পড়িল। যুবক তাহাকে বলিষ্ঠ বাহুতে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া পাশের ঘরে লইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

বাংলায় ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজ শাসনের ইতিহাস *

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাংলায় ইংরেজী শিক্ষার আদি ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা দেখিয়াছি, ইংরেজেরা প্রথমে এদেশে ইংরেজী-শিক্ষা প্রচার করিতে একেবারে নারাজ ছিলেন। তাঁহাদের একটা ভয় ছিল,—ইংরেজী শিখাইতে গিয়া কি জানি এদেশের লোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর কোনরূপ আঘাত দেওয়া হয়,—কি জানি তাহাদের চিত্তে এই সন্দেহ জাগিয়া উঠে—দেশের নূতন রাজা যাঁহারা হইয়াছেন তাঁহারা দেশের লোককে আপন ধর্ম্মাবলম্বী করিতে চাহেন। ইহা অপেক্ষাও নিগূঢ় আর একটা কথা ছিল,—লায়ন স্মিথ প্রভৃতি অনেক ইংরেজ সে কথা বলিয়াছেন,—তাহা এই,—ভারতবর্ষের লোকদের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে ভেদ আছে, হিন্দু-মুসলমান ভেদ, হিন্দুদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে যে ভেদ বিরোধ আছে ইহার উপর ইংরাজের প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠিত; এই ভেদ বিরোধ যতদিন থাকিবে ততদিন ইংরেজের মার নাই, আর তাহাদের মনে হইয়াছিল পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা যদি এদেশে দেওয়া হয় তাহা হইলে পশ্চিমদেশে যেমন লোকের প্রাচীন বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া নূতন বিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সেইজন্য সমাজে যেমন একটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, যে শিক্ষা বিপ্লবের ফলে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, এখানেও বা হয়ত তাহাই হইবে, জাতি বর্ণ ও ধর্ম্ম-বিরোধ মিটিয়া যাইবে, তাহা যদি হয় তাহা হইলে ইংরাজের পক্ষে ইচ্ছামত এদেশ শাসন করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এই এই ভয়ে ইংরেজী শিক্ষা এদেশে প্রচারিত হউক বহুদিন এই ইচ্ছা তাঁহারা একেবারেই করেন নাই।

১৮১৩খ্রীঃ পার্লেমেণ্ট ঠিক করিলেন ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে যে টাকা বৎসর বৎসর উদ্বৃত্ত থাকিবে অর্থাৎ এখানকার খরচ কুলাইয়া এবং বিলাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যে ঋণ ছিল তাহার বার্ষিক সুদ দিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা হইতে বৎসরে অন্ততঃ এক লাখ টাকা এদেশের লোকের শিক্ষার জন্য খরচ করিতে হইবে। কিন্তু এখানকার রাজপুরুষেরা বহুদিন পর্য্যন্ত কিছুই করিতে রাজী হন নাই, কেমন করিয়া এই টাকা খরচ করিতে হইবে তাহা ভাবিয়া পান নাই। ডিরেক্টরেরা বলিলেন—টাকাটা স্কুল কলেজ করিয়া খরচ করিলে চলিবেনা, দেশে যে সকল হিন্দুমুসলমান প্রাচীন অধ্যাপকবর্গ আছেন তাঁহাদিগকে কিছু কিছু বৃত্তি দিয়া আর সম্ভব হইলে ভদ্রলোকদের বাড়ীতে বাড়ীতে শিক্ষক পাঠাইয়া তাঁহাদের লেখা পড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ১৮২৩ খ্রীঃ যে কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন গঠিত

* থিওসফিকেল সোসাইটী হলে ২৩।৯।২৬ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা। শ্রীইন্দ্রকুমার চৌধুরী কর্ত্তৃক সংক্ষেপ লিখন পদ্ধতি মতে লিখিত।

হইল তাহার উপর এই টাকাটা খরচের ব্যবস্থার ভার অর্পিত হইল। তাঁহারা ঠিক করিলেন একটা উচ্চ অঙ্গের সংস্কৃত টোল এবং একটা মাদ্রাসা এখানে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এবং শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের লোকের প্রতি নূতন রাজপুরুষদের কর্ত্তব্য পালন করিবেন। রামমোহন রায় কিন্তু ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, ইহা দ্বারা আমাদের সমূহ অকল্যাণ হইবে, গভর্ণমেন্ট এদিকে যখন কিছু করিতে দিলেন না তখন ইংরেজী শিক্ষার জন্য দেশের লোক লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষায় আমাদের যে সমূহ লাভ হইবে ইহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহার কারণ, কিছুদিন পূর্ব্বে ডেভিড্ হেয়ার—যাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি আপনারা ওখানে (কলেজ স্কোয়ারে) দেখিতে পান তিনি—এদেশে আসিয়া প্রথম ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি ঘড়িওয়ালা হইয়া আসেন, পকেটওয়াচ্ সারাতেন, খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে মিশনারী হইয়া তিনি আসেন নাই। এ দেশের বালকেরা স্কুল কলেজে যায় না, লেখা পড়া শিখিতে চায়না দেখিয়া তাঁহার চিত্তে শিক্ষা দিবার ভাব জাগিয়া উঠে, ভদ্রলোকের ছেলেদের ধরিয়া এবং যাহারা ভদ্রলোক নয় তাহাদের ছেলেদিগকেও ধরিয়া তিনি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার যত্নে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি এদেশের লোকের অনুরাগ জন্মে। তাহার ফলে হিন্দু মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮১৭খ্রীঃ আমাদের দেশের লোকেরা তাহা করেন, গভর্ণমেন্ট কোন প্রকার টাকা কড়ি, এমন কি উৎসাহ পর্য্যন্ত দেন নাই। তখনকার শাসনকর্ত্তা মার্কুইস অব হেষ্টিংস উদারমতি লোক ছিলেন, যাহাতে এদেশের লোকের উন্নতি হয় সে বিষয়ে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেইজন্য তিনি এই পর্য্যন্ত করিলেন কোন বাধা দিলেন না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজপুরুষেরা বাধা দিতেন। কেরী সাহেব যখন ধর্ম্মতলায় স্কুল খুলিতে চাহিলেন তখন তাঁহাকে ডিপোর্ট করিবার ভয় দেখান হয়, কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে তিনি বাঁচিয়া যান, তখন গভর্ণমেণ্টের এই প্রকার ভাব ছিল। মার্কুইস অব হেষ্টিংস সাহায্য করেন নাই বটে, কিন্তু বিরুদ্ধাচরণও করেন নাই। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারতি হাইড্ ইষ্টের বাড়ীতে যে সভা হয় তাহাতে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা উঠে, সে টাকার দাম এখন ৫ লাখ টাকা হইবে, সেই টাকাতে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়, বহুদিন পর্য্যন্ত রাজপুরুষেরা কিছুই করেন নাই। ১৮২৩ খ্রীঃ হইতে একদল লোক বলিতে আরম্ভ করিলেন পার্লেমেণ্ট যে টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন তাহা দ্বারা এদেশের প্রাচীন সংস্কৃত বা আরবী পার্সী সাহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। আর একদল বলিলেন তাহা নহে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান বিস্তারে এই টাকা খরচ হউক, প্রথমোক্ত দলকে অরিয়েণ্টেলিষ্ট ও শেষোক্ত দলকে এংলিসিষ্ট বলা হয়। শিক্ষার নীতি লইয়া উভয়দলে একটা ঝগড়া বাধিয়া উঠে। ১৮২৩—৩৫ পর্য্যন্ত এই ঝগড়া চলে। ১৮৩৫ খ্রীঃ লর্ড বেণ্টিঙ্ক এক ইস্তাহার জারি করিয়া বলেন—টাকাটা ইংরেজী শিক্ষা, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষায় খরচ করা হইবে, আর সেই শিক্ষা ইংরেজী ভাষার সাহায্যে দেওয়া হইবে, ইহাই শেষ মীমাংসা বলিয়া হীত হইল।

তাহার পরেও কিন্তু বেশী কিছু হইল না। ১৮৩৫—৫৪ পর্য্যন্ত কাজে কিছুই হইল না। ১৮৫৪ খ্রীঃ ডিরেক্টরেরা ঠিক করিলেন এ বিষয়ে কিছু পরিশ্রম করিতে হইবে। ইতিমধ্যে ১৮৫৪ খ্রীঃ এর আগে আমাদের দেশের লোক অনেকগুলি ইংরাজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। এলেক্জাণ্ডার ডাফ নামে একজন ইংরেজ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে এদেশে আসেন তিনি জেনারেল এসেমব্লী ইন্‌ষ্টিটিউশান কলেজ—যাহা এখন স্কটীসচার্চ্চ কলেজ নামে পরিচিত তাহা—স্থাপন করেন। এই কার্য্যে তিনি হিন্দুদের যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন, বিশেষভাবে রামমোহন রায় ডাফ সাহেবকে সাহায্য করেন। ইহা ছাড়া কেরী মার্সমেন ও ওয়ার্ড সাহেব শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার ও শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে এখানে জায়গা দেন নাই, শ্রীরামপুর দিনেমার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেখানকার রাজা তাঁহাদিগকে কলেজ স্থাপনের অনুমতি দেন। শ্রীরামপুর যখন ইংরেজের হাতে আসে তখন যে কবলা হয়, তাহাতে লেখা হয়, শ্রীরামপুর কলেজ দিনেমারদিগের হাতে থাকিতে যে নিষ্কর ভূমি ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করিত ইংরেজের হাতেও তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ১৮৩৬ খ্রীঃ হুগলী কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়, মহম্মদ মহসীন নামে একজন খুব ধনী মুসলমান মৃত্যুকালে বিস্তর টাকা—যাহার বার্ষিক আয় ৪৫ হাজার টাকা ছিল তাহা—ঈশ্বরের নামে একটা ট্রষ্টির হাতে দিয়া যান For the service of God. কিন্তু ট্রষ্টিরা তাহা বাজেয়াপ্ত করিতে আরম্ভ করেন। যে টাকাটা তিনি ঈশ্বরের সেবার জন্য দিয়াছিলেন ট্রষ্টিরা দয়া করিয়া তাহা নিজেদের সেবায় নিযুক্ত করেন, বোধ হয় তাঁহাদের "অহং ব্রহ্মোস্মি" জ্ঞান হইয়াছিল। কিন্তু বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট মাঝখানে উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন তোমরা ট্রাষ্টের টাকা এইভাবে খরচ করিতে পারিবেনা। গভর্ণমেণ্ট বলিলেন—তাঁহারা নিজেরা ট্রষ্টি হইবেন। কিন্তু বলিলেই ত হয় না, নবাবী আমল হইলে হয়ত হইত, যেই বলা অমনি হওয়া। কিন্তু ইংরাজের আইন আছে, সেই আইনের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে, কাজেই মামলা বাধিল। কোম্পানির সঙ্গে ট্রষ্টিদের মামলা চলিল, সে মামলা প্রিভি-কাউন্সিল পর্য্যন্ত গেল, প্রিভি-কাউন্সিলের বিচারে ট্রষ্টিরা বরখাস্ত হইলেন এবং ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট মসীন ফণ্ডের ট্রষ্টি নিযুক্ত হইলেন। যখন মামলা হইতেছিল তখন আরোও অনেকগুলি টাকা জুটিয়া গেল। একজন মওতাল বেওয়ারিস মারা যান, সেই টাকা মসীন ফণ্ডে যুক্ত হয়। এই টাকায় ১৮৩৬ খ্রীঃ হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৩ খ্রীঃ গভর্ণমেণ্ট হুগলী কলেজের খরচের ব্যবস্থা করেন এবং মসীন ফণ্ডের টাকা দিয়া মুসলমানদের শিক্ষার সাহায্যের জন্য বাংলার সর্ব্বত্র স্কলারসিপের বন্দোবস্ত হয়। হুগলী কলেজের জন্য ঐ টাকা এখন আর খরচ হয় না। ১৮৩৬—৭২ পর্য্যন্ত ৩৬ বৎসরকাল মসীন ফণ্ডের টাকা দ্বারা হুগলী কলেজ রক্ষিত হইয়াছিল।

মিসনারীরা আরোও কলেজ করেন। স্কটলণ্ডের একটা খৃষ্ট সম্প্রদায় বা চার্চ্চ কর্ত্তৃক

জেনারেল এসেম্বলী ইন্‌ষ্টিটিউসনের প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সম্প্রদায় দেশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। যখন স্কটলণ্ডে বিরোধ উপস্থিত হইল এখানেও সেই বিরোধের ঢেউ দেখা দিল। তাহার ফলে জেনারেল এসেম্বলী ইন্‌ষ্টিটিউশন প্রেসবিটারিয়েনদের হাতে রহিয়া গেল। ডফ সাহেব, যিনি ফ্রি-চার্চ্চদলভুক্ত ছিলেন, তিনি ফ্রি চার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউশান নাম দিয়া নিমতলা ঘাটে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৫৪ খ্রীঃ বিলাতের বোর্ড অব ডিরেক্টাররা ঠিক করিলেন এদেশে রীতিমত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার ফলে স্যার জন উড্ ডিসপেচ্ আসিল—যাহার সামান্য উল্লেখ গতবারে করিয়াছি। আমরা যখন অল্পবয়স্ক ছিলাম তখন ঐ ডিসপেচকে অনেকে আমাদের এডুকেশনল চার্টার বলিয়া মনে করিত। ১৮৫৮ খ্রীঃ এর কুইন্‌স্ প্রক্লেমেশানকে যেমন অনেকে পলিটিকেল চার্টার বলেন তেমনি ১৮৫৪ খ্রীঃ শিক্ষা বিষয়ক ডিসপেচকে অনেকে এডুকেশানেল চার্টার বলিতেন। ইহার মূল নীতি ছিল গভর্ণমেণ্ট নিজে সাক্ষাৎভাবে এদেশের লোকের শিক্ষার জন্য বেশী টাকা খরচ করিবেন না। কিন্তু দেশের লোকেরা নিজেদের শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা করিবেন তাহাতে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবেন। এই উদ্দেশে তাঁহারা বিলাতের গ্রেণ্ড ইন এইড্ সিষ্টেম এদেশে প্রবর্ত্তিত করেন। বিলাতে ঐ প্রণালী দ্বারা আশ্চর্য্য রূপ শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে। এখন শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট সব টাকা দেন। আগে গ্রেণ্ট ইন্ এইড্ সিষ্টেম ছিল। অনেক স্কুল এই প্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্কুল স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৪ খ্রীঃ এর আগে চারিদিকে শিক্ষার বিস্তার আরম্ভ হইল।

১৮৫৪ খ্রীঃ এর ডিসপেচে গভর্ণমেণ্ট বলেন—

As a Government we can do no more than direct the efforts of the people and aid them wherever they appear to require most assistance. The result depends more upon them than upon us and although we are fully aware that the measures we have now adopted will involve in the end a much larger expenditure upon education from the revenues of India, or in other words, from the taxaton of the people of India, than is at present so applied, we are convinced, with Sir Thomas Munro, in words used many years since, that any expense which may be incurred for the object, will be amply repaid by the improvement of the country; for the general diffusion of knowledge is inseparably followed by more orderly habits, by increasing industry, by taste for comforts of life, by exertion to acquire them, and by growing prosperity of the people.

ইংরেজী শিক্ষা দিলে তাহার ফল কি হইবে? কোন আধ্যাত্মিক আদর্শের কথা, মনুষ্যত্ব

বৃদ্ধি পাওয়ার কথা,—আমরা এখন যে ভাবে মনুষ্যত্ব বিকাশের কথা বুঝি—আমরা মনুষ্য হইব—এই ভাবে গভর্ণমেণ্ট জিনিষটীকে দেখেন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল প্রথমতঃ ঐ orderly habit এর উপর। আমাদের আচার-ব্যবহার সংযত হইবে সেইটীর উপর তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল। এ কথার পিছনে অনেক ভাব আছে, অনেক ভয়ও আছে। কেননা তখনকার একজন ইংরেজ বলিয়া গিয়াছেন এদেশের লোক অত্যন্ত শান্ত শিষ্ট সুশীল বটে, কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মে যদি আঘাত করা যায় তাহা হইলে তাহারা হিংস্র জন্তুর মত ভীষণ হইয়া উঠে। সুতরাং orderly habit হইলে হঠাৎ মারামারি করিবেনা, রাজ্যের শান্তি রক্ষা করিবে, বেশী পরিশ্রম করিবে, বেশী পরিশ্রম করিলে বেশী পণ্য উৎপাদন করিবে, আর জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে তাহাদের মতি হইবে, এদিকে একটু লোভ হইলে তাহারা এগুলি উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করিবে, তাহার ফলে লোকের সাংসারিক উন্নতি হইবে। আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি—আমার কাছে যে জিনিষ বেচিতে আসিবে—তাহার প্রথম কথা হইবে—আমার সমাজে শান্তি থাকা চাই, না হইলে তাহার পণ্যসম্ভার রক্ষার ভরসা থাকেনা। সে যে পণ্য নিয়া আসিবে আমাকে তাহা কিনিতে হইবে, এবং কিনিতে হইলেই আমাকেও কিছু কিছু উৎপন্ন করিতে হইবে। কারণ, পণ্য বিনিময়ে বাণিজ্য চলে। এক জাতির পণ্য অন্য জাতি পণ্যের বিনিময়ে গ্রহণ করে। আমরা যা উৎপন্ন করি তাহা দিয়া ইংরেজ যাহা উৎপন্ন করে তাহা গ্রহণ করি—এই ভাবে কারবার চলে, নগদ টাকার কারবার হয় না, সুতরাং আমাদের ইন্‌ডাষ্ট্রী যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে আমরা ইংরাজের পণ্য বেশী পরিমাণে নিতে পারিব। তারপর সাংসারিক ভোগ বিলাসের প্রতি যদি আমাদের লোভ হয় তাহা হইলে তাহারা আমাদের ভোগ বিলাসের জিনিষ যোগাইবে, একথা ভুলিলে চলিবেনা।—আমরা চিরদিন কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যমন্তঃ আদর্শের অনুসরণ করি নাই। বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসে, বাৎস্যায়ান সূত্রে এবং অন্যান্য গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাই, যশোধরের টীকার সাহায্যে বাৎস্যায়ন সূত্র যদি একবার চোখ বুলাইয়া পড়ি তাহা হইলে আমাদের প্রাচীন ক্রিয়া-কলাপ ও খাওয়া-দাওয়ায় ভোগ-বিলাসের কিরূপ ব্যবস্থা ছিল জানিতে পারি। ইংরেজেরা কি ভোগবিলাস করিতেছে, তাহাদের ভোগ বিলাসের চাইতে অনেক বেশী ভোগবিলাস আমাদের দেশে ছিল। ভারতচন্দ্রের কবিতায় পড়িয়াছি—

চন্দ্রসার ১৬ কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ ৬৪ কলায়।

বাল্যকালে মনে করিতাম ১৬কে ৪ গুণ করিয়া বুঝি ৬৪ করা হইয়াছে, তাহা নহে, ১, ২, ৩, ৪ করিয়া ৬৪ পর্য্যন্ত কলা বা আর্ট আমাদের দেশে ছিল। মহাভারতে সকলেই পড়িয়াছেন কুরু সভায় যখন পাণ্ডবেরা বসিয়া ছিলেন আর এদিকে গোপনে জতুগৃহ দাহের

ব্যবস্থা হইয়াছিল, তখন বিদুর সভায় বসিয়া দুর্য্যোধনাদির চক্রান্ত পাণ্ডবদিগকে বলিয়া দেন—অমুক মুখো ঘর, বাহির হইবার পথ অমুক দিকে, অমুক সময় আগুন জ্বলিবে, সুতরাং ঘর হইতে বাহির হইতে হইবে, এমন ভাবে বাহির হইবে শত্রুরা যেন মনে না করিতে পারে তোমরা পলায়ন করিয়াছ। তোমরা চলিয়া গেলে ৫ জনের লাস যেন পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া যাইবে—এই সমস্ত কথা সভার মাঝখানে দুর্য্যোধনের সামনে বিদুর বলিয়াছিল, কিন্তু দুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে পারে নাই, বুঝিল শুধু যুধিষ্ঠির আর বিদুর। বাৎস্যায়নের বিবরণে পাই,—একটা কলা ছিল,—প্রকাশ্যভাবে কথা বলিবে কিন্তু তাহার গোপন অর্থ থাকিবে, যাহারা কলা জানে কেবল তাহারা বুঝিবে, অন্যে বুঝিবে না। এখন জাপানে জিউজিৎসু আছে কিন্তু আমাদের দেশেও তাহা ছিল। আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে আজকাল দস্যুরা ধরিয়া লইয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলের অনেক স্থলে তাহা ঘটিয়াছে। ইহা সম্ভব হইত না যদি এই কলা—জিউজিৎসু বিদ্যাটা—আমাদের জানা থাকিত। ইহাও ৬৪ কলার এক কলা। দস্যু যখন আক্রমণ করিতে আসিয়া স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দেয় তখন হাতখানি ধরিয়া এমনভাবে ঘুরাইয়া দেওয়া যায় যাহাতে হাতখানি একেবারে চিরদিনের মত বিকল হইয়া পড়ে, অত্যাচার করিবার এমন কি নড়িবার পর্য্যন্ত শক্তি থাকে না। কাপড় পরিবার কলা ছিল, এমনভাবে কাপড় পরিতে হইবে কেহ খুলিতে পারিবে না। ফুলের মালার ভিতর চিঠি পাঠান হইত, মালা এমনভাবে তৈরী করা হইত, যাহারা সংকেত জানিত, বুঝিতে পারিত মালার ভিতর কি আছে। তারপর, রন্ধন, তলোয়ার খেলা, লাঠী খেলা, মল্লযুদ্ধ—এ সবও ৬৪ কলার অন্তর্গত ছিল। বাৎস্যায়ন সূত্রখানি একবার পাতা উল্টাইয়া দেখিলেই বুঝিবেন কি আশ্চর্য্য ভোগবিলাসের ব্যবস্থা এদেশে ছিল। বাড়ীতে যখন স্বামী আসিবে, স্ত্রী কি ভাবে স্বামীর অভ্যর্থনা করিবে তাহারও পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে। স্বামী পুষ্প বাটিকায় প্রবেশ করিলেন,—তখন বাড়ীর চারিদিকে বাগান থাকিত, গার্ডেনিং ও টাউন প্লেনিং ছিল,—বাড়ীর ভিতর প্রবেশের সময় স্ত্রী সুগন্ধি সুরা হাতে স্বামীর অভ্যর্থনা করিবে। শয্যা ঘরের যে বর্ণনা আছে তাহা অদ্ভুত। বিছানার কাছে মর্ম্মরনির্ম্মিত ত্রিপদী ছিল ইংরেজীতে যাহাকে টেপর বলে,—উহা প্রাচীন ত্রিপদী শব্দের অপভ্রংশ। দুর্গোৎসব প্রভৃতির সময় যাহার উপর প্রতিমা সাজাইয়া রাখা হয়, সেই ত্রিপদীর উপর মদের বোতল—ঠিক বোতল নয়, ইংরাজীতে যাকে ডিকেণ্টার বলে, কলসের মত তাহা—থাকিত। এই সকল অসাধারণ ভোগবিলাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে আমরা যে একেবারে কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ছিলাম তাহা নহে। যখন এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য ছিল তখন আমাদের বহির্বাণিজ্য ছিল। ভারত সাগরের চারিদিকে আমাদের বাণিজ্যপোত ভ্রমণ করিত। আমাদের দেশের পণ্য চীন ইজিপ্ট প্রভৃতি নানাদেশে বিক্রয় হইত। মধ্যযুগে সব লোপ পাইয়াছে,—এমন লোপ পাইয়াছে আমরা আমাদের প্রাচীন ভোগ বিলাসের কল্পনাও এখন করিতে পারি না। এত ধন,

এত ঐশ্বর্য্য, এত ভোগবিলাস, এমন সাংসারিক অভ্যুদয় হইয়াছিল, আমরা এখন তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারি না। ইংরেজ যখন এদেশে আসে তখন আমরা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলাম, বিদ্যাতে, ধনে, সভ্যতায় সকল বিষয়ে আমরা ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলাম। ইংরেজ দেখিল—এদেশের সঙ্গে যদি ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাদের ষ্টেণ্ডার্ড অব্ লিভিং—জীবন যাত্রার আদর্শ—বাড়াইয়া দিতে হইবে। ৮ হাতি মোটা জুগিয়ান কাপড় পরিলে চলিবে না। বাল্যকালে এই কাপড়কে জুগিয়ানা কাপড় বলিত, এখন গুর্জ্জর হইতে নূতন নাম এসেছে খদ্দর। ছেলে বেলায় দেখিয়াছি ভদ্রলোকেরা—এমন কি জমিদারেরা পর্য্যন্ত—৮ হাতি কাপড় পরিতেন। ঢাকা মসলিনের কথা শোনাই যায়; কচিৎ কেহ উহা পরিতেন, বিবাহের পট্টবস্ত্ররূপে, অথবা পূজা কিম্বা অন্যান্য উৎসবে ধনী যাঁরা তাঁরাই উহা ব্যবহার করিতেন, বিবাহ, তা না হয়, সামান্য ভাবেই হইত। এই অবস্থা আমাদের হইয়াছে, এ অবস্থায় আর একটা পণ্যসম্ভার আসিলে কখনও বেশী কাটতি হইতে পারে না। সেইজন্য ইংরেজেরা বলিলেন—এদেশের ভোগবিলাস বাড়াইতে হইবে। এত কথা এইজন্য বলিলাম—১৮৫৪ খ্রীঃ এর ডিসপেচের পিছনে বণিক বৃত্তির যাহা প্রয়োজন তাহার প্রেরণা ছিল।

কিন্তু তবু গভর্ণমেণ্ট কিছু করিলেন না। কারণ, এদেশে শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর তখন তাঁহাদের ছিল না। লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কেমন করিয়া পররাষ্ট্র হরণ করিয়া বৃটীশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবেন সেদিকে তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি ছিল। লোকশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি করিবার অবসর তাঁহার ছিল না। সুতরাং ১৮৫৪ খৃঃ ডিসপেচ আসিল বটে কিন্তু কাজে কিছু হইল না। আমি আগে বলিয়াছি মাওয়েট সাহেব পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশন কমিটীর সেক্রেটেরী ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁহাকে স্কুল কলেজ পরিদর্শন করিতে হইত। তখন ডিরেক্টর, ইন্‌স্পেক্টর ছিল না। দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, সব স্কুল কলেজগুলিকে যদি একটা অর্গেনিজেশনের অধীনে আনিতে হয়, তাহা হইলে একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। এইজন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব করেন। কেমেরণ সাহেব কমিটীর সভাপতি ছিলেন, তিনি ডাঃ মাওয়েটের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেন। সেই প্রস্তাবের আলোচনা উপলক্ষে পার্লেমেণ্টরী কমিটি বলেন :—

"Some years ago we declined to accede to a proposal made by the Council of Education and transmitted to us, with the recommendation of your Govt, for the institution of a University in Calcutta. The rapid spread of a liberal education among the native of India since that time, the high attainments shown by the native candidates for Govt scholarship and by native students in private institutions, the success of Medical College and the requirements of an increasing European and Anglo-Indian population

have led us to the conclusion that the time has now arrived for the establishment of Universities in India which may encourage a regular and liberal course of education by conferring academical degrees as evidences of attainment in the different branches of art and science, and by adding marks of honour for those who may desire to compete for honorary destinction.

The council of Education in the proposal to which we have alluded, took London University as their model, and we agree with them that the form, government and functions of that university are best adopted to the want of India, and may be followed with advantage, although some variation will be necessary in points of detail.

We desire that you take into your consideration the institution of Universities in Calcutta and Bombay, upon the general principles which we have now explained to you and report to us upon the best method of procedure with a view to their incorporation by acts of the Legislative Council of India.

We shall be ready to sanction the creation of a University at Madras, or in any other part of India where a sufficient number of institutions exist from which properly qualified candidates for degrees could be supplied, it being in our opinion advisable that the great centres of European Govt and civilisation in India should possess university similar in character to those which will now be founded as soon as the extension of a liberal education shows that their establishment would be of advantage to the native communities."

তাহার পর ১৮৫৭ খ্রীঃর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে—যাহার সভাপতি ছিলেন গভর্ণর জেনারেল—ইউনিভার্সিটী এক্ট পাশ হয়। লর্ড ক্যানিং তখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাহার প্রথম ফেলো নির্ব্বাচিত হন—ডাক্তার এফ, জে, মাওয়েট, রেভাঃ এঃ, ডাফ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামাপ্রসাদ রায়; রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ এবং কলিকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মৌলভী মহম্মদ উজি। ১৩টী কলেজ লইয়া এই ইউনিভার্সিটী প্রতিষ্ঠিত হয়।

১। প্রেসিডেন্সি কলেজ,—প্রথমতঃ ইহা হিন্দু কলেজরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ১৮৫৫ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়। ডাফ সাহেবের জেনেরেল এসেম্বলী ইনষ্টিটিউশান যে জায়গায় আছে, হিন্দু-মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু-কলেজ প্রথমতঃ তাহার কাছে ছিল, তারপর চীৎপুর রোডে উঠিয়া যায়, সেখান হইতে বৌ-বাজার ফিরিঙ্গিটোলায় আইসে। তখন বৌবাজারের

বিশেষতঃ লাল বাজারে অনেক ফিরিঙ্গি ছিল। আমরা পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, জাহাজ বোঝাই করিয়া যে সকল নাবিক বা সৈনিক লোক এদেশে আসিত তাহাদের অত্যাচারে রাত্রিতে বাস করা কঠিন ছিল। এখান হইতে উঠিয়া যেখানে এখন সংস্কৃত কলেজ আছে সেই বাড়ী তৈয়ার হইলে পর সেই বাড়ীতে উঠিয়া যায়। তখন সংস্কৃত কলেজ ও প্রেসিডিন্সি কলেজ এক বাড়ীতে ছিল। ১৮৭৫ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের নূতন বাড়ী—এখন যেখানে আছে, সেই বাড়ী—তৈরী হয়। তখন রেলিং টেলিং ছিলনা, সায়েন্সের লেবরেটরীও ছিল না, পি. সি. রায় ও একজন সাহেব কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন। একতালায় একটী কোঠাতে কেমিষ্ট্রির ক্লাশ লইত, ইহা ছাড়া আলবার্ট কলেজেও ২।১টী ক্লাশ হইত। ১৮৫৫ খ্রীঃ গভর্ণমেণ্ট প্রেসিডেন্সি কলেজ নিজের হাতে নেন।

২। ঢাকা কলেজ—প্রথমে পাবলিক ইনস্ট্রাকশন কমিটি কর্ত্তৃক ১৮৩৫ খ্রীঃ একটী স্কুলরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৮৪১ খ্রীঃ কলেজরূপে পরিণত হয়, ১৮৫৭খ্রীঃ ইউনিভাসিটী ভুক্ত হয়।

৩। কৃষ্ণনগর কলেজ, ১৮৪৫ খ্রীঃ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪। বহরমপুর কলেজ, একটা স্কুলরূপে ১৮২৬ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তারপর ১৮৫৩ খ্রীঃ বর্ত্তমান নামে কলেজে পরিণত হয়। ইহা আগে গভর্ণমেণ্ট কলেজ ছিল, ১৮৮৬ খ্রীঃ প্রাইভেট মেনেজমেণ্টের হাতে যায়।

৫।৬। জেনারেল এসেম্বলী ইন্‌ষ্টিটিউশান ও ডাফ কলেজ। ১৮৩০ খ্রীঃ ডাফ সাহেব প্রতিষ্ঠিত করেন, ১৮৫৩ খ্রীঃ ফ্রি চার্চ্চ কলেজ আলাদা হইয়া যায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে এই ২টী এফিলেয়েটেড্ কলেজরূপে তাহার অন্তর্ভুক্ত হয়।

৭। শ্রীরামপুর কলেজ,—১৮১৮ খ্রীঃ কেরী, মার্সমেন ও ওয়ার্ড কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে ইউনিভাসিটীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কলেজের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

৮। ১৮৩৫ খ্রীঃ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইহা ছাড়া বাংলা দেশে বোধ হয় আরো একটী কলেজ ছিল. তাহার নাম এখন মনে পড়ে না, বাংলার বাইরে ৪টী কলেজ ছিল, (১) সিংহলের কলম্বোতে একটী কলেজ হয়, (২) আগ্রা কলেজ,—গঙ্গাধর ওঝা নামে একজন শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেকগুলি টাকা দিয়া যান তাহাতে আগ্রা কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়, পরে উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, (৩-৪) নাগপুর অঞ্চলে সম্ভবতঃ ২টী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ১৩টী কলেজ লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়; তখনকার শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহা জানিলে কেবল কৌতূহল নিবৃত্তি হয় এমন নহে অনেক খবরও জানা যায়। বি এ পর্য্যন্ত বাংলা ছিল, ইংরাজী সাহিত্য সকলকে পড়িতে হইত, সেকেণ্ড ল্যাংগুয়েজ ছিল—গ্রীক, লাটিন, হিব্রু, আরবী, পার্সি, উর্দ্দু, বাংলা ও সংস্কৃত। বাংলার পাঠ্য পুস্তক ছিল—

রামায়ণ, মহাভারতের শান্তি পর্ব্ব এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনচরিত। ১৮৫৭ খ্রীঃ ইউনিভার্সিটিতে এণ্ট্রেন্স হয়, ১৮৬৮ খ্রীঃ বি এ হয়। প্রথম বি এ পরীক্ষায় ১৩ জন ছাত্র উপস্থিত হইবেন বলিয়া দরখাস্ত করেন তাহার মধ্যে ৩ জন পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই—হয় সমস্ত সময়ে পারেন নাই অথবা আংশিকভাবে পারেন নাই। বাকী ১০ জনের কেহই সকল বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন এই ১০ জনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন ছিলেন। তিনিও সমস্ত বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই কিন্তু—Board recommended that two candidates namely Bankim Chander Chatterjee and Jadunath Bose who had passed creditably in 5 of the 6 subjects (language group being counted as two subjects) and had failed by not more than 7 marks in the sixth, might as a special act of grace be allowed to have their degrees being placed in the Second Division.

১৮৬৪ খ্রীঃ প্রথম কনভোকেশন হয়। তাহার আগে বার্ষিক সভাতে ডিগ্রী দেওয়া হইত। এফ, এ পরীক্ষায় বাংলা পাঠ্যপুস্তক ছিল—টিলী মেকসের বাংলা অনুবাদ, এবং মহাভারতের শান্তি পর্ব্ব। সংস্কৃত ছিল—কিরাতার্জ্জুনীয় এবং শকুন্তলা। বি এ পরীক্ষায় মরাল ফিলজফির প্রশ্ন কিরূপ ছিল তাহাই নমুনা দেখুন—

(a) Dintinguish between Pride and Vanity.

(b) "He who grieves at his own abstinence is a voluptuary"—Explain fully the import of this assertion.

(c) Strong inducements to vice are sometimes resisted from motives referring to health, or to the maintaining of a good name or other such like consideration. How is such resistance to be morally estimated ?

বি এতে যে দর্শন পড়ান হইত তাহার প্রশ্নের নমুনা দেখুন—

1. What systems of philosophy are implied by the word ষড়্দর্শন ? Who were the authors of those systems ? Which of them were theistic and which atheistic ?

2. What signification do the words উৎপত্তি and বিনাশ bear in the Sankhya philosophy ?

3. How do the বৈশেষিকজ argue for their theory of atoms ? and how does Sankaracharaja meet their argument ? Show the analogy between Vaisesika and the Newtonian arguments in the subject.

4. Explain the platonic sentiment involved in the following passages.

পেলেতো পূর্ব্বজন্ম বিষয়ে এই কহেন যে স্মৃতি ভিন্ন অবগতি নাই, সকল জ্ঞানই স্মৃতি সুতরাং পূর্ব্ব জন্ম অবশ্যই ছিল।

আমার সময় থাকিলে দেখাইতে পারিতাম তখনকার শিক্ষার আদর্শ এবং পরিসর কিরূপ ছিল।

এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে আমাদের চেষ্টায় ইংরেজী-শিক্ষা আরম্ভ ও প্রচারিত হইয়াছিল এবং অনেকগুলি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বি, এ, পর্য্যন্ত বাংলা পাঠ্য দিল, কেবল তাহাই নহে ইংরেজী-ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ের—যেমন ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ইত্যাদির—উত্তর বাংলা ভাষায় লিখা যাইতে পারিত। ইংরেজী ভিন্ন অন্য একটী বিষয় শিক্ষার্থী নির্ব্বাচন করিয়া নিতেন, তাহা সেকেণ্ড ল্যাংগুয়েজ ছিল, এবং সেই ভাষায় উত্তর দেওয়া যাইতে পারিত—Provided it is a living language. অবশ্য সংস্কৃতে যদি গণিতের অথবা ইতিহাসের উত্তর দিতে হয় তাহাতে পরীক্ষক ও পরিক্ষার্থী উভয়েরই বিপদ। বাংলা উর্দ্দু, পার্সি প্রভৃতিতে উত্তর লেখা যাইতে পারিত। আমরা সকলেই এখন দেশী ভাষার ভিতর দিয়া, বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া, উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা হউক ইচ্ছা করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হইতেই সেই চেষ্টা ছিল। ইংরেজী শিক্ষাবিষয়ক নথীপত্র ঘাটিলে আমরা দেখিতে পাই এবং এংলিসিষ্টেরা একদিকে যেমন বলিয়াছিলেন ইংরেজী ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা দিতে হইবে অন্যদিকে ইহাঁও বলিয়া ছিলেন দেশী ভাষার উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। ডাঃ মাওয়েট যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব করেন, তখন তিনি বলেন—৩টী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক; বাংলায় একটী, মাদ্রাজে একটী এবং বোম্বাইতে একটী। তিনি ইহার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন,—এই ৩ প্রদেশে ৩ রকম ভাষা প্রচলিত। বাংলা দেশে বাংলা ভাষা বিস্তৃতরূপে প্রচলিত আছে, যদি বাংলা দেশের জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে হয়, তাহা হইলে আগে বাংলা ভাষার উন্নতি করিতে হইবে। ইংরেজী শিখিয়া কোন ফয়দা হইবে না যদি সে শিক্ষার সাহায্যে বাংলা ভাষার উন্নতি না হয়। মাদ্রাজে তামিল ভাষা প্রচলিত, সেই ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারিত হওয়া আবশ্যক, সেই জন্য মাদ্রাজে পৃথক ইউনিভার্সিটী স্থাপন করিতে হইবে। বোম্বাইএ মারাটী ভাষা প্রচলিত, অবশ্য এখন গুজরাট তাহার সঙ্গে লিখিত হইয়াছে, এই লিংগুইষ্টিক ডিভিশন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। মাওয়েট সাহেব বলিলেন—একভাষাভাষী যাহারা এক প্রদেশে বাস করে তাহাদের জন্য এক একটী বিশ্ববিদ্যালয় আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় দেশীয় ভাষার উন্নতি একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ভগবানের কৃপায় সেই উদ্দেশ্যে বাংলা অপূর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, অন্যান্য প্রদেশও করিয়াছে কিন্তু বাংলার মত অতটা করে নাই।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

শীত

শীত এলো দ্বারে, ভয় কেন ? তারে বরণ কর'
গ্রীষ্মের চেয়ে নয় সে ত কভু ভীষ্মতর।
ওকি ? ত্বরা দ্বার বাতায়ন কর' বন্ধ কেন ?
ভরসা পাওনা ? বরষা ফিরিয়া আসিল যেন ?
কাঁপিতেছ নাকি ? মিছে ভয় তারে করিছ অত।
ভয়ে যে ভয়াল আগুনেরি হ'লে শরণাগত।
গগনে ভানুরে হেরি তবে আজ জানালা খোলো,
তপন আবার বহুদিন পরে আপন হ'লো।
কার কথা শুনে মিছামিছি কোণে লুকাও ভয় ?
দেখ'না সে কত ভেট উপহার এনেছে বয়ে'।
সারা মাঠখানি ভরে' গেছে দেখ সোণার ধানে,
মটর সীমের হরিৎ ডুবেছে বেগুণী বানে।
ভরেছে তোমার দোচালা আঙিনা সজিনাফুলে
দোজমির মাটি ফেঁপে ফেটে উঠে পীবর মূলে।
শোভিছে কমলা গিরিকমলার হাজার করে,
শুষ্ক খেজুর কণ্ঠে মধুর সুরস ঝরে।
মসিনার ক্ষেতে মৌমাছি মেতে পিইছে মধু,
বাসকে বাসকসজ্জা লভেছে কাননবধূ।
বদরীর বনে মাধুরী পেয়েছে বালক বুড়া,
খই হ'য়ে ফুটে রসের ভিয়ানে কনকচূড়া।
প্রান্তরভূমি তিল তিল রূপে তিলোত্তমা,
হেথা পাবে কবি রূপসী নাসার কুসুমোপমা।
সুরভি তারায় শোভিছে অড়র বনের নিশা
শোণের শোণিত পীত হ'য় হরে নয়ন তৃষা।

আফিমের ফুলে রঙীন হইয়া স্বপন ফুটে,
জমে ব্যথাহরা রসায়ন তার বীজের পুটে।
আঙিনার কোণে পালঙ রয়েছে পালঙখানি
শায়িত তাহাতে পীবর লতিকা পূতিকা রাণী।
পাকা কৎবেল চালিতা নাসার জড়তা হরে,
তরুশাখে র'য়ে রসনা মরুরে সজল করে।
অতসীর বনে খেলে প্রজাপতি আতসবাজী—
শমীনিদ্রিত বহ্নি কুসুমে জেগেছে আজি।
স্নেহ মধুময় সরিষার ক্ষেতে চমক লাগে,
ফুলে আলো করে তৈলে সে আলো করার আগে।
আজি আকন্দ নীলকণ্ঠের গাঁথিছে মালা,
ধুতুরা সাজায় অঘোরনাথের পূজার ডালা।
কেদারনাথের ভ্রুকুটী আজিকে যবের শীষে,
শাসনে তাহার ক্ষুদের সঙ্গে দুধ যে মিশে।
বেগুনের গুণে ব্যঞ্জন পরমান্নে জিনে,
আগুন আগুলি' সরিয়া থেক'না এমন দিনে।
মাঠে মাঠে বাজে শোন' মাঝে মাঝে রাখালী বেণু,
রমার রথের চাকায় উড়িছে পথের রেণু।
বন হ'তে মৃগ ছুটিয়া এসেছে ধানের মাঠে,
কোণ হ'তে তুমি জুটিবেনা এসে সোণার হাটে ?
শীতের হাতের দণ্ডের ভয়ে পালাও বঁধু,
দণ্ডটি তার—ইক্ষুদণ্ড—যষ্টিমধু।

———

রায়তের কথা *

কবীন্দ্র শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়তের কথা লিখে রায়তকে গৌরবান্বিত এবং সম্মানিত করেছেন। "রায়তের কথা" অর্থে অবশ্য বুঝতে হবে রায়ত সম্বন্ধীয় কথা, রায়ত কর্ত্তৃক কথিত কথা নয়। তবে রায়ত কর্ত্তৃক কথিত না হলেও রায়তের কৌন্সেল কর্ত্তৃক কথিত হতে পারে, তা সে কৌন্সেল রায়ত কর্ত্তৃক নিযুক্তই হ'ন বা অনিযুক্তই হ'ন। শাস্ত্রে আছে "অনিযুক্তো নিযুক্তো বা ধর্ম্মজ্ঞো বক্তুমর্হতি।" তবে অনিযুক্ত কৌন্সেলের অসুবিধা এই যে তিনি নিযোক্তার উপদেশ (instruction) পান না। আবার যে বিচারককে এইরূপ অনুপদিষ্ট কৌন্সেলের কথায় নির্ভর করে' অভিযোগের বিচার করতে হয়, তাঁরও অসুবিধা কম নয়। তাঁকে অনুপদিষ্ট কৌন্সেলের কল্পিত কথার উপর নিজের কল্পনা যোগ করে' যথাসম্ভব মীমাংসা করবার চেষ্টা করতে হয়। সুতরাং তাতে বাস্তবতার অভাব থাকে। "রায়ত বনাম জমিদার"—মামলায় শ্রীরবীন্দ্রনাথ তাঁর "রায়তের কথায়" সে অভাব পূর্ণ করেন নি।

তিনি বলেন এদেশের ভদ্রলোকেরা রাজপুরুষদের সঙ্গে ভারতের গদি ভাগাভাগি করে' নেওয়ার যে রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ করেছিলেন, তাতে দেশে একটা "প্রগল্‌ভ বাগ্‌বাত্যা বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধস্তরে বিচিত্র বাষ্পলীলা রচনায় নিযুক্ত" ছিল। সেই রাজনীতি বা পলিটিক্‌স্‌ এখন মুখ ফিরিয়েছে। এখন সেই বাগ্‌বাত্যা বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধস্তর থেকে ভূমণ্ডলের মাটির স্তরে নেমেছে এবং সেই মাটি টানাটানি বা কর্ষণ করে' যারা জীবন ধারণ করে সেই রায়তদের মুখের দিকে তাকিয়েছে। এই ভাব-পরিবর্ত্তনকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "নিরুপাধিক প্রেমচর্চ্চা"। কিন্তু যাঁরা এই চর্চ্চা করছেন তাঁরা এর উপাধি দিয়েছেন স্বদেশ-প্রেম। অবশ্য এতে যদি বাস্তবতা না থাকে তা' হলে এও বিদ্যাহীন উপাধির মত "ব্যাধিরেবস্যাৎ।" কিন্তু তাঁরা আশা করেন এবং বিশ্বাস করেন কবিকথিত উচ্চস্তরের বাষ্প ভূমিতলের সংস্পর্শে এসে জল হয়ে ভূমিকে উর্ব্বরা করবে এবং রায়তের পক্ষেও হিতকর হবে।

সকল বিষয়েরই সাধনাতে বাক্ ("রায়তের কথায়" শব্দ) এবং অর্থের প্রয়োজন আছে। সে-কালের কবিরা এই বাগর্থপ্রতিপত্তির জন্য জগতের পিতামাতাকে বন্দনা করতেন। এখনকার কবিরা এই বস্তুতন্ত্রতার দিনে অবশ্য কেবল বন্দনার উপর নির্ভর করতে পারেন না। তাই রবীন্দ্রনাথ "এই নিরুপাধিক প্রেমচর্চ্চার" জন্য "অর্থ" এবং "শব্দের" প্রয়োজন অনুভব করে' ঐ দু'টি পদার্থের সংযোগ-কার্য্যের বিভাগ করে' দিয়েছেন—"শব্দ" সংগ্রহের ভারটা দিয়েছেন "আইন ব্যবসায়ীদের" এবং "অর্থ সংগ্রহের ভারটা দিয়েছেন তাঁদেকে যাঁদের "কারো বা আছে জমিদারী, কারো বা আছে কারখানা।" আইনব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে শ্রম বিভাগটা

*আষাঢ়ের সবুজ পত্রে প্রকাশিত। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত।

ঠিকই হয়েছে। কারণ, আইনব্যবসায়ীদেরই নামান্তর বাগ্‌ব্যবসায়ী। কিন্তু যাঁদের জমিদারী আছে বা কারখানা আছে তাঁদের মধ্যে কাউকে নিষ্কাম রায়ত-প্রেমের বাহুল্যে অর্থব্যয় করতে বড় একটা দেখা যায় না। যদি এমন প্রেমিক থাকেন—আশা করি অনেক আছেন—ত তাঁরা সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার।

তারপর যে আইনব্যবসায়ী, জমিদার এবং কারখানাওয়ালা—এক কথায় বুর্জোয়া—এই রায়ত-প্রেমের চর্চ্চা করছেন, তাঁদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছেন যে, তাঁরা চান "আগে পাতা হ'ক সিংহাসন, গড়া হ'ক মুকুট, খাড়া হ'ক রাজদণ্ড, মানচেষ্টার পরুক কোপনী,—তার পর সময় প'ওয়া যাবে রায়তের কথা পড়িবার" অর্থাৎ দেশের পলিটিক্‌স্ আগে দেশের মানুষ পরে। দেশ আর দেশের মানুষ—এই দু'য়ের পার্থক্য এবং পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে একটা অন্য মতও আছে। সে মতান্তরে বিশ্বজনীন প্রেমের আবির্ভাব ঘটাতে বিশ্বমানবের আর পলিটিক্‌স্ চর্চ্চার আবশ্যক থাকে না। বলা বাহুল্য রায়তও বিশ্বমানবের তেমনি অন্তর্গত যেমন বুর্জোয়া। অতীত যুগে সে চেষ্টাও হয়ে গিয়েছে—রাজপুত্র শাক্যসিংহ থেকে সূত্রধরপুত্র নাজারেথের যীশু পর্য্যন্ত প্রাণপাত করে' সে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার ফল কি হয়েছে? ধনী ও শ্রমীর মধ্যে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান বিবাদ পৃথিবীব্যাপী অশান্তির সৃষ্টি করেছে।

আর এক শ্রেণীর মনীষী আছেন যাঁদের আর একটা মত আছে। সে মতটা হচ্ছে এই যে, জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশ্বমানবের মধ্যে বিশ্বজনীন প্রেমের আবির্ভাব হতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে,—স্বর্গরাজ্য স্থাপনের যোগ্য স্থান এখনও তৈরী হয়নি। এর মধ্যে পৃথিবীর দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করতে রাষ্ট্রনৈতিক শক্তির আবশ্যক। সেই জন্য, তাঁদের মতে, রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি যাতে হস্তগত হয় সেই চেষ্টাই সর্ব্বপ্রথমে করা উচিত। এই মতটা আমাদের দেশের অনেকে বর্ত্তমান দেশকালোপযোগী বলে' গ্রহণ করেছেন। অন্যায় হয়েছে কি? কে তার মীমাংসা করবে?

কবীন্দ্র বলেছেন "এক দল জোয়ান মানুষ রায়তের দিকে মন দিতে সুরু করেছেন। * * * বোঝা যাচ্ছে তাঁরা বিদেশে কোথাও একটা নজীর পেয়েছেন।" এই "জোয়ান মানুষ"গুলি চিরকালই আছেন এবং দুর্ব্বলের দুঃখদারিদ্র্য দূর করতে চিরকালই সচেষ্ট আছেন। রায়তও অন্যান্য শ্রমজীবীর মত আজ সেই দুর্ব্বল দারিদ্র্য-পীড়িতদের মধ্যে। তাই রবীন্দ্রনাথও তাঁর কবিজনোচিত অলঙ্কারবহুল ভাষাকে একবার নিরাভরণ করে' সোজা সত্যকে খুব সোজা করে' বলেছেন "মূল কথাটা এই—রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি।" জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় না কি রায়তের এই শোচনীয় অবস্থাটা ঘটালে কে? কবিরাজ রোগের বর্ত্তমান অবস্থাটা ধরেছেন ঠিকই, কিন্তু নিদানতত্ত্ব (aetiology) সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। একজন জারমান এই নিদানতত্ত্বের আবিষ্কার করেছেন, আর আজও

তাঁর সেই আবিষ্কৃত তত্ত্ব সর্ব্ববাদী দরিদ্রবন্ধুদের মূলমন্ত্র হয়ে দেশে দেশে প্রচারিত হচ্ছে। অন্নের দারিদ্র্য, বস্ত্রের দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য, জ্ঞানের দারিদ্র্য, মনুষ্যত্বের অত্যন্ত-অভাব-জনিত সর্ব্ববিধ দারিদ্র্যের নিদানতত্ত্ব তিনি ইতিহাসের বৈষয়িক ব্যাখ্যান করে' (materialistic interpretation of history) ঐতিহাসিক ঘটনা থেকেই আবিষ্কার করেছেন; পৌরাণিকের অলৌকিক উপাখ্যান থেকে, কবির কল্পনা থেকে নয়। বলা বাহুল্য সেই মহা আবিষ্কারকর্ত্তা কার্ল মার্কস্। তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বের—সমানাধিকারবাদের (communism)—সবিস্তর আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। ১৮৪৮ সালে সমানাধিকার-বাদ-বিজ্ঞপ্তির (communist manifesto) প্রথম প্রচার থেকে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্বত্র এর আলোচনা এবং সমালোচনা হয়েছে এবং দেশকাল ভেদে নানাপ্রকারে নানাজাতি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে "একদল জোয়ান মানুষের" কথা বলেছেন, সে জোয়ান মানুষগুলি এই মার্কসের শিষ্য এবং তাঁরই সঞ্জীবন মন্ত্রে দীক্ষিত। আর যে তিনি বলেছেন "তাঁরা বিদেশে কোথাও একটা নজীর পেয়েছেন"—সে নজীরটা এই সমানাধিকারবাদবিজ্ঞপ্তি। তবে, এটা "made in Europe". ইউরোপের মধ্যে আবার জারমানি! জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক বিষয় "ইউরোপে প্রস্তুত" হলেও আমরা সাদরে গ্রহণ করেছি, আর এইটাই বর্জ্জন করতে হবে? সমগ্র ইউরোপের সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত সুপরিচিত রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এ প্রশ্নের উত্তর দেবার যোগ্যতর ব্যক্তি আর কে আছে? আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বলকারী যে-সকল বিদ্বজ্জন ইউরোপ-প্রদত্ত সম্মান গ্রহণ করে' ইউরোপকেও ধন্য করেছেন, তাঁরা কি এই সমানাধিকারবাদের "নজীর"টাকে "made in Europe" বলেই বর্জ্জন করবেন?

তারপর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "আমি নিজে জমিদার, এই জন্য হঠাৎ মনে হতে পারে আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই।" এর কৈফিয়ৎও তিনি নিজেই দিয়েছেন, বলেছেন "ওটা মানবস্বভাব," সুতরাং "দোষ দেওয়া যায় না।" এর ওপর অবশ্য বলবার কিছু থাকতে পারে না। তবুও দুঃসাহসের সহিত বলতে ইচ্ছা হয় যে ঠিক এই ন্যায়ের বলেই গরীব রায়ত তার প্রাণটা বাঁচাতে চায়। জমিদারের "আসন" মানে ধন, প্রভুত্ব, সংসারের সমস্ত উপভোগ্যের ভোগ এবং ভোগের অক্ষুণ্ণ শক্তি। আর গরীব রায়তের প্রাণ মানে দারিদ্র্য, দাসত্ব, সংসারের সমস্ত দুঃখযন্ত্রণার ভোগ এবং ভোগের জন্য নীরব অক্লান্ত সহিষ্ণুতা। জমিদার রায়তের বিবাদটা "আছে-নাই-এর" বিবাদ, বিবাদ "between the have's and have-not's." ওটা জীবধর্ম্ম, ওতে দোষ থাকতে পারে না, জমিদারেরও নয়, রায়তেরও নয়।

কিন্তু জমিদারীতে যেন কিছু দোষ আছে, এই আশঙ্কা করে' রবীন্দ্রনাথ আর একটা কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন, বলছেন "আমার জন্মগত পেশা জমিদারী, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারী।" আগে লোকে কেবল আসমান-জমিনের "ফরাকটা"ই দেখত। এখন দেখে

আসমান জমিতে এসেই ঠেকেছে। আসমানের পরীপ্রেমের লিখচ্চিত্র দেখবার অবসর ও প্রবৃত্তি লোকের নিতান্তই অল্প। তাই এই নীরস, কঠিন জমির দুঃখ-দারিদ্র্য-পীড়িত রায়তের শোচনীয় দুরবস্থা আজ রবীন্দ্রনাথের উর্দ্ধ দৃষ্টিকে নীচের জমিতে আকৃষ্ট করেছে। রায়তের আরও আনন্দের বিষয় এই যে "এই জিনিষটার (জমিদারীর) ওপর", রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে', উপার্জ্জন না করে', ঐশ্বর্য্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে' তুলি। যাঁরা বীর্য্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে, আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই।" এগুলোও অবশ্য "লালমুখো বুলি।" সমানধিকারবাদীরাও এই কথাই বলেন। আর একটু বেশী বলেন এই যে, জমিদারেরা তাঁদের অনুপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য ভোগের দ্বারা যে কেবল তাঁদের দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে' তোলেন তাই নয়; তাঁরা দরিদ্র প্রজার দেহ এবং চিত্ত উভয়কেই অপটু করে' প্রজার ন্যায্যপ্রাপ্য মনুষ্যত্ব লাভের সর্ব্ববিধ উপায় থেকে তাকে বঞ্চিত করেন। ফলে, এই মুষ্টিমেয় জমিদারবাদে এই বিশাল "মানবজমিন" পতিত আছে, যা "আবাদ করলে ফলত সোণা।"

জমিদারদের সম্বন্ধে এই সকল "লালমুখো বুলি" বলে' রবীন্দ্রনাথ বলছেন "মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে আছি। এমন জমিদারী ছেড়ে দিলেই তো হয়"। তবে কি সত্য সত্যই তাঁর জমিদারী ছাড়বার ইচ্ছা হয়েছে? হয় নি বলেই বোধ হয়। হয়তো হত, কিন্তু একটা সন্দেহ তাঁর চিত্তকে আন্দোলিত করছে। "কাকে ছেড়ে দেব?" এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করে' তিনি কল্পিত অপর পক্ষের কল্পিত উত্তর দিচ্ছেন আর একটা প্রশ্ন করে—"অন্য এক জমিদারকে?" উত্তরটা মনঃপূত হল না। আবার প্রশ্ন করছেন—"প্রজাকে ছেড়ে দেব?" এ উত্তরও সন্তোষজনক হল না। এইরূপ সন্দেহ করতে করতে তিনি বলছেন "জমি চাষ করে যে, জমি তারই হওয়া উচিত।" কিন্তু আবার সন্দেহ "কেমন করে' তা' হবে? জমি যদি পণ্য দ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে?" সমানাধিকারবাদীরা এর একটা স্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন। সেটা এই যে, জমি পণ্য দ্রব্য হবে না, হস্তান্তরিতও হবে না; জমিদারের সম্পত্তিও থাকবে না, প্রজার সম্পত্তিও হবে না। জমিটা হবে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি; প্রজাকে দেওয়া হবে চাষ করবার জন্য; হস্তান্তর করবার ক্ষমতা থাকবে না; ব্যক্তিগত (private) সম্পত্তি থাকবে না। একটি লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে পরিমাণ জমির আবশ্যক, যা' এক জনে নিজে চাষ করতে পারে, প্রত্যেক প্রজাকে সেই পরিমাণ জমি দেওয়া হবে। জমি নিজে চাষ করতে হবে; মজুর দিয়ে বা ভাগে দিয়ে চাষ করাতে পারবে না; পরিবারস্থ লোকের সাহায্যে বা আর পাঁচ জন প্রজার সঙ্গে মিলে যৌথ চাষ করতে পারবে। চাষ না করে জমি ফেলে রাখতে পারবে না। প্রজা

যেমন জমি হস্তান্তর করতে পারবে না, তেমনি প্রজাকেও কেউ জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে না। উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ বা তার মূল্য হবে জমির খাজনা। সেটা আয়কর প্রভৃতি অন্য অন্য করের মত প্রতিবৎসর নির্দ্ধারিত হবে। প্রজার মৃত্যু হলে উত্তরাধিকারসূত্রে তার পুত্র বা অন্য কেউ সে জমি পাবে না; উত্তরাধিকারী বয়ঃপ্রাপ্ত হলেই স্বতন্ত্র, প্রজা বলে' গণ্য হবে এবং পৃথক জমি পাবে, পূর্ব্বাধিকারীর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। এতে "এক বড় জমিদারের জায়গায় দশ ছোট জমিদার গজিয়ে" ওঠবার সম্ভাবনা থাকবে না; জমিদারী "কাকে ছেড়ে দেব" সে দুশ্চিন্তারও অবসর থাকবে না; "যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার টাকা আছে, অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই" না; উত্তরাধিকারসূত্রে জমি খণ্ড খণ্ড হতে পারে না; এবং "এমনি করে' ছোট জমিগুলি স্থানীয় মহাজনদের বড় বড় বেড়া-জালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়বে" না। এক কথায়, "abolition of private property" এবং "nationalization of land and other means of prodution and transportation" হলে রবীন্দ্রনাথের সব আপত্তিই খণ্ডিত হয়ে যাবে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এতে বলশেভিজমের ছায়া দেখে আশঙ্কিত হবেন নিশ্চয়ই। কারণ, বলশেভিজ্‌ম্ এবং ফ্যাসিজ্‌ম্ (তিনি এই দুইকেই এক শ্রেণীভুক্ত করেছেন) সম্বন্ধে তিনি বলেন "ইদানীং পশ্চিমে বলশেভিজ্‌ম্, ফ্যাসিজ্‌ম্ প্রভৃতি যে সব উদ্যোগ দেখা দিয়েছে, আমরা যে তার কার্য্যকারণ, তার আকার প্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া।" ফ্যাসিজ্‌ম্ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একথা অবশ্য সম্মানের সহিত মস্তক অবনত করে শুনতে হবে। কারণ, তাঁর কথা প্রত্যক্ষদর্শীর কথা; তিনি ফ্যাসিজ্‌মের দেশে সম্প্রতিই গিয়েছিলেন এবং ফ্যাসিজ্‌মের অধিনেতা মুসোলিনির সাক্ষাৎ এবং আপ্যায়ন লাভ করে' এসেছেন। কিন্তু বলশেভিজ্‌ম্-সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে কিনা তা' আমরা জানি না। সংবাদপত্রে ও সাময়িক সাহিত্যে বলশেভিজ্‌ম্-সম্বন্ধে তার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল কথা প্রকাশিত হয়, তা থেকেই যদি রবীন্দ্রনাথ অন্য লোকের মত তাঁর মতামত গঠিত করে' থাকেন, তা' হলে বলতে হবে একটা মতান্তরও আছে।

ইংলণ্ডের অনেক বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোক বলশেভিজ্‌ম্-এর জন্ম স্থানে গিয়ে তার কার্য্যকলাপ দেখে এসেছেন। বারট্রাণ্ড রাসেল তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বলেন "The war has left throughout Europe a mood of disillusionment and despair which calls aloud for a new religion, as the only force capable of giving men the energy to live vigorously. Bolshevism has supplied the new religion. It promises glorious things : an end of injustice of rich and poor, an end of economic slavery, an end of war. * * * It promises a world where all men and women shall be 'kept sane by work, and where all work shall be

of value to the community, not only to a few wealthy vampires. * * *

* 'In place of palaces and hovels, futile vice and useless misery, there is to be wholesome work, enough but not too much, all of it useful, performed by men and women who have no time for pessimism and no occasion for despair"--(The Practice and Theory of Bolshevism—page 17.) এই নবধর্ম্মকে যদি "গুণ্ডাতন্ত্র" বলতে পারা যায়, তা'হলে এমন অনেক লোক পাওয়া যাবে যাঁরা এই তন্ত্রে যোগ দিতে লজ্জা বোধ না করে' গৌরব বোধ করবেন। আসল কথাটা এই যে আমরা বর্ত্তমান সমাজে জন্মে এবং বাস করে' যে মনোভাব লাভ করেছি, শিক্ষায়, দীক্ষায়, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যে মনোভাব আমাদের অভ্যস্ত হয়ে প্রকৃতিগত হয়ে গিয়েছে, সেই মনোভাব দিয়ে বলশেভিজম্-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হলে যে নতুন শিক্ষা, দীক্ষা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা হবে এবং তাতে যে নতুন মনোভাব জন্ম গ্রহণ করবে, তার বিচার করা চলে না। মাপ কাঠিটা বদলাতে হ'ব।

রায়তের ভবিষ্যৎ ভ'গ্য গণনা কঠিন হলেও, বর্ত্তমান বিচার তত কঠিন নয়। বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থার ফলে রায়তের কি অবস্থা হয়েছে, তা' আর অনুমানের বিষয় নয়। রবীন্দ্র-নাথ ঠিকই বলেছেন "রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি।" "তারা কোন' মতে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না।" কিন্তু তার পরেই যা' বলেছেন ত'তে ত একেবারে হতাশ হয়ে যেতে হয়; মনে হয় যাতে এই অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটে, যাতে রায়তের বিদ্যা হয়, বুদ্ধি হয়, শক্তি হয়, আর তা'র ধনস্থান থেকে শনি নিষ্ক্রান্ত হন, তাতে রবীন্দ্রনাথের তেমন ইচ্ছা নাই। কারণ, এর অব্যবহিত পরেই তিনি বলছেন "তাদের মধ্যে যারা জানে তাদের মত ভয়ঙ্কর জীব আর নেই। * * * জাল, জালিয়াতি, মিথ্যা মোকদ্দমা, ঘর জ্বালানো, ফসল তছরুপ—কোন বিভীষিকায় তাঁদের সঙ্কোচ নেই।" অতএব, কি সিদ্ধান্ত করে' নিতে হবে যে, যাতে তারা না জানে তাই করা হ'ক? অর্থাৎ যাতে তাদের জ্ঞান হয়, তা' করে' কায নাই? এর ন্যায়টা হচ্ছে, বলা বাহুল্য, সেই আদম-হবার নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ন্যায়। অতি সম্মানের সহিত, বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হচ্ছে যে, বর্ত্তমান জমিদারদের পূর্ব্বগামী যাঁরা ছিলেন, যাঁরা স্বহস্তে জমিদারী অর্জ্জন করেছিলেন এবং যাঁদের খ্যাতি আজও বাঙলার গ্রামে গ্রামে লোকমুখে বিরাজ করছে, তাঁদের মধ্যে ক'জন ঐ "জাল জালিয়াতি, মিথ্যা মোকদ্দমা, ঘর জ্বালানো, ফসল তছরুপ" এবং তাঁর উপর লাঠি-শড়কী ব্যবহার করেন নি? দেশের আদালতগুলির মহাফেজখানায় তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কোন ঐতিহাসিক ইচ্ছা করলে তা' সংকলন করে' লোকহিতের জন্য প্রকাশ করতে পারেন। বর্ত্তমান জমিদারেরা তেমন করে' জমিদারী অর্জ্জন করেন না, প্রজাশাসনও করেন না। তাঁরা জমিদারী খরিদ করেন এবং খরিদ করবার

সময়, নিশ্চয়ই অনুসন্ধান করে' দেখে শুনে, নিঃসন্দেহ হন যে, যে-জমিদারীটা খরিদ করছেন তার স্থাপয়িতা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে জমিদারীটি স্থাপন করেন নি। অথবা, দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি? রায়ত-খাদক রায়ত "যে প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হতে হতে জমিদার হয়ে ওঠে" স্বয়ংগঠিত জমিদার, বোধ করি, সে "প্রণালী" অবগত নন?

অতএব, রবীন্দ্রনাথ বলছেন "রায়ত যতদিন বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হয়ে না ওঠে, যতদিন পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার" না হয়, আর "সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্‌ভাবন করতে" না পারে, ততদিন—ততদিন যা' আছে, যেমন আছে, তাই থাক্, তেমনি থাক্। রায়তের বুদ্ধি ও অর্থ-সম্পত্তি, প্রাণের সঞ্চার ও সম্পূর্ণতা অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ হয়ে আপনি উদ্‌ভূত হবে; রায়তকে কেবল নীরব সহিষ্ণুতার সহিত সেই শুভদিনের অপেক্ষা করতে হবে।

শ্রীহৃষীকেশ সেন

দশচক্র

(৩)

যোগেন্দ্র বলিলেন "তুমি কি বল্‌তে চাও, ভগবান্ নেই?"

ভগবান্ সম্বন্ধে এইরূপ একটা প্রশ্ন রাম ও শ্যামকে প্রায়ই শুনিতে হইত। ছারপোকার মত যোগেন্দ্রের এই প্রশ্নকে কিছুতেই নিঃশেষ করা গেল না।

আস্তিক বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় যোগেন্দ্র ঠিক তাহাই ছিলেন। অর্থাৎ "আমি নাস্তিক" এই কথাটা নিজে না বলা, এবং পরকে বলিতে না দেওয়া, এইটাকেই তিনি ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। তিনি বিষয়ী লোক, সংসারে ভগবান্ অপেক্ষা ভাগ্যবানের সেবা করিতেন ঢের বেশী। উকীল মানুষ, মামলা-মোকদ্দামা, নথি-পত্র লইয়া দিনের অধিকাংশ সময় কাটাইতেন এবং অবসরমত পান তামাকের সঙ্গে একটু পরলোক তত্ত্বের চর্চ্চা করিতেন। এ জগৎ যে ছায়াবাজি এবং তাহার মন যে মায়ামদে মত্ত হইয়া বিষয়বিষে জর্জ্জরিত হইতেছে এইরূপ পরিতাপ করিয়া তিনি দুএকটী সঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন। সঙ্গীত শুনিয়া শ্যাম যখন বলিলেন, "দেখ যোগেন কিছু মনে কোরো না; আমার বিশ্বাস, যার মনের ভাণ্ডার একেবারে শূন্য সেই লোকই মায়াবাদের ভেরেণ্ডা ভাজে।" তখন যোগেন মুখে যাহাই বলুন, রাগ করিলেন না। শ্যামের কাছে ত ধরা পড়িতেই হইবে। লোকটা যে বুদ্ধিমান। কিন্তু সকলে ত এত বুদ্ধিমান্ নয়। তাঁহার বিশ্বাস ছিল এই গান শুনিয়া ভগবান্ তাঁহাকে ভক্ত মনে করিতে পারেন, এবং মাঝে মাঝে

তাঁহার দুএকটা মোকদ্দমা জিতাইয়া দিতে পারেন। একটা প্রশ্ন উপস্থিত হইলে তাহার একটা উত্তর দিতে হয়। পাছে তর্কে হটিতে হয় এই ভয়ে অতি সাবধানে, আট ঘাট বাঁধিয়া রাম বলিলেন "ভগবান্ নেই এমন কথা জোর ক'রে বল্‌তে পারি না। তবে তিনি আছেন এরও কোন প্রমাণ নেই।"

শ্যাম অন্যমনস্কভাবে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ মুখ তুলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন "আমি জোর করে বল্‌তে পারি ভগবান্ নেই। সে জিনিষ আমার বুদ্ধির অতীত—"

যোগেন্দ্র। তোমার বুদ্ধির অতীত হ'লেই একেবারে নাস্তি ? ঋষিরা—

শ্যাম। হাঁ ঋষিরা বলেছেন তিনি মনোবাক্‌কায়ের অতীত। যে জিনিষ সকল কালের সকল লোকের মনোবাক্‌কায়ের অতীত সে জিনিস নেই, এমনি আমরা বলে থাকি।

যোগেন্দ্র। তুমি বল্‌লেই 'নেই' হয়ে গেল ?

শ্যাম। হ'ল কি না জানি না। আমি বল্‌বো 'নেই'। অমি বল্‌বো তোমার নাকের ওপর একটা আস্তাবল নেই। তোমার ইচ্ছা হয় আস্তাবল আছে বলে বিশ্বাস কোরো।

আস্তাবলের উপমায় উপেন্দ্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সশব্দে করতালি দিয়া চীৎকার করিলেন, বা বা বা! ঠিক বলেছ! ঠিক বলেছ; আস্তাবল—

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঘরের মধ্যে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইল,—সরল, দীর্ঘ, বাহুল্যবর্জ্জিত দেহ, মুণ্ডিত মুণ্ড, প্রশস্ত উন্নত ললাটের নীচে দুইটী জ্বলন্ত চক্ষু।

গোখুরা সর্পকে হঠাৎ সম্মুখে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতে দেখিলে ক্রীড়োন্মত্ত বালক যেমন মুহূর্ত্তে নিষ্প্রভ হইয়া যায়. উপেন্দ্র সেইরূপ হইয়া গেলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

সন্ন্যাসী দক্ষিণ হস্ত সম্মুখে প্রসারিত করিয়া বলিলেন 'শিবমস্তু'।

উপেন্দ্র প্রথমটা যে একটু দমিয়া গিয়াছিলেন তাহারই প্রতীকার কামনায় এবার একটু চেষ্টা করিয়াই বলিলেন "বাবাজি, আশীর্ব্বাদটী ফিরিয়ে নিন, এখানে প্রাপ্তির আশা কম।"

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া বলিলেন "আশীর্ব্বাদ ত বিক্রয় করি নি।"

উপেন্দ্র। বাবাজীর জ্যোতিষ টোতিষ জানা আছে নিশ্চয়।

সন্ন্যাসী। জ্যোতিষ ত সকলেই জানে। ছোট ছেলে সেও জানে চাঁদ উঠলে আলো হবে। তার চেয়ে যে বড় সে জানে চাঁদ আজ ছটার সময় উঠ্‌বে। আরও যে বড় সে জানে চাঁদ আজ থেকে অমুক অমুক সময়ে উঠ্‌বে, এবং অমুক অমুক সময়ে গঙ্গায় জোয়ার আসবে।

উপেন্দ্র। হুম্! আপনি অবশ্য এদের চেয়ে বেশী জানেন। আচ্ছা বলুন দিকি আপনি আমাদের কাছ থেকে কিছু নমস্কারী পাবেন কি না।

সন্ন্যাসী। নমস্কারী পাব না। কিছু পাই ত ভিক্ষাস্বরূপ পাব।

আশ্চর্য্যের বিষয় উপেন্দ্রের কথা শুনিয়া কেহ হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল না। বরং রামময় একটু বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিলেন, বলিলেন "মানুষের সঙ্গে অভদ্রতা করচ কেন!"

সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, "না, অভদ্রতা করেন নি ত। আমরা সন্ন্যাসী, সমাজের বাইরে। আমাদের কাছে ভদ্রতার কোন [illegible] নাই। আমাদের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করাই ভদ্রতা।"

রাম। আপনার প্রতি ওঁর তশ্রদ্ধাই যদি থাকে ত সেটা প্রকাশ ক'রে আপনাকে কষ্ট দেবার ওঁর কি অধিকার?

সন্ন্যাসী। না, সত্যই কষ্ট দেন নি। পৃথিবীশুদ্ধ লোক আমাকে শ্রদ্ধা করবে,—এতবড় স্পর্দ্ধা আমার নেই।

রাম। আপনি কিছু মনে না করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে ভদ্রতার একটা আদব কায়দা আছে ত।

সন্ন্যাসী। দুজনের মধ্যের আদব কায়দা সেই দুজনে ঠিক করে। আপনার আদব কায়দা ত আমার জন্য নয়। আমার কাছে মনের ভাব ব্যক্ত করাই ভদ্রতা।—যাক্, আমি কিছু ভিক্ষার আশায় এসেছি।

উপেন্দ্র। সেটী আমাদের জানা ছিল, ঠাকুর।

সন্ন্যাসী। জানবেন বৈ কি। আমরা সকলেই যে ভিখারী। এই সমস্ত পৃথিবী ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে আছে আকাশ থেকে দুই বিন্দু জল পাবে বলে, আর সমস্ত আকাশ খাঁ খাঁ করচে, পৃথিবী থেকে দুই বিন্দু জলের আশায়।—হঠাৎ রামের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "হাঁ, আপনারই এই বাড়ী?"

রাম। আজ্ঞে হাঁ।

সন্ন্যাসী। এর পাশে খানিকটা খালি জমি পড়ে আছে, তাও আপনার?

রাম। আজ্ঞে হাঁ।

সন্ন্যাসী। ঐ জমির এক কোণে একটী নিমগাছ আছে। সেই গাছের ছায়া খানিকটা কিছুকালের জন্য উপভোগ করবার অধিকার চাই।

রাম। সে অধিকার ত সকলের আছে। এই জন্য আপনি কষ্ট ক'রে আমার কাছে এসেছেন?

সন্ন্যাসী। আপনার জিনিস।

রাম। গাছের ছায়া আবার আমার নিজের জিনিস!

সন্ন্যাসী। ছায়া আপনার নয়? সে গাছ আপনার? সে জমি আপনার? এ বাড়ী আপনার? এ দেহ আপনার? বলিতে বলিতে পাপিয়ার মত সন্ন্যাসীর স্বর ক্রমেই চড়িতে লাগিল।

রাম বাধা দিয়া বলিলেন। দেহ আমার নয় ত কার আবার?

সন্ন্যাসী। আপনারই ত। এ দেহ আপনার। ও ছায়াও আপনার।—তা হলে পেতে পারি?

রাম। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

সন্ন্যাসী রামময়ের দিকে দক্ষিণহস্ত পূর্ব্ববৎ প্রসারিত করিয়া বলিলেন "তত্ত্বমসি।" তার পর ষ্টিমারের সার্চলাইটের মত দুই চক্ষু সকলের দিক হইতে ফিরাইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

রামময় বলিলেন "বাস্তবিক ভারতবর্ষের এই সন্ন্যাসী আমার প্রাণকে আকুল করে তোলে। মনে হয় had I not been Alexander—"

শ্যাম। কেন হয়েছে কি? এত হাহাকার করবার কি আছে?

রাম। না, এই যে একটা সংযমের সাধনা—

শ্যাম। আমরাই বা কি এমন অসংযমের সাধনা করচি? কাপড়ের রঙের ওপর ত সংযম নির্ভর কর্‌চে না।

যোগেন্দ্র। ওঁর সঙ্গে তোমার তুলনা কর্‌চো? একখানি গেরুয়া কাপড় প'রে এমনি করে তুমি পথে ঘাটে বেড়াতে পার?

শ্যাম। গেরুয়া প'রে পারি, সাদা কোট প'রে পারি, সিল্কের পাঞ্জাবী প'রেও পারি। তোমার সন্ন্যাসী কিন্তু সাদা কোট প'রে হয়ত বেরুতে পারবেন না। কাপড় চোপড় আমরাই বেশী ত্যাগী।

উপেন্দ্র। তা যাই হোক্, বাড়ীর পাশে একটা সন্ন্যাসী বসালে?

শ্যাম। ঐ শোন! উপেনের ভয় হচ্চে তোমার নাস্তিকতাটা এবার উড়ে যাবে।

উপেন্দ্র। ভয় হচ্চেই ত।

শ্যাম। ও যে ওড়বার সে উড়ুক। তাকে ধ'রে রেখে লাভ নেই।

উপেন্দ্র। রামকেই জিজ্ঞাসা কর না, ওঁর মনে কোন দুর্ব্বলতা এসেছে কিনা?

রাম। এই দেখ, উপেন, যেদিন স্বর্গ থেকে নাস্তিকতার inspiration পেয়েছি ব'লে বিশ্বাস কর্‌বো, সেদিন তোমাকে না হয় apostle করে পাঠাব, ধার্ম্মিকদের মাথা কাটবার জন্য। আপাততঃ বেগ একটু সংবরণ ক'রে থাক।

(৪০)

প্রায় বিশ বৎসর রামময় দেশে যান নাই। দেশের বাড়ীতে এক সময়ে খুব ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব হইত। রামময়ের আমলেও মা দশভুজা কয়েকবার যাতায়াত করিয়াছিলেন, —প্রথমটা অভীষ্টফলদায়িনী রূপে, তার পর "শক্তি" "দেশমাতা" প্রভৃতি কয়েকটা theoryর

দোহাই দিয়া, এবং শেষটা কেবল লোকরঞ্জনার্থ। আজ দশ বৎসর তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছেন। বাড়ীতে বাণলিঙ্গের বিগ্রহ ছিল। কুলপুরোহিত যাদবেশ্বর চক্রবর্ত্তীর উপর ইহার সেবার ভার দিয়া রামময় তাঁহাকে বাড়ীতে স্থান দিলেন।

যাদবেশ্বর ব্রাহ্মণপণ্ডিত, অর্থাৎ, পণ্ডিত ন'ন। এ বিষয়ে তিনি "অর্দ্ধং ত্যজতি।" তাঁহার মাথার ভিতরে কিছু না থাক্, মাথার উপরে বেশ ফাঁস দেওয়া একটী শিখা ছিল। এই শিখার সাহায্যে প্রায় পঞ্চাশ ষাট ঘর যজমান তাঁর বাঁধা। পূজাদি তিনি খুব ভক্তি সহকারেই করিতেন। তবে যে ভাষায় করিতেন, শুনিয়াছি তাহার নাম দেবভাষা। দেবতারা হয়ত তাহার অর্থ বুঝিতেন, মানুষের বুঝিবার সাধ্য নাই। পাড়ার সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। ভক্তি আকর্ষণ করিবার মত গোটাকত গুণও তাঁহার ছিল, যথা—তিনি মন্ত্র পড়িতে পড়িতে কাহারও ঘটকালী করিতেন না, পূজা করিতে করিতে তিন বার উঠিয়া গিয়া তামাক খাইয়া আসিতেন না; এবং উপবাস করিবার সময় অনশনেই থাকিতেন। প্রতিমাসে অনেকগুলা উপবাস করিয়া তিনি কেবল পারত্রিক নহে, ঐহিক ফলও লাভ করিতেন। ইহার একটা কারণ, তাঁহার আমড়া গাছের মত ফলন্ত সংসারে পত্রপুষ্পের শোভাসম্পদ্ না থাকুক, অস্থিচর্ম্মসার ফল ফলিয়াছিল অনেকগুলি। এত ফল না ফলিলেই তিনি সুখী হইতেন। কিন্তু এসব নাকি ভগবানের হাত।

যাদব চারিবার মাত্র দারপরিগ্রহ করেন। প্রথম স্ত্রী বন্ধ্যা বলিয়া বিতাড়িত, এবং দ্বিতীয়টী একটী কন্যা প্রসব করার পর সূতিকারোগে প্রাণত্যাগ করেন। যাদব দেখিলেন তাঁহার বয়স হইয়া যাইতেছে, পিতৃঋণ বুঝি আর শোধ হয় না। তাই তাড়াতাড়ি দুইটী বিবাহ করিয়া ফেলিলেন, পর পর। আপাততঃ তাঁহার সংসারে এই দুই পক্ষ বিদ্যমান্। ইহারা আসিয়া তাঁহার পিতৃঋণ শোধ করিলেন,—চক্রবৃদ্ধিহারে। আজ যদি হঠাৎ যাদবকে জিজ্ঞাসা করা যায় তাঁহার মোট পুত্রকন্যা কয়টী, তবে ভদ্রলোক হিসাব লইয়া যে বিপদে পড়েন, সে বিপদ কাহারও কাহারও ভাগ্যে বছরে একবার করিয়া ঘটিয়া থাকে, ইনকমট্যাক্সের ফরম পূরাইবার সময়।

যাদবের নিস্তরঙ্গ সংসার সরোবরে কৌতুকপ্রিয় ভাগ্য-দেবতা একটী ঢিল ফেলিলেন। ঢিলটী আসিল একটী বিধবা যুবতীর আকার ধরিয়া। ইনি কে, কোথা হইতে, কি উদ্দেশ্যে আসিলেন, ইত্যাকার প্রশ্ন যখন তাঁহার মনকে সকরুণ করিয়া তুলিয়াছে, তখন জানা গেল ইনি তাঁহারই দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান, গৌরী। এক মুহূর্ত্তে যাদবের মন বিস্বাদ হইয়া গেল। পিছন হইতে পালকে-ভরা প্রকাণ্ড দেহ দেখিয়া যাহাকে ময়ূরের স্বজাতীয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, হঠাৎ দেখিলেন সেটা শকুনি। তাহার গলার কাছ হইতে অপ্রত্যাশিত এ কি কদর্য্য নগ্নতা।

গৌরী নয় বৎসর বয়সে শ্বশুর ঘর করিতে গিয়াছিল, আর পিত্রালয়ে আইসে নাই। এতকাল পরে অকস্মাৎ আজ যে সে এমন করিয়া, একাকী, একটা গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইবে, কে ভাবিয়াছিল! যাদব ছা-পোষা লোক, দুইটী স্ত্রী ও ডজনখানেক পুত্রকন্যা লইয়া একরকম সংসার চালান। তাহার মধ্যে এ আপদকে লইয়া কি করিবেন? স্থূলকায় ব্যক্তি তাহার চার মণ তের সের দেহ কোনরূপে বহিয়া বেড়ায়। তাই বলিয়া তাহার ঘাড়ে পাঁচ সেরি একটা কাঁঠাল চাপাইলে বেচারা পারিবে কেন?

গৌরী শৈশবে মাতৃহীন হইয়া দুই সৎমার কাছে মানুষ হয়, এবং আওতা-পাওয়া চারাগাছের মত কেবল লম্বার দিকে বাড়িতে থাকে। এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে লাগিল যে পিতৃদেব শঙ্কিত হইয়া নয় বৎসর পার না হইতেই তাহাকে পাত্রস্থ করেন। পাত্রটী বিষয়ী লোক। বাড়ীর পাশে খানিকটা জমিতে কয়েকটা কলাগাছ পুতিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। ইনি জমিদারীতে ছোট হইলেও কৌলীন্য মর্য্যাদায় খুব বড় ছিলেন, বয়সে আরও বড়। তিনি গৌরীকে বড় আদর করিতেন। এবং দুই বৎসর তাহাকে চ'খে চ'খে রাখিয়া সহসা যেদিন চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, সেদিন কৌলীন্যমর্য্যাদার সবটাই তাহাকে দিয়া গেলেন। বিষয় সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিবার সময় পান নাই। কাজেই কলাবাগানের বাগানটা পাঁচজনে দখল করিয়া বসিল, গৌরীর ভাগ্যে রহিল বাকীটা।

গৌরীর উচিত ছিল স্বামীর মৃত্যুতে একেবারে মুষড়িয়া পড়া; একেবারে আদর্শ হিন্দু সতীর মত গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়া, এবং জীবনের পঞ্চাশ বা ষাটটা বছর "হা নাথ!" "হা নাথ!" করিতে করিতে শরদিজ ঘর্ম্মক্লিষ্ট কেতকী-গর্ভপত্রের মত শুখাইয়া যাওয়া। কিন্তু কৈ? শুখান দূরে থাক, বৈধব্যের অব্যবহিত পরেই তাঁহার সমস্ত দেহ একটা লাবণ্যের বন্যায় কূলে কূলে ভরিয়া উঠিল, ইহাতে ঘরে বাহিরে সকলেই ছি ছি করিতে লাগিল। সকলেই অনুমান করিল এই লাবণ্যের উৎস কোন এক জোড়া পাতলা কাল গোঁফের পশ্চাতে লুকাইয়া আছে। গোরা নিজেও কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কিন্তু লাঞ্ছিত কুলিরমণীর কণ্ঠলগ্ন শিশুর মত তাহার এই নবজাত লাবণ্য কাহারও তোয়াক্কা না রাখিয়া, নিশ্চিন্ত আনন্দে, কারণে অকারণে হাসিতে লাগিল।

এ হাসি ত থামাইতে হয়। —চেষ্টার ত্রুটি হইল না। রসদ কমান হইল, খাটুনির মাত্রা ও মেয়াদ বাড়ান হইল, কিন্তু উৎপীড়নের তাড়নে তাহার যৌবনশ্রী সংযত হইল না, বরং কষাহত বর্ম্মা টাটুর মত দুর্দ্দমচাঞ্চল্যে মলিন জীর্ণ বেশবাসের আগড় ঠেলিয়া, চ'খে মুখে ছুটিয়া বাহির হইল। সকলে ভাবিল হায়! হায়! এই পাগলা ঘোড়ার হাতে পড়িয়া গৌরী না জানি আজ কোন খানাখন্দে পড়িয়া নাজেহাল হইবে।

মেয়ের কলঙ্ককাহিনী বহুপূর্ব্বেই পিত্রালয়ে আসিয়া পৌছিয়াছিল। পিতামাতা, তাই।

সহ্য করিয়াছিলেন। আজ যে কলঙ্কিনী নিজে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাকে সহ্য করা যায় কিরূপে? অথচ হাতাহাতি গলাধাক্কা দিয়া বিদায় করাও যায় না। দুই চারি দিন অন্ততঃ রাখিতে হয়।

এই দুই চারি দিনই অসহ্য হইল। গৌরী যদি কোন কাজে হাত দিত, অমনি বড়গিন্নি আহার ত্যাগ করিতেন। বলিতেন ইহার ছোঁয়া জল তিনি খাইবেন না। সে যদি কোন কাজে হাত না দিত, তবে ছোটগিন্নি অন্য দিনের চেয়ে দশগুণ বেশী কাজ করিয়া, অনাহারে ঘরে গিয়া খিল দিতেন। বলিতেন যাহারা বসিয়া খাইতে আসিয়াছে তাহারা আহার করুক, তাঁহার আহারে প্রয়োজন নাই, তিনি শুধু দাসীবৃত্তি করিয়াই কাটাইবেন। এইরূপে যাদবের হাঁড়ির চাল বাঁচিতে লাগিল বটে, কিন্তু কলহের চীৎকারে বাড়ীর চাল উড়িবার উপক্রম হইল। তিনি দেখিলেন কন্যাকে স্থানান্তরিত করা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু কোথায় করিবেন? স্থির করিলেন, রামময়কে ধরিয়া করিয়া তাঁহার বাড়াতেই মেয়ের একটা আস্তানা করিয়া দিবেন।

রামময়ের প্রকাণ্ড পরিবার। ভাইপো, ভাগ্‌নে, শালা, নাতজামাই প্রভৃতি বাঁধা পোষ্য অনেকগুলি। ইহার উপর অতিথি অভ্যাগতেরও অভাব ছিলনা। গ্রামের কাহাকেও কয়দিন কলিকাতায় থাকিয়া মোকদ্দমা চালাইতে হইবে, কেহ চাকুরীর চেষ্টা করিতেছে, কেহ চাকুরী পাইয়াছে, কিন্তু যথেষ্ট বেতন পায় নাই, কেহ পড়াশুনা করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে,—সকলেই নিঃসঙ্কোচে তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় লইত। তাহারা কে, কোথা হইতে আসিয়াছে কেহ প্রশ্ন করিত না, কেহ বাধা দিত না। তাহারাও নিজেদের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করিত না। আপন আপন পোঁট্‌লা পুঁটলি ঘরের কোণে গুছাইয়া রাখিয়া, তাহারা চাকরকে দিয়া তেল আনাইয়া স্নান করিত, ডাকহাঁক করিয়া ঠাকুরকে দিয়া ভাত আনাইয়া আহার করিত, এবং যে-সে যাহার-তাহার বিছানায় যাহার-তাহার লেপ টানিয়া গায়ে দিয়া রাত কাটাইয়া দিত। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন যোগ ছিল না; এক জনের ব্যথায় আর এক জনের প্রাণ কাঁদিত না; ইহারা কেবল একত্র বাস করিত,—নবজাত কেন্নুইশাবকের মত অনেকগুলি একসঙ্গে তাল পাকাইয়া।

রামময়ের স্ত্রী জগত্তারিণী বহুদিন হইতে রোগে ভুগিতেছেন। অসুস্থ শরীরে তাঁহাকে অনেক দিক্‌ দেখিতে হইত, অথচ বিরাট পরিবারে তাঁহাকে দেখিবার কেহ ছিল না। গৌরী তাঁহার সেবা সুশ্রূষা করিতে পারিবে জানিলে রামময় ইহাকে সাদরেই গ্রহণ করিবেন। তিনি অনেক দিন হইতে এইরূপ একটী ব্রাহ্মণ কন্যার সন্ধানও করিতেছিলেন। তা ছাড়া, লোকটা নাস্তিক। চরিত্র দোষ লইয়া তত মাথা ঘামাইবে না, ইহাও যাদবের বিশ্বাস ছিল।

* * * *

জগত্তারিণী আহ্নিক করিতেছিলেন। গৌরী অতি পরিচিতার মত আসিয়া তাঁহাকে গড়

করিল। তিনি হুঁ হুঁ করিয়া ছুঁইতে নিষেধ করিলেন। তার-পর তাড়াতাড়ি আহ্নিক সারিয়া গৌরীর ঘরের কথা, শশুর বাড়ীর কথা ইত্যাদি লইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে নিশি আসিয়া ভাত চাহিল, এবং ঠাকুর ভাতের থালা ধরিয়া দিয়া গেল। নিশি মাটীতেই বসিতে যাইতেছে দেখিয়া গৌরী কথার মাঝখানে উঠিয়া গিয়া একখানা পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল। পিঁড়ির গোছা দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড় করান আছে যাহার ইচ্ছা হয় টানিয়া লইয়া বসে। ছেলেদের আহারের সময় পিঁড়ি পাতিয়া দিবে এমন লোক এ-সংসারে বড় কেহ ছিল না। তাই আজিকার এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ধক্ করিয়া নিশির নজরে পড়িল, জগত্তারিণীর নজরও এড়াইল না। অতি তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র ছর্‌রার মত তাহা মাতা-পুত্র দুই জনের মনের মধ্যে গিয়া বিঁধিয়া রহিল।

হাঁ, যাহা ভয় করিতেছেন, তাহাই। ঘৃতবহ্নি-ঘটিত ব্যাপারই বটে। জগত্তারিণীর মনেও এ ভয় হইয়াছিল। ভয় করিবার কারণও রহিয়াছে। নিশি আজিও বিবাহ করে নাই, এবং গৌরীর বয়স আঠার বৎসর। তবে একটা কথা,—গৌরীর দেহে স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্য যথেষ্ট থাকিলেও, তাহার মুখের কাটছাটকে সুন্দর বলা যায় না। আরও একটা কথা, তাহার চামড়া ছিল কাল। এই খানেই জগত্তারিণীর প্রধান ভরসা। তিনি জানিতেন মীনকেতুর ধারাল ধারাল শর কতবার চামড়ায় প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, কতবার বড় বড় হৃদয় ভেদ করিয়া চামড়ায় আসিয়া আট্‌কাইয়াছে। চামড়া ত তুচ্ছ নয়! চামড়ারই ত ঢাল হয়।

(৫)

কতকগুলা ছড়ান লোহার গুঁড়া একটা চুম্বকের সান্নিধ্যে আসিয়া যেমন সুসম্বদ্ধ, সুবিন্যস্ত হয়, গৌরীর আবির্ভাবে রামময়ের সংসার সেইরূপ হইল। গড়গড়ার নল, গরদ কাপড়, মটর ডাল ও রেড়ির তেল, ঘর ও বারান্দা জুড়িয়া ছড়ান আছে, এমন দৃশ্য বিরল হইয়া উঠিল; আধ প্যাকেট ডাক্তারী তুলা, তিন পাটি মোজা, একটা নারিকেল তৈলের বাটি, দেড়খানা পঞ্জিকা ও একটুকরা মোমের বাতি, এতকাল একটা ভাঙা wash hand basin-এর মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিল, এখন তাহারা যথাস্থানে ফিরিয়া গেল; ছেলেদের খাতা ও বই বালিস বিছানার তলায় আত্মগোপন না করিয়া র‍্যাকের উপর প্যারেড করিয়া দাঁড়াইল; এবং ভিজা গামছা দেরাজ, আলমারীর উপর হইতে বিতাড়িত হইয়া আলনায় গিয়া ঝুলিতে লাগিল। সকলেই দেখিল মেয়েটী নানা কাজে চরকীর মত ঘুরিতেছে। কিন্তু চরকীর মত ঘুরিলেও নিন্দার কাণামাছি তাহাকে ছাড়িল না।

আম্রের মধ্যে মিষ্টরসের মত গৌরী গৃহস্থালীর শিরায় শিরায় আপনাকে পরিব্যপ্ত করিয়া দিল, সর্ব্বত্র মাধুর্য্য আনিল, শ্রী ফিরাইল। সকলে বলিল, সংসার অধঃপাতে যাইবে, ইহা তাহারই পূর্ব্বলক্ষণ। এ পরিবারে আত্মীয়দের মধ্যে যাঁহারা শুইয়া বসিয়া ও

মিশি দাঁতে দিয়া দিন কাটাইতেন, তাঁহারা বলিতেন গৌরীর খাটুনির মধ্যে একটা বাড়াবাড়ি আছে। এর অনেকটা লোক-দেখান। যাঁহারা পূজা-আর্চ্চা লইয়া থাকিতেন, তাহারা বলিতেন খাটিলে কি হইবে, ইহার আচার-বিচার নাই। এদিকে রামের আশ্রিতদের মধ্যে যাঁহারা পুরুষ, অতএব সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, তাঁহারা বাহির মহল হইতে লোলুপ-কৌতূহলের দূরবীণ কষিয়া ইহার চাল-চলনে বড় বড় ছিদ্র দেখিতে পাইলেন।

নিশির প্রতি গৌরীর পক্ষপাত প্রথম হইতেই সকলের চ'খে পড়িল এবং অনেকের আলোচনার বিষয় হইল। ইহা লইয়া শ্লেষ পরিহাসও কম হইত না। গৌরী কোন প্রতিবাদ করিত না, শুধু হাসিত। এই হাঁসের পালকের মত সাদা হাসির জোরে সে শ্লেষ বিদ্রূপের ধারাপ্রপাত গায়ে মাখিত না।

পরিবেষণের সময় সে ভাল ভাল তরকারী নিশির পাতেই বেশী করিয়া দিয়া থাকে এমন অপবাদও তাহাকে একদিন শুনিতে হইল। গৌরী প্রথমটা থতমত হইয়া গেল, তার পর হাসিয়া বলিল "বেশ ত, তুমিও নাও না।" বলিয়া চারগুণ তরকারী অপবাদকারীর পাতে ঢালিয়া দিল। ঠাকুর চীৎকার করিয়া উঠিল "অমন করে সব ফুরিয়ে দিলে আর কেউ খেতে পাবে না।" গৌরী মনে মনে ভাবিল "বেশ ত, সে না হয় না খাইয়া থাকিবে।" তার পর মনে পড়িল সে ছাড়া আরও ত অনেক খাইবার লোক আছে,—"আর কেহ" বলিতে সে নিজেকেই মনে করিতেছে কেন? তখন লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে এবং এ লজ্জা আর সকলের অগোচর থাকে নাই।

জগত্তারিণী চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। নিশির জন্য ঠিক নয়। তবে বাড়ীর মধ্যে যে নির্লজ্জ ইঙ্গিত ও আলোচনা চলিতেছে তাহাকে বাড়িতে দেওয়া ত ঠিক নয়। তিনি গৌরীকে দুএকটা কড়া কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু সময় পান কৈ! সকালে কিছু বলিবার আগেই গৌরী তাঁহাকে বসাইয়া চুল খুলিয়া তেল মাখাইয়া স্নানের ঘরে পাঠাইয়া দেয় এবং পূজার জোগাড় করিয়া রাখে। পূজা আহ্নিকের পর কিছু বলিবেন ইচ্ছা করেন, মেয়েটা খানিকটা গরম দুধ বা সরবৎ আনিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। আহারাদির পর কিছু বলিবেন ঠিক করিলেন, কিন্তু গৌরী পাশে বসিয়া পাখা করিতে লাগিল। পাখার হাওয়ায় অনেকগুলা সঞ্চিত কটু কথা উড়িয়া গেল।

যাহা হউক, তিনি দমিলেন না। একদিন তিরস্কার করিলেন। তবে যাহা বলিলেন তাহাতে বিশেষ ফল না পাওয়াই সম্ভব। তিনি বলিলেন,—খুব কড়া করিয়াই বলিলেন; "তুমি দিনের বেলায় একটু শুতে পার না? সমস্ত দিন কি দস্যিবৃত্তি করে বেড়াচ্ছ?"

গৌরী বলিল "আমার ঘুম পায় না।"

"যাও উঠে যাও তুমি" বলিয়া জগত্তারিণী গৌরীর হাতের পাখা কাড়িয়া লইলেন।

গৌরী পাশেই বসিয়া রহিল, এবং কিছুক্ষণ পরে পাখা লইয়া হাসিতে হাসিতে বাতাস করিতে লাগিল। জগত্তারিণী রাগে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। গৌরী তাঁহাকে আফিমের মত পাইয়া বসিয়াছিল। ইহার তিক্ততায় মুখ বিকৃত রাখিবেন কত ক্ষণ? ইহার প্রতি অনুরাগে যে তাঁহার মন আচ্ছন্ন।

ক্রমশঃ

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

সহজিয়া ও চণ্ডীদাস

"যাবন্নো পততি প্রভাস্বরময়ো শীতাংশুধারা দ্রবো
দেবী পদ্মদলোদরে সমরসীভূতো জিনানাংগণৈঃ
স্ফুরজ্জিদ্ বজ্র শিখাগ্রতঃ করুণয়া ভিন্নং জগত্কারণং
গজ্জর্দ্ধী করুণাবলস্য সহজং জানীহি রূপং বিভোঃ"।

ইহাই বৌদ্ধ-সহজিয়াগণের সাধন। এই মত অন্ততঃ হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন রাঢ়দেশের সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। লুইপাদ নাকি খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর লোক। তাঁরও পূর্ব্বের লোক—উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতির কন্যা লক্ষ্মীংকরা অদ্বয়সিদ্ধি নামে একখানি বই লিখিয়াছিলেন। বইখানির সারকথা—"যোষিৎ আনন্দই জগতের শ্রেষ্ঠ আনন্দ"। স্ত্রীলোক লইয়া ধর্ম্মসাধনা বৌদ্ধদের মধ্যে কোন্ সময়ে কিরূপে প্রবেশলাভ করে,—সে অনেক কথা। মোটের উপর সহজ যানে আসিয়া তাহাদের ধর্ম্ম যে আকার পাইয়াছিল, তাহার ছবি উপরের শ্লোকেই পাওয়া যায়। শাক্তগণের শক্তি ও শৈবদের ভৈরবী কতদিনের পুরাণো, বৌদ্ধদের আগেকার না পরবর্ত্তী, পণ্ডিতে পণ্ডিতে তাহার হিসাব লইয়া আজিও তর্ক চলে, হার জিৎ বড় শুনিতে পাই না। অনেকে বলেন নারী লইয়া সাধনা যে কত কাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা গণিয়া বলিবার উপায় নাই, অর্থাৎ এ জিনিস অতি পুরাতন, বুঝিবা ইহাই ছিল আদি কালের একমাত্র ধর্ম্ম। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় এম, এ, মহাশয় বলেন ছান্দোগ্য উপনিষদে পরকীয় সাধনের কথা আছে।

উপরে যে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া দিয়াছি, বৈষ্ণব সহজিয়াগণ সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা করেন—"রজে বীজে সাধন"। "টলে জীব অটলে ঈশ্বর, তার মাঝে খেলা করে রসিক শেখর"।

ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এবং এই কবিতাগুলির ব্যাখ্যায় বিশেষ কোনো পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ইহার অধিক বলিবার উপায় নাই। সহজিয়াগণের হাতের লেখা যে সব পুঁথি দেখিয়াছি, ছাপার অক্ষরে তাহা প্রকাশ করা যায় না।

বৈষ্ণব সহজিয়াগণ বলেন তাঁহাদের আদিগুরু স্বরূপ দামোদর, স্বরূপের শিষ্য রূপ গোস্বামী, রূপের শিষ্য রঘুনাথ দাস, দাস গোস্বামীর শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য সিদ্ধ মুকুন্দদাস। মুকুন্দদাসের চারি শিষ্য হইতে আউল, বাউল, সাঞী ও দরবেশ এই চারি শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। সিদ্ধ মুকুন্দদাসই ইঁহাদের ধর্ম্ম ব্যাখ্যাতারূপে সম্মানিত হইয়া থাকেন। সহজ ধর্ম্মের সূত্রের পুঁথি সব এই মুকুন্দের লেখা। সহজিয়াদের যত পুঁথি আছে—তার সবগুলিই মুকুন্দের ঐ সূত্রগ্রন্থের টীকা, টিপ্পনী ভাষ্য বা বার্ত্তিক ইত্যাদি। সহজ ধর্ম্ম নব রসিকের ধর্ম্ম নামে পরিচিত। বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এবং কবি রায় শেখরকে লইয়া পাঁচ রসিকের নাম পাওয়া যায়। কাটোয়ার যদুনাথ দাসের লেখা "সংগ্রহ তোষণী" নামক একখানি পুঁথিতে এই পাঁচজন রসিকের পূর্ব্বজন্মের বিবরণ পর্য্যন্ত দেওয়া আছে। আগে যদুনাথের পরিচয় দেই—

"শ্রীহেমলতার শিষ্য আমি বিপ্রকুলে জন্ম।
কটক নগরে বাস কহিলাম মর্ম্ম ॥
পালি গ্রামে জন্ম হয় যদুনাথ নাম।
ভক্তির অযোগ্য হই সদা অভিমান ॥
শিবপ্রসাদ পিতা মোর মাতা ব্রহ্মময়ী।
আচার্য্য প্রভুর পরিবার যদুনাথ কহি ॥

* * *
* * *

ঠাকুরের ঠাকুর মোর শ্রীনিবাস আচার্য্য।
তিঁহো কৈলা বৃন্দাবনে গোপাল ভট্ট পূজ্য ॥
কৃপা করি শ্রীজীব গোঁসাই বহু গ্রন্থ দিল।
তার মধ্যে সংগ্রহ গ্রন্থ সত্বরে ধরিল ॥

সংগ্রহ ছেদন ইথি সূত্র বৃত্তি মানি।
শ্লোকময় সমাকার বুঝিতে না জানি ॥
হেন গ্রন্থ আচার্য্য প্রভু আমাকে সমর্পণ।
নয় পত্র গ্রন্থ ইথে যড়দরশন ॥
প্রভু মোরে পড়াইল নিভৃতে বসিয়ে।
পয়ার করহ যদু উপাসনা দিয়ে ॥
হেন আজ্ঞায় হেমলতার চরণ প্রত্যাশ।
সংগ্রহ পয়ার লেখেন যদুনাথ দাস ॥

* * *
* * *

তথাপিহ পুনঃ পুনঃ লিখিতে প্রকাশ।
হেমলতা যার ইষ্ট বেগুণকোলায় বাস ॥

ইনি ভণিতার মাঝে মাঝে যদুনন্দন নামও ব্যবহার করিয়াছেন। বিদগ্ধ মাধব, গোবিন্দ লীলামৃত প্রভৃতির অনুবাদ ইঁহারই লেখা বলিয়া মনে হয়। পদ কর্ত্তা বলিয়াও ইঁহার খ্যাতি আছে। ইনি খেতুরীর মহোৎসবের সময় কাটোয়ায় বহু বৈষ্ণবের আহার, আবাসাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহারা বিশ্রামে পরিতৃপ্ত হইলে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া খেতুরী গিয়াছিলেন। "দাস" ইঁহাদের বৈষ্ণবী বিনয়ের নিদর্শন।

যদুনাথ দাস বলিতেছেন ———— (সংগ্রহতোষণী)

" রঙ্গিনী নামে রজকিনী ছিল বৃন্দাবনে।
শ্রীরাধিকা বস্ত্র ধৌত করে প্রতিদিনে ॥

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

ধন্য ধন্য রজকিনী মহাভাগ্যবানে ॥
রাই বস্ত্র লৈয়ে রামা মস্তকে বান্ধয়।
খসাইয়া বুকে মুখে সৌরভ আস্বাদয় ॥
শুক সারি ছিল তথা কদম্বের ডালে।
হাত সানে রজকিনী ডাকে সেই কালে ॥
নিকটে আসিয়া দেখে সারী ভাগ্যবতী।
রাই বস্ত্র পরশিয়া মূর্চ্ছাপন্ন মতি ॥
তিন জনে প্রেমানন্দে হইয়া বিহ্বলে।
সেই বস্ত্র লৈয়া গেল যমুনার জলে ॥
পর্শ পাইল যমুনা তার সৌভাগ্য মানিয়া।
প্রেমে আলিঙ্গন দিল ধুবী পরশিয়া ॥
শ্রীবৃন্দাবনে শুক-সারি মহাভাগ্যবান।
লীলা অন্তে নিধুবনে রসোল্লাস গান ॥
রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগাদি বিলাস পীরিতি।
গুপ্ততত্ত্ব লীলাতত্ত্ব জানে নিতি নিতি ॥

সারি হৈল চণ্ডীদাস শুক বিদ্যাপতি।
গৌরাঙ্গ আগেতে আসি ধন্য কৈলা ক্ষিতি ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত সহজ বর্ণন।
প্রাকৃতে অপ্রাকৃত ঘটাই প্রণব সাধন ॥
পদ পদার্থ গ্রন্থাদিক সিদ্ধান্ত চরিত।
ভাবিনী সংগ্রহ করি ভাবের প্রতীত ॥
রঙ্গিনী হৈল এবে রামী রজকিনী।
চণ্ডীদাসে ভাব রাখি আপনে ভাবিনী ॥
কপোত আছিলা পূর্ব্বে লীলা বৃন্দাবনে।
লছিমা হইয়া সাধন বিদ্যাপতি সনে ॥
মাধবিনী ছিলা পূর্ব্বে এবে চিন্তামণি।
কল্পতরু বিল্বমঙ্গল তাহার ভাবিনী ॥
কদম্বতরু ছিলা পূর্ব্বে জয়দেব ঠাকুর।
যার মূলে রাধাকৃষ্ণ বিলাস প্রচুর ॥
ভ্রমরিণী বৃন্দাবনে এবে পদ্মাবতী।
কৃষ্ণকে করাইলা ভোজন সাধিয়া পীরিতি ॥
অশোক বৃক্ষ রায় শেখর বৃন্দাবনে শোভা।
যার মূলে রাধাকৃষ্ণ দুঁহু মনোলোভা ॥
রাজহংসী দুর্গাদাসী ছিলা বৃন্দাবনে।
রায় শেখর সঙ্গে এবে সহজ ধারণে ॥
এই ত কহিল পাঁচ রসিকের তত্ত্ব।
যাহা হইতে সহজ লীলা প্রকাশ মহত্ত্ব ॥ "

কবিতাগুলির সম্বন্ধে মন্তব্য অনাবশ্যক, কেবল এইটুকু মনে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে— যে মহাপ্রভুর তিরোধানের মাত্র পঞ্চাশ বৎসর মধ্যেই কোথাকার জল কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সহজ সাধনা কি জিনিস নিজেই ভাল বুঝি না, পরকে বুঝানো তো পরের কথা। তবে পুরানো কাগজ-পত্রে যাহা পাওয়া যায় তাহা হইতে অনুমিত হয়—বৌদ্ধ আমলে সাধনার নামে বড়ই বাড়াবাড়ি ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছিল, এমন কি হিন্দু সেন রাজারা তার উপদ্রবে কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট লক্ষ্মণসেনের সময় হিন্দুয়ানীর দিক্ দিয়া সমাজের সকল বিষয়েরই কিছু কিছু সংস্কার সাধিত হইতেছিল। প্রাচীন ভাগবতধর্ম্মের নূতনরূপ দিয়া কবি জয়দেব সেই সময় শ্রীগীতগোবিন্দ প্রণয়ন করেন। যে মহাসুখবাদ বৌদ্ধগণের নিজ

দেহেন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগের বস্তু ছিল, জয়দেব তাহা শ্রীরাধাকৃষ্ণে আরোপ করিয়া নিজেকে সঙ্গীরূপে কল্পনা করেন। তিনি যেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনানন্দের দর্শক মাত্র। যুগল পীরিতির অনুভবানন্দে তিনি দ্রষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদের প্রতিক্রিয়ায় ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। জয়দেব বা তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ প্রতীক উপাসনার হিসাবে কোনো নায়িকার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন কিনা ভাবিবার বিষয় বটে।

কবি তরুণীরমণ বলিয়াছেন —

"আপনার সভাব সঁপিবে তার স্থানে। তাহারে নায়ক রসরাজ মনে করি।
তাহার স্বভাব নিবে করিয়া যতনে॥ তাহারে আপন জ্ঞানে হইবে সুন্দরী॥
* * ছাড়িয়া তার স্তুতি রবে বামে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ধ্যান করি ভাবে রবে।
তাহারে আপনা মানি রবে শুদ্ধমনে॥ মন্ত্র বিদ্যা আদি করি আপনা ভুলিবে॥"

সহজিয়াগণ বলেন —

"ভাব্য কি? বর্ত্তমান। অদৃষ্ট ভাবনা —যাকে দেখি নাই তাকে কিরূপে ভাবিব? যাকে দেখিতে পাই, তাকেই ভাবি। যেরূপ নেত্রে দেখে, সেইরূপ হৃদয়ে থাকে। বর্ত্তমান হৃদয়ে রয়, দুইয়ে বুঝ কিবা হয়? বর্ত্তমান জানিব কিসে? শ্রবণে দর্শনে লোভ। লোভ হয় কাকে? যে মন হরে। মন হরে কে? সহজ জানায় যে। সহজ কাকে বলি? আহার, নিদ্রা, শৃঙ্গারকে বলি। থাকেন কোথা? কৈশোরে। কৈশোর তিন অক্ষরে থাকেন কোথা? যৌবনে। যৌবন তিন অক্ষর' থাকেন কোথা? স্বরূপে। স্বরূপ তিন অক্ষরের জন্ম কিসে? এক অক্ষর বংশীধ্বনি, এক অক্ষর হঠৎকার দর্শন, এক অক্ষর দূতী মুখে মিলন"।

মানিয়া লইতে পারি জয়দেব পদ্মাবতী এই পথের পথিক ছিলেন, কিন্তু বিদ্যাপতি ও লছিমাদেবীর সম্বন্ধে সহজিয়াগণ যাহা বলেন,—যদুনাথ তাঁহার সংগ্রহতোষণীতে যাহার উল্লেখ করিয়াছেন —ইতিহাস বলে তাহার কোনো প্রমাণ নাই। বিদ্যাপতি রাজবাড়ীর কবি ছিলেন, তাঁহার রচিত গান রাজ-অন্তঃপুরে গীত হইত, তিনি আনন্দ দিবার জন্য মাঝে মাঝে রাণী, রাজপুত্রবধূ ও মন্ত্রী পত্নীগণের নামে ভণিতা দিয়া গান রচনা করিয়া দিতেন। তাঁহার গানে কয়েকজন রাজা রাণী, রাজপুত্র ও রাজ পুত্রবধূ এবং মন্ত্রী ও তৎ পত্নীর নাম পাওয়া যায়। লছিমাদেবীর ন্যায় গানে রাজা শিবসিংহের অপরা মহিষী মধুমতী ও সুষমা দেবীর নামও পাওয়া যায়। সুতরাং কিরূপে বিশ্বাস করিব যে লছিমা ও বিদ্যাপতির প্রবাদের মধ্যে সত্য আছে? অথচ এই লইয়া বিদ্যাপতির শূলে যাওয়ার কথা এবং তাহা লইয়া বিদ্যাপতি ও লছিমার নামের কয়েকটী পদও সহজ পদাবলীর মধ্যে আছে। কে বলিবে—চণ্ডীদাস ও রামীর প্রবাদ এবং অন্যত্র গান করিতে গিয়া চণ্ডীদাসের চিত্রবধের কথা এমন-ই রহস্যময় কিনা! মিথিলায় বিদ্যাপতির সম্বন্ধে কোনো প্রবাদ নাই; কিন্তু বীরভূমে নান্নুরে চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে রামীকে

লইয়া জোর প্রবাদ আছে, চিত্রবধের না থাক্ মুসলমান কর্ত্তৃক হত্যার প্রবাদও আছে। চিত্র বধের কবিতা মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় পরিষৎ পত্রিকায় ছাপাইয়া দিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে ৪ জায়গায় রামীর বা রজকী, বা ধোবিক জনার উল্লেখ আছে—নীলরতন বাবুর ৭১, ২২৩, ৩১০, ও ৩০৩ সংখ্যক পদ। রাগাত্মিকা পদগুলি ত প্রধানতঃ রামীর প্রসঙ্গেই পরিপূর্ণ, তাছাড়া পরবর্ত্তী যে সমস্ত বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের নামে বন্দনা গাহিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের পদেই রামী বা রামতারা বা তারা ধুবনীর নাম আছে। চিত্রবধের কবিতাগুলিও অন্ততঃ আড়াইশত বৎসরের পুরানো। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, হয়তো চণ্ডীদাসের প্রবাদে সত্য আছে, এবং এই নজীরেই বিদ্যাপতির গানে লছিমার নাম দেখিয়া উভয়ের সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। কারণ বিদ্যাপতির পদগুলিই বাঙ্গালায় চলিত ছিল, তাঁহার পরিচয় বড় কেহ জানিত না। সুতরাং বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যদি কোনো ভুল খবর রটিয়া থাকে তজ্জন্য চণ্ডীদাসের সম্বন্ধীয় প্রবাদগুলিকেও অমূলক বলা ঠিক্ হইবে কিনা অনুসন্ধানের বিষয়। দুঃখের বিষয় শিক্ষিত সম্প্রদায় চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেন না। অত বড় একজন কবি বাঙ্গালায় জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু যে অনুসন্ধান, প্রচেষ্টা পরিশ্রম ও যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন অনুশীলনে তাঁহার সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারিত, বাঙ্গালায় তাহার সিকি পরিমাণও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। যে কোনো সভ্যদেশে চণ্ডীদাসের মত মহাকবি সাধারণতঃ যে সমাদর লাভ করিয়া থাকেন, বাঙ্গালায় তিনি তাহার এক আনা পরিমাণেও পান নাই, ইহা শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে একটা অনপনেয় লজ্জা।

সংগ্রহতোষণী হইতে একটা নূতন খবর পাওয়া গেল,— সেটী কবি রায় শেখর সম্বন্ধে। সংগ্রহতোষণীতে কবির নাম দেখিয়া তাঁহার সময়েরও একটা আন্দাজ পাওয়া গেল। অনেকে রায়শেখর, শশিশেখর, চন্দ্রশেখর, ইত্যাদি শেখরের দলকে সব এক জায়গায় টানিয়া একজন কবি বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর দুই ভ্রাতা, ইঁহাদের নিবাস ছিল কান্দরা গ্রামে, ইঁহারা কান্দরার মঙ্গল বৈষ্ণবের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই মঙ্গল বৈষ্ণবকে লইয়া ইহার পূর্ব্বে অনেক গবেষণা হইয়া গিয়াছে, অনেকে জ্ঞানদাসকেই মঙ্গল ঠাওরাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, জ্ঞানদাস ভারি সুপুরুষ ছিলেন, তাই লোকে তাঁকে মদন মঙ্গল বলিত ; তিনি ভুবন মঙ্গল হরিনাম প্রচার করায় লোকে তাঁহাকে বলিত মঙ্গল ঠাকুর, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানদাস ও মঙ্গল ঠাকুর দুইজন পৃথক ব্যক্তি, আমরা কাঁদরা প্রবন্ধে ইঁহাদের পরিচয় দিব।

কবি রায়শেখরের নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার পরাণ গ্রামে, তিনি প্রায় মহাপ্রভুর সম-সাময়িক কবি। বাঙ্গলায় এবং ব্রজ ভাষায় তিনি এত সুন্দর পদাবলী লিখিয়া গিয়াছেন যে অনেকে পরিচয় না জানিয়া তাঁহার কতকগুলি পদকে বিদ্যাপতির বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন।

যদুনাথ সংগ্রহতোষণীতে চণ্ডীদাসের 'রামীর মত তাঁহার সাধনপাত্রী দুর্গাদাসীর নাম করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সহজ সাধনা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু নিত্যানন্দের কৃপায় কতকগুলি বাঙ্গালী বৌদ্ধ সহজিয়া তথাকথিত বৈষ্ণব নামে পরিচিত হইয়া সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া বহুলোককে দলে টানিয়াছে। পূর্ব্বে এই সহজিয়াগণের গুরুপ্রণালী বর্ণনায় মুকুন্দদাসের নাম করিয়াছি। হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য যদুনাথ আপন সংগ্রহতোষণীতে এই মুকুন্দদাসের খুবই প্রশংসা করিয়াছেন। কবি তরুণীরমণের দুইটী সহজপদ প্রমাণস্বরূপ তুলিয়া দিয়াছেন, সুতরাং মনে হইতেছে ঐ নায়িকা রাখিয়া প্রতীক উপাসনার পদ্ধতিটা বাদ দিয়া ইঁহারাও সহজ পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবি প্রেমদাসের 'বংশী শিক্ষা' নামে একখানি বই আছে, বইখানি ১৬৩৮ শাকে লেখা। নবদ্বীপের ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র বংশীবদনকে মহাপ্রভু না কি এক রকমের উপাসনাতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন, কবি প্রেমদাস বংশী শিক্ষায় তাহাই বর্ণন করিয়াছেন। বংশীবদন মহাপ্রভুর সম-সাময়িক, আন্দাজ ১৪১৬ শাকে তাঁহার জন্ম। প্রেমদাস লিখিয়াছেন—

"কলি পাপ তাপাচ্ছন্ন দেখি ভক্তগণে।
উদয় হইলা প্রভু শচীর ভবনে॥
দুইভাবে দুই কার্য্য করিলা সাধন।
অন্যে ইহা নাহি জানে জানে ভক্তগণ॥
বহি রঙ্গ ভাবে হরেকৃষ্ণ রাম নাম।
প্রচারিলা জগমাঝে গৌরগুণধাম॥
অন্তরঙ্গ ভাবে অন্তরঙ্গ ভক্তগণে।
রসরাজ উপাসনা করিলা অর্পণে॥"

* * * *

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভু এবং রায়রামানন্দ সংবাদে এই রসরাজ তত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আমাদের মনে হয় মহাপ্রভুকে লইয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেই অন্ততঃ তিনটী দলের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং এই দল সেই অন্তহীন বিরাট রহস্যের পদ-প্রান্তেই গঠিত হইয়াছিল। প্রথম অদ্বৈত আচার্য্যের দল, ইঁহারা আনুষ্ঠানিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী এবং বর্ণাশ্রমের মধ্যে থাকিয়াই এই দল শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। দ্বিতীয়, নিত্যানন্দ ভক্তের দল, ইঁহারা প্রধানতঃ গৌর নিতাইয়ের উপাসক এবং ইঁহাদের আচার ব্যবহার বর্ণাশ্রমের সঙ্গে অনেক বিষয়ে পৃথক। সহজিয়া বা ন্যাড়ান্যাড়ীর দলের চারি সম্প্রদায়ও বাহ্যতঃ এই দলে। তৃতীয়, গদাধর গৌরাঙ্গ ভক্ত বা নাগরীভাবের উপাসক, শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের দল, লোচন ঠাকুর এই দলের কবি। রসরাজ উপাসনা ইঁহাদের দলেরই মূলমন্ত্র। কিন্তু এই তিনটী দলই এখন মূল লক্ষ্য হইতে এতদূরে সরিয়া পড়িয়াছেন যে দেখিলে চোখে জল আসে। একদল বিধি নিষেধের গণ্ডী এমনই বাড়াইয়া দিয়াছেন যে, তিলকের পরিমাণ কয় অঙ্গুলী হইতে পারে, তাহা লইয়া তর্ক বিতর্কের আর অন্ত নাই। দ্বিতীয় দল আবার তেমনই আচারে

ব্যবহারে এতই নীচে নামিয়াছেন যে, পতিত উদ্ধার মানে ইঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন যে, পতিতকে বাহিরে একটা ভেক দিয়া দলে ভিড়াইয়া লইতে পারিলেই হইল, প্রণামী পাঁচ সিকাই যথেষ্ট, তাহার অন্তর শুদ্ধির আর দরকার নাই। সহজিয়াগণের কথা না বলাই ভাল, কারণ সে বীভৎস ব্যাপার শুনিলে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়। নাগরীভাবের দলের ব্যাপারও এতদূর গড়াইয়াছে যে ইঁহারা ব্রজলীলার সঙ্গে গৌরলীলার মিলন সাধনের জন্য এতই ব্যগ্র যে অপর দিকে নজর দিবার অবসর নাই বলিলেই হয়। সখী ইত্যাদির সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য ইঁহাদের অধ্যবসায়ের ইয়ত্তা করা যায় না। অবশ্য সকল দলেই ভাল লোক আছেন,—আমি শুধু ইঁহাদের সাধারণ অবস্থার কথা বলিতেছি মাত্র। এখন সর্ব্বাপেক্ষা মুস্কিলের বিষয় দাঁড়াইয়াছে এই যে—নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম লইয়া রীতিমত মূলধন নিয়োগে ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে, এবং প্রচ্ছন্ন সহজিয়ার দল রসরাজ উপাসনার আবরণে সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। ইহা অপেক্ষা বরং প্রকাশ্য সহজিয়ারা ভাল, দেখিলে চেনা যায়। বর্ত্তমান কালে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা যে কত, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিবেন। আমরা এ দিকে গোস্বামী সন্তানগণের এবং শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ব্যথার দান

রাত আটটা বাজিয়া গিয়াছে। বৃষ্টির পরের জলো হাওয়া তখনও বন্ধ হয় নাই—বেশ ঠাণ্ডা লাগিতেছিল। তবুও ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, ক্লাবে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। খাওয়া দাওয়া যেমন একটা অবশ্য কর্ত্তব্য, সন্ধ্যার পরে পাঁচ বন্ধু মিলিয়া এই ক্লাবে বসিয়া হাসি-ঠাট্টা, গল্প গুজব এবং পাড়ার প্রত্যেকটি পরিবারের হাঁড়ির খবরটির পর্য্যন্ত আলোচনা করা তেমনি আমাদের একটা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

ক্লাবে আসিয়া দেখিলাম তখনও কেহই আসে নাই। শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও যে আমাদের মধ্যে কেহ একবার ক্লাবে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না, তাহা ঠিক জানিতাম। তাই ঘরের চাবি খুলিয়া প্রথমে দেওয়ালগিরিটি জ্বালিলাম। তারপর একখানা পুরাতন মাসিকপত্রের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বন্ধুদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। পত্রিকার একখানা ত্রিবর্ণ ছবির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছি, এমন সময় যতীন আসিয়া পত্রিকাখানি হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া বলিল—"বেশ ত ছবি দেখিতেছ। নরেশদের ডাকিলে

না কেন?" আমি বলিলাম—"একা যাইতে ভাল লাগে না; তাই বসিয়া আছি। এবার তোমাকে লইয়া বাহির হইব।"

দুই বন্ধুতে ঘরের চাবি বন্ধ করিয়া বাহির হইতেছি, এমন সময় রাজেন ও নরেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন চারি বন্ধু মিলিয়া আমাদের ক্লাবের কার্য্য আরম্ভ করিলাম।

সারাদিনের খাটুনির পর আমাদের এ মিলন যে কত সুখের, সারাদিনের কর্ম্মক্লান্তির পর বন্ধুর নিকট বসিয়া প্রাণের কথা খুলিয়া বলিবার সুযোগ যাহারা পায়, কেবল তাহারাই এ মিলনের মর্ম্ম বুঝিতে পারে।

আমরা ছিলাম পাঁচটি বন্ধু। আমরা সতীর্থ, সমবয়সী এবং প্রতিবেশী। বেশ স্ফূর্ত্তিতেই আমাদের দিন কাটিতেছিল—অন্ততঃ এই ক্লাবের কৃপায়। কিন্তু আজ প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল—একটি বন্ধু আস্তে আস্তে আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ ক্লাবে তাহার কথাই আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হইল।

"দেখ ভাই, একবার ক্লাবে আসিবার জন্য যোগেনকে কত করিয়া বলিলাম, তথাপি সে আসিল না। সে বুঝি আর আমাদের সঙ্গে মিলিতেই চায় না।"—বলিয়াই যতীন একটা দুঃখের নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

রাজেন বলিল—"কি করিয়াই বা সে আর আসিবে, বল? একটি পরিবারের ভরণ-পোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার উপর। রাজেনের কথায় বাধা দিয়া নরেন বলিল—"তাই বলিয়া কি আমাদের সঙ্গে একটিবারের জন্যও সে দেখা করিতে পারে না? আসল কথা তা নয়, ভাই! দেখা না করিবার প্রধান কারণ এই যে, সে আমাদের পরামর্শ মত কাজ করিতে রাজী নহে।"

"এ কথা ভাই সত্য। আমি সেইদিন তাহাকে কত দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলাম যে আজকাল ঠাকুর-দেবতার ছবির আর তত আদর নাই; ঐ সকল ছবি আঁকিয়া আজকাল টাকা রোজগার করা একপ্রকার অসম্ভব। আজকাল টাকা উপায় করিতে হইলে দেশের লোকের রুচির প্রতি প্রথমে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিক্রেতার চোখে যাহা ভাল দেখায়, তাহা যে ক্রেতাও সে দৃষ্টিতে দেখিবেন, তাহার কোনই কারণ নাই। কিন্তু তাহাকে অত বলিয়াও কোনই কাজ হয় নাই। আর এক দিন গিয়া দেখিলাম—সে কৃষ্ণঠাকুরের একখান ছবি আঁকিতে ব্যস্ত!" নরেশ আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় যোগেন আসিয়া ক্লাবে ঢুকিল। আমরা বিস্মিত হইলাম।

যোগেন আর সে যোগেন নাই। তাহার পরিধেয় বস্ত্রখানি শতছিন্ন; ছেঁড়া পাঞ্জাবীটির ভিতর দিয়া তেল-অভাবে খড়ি-ওঠা গায়ের খস্‌খসে চামড়াগুলি দূর হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ আজ কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু দুইটী দেখিলে মনে হয়, যেন তাহারা এ সংসারে কোথাও শান্তির সন্ধান না পাইয়া হৃদয়ের

নিভৃত কন্দরে কোথাও বাঞ্ছিত শান্তির খোঁজ পাওয়া যায় কিনা, তাহাই অনুসন্ধান করিতেছে। তাহার মুখে দারিদ্র্যের ভীষণ প্রতিচ্ছায়া যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ক্ষীণ দুর্ব্বল দেহ যেন আজ বাতাসের ভারও সহ্য করিতে অক্ষম। টলিতে টলিতে আসিয়া যোগেন আমার পার্শ্বে বসিল।

এতদিন তাহার সঙ্গ না পাইয়া আমরা কেবল তাহার সাংসারিক অভাব অভিযোগের কথা ভাবিয়াই কখনও কখনও একটু দুঃখ প্রকাশ করিতাম; কিন্তু আজ দারিদ্র্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি লইয়া যখন যোগেন আসিল, আমার পার্শ্বে বসিল, তখন তাহার এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া আমার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও যোগেনের দুঃখে সহানুভূতি জানাইবার জন্য একটি কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারিলাম না। কে যেন তখন আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল—একবৃন্তে প্রস্ফুটিত পাঁচটি ফুলের মত তোমরা আবাল্য এক সঙ্গে থাকিয়া পরস্পর যে স্নেহ মমতার সূত্রে বাঁধা পড়িয়াছিলে, সংসারচক্রের ঘোর আবর্ত্তনে পড়িয়া তোমাদের আবাল্যের একটি সহচর যে এমনিভাবে নিষ্পেষিত হইয়া গেল, তাহার জন্য তোমরা কি করিয়াছ? ক্লাবে আসিতে পারিত না বলিয়া মাঝে মাঝে তাহার সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা ছাড়া আর কোনও কর্ত্তব্যজ্ঞান একমুহূর্ত্তের জন্যও কি তোমাদিগের অন্তরে জাগিয়াছিল? উঃ! কি নিষ্ঠুর কপট বন্ধুত্বের ভান করিয়া তাহাকে এতদিন ধরিয়া তোমরা প্রতারিত করিয়া আসিয়াছ!

আমরা সকলেই নির্ব্বাক্; কি বলিয়া আজ যোগেনের সঙ্গে আলাপ করিব, কি বলিয়া তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিব, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না—সকলেই যোগেনের মুখের প্রতি চাহিয়া আছি। আমাদের দৃষ্টির ভিতর কি ছিল জানি না; যোগেন অতিষ্ঠ হইয়াই বলিয়া উঠিল—"ভাই, আমি জানিতাম যে আমাকে দেখিলে তোমরা অবাক্ হইবে—ব্যথা পাইবে। তথাপি আজ একবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া বহুদিনের পুরাতন স্মৃতিটিকে একটু সজীব করিয়া লইবার জন্য আসিয়াছি। কিন্তু ভাই, আমার সময় অতি অল্প। আমি আর সময় নষ্ট করিতে পারিব না। তাহারা সকলে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই পত্রখানা রইল ভাই, কিন্তু এ চিঠি আজ পড়িও না—এ আমার বিনীত অনুরোধ।" কথাগুলি একপ্রকার এক নিঃশ্বাসে শেষ করিয়াই যোগেন ক্লাব হইতে বাহির হইয়া গেল। আমরা এ ব্যাপারের কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অথচ যোগেনের কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সেই রাত্রে তাহার পত্রখানিও পড়িতে পারিলাম না। অগত্যা সেদিনকার মত ক্লাবের কার্য্য বন্ধ রাখিয়া সকলে নিজ নিজ গৃহে ফিরিলাম।

ভোর হইতে না হইতে শয্যাত্যাগ করিয়া যতীন, নরেশ ও রাজেনকে ডাকিয়া ক্লাবে আনিলাম। সকলেই যোগেনের পত্র শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। আমি পড়িবার উদ্দেশ্যে পত্রের

মোড়ক খুলিয়াই দেখি—পত্রের সঙ্গে একখানা পাঁচ হাজার টাকার চেক রহিয়াছে। ব্যাপার কিছুই ধারণা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। শেষে পত্র পড়িতে আরম্ভ করিলাম। যোগেন লিখিয়াছে—

"ভাই, আমার পরম সৌভাগ্য যে তোমাদের ন্যায় সরলপ্রাণ বন্ধুর ভালবাসার আশ্রয়ে আবাল্য স্থান পাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু আমার অদৃষ্ট নেহাৎ মন্দ, তাই অপ্রাপ্ত বয়সে পিতৃহারা হইলাম; আমার সকল আশা আকাঙ্ক্ষা অতল জলে ডুবিয়া গেল। তার পরই এই অপরিণত বয়সে জটিল সংসারের গুরুকর্ত্তব্যের দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া আমাকে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য-রাক্ষসী-তাহার করাল বদন ব্যাদান করিয়া আমাকে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। তার কোপে পড়িয়া প্রতিমুহূর্ত্তে আমি নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; তাই এতদিন তোমাদিগের সঙ্গসুখ লাভ আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

"পিতার মৃত্যুর পর হইতে দীর্ঘ দুইটী বৎসর কি দারুণ জীবন-সংগ্রামে যে আমি ব্যস্ত ছিলাম, তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামীই জানেন। তোমরা নিঃস্বার্থ বন্ধু; আমার এই দুঃখ-দৈন্যের কাহিনী শুনিলে তোমাদের সরলপ্রাণে ব্যথা লাগিবে, এই জন্যই আমি তোমাদিগকে কখনও আমার দুঃখের কথা জানাই নাই। তোমরা কিন্তু আমার অবস্থা দেখিয়া সবই বুঝিয়াছিলে; তাই আমাকে সর্ব্বদা ঠাকুর-দেবতার ছবি আঁকিবার অভ্যাস ত্যাগ করিয়া হাল ফ্যাসানের ছবি আঁকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলে। তোমরা আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, তাই আমাকে আর্থিক উন্নতি বিধানের উপায় দেখাইয়া দিতে আসিয়াছিলে। কিন্তু সেই ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করা আমি কখনও যুক্তিযুক্ত মনে করি নাই। তোমাদের উপদেশে আমি যে কখনও তেমন ছবি আঁকিতে চেষ্টা করি নাই, তাহা নয়। কিন্তু যখনই আমি কাজ আরম্ভ করিয়াছি—তখনই কে যেন আমার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিত, সাবধান যোগেন! যাঁহারা মনের ভাব এবং হৃদয়ের ভাষা শিল্পকলার সাহায্যে ব্যক্ত করিতেন, সেই জাতির শোণিত এখনও তোমার প্রতি শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত। তাঁহাদেরই বংশধর হইয়া তুমি আজ শিল্পকলার অপমান করিতে চলিয়াছ? সাবধান, দারিদ্র্যের পীড়নে ব্যস্ত হইয়া হৃদয়ে বল হারাইও না, সনাতন প্রথার অবমাননা করিও না। শিল্পকলা তোমার বাহ্য দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য নয়। ভারতের প্রাচীন শিল্প সুসভ্য আর্য্যজাতির সদনুভূতির একটা বিকাশ মাত্র। যাঁহাদের শিক্ষা, সাধনা এবং জ্ঞানের জ্যোতির এক একটি স্ফুলিঙ্গের প্রেরণায় আজ বিভিন্ন জাতি বিশ্বের অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিবার প্রয়াসী, তাঁহারা কি করিতেন, জান? তাঁহারা এই শিল্পকলার সাহায্যে তাঁহাদের আরাধ্য দেবতাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেন। আর আজ তাঁহাদেরই বংশধর হইয়া তুমি কি না আধুনিক

শিক্ষায় শিক্ষিত মানবের নষ্ট রুচির পরিতৃপ্তির জন্য সেই আদর্শ শিল্পকে বিকৃত রুচির সমর্থক করিয়া তুলিতে চাও? ধিক্ তোমার অর্থস্পৃহায়। মনে রেখো—মানুষ কখনও আপন ইচ্ছানুযায়ী অবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, পারিবে না। মানব কেবল চেষ্টা করিবার অধিকারী, শুভাশুভফল ভাগ্যবিধাতার হস্তে।

"শত চেষ্টা করিয়াও যে আমি তোমাদের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে পারি নাই—বিবেকের এই ধিক্কারবাণীই তাহার প্রধান কারণ। অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু একবারও সফলকাম হইতে পারি নাই। যখনই তুলি হাতে করিয়া বসিতাম, তখনই ঐ শ্লেষবাণী স্মরণ হইত, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার অজ্ঞাতে হাতের তুলি পড়িয়া যাইত। তাই তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই।

"তোমরা জান, আধুনিক রুচি অনুযায়ী ছবি না আঁকিলেও, শিল্পে আমার যে সামান্য অধিকার ছিল, তাহাতে কোন প্রকারে পরিবার প্রতিপালনের ব্যবস্থা হইয়া যাইত। আর কেবল ঐ সম্বল লইয়াই আমি সংসারের পথে বাহির হইয়াছিলাম। কিন্তু আস্তে আস্তে উপায় কমিতে লাগিল, আর তার সঙ্গে আমার দেনার দায় বাড়িয়া চলিল। কাজে কাজেই অভাব আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিল—কেবল অভাব আর অভাব! যাহা আয় করি, কিছুতেই কুলায় না। পাওনাদারের দেনা দিতে পারি না। তাই আস্তে আস্তে ধারের পথ বন্ধ হইল, কেহ আর আমাকে একটি কপর্দ্দকের জন্যও বিশ্বাস করিত না।

"আয় যতই কমিতে লাগিল অভাব ততই বাড়িয়া বলিল। কিছুতেই সঙ্কুলান হয় না দেখিয়া কোঠাঘর ছাড়িয়া অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে খোলার ঘর ভাড়া করিলাম, দুই বেলার স্থলে একবেলা আহারের ব্যবস্থা করিলাম। কিন্তু বালির বাঁধে কি আর সমুদ্রের বেগ প্রতিহত হয়? যখন দিনে এক বেলার আহার জুটিল না, তখন দুই দিনে একবেলা খাইবার ব্যবস্থা করিলাম। শেষে তাহাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। কোনো দিন ভাগ্যক্রমে যদি একটি টাকা জোগাড় করিতে পারিয়াছি, তাই হাতে দিয়া মাকে বলিয়াছি—"মা, এই নাও। ইহাদ্বারা পাঁচদিন চালাইতে হইবে।" আমি জানি, এক টাকায় পাঁচদিন চলিতে পারে না; তথাপি বাধ্য হইয়া আমাকে এইপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইত। কি করিব? আমি নিরুপায়! মাকে এভাবে বলিতাম বটে, কিন্তু আমার মনকে কোনপ্রকারেই সান্ত্বনা দিতে পারিতাম না। আপন অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে গেলেই চোখের জলে আমার বুক ভাসিয়া যাইত। কিন্তু হায়! কেবল অশ্রুই সার! আশার একটি ক্ষীণ আলোক রশ্মিও ক্ষণিকের জন্য আমার চক্ষুর সম্মুখে কখনও ভাসিয়া আসিত না।

একদিন দুই তিনখানা আঁকা ছবি বিক্রয় করিবার জন্য অনেক দোকানে ঘুরিয়া শেষে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি—দুঃখে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আহা!

দুই দিনের উপবাসী ভাইভগিনীদের আমি কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব? মাকে কি বলিব? এই সকল চিন্তা করিতেছি, এমন সময় মা আসিয়া বলিলেন "সকাল হইতে ছোট খোকার জ্বর হইয়াছে, এখন দাস্তবমি আরম্ভ হইয়াছে। একবার ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়া আনিতে পারিস্ কিনা দেখ না, বাপ।"

"কথাটি শুনিয়াই আমার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। কি বলিয়া ডাক্তার বাবুকে মুখ দেখাইব? কি বলিবেন তিনি? বাবার অসুখের সময় যে ঔষধ আনিয়াছি, তাহার দাম দিতে পারি নাই; খুকীর জন্য সেইদিন ঔষধ আনিয়াছি তাহারও দাম দিতে পারি নাই। আজ আবার কি তিনি আসিবেন না ঔষধ দিবেন? খালি হাতে আজ আবার কোন্ মুখে তাঁহাকে ডাকিতে যাইব? এই চিন্তা আমাকে ক্ষণেকের জন্য অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু দুঃখ ভুগিয়া ভুগিয়া আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। লজ্জা এবং আত্মসম্মানবোধ পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই আমাকে বাধ্য হইয়া বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। তাই এমতাবস্থায়ও ডাক্তার বাবুর নিকট যাইতে আমার বিশেষ কোন কষ্ট হইল না। কিন্তু এবার আর তাঁহার সহানুভূতি পাইলাম না। আমার সানুনয় নিবেদন এবং কাতর প্রার্থনা তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন। হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলাম। আহা! আজ যদি আমার সম্পদ থাকিত, তাহা হইলে কি আর ডাক্তার বাবু এ ভাবে আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন? আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিলাম। ঘরে ঢুকিতেই মায়ের কাতর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। ত্বরিতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম—ছোট খোকার নিস্পন্দ দেহ বুকে চাপিয়া ধরিয়া মা কাঁদিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই তাঁহার শোকাবেগ বাড়িয়া উঠিল; তিনি নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। মাকে সান্ত্বনা দিই, এমন ভাষা আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। কিন্তু দুঃখ করিয়া কোনই ফল নাই। নিয়তিকে কে বাধা দিবে? অগত্যা পাষাণে বুক বাঁধিয়া স্নেহের পুতুলিকে নিজ হাতে দাহ করিলাম।

খোকার মৃত্যুর পর হইতেই মায়ের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। দিন দিন তিনি যেন শুকাইয়া কাঠ হইয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার জীর্ণ দেহ আর ভাইবোন দুইটীর কঙ্কালসার মূর্ত্তি দেখিলেই দুঃখে আমার বুক ফাটিয়া যাইত। উঃ! কি সে যন্ত্রণা! চোখের জল বহুদিন শুকাইয়া গিয়াছে—সম্বল কেবল দীর্ঘনিশ্বাস। অতি দুঃখে যখন দুই চারিটি দীর্ঘশ্বাস হৃদয়টিকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া বাহির হইয়া যাইত, তখন একটু স্বস্তি বোধ করিতাম। আবার অদৃষ্ট পরীক্ষায় বাহির হইতাম। এই ভাবেই দিন যায়। আমার সুখদুঃখের জন্য কালের গতি কোন দিন এক পলের জন্য বদ্ধ রহিল না। কালস্রোতের আবর্ত্তে অনন্ত আঁধারের মধ্যে ডুবিয়া হা-হুতাশ করিতে লাগিলাম। কেবল আঁধার।—এ আঁধারের কি পার নাই? এই অনন্ত আঁধারের পরপারে কোথাও কি একটা আলোকের রাজ্য নাই? এমন করিয়া ত আর

প্রাণ বাঁচে না ! এ ভাবে দুঃখ দেওয়া এবং সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যু যে শতগুণে শ্রেয়ঃ। তাই একদিন স্থির করিলাম মৃত্যুই আমার একমাত্র পন্থা।

"কিন্তু মানুষ কখনও বিধিলিপির বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে পারে না। ভোগ শেষ না হইলে মানুষের মুক্তি হয় না। আমাকে যে আরও অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। তাই মরিতে পারিলাম না—একটি ক্ষীণ আশার আলোক দেখিয়া মরিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। সে আলোক আর কিছু নয়—একখানি বিজ্ঞাপন। এক রাজা বিজ্ঞাপন দিয়াছেন - পারিবারিক অবস্থা অবলম্বন করিয়া একখানি ছবি আঁকিতে হইবে। যে চিত্র সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী হইবে, তাহার শিল্পী পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে। মৃত্যুকে বলিলাম—একটু অপেক্ষা কর, এ সুযোগে একবার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখি।

"ছবি আঁকিতে প্রবৃত্ত হইলাম ; কিন্তু যাহা আঁকি, আমারই পছন্দ হয় না। অনেক চেষ্টা করিয়াও একখানা চিত্তাকর্ষক ছবির কল্পনা গড়িয়া তুলিতে পারিলাম না। এক এক সময় মনে করিতাম আমার পারিবারিক অবস্থা উপলক্ষ করিয়াই একখানি ছবি আঁকা যাউক। যেই মুহূর্ত্তে এই চিন্তার উদয় হইত, সেই মুহূর্ত্তেই বিবেক আসিয়া আমার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইত। উঃ ! কি যে বিষে-ভরা তার প্রত্যেকটি অক্ষর। বিবেক বলিত "তুমি কি যোগেন ? তোমার হৃদয়ে আত্মসম্মান বজায় রাখিবার বিন্দুমাত্র স্পৃহাও নাই ? সন্তান হইয়া কোন্ প্রাণে তুমি তোমার ক্ষুৎপিপাসাকাতর জননীর শীর্ণ মূর্ত্তি শিল্পের সাহায্যে জগতের সমক্ষে ধরিয়া দিতে চাও ? অনাহারক্লিষ্ট ভ্রাতা ও জননীর কঙ্কালসার ছবি আঁকিয়া দিয়া তুমি কোন প্রাণে তোমার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করিতে চাও ? এইজন্যই কি তুমি সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে ? এরই জন্যই কি তুমি তোমার সহোদরদিগের স্নেহময় জ্যেষ্ঠভ্রাতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে ? ধিক্ তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞানকে ! আর শত ধিক তোমার অর্থলাভস্পৃহায় !" বিবেকের এই শ্লেষবাণী বিষাক্ত শেলের মত আমার অন্তরে বিদ্ধ হইত। সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্কল্প ভাঙ্গিয়া যাইত।

"একবার, দুইবার, তিনবার—যতবার চেষ্টা করিয়াছি, বিবেকের উত্তেজনাময় শ্লেষবাক্যে ততবারই আমাকে নিরস্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু শেষটায় আর পারিলাম না। সময় সঙ্কীর্ণ—যে সুযোগ হৃদয়ের কোণে একটু ক্ষীণ আশার আলো জ্বালিয়া দিয়াছিল, তাহাও বুঝি নিভিয়া যায়। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে এক এক বার ক্ষণপ্রভা বিদ্যুৎ বিকসিত হইয়া আবার চকিতে কোথায় লুকাইয়া যায়। পথিক যে তিমিরে সেই তিমিরে! আমার অবস্থাও বুঝি তাই! বিবেকের আদেশ আর রক্ষা করিতে পারিলাম না - দারিদ্র্যের তাড়নাজনিত অর্থস্পৃহা বিবেককে ছাপাইয়া উঠিল। শেষে আমার পারিবারিক অবস্থা উপলক্ষ করিয়া ছবি আঁকাই স্থির হইল।

"সেদিন দ্বিপ্রহরে মা আমার ভাইবোনদের লইয়া শুইয়া ছিলেন। আমি চুপি চুপি ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাদের ছবি আঁকিয়া লইলাম। সে ছবিকে পরীক্ষকের চিত্তাকর্ষক করিবার অভিপ্রায়ে কি ভাবে সজ্জিত করিয়াছিলাম, জান? আমি আঁকিয়াছি—আমার অনাহারক্লিষ্ট ভ্রাতা-ভগিনীকে তৃষ্ণার জল দিতে যাইবার চেষ্টা করিয়া মা সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়িয়া আছেন, পিপাসায় কাতর ভ্রাতাভগিনী তৃষ্ণার তীব্র দহন সহ্য করিতে না পারিয়া হা হুতাশ করিতে করিতে আমার সংজ্ঞাহারা মায়ের বুকের উপর পড়িয়া আছে—তাহাদের আত্মাও কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে।

"ছবি আঁকা শেষ হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই রাজবাড়ীতে ছবি জমা দিয়া আসিলাম। অদ্য সকালে একখানা কার্ড পাইয়া বুঝিতে পারিলাম—আমার ছবিই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে; আমিই প্রথম পুরস্কার পাইয়াছি। দারুণ দুঃখের মধ্যেও হৃদয় একবার আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আজ মা, বোন এবং ভাইকে ক্ষুধায় অন্ন এবং তৃষ্ণায় জল দিবার সংস্থান হইল ভাবিয়া কত যে আনন্দ পাইলাম, তাহা আর কি বলিব। তারপর কার্ডখানি লইয়া রাজবাটীতে গেলাম। কার্ড দেখাইতেই তাঁহারা আমাকে পাঁচহাজার টাকার একখানা চেক দিলেন। চেক পাইয়া আমার আনন্দ দেখে কে? জীবনে এমন আনন্দ কখনও পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

"বাড়ী ফিরিবার পথেই দোকানীকে চেক দেখাইয়া আবশ্যক জিনিষপত্র লইয়া আসিলাম। কত আশা—কত আনন্দ—আজ আমি পাঁচ হাজার টাকার মালিক। যাবতীয় দেনা শোধ করিয়া শীঘ্রই মা এবং ভ্রাতা-ভগিনীকে লইয়া আবার একটি ভাল বাড়ীতে গিয়া বাস করিব। ভাইবোন দুইটীকে এইবার স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিব।—কত সুখেই আমায় দিন কাটিবে। আবার মনের আনন্দে শিল্পটা আরম্ভ করিব। আবার তোমাদের ন্যায় অকৃত্রিম বন্ধুর সঙ্গ লাভ করিবার সুযোগ হইবে। এইপ্রকার আশা আকাঙ্ক্ষার উচ্ছ্বাসে তখন যে কি এক অপূর্ব্ব শান্তির আবেগ জীবনে একটিবারের জন্য আমার হৃদয়কে ভরপুর করিয়া দিয়াছিল, তা কেবল ভুক্তভোগীই উপলব্ধি করিতে পারে।

"কিন্তু ভাই, আমার ন্যায় হতভাগ্যের পক্ষে সুখের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। বিধি-লিপির বিরুদ্ধে মানব যে কোন কার্য্যই করিতে পারে না, সে কথা ভুলিয়া গিয়া আমি বিবেকের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি; আমি কি প্রকারে সুখ পাইব? আশা-আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হৃদয়ে গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে আগ্রহে ডাকিলাম—'মা, ওমা, মাগো!'—কিন্তু কোন সাড়া নাই! বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল।—তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে গেলাম। ভিতরে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে মুহূর্ত্তে সকল আশা অতল জলে ডুবিয়া গেল। এ যেন আমার সেই ছবি আজ বাস্তব ঘটনায় পরিণত হইয়া দেখা দিয়াছে। যে কল্পনাকে রং ও তুলির সাহায্যে চিত্র-শিল্পে পরিণত করিয়া আজ আমি পাঁচ হাজার টাকার মালিক, আমার চোখের সম্মুখে আজ

সেই কল্পনা মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিল—আমার মা, ভাই এবং ভগিনীকে লইয়া! যে আশা-আনন্দের উচ্ছ্বাস লইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলাম, মুহূর্ত্তে তাহা ভস্মীভূত হইয়া গেল। আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। চোখে বিশ্বসংসার অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। দুঃখে অন্তর ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। একটা হাহাকার আমার শুষ্ক হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বাহির হইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া ফিরিয়া গেল। হৃদয় যে আমার তপ্ত মরু—কোথাও একবিন্দু জলের লেশমাত্র নাই; জ্বলিয়া পুড়িয়া সব খাক্ হইয়া গিয়াছে! এই নিদারুণ শোকের বেগ সাম্‌লাইতে পারিলাম না—সংজ্ঞা হারাইলাম।

"কতক্ষণ এভাবে ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। চেতনা পাইয়া মা'র পদপ্রান্তে বসিলাম; কিন্তু এখন যে আমি আর আমার স্নেহময়ী জননী এবং আদরের ভাইবোনগুলির ত্যক্ত কায়ার প্রতিও চাহিতে পারি না! কি ভীষণ বিভীষিকা! যারা কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও আমার নিতান্ত আপনার জন ছিল—এক্ষণে তাহারাই যে আবার নিষ্ঠুর শত্রুর ন্যায় আমার উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত। তাহাদের ত্যক্ত কায়া যেন আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে চায়! ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া চোখ বন্ধ করিলাম; কিন্তু তথাপিও নিস্তার নাই। আমি শুনিতে লাগিলাম, তাহারা যেন বলিতেছে—"কোন্ লজ্জায় তুমি আমাদের জন্য দুঃখ করিতেছ? কি সুখে রাখিয়াছিলে তুমি আমাদিগকে? মাতার প্রতি সন্তানের যাহা কর্ত্তব্য, ভ্রাতাভগিনীর প্রতি ভ্রাতার যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কোন্‌টি তুমি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলে? যে মা-বোনের ভরণ-পোষণ যোগাইতে পারে না, সে আপনাকে মায়ের ছেলে এবং ভ্রাতাভগিনীর সহোদর বলিয়া প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করেনা কেন? দিনান্তে একবেলার আহার জোগাইবার ক্ষমতা নাই! তোমারই অক্ষমতার জন্য যে তোমার মা-বোন দিনে দিনে অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তাহার জন্য তোমার একটুও পরিতাপ হয় না! আজ মা-বোনের জন্য দুঃখ করিতেছ; কিন্তু সেইদিন এই মা-বোনের জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার ছবি আঁকিয়া পরীক্ষকের চিত্তাকর্ষণ করিবার লোভ ত সামলাইতে পারিলে না। ধিক্! শতধিক্ তোমার মত নিষ্কর্ম্মা জীবকে।"

"দুঃখ ভুগিতে ভুগিতে আমার হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে। নিদারুণ দুঃখের উপর এই বিষে-মাখা শ্লেষবাণী শুনিয়াও সে পাষাণ গলিল না-এক ফোটা চোখের জল বাহির হইল না। আজ বুকের ভিতর কেবল হাহাকার আর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস! বুকের উপর যেন একখণ্ড জগদ্দল পাষাণ চাপিয়া আছে—শ্বাস আর চলে না। অতিকষ্টে হৃদয়ের আগুন হৃদয়ের ভিতর চাপিয়া রাখিয়া ইহাদের সৎকার ব্যবস্থা করিলাম। দাহ শেষ করিয়া যখন ঘরে ফিরিতেছিলাম তখন দিনের শেষে এই বিশ্ব আঁধারের কোলে মুখ লুকাইতেছিল। আমার মনে হইল-আমার হৃদয়ের জমাট অন্ধকার এই বিশ্বসংসারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কেবল

অন্ধকার—অন্তরে বাহিরে সব স্থানেই ভীষণ অন্ধকার! আজ এই সংসার আমার চক্ষে একটা বিরাট শ্মশান! এ শ্মশানে বাস করা অসম্ভব। আজিকার সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা অনন্ত তিমিরগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

"এই সংসারে আমার আপনার বলিতে যাহা কিছু ছিল, আজ সবই হারাইয়াছি। আর আমার বাঁচিয়া ফল কি? চলিলাম বন্ধু—এ জীবনের মত এই শেষ দেখা।

"ওই পাঁচ হাজার টাকার চেক্ তোমাদের জিম্মায় রহিল। আমার নামে দোকানে যে কয়টী টাকা ধার আছে, তাহা শোধ করিয়া দিয়ো। আর বাকী টাকার দ্বারা দীন দুঃখীর দুঃখ মোচন করিবার চেষ্টা করিও। স্মরণ রাখিও, এই টাকার জন্য আজ আমি মাতৃহারা! এই টাকার বিনিময়ে আমি পাইয়াছি—অনন্ত যন্ত্রণা আর মর্ম্মন্তুদ হাহাকার।"

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মসীজীবী বাঙ্গালীর জীবন-সমস্যা

প্রয়োজনের বশে ও দারিদ্র্যের পীড়নে যে সকল তরুণ যুবক যৎসামান্য শিক্ষা পাইয়া স্কুল ছাড়িয়া কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। আবার স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে যাহারা পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য বিবাহ করিয়া বসিতে বাধ্য হয়, এবং অসময়ে পড়া ছাড়িয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য লালায়িত হয়, ভদ্রঘরের এমন ছেলের সংখ্যাও বড় কম নহে। এই শেষোক্ত নবযুবকগণ যে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পিতার চিন্তাভার লাঘব করিবার জন্য, অথবা সাংসারিক অবস্থার উন্নতির জন্যই চাকরির চেষ্টা দেখে, তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে, বিবাহ করিলেই তাহার নব পরিণীতার প্রতি একটা কর্ত্তব্যের যেন ভার পড়ে। যুবকের নিজের চা চুরুটের খরচের জন্য নহে; সে খরচ যাহার নাই, তাহার নববধূর সাবান, এসেন্স, নভেল, নাটক, চিঠি, ষ্ট্যাম্পের খরচটাও ত ক্রমে আবশ্যক হইয়া পড়ে? কিন্তু সমজদার পুত্র পিতার কাছে সে খরচটা কি বলিয়াই বা চাহিয়া লয়? ছা-পোষা পিতা নিরোজগারী ছেলের খেয়ালমত পকেট খরচ কোথা হইতে কতদিন বা যোগাইতে পারেন? বিবাহের পরই গ্রন্থে "ডুরি বাঁধিয়া" তাড়াতাড়ি উপার্জ্জনে মন তাই অনেক ছেলের দেখা যায়। বলা বাহুল্য, প্রায়ই তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার মত শিক্ষাই (training) হয় না। পুঁজির অভাবে ব্যবসায়ে লোকসান দিয়াও হাতে-কলমে শিক্ষালাভের সম্ভাবনাও অল্প থাকে। "চাষাড়ে কাজ" কৃষির কথা বলাই ধৃষ্টতা। দুঃখের কথা, শ্রমশিল্পে

হাত দিবার মত মনের বল কাহারও কাহারও থাকিলেও দেহের বলে কুলায় না। অগত্যা ভদ্রঘরের ছেলে গতানুগতিক ভাবে দশ পনের টাকার কেরাণীগিরি পাইলে আনন্দিত হয়। লজ্জার কথা, এমন চাকরিও খালি হইলে বেচারী দেখে, বহু উমেদার তাহার প্রতিযোগী। কাহারও বিদ্যায় তাহার অপেক্ষা দাবী বেশী, কাহারও বা সুপারিশের জোর বেশী। সরকারী দপ্তরে এরূপ উমেদারের বড় কিছু হয় না। সওদাগরী অফিস অনেককেই কূল দেয়; কিন্তু, চটকল, পাটকল, তেলকল আর হাজার হাজার কল কারখানাই তাহাদের মুখ রক্ষা করে। উচ্চ স্কুলের উত্তীর্ণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বহু আণ্ডার-গ্রাজুয়েট উমেদার, মাঝারী ও বেশী মাইনের কেরাণীগিরি পাইলেও তাঁহাদের সংখ্যা ইঁহাদের তুলনায় খুবই কম। তাই দেশের সাধারণ ভদ্রগৃহস্থের অন্নবস্ত্রের দুঃখ আর ঘুচে না। সহরের নাড়ী টিপিয়া গ্রামের ধাত বুঝা যায় না। সহরের চক্ষু ঝলসিতকর দৃশ্যাবলী, বায়স্কোপ, থিয়েটার, আর শত আমোদ-প্রমোদ, ধনীদের বিলাসপর্ব্ব এবং স্কুল কলেজ, বিজ্ঞানাগার, সভাসমিতি জনস্রোত কোলাহল এবং বিদ্যুতের আলোক ক্ষয়িষ্ণু পল্লীগুলির অবস্থা বুঝিবার সুযোগ ত দেয়ই না, বরং দৃষ্টি অবরোধ করিয়া বসে। যে দেশের ছেলেদের ব্রহ্মচর্য্যের বয়স বাল্যেই সমাপ্ত করিতে হয়, যাহাদের অধিকাংশের শিক্ষা কৈশোরেই শেষ হয়, যাহাদের শিক্ষা ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষি, ব্যবহারিক শিল্প, বিজ্ঞান, রসায়নের ত্রিসীমার বাহিরে কেবল মাত্র চিঠির নকল, তেরিজকষা, খাতালেখা, কুলীর সর্দ্দারী আর গুদামসরকারীতে পর্য্যবসিত হয় এবং কাহারও বা তাহাও হয় না; যাহাদের অধিকাংশেরই গৃহে বা স্কুলে পাঠ্যপুস্তকের নীতিকথা ছাড়া ধর্ম্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, শিষ্টাচার-শিক্ষা আদৌ হয় না; যাহারা কি বাল্যে, কি যৌবনে দেশকে চিনিতে, নাগরিক কর্ত্তব্য ও অধিকার বুঝিতে শেখে না; যাহাদের অগণিত লোক সমাজের হিত কিসে হয় তাহা না বুঝিয়া কেবল দলাদলি করে, আর পরশ্রীকাতর ও স্বার্থপরবশ হইয়া পরস্পরকে অপরাধী করিয়া ক্ষতবিক্ষত সমাজের ক্ষত আরও বৃদ্ধি করিয়া থাকে, যাহারা জাত্যভিমান, জাতিনিন্দা, ছুঁৎমার্গ আর শৌচাশৌচ বিচার, সর্ব্বোপরি পরচ্ছিদ্রানুসন্ধান ও পর-সমালোচনা লইয়া সামাজিক জীবনের অধিকাংশ ভাগ ক্ষেপণ করে, যাহাদের বহুসংখ্যক কিশোর ও যুবক পুত্র কল-কারখানার দূষিত আবহাওয়ায় ও কদর্য্য সংশ্রবের মধ্যে সমস্ত দিন থাকিয়া অবশিষ্ট সময় অভাবের সংসারে নিরুৎসাহে, আলস্যে, অসন্তোষে অতিবাহিত করে, এবং পুষ্টিকর অন্ন, উপযুক্ত বস্ত্র, স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের অভাবে এবং আয়ুক্ষয়কর অভ্যাস সমূহের বশবর্ত্তী হইয়া যৌবনেই জরাগ্রস্ত হইয়া অনাথ শিশু ও বিধবা নারীর দল বৃদ্ধি করে—তাহারা সমগ্র জাতিটিকে কিভাবে গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করিতেছে, অথবা সমাজ ও জাতির কোন্ অংশ পুষ্ট করিতেছে, দিন দিন তাহারা এই বহুবিশ্রুত কৃতপৌরুষ প্রাচীন জাতিকে বিশ্বমানবতার কোন্ স্তরে পৌঁছিয়া দিতেছে, বিশ্বজাতি-সঙ্ঘের কত পশ্চাতে ফেলিয়া দিতেছে—তাহা

ভাবিয়া দেখিবার এবং ভাবিয়া তাহার স্রোত ফিরাইবার সময় আসিয়াছে ; বলিব কি, সে সময় অতীত হইয়া যাইতে বসিয়াছে।

অল্প বেতনের কলমপেষা চাকরি আর সামান্য আক্ষরিক বিদ্যালব্ধ ও নিরক্ষর কল-বাবুদের "নলিখোলা, পাটবাঁধা, চটসেলাই, আর মালবোঝাই, মার্কা দেওয়া আর উকো ঘষার কাজে দশ পনের টাকার মাসিক আয়ে তাহাদের সংসারগুলি, সুতরাং সমাজের কতখানি অংশ, নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে ; অর্থ অবসর দেহমনের বল এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞান ও উপায় অভাবে তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণামবশে ম্যালেরিয়া ও ক্ষয়রোগ দেশে কেমন স্থায়ী অধিকার বিস্তার করিয়া লইয়াছে ; দেহ মনের দুর্ব্বলতাজনিত বুদ্ধি ও শক্তিসাধ্য সর্ব্ব কর্ম্মেই উৎসাহ ও অধ্যবসায়হীনতা, প্রবলের আক্রমণ ও লাঞ্ছনা হইতে আত্মরক্ষার শক্তিহীনতা ক্রমেই কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা চক্ষুষ্মানের অগোচর নাই। সহরের সজাগ প্রতিষ্ঠানগুলির উক্ত অভাবের প্রতিকার চেষ্টা এই মহাদুর্দ্দিনের ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুল্লেখার মত ক্ষণে ক্ষণে চমকিত হইতেছে বটে, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রচেষ্টার পরিণাম দেখিয়া তাহা ক্ষণপ্রভারই ন্যায় ক্ষণিক বলিয়া মনে হইতেছে। তাহাতে একদিকে স্থায়ী প্রতিকারের বহু প্রতিবন্ধক যেমন দেখা দিতেছে, তেমনি জাতীয় জীবনব্যাপী অবসাদের সহচর আতঙ্কেরও অবসান হইতেছে না। জীবন-রহস্য ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে।

এমন সঙ্কটময় অবস্থাতেও বাঙ্গালীর কেরাণীগিরির মোহ আজও ছুটিল না। এত লাঞ্ছনা, এত নিন্দা, এত স্থান-সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা, এত ধিক্কার, এত পশ্চাত্তাপ সত্ত্বেও এখানকার গৃহ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগুণে ভারতময় কেরাণীর সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। সংখ্যায় প্রয়োজনাতিরিক্ত হওয়ায় কেরাণী সর্ব্বত্রই অতি অল্প বেতনে সহজলভ্য হইতে দেখিয়াও এ পথের পুরাতন পথিক বাঙ্গালীর দৃষ্টি আজও খুলিল না! বাঙ্গালীর যাহা এক সময়ে সাধনার বস্তু ও নিজস্ব বৃত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজ যে তাহা সকল প্রদেশের সকল জাতিরই অবলম্বনীয় বৃত্তি হইতে চলিয়াছে, বাঙ্গালীর এই একচেটিয়া জীবিকার্জ্জন ক্ষেত্র যে ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। পূর্ব্বে যে বাঙ্গলা দেশ সব প্রদেশের প্রয়োজনসাধক কেরাণী ও উচ্চ কর্ম্মচারীর যোগান দিত, আজ সেই বাঙ্গলার প্রয়োজনে দক্ষিণ ভারত বিশেষ করিয়া মাদ্রাজ তাহার যোগান দিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বে সকল প্রদেশে যেখানে বাঙ্গালী ছাড়া কেরাণীই ছিল না, স্থানীয় ও বাহিরের চাকুরেদের সংখ্যা-বাহুল্যে বাঙ্গালী কেরাণী তথায় বিরলদর্শন, কোথাও বা লুপ্ত হইতেছে। বহিষ্কার মন্ত্রে দীক্ষিত নানাস্থানে প্রবেশ নিষেধ দেখিয়া বাঙ্গালী আজ ঘরে ফিরিয়া সেখানেও দেখিতেছে, দেশবাসী ছাড়া বহু বাহিরের উমেদারেরও সহিত তাহার ঘোর প্রতিযোগিতায় ভাগ্যপরীক্ষা করিতে হইবে। অন্নগতপ্রাণ বাঙ্গালীর সুতরাং

জীবনসমস্যা উপস্থিত। এই অবস্থা যে কেরাণী প্রস্তুত করিবার কারখানাস্বরূপ প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তাহা এখন অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। দরিদ্র এবং অনভিজাতের "বাবু" নামে সম্মানিত হইবার এবং পাশ্চাত্য ফ্যাশানবিলাসের ক্ষুদ্র সংস্করণ সজ্জা সাবান, চা-চুরুটের ভিতর দিয়া সহজসাধ্য "বাবুগিরির" লোভ যে এ শিক্ষার অন্যতম পরিণাম, তাহাও অনেকে হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছেন। আমরা দেখিতেছি, হয় বিশেষ করিয়া কেরাণীগিরি এবং সাধারণতঃ কাগজকলমঘটিত চাকরির বাহিরে জীবিকার উপায়স্বরূপ আর যে কোনরূপ কর্ম্মই হউক না কেন, তাহা সম্পাদন করিবার মত শক্তি এই শিক্ষা হরণ করিয়া লয়, এবং "বাবুর" আত্মসম্মানবোধ এমন বিকৃতভাবে জাগাইয়া তুলে, যাহাতে করিয়া গৃহ-শিল্প, অল্পপুঁজির দোকানপাট, অপরিহার্য্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় মাটি-কাট-পাথরের, লোহালক্কড়ের তথা চাষবাস প্রভৃতির শ্রমসাধ্য কাজ করিবার মত মনের বল, দেহের শক্তি এমন কি প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি পর্য্যন্ত হারাইয়া বসিতে হয়। অনন্যগতি বাঙ্গালী তাই তাহার বহু-লাঞ্ছিত জীবনের প্রবর্ত্তক এই বহুবাঞ্ছিত শিক্ষার প্রসাদে সকল অসন্তোষের খনি, দারিদ্র্য অসচ্ছলতার নিদান, হৃদয়মন ও দেহের নৈরাশ্যজনক দুর্ব্বলতার মূল, প্রভুত্ব-পিষ্ট, ক্ষমতার অপব্যবহারদুষ্ট আত্মগ্লানিপূর্ণ কলুষে চাকরি কেরাণীগিরিরই শরণ লইতে বাধ্য হয়। যদি এই শিক্ষা দেশবাসীকে বাক্‌লেখের সচলযন্ত্র না করিয়া প্রকৃতই মানুষ করিয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে এত দিনের তালীমের এমন পরিণাম দেখা যাইত না, এবং অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অর্দ্ধশতাব্দীর বেশীদিনের শিক্ষানবীশি বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীকে এ হেন চাকরিমুখী করিয়া তুলিত না। বাঙ্গালীর পুরুষানুক্রমিক অভ্যাসের ফলে যাহা মজ্জাগত হইয়া তাহার জাতীয় বিশেষত্বে পরিণত করিয়াছে, ঠিক ততটা দিনের অভ্যাস অন্যান্য প্রদেশের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকদিগকে সেই পরিণামের বশীভূত কেন করিবে না তাহা জানি না। বর্ত্তমান শিক্ষার বাহিরের চটক অন্যান্য প্রদেশের নূতন প্রবর্ত্তকদিগকে চমকিত, মুগ্ধ করিতে পারে, কিন্তু ভুক্তভোগী বাঙ্গালীর এখন চমক ভাঙ্গা উচিত। চাকরির ক্ষেত্র যেরূপ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, কেরাণীগিরি যেরূপ আলোভনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তাহার মুখ চাহিয়া থাকা এবং মানুষ হইবার সুযোগ, বয়স ও শক্তি কেবল কেরাণী হইবার সাধনায় নিয়োগ বা নষ্ট করিয়া জাতীয় ভবিষ্যংকে অধিকতর অন্ধকারময় করা বাঙ্গালীর আর শোভা পায় না। সত্য বটে সকল বাঙ্গালীই নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই; কর্ম্মক্ষম প্রত্যেক বাঙ্গালীই যে কেরাণীগিরি বা অন্য চাকরি মাত্র সম্বল করিয়াছে তাহাও নহে; সত্য বটে, কতকগুলি কেরাণী ও নির্দ্দিষ্টসংখ্যক চাকুরিয়ার প্রয়োজন চিরদিনই থাকিবে; আর ইহাও সত্য যে জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য ও কলার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এবং উচ্চ উচ্চ পদে বাঙ্গালী এমন কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন ও দেখাইতেছেন, যে তাঁহারা যে কোন দেশের,

যে কোন সভ্য সমাজের গৌরবস্থল ও ভরসার কারণ হইতে পারেন,—যদিও তাঁহারা স্ব স্ব জীবনের দ্বারা বাঙ্গালীজাতির বড় হইবার, তাহার মানুষ হইবার সম্ভাব্যতাই প্রমাণ করিয়া দিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের বাহিরে যে কোটি কোটি বঙ্গসন্তান আছেন তন্মধ্যে কয়জন এই "মহাজনপন্থাঃ" অনুসরণ করিতেছেন, আর কত জনই বা "যেমন তেমন চাকরি ঘী ভাত"এর জন্য প্রস্তুত হইতেছেন ?

প্রতি বৎসর যত উমেদার তৈয়ার হয়, তত চাকরি কিছু খালি হয় না। মুষ্টিমেয় চাকরির অসংখ্য প্রার্থী বিরল নহে ! ভীড় ঠেলিয়া আর সকলকে পশ্চাতে রাখিয়া যিনি চাকরির মন্দিরে অনেকের ভাষায় "গোলাম খানায়" প্রবেশলাভ করিতে পারেন, সেই যোগ্যতমের জয় অবশিষ্ট কত শত জনের নৈরাশ্য উদ্বেগ ব্যাকুলতা এমন কি জীবনান্তেরও কারণ হয়, তাহার হিসাব কে রাখে ? অধুনা সংবাদ পত্রে পাশ করিতে না পারিয়া ছাত্রের গলায়দড়ী দিয়া বা বিষ পানে আত্মহত্যা করার মত, চাকরি না পাইয়া উমেদারের প্রাণ বিসর্জ্জনের সংবাদ প্রায় পাওয়া যায়। এই সব দেখিয়া শুনিয়াও এবং উমেদারের শ্বাসরোধকারী ভীড়ে চাকরির পথ রুদ্ধপ্রায় হইলেও, বাঙ্গালীর চাকরি করিবার আস্থা এবং চাকরি পাইবার আশা কিছুতেই মিটিতেছেনা।

যাঁহারা বলেন বাঙ্গালীর কিছুতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা বা এক বিষয়ে লাগিয়া থাকিবার শক্তি নাই। তাঁহারা যদি বাঙ্গালী কিরূপ দেহমন প্রাণ ঢালিয়া কেরাণীগিরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, কত দৃঢ়মুষ্টিতে তাহাকে ধরিয়া থাকে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা কালে কিশোর হইতেই তাহার প্রতি চাতকের ন্যায় কেমন চাহিয়া থাকে, তাহার তত্ত্ব রাখেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা আপনাদের ভ্রম সংশোধন করিতে বাধ্য হন। ভগবান্ আমাদের এই "বাঙ্গালীয়া গোঁ"—এই "বিলাতী বুলডগ-সুলভ" (bulldog tenacity) নির্ভীক নাছোড়বান্দামি হইতে রক্ষা করুন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

পুস্তক-পরিচয়

স্বামীর পত্র—(প্রথম ভাগ):—অধ্যাপক শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন, এম্ এ লিখিত ও ১৫নং কলেজ স্কোয়ার হইতে চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সুন্দর ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই ;—৩১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

পুস্তকখানিতে স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীকে লিখিত ৫২ খানি পত্র আছে। এই সকল পত্রে স্ত্রীজাতির শিক্ষণীয় নানা বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনার ভাষা ও যুক্তি, সহজ ও সুন্দর। পত্রচ্ছলে যে সমস্ত সামাজিক সমস্যার বিষয় ও গৃহস্থালী সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অল্পশিক্ষিত গৃহলক্ষ্মীরাও যে সানন্দে

পাঠ ও উপলব্ধি করিতে পারিবে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। লেখক বিষয় নির্ব্বাচনেও সুবিচারের পরিচয় দিয়াছেন। নানা দিক্ হইতে এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

ভারতনারীর সৎসাহস ও বীরত্ব:—শ্রীঅনুকুল চন্দ্র দাস প্রণীত ও পাটনা—মোরাদপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত;—৪১ পৃষ্ঠা,—মূল্য ।৵০ পাঁচ আনা মাত্র। পাইকা টাইপে পরিষ্কার ছাপা।

সাময়িক পত্রাদিতে নিয়তই নারীহরণ, নারীনিগ্রহ ও নারী উৎপীড়নের সংবাদ প্রকাশিত হইয়া থাকে। নারীগণ স্বভাবতঃ দুর্ব্বলা ও সমাজ ব্যবস্থায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত বলিয়া দুর্বৃত্তগণ তাঁহাদিগকে অনায়াসে লাঞ্ছিত করিয়া তাঁহাদের দুর্দ্দশার একশেষ করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় সমাজ, এমন কি নিকট আত্মীয় স্বজনগণের নিকট হইতে তাঁহাদের সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা পরিত্যক্ত হইয়া নিরুপায় হইয়া পড়েন। কিন্তু এই দুর্ব্বলা ও চিরদুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারতনারীও সময়ে সময়ে যে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন তাহা শুনিলে বিস্ময়ে পুলকিত হইয়া উঠিতে হয়। অবলাকুলের এই সকল সৎসাহস ও শক্তির পরিচয় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়ই আবদ্ধ থাকে এবং কালক্রমে তাহা বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হয়। গ্রন্থকার সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া সমাজের যথার্থ উপকার করিয়াছেন। আদর্শের যদি কোন উপকারিতা থাকে, তবে যে "এই অসহায় সমাজের নরনারী, স্বীয় ভগিনীগণের জীবন্ত আদর্শে উদ্বুদ্ধ" হইবেন তাহা সম্পূর্ণ আশা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক দেশেই প্রতি বৎসর দেশের লোকসংখ্যা প্রভৃতির বিবরণ (statistics) প্রকাশিত হইয়া থাকে, গ্রন্থকারের সংগৃহীত বিবরণের মূল্য ঐ সকল বিবরণের মূল্য অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, বরং অনেকাংশে বেশী। গ্রন্থকারের এই সংচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক।

আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা—(১ম ভাগ):—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ, পি'চ্-ডি প্রণীত ও ৫৫নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে শ্রীপবিত্রকুমার গুহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৬২ পৃঃ, মূল্য পাঁচ সিকা।

সেকালের "যুগান্তর" পত্রের সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ বহুকাল জার্ম্মাণি, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়া সেদেশ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে আমেরিকার অভিজ্ঞতা এই পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকখানি আগ্রহ সহকারে পড়িয়া আমরা অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় পাইয়াছি, কিন্তু ভাষার দোষে ও ইংরাজি শব্দের বাহুল্যে ইহা সুখপাঠ্য হইতে পারে নাই। ইহাতে ইংরাজ শব্দের প্রাচুর্য্য হেতু ইংরাজি ভাষায় অনভিজ্ঞ বা অল্প অভিজ্ঞ পাঠকগণ অনেকস্থলেই ভাবগ্রহণে সমর্থ হইবেন না বলিয়াই মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ দু'একটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম, –

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় চিত্তবৃত্তিকে একটা training দেয়।

(২) তথায় entrance requirement পরিপূরণ করিবার জন্য লাটিন বা গ্রীক ভাষার পরীক্ষা দিতে হয়।

(৩) অবশ্য দক্ষিণে জনকতক ইংরেজ ধনীবংশের বংশধরেরা তথায় cotton plantation স্থাপন করিয়া বসবাস্ করিয়াছিল।

(৪) সকলেই Optimist, জগৎকে বিষবৎ বলিয়া কেহ ত্যাগ করিতে চায় না।

বর্ত্তমান সমাজের ইতিবৃত্ত:—শ্রীভাগবতচন্দ্র দাস প্রণীত ও মেদিনীপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৮৮+৵০ পৃষ্ঠা; মূল্য এক টাকা মাত্র।

পুস্তকখানির প্রকাশ খুব সময়োপযোগী হইয়াছে। যখন হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা সমন্বয়ের নিতান্ত

আবশ্যক, তখনই সকল জাতিই নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনার্থ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন ও বিবাদ, বিসংবাদ ও গালাগালিতে নিজেদের মধ্যে ব্যবধান বাড়াইয়া চলিয়াছেন। অথচ, অনেক সমাজপতিই সমাজের ইতিহাসের কোন খবরই রাখেন না। যদি রাখিতেন, তবে দেখিতেন অনেকেরই গোড়ায় গলদ এবং অনেকেরই কৌলীন্যগর্ব্ব কলঙ্ক কালিমার উপরে একটা আবরণ মাত্র। মেদিনীপুর বিধবা বিবাহ সমিতির সম্পাদক ও হিন্দু মহাসভার মেদিনীপুর শাখার সম্পাদক গ্রন্থকার বর্ত্তমান সমাজের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সমাজপতিগণ সমাজের ইতিহাস সম্যক অবগত হইয়া ও বিবাদ, বিসংবাদ পরিত্যাগ করিয়া বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত হইলে দেখিতে পাইবেন হিন্দুসমাজে যুগে যুগে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং কালধর্ম্মে সংস্কারের আবশ্যক হইলেই সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক।

আত্মোন্নতি:—শ্রীভুবনমোহন দাস, এম্ এ প্রণীত ও ১০-এ শ্রীনাথদাসের লেন হইতে বি, কে দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৫২ পৃঃ—মূল্য আট আনা।

এই পুস্তকে গ্রন্থকার দুঃখ, সুখ, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই পাঁচটি বিষয় সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদের বিচার করিয়াছেন। শ্রীঅক্ষয় কুমার শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ মহাশয় লিখিত ভূমিকায় প্রকাশ যে; এই গ্রন্থ লিখিয়া গ্রন্থকার বর্ত্তমান বর্ষে "বঙ্গসাহিত্য সারস্বতমণ্ডল" হইতে বিদ্যাভূষণ উপাধি পাইয়াছেন।

মহারাজা সীতারাম:—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত,—১২৭ পৃঃ—মূল্য—অজ্ঞাত। ঐতিহাসিক নাটক।

গ্রন্থকার প্রথমেই বলিয়াছেন, তিনি ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের সহিত তাঁহার সীতারামের বিস্তর প্রভেদ। সত্যই বিলাসপরায়ণ হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামে যতটা ঘটনা পরম্পরার সামঞ্জস্য আছে এই স্বদেশ-প্রেমিক সীতারামে তাহা নাই। পুস্তকখানি স্থানে স্থানে পড়িতে ভাল লাগে বটে, কিন্তু অভিনয়ের উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। এ সম্বন্ধে আমরা দৃঢ়তা-সহকারে কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু সীতারামের দীর্ঘ তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী মহামায়ার স্তবে শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতিরই আশঙ্কা হয়। প্রথম অঙ্কের ১ম দৃশ্যের দস্যু-সীতারাম ব্যাপারটি সীতারামকে দুর্ব্বলের রক্ষা ও দুষ্টের দমনে প্রবৃত্তি দিবার উদ্দেশ্যেই অবতারণা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা সুলিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, গ্রন্থকারের বঙ্গসাহিত্যে সীতারাম সম্বন্ধে একখানি ঐতিহাসিক নাটকের অভাব মিটাইবার প্রয়াস প্রশংসনীয়।

নীলাচল:—সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীচুনীলাল বসু রসায়নাচার্য্য, সি-আই-ই, আই-এস্-ও, এম্-বি, এফ্-সি-এস্ প্রণীত ও ২৫ নং মহেন্দ্র বসুর লেন হইতে শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ বসু, এম্-বি, বি-এফ্-সি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। ১০খানি চিত্র শোভিত,—১৬৬ পৃঃ,—মূল্য, এক টাকা মাত্র।

গ্রন্থকারের "নিবেদনে" প্রকাশ, এই পুস্তকের কিয়দংশ ২৩ বৎসর পূর্ব্বে "সাহিত্য সভায়" পঠিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পুরীর বিবরণ কিছুদিন পূর্ব্বে "পুরীদর্শন" নামে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট অংশ ইতিপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

পুস্তকখানি প্রধানতঃ (১) পুরীর পথে, (২) পুরীধামে, (৩) জগবন্ধু ও মহাপ্রভু, (৪) শ্রীপুরষোত্তমক্ষেত্র তত্ত্ব, (৫) কোণার্ক ও (৬) চিল্কাহ্রদ;—এই ছয় অংশে বিভক্ত। ইহা পুরীধাম ও জগবন্ধু প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অবশ্য

জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। লিখিবার গুণে প্রত্নতত্ত্বের নীরস অংশ ও বিশেষ বিবরণগুলি সরস হইয়া উঠিয়াছে। পুরীযাত্রিগণ এই পুস্তক পাঠ করিলে অনেক নূতন তথ্যের পরিচয় পাইবেন এবং অনেক বিষয়ের ঐতিহাসিক জ্ঞান লাভ করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

আবৃত্তি-পদ-মুক্তাবলী—প্রথম ভাগ (পদ্যাংশ)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গুপ্ত, বি-এ সঙ্কলিত (কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় লিখিত ভূমিকা সংবলিত)। সূর্য্য প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ॥৹ আট আনা।

কবিতার রস বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য আবৃত্তি যে কতটা প্রয়োজনীয় তাহা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। সংস্কৃত সাহিত্যে আবৃত্তির স্থান অতি উচ্চ নির্দ্দিষ্ট ছিল এমন কি আবৃত্তিকে "বোদ্ধাদপি গরীয়সী" বলিতেও আলিঙ্কারিকগণ কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের এই প্রকার উক্তি নিরর্থক বা অতিরঞ্জিত নহে। মন্ত্রের প্রাণশক্তি তাহার অর্থবোধ নহে, সুসঙ্গত আবৃত্তির মধ্যেই নিহিত। সঙ্গীত মনোহরণ করে সুরে—'কথায়' নয়। বাঙলার প্রাচীন কবিগণ এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন তাই তাঁহাদের রচিত 'মঙ্গল কাব্য' সমূহ তাল-লয়-মানে বিবিধ বিচিত্র সুর সংযোগে গীত হইয়া শ্রোতার 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করিত, রচয়িতা বা শ্রোতৃবর্গ কেহই কাব্য 'পাঠের' অপেক্ষা রাখিতেন না। বর্ত্তমানে আমরা কিন্তু দুই কূল হারাইয়াছি, এখন কাব্য 'গীত'-ও হয় না "আবৃত্ত"-ও হয় না, যদি স্কুল-কালেজ পাঠ্য হয় তবেই তাহার 'কথার মানের' দরকার নচেৎ তাহাও নয়। তবে সুখের বিষয় ইংরেজের অনুকরণে আজকাল পারিতোষিক সভায় কবিতা আবৃত্তির চেষ্টা দেখা যাইতেছে এবং সুষ্ঠ ও সুসঙ্গত আবৃত্তি গুণে সামান্য জ্ঞানে অবহেলা প্রাপ্ত কবিতার মধ্যেও অসামান্য সৌন্দর্য্যের আভাস পাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিমুগ্ধ হইতেছেন। এইরূপে "আবৃত্তি" ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিতে থাকায় একত্র গ্রথিত আবৃত্তি যোগ্য পুস্তকের অভাব অনেক স্থলেই অনুভূত হইতেছে। সঙ্কলিতাদ্বয় সেই অভাব মোচনে ব্রতী হইয়াই বাঙলা ভাষার প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত কাব্য সাগর মন্থন করিয়া অনেকগুলি মুক্তা সংগ্রহ করিয়া এই মুক্তার মালা রচনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, হেম, নবীন, রবীন্দ্রনাথ, বিজয়চন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, চিত্তরঞ্জন, সত্যেন্দ্রনাথ, কালিদাস, কাজী নজরুল, গোলাম মোস্তাফা সকলেরই ভাণ্ডার হইতে কিছু কিছু উপদান সংগ্রহ করা হইয়াছে। তবে ইহাতে যে দু চাঁরটা ঝুটা মুক্তাও স্থান পায় নাই এমন নয়। এই পুস্তকের এক খণ্ড কাছে থাকিলে আবৃত্তি-যোগ্য কবিতার জন্য আর হাতড়াইতে হইবে না বা কবিতা নির্ব্বাচনের জন্য কষ্ট পাইতে হইবে না। বই খানিতে কিন্তু একটা ত্রুটি চোখে ঠেকিল। কি উপায়ে যথাযথ 'আবৃত্তি' হইতে তাহার ইঙ্গিত বই খানিতে নাই। সঙ্গীতের স্বরলিপির মত আবৃত্তিরও একটা নির্দ্দেশ থাকা চাই। সহরে না হয় উপায় হইবে, কিন্তু সুদূর পল্লীগ্রামে উপযুক্ত শিক্ষক কোথায়? আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে এই ত্রুটি বিদূরিত হইবে। আমরা এই অত্যাবশ্যকীয় পুস্তকের 'দ্বিতীয় ভাগের' জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম। কবিশেখর যে সুচিন্তিত ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন তাহাই একটি অতি উচ্চদরের সাহিত্য প্রবন্ধ, উহাতে অনেক শিখিবার বিষয় আছে। এই ভূমিকার উপর পুস্তকখানি বেশ সুদৃঢ় ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

ছিটে-ফোঁটা

গোকুল

(গল্প)

বাঙ্গলাদেশের লোকরঞ্জন পুরাণে বলে যে রামায়ণের কবি ত্রেতা যুগের বাঙ্গলা ভাষায় ঘন ঘন মরা মরা আওড়াইয়া অনিচ্ছায় রাম নাম করিয়া মুক্তি পাইয়াছিলেন, আর আমি কাজের দায়ে যোল আনা ইচ্ছায় সারাদিন হরিকে ডাকিয়া ছোট খাট কাজ হাসিল করিতে পারি না। একদিন বেলা তিনটার সময় "ও হরি, ওরে হ'রে" বলিয়া অনেকক্ষণ চেঁচাইবার পর আমার বৈঠকখানার ফরাসের উপরে হরি হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিল ও অতি কষ্টে বলিল "যাই"। আমি বৈঠকখানার পাশের ঘরে ছুটির দিনে আমার মুন্সি মহিমের সাহায্যে নানা নজির ঘাঁটিয়া মক্কেলের মুক্তির উপায় খুঁজিতেছিলাম; মহিম তখন আমাকে চুপি চুপি জানাইল যে বারান্দার উপরে একজন ফিরিঙ্গি সাহেব দাঁড়াইয়া আছে। আমি সেই লোকটির খবরের জন্য হরিকে ডাকিয়াছিলাম। হরি গায়ের আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া বারান্দায় আসিতেই আমার দর্শনপ্রার্থী হরির হাতে একখানি কার্ড দিল—আর হরি সেখানি আমার হাতে দিয়া জানাইল, কে একজন সাহেব আসিয়াছে। হরি আমার আদেশে লোকটিকে বৈঠকখানার ঘরে একখানি চেয়ারে বসাইল ও নিজের মর্জ্জিতে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

যে রকম মলিন কার্ডে A. D. Cary লেখা ছিল তাহার চেয়েও মলিন ইউরোপীয় পোষাকে আমার দর্শন-প্রার্থীকে দরজার ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইলাম। মহিম তাহার গভীর অভিজ্ঞতায় দৃষ্টিমাত্রেই বুঝিয়াছিল লোকটি মক্কেল শ্রেণীর নয়; তাই সে তাহাকে নিজে ডাকিয়া না আনিয়া চুপি চুপি তাহার সংবাদ দিয়াছিল আর আমিও সেই ইঙ্গিতে তাহাকে ব্যবসায়ের ঘরে ডাকি নাই। লোকটির মুখ দেখিয়া মনে হইল তাহাকে যেন চিনি; কেন এমন মনে হইল তাহা বিশেষ না ভাবিয়াই বৈঠকখানার ফরাসে গিয়া বসিলাল। আমার ডাহিন হাতের কনুইটি তাকিয়ায় দাবাইয়া ইংরেজি ভাষায় বলিলাম, Yes, what can I do for you, Sir ? কার্ডের কেরি সাহেবের ঠোঁট কাঁপিতেছিল, সে মুখ নীচু করিয়া প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বাঙ্গলা ভাষায় বলিল, আমি গোকুল। "ও, তাই ত", বলিয়া আমি ফরাস ছাড়িয়া একখানি চেয়ার টানিয়া গোবর্দ্ধন অধিকারীর হারান ছেলের পাশে গিয়া বসিলাম।

গোকুল কহিল, "আমি যে কি হইয়াছি তাহার একটু আভাষ দেওয়ার জন্য আপনার হাতে আমার ইংরেজি রকমের নামটি দিয়াছি, কিন্তু আসিয়াছি আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে।" বুঝিলাম, গোকুল বিশেষ বিপদে পড়িয়াছে। ঠিক মনে আছে, ১৮৮৩ সনের

জানুয়ারি মাসে গোবর্দ্ধন অধিকারী আমাকে কলিকাতা, আসিয়া জানাইয়াছিলেন যে তাঁহার ছেলেটি লেখাপড়া ছাড়িয়া কোথায় নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। গোবর্দ্ধনের বংশ বর্দ্ধন করিয়াছিল তাঁহার একই পুত্র গোকুল; সে কি অবস্থায় তাহার আচার ও আহার বদলাইবার ফলে "গো-কুল" ধ্বংস করিয়া নামের উপাধির অধিকারী শব্দটাকে বাঁকাইয়া—একে তিন করিয়া এ, ডি, কারি হইল তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। কিন্তু মনে হইতেছিল সে বড় দুর্ব্বল,—হয়ত বা পেট ভরিয়া কিছু খায় নাই; তাই আগে তাহাকে কিছু খাইতে অনুরোধ করিলাম। গোকুল তাহার স্বীকৃতি জানাইল। মহিম নিশ্চয়ই গভীর মনোযোগে আমাদের কথা শুনিতেছিল; কিছু না বলিতেই সে চেঁচাইয়া হরিকে ডাকিল, ও পরে নিজের হাতে একখানি থালায় কিছু খাবার দিয়া গেল। আমি উৎসাহিত করিলাম আর গোকুল আগ্রহে অকাঙ্ক্ষা পুরাইয়া খাইল।

গোকুল কলিকাতায় লেখাপড়া করিবার সময় গোবর্দ্ধন তাহাকে অনেক টাকা দিতেন; শিষ্য যজমানের কৃপায় গোবর্দ্ধনের টাকার অভাব ছিল না। ইংরেজী না শিখিলে আর খড়ম পায়ে গামছা কাঁধে থাকিলে একালে মান সম্ভ্রম বাড়ে না ভাবিয়া গোবর্দ্ধন গোকুলকে লম্বশাটপটাবৃত না করিয়া লম্বা শার্ট-কোটাবৃত করিয়াছিলেন; কিন্তু গোকুল একদিন গোবর্দ্ধনের লোহার সিন্দুকের টাকা খালি করিয়া কোথাও উধাও হইয়াছিল। গোকুল সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছিল তাহাতেই আমি তাহার পূরা ইতিহাস পাইয়াছিলাম।

গোকুলের মামাবাড়ীর গ্রামের জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য কোন অপ্রকাশিত কারণে খৃষ্টান হইয়াছিল, আর মাদ্রাজে গিয়া গা-ঢাকা দিয়া জাত-ফিরিঙ্গি সাজিয়াছিল, ও সুকৌশলে আপনার জনার্দ্দন নামটিকে John Ardenএ পরিণত করিয়াছিল, কারণ সেদিনে ইঞ্জিনিয়ারি বিভাগের অনেক চাকুরি ফিরিঙ্গিদের ভাগ্যেই ভাল জুটিত। জনার্দ্দন ওরফে জনার্ডেন কলিকাতায় গোকুলকে পাইয়া বসিয়াছিল।

গোকুল প্রথমে মুগ্ধ হইয়াছিল জনার্দ্দনের মহিমায়, আর তাহার পরে মজিয়াছিল ফিরিঙ্গিখানায় কল্পিত নূতন আকাঙ্ক্ষার আবর্ত্তে। সে ভাসিয়াছিল নানা স্রোতে, হাবুডুবু খাইয়াছিল নানা জলে, কিন্তু একটা পৈতৃক সংস্কারের জোরে গোবর্দ্ধনের লোহার সিন্দুকের টাকা ভাল করিয়া উড়ায় নাই,—কিছু পুঁজি রাখিয়াছিল। কারণ, গোকুলচন্দ্র জানিতেন, তিনি যখন গোবর্দ্ধন ধারণ করিলেন না, তখন গোবর্দ্ধনের আওতায় তাঁহার বাড়িবার আশা বন্ধ হইয়াছিল।

একবার কিছু মাসোয়ারা পাইয়া গোকুল বিনা খরচে এক জাহাজে বিলাতে গিয়াছিল ও সে সেদেশের কয়েকটা সহর দেখিয়াছিল। দেশে ফিরিয়া একটা চাকুরি পাইবার পর বাসা নিয়াছিল ফিরিঙ্গিদের পাড়ায়। যাহারা জাহাজে চড়িয়াছে ও বিলাত দেখিয়াছে,

তাহারা ফিরিঙ্গি মহল্লে নৈকষ্য কুলীন। গো-কুল-কাটা কারি সাহেব তাহার বাসার অংশ বিশেষের অধিষ্ঠাত্রীর মায়াজালে পড়িয়াছিল। মায়াবিনী গন্ধ পাইয়াছিল কারির কিছু টাকা আছে আর তাহার পক্ষে কুলীনের সংস্পর্শ ছিল গৌরবের।

এবারে পৈতৃক সংস্কার গোকুলকে বাঁচাইতে পারিল না; তাহার পুঁজির টাকা উড়িয়া গেল। মাহিয়ানার টাকায় আর চলে না, আবার অন্যদিকে মায়াবিনীর রাক্ষসী প্রকৃতি গোকুলের জাগ্রত স্বপ্নে নরকের দৃশ্য সৃষ্টি করিতে লাগিল। সে মানসিক জ্বালায় অধীর হইয়া উঠিল ও একদিন দৈবাৎ আমার নাম মনে পড়ায় আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল।

জনার্দ্দন এখন তাহার জন্ আর্ডেন্ নাম ও খৃষ্টিআনি মুছিয়া ফেলিয়া স্বামী পুষ্করানন্দ হইয়াছিল। এসময়ে এখনকার মত স্বামীর দল বহু সংখ্যায় দেখা যায় নাই, আর তখন যে সন্ন্যাসী বা স্বামী ইংরেজি বুক্‌নি ঝাড়িতে পারিত এদেশে তাহার আদর ও প্রতিপত্তি ছিল বড় বেশি। চাকুরি হারাইয়া সে দুঃখিত হয় নাই, কেন না তাহার উপার্জ্জন হইতেছিল অতি মাত্রায় অধিক। সে তাহার পূর্ব্ব পরিচিত অনেক স্থানে গা-ঢাকা দিয়া জ্যেতিষীগণনার ছলে নানা কথা বলিয়া খুব চমক লাগাইতে পারিত। দৈবাৎ জনার্দ্দনের সঙ্গে দেখা হওয়ায় গোকুল সংবাদ পাইয়াছিল যে বৃন্দাবন ধামে গোবর্দ্ধনের কৃষ্ণ প্রাপ্তি হইয়াছে। এ সংবাদে নূতন আলোক চমকিয়াছিল, ও সেই আলোকে গোকুল একদিকে দেখিল প্রাণভরা নিঃস্বার্থ স্নেহময় পিতাকে ও আর একদিকে মায়াবিনী রাক্ষসীকে। জনার্দ্দনের মত তাহার পলাইবার সুবিধা ছিল না; তাহার মায়াবিনী তখনও জানিত না যে গোকুলের পুঁজি উড়িয়া গিয়াছে, কাজেই সে ঠাঁই ছাড়া হইতে গেলেই তাহার নামে বিবাহের চুক্তিভঙ্গের মোকদ্দমা দায়ের হইতে পারে, ও তাহার ফলে গায়ে এমন ছাপ পড়িতে পারে যে কোন স্বামীগিরির গৈরিকে তাহা ঢাকিতে পারে না। সে অধীর হইয়া একটা উপায় খুঁজিবার জন্য আমার কাছে আসিয়াছিল।

আমি ভাবিতেছিলাম কি করা যায়, আর আমার মুখ দেখিয়া মহিম তাহা বুঝিতে পারিয়া কাগজ কলম নিয়া আমাদের কাছে আসিয়া বসিল। মহিম তাহার প্রয়োজনের সকল নাম ঠিকানা প্রভৃতি টুকিয়া নিয়া গোকুলকে বলিল যে সে না-ফেরা পর্য্যন্ত গোকুল যেন আমার বাড়ীতে থাকে। মহিম আমাকে কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল, ও পরে শুনিলাম সে তাহার বন্ধু পুলিস ইন্সপেক্টার আস্‌গর আলিকে সঙ্গে করিয়া আপনার প্রয়োজনের কাজ করিয়াছিল।

প্রায় পাঁচটার সময় অপরাহ্নে আস্‌গর আলিকে দরজায় খাড়া করিয়া সে চুণাগলির একটি বাড়ীতে কারি সাহেবকে ও তাহার মায়াবিনীকে নাম ধরিয়া ডাকিল; মায়াবিনী দেখা দিল। মহিম তাহাকে বলিল যে তাহার হাতে একটা ভীষণ অপরাধের দরুণ কারির নামে গ্রেপ্তারির ওয়ারেণ্ট আছে; আর পুলিস প্রমাণ পাইয়াছে যে মায়াবিনী তাহার পাপের সহায় ও কারিকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে। পুলিসের ভয়ে রাক্ষসীর গায়ে জ্বর আসিল, সে কারির

ঘর দেখাইয়া দিয়া তাহার একটা বাক্স ও বিছানা মাত্র সম্বল টানিয়া বাহির করিয়া দিল ও কারির সঙ্গে যে তাহার কোন সম্পর্ক নাই তাহা শপথ করিয়া বলিতে লাগিল। মহিম গোকুলের বাক্স বিছানা ছুঁইল না; সে কেবল একটা এজাহার নিয়া মায়াবিনীর নিজের হাতে আগাগোড়া লিখাইয়া নিল যে সে কেবল প্রতিবেশী বলিয়া কারিকে চেনে, কিন্তু একদিনের জন্যও কারির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে নাই ও কারির কোন বিবরণ সে জানে না। মায়াবিনী নাম দস্তখৎ করিল ও মহিম সানন্দে আস্‌গর আলির সঙ্গে ছেকড়া গাড়িতে চড়িয়া অদৃশ্য হইল।

গোকুলের বিভীষিকা কাটিয়া গেল; সে তাহার বাক্স ও বিছানার মায়া কাটাইল,—আর চুণাগলিতে গেল না। মহিম গোকুলকে ধুতি চাদর পরাইয়া আমাদের গ্রামে গেল, অর্থাৎ গোবর্দ্ধনের বাড়ীতে গেল। সেখানে মহিমের উপদেশে গোকুল কি কি করিয়াছিল তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। অল্পদিনের পরেই প্রচারিত হইল গোকুল বিরাগী হইয়া নানা তীর্থে বেড়াইয়া দেশে ফিরিয়াছে; গোকুলের শিষ্য-যজমানেরা তাহাকে বরণ করিয়া নিল। একথাও বলি, মাঝে মাঝে গোকুলের আচরণের নিন্দুক জুটিত, কিন্তু তাহাতে তাহার সিন্দুক খালি হয় নাই।

(২)

স্বামী অরবানন্দ পরমহংস

(স্বপ্ন)

অতবড় জ্ঞানী ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ পৃথিবীতে কেহ কখনও দেখে নাই; কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া অনীল এই কাহিনী যাহাদিগকে শোনাইতেছিল, তাহারা কেহ বা হাঁ করিয়া, কেহ বা ঘাড় বাঁকাইয়া, কেহ বা অন্যবিধ ভঙ্গিতে শুনিতেছিল। অনীল বলিল যে সেই মহাপুরুষের বয়সের গাছ-পাথর নাই, তিনি যে কবে কোথায় জন্মিয়াছিলেন ও কবে কোথা হইতে কাশীধামে আসিলেন, তাহা কেহ জানে না; দেখিলে মনে হয় বয়স চল্লিশের অধিক নয়, কিন্তু সে অপূর্ব্বের পিসীর মুখে শুনিয়াছে যে মহাপুরুষের বয়স দু-শ বৎসরের কম নয়, আর মোহনচাঁদ ঠাকুর বিশ্বাসী লোকের মুখে শুনিয়াছেন যে নিদান পক্ষে তাঁহার বয়স দেড়-শ বৎসর হইবেই।

পঞ্চু জিজ্ঞাসা করিল যে মহাপুরুষ নিজে তাঁহার বয়স কত বলেন। অনীল বলিল, "আগেই ত বলেছি তিনি দুনিয়ার কোন লোকের সঙ্গে কথা ক'ন্ না, শত খানেক বছর নীরবে বসেই আছেন।" পঞ্চু মাথা চুলকাইয়া বলিল, "ঠাকুর নিজে কিছু বলেন নাই, তিনি কোথাকার লোক কেউ জানে না, তবে বয়সের অতবড় ফর্দ দিল কে? শ্রোতার দল চটিয়া.

হাঁ হুঁ করিয়া উঠিল, আর গোবর্দ্ধন বলিল, "পঞ্চু, তুমি তর্ক থামাও, মহাপুরুষের কথা শুনতে দাও।"

অনীল ঝাঁকিয়া বসিয়া বলিল, "পঞ্চু, তুমি কিছুই বিশ্বাস কর না, আর কাশীশুদ্ধ সকল লোকে জানে, মহাপুরুষ না জানেন এমন বিদ্যা নাই, না জানেন এমন ভাষা দুনিয়ায় নাই।" পঞ্চু বেচারা বিনীতস্বরে বলিল, "তিনি ত কথাই ক'ন্ না, তবে এত জ্ঞানের খবর লোকে কি পেটে বোমা দিয়া—?" কথা শেষ না হইতেই সকলে পঞ্চুকে অনেক কটু কথা বলিল, পঞ্চু চুপ করিল।

অনীল বলিল, মহাপুরুষ কিছুই খান্ না, এক ফোঁটা জলও নয়; কত লোকে দুধ আনিয়া দেয়, ফল আনিয়া দেয়, মিষ্টান্ন সামগ্রী দেয়, টাকা পয়সা প্রণামী দেয়, মহাপুরুষ তাহার কিছু স্পর্শ করেন না। পঞ্চু জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহার চেলারাও নয়? জিনিসগুলি কোথা যায়?" অনীল বুঝাইয়া দিল যে লোক-জন চলিয়া গেলে মহাপুরুষ ভক্তদের তুষ্টির জন্য মনে মনে মন্ত্র পড়িয়া একবার ছুঁইয়া দেন, আর সে সব জিনিসপত্র ও টাকাকড়ি আকাশে ও বাতাসে মিলাইয়া যায়। পঞ্চু ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—বুঝিলাম। পঞ্চুর সুমতি দেখিয়া শ্রোতারা সুখী হইল।

অনীল বলিল,—ঠাকুর একেবারে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। তিনি ইচ্ছা করিলেই আকাশে উড়িতে পারেন, এক মুহূর্ত্তে দূরদেশে গিয়া ফিরিয়া আসিতে পারেন, ইত্যাদি। কুমতি আবার পঞ্চুর ঘাড়ে ভর করিল, পঞ্চু জিজ্ঞাসা করিল, অনিল তাঁহাকে উড়িতে দেখিয়াছে কিনা। অনীল হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল "আরে আহাম্মক, সে কি হয়! মহাপুরুষকে আকাশে দেখলেই যে একেবারে লোকের মুক্তি হয়ে যাবে; তিনি কি লোককে তা দেখান?" পঞ্চুর ঘাড়ে কুমতির বোঝা বাড়িল; সে বলিল—ইউরোপের লোকেরা ত এরোপ্লেনে উড়িতেছে, তাহারা কি পরমেশ্বর? কত চোর, ডাকাত নিমেষে এরোপ্লেনে দূরে যাইতে পারে। এখন আমরা দূরের পথে অল্প সময়ে রেলে যাই; তাহাতে কি চোর সাধু হয়, না, মনুষ্যত্ব বাড়ে? এই মাটীর শরীরটাকে আত্মা যদি হাওয়ায় না উড়াইয়া মাটীর পৃথিবীর অন্য কিছু হাওয়ায় উড়াইয়া তাহাতে মায় শরীর চড়িতে পারে, তবে প্রভেদ রহিল কোথায়? অনীল একথা শুনিয়া বলিল—তবে তুমি যোগবলে মুক্তিলাভের কথা মান না; তুমি নাস্তিক। শ্রোতারা একবাক্যে বলিল যে, পঞ্চু অতি পাষণ্ড, তাহার মুক্তি নাই।

অনীল এবার পঞ্চুকে টিট্ করিবার জন্য বলিল, "তুমি জান পঞ্চু, এই মহাপুরুষ কতবার যে রূপ বদলাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই; পরমেশ্বর না হইলে তাহা কেহ করিতে পারে? এই যাহারা একবার তাঁহাকে দেখিয়াছে তাহারা কয়েক বৎসর পরে দেখে যে সে মূর্ত্তি আর নাই, যেন আর একজন ঠিক সেই স্থানে গট্ হইয়া বসিয়া আছেন। পঞ্চু এবারে সুমতি পাইয়া

বলিল, ঠিক বুঝিতেছি যে একদল ব্যবসায়ী নূতন নূতন অরবানন্দ আনিয়া জুটায় না। আমিও এই রকমের একটা সত্য কথা ইংরেজিতে পড়িয়াছি। গ্রামের বাহিরে একখানি কুঁড়ে ঘরে একজন ডাইনী থাকিত ও সেই ডাইনীর বাড়ীতে কেবল একটি বিড়াল ছিল। লোকেরা স্পষ্ট দেখিয়াছে যে এক এক সময়ে ডাইনীটি বিড়াল হইয়া বেড়াইত আর বিড়ালটি ডাইনী হইয়া বসিয়া থাকিত।" এবারে সকলে পঞ্চুকে ধন্য ধন্য বলিল ও একবার অরবানন্দের পা ছুঁইয়া সকলে মুক্তিলাভ করিবার আগ্রহ দেখাইল।

শোক-সংবাদ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

দারুণ দুঃখে ও শোকে এবং হত্যাকারীর প্রতি গভীর ঘৃণায় আমরা স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যার বার্ত্তা লিখিতেছি। পাঠকেরা পূর্ব্বেই নানা সংবাদপত্রে পড়িয়া থাকিবেন কিরূপ পাশব ব্যবহারের ফলে একনিষ্ঠ সমাজসেবক উদারচেতা মহাত্মা শ্রদ্ধানন্দ প্রাণ হারাইয়াছেন। ৭০ বৎসর বয়সে কফ রোগের প্রকোপে ও ফুস্‌ফুসের প্রদাহে তিনি শয্যাগত ছিলেন, আর তাঁহার হত্যাকারী "মুসলমান" তাঁহাকে দেখিবার ছল করিয়া তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া পিস্তলের গুলিতে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। হত্যাকারীর বিচার হইবে আদালতে; আমরা সে প্রসঙ্গে একটি কথাও বলিব না,—কিরূপভাবে তাঁহার অনুষ্ঠিত শুদ্ধি ও সংস্কারের কাজে মুসলমানেরা উত্যক্ত হইয়াছিলেন ও আর্য্যসমাজকে বিষচক্ষে দেখিতেছিলেন, তাহাও বলিব না। যাঁহাকে আমরা হারাইলাম তাঁহার কথাই বলিব। ইনি বি, এ, পরীক্ষার পর আইন পরীক্ষায় পাস্ করিয়া উকিল হইয়াছিলেন, কিন্তু সে কাজ না করিয়া যৌবনেই আপনাকে স্বদেশসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে ইঁহার কৌলিক নাম ছিল লালা মুন্সিরাম। ইনি আর্য্যসমাজের সঙ্গে আপনাকে যুক্ত করিয়া দেশের ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কারে ব্রতী ছিলেন। তিনি যে জাতিভেদ মানিতেন না ও দেশের সকলের মধ্যে সদ্ভাব বাড়াইয়া একতা স্থাপনের উদ্যোগী ছিলেন, তাহা তাঁহার প্রতি আচরণে প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার দুইটি দুহিতাকে আপনার কৌলিক জাতি হইতে ভিন্ন জাতিতে বিবাহ দিয়াছিলেন, ও যে সকল হিন্দু মুসলমান হইয়া সমাজভ্রষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে টানিয়া নিজেদের সমাজে আনিয়াছিলেন। পুরুষ ও নারীদের সুশিক্ষা বিস্তারের জন্য বহু চেষ্টায় বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া গিয়াছেন; হরিদ্বারের নিকটে কনখলের অপর পারে পুরুষদের জ্ঞান-চর্চ্চা ও সেবাব্রত শিক্ষার জন্য গুরুকুল স্থাপন করিয়াছেন আর দিল্লীতে স্ত্রীলোকদের ঐরূপ শিক্ষার জন্য গুরুকুল বা বিদ্যালয় বসাইয়াছেন। দেশে এমন আপদ-বিপদ আসে নাই যাহার প্রতিষেধের জন্য সকলকে নিরাময় করিবার জন্য

তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেন নাই। শ্রীযুক্ত গান্ধিজীর কর্ম্মপদ্ধতির সঙ্গে তাঁহার মিল ছিল না বলিয়া তিনি রাজনীতির আলোচনা ক্ষেত্রে তাঁহার ও তাঁহার সহকারীদের দলে জুটেন নাই, কিন্তু অক্লান্ত চেষ্টায় দেশের সকল শ্রেণীর উন্নতির জন্য বহুকাজ করিয়াছেন। যে সময়ে আলিগড়ে কোন এক ব্যক্তি স্বামীজীর শুদ্ধি পদ্ধতির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তখন তিনি কিছুমাত্র

বিচলিত হন্ নাই। যে ঘটনাটির ইঙ্গিত করা গেল, তাহার পূর্ব্বে মুসলমানেরা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। তিনি আপনার বিশ্বাসে সেইভাবেই অতি ধীরতায় রাজপুতনায় হিন্দু-কুলের মুসলমানদিগকে শুদ্ধি দিয়াছিলেন, যেভাবে অপর সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরাই ধর্ম্মপ্রচার করিয়া দলের প্রসার বাড়াইয়া থাকেন। মানুষে যে ধর্ম্মের নাম করিয়া এত বড়

নৃশংস হত্যাকাণ্ড করিতে পারে তাহা স্বামীজীর জীবন-ধ্বংসের ইতিহাসে তাঁহার অনুবর্ত্তীরা নিরন্তর মনে রাখিয়া ধর্ম্মপ্রচারের সময়ে মানুষের উগ্রতা ও পশুত্ব দূর করিবার জন্য যদি চেষ্টা করেন তবে স্বামীজীর এই ভীষণ শোকাবহ মৃত্যু বিফল হইবে না।

(২)

স্বর্গীয় হারাণচন্দ্র রক্ষিত—বাঙ্গলা দেশে সুপরিচিত সাহিত্যিকগণের অন্যতম হারাণচন্দ্র রক্ষিত ৬২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে হারাণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্য তাঁহাকে চিরদিনই আকৃষ্ট করিয়াছিল। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পরে ইনি কিছুদিন "কর্ণধার" নামক একখানি মাসিকপত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ইহার পরে ইনি সুপ্রতিষ্ঠিত "বঙ্গবাসী" পত্রের সম্পাদকীয় চক্রে প্রবেশলাভ করেন। এই সময়ে হারাণচন্দ্র মহাকবি সেক্‌স্‌পিয়রের নাটকাবলী হইতে ল্যাম্ব কর্ত্তৃক লিখিত গল্পগুলির বাঙ্গলা ভাষায় সরল ও সহজভাবে অনুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, এবং এইজন্য ১৯০৩ খৃঃ ১লা জানুয়ারী সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট হইতে "রায়সাহেব" উপাধি প্রাপ্ত হন। সেক্‌স্‌পিয়র ব্যতীতও হারাণচন্দ্র রাণীভবানী, বঙ্গের শেষ বীর, মন্ত্রের সাধন, জ্যোতির্ম্ময়ী, কামিনী-কাঞ্চন, প্রতিভা সুন্দরী, দুলালী, চিত্রা ও গৌরী, বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম, ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গলা-সাহিত্য প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইনি কয়েক বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন ও আই-এ পরীক্ষায় বাঙ্গলা ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি।

পৌষে

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-বিধি—আমরা দৈবজ্ঞ নই,—দৈবজ্ঞ নই; তিন বৎসর পরে ভারতশাসনের জন্য কি পদ্ধতি রচিত হইবে জানি না। বড় লাট বলিয়াছেন, উহা তিনিও জানেন না, তাঁহার ও তাঁহার দেশের কর্ত্তা পার্লামেণ্টও জানেন না। পার্লামেণ্ট বলিতে এমন একটি স্থায়ী ব্যক্তি বুঝায় না যিনি নিজের সুনিশ্চিত অভিপ্রায়ে একটি গড়াপেটা পদ্ধতিতে কাজ করেন। ইংলণ্ডের জন্য হউক, ভারতের জন্য হউক, পার্লামেণ্ট যে ব্যবস্থা রচনা করেন, তাহা সাময়িক অবস্থার আলোচনায় দশের ভোটে নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে বাঁধা নীতির প্রসঙ্গে এটুকু বলা চলে যে, ইংলণ্ড শাসনের পক্ষে স্থায়ী মূলনীতি রহিয়াছে ইংলণ্ডের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা, আর ভারত

সম্বন্ধে অটুট নীতি রহিয়াছে, এ দেশকে ইংরেজের অধিকারে ও প্রভাবে রাখা। আমরা যদি নেকা সাজিয়া বা বোকা বনিয়া কোন তর্ক বা বিচারের সময়ে ভারত শাসনের অটুট মূলনীতিটি ভুলিবার ভাণ করি বা ভুলি, তবে লাভ হইবে অসার বিতণ্ডা, নিষ্ফল কোলাহল ও নিছক দুঃখ। আন্দোলনকারীরা বলিতে পারেন, তাঁহারা তাহা জানেন, তবে অজ্ঞ লোকসাধারণকে উত্তেজিত করিবার জন্য কিছু উল্টা কথা শুনাইতে হয়। তাঁহারা ভুলিয়া যান, শূন্যের উপর কিছু গড়া যায় না,—খাঁটি কথা বুঝাইয়া মানুষকে শিক্ষিত করিলে কাজ বিলম্বে হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কাজ হয় পাকা। গোঁজামিলের তাড়াতাড়িতে আসর জমে,—কাজ হয় না। মনে রাখিতেই হইবে এদেশ আয়র্লণ্ড্ নয় বা ইংরেজের আপনাদের সহকারী ও বিশ্বাসী লোকেদের উপনিবেশ নয়।

বিশ্বাস নাই ইংরেজদের, আমাদের উপরে যে আমরা তাঁহাদের স্বার্থ বজায় রাখিয়া শাসনের ভার ঘাড়ে তুলিব; বিশ্বাস নাই আমাদের যে জেতারা নিজেদের লোকের উপকার করার মত মতলবে আমাদের জন্য কিছু করেন। পরস্পরের এই বিশ্বাস না থাকার কথা লাট লিটন স্বয়ং বলিয়াছেন। জাতীয় বিদ্বেষ প্রভৃতি অনেক বাধা আছে যাহা সহজে দূর হইবার নয়। সম্পর্ক যেখানে এই ধরণের, সেখানে বিনা উপদ্রবে শাসনের সুবিধার জন্য আমাদের অধিকার বাড়াইবার সময়ে জেতারা বুঝিয়া দেখিবেন আমাদের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে কি, আর আমাদের শক্তি ও দক্ষতার প্রকৃতি কিরূপ। জেতারা যে চতুর ও কর্ম্মদক্ষ, তাহা কে অস্বীকার করিবে? আমরা একটা আন্দোলনের বা কোলাহলের কুয়াশায় দেশের খাঁটি অবস্থা ঢাকিয়া রাখিতে পারিব না। ভয় দেখাইয়া কিছু আদায় করিতে পারিব না। ইংরেজদের এ সম্বন্ধে যাহা ধারণা তাহা তাঁহাদের পক্ষ হইতে লেঙ্গ্‌ফোড জেমস্ ইঙ্গিতে কিছু বলিয়াছেন; ইংরেজের ধারণা যে, এখনও এদেশের লোকেরা আপনাদের বিবাদের সময় বা অন্য উৎপাতের সময় সাহেবকেই আশ্রয় মনে করে।

দেশের খাঁটি অবস্থা কি তাহা বুঝিবার জন্য শীঘ্রই পার্লামেণ্টের কমিশন বসিবে,—যত বিলম্বে বসিবার কথা ছিল তাহার আগেই বসিবে। এখন হইতেই সুর উঠিয়াছে এদেশে 'বিলাতী' ধরণে ভোট্ চালাইলে চলিবে না; এ বিশ্বাসের মূলে অন্য কারণের মধ্যে এটা হয়ত একটা কারণ যে, শাস্তারা মনে করেন যে, দল বিশেষের লোকেরা কেবল কৌশলের জোরে ভোট্ পাইয়া পুষ্ট হইতেছে। গ্রামে গ্রামে লোকেরা আপনাদের পঞ্চাএত সভার বিচারে জানা লোককে জেলা বোর্ডে পাঠাইবে আর সেই জেলাবোর্ডের লোকেরা লোক চিনিয়া তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে; এই প্রথা ধরিলে নাকি দেশের সনাতন প্রথায় কাজ চলিবে ও সাম্প্রদায়িক লড়াই বন্ধ হইবে। ঠিক এই বিষয়টির বিশেষ বিচার আমরা অন্যবারে করিব।

প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের এই নূতন পদ্ধতির ইঙ্গিত দেওয়ার সময়ে বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন যে, এদেশের লোকেরা এপর্য্যন্ত এমন কোন পদ্ধতি রচনা করে নাই যাহাতে তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টভাবে ধরা যায়; কাজেই নাকি কেবল পার্লামেণ্টের লোকেরাই সকল কোলাহল উপেক্ষা করিয়া দেশের খাঁটি অবস্থা বুঝিয়া উপযোগী পদ্ধতি রচনা করিবেন। অতি গভীরভাবেই একথাটির বিচার করিতে হয়। আমরা সকলেই জানি যে এদেশের নেতারা কেবল একটা অসীম অধিকারের কথাই অনির্দ্দিষ্টভাবে বলিয়া থাকেন, ও এপর্য্যন্ত একটা কাটাছেঁটা পদ্ধতি গড়েন নাই। হয়ত এদেশের লোকে ভাবেন যে, ধরিবার ছুঁইবার মত কিছু লিখিয়া দাবি করিলে দাবি অপেক্ষা খানিকটা কম জিনিস মিলিবে, ও সেইজন্য ইংরেজের প্রস্তাবের অপেক্ষায় থাকা ভাল, কেননা তাহাতে সেই প্রস্তাবের সমালোচনা করিবার সুবিধা হয়। এবুদ্ধি আঁটিলে যে ইংরেজেরা মনে করেন যে, জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার অভাবে আমরা পদ্ধতি রচনায় অপটু, তাহা বড়লাটের কথায়ও কিঞ্চিৎ ব্যক্ত হইয়াছে। অন্যদিকে আবার অনির্দ্দিষ্ট অসীম অধিকার চাহিলে যে কিছু ফল নাই,—ইংরেজের স্বার্থ আমাদের হাতে রক্ষিত হইবে বলিয়া যে জেতাদের বিশ্বাস নাই, তাহা গোড়ায় বলিয়াছি। কাজেই এখন নূতন বুদ্ধি আঁটিয়া আমাদের হিতের পন্থা নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে, আর সেই পন্থা যে ইংরেজের স্বার্থের বিরোধী না হইয়া আমাদের জাতীয় উন্নতির সুবিধা হইবে তাহা ভাবিতে হইবে ও বুঝাইতে হইবে। ইংরেজিতে যাহাকে বলে common sense—আর আমরা বলি কাণ্ডজ্ঞান, সেটা ছাড়িয়া আন্দোলনের ঝড় তুলিলে আমরা নিজেরাই সেই ঝড়ের ধাক্কায় মরিব।

* * * *

কৃষি কমিশন—আমরা এই পত্রিকায় দুই তিন বার দেশের লোকের দোহাই দিয়া নেতাদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছি, তাঁহারা যেন কমিশন পৌঁছিবার আগে হইতে এদেশের চাষের ও চাষার সকল অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিয়া প্রস্তুত থাকেন ও কাজের সময়ে কমিশনার-দিগকে খাঁটি অবস্থা শুনাইয়া দেন। দেখা গেল যে সার্ প্রফুল্লচন্দ্র ভিন্ন কোন নামজাদা বেসরকারি ব্যক্তি কমিশনে সাক্ষ্য দেন নাই; মানিবার মত ভাবিবার মত কথা কেবল বড় বড় সরকারি চাকুরেরাই বলিয়াছেন। যদি এ বুদ্ধিতে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই কমিশনের কাছে সাক্ষী দিতে না আসিয়া থাকেন যে, সেরূপ আচরণ করিলে তাঁহার পক্ষে নিজেদের একটা বাঁধা নীতির নিয়ম ভঙ্গ হয়, তবে তিনি ভুল করিয়াছেন। কমিশনকে ঘৃণার চক্ষেই দেখি বা উপেক্ষার চক্ষেই দেখি, উহার মন্তব্য ধরিয়াই দেশ চালনার পদ্ধতি গড়া হইবে আর সেই পদ্ধতিতেই দেশের কাজ চালিত হইয়া প্রজাদের অর্থাৎ আমাদের সকলের ভাগ্য নিয়মিত হইবে। এক্ষেত্রেও গবর্ণমেণ্ট এই ধারণা দৃঢ় করিবার সুবিধা পাইবেন যে, যাঁহারা কৌশলের

কোলাহলে ভোট জড় করিতে পারেন, তাঁহারা যথার্থই এদেশের পল্লীর চাষার অবস্থা জানেন না, আর কাজেই তাঁহারা দেশের দায়িত্ব ঘাড়ে তুলিবার অনুপযোগী। চাষার ও চাষের অবস্থা কি, দেশের সৌভাগ্য বাড়াইবার উপায় কি, এসকল কথার বিচার করিয়া দেশের হিতৈষীরা যখন কোন বই লেখেন নাই, তখন তাঁহাদের কার্য্য-কুশলতা হইতে দেশ শাসনের দক্ষতা সূচিত হইবে না।

স্যর্ প্রফুল্লচন্দ্রের উক্তির যে বিবরণটুকু দশে পাইয়াছে তাহাতে কেবল এইটুকুই জানা যায় যে, তিনি জমিদারদের বিলাস ও সহরবাসের ফলে যে গভীর অনিষ্ট হইতেছে, তাহাই ভাল করিয়া বলিয়াছেন। এটা ভাল কথা, কিন্তু বলিবার মত কাজের কথা ছিল যে অনেক। স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর্ অনেক পাকা কথা বলিয়াছেন, মনে হইল। জল সঞ্চারণের নানা রকমের ব্যবস্থা করিলে যে চাষের উন্নতি হয়, দেশের লোকে খাইতে পাইয়া রোগ সহিবার ও তাড়াইবার উপায় পায়, দেশের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি ভীষণ শত্রু একেবারে দমিয়া যায় ও কেবল এই বাঙ্গলা দেশটি যে সারা দেশকে অন্ন যোগাইতে পারে, এ সকল কথা বেণ্ট্‌লী অতি দক্ষতার সহিত বলিয়াছেন। আমরা জানিতাম যে, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গে চাষের প্রসার এত অধিক যে এদেশে অনুর্ব্বরা পতিত ভূমি অতি অল্প; কিন্তু বেণ্ট্‌লী দেখাইয়াছেন যে পশ্চিম বঙ্গে ও উত্তর বঙ্গে বহু সহস্র বর্গমাইল চাষের অনুপযোগী বলিয়া পতিত আছে, আর কি উপায়ে সেই সকল ভূমি অনায়াসে নানা ফসল দিতে পারে, তাহাও বলিয়াছেন। তাহা হইলেই আমরা প্রয়োজনের খবর পাইলাম সরকারি সাহেবের কাছে। ফাঁকা আওয়াজের দিকে ও অসার আন্দোলনের দিকে আমরা এত ঝুঁকিয়াছি যে, যাহা দেশহিতৈষণার প্রথম ও প্রধান কাজ তাহাই প্রশান্তমনে উপেক্ষা করিতেছি।

এ সম্পর্কে আর একটা কথা। অল্প একটু মাটি আঁচড়াইলেই এদেশে দুমুঠা খাইবার মত ফসল মেলে; এইজন্য চাষের উন্নতিতে বহুকাল হইতে অধিকতর উদ্যোগের ঝোঁক নাই ও উন্নততর চাষের উপায় আবিষ্কৃত বা অবলম্বিত হয় নাই। এই অবস্থাটি সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়া ১৮৭৮ অব্দে ছোট লাট ইডেন্ সাহেব বড় রকমের সরকারি কৃষিবিভাগ খুলিবার মন্তব্য লিখিয়াছিলেন ও চাষের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদিগকে বিলাতে পাঠাইবার বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সেই বিধানের ফলে অনেকে চাষের বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু এই নূতন শিক্ষিতদের দু-তিনজন ছাড়া সকলকেই ইডেনের পরবর্ত্তী লাটেরা হাকিমি কাজে নিয়োগ করিয়াছিলেন; যাঁহারা হাকিম হ'ন্ নাই তাঁহারাও খাঁটি চাষের বিভাগে নিযুক্ত হ'ন্ নাই। কাজেই চাষের বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত এদেশীয়দের অভিজ্ঞতায় ও উদ্যোগে যাহা হইবার ছিল তাহা হয় নাই। এবারকার কমিশনে যাঁহারা সাক্ষী ছিলেন তাঁহারা কেহই এ সময়ের কথা বলেন নাই ও কেন যে ১৮৮৮ অব্দ হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট চাষের উন্নতিটি উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহা বলেন নাই। যে কয়েকটি সরকারি চাষের ফার্ম্ম্ রক্ষিত হইয়াছিল ও হইতেছে, সেখানে অতি অধিক ব্যয়ে যে পদ্ধতিতে কাজ হইয়াছিল ও হইতেছে তাহার বিবরণ দিলে কমিশন বুঝিতে পারিতেন যে, সেই ফার্ম্ম্‌গুলির পদ্ধতি দেখিয়া এদেশের দরিদ্র চাষারা কাজে লাগাইবার মত কিছু শিখিতে পারে না ও স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন যে গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে অযথা অর্থব্যয় হইয়াছে—অনেক। চাষের উন্নতি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি না দেখিয়া বিদেশী বণিকদের পাট পাইবার সুবিধা যে বেশি করিয়া দেখা

হইয়াছে, ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া কোন দক্ষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি পুস্তিকা রচনা করেন ও কমিশনের হাতে দেন, তবে হয়ত বা বিষয়টির বিচার হইতে পারে।

* * * * *

সাহিত্য পরীক্ষায় উন্নতির পরিচয়—সভা-সমিতি ও বক্তৃতা যত বাড়িয়াছে তাহার অনুপাতে মানুষের চিন্তাশীলতা বাড়িয়াছে কি না, জ্ঞানের প্রসার হইয়াছে কি না, উহার পরিচয় মেলে সাহিত্যের পরীক্ষায়। নানা ধরণের সাময়িক আন্দোলনের উত্তেজনায় বহুলোকে নানা কথা বলে ও লেখে, কিন্তু তাহার ফলে যদি লোকশিক্ষার জন্য সুচিন্তিত স্থায়ী সাহিত্যের সৃষ্টি না হয়, তবে জাতীয় উন্নতিতে সন্দেহ জন্মে। গত বৎসরের প্রথম ছয় মাসে বাঙ্গলা ভাষায় নানা বিষয়ের রচনায় প্রায় ৫০০ বই ছাপা হইয়াছে, আর তাহার মধ্যে পাঠশালার ছাত্রদের জন্য রচিত হইয়াছে প্রায় ৪০০ বই। বাদবাকি ১০০ বইএর মধ্যে কু-রচিত গল্প ও কবিতার বই সংখ্যায় খুব অধিক, আর যে বই পড়িলে লোকসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার বাড়ে, সে শ্রেণীর বই একেবারে নাই। বিদ্যালয়ের জন্য রচিত বইগুলির মধ্যে আবার পাঠ্য নামে পরিচিত বইগুলির অপেক্ষা উহাদের মানে ও টীকাটিপ্পনীর বই বেশি। এই মানের বইগুলির প্রকৃতি আমরা জানি ; উহাতে আকাশ বুঝাইবার শব্দ পাই নভোমণ্ডল, ডুমুর বুঝাইবার শব্দ পাই উদুম্বর ও জন্তু ফল। পাঠ্য নামে রচিত বইগুলি কুমারদের গড়া পুতুলের মত এক ছাঁচে ঢালা ; উহা পড়িলে জ্ঞানের জন্য কৌতূহল বাড়ে না, মানুষের প্রয়োজনের দিকের কোন শিক্ষাও হয় না। লোকসাধারণের শিক্ষার নামে বক্তৃতা হয় অনেক, কিন্তু বই নাই একখানাও। দেশের সকল উদ্যোগ ও আন্দোলনকে ছাপাইয়া রাষ্ট্রনীতির তুমুল আন্দোলন চলিতেছে, কিন্তু রাষ্ট্রনীতির বা অর্থনীতির শিক্ষার জন্য অতি অসার দুইখানি পুস্তিকা ছাড়া কিছু রচিত হয় নাই। ছয় মাসের সাহিত্য দেখিয়া উন্নতির বিচার করা চলে না বটে, কিন্তু কোন বৎসরের কোন একটি অংশেও যে সাহিত্যের নামে এতবড় জঞ্জালের স্তূপ বাড়িতে পারে তাহা বিশেষরূপে ভাবিবার কথা।

সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না বলিলেই একদল লোক আসিয়া আমাদের গলা টিপিয়া ধরিবেন, আর বাঙ্গলা-সাহিত্য রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বজোড়া খ্যাতি পাইয়াছেন তাহা শুনাইবেন। পাঁচ কোটি লোকের দেশে সাহিত্যের জঞ্জালের অসার স্তূপের উপরে রবীন্দ্রনাথের মত দুই-একজনকে দেখাইয়া দিলে, সাহিত্যের উন্নতির অর্থাৎ আমাদের জীবনের উন্নতির সাক্ষী দেওয়া হয় না।

* * * *

বেঁট্রার পল্লীচর্য্যা সমিতি—সহরে ও গ্রামে আগে এমন অনেক সভা হইত (এখনও না হয়, তাহা নয়) যেখানে কাজ করার নামে কতকগুলি যুবক বক্তৃতা কপ্‌চাইতেন বা মক্স করিতেন। এখন আমরা বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির সময় দেখিয়াছি যে, যুবকেরা বহু সংখ্যায় নানা কষ্ট সহিয়া দুঃস্থদের অনেক উপকার করিয়া থাকেন। দুঃস্থ ও পীড়িতদের সেবার জন্য গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় করিবার জন্য ও জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রচারের জন্য যে অল্প কয়েকটি সমিতি বসিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাইয়াছি তাহার মধ্যে বেঁট্রার পল্লীচর্য্যা সমিতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত বেণ্টলী সাহেবকে ডাকিয়া,—পল্লী সংস্কার

বিষয়ে তাঁহার উপদেশ সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি এই সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভায় বুদ্ধিমান কাজের লোক অনেক আছেন; তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন প্রামাণিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি। প্রামাণিক মহাশয় ব্যবসা-বাণিজ্য করেন, অবসর সময়ে নিপুণভাবে সাহিত্য চর্চ্চা করেন ও তাহা ছাড়া এই নূতন সমিতির সেবার কাজে সহায় হইয়াছেন। এই শ্রেণীর সমিতির কাজের উপরে দেশের অনেক উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

* * * *

কংগ্রেস—গৌহাটির কংগ্রেস সম্পর্কে বলিবার ছিল অনেক, তবে উহার বিবরণ প্রকাশের এক দিনের মধ্যে সকল কথার আলোচনা সম্ভব নয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয়ের অভিভাষণটিকে সরকারী পক্ষের ইংরেজী পত্রে একটু ক্রুদ্ধ সুরে কুবিচারিত বলা হইয়াছে। এ শ্রেণীর সমালোচনা পড়িলেই মনে হয় উহাতে সার কথা অনেক আছে। অভিভাষণটি পড়িয়াই সে ধারণা দৃঢ় হইল; উহার বিশেষ পরিচয় পরে দিব। উক্তিগুলির মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। প্রচলিত ব্যবস্থাপক সভার পদ্ধতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে, যে ঐ পদ্ধতিতে অধিকারের নামে যাহা আমরা পাইয়াছি তাহা একেবারে ফাঁকা ও ফাঁকি; মিনিষ্টরেরা সরকারের তাঁবেদারিতে ও ইচ্ছার নির্দ্দেশে কাজ করিতে পারেন,- কোনদিকেই নিজেদের কর্ত্তৃত্ব ও স্বাধীন মত চলিতে পারা অসম্ভব। উল্লেখ-যোগ্য দ্বিতীয় বিষয়টি ঐ প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে। হাতে পূর্ণ অধিকার পাইলে সমর-বিভাগ প্রভৃতি সকলগুলি বিভাগের কাজ দেশের যোগ্য লোকে হাতে নিতে পারে; এ কথায় অনেক বিরোধ হইতে পারে, তবে বিষয়টিকে আলোচনায় না আনা সুবিবেচনার কথা নয়। তৃতীয় উক্তি সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও নির্ব্বাচন সম্বন্ধে। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন জাতির উন্নতির বিরোধী, আর উহা বুঝিলেই সাম্প্রদায়িক বিবাদ উঠিয়া যাইবে, ইহাই বলা হইয়াছে; আমরা ঠিক এই কথা বহুবার লিখিয়াছি ও আর একবার এই সম্পর্কে লিখিব। জাতিভেদের কঠোরতা ও ধর্ম্মবুদ্ধির অভাব কি ভাবে সকলকে দুঃস্থ করিয়াছে, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা পরে এই প্রয়োজনের কথাগুলি সযত্নে আলোচনা করিব।

বাঙ্গলার হিন্দু

(প্রতিবাদ)

৭ নং সুত্রাপুর রোড, ঢাকা হইতে শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র পাল, হরিণা (ত্রিপুরা) হইতে শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র ভাওয়াল ও যশোহর হইতে শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়গণ অগ্রহায়ণ সংখ্যার বঙ্গবাণীতে শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল মহাশয় লিখিত "বাঙ্গলার হিন্দু" শীর্ষক প্রবন্ধে বারুই জাতিকে "জলচল" বলা হয় নাই বলিয়া ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, বারুই জাতি "জলচল"। এই অনবধানতাপ্রসূত ও অনিচ্ছাকৃত ভ্রমের জন্য আমরা দুঃখিত।

Editor : Bejoychandra Majumdar.
Printed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani Office, 77 Russa Road North, Bhawanipur, Calcutta.

বঙ্গবাণী

কাত্যায়নী ষ্টোরস
প্রসিদ্ধ
কাপড় ও পোষাক।
বিক্রেতা
Kashi Studio
কলেজষ্ট্রীট মার্কেট
মহিলাদিগের বসিবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে

সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক ফতেপুর সিক্রী নির্ম্মাণ পরিদর্শন

মূলচিত্র
শ্রীহরিহর শেঠ ও শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দে
মহাশয়দ্বয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

"আবার তোরা মানুষ হ"

৫ম বর্ষ
১৩৩২-'৩৩

মাঘ

দ্বিতীয়ার্দ্ধ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

আমাদের দুরবস্থা

সম্প্রতি কলিকাতায় অর্থনীতিবিৎ পণ্ডিতগণের এক সভা হইয়া গিয়াছে। বক্তৃতার ত্রুটি অবশ্যই হয় নাই, কিন্তু দেশের আর্থিক উন্নতি কেবল পণ্ডিতের বক্তৃতার উপর নির্ভর করে না। পণ্ডিতেরা পন্থা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন কিন্তু সে পন্থায় হাঁটিতে শিখাইবার জন্য প্রয়োজন—কর্ম্মীর। পণ্ডিতদিগের নির্দ্দিষ্ট পন্থাও সব সময়ে ঠিক খাঁটি হয় না, একটু দেখিয়া শুনিয়া নিতে হয়—কারণ, তাঁহারা পণ্ডিত, আর পন্থাটার প্রয়োজন সাধারণতঃ মূর্খের জন্য। মূর্খকে যিনি খাঁটি পথে চালাইয়া নিতে পারেন তিনিই "কর্ম্মী"।

অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় দেশের আর্থিক দুরবস্থার নিবৃত্তি করিতে গেলেও লোকের মতিগতি ও আবহমান প্রচলিত সংস্কারের একটা বোঝাপড়া আবশ্যক। অগ্রে নাড়ী-পরীক্ষা, পরে চিকিৎসা—ইহাই সনাতন প্রথা। ইহার অন্যথাচরণে কৃতকার্য্যতা লাভের আশা খুবই কম।

বিনিময়ের হার প্রভৃতি বড় বড় কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা বাঙ্গলার প্রজাসাধারণের কথা লইয়াই একটু আলোচনা করিব। এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, সাধারণ বাঙ্গালী খুবই দরিদ্র, আর অধিকাংশই পল্লীগ্রামের অধিবাসী। চাষবাসের উপর আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রধানতঃ নির্ভর করি। আ'জ কা'ল সহর বা উপসহরে পাশ্চাত্য ধরণের

কলকারখানা দ্রুতবেগে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে, কিন্তু সমগ্র দেশের তুলনায় কল-কারখানার শ্রমজীবীর সংখ্যা এখনও মুষ্টিমেয়। ভূমিশূন্য শ্রমজীবী বাঙ্গলায় কম, পূর্ব্বে আরও কম ছিল বলিয়াই মনে হয়। গ্রাম্য কারিকরদিগেরও অনেকেরই দু চারি বিঘা জমী আছে। বেতনের পরিবর্ত্তে চাকরাণ জমী দিবার প্রথা এদেশে বড় লোকদিগের মধ্যে কোন রকমই প্রচলিত ছিল। কল-কারখানার কার্য্যে শ্রমজীবিগণের আর্থিক উন্নতি যাহাই হউক, মানসিক বা নৈতিক উন্নতি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও লক্ষ্য করা যায় না,—গ্রাম্য সঙ্গের বাহিরে আসিয়া তাহারা কতকটা অন্য শ্রেণীর জীবে পরিণত হয়। এই সকল কল-কারখানা যে দেশের অবস্থান্তর ঘটাইতেছে তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। পাশ্চাত্য জগতের গতি যখন ঐ দিকে, তখন ঐ স্রোত বোধ হয় ফিরিবেও না। সুতরাং আমাদের পূর্ব্ব হইতেই সতর্কতার প্রয়োজন। বিলাতী কল কারখানায় স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা অনেক ভাল থাকিলেও সেখানেও যে শ্রমজীবীরা খুব সুখে আছে এ কথা বোধ হয় কেহ বলিবেন না। এ দেশে শ্রমজীবীদিগের উন্নতিকল্পে কিছু করিতে গেলেই প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে কৃষকদিগকে ; কিন্তু নাগরিক বা কলকারখানার শ্রমজীবী-দিগকে ভুলিয়া গেলেও চলিবে না।

বাঙ্গলায় কল-কারখানার শ্রমজীবী বেশীর ভাগই বাঙ্গলার বাহিরের লোক। তাহা না হইলে বোধ হয় তাহারা আর একটু ভাল ভাবেই থাকিত। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর লোক যে ভাবে বসতি করে, বাঙ্গলায় সেভাবে করে না। বাঙ্গলার পল্লীগ্রামবাসী যত দরিদ্রই হউক, বায়ু ও জল একটু বেশীপরিমাণে ভোগ করে, ঘরগুলি লতাপাতার হইলেও স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে যেন একটু বেশী উপযোগী। বাঙ্গলার জল ও বায়ু যে স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে বেশী অনুকূল তাহা বলিতেছি না, লোকের বসতির প্রণালীটা একটু ভাল। বাঙ্গলার কৃষক শ্রেণীর মধ্য হইতে কল কারখানার শ্রমজীবীর আমদানি বেশী হইলে, ইহারাও আপন সংস্কারানুযায়ী বসবাসের বন্দোবস্ত করিয়া লইত, পশ্চিমাঞ্চলের ধরণ চলিত না। তবে একবার যে ধরণ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে তাহা যে আবার ফিরিবে এমনও মনে হয় না। ঐ ধরণটাকেই সংস্কৃত ও স্বাস্থ্যবিধি-সম্মত করিয়া লইতে হইবে।

আর্থিক অবস্থার সহিত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে, এই দুইটীকে ছাড়িয়া কেবল আর্থিক অবস্থার আলোচনা করিলে সে আলোচনা নিতান্তই অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। শুনিতে পাওয়া যায় কেহ কেহ মাটীতে পোতা টাকা পাইয়া বড় লোক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে অবস্থা কচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে। ধনসম্পত্তি প্রধানতঃ মাটীতেই জন্মে, কিন্তু তাহা কষ্ট করিয়া আয়ও করিতে হয় ; ইহাই সাধারণ নিয়ম এবং এই নিয়ম কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে গেলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা দুইই আবশ্যক। স্বাস্থ্যের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব ঘটিলে, দেহটী শ্রমসহিষ্ণু না হইলে, উপার্জ্জনের ক্ষমতা আসিবে কোথা হইতে? স্বাস্থ্যও আবার অনেকটা শিক্ষা

সাপেক্ষ। লোকের জীবনযাত্রা যতদিন স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী না হইবে, ততদিন স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অপরের চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হইতে পারে না। এই জীবনযাত্রা ঠিক কারবার জন্য আক্ষরিক শিক্ষা যত হউক বা না হউক, ব্যবহারিক শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। পাটের কলের শ্রমজীবীরা ভাল মন্দ নানারকম স্থানেই থাকে, কিন্তু যতদিন তাহাদের ভালমন্দের জ্ঞান না জন্মিবে ততদিন তাহাদিগকে স্বর্গে রাখিলেও সে স্বর্গ শীঘ্রই নরকে পরিণত হইবে। বঙ্গের পল্লীগ্রামের কৃষকেরা এ বিষয়ে কতক পরিমাণে ভাল, অন্ততঃ নাগরিক বক্তার দল তাহাদিগকে যতটা মন্দ মনে করেন তাহারা ততটা মন্দ নয়। তবু স্বাস্থ্যরক্ষার অনেক নিয়ম তাহারা শিক্ষার অভাবে পালন করিতে জানে না। উপযুক্ত পানীয় জলের একেই অভাব, তাহাতে আবার তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষায় মনোযোগের অভাব সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কোন ভাল পুষ্করিণী কাটাইয়া পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য তাহাতে স্নান নিষেধ করিলে সে নিষেধ খুব কম লোকেই ইচ্ছাপূর্ব্বক মানিয়া চলে। নিষেধটা যে সাধারণের উপকারের জন্য এ ধারণা বড় একটা মনে আসে না, মালিকের মনটা নিতান্ত ছোট এইরূপ একটা ধারণাই অনেকের মনে স্থান পায়। গোবরের গর্ত্ত শয়নগৃহের নিকট থাকিলে যে শয়নগৃহের বায়ুর বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়, ইহাও বড় কাহাকে মনে করিতে দেখা যায় না। উন্নতিশীল পূর্ব্ববঙ্গে বর্ষার শেষভাগে কিরূপভাবে যেখানে-সেখানে পাট পচাইবার বন্দোবস্ত করা হয় এবং তাহা লইয়া কত বাগ্বিতণ্ডা ও কলহের সূত্রপাত হয়, তাহা যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই জানেন। এই সকল দোষ শিক্ষা ভিন্ন দূর হয় না। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সকল সভ্য দেশেই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য -- এ দেশে বিদেশী গবর্ণমেণ্টও সেটা অকর্ত্তব্য মনে করেন না। তবে কোন্ কালে যে প্রকৃত প্রস্তাবে কতটা দাঁড়াইবে তাহা বিশ্বনিয়ন্তাই জানেন।

পল্লীগ্রামে খোলা মাঠ এত বেশী যে মূত্রপুরীষ ত্যাগের জন্য (অন্ততঃ পুরুষলোকের) যে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান আবশ্যক এ কথা প্রায় কাহারও মনেই আসে না। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নগরে এ বিষয়ে দরিদ্র লোককে অনেক বিষয়ে বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। সাধারণের ব্যবহার্য্য পায়খানা অনেক স্থানেই পরিমাণে কম সুতরাং প্রকৃতির তাড়নায় লোকে স্বাস্থ্যনীতির বিরুদ্ধ নানা কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। বারাণসীধামের ন্যায় পবিত্র স্থানে পবিত্র সুরতরঙ্গিণীর ধার দিয়া যিনি বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন তিনিই দেখিয়াছেন হিন্দুর বহুকালের ধর্ম্মসংস্কারও প্রকৃতির তাড়নার নিকট কিরূপ অবনতমস্তক।

অর্থ যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যও সেইরূপ অর্থ ব্যতীত দুষ্প্রাপ্য, এ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য রহিয়াছে একদিকে গবর্ণমেণ্টের ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত বিবিধ কর্ত্তৃত্ব-সভার (ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী, লোক্যালবোর্ড, ইউনিয়নবোর্ড প্রভৃতির), অপরদিকে স্থানীয় লোকের। যে যে স্থলে গবর্ণমেণ্টেরও এই সকল কর্ত্তৃত্ব-সভার সাহায্য আবশ্যক

সেখানে কার্পণ্য না করিয়া তাঁহারা সাহায্য দানে অগ্রসর হউন, শিক্ষার ব্যবস্থা করুন, পানীয় জলের ব্যবস্থা করুন, যাহাতে দূষিত পদার্থের সমাবেশে সংক্রামক ব্যাধি বিক্রম প্রকাশ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করুন। স্থানীয় বড়লোকদিগের অর্থও এই সকল সৎকার্য্যে সার্থক হউক। আর যাঁহারা “কর্ম্মী” তাঁহারা, যাহাতে জনসাধারণ এই সকল মহাজন-নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগুন। গ্রামের মাতব্বর ও শিক্ষিত যুবকগণের এদিকে যথেষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। মাতৃভূমির সেবা, দরিদ্রনারায়ণের সেবা—ইহা অপেক্ষা মহত্তর ব্রত আর জগতে কি আছে? এ বৎসর অর্থনৈতিক সভায় ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে মন্তব্য পাঠ করিয়াছেন তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। আমরা তাঁহার সকল কথার অনুমোদন না করিলেও মোটের উপর ইহা সত্য যে, যে সকল বড় নগরীর কলকারখানা পাশ্চাত্য দেশের ধারা অবলম্বন করিতেছে সে সকল স্থানে পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যবিধির প্রবর্ত্তন আবশ্যক। বাসগৃহগুলি সুবিন্যস্ত হইবে, ময়লা আবর্জ্জনা পরিষ্করণের সুব্যবস্থা থাকিবে, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমনের সহজ উপায় থাকিবে—এ সকলই আবশ্যক। মফঃস্বলে পুষ্করিণীর প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট, কিন্তু সহরে পচা পুরাতন পুষ্করিণী বুজাইয়া দিলে যে অপকর্ম্ম করা হয়, আমরা এরূপ মনে করি না। জলের কল থাকিলে পুষ্করিণীর প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যায়। কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে প্রাচীন পুষ্করিণীগুলি বুজাইয়া দেওয়ায় স্বাস্থ্যের উন্নতিই হইয়াছে। অত্যন্ত ঘনবসতি যে স্বাস্থ্যের অন্তরায় সে বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে না। লোক বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে সহরে যে-কোন ভাবে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হয়। খুব সহজে, অল্প খরচে ও অল্প সময়ে সহরের বাহির হইতে ভিতরে আসিবার ব্যবস্থা থাকিলে এই সকল লোক সহরের উপকণ্ঠেই অধিক সুখে বাস করিতে পারে, সহরও জনাধিক্যে এতটা প্রপীড়িত হয় না। রাধাকমল বাবু শিশুদিগের অকালমৃত্যুর আধিক্য দেখাইয়া ভারতীয় শ্রমকেন্দ্রগুলির অস্বাস্থ্য প্রতিপাদন করার চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিক এই সকল শিশুজীবনের অকালে পরিসমাপ্তি দেখিলে জন্মকোষ্ঠীর উপর অশ্রদ্ধা আসিয়া পড়ে। যদি একই দিনে একই সময়ে জন্ম গ্রহণ করিলে জীবনের ফল (অন্ততঃ মোটামুটি) একরকম হয়, তাহা হইলে ভিন্নদেশে জাত শিশু এত দীর্ঘ জীবন লাভ করে কেন এবং ভারতের শ্রমকেন্দ্রে যাহাদের জন্ম তাহারাই বা এত শীঘ্র যমরাজের সভায় নীত হয় কেন? এ সকল হয়ত খুব গূঢ় কথা, হয়ত জন্মের সময়ে দুই এক সেকেণ্ড বা মিনিট তফাৎ থাকে এবং শিশু জীবনে মৃত্যুই যাহার নিয়তি, বিধাতা পুরুষ হয়ত তাহাকে ভারতবর্ষীয় শ্রমকেন্দ্রে জন্ম গ্রহণ করিতে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু এইরূপ নিয়তিগ্রস্ত লোক যাহাতে এদেশে বেশী না আসিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে একটু পুরুষকারের প্রয়োগ বোধ হয় স্বদেশভক্ত ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

ব্যবহার্য্য জলের সংস্থান ও অব্যবহার্য্য জলের নিঃসরণ দেশের স্বাস্থ্যের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে

প্রয়োজনীয়। সরকারপক্ষের ও দেশের বড় লোকদিগের এদিকে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আবশ্যক। মানুষ ও গরুর পানের জন্য এবং কৃষিক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য দেশে যে সকল বড় বড় পুষ্করিণী-গুলি, সেগুলি ত প্রায় বুজিয়া আসিয়াছে, এখন সংস্কার আবশ্যক। এ দিকে ধনী লোকের পূর্ব্বের ন্যায় মতি নাই, ধর্ম্মবিশ্বাসও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উপরওয়ালারও নষ্ট পুষ্করিণীর স্থান পূরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন না। গ্রীষ্মকালে ব্যবহার্য্য জলের অভাবে পূর্ব্ববঙ্গে পর্য্যন্ত অনেক স্থানে ভীষণ অবস্থা দেখা দেয়। এ দিকে বর্ষার সময়ে ও পরে অনেক অব্যবহার্য্য জল নিঃসরণের সুবিধা না পাইয়া কেবল দুর্গন্ধ ও ব্যাধির বীজের আশ্রয়-স্থল হইয়া দাঁড়ায়। দেশটা পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হইয়াছে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলি বাঙ্গালা দেশে সে উপকারটা এখনও করিয়া দিতেছে, ছোট খাট নদী কঙ্কালসার হইয়াছে, বর্ষার জল ডোবা ও খালে আবদ্ধ হইয়া পালায় কোথায়? তাহার পর রেলওয়েগুলি: জলনিঃসরণের যে স্বাভাবিক সুবিধা ছিল তাহা দূর করিতে ইহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে। জল যেখানে যাইতে চায় সেখানে যাওয়ার পথ না পাওয়ায় অগত্যা ভেক ও মশককে ক্রোড়ে করিয়া কোনমতে দিন কাটায়।

বাস্তবিক পল্লীগ্রামে দেশের কর্ত্তাদিগের পক্ষে স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা প্রধানতঃ দুই কথায় পরিসমাপ্ত—সুপেয় জলের সংস্থান ও অব্যবহার্য্য জলের নিঃসরণ। বাকীটা রহিল মানুষ তৈয়ারী। দ্বিপদ জন্তুকে শিক্ষা দিয়া মানুষে পরিণত করা—ইহাও সরকারেরই কাজ। এরূপ শিক্ষা আবশ্যক যাহাতে গ্রাম্য লোক স্বাস্থ্যনীতির মোটামোটা বিধানগুলি বুঝিতে পারে, যাহাতে মোটা মোটা শিল্পকার্য্য—যাহা গ্রামেও চলিতে পারে—শিখিয়া লইয়া উদরান্নের জন্য দু'পয়সা সংগ্রহ করিতে পারে। গ্রাম্য কৃষক বা তাহার পরিবারভুক্ত ব্যক্তি বা তাহার সমশ্রেণীর লোক সস্তা রেলের সাহায্যে সহরে বা তাহার উপকণ্ঠে কলকারখানায় মজুরী করিতে আসিবে ইহা খুব বাঞ্ছনীয় মনে হয় না। অবশ্য কতক লোককে আসিতেই হইবে। কিন্তু অধিকাংশ লোকের যেন সে চেষ্টা করিতে না হয়। দেশের প্রাচীন প্রথা এ দেশের শিল্পীকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া—যন্ত্রে পরিণত না করিয়া—কার্য্য করিতে বলে। দেশের সেই ধারাটা রক্ষা করিয়া শিল্পী—আবশ্যক হইলে যৌথ ভাবে কার্য্য করিতে পারে, কৃষক অবসর কালে তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই শিল্পকার্য্যে মনোযোগ দিতে পারে এইরূপ শিক্ষাই এ দেশে শোভন। আমরা বলি গবর্ণমেণ্ট এইরূপ শিক্ষার প্রবর্ত্তন করুন, দেশের "কর্ম্মী"রা শ্রমিকদিগকে এইরূপ কার্য্যের পন্থা দেখাইয়া দিন। গ্রামে উপযুক্ত স্থানে বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক, তাহাতে সার্ব্বজনীন আক্ষরিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ জীবিকার্জ্জনে সহায়কারী বিদ্যা, শরীররক্ষণে সহায়কারী জ্ঞান অভ্যাস করান হউক। তাহা হইলে অধিকাংশ গ্রাম্য শ্রমজীবী গ্রামে থাকিয়াই গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে পারিবে, সহরকে আরও ভারাক্রান্ত করা আবশ্যক হইবে না।

ক্ষুদ্র বা বৃহৎ নগরে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থানের ব্যবস্থার আমরা মোটেই পক্ষপাতী নাই। বাঙ্গলা দেশে এ ব্যবস্থা এখন খাটে না; খাটিলেও তাহা সুব্যবস্থা নহে। সাময়িক স্বাস্থ্যোন্নতি বা উপার্জ্জন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে। যাহা দেশের উদীয়মান জাতীয়তার বিরোধী তাহা নিশ্চয়ই পরিহার্য্য। হিন্দু ও মুসলমানের বিভিন্ন গণ্ডীর ঘাতপ্রতিঘাতেই আমরা অস্থির। তাহার উপর আবার হিন্দুর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার? ভাবিলেও দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হয়। আমরা বাঁচি বা মরি যেন এক সঙ্গেই সে কাজটা হয়, আরও খণ্ড খণ্ড হইয়া না পড়ি।

দেশের শাসনকর্ত্তৃপক্ষ ও নেতার দল আপন আপন কার্য্যক্ষেত্রে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেই দেশের চেহারা ফিরিয়া যাইতে পারে। আমরা শ্রমজীবীদের শিক্ষা চাই, স্বাস্থ্য চাই, অবস্থার উন্নতি চাই, সঙ্ঘবদ্ধতা চাই। জাতিকে মানদণ্ড করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘবদ্ধতা দেশে দেখা দিলে ভেদনীতি প্রবল হইয়া উঠিবে, জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সাধারণের হিতকে লক্ষ্য করিয়া স্থানবিশেষ লইয়া লোকে সঙ্ঘবদ্ধ হইলেই দেশের মঙ্গল। কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ কর্ত্তব্য সমাজের নিম্নস্তরের বালক বালিকাগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, তাহারা জীবনে করিয়া খাইতে পারে এমন সুযোগ দেওয়া; বিশুদ্ধ বায়ু ও বিশুদ্ধ জলের সংস্থান দ্বারা সংক্রামক ব্যাধির হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করা। নেতাদিগের কর্ত্তব্য, যাহাতে ইহারা গবর্ণমেণ্টপ্রদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারে সেইরূপ ভাবে ইহাদিগকে চলিত করা। সহরে যাঁহারা বক্তৃতা দিয়া বেড়ান তাঁহারা এই কার্য্য ঠিকমত করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। গ্রাম্য লোকদিগের ভিন্ন শ্রেণীর ছোট-খাট নেতা আছে যাহাদের কথা তাহারা সম্পদে বিপদে শোনে। এই নেতারা সহরবাসী বক্তৃতাকারীও নহেন, গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত পঞ্চায়েৎও নহেন। পঞ্চায়েৎ ও বক্তৃতাকারীর দল এই সকল নেতাদিগের মধ্যস্থতায় কাজ করিতে না পারিলে বিশেষ কিছু করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। শ্রমজীবী শ্রেণীর লোকের নাড়ী বুঝিতে পারে এরূপ লোক খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার মারফৎ চিকিৎসা না চালাইলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যাধির উপশম হইবে না। পণ্ডিতদিগেরও কার্য্য আছে, তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্য ও নেতাদিগের কার্য্য কিরূপভাবে চলিতে পারে তাহার পরামর্শ দিতে পারেন—দিয়াছেনও তাই; কিন্তু বড় কার্য্য সরকারের ও "কর্ম্মী"র।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

সাধনা

বিশ্বাসে পশি শ্মশানভস্মে, ডরি যে তোমায় ধরিতে;
(তাই) জীবন-মরণ-সন্ধির তীরে মন্দির গড়ি বরিতে।

ঘুম

(কাল্পনিক দুইটি নর-নারীর মিলন ও বিচ্ছেদের প্রেমালাপ)

শীতে ও কুয়াসায় গুমট যেন ভাঙে না। প্রভাতেই মেঘ করিয়া আসিল। প্রকৃতি নিরাভরণা। যেন কাল রাত্রে বিধবা হইয়াছে। বালার্ক কিরণে উজ্জ্বল কনকরেখা সীমন্তে আজ ফুটে নাই। নদী মাঠ আকাশ পাহাড় পাহাড়ের কোলে ঘন বনরাজী—নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ। হাস্যে লাস্যে, বর্ণে রূপে, গীতে গন্ধে, চমকে ঠমকে—ধেয়ে আসে না। দূর দিগন্ত—তাও স্তব্ধ। নিঃশ্বাস ফেলে কি না ফেলে—বুঝা যায় না। আঁখির পলক পড়ে কি না পড়ে—দেখা যায় না। এত স্তব্ধ কেন? কে একে দুঃখ দিয়েছে? তাই স্তব্ধ হয়ে আছে।

—তুমি কখন এসে পাশে দাঁড়ালে 'গোপন তব চরণ ফেলে'? এই যে গো ঘুমিয়ে ছিলে?

—আমি কি খালি ঘুমিয়েই থাক্‌ব। আমার কি আর উঠ্‌তে নেই?

—আমি কি তাই বলেছি যে তোমার উঠ্‌তে নেই।

—দেখ এই ভোর সকালে উঠেই তুমি ঝগড়া করোনা—বলছি। ভাল হবে না। তুমি কেন আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে?

—বাঃ রে! আমি তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলুম কি করে? আমি জেগেছি সেই কোন্ সকালে। তখন ত তুমি বিছানায় পড়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছ।

—তুমি উঠে এলে কেন?

—আমি যে তখন জেগেছি।

—জেগে বসে রইলে না কেন?

—জেগে কি মানুষ বসে থাকতে পারে?

সে আমার দিকে একবার তাকিয়ে যেন মুখখানা ভার করিয়া রহিল। সত্যি কি জেগে বসে থাকা যায়! যে জাগে সে উঠে চলে যায়! জাগার ভাণ করে যে ঘুমায় সেই শুয়ে পড়ে থাকে!

—শোন বুঝেছ? হাত মুখ ধোও—আবার সকাল বেলায় অঙ্গ মোড়া দিয়ে হাই তুলা কেন?

সে কোন উত্তর দিল না। বাহিরে একমনে কি দেখিতেছিল। আঁকা বাঁকা শুষ্ক নদী—সৈকতে ধূসর বালুস্তর—তার ওপারে মাঠ—মাঠের ওপারে পাহাড় অস্পষ্ট ছায়াময়—ভাল দেখা যায় না। জানালা দিয়ে একদৃষ্টে নীরবে কেবল তারই দিকে চাহিয়া রহিল। শুষ্ক নদীতে ভরা নদীর মত কে ঐ সুন্দরী স্নান করিতে এল। ও কি! চুল খুলে যে! আদুল গায়ে কি এইখানে বসেই নাইতে সুরু কর্‌বে?

—দেখ কি নির্লজ্জ।

—তুমিই বা কম কি?

—আর যদি কোন পুরুষ মানুষ ঐ রকম করে স্নান করত?

—তবে আমি এখান থেকে চলে যেতাম।

—আর আমি যদি ধরে রাখতাম?

—জানালা বন্ধ করে দিতাম।

—তারপর?

—যাও, তুমি বড় বেহায়া হয়েছ।

—হ্যাঁ—তা হয়েছি।

—আচ্ছা, তুমি আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে কেন?

—আবার?

—না বল, আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে কেন?

—তোমার ঘুম এখনো ভাঙেনি।

—আমি ত তোমার ঘুম কখনো ভাঙ্গাইনা।

—আমি কি বলেছি যে তুমি আমার ঘুম ভাঙ্গাও? যা বলিনি তা নিয়ে ঝগড়া কেন—বলত?

—আমি কথা বললেই ঝগড়া।

—ঝগড়া বলে ঝগড়া—একটা রীতিমত যুদ্ধ।

—আমি চুপ করলেই যেন সৃষ্টি বাঁচে। না?

—উ—হুঁ! একেবারে বাঁচে না। কেননা কোনকালেই তুমি একেবারে চুপ করবে না। তবে অনেকক্ষণের জন্য খুব একটা বড় রকমের সন্ধি হয় বটে।

—ঘুম না এলে ত আমাকেই ডাক?

—তা ডাকি—।

—কেন ডাক—?

—তুমি যে আমার ঘুম।

—আমি আবার তোমার ঘুম হলাম কি ক'রে—? কত হেঁয়ালীই জান।

—সত্যি যে তুমি হেঁয়ালী।

—তাত হবেই। আজ আমি ঘুম—কাল আমি হেঁয়ালী। এখন ত এইরকমই দেখছি। সেদিন ত যা-না-তাই—আমায় বললে।

—তুমি যে সত্যি যা-না-তাই।

—চুপ কর বল্‌ছি। আমার ভাল লাগ্‌ছে না।

—আমি কি বল্‌ছি তোমার ভাল লাগ্‌ছে ?

—আচ্ছা, আজ সকালে উঠেই তুমি এমন কচ্ছ কেন বলত ?

—আমি না তুমি ?

—তুমি না উঠ্‌লে ত আমি এখনো পড়ে ঘুমাতাম। রাত্রে আমি একটুও ঘুমুতে পারিনি।

—কেন—বলত ? শুয়ে শুয়ে কি কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলে ?

—কেন আমার সঙ্গে তুমি অমন করে লাগছো ? কেন আমায় অমন করে বিঁধছ ?

—তুমিই বলছ—রাত্রে ঘুমোতে পারনি—তাই ভাবছি।

—কি ভাবছ—?

—খুব বড় রকম—মস্ত একটা—যার আদি নাই—অন্ত নাই—যা—

—খুব হয়েছে—থাম—থাম। আমি চলে যাব কিন্তু এ রকম করলে। খুব বাড় হয়েছে, —না ? ওকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে সারারাত বসে জেগে থাক্‌তে হয়—আবার—যেন কিছু জান না—না ? ভাল মানুষের মত বলা হ'চ্ছে—রাত্রে বেড়াতে গিয়েছিলে কোথায় ? ঘুমোতে দেয়নি কে ? কে—তা জান না ?

—ওঃ, এযে একেবারে আস্ত একটা দর্শনশাস্ত্রের বক্তৃতা পাঠ করলে। বেঁচারাম ভট্‌চায্যের টোলে—

—তুমি থাম্‌বে কিনা আমি জানিতে চাই।

—তবে তাই হোক—, হে চন্দ্র সূর্য্য—না, না—চন্দ্র না—। সারা রাত জেগে বেচারী ভোরের মুখে ঘুমিয়ে পড়েছে। দেবরাজের উজ্জ্বল মুখরিত নূপুর-সিঞ্চিত উৎসব রজনীতে চন্দ্রকে সারাক্ষণ জেগে জেগে জ্যোৎস্না ছড়াতে হয় আর রাত্রিতে জাগরণ করলেই—ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের মুখে নিদ্রাটি এসে উপস্থিত হ'ন—।...আরে আরে কি মুস্কিল—তোমাকে বলছিন। তুমি কি আমার চাঁদ—? কি বিপদেই পড়া গেল। ইন্দ্রের সভায় কি তুমি থাক ? তুমি কি সুধা খাও ?—সুধা—সুধা ? সাধু ভাষায় যাকে বলে—মদ্য ? —মাপ করো—এই হাত জোড় করছি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। তা শোন—, হ্যাঁ কি বল্‌ছিলাম—হে যক্ষ রক্ষ দক্ষ ভক্ষ্য—ছাই জুটেও আসে না—যত সব অন্তরীক্ষ এবং তাতে যারা বাস করে—কিন্নর কিন্নরী ;—ওদে নামগুলোও করি কি বল ? উর্ব্বশী—মেনকা—রম্ভা ইত্যাদি তোমরা সাক্ষী হও—আমি ভীষণ প্রতিজ্ঞা কচ্ছি—আমার—নামটা তোমার নাই বল্‌লাম,—উনির সাক্ষাৎ সম্মুখে দাঁড়িয়ে আর তুমি জান্‌তে চাইলে—না—? অতএব তুমিও জেনে রাখ যে—আজ থেকে আমি থামলাম

—তোমার কি হয়েছে—আমায় বল

—কিছু না।

—আমায় বল্‌বে না?

—তুমি বুঝ্‌বে না।

—তুমি বুঝিয়ে বল। ভাল করে বল। আমি বুঝ্‌ব।

—আমি যে দেখ্‌ছি—তুমি বুঝ্‌লে না।

—যদি আমি না বুঝি—তবে এ সংসারে আর কি কেউ বুঝ্‌বে?

—বোধ হয় না।

—তবে তুমি বল—। আমি বুঝ্‌তে পারি বুঝ্‌ব—না বুঝ্‌তে পারি—না বুঝ্‌ব। তবু একবার আমি শুন্‌ব।

—কি শুন্‌বে—?

—তুমি রাত্রে ঘুমাও না কেন?

—ঘুম আসেনা।

—আমি কাছে থাক্‌লে ত ঘুমাও।

—আমার মনে হয়—তুমিই আমার ঘুম।

—তাইত আমি রাত্রে ঘুমোতে পারিনা।

—না, এখন থেকে তুমি ঘুমিও।

—তাহ'লে তোমার কি হবে? তুমি যে বাঁচ্‌বেনা।

—বাঁচা মরার কথা নয়। আমি জাগ্‌ব। তোমার দেওয়া ঘুমে আমি অনেক ঘুমিয়েছি—। এবার আমার দেওয়া ঘুমে তুমি ঘুমাও—।

—এত এত জাগ্‌লে যে তুমি বাঁচবেনা!

—জাগরণে যদি মৃত্যু আসে—আমার মৃত্যু হবে।

—তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমায় বল—তোমার কি হয়েছে?

আমার কিছু বল্‌বার ছিল না। কি বল্‌ব? কিছু বল্‌লাম না। হৃদয়ের এ হাহাকার—সৃষ্টির বুকে অভিশাপের মত ছুড়ে ফেলে দিব? বজ্রের মত উল্কাবেগে সে ছিঁড়ে বিদীর্ণ করে দিয়ে যাবে? একবার গুঁড়িয়ে দিতে পার্‌লেই সব উড়ে যাবে।

—হ্যাঁ—তুমি কি পার্‌বে? না, তুমি না। তোমাকে নয়।

—বল—বল—আমি পারব।

—আচ্ছা—তুমিই—। তুমি পারবে?

—পারব—নিশ্চয় পারব।

—তবে চল—উপরে যাই।

—চল—এস। আমার ব্যাঘ্রাসন যে তুমি এখনো তুল নাই। আর এই ত উঠ্‌লে—কখন

তুল্‌বে। এই সেই আমার পরিত্যক্ত পাদুকা মুকুট, দণ্ড ও তাম্রযন্ত্র। যজ্ঞকুণ্ড, দগ্ধ ভস্ম। দেখ দেখি ওর মধ্যে শুভ্র অস্থি কি দেখা যায়? নারী অস্থি—? যার মধ্যে কেবলই ফণা। হুতাশন বাল সমস্ত রাত্রি জ্বলেছে। দেব বৈশ্বানর কি তৃপ্ত হ'ন নাই? আহুতির পর—আহুতি দিয়েছি। বাকী রেখেছিলুম বুঝি তোমাকে। বাছা বাছা তন্ত্র থেকে বেছে বেছে মন্ত্র উচ্চারণ করেছি—। মন্ত্র শব্দ মাত্র। জড়—তাকে চৈতন্য দিয়েছি, জাগ্রত করেছি—ধারণ করেছি—প্রয়োগ করেছি—সংবরণও করেছি—। বর্ণে বর্ণে—প্রতিবর্ণে পালন করেছি। দলে দলে প্রতিদলে স্থাপন করেছি। পাপড়িগুলি যেন চক্ষু মেলে চেয়েছে—। আমার এই বিশ্বভুবনে লুকিয়ে ছিল যা—সমস্ত দিন বনে বনে ঘুরে অতি সঙ্গোপনে তুলে এনেছিলাম যা——আমি তাকে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ফুটিয়েছিলাম। পুলকে—কম্পন তার,—আমি বিস্মিত—অবাক হয়ে দেখেছিলাম। আমার পদ্ম ফুটেছিল। ফুলে ফুলে দুলে দুলে ঘুরে ঘুরে সে আমায় বেড়েছিল। কতবার মুখ তুলে আঁখি মেলে যেন ফণা ধরে সে চেয়েছিল। আমার মধ্যে কত পদ্ম—কত ফুল। আমি ফুলে ফুলময় হয়ে গিয়েছিলাম। আবার স্তরে স্তরে সাজান একের পর আর—তাকে হাতে ধরে আমি উঠায়েছি,-খেলা করেছি,-যেখানে ইচ্ছা চালিয়ে নিয়েছি। কি সুডৌল সুগোল তার দেহ—বড় মসৃণ বড় কোমল বড় পিচ্ছিল—আমারি মুঠির মধ্যদিয়ে সে আবার অতি ধীরে নেমে চলে গেল। ঠিক তার আপন জায়গাটিতে নেমে পাকে পাকে ঘুরে ঘুরে কুণ্ডলী বেঁধে ঘুমিয়ে পড়লো—। দীপোজ্জ্বল সারানিশি জাগরণের পর সেও ঘুমিয়েছে।

—আমি জেগে আছি। ঘুমায়নি।

—তুমি জেগে আছ? আমি যে দেখছি—তুমি লতিয়ে লতিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লে—।

—তুমি কি দেখ—আমি তা জানিনা। আমি জেগেই ছিলাম—জেগেই আছি—। আজ থেকে আমি আর কখনো ঘুমাবো না।

আমি বুঝেছি—সব বুঝেছি—। এবার যার ঘুম তারে দিয়ে—আমি শুধু জেগে জেগে নিশি পোহাব। আর আমার ঘুম হবে না। এইবার আমি বুঝেছি। দেখো—শোন—

—হ্যাঁ—বল।

—যখন তুমি বল্‌লে—তখন আমিও বলি—। আমি কোনদিন বলি নাই।

—বল।

—এর আগেও আমি এমনি একদিন রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তাঁর পায়ের শব্দ আমি শুনতে পাই নি। কি ঘুম যে আমার এসেছিল। সে একা এসে নীরবে আমার পাশে শুয়ে—আবার ভোর না হতে একা চলে গিয়েছিল। জেগে উঠে আমার মনে যে কি দুঃখ হয়েছিল। তার পর থেকে আর আমি ঘুমাই নাই। সেই থেকে ঘুমে আমার বড় ভয়।

—তার পর—? এ কথাত তুমি আগে বল নি।

—তার পর—আর কি ? তোমার ভাব দেখে এখন আমি সব বুঝতে পেরেছি। ক্রমে বুঝতে পাচ্ছি।

দুই হাত দিয়ে সে চক্ষু রগড়াইয়া ফেলিল। যেন আরো কি স্পষ্ট দেখিতে চায় এমনি করে এক দৃষ্টে সে আমার কাল রাত্রের যজ্ঞাবশেষ ভস্মরাশির দিকে তাকিয়ে বলিতে আরম্ভ করিল।

—এখন আর আমার কিছুই বুঝতে বাকি নাই। যা একবার হয়ে গেছে—তাই আবার হবে। যা একবার হয়েছে—তাই বুঝি আমার কপালে আবার হয়।

—কি হয়ে গেছে ? কি আবার হবে ?

—সে আমি জানি। তাই এখন বুঝতে পেরেছি। তুমি ত তা জাননা। আর আমিও বলেছিত—তোমায় কোন দিন বলি নাই। তুমি বুঝতে পারবেনা।

—আচ্ছা—তুমি বলে যাও—দেখি, পারি কি না।

—ওগো তুমি আর কি শুনবে—? কি শুনতে চাও—? সব শেষ হয়ে গেল যে। আমি দেখতে পাচ্ছি—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ঐ দেখ—দেখ। না—না—মুখ ফিরাও। তুমি আর ওদিকে চেয়োনা। মৃত মৃত।

—কেন তুমি এমন উতলা হলে ?

—না কিছু হইনি ত। ঠিক আছি। ঠিকই থাকিব। সেবারেও ঠিকই ছিলাম।

—তারপরে কি হল ?

—তারপরে আর তার দেখা পেলাম না। আহা সে ঘুমোতে এসেছিল আমার কাছে। বুঝি সে ঘুমোতে পারে নাই। বুঝি সে সারা রাত শুয়ে জেগে কাটিয়ে তাই অভিমানে ভোরের বেলা না বলে চলে গিয়াছিল।

—তুমি ত তারপরে ঘুমিয়েছ। আমি দেখেছি।

—হ্যাঁ তারপরে আবার আমি ঘুমিয়েছি। সত্যি কথা। কেন ঘুমিয়েছি ? ওগো আমি কেন ঘুমিয়েছিলাম ? বারে বারে এ আমার কি যন্ত্রণা। বারে বারে কেন আমার দুয়ার খুলে দিতে হয় ? এই ঝড় বাদল আঁধার রাত কিছু মানেনা—তবু কেন আসে ? নামধরে ডাকে, বলে খুলে দাও। খুলে দাও।

—তুমি কি তাকে দেখেছিলে ?

—না। কৈ না। কোনদিন তাকে আমি দেখিনি। আহা যদি না ঘুমাতাম তবে বুঝি দেখতাম।

—আমাকে দেখেছ ?

এক দৃষ্টে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ বার বার চেয়ে দেখে বলিল—

—হ্যাঁ তোমায় আমি দেখেছি। কিন্তু তাকে আমি দেখি নাই।

—মনে কর আমিই যদি তখন এসে থাকি।

—ওঃ—তুমিই যদি তখন এসে থাক।

—হ্যাঁ—ভেবে নেও—আমিই সেই।

—ভেবে নেব কি গো। তবে সত্যি—সত্যি তুমি সে নও? আমায় মিথ্যে করে ভাবতে বলছ?

—না মিথ্যা না। সত্যি।

—আমার বিশ্বাস হয় না একথা।

—আমি প্রমাণ দিতে পারব না।

—কেন? সত্যি হ'লে কেন পারবে না। অবশ্য পারবে। দাও তুমি আমায় বুঝিয়ে দাও।

—না।

—কেন, না কেন?

—যে বুঝে সে অমনি বুঝে।—বুঝিয়ে দিতে গেলে আরো দুর্বোধ্য হয়।

—তুমিই এসেছিলে? ঠিক?

—যা মনে কর।

—আমাকে ডাক নাই কেন? বল, আমায় ডাক নাই কেন? আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমায় চুমো দেওনি কেন? যেমন করে যা বলে আমায় ডাক তেমন করে ডাকনি কেন? তুমি ডাকলে কি আমি আর ঘুমিয়ে পড়ে থাকি। আমি বুঝি মরে গেলেও—তুমি ডাকলে শুনতে পাব, সাড়া দেব। বল তুমি যা খুসী—শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে যাও—আর আমি শুনি। বুঝি বা না বুঝি কি আসে যায়?

—না আমার এখন কাজ আছে।

—কাজ? কি কাজ? আমাকে ছাড়া আবার তোমার কি কাজ আছে?

—এই দেখ তোমার চক্ষু ভেঙে আবার ঘুম আসছে। যাও তুমি ঘুমোওগে। চল নীচে চল।

—তবে এখানে ভোরের বেলায় নিয়ে আস্‌বার কি দরকার ছিল? আমি সত্যি নেমে গিয়ে ঘুমাবো।

—তা আমি জানি। চল এস।

—চল।

নামিতে নামিতে আমি বলিলাম—

—দেখ যে আসে সে একজনই আসে। কিন্তু একবার আসে না—অনেকবার আসে।

—রাগ করে ফিরে যায় বলেই ত বারে বারে আস্‌তে হয়। আচ্ছা ঘুরে ঘুরে বারে বারে সেই এক জনই আসে?

—হ্যাঁ।

—তুমি আমার সেই একজন?

—হতেও পারি।

—বাঃ! হতেও পারি কি রকম? এখনও হতেও পারি?

—নিশ্চয়।

—তবে না হ'তেও পার? বল?

—বুঝি তাও পারি।

—কি যে বল ঠিক নাই। শেষ পর্য্যন্ত তোমার কথার কিছু বুঝা যায় না।

—শেষ পর্য্যন্ত শুনোনা।

—তারপর এখন?

—তারপর এখন তুমি একটু ঘুমিয়ে নেও।

—আর তুমি?

—আমি—আমি—না বিশেষ কিছু নয়।

—তুমি কি করবে?

—আমি যখন ঘুমোবোনা তখন জেগে ত আর শুধু শুধু বসে থাকা যায় না। একটা কিছু কর্‌তে হবে।

—কর যা খুসী। আমি আর পারি না। সত্যি বড় ঘুম পাচ্ছে। আমি শুইগে। আস্‌বেনা? আস্‌বেনা? এস।

—না।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

সাবধানি

চল্‌বে না ক মিথ্যাটাকে সাজিয়ে সাঁচা ঝুট্ বলা;
সখ্যে মেলা? সে ত ঢালা সাপের গলায় দুধ কলা।
ওগো জল্লাদ! বাড়িয়ে দিব কাঁচা মাথা? তাই বটে!
কিবা ক্ষতি বিশ্বে যদি উদার নামটা নাই রটে।

বিপ্র পরশুরাম

বিপ্র পরশুরাম একজন পুরানো কবি,—পশ্চিম বাঙ্গালার একজন বিখ্যাত কবি। ইঁহার রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' পুঁথি—গানের পুঁথি বলিয়া পরিচিত। পুঁথিখানা অবশ্য পয়ার ত্রিপদী ইত্যাদি ছন্দে রচিত, মাঝে 'পদ'ও আছে, লোকে মৃদঙ্গ মন্দিরা লইয়া দল বাঁধিয়া সেই সব পয়ার ত্রিপদী, পদ গাহিয়া বেড়াইত। পশ্চিম বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে এক সময় কৃষ্ণমঙ্গল গানের খুব প্রচলিত ছিল, নূতন শিক্ষার তাড়সে অন্যান্য পুরানো জিনিসের সঙ্গে কৃষ্ণমঙ্গলের গানও উঠিয়া গিয়াছে। প্রথম সখের "যাত্রার দলের" ঢেউ উঠিয়া ইহাকে খানিক সরাইয়া দিয়াছিল। এখন থিয়েটারের বাতিকে এবং পল্লীর দারিদ্র্যে, ও ম্যালিরিয়ায় লোকের অর্থ কষ্ট ও স্ফূর্ত্তি-হীনতার চাপে ইহার একেবারে নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে।

তাই এখনকার লোকে পরশুরামের পরিচয় বড় জানে না, শুধু পরশুরাম কেন কৃত্তিবাস কাশীদাস ভিন্ন প্রায় আর সকলকেই ভুলিয়াছে।

কৃষ্ণমঙ্গল পুঁথিখানা মুলতঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুবাদ, তবে কবি ইহাতে প্রসঙ্গতঃ শ্রীকৃষ্ণ-লীলার আরো বহু বিষয় ঢুকাইয়া অল্প বিস্তর নানা রসের সমাবেশে পুঁথিখানিকে মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন। এক দিকে যেমন বৃন্দাবন লীলায় দানখণ্ড নৌকাখণ্ড আছে, অন্যদিকে তেমনি বৃষকেতুর উপাখ্যানও আছে। দুঃখের বিষয় কৃষ্ণমঙ্গলের সমগ্র পুঁথি খুঁজিয়া পাই নাই। তবে পুরানো পুঁথি খুজিতে যে কোনো গ্রামে গিয়াছি, পরশুরামের এক আধ টুকরা পুঁথি পাওয়া যায় নাই, এমন খুব কমই দেখিয়াছি। পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল হইতে দানখণ্ডের একটু নমুনা দিলাম।

"আইস আইস বিনোদিনী বৈস মোর কাছে।
উছটে ঠেকিয়া পদ নখ খসে পাছে॥
পসরা তুলিয়া আইস বৈস তরুমূলে।
চলিতে বেদনা পাবে চরণ কমলে॥
চন্দ্রাননে বিগলিত বিন্দু বিন্দু ঘাম।
অধিক শোভিত তাহে মুকুতার দাম॥
ঘামে নষ্ট হইল গৌরি সুন্দর কাজলে।
শীতল তরুর ছায় বৈস মোর কোলে॥
অতি ক্ষীণা কমলিনী সোনার বরণ।
রবি তাপে মিলাইবে এমন যৌবন॥
খঞ্জনে গঞ্জনআঁখি রঞ্জনে রঞ্জিত।
স্বর্ণমৃগ বলি ব্যাধ বিন্ধিবে নিশ্চিত॥
দেখিয়া অধর মুখ নলিনী মেলানী।
কমলের ভাবে আলি দংশিবে এখনি॥
শীতল তরুর ছায় বৈস একবার।
সকল কিনিয়া নিব তোমার পসার॥"

কৃষ্ণমঙ্গল সম্পূর্ণ পাই নাই, কিন্তু ইহাঁর লেখা "মাধব সঙ্গীত" নামক একখানি পুঁথি সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। ১৩৭ পাতার পুঁথি—তুলোট কাগজে দুই পিঠ লেখা। পুঁথি নকলের

তারিখ ১১৯৩ সাল ১৬ ভাদ্র মঙ্গলবার শুক্লাষ্টমী। কবির বয়স কিন্তু তিন শত বৎসর হইবে, পরে পরিচয় দিতেছি।

গৌরাঙ্গদেবকে বন্দনা করিয়া কবি পুঁথি আরম্ভ করিয়াছেন—আরম্ভ ভাগে শ্রীমতী রাধিকার বন্দনাটী দেখুন—

"জয় জয় মাধব দয়িত অভিরামা।
অবিদিত বেদ বিবুধ বিধি বন্দিত রাধা রসবতী নামা।
বৃষভানু উদধি অবধি অচিন্তন চিন্তামণি ধনীরূপা।
নন্দনগর নব নন্দিনী বন্দিনী বৃন্দাবন বনভূপা ॥

* * * * *

বেশ বিশেষ শেষ সদৃশানন শিব শুক বর্ণন পারা।
সিন্ধু সুতাসুত শম্ভু ঘরণীজিত তনু উনু লাবণী সারা ॥
ঢল ঢল সকল কলেবর আবর দ্যুতি জিতি বিদ্যুত বল্লী।
চাঁচর চিকুর প্রচয় রুচি রঞ্জন ছন্দন মালতী মল্লী ॥

* * * * *

বিদলিত মল্লি মাল মনি মৌক্তিক অলিকুল কলয়িত হারা।
কুচ যুগ শম্ভু শিরোপরি শোহণ মেরু সুরেশ্বরী ধারা ॥
বসন রসন ঘন অঞ্জন গঞ্জন চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গী।
জনু ঘণ পত্তন ইন্দুকিরণ পুন পূরণ করণ রণরঙ্গী ॥
কর কিশলয় ভূজবল্লরী বলয়িত করী অরি কমনীয় মধ্যা।
কটীতট নিকট কলনূর্মাণ কিঙ্কিনী গতি জিতি নর্ত্তন পথ্যা ॥
গৌর নিতম্ব বিতম্ব তব তুঙ্গিত গঞ্জিত হংস বিহঙ্গে।
স্তবকিত তরল ছন্দ নীবিবন্ধন দোলই অঙ্গ তরঙ্গে ॥
কঞ্জচরণে মণি মঞ্জীর ঝঙ্কৃত ঝলমল নখমণি কিরণে।
পদতল অমল সরোরুহ শীতল পরশুরাম রহ স্মরণে ॥

পুঁথির বর্ণনীয় বিষয়—

"ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিৎ গঙ্গাবক্ষে মঞ্চ বাঁধিয়া বাস করিতেছেন, সঙ্গে পরাশরাদি মুনিগণ, উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তন হইতেছে, স্বচ্ছন্দচারী শুকদেব সেই ধ্বনি শুনিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনিগণ সহ রাজা সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। যথারীতি পাদ্য অর্ঘ্য দান ও পূজাদির পর রাজা বলিলেন—মুনিগণের আগমনে মৃত্যুভয় আমার দূর হইয়াছে, ব্রহ্মশাপ আমি বর বলিয়া মনে করিতেছি, এখন এই অন্তিমকালে আপনি অনুকূল হইয়া কৃষ্ণকথা শুনাইয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। শুকদেব বিস্মিত হইলেন—

একে তরুণ, তায় বিষয়ী, তার কৃষ্ণকথায় এমন রতি, বজ্রসম ব্রহ্মশাপ শ্লাঘ্য বলিয়া মনে করিতেছে—

শুকদেব বলেন বাপ আইস করি কোলে।
সর্ব্বথা হইলে মুক্ত মায়ামোহ জালে॥
মৃত্যু বলি মিথ্যাবাদ ব্রহ্মশাপ বৃথা।
বিস্তার করিলে তুমি ভাগবত কথা॥

শুকদেব সংক্ষেপে কৃষ্ণকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য আদি বর্ণন করিয়া লীলাবর্ণন আরম্ভ করিলেন। এইরূপে নন্দ যশোদার সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া চতুর্ব্বিধ সখ্যরসের কথা-প্রসঙ্গে ব্রজ রাখালদের প্রিয় নর্ম্ম সখাদি ভেদ বিবৃত করিলেন। এই সঙ্গে সুবলাদির প্রীতির গাঢ়তা, কালীয়দমন দিনের ব্যাকুলতা, ব্রহ্মার গোবৎস হরণাদির কথাও সংক্ষেপে আছে। অতঃপর ব্রজকিশোরীগণের অপ্রাকৃত প্রেমের অলৌকিক কাহিনী রহিয়াছে। শুক— —দবীগণের প্রশংসা করিতেই রাজা সবিনয়ে নিবেদন করিলেন—

কৃপা করি কহ মোরে নিবেদি চরণে।
উপজয়ে প্রেমভক্তি কতেক সাধনে॥

শুকদেব একে একে সাধনভক্তির ক্রম বর্ণন করিতে লাগিলেন। ভক্তি, প্রেম, রাগ, মার্গ, বিধিমার্গ, ত্রিবিধাগোপী, শ্রীরাধিকার শ্রেষ্ঠতা আদি বর্ণন করিয়া শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-বিহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। শরতের শেষ,—হেমন্ত ঋতু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। রাত্রিকালে,—গগনে চাঁদ, কাননে ফুল; যমুনার কলধ্বনি গন্ধেভরা মন্দ পবনে ভাসিয়া আসিতেছে—কিশোর কানু ঘর ছাড়িয়া বনে আসিয়া দেখা দিলেন। আজ পুনঃ পুনঃ শুধু শ্রীরাধার কথাই মনে হইতেছে। এমনি সময়ে মনসিজ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজ পরিচয় দিয়া কহিলেন—

উজ্জ্বলাদি সর্ব্বরসে পরিপূর্ণ অঙ্গ।
কি বুঝিয়া নাহি কর প্রেয়সীর সঙ্গ॥

আমি তরুণীগণের চিত্র ইঙ্গিতে বলিতে পারি, ব্রজ-সুন্দরীগণ তোমাতেই আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমার বন্ধুর কার্য্য কর—আমার নিকট শ্রীমতীকে আনিয়া দাও। কাম সভয়ে বলিলেন—

"আনন্দ মঞ্জরী সর্ব্ব মাধুর্য্যের সীমা।
বিধির অবধি যার অপার মহিমা॥
কত কাম মূরুছায় নয়নের কোণে।
কি করিতে পারে তার সম্মোহন বাণে॥"

উপায় করিতে কাম ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে রাধামন্ত্র ও সাধনের উপদেশ দিয়া বড়াইয়ের শরণ গ্রহণ করিতে বলিলেন; কাম বড়াইকে আনিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বড়াইয়ের নিকট শ্রীমতীর রূপগুণ, তাঁহার সখীগণের নাম, শ্রেণী ভেদ, ইত্যাদি সবিস্তারে শুনিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে বড়াই গিয়া শ্রীমতীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি ব্যাখ্যা করিলেন (কৃষ্ণ সাধনের উপদেশ দিলেন)। বড়াইয়ের উপদেশে বিশাখার তত্ত্বাবধানে সখী চিত্রলেখা শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট আঁকিয়া আনিয়া শ্রীমতীকে দেখাইলেন। শ্রীমতী সখীগণকে লইয়া কৃষ্ণসাধনে রত হইয়াছেন,—চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মাবতী চন্দ্রাবলীকে এই সংবাদ দিয়া আগে ভাগে অভিসারে উপদেশ দিলেন। চন্দ্রাবলী অভিসারে না গিয়া শ্রীমতী যাহাতে নিবৃত্তা হন, সেই উদ্দেশ্যে শ্রীমতীর পিত্রালয়ে গিয়া শ্রীমতীকে কত বুঝাইলেন, কিন্তু শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের পদে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণের সংকল্প জানাইয়া চন্দ্রাকে বিদায় করিয়া দিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মুরলীযন্ত্রে রাধানাম সাধন করিতেছেন,—মুরলী-মোহিত ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীমতীর উপদেশে কাননে অভিসার করিলেন। বিশারদা নাম্নী গোপীকে গুরুজন আসিতে না দেওয়ায় তিনি গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যদেহে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিতা হইলেন, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া গুরুজনগণ আর কাহাকেও বাধা দিতে সাহস করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে পতিসেবাদির উপদেশ দিয়াও গৃহে ফিরাইতে না পারিয়া শ্রীমতীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাধিকার অভিসার-সজ্জা তখনো সমাপ্ত হয় নাই। ইত্যবসরে চন্দ্রাবলী আসিয়া উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই রাধা বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে চন্দ্রাবলী তো রাগিয়াই অস্থির, এমন সময়ে শ্রীমতী আসিয়া দেখা দিলেন। উভয়েই উভয়কে দেখিয়া মুগ্ধ, নির্নিমেশ নয়নে নির্ব্বাক হইয়া উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ব্যাপার দেখিয়া বড়াই বলিলেন, আমিই এখানে এ মিলনে একমাত্র বাধা দেখিতেছি,—আমি বুড়ি, এতগুলি কিশোরীর মধ্যে একা বুড়িকে মানাবে কেন? তা—আমি যাইতেছি, আমার শুধু একটা কার্য্য বাকী আছে, শ্রীকৃষ্ণের করে কুমারীগণকে সম্প্রদান করিতে হইবে। তোমরা আয়োজন কর, গার্গী কন্যাকর্ত্তা হউন, ভার্গী পৌরোহিত্য করুন, তোমরা যে যা উপায়ন আনিয়াছ বরকে দাও। বড়াইয়ের আদেশ প্রতিপালিত হইল. প্রতি কুঞ্জে প্রতি গোপীকে লইয়া কায়ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতে লাগিলেন।

"এই মত লীলা করে গোপীগণ লঞা।
বহ্মরাত্রি গোঙাইল আনন্দ করিঞা॥
পরশুরামের রহু গুরু পদে আশা।
এহো কালে পরকালে বৈষ্ণব ভরোষা।" ॥

এই পুঁথি খানি লিখিতে কবি—বিদগ্ধমাধব, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু,

উজ্জ্বলনীলমণি, গোপাল তাপনী, রুদ্রপুরাণ, বার্পণ্য পঞ্জিকা, দীপিকা, যামল, সঙ্গীত দামোদর, হাস্যার্ণব, ললিত মাধব, ব্রহ্ম সংহিতা প্রভৃতি পুঁথি হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

পরশুরামের রচনা প্রাঞ্জল। মাধবসঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার একটী চিত্র—

"কনক কটোরী ভরি দুগ্ধ দেই মায়।
মুখ দিয়া থাকে তায় কিছু নাহি খায় ॥
যশোমতি বলে কথা শুনরে বাছনি।
দুগ্ধ খাহ এই ক্ষেণে বাঢ়িবেক বেণী ॥
বলরামের দীঘ বেণী দেখ পিঠে দোলে।
দুগ্ধ নাহি খাহ তেঞী কেশ কর্ণ মূলে ॥
সারোষ্ণ ধবলী দুগ্ধ চিতা দিঞা খায়।
খাত্যে খাত্যে বেণী বাঢ়ে চরণে লোটায় ॥
মায়ের এ-সব কথা প্রলাপ শুনিঞা।
দুগ্ধ খায় কেশে কৃষ্ণ বাম হাত দিঞা ॥
তা দেখি মায়ের গা ধরনে না যায়।
আনন্দ সাগরে ভাসে থল নাহি পায় ॥
দুগ্ধ খাঞা মায়ের কাছে চতুর কানাঞী।
বোঁখা দিঞা দেখে কেশ কিছু বাঢ়ে নাঞী ॥
কেশে ধরি কান্দে কৃষ্ণ গড়া গড়ি দেল।
ব্যস্ত হইল যশোমতি পুত্র করি কোলে ॥
ক্রন্দন শুনিঞা তথা আইলা রোহিণী।
কৃষ্ণ কোলে করি হাতে দিল নিজ বেণী ॥
যশোদা বলেন এই দেখ যদুরায়।
বাঢ়িল তোমার বেণী ধরণী লোটায় ॥

কৃষ্ণমঙ্গল সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই, সে পুঁথি খানিতে কবির কোনো পরিচয় লেখা আছে কিনা জানি না। মাধবসঙ্গীতে সামান্য কিছু পরিচয় আছে, তাহা হইতে জানা যায় কবি ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও মনোহরদাসের শিষ্যত্ব স্বীকারে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ চলিত কথায় যাহাকে "ভেকাশ্রয়" বলে সেই 'ভেক' লইয়া বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। মনোহরদাস অধিকাংশ সময় জ্ঞানদাসের জন্মভূমি কান্দরায় থাকিতেন, তাঁহার কনিষ্ঠ কিশোরদাস জ্ঞানদাসের পাটের প্রথম মোহন্ত, তিনি কান্দরাতেই বাস করিয়াছিলেন। কান্দরায় কিশোরের বংশাবলী আছে। কবি বলিতেছেন—

"সংসারে ধনি ধনি　　ক্ষেত্রিয় শিরোমণি
　　শিখর শ্যাম অধিপতি।
নৃপতি আশ্রমে　　'**দ্বাদশ কল্য**' গ্রামে
　　রচিল সংগীত পুঁথি ॥
ধন্য সে ঠাকুরাল　　বাঢ়ুক বহুকাল
　　ধনি সে পাত্র পরধান।
ধন্য সে সব প্রজা　　বৈষ্ণব পদ পূজা
　　করেন হরিগুণ গান ॥
পরশুরাম দিন　　সাধন সঙ্গ হিন
　　ব্রহ্মণে কুল দিল পাঞা।
দিবস দুই চারি　　প্রকারে পরিহরি
　　রাধিকা কৃষ্ণ গুণ গাঞা" ॥

'**দ্বাদশ কল্য**' কি বারকুলি বোরাকুলির সংস্কৃত নাম? সেখানে কি শ্যামশিখর নামে কোনো জমিদার ছিলেন? পরশুরাম প্রায় তিন শত, সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পরিচয় জানিতে পারিলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একজন পুরানো কবির সংখ্যা বাড়িতে পারে। মাধব সংগীতের আর একজায়গায় আছে—

'ক্ষেত্রি অবতংস মহারাজ বংশ
কুমার শিখর শ্যাম।
যার দেশে বসি সংগীত বিলাসী
রচিল পরশুরাম॥

বীরভূম জেলার কান্দারার নিকটে "দাস কল গ্রাম" "চোর কল গ্রাম" নামে দুইখানি গ্রাম আছে। "দ্বাদশ কল্য" কি এমনি "কল" শব্দান্ত বার সংখ্যক কোনো গ্রাম? কেহ দ্বাদশ কল্যের সন্ধান দিলে বাধিত হইব। মাধব সংগীতের ভণিতায় মনোহর দাসের নাম আছে—

"পরশুরামের রহু গুরু পদে আশ।
দেহ পদতল ছায়া মনোহর দাস"॥

অন্যত্র—

"তুমি সে করুণা সিন্ধু অনাথজনায় বন্ধু
মোরা সভে চরণ কিঙ্করি।
খণ্ডিঞা সকল মায়া মনোহর দাসে দয়া
কর কৃষ্ণ না কর চাতুরী॥
অনুজ কিশোর দাস তার পুর অভিলাস
কৃপাকর বৃন্দাবন দাসে।
মাধবদাসের মনে বিলসই অনুক্ষণে
প্রিয়ার্জিত পরিণত বেশে"॥

নিজ পরিচয়ে কবি বলিতেছেন—

"* * * * *
* * * *
চম্পক নগরী গ্রাম তাহাতে নিবাস ধাম
নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥
লোক নাথ হরি রায় তৎসুত সুবুদ্ধি রায়
তার পুত্র শ্রীমধু সূদন।
দ্বিজ কুলে জন্ম পাইঞা তাহার নন্দন হইঞা
বিরচিল কৃষ্ণের কীর্ত্তন॥

চম্পক নগরী তো অনেক জেলাতেই আছে, কবির জন্মভূমি কোন্ চম্পক নগরী, কেহ জানেন কি?

মাধব সংগীতে মাঝে মাঝে কবির স্বরচিত কতকগুলি পদ আছে, এ গুলির উপরে কীর্ত্তন গানের অনুকরণে রাগ রাগিণী লেখা আছে। একটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

রাগ গৌরি গান্ধার
ধনি ধনি রাধে অজীবনি।
লাখ লখিমি নবলীলা লোভন
ব্রজ রমনিগণ মুকুট মণি॥
চিত্রিত চারু চরণে মণি মঞ্জীর
ঝুনুর ঝুনুর ঝুনু বাজ রসাল।
প্রতি পদ গতি রতিপতি মতি মোহিত
নখমণি উদিত বিধুকর মাল॥
পদতল অমল কমল দল কোমল
ফুয়ল থল জলজা বলি বলিয়া।
ধরনি বিভুসন আকুল চিহ্নগণ
অলিকুল বৈঠল ভুলিয়া॥
সৌভগ যদমণি কিঙ্কিনি ভাসিনি
কিনি কিনি কামিনি কাহ্নু সনে।
পরসুরাম কহ ভুবন চতুর্দ্দস
পদ নিরজ রজ লেস পণে॥ (১)

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(১) বিপ্র পরশুরামের "মাধব সংগীত" পুঁথি খানি বীরভূম—বাতিকারের অন্যতম জমিদার স্নেহভাজন সুহৃদ শ্রীযুক্ত শশধর ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে আছে। পুঁথিখানি ব্যবহার করিতে দিয়া তিনি আমাদের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। আমি উদ্ধৃত অংশে পুঁথির বানান বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। (লেখক)

দশচক্র

(৬)

নিশি তাহার এক সহপাঠীর বাসায় পড়িতে যাইত, এবং প্রায়ই অনেক রাত্রি করিয়া বাড়ী ফিরিত। এরকম সময়ে তাহার টেবিলের নীচে ভাত চাপা দেওয়া থাকিত,—শুক্‌না ভাত, ও তাহাতে বাটী বাটী তরকারী গেঁথা। নিশি আসিয়া নিজের ঘরে আলো জ্বালিত, এবং ভাত টানিয়া লইয়া আহার করিত। এ ব্যবস্থা গৌরীর ভাল লাগিল না। সে নিশির ভাত উনানে চড়াইয়া রাখিত। নিশি আসিলে তাহার খাবার সাজাইয়া দিয়া অন্তরালে বসিয়া থাকিত, এবং সে আহার করিয়া উঠিয়া গেলে, বাসন মাজিয়া, ঘর ধুইয়া নিজে শয়ন করিত। গৌরীর সহিত নিশির দেখা হইত না। সে একা বসিয়াই আহার করিত এবং এই সময়ে এই সুষুপ্ত পুরীর মধ্যে চিরজাগ্রতা কোন এক অদৃশ্য স্নেহশীলার সেবানিপুণ হস্তের স্পর্শানুভূতি তাহার চখের পাতা ভারি করিয়া আনিত।

গল্প জমিতেছে? সেবানিপুণ বাহুলতা ভাতের থালাতেই নিঃশেষিত না হইয়া এক সময়ে নিশির গলা বাহিয়া উঠিবে সন্দেহ হয়? আমাদের মনেও এইরূপ সন্দেহ হইতেছে। তবে শশীর কাছে এ সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কাজ নাই। করিলে সে কতকগুলা ঘটনা পর পর সাজাইয়া গজকাটি দিয়া মাপিয়া দেখাইবে যে, তাহার উপর গৌরীর পক্ষপাত নিশির অপেক্ষা কম নহে। এমন কি এ বাড়ীর আরও অনেকের উপর তার সমান মাত্রায় পক্ষপাত আছে।

একদিন শশী নিজের বিছানা করিয়া লইতেছিল। সেদিন তাহার শরীরটাও ভাল ছিল না। যা' তা' করিয়া বিছানা পাতিয়া লইতেছিল। এমন সময়ে গৌরী ঘরে ঢুকিয়া বলিল "সর, আমি বিছানা ক'রে দিই।" পরের সেবা লওয়া শশীর অভ্যাস নয়। সে কিছুতেই সরিতে চাহিল না। তখন গৌরী হাত ধরিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া বিছানা করিয়া দিল। সেদিন হইতে সে বুঝিয়াছে, গৌরী দেবী। আসক্তি অনাসক্তির বশীভূত সাধারণ নারী কি এমনি করিয়া তাহার মত একজন যুবককে স্পর্শ করিতে পারিত?

গৌরীর দেবীত্ব বুঝাইবার জন্য শশী সর্ব্বদা প্রস্তুত। বুঝাইবার কয়েকটা ভাল উপায়ও তাহার জানা ছিল। সে বলিত এসব ব্যাপারে মুখের যুক্তি যাহার কানে প্রবেশ না করে, তাহাকে মুঠা মুঠা যুক্তি দিতে হয় নাক ও মুখের ভিতর দিয়া, এবং এক আউন্স যুক্তির স্থান করিতে নাক দিয়া চার আউন্স রক্ত বাহির করিতে হয়।

(৭)

নিশি মেডিকেল কলেজে পড়িত। কিন্তু সহপাঠীদের চেয়ে বেশী মিশিত সরোজের সহিত। সরোজ তাহার বাল্য সঙ্গী, দুইজনে একই স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া, একই

কলেজে বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। সরোজের পিতামাতা নিশিকে সন্তানের মত দেখিতেন এবং সেও তাঁহাদের নিতান্ত আপনার জন বলিয়া জানিত, এবং কাকাবাবু ও খুড়িমা বলিয়া ডাকিত। নিজের সুখদুঃখের কথা, যাহা সে সরোজের কাছেও গোপন করিত, তাহা এই খুড়িমার কাছে প্রকাশ না করিয়া সে বাঁচিত না। এইরূপ নানাদিক হইতে বাঁধিয়া সরোজ তাহার বন্ধু। নতুবা, এক প্রচলিত হিন্দুয়ানীর প্রতি বিদ্বেষ ছাড়া আর কোথাও দুইজনের মিল ছিল না। সরোজ যেখানে মানিবার জন্য উন্মুখ, নিশি সেখানে উড়াইতে পারিলে কৃতার্থ হয়। সরোজের ভাল লাগিত sermon. sermonএর নামে নিশি ক্ষেপিয়া যাইত। সরোজ ব্রাহ্মধর্ম্মে ভক্তিমান, নিশি ধর্ম্মমাত্রকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছে। নিশি অনেকদিন সরোজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছে, এবং ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত ও বক্তৃতা শুনিয়া অশ্রুমোচন করিয়াছে। নিশি কাছে থাকিলে সরোজ উপাসনায় যোগ দিতে পারিত না। বন্ধুর মুখে কখন কি ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে, তন্ন তন্ন করিয়া ইহা লক্ষ্য করিতেই তাহার সময় কাটিত, এবং নিশির চ'খ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিলে জয়গর্ব্বে তাহার বুক ভরিয়া উঠিত। সে অনেকবার নিশিকে বলিয়াছে "ব্রাহ্মসমাজের ডাক তোমার কানে বাজ্‌ছে। আর আত্মপ্রবঞ্চনা ক'রে লাভ কি নিশি? অনেকদূর ত এগিয়েছ। আর একটু এগিয়ে পড়।"

বন্ধুকে আর একটু অগ্রসর হইতে বলিত বটে, নিজে কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই,—আজিও দীক্ষা লয় নাই। জীবনের এতবড় একটা পরিবর্ত্তন পিতামাতার অজ্ঞাতসারে হয় ইহা সে ইচ্ছা করিত না। এইখানেই বিলম্বের কারণ ছিল।

সরোজের পিতা ভূপতি সংসারের খুঁটিনাটিতে বড় থাকিতেন না। তিনি লোকের সহিত কম মিশিতেন। ছেলের সহিত আরও কম মিশিতেন। ইহার কারণ, তিনি যে লোকে বিহার করিতেন সেখানে সরোজকে কল্পনাতেও সঙ্গে লইতে পারিতেন না।

ভূপতি রাগিবার বা গর্জ্জন করিবার লোক নহেন। কিন্তু তাঁহার অল্পকথা ও সহজ চাহনির মধ্যে তুহিনকণার গিরিবিদারণ শক্তি ছিল। সেই চাহনির সম্মুখে নিজের সঙ্কল্পের জয়ধ্বজা বহন করিয়া দাঁড়াইবার সাহস সরোজের ছিল না।

কেবল একজনের কাছে ভূপতি মন খুলিয়া কথা কহিতেন,—নিশি। নিশি মাঝে থাকিলে তাঁহাকে এত দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া মনে হইত না। তাই সরোজের ইচ্ছা ছিল পিতার নিকট দীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার সময় সে নিশিকে সঙ্গে রাখিবে। নিশিকে এই অর্থে নিমন্ত্রণ করিয়াও রাখিয়াছিল। সে কিন্তু সময়মত আসিয়া পৌঁছিল না।

ভূপতি ইজিচেয়ারে বসিয়া বই পড়িতেছিলেন। সরোজ একখানি চেয়ার টানিয়া পার্শ্বে বসিয়াই বলিল "বাবা, আপনার সঙ্গে একটু কথা কইতে চাই।"

ভূপতি মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "বল।"

সরোজ। দেখুন, আমি বড় হয়েছি।

ভূপতি। দেখ্‌তে হবে না। 'Tis no news to me.

সরোজ। আমার এখন নিজের পথ বেছে নেবার সময় এসেছে।

ভূপতি। Rather late। অনেকদিন আগেই পথ বাছা উচিত ছিল।

সরোজ। আমি দেখ্‌ছি, এতদিন যে পথে চল্‌ছিলুম তা ঠিক নয়। আমার গন্তব্য অন্য দিকে।

ভূপতি। ভাল কথা।

সরোজ। আমি ইচ্ছা করচি, ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ কর্‌বো।

এবার ভূপতি বই বন্ধ করিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। বলিলেন "ব্যাপারটা ভাল বুঝলুম না। ব্রাহ্মধর্ম্মে তোমার বিশ্বাস হয়েছে? তোমার মনে হয়েছে, ঈশ্বর এক, পঞ্চাশটা নয়, তাঁর হাত পা আছে, কিন্তু আকার নেই; থিয়েটার দেখ্‌তে নেই; এই রকম গোটাকত জিনিসে তোমার বিশ্বাস হয়েছে?"

সরোজ। হাঁ তাই। আপনি অশ্রদ্ধা করে কথা কইচেন কেন?

ভূপতি। হু—ম্! ব্রাহ্মধর্ম্মে তোমার বিশ্বাস হয়েছে, এই কথাটা বিজ্ঞাপন দিয়ে লোককে জানাতে চাও?

সরোজ। জানাতে হবে বৈ কি।

ভূপতি। লোকের যা যা মত, তা ত পাশের লোক অমনিই জান্‌তে পারে। বিজ্ঞাপন দোবার ত কৈ দরকার হয় না।

সরোজ। একটা নতুন ধর্ম্মমত—

ভূপতি। I beg your pardon. এটা সাধারণ মত নয়, ধর্ম্মমত,—তাই একটু আড়ম্বর কর্‌তে হবে।

সরোজ। আড়ম্বর করা আমার উদ্দেশ্য নয়। নতুন ধর্ম্মমতে আমাকে দীক্ষা নিতে হবে।

ভূপতি। অর্থাৎ আজ তুমি যা বিশ্বাস কর্‌চো, আমরণ তাই বিশ্বাস কর্‌বে, এইরকম একটা লেখাপড়া ক'রে দিতে হবে।

সরোজ। লেখাপড়া নয়। আমার এই এই মত, একথা আমাকে বল্‌তে হবে।

ভূপতি। আর imply কর্‌তে হবে যে, সেই সেই মত চিরকাল অটুট রাখবে।—হাঁ, একটা কথা, তোমার যা যা মত ব'লে লিখে দেবে সেগুলো নিজের মন থেকে বল্‌বে, না তাঁদের ছাপা form থেকে?

সরোজ। তাঁদের কোন ছাপা form নেই।

ভূপতি। তুমি দেখ্‌লে তাঁদের মতামতের যে একটা অব্যক্ত list আছে তাঁর সঙ্গে তোমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে।

সরোজ। হাঁ।

ভূপতি। Strange, isn't it ? তোমার ও-দলের খবর ঠিক জানি না। তবে ও-দলের বাইরে দুটীলোকের ঠিক একমত দেখিছি বলে মনে হয় না।

শ্লেষের কুশাঙ্কুরে পদে পদে ব্যাহত হইয়া সরোজ আর তর্ক চালাইতে চাহিল না। বলিল "আমি এ দিয়ে আর আলোচনা কর্‌তে চাই না। আমি শুধু ইচ্ছা করি আমার দীক্ষা নোয়ায় আপনার আপত্তি না থাকে।"

ভূপতি। আপত্তি! দাঁড়াও! তোমার কাজে আপত্তি করবার আমার অধিকার নেই, কারণ তুমি বড় হয়েছ। তবে দুটো কথা জান্‌তে ইচ্ছা করে,—এ দীক্ষা নিলে কারুর মাথা ফাটাতে হবে না ত ?

সরোজ। একটা ধর্ম্ম সম্বন্ধে—

ভূপতি। মাথা ফাটান ধর্ম্মের অঙ্গ ব'লেই বল্‌ছি।—আর,—মুখের ভাত ফেলে দিয়ে শুকিয়ে মর্‌তে হবে না ত ? অনেক ধর্ম্মে তাই কর্‌তে হয়।

সরোজ। না।

ভূপতি। তা হ'লে দীক্ষা নাও, by all means, and be damned,—and welcome.

এতক্ষণ পরে নিশি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই ভূপতি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন "নাঃ, তোমরা আর আমায় পড়্‌তে দিলে না।"

নিশি। কেন আপনি পড়ুন না।

ভূপতি। আর হয় না। সরোজ দীক্ষা নেবে বল্‌চে।

নিশি। তাতে কি ?

ভূপতি। তাতে কি! ওর মনে ধর্ম্মভাব এসেছে। একটা নতুন ধর্ম্ম প্রায় আসে একটা form নিয়ে। একটা তিলফুল নাসা বা ঐ রকম একটা কিছুর through দিয়ে। তাই আমি না গেলে তোমাদের আলোচনাটা জম্‌বে না।

তারপর বাহিরে যাইতে যাইতে বলিলেন "I mean, ধর্ম্মালোচনা।"

ভূপতি চলিয়া যাইতেই সরোজ অভিযোগের সুরে বলিল, "বাস্তবিক, বাবা ভয়ানক, এ—ম্,—blasphemous কথাবার্ত্তা ক'ন।"

যাহার কাছে অভিযোগ করা হইল, সে ব্যক্তিটী সুবিচারের কোন বন্দোবস্ত না করিয়া প্রশ্ন করিলেন "খুড়িমা কোথায় ?"

(৮)

ভূপতির স্ত্রী প্রতিভা সুন্দরী ধনীর কন্যা, এবং সেকালের ইস্কুলে পড়া মেয়ে। দেমাকে ইহার মাটীতে পা পড়িবে না, এমনি অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা গেল যাহাকে তাঁহারা শূন্যগর্ভ, স্ফীত, গর্ব্বিত রবারের বেলুন মনে করিয়াছিলেন, আসলে তাহা তরমুজ। নিজের সরস সারবত্তার ভারে তাহা আপনি নত হইয়া মাটীতে লুটাইতেছে। তাহার মধ্যে দেমাকের Coal gasএর অবকাশও নাই, প্রভাবও নাই।

সরোজ তাঁহার একমাত্র সন্তান। ইহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াও তিনি পরিপূর্ণরূপে লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতেন। সে আজ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতেছে। কাল হয়ত তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, এই চিন্তা তাঁহাকে আকুল করিয়াছিল।

নিশির সহিত তাঁহার পরিচয় সরোজের মধ্যস্থতায়। প্রথম যেদিন তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় সে তাঁহার হৃদয়-উপকূলে আসিয়া পৌঁছে, সেদিনকার কথা তাঁহার বেশ মনে আছে। সে ত বেশীদিনের কথা নয়। এই অল্পদিনের মধ্যেই এই সরল, সপ্রতিভ যুবা শতবন্ধনে তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। কিন্তু যে তরঙ্গ ইহাকে বহিয়া আনিল তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল কৈ ? সে যে ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছে।

আজ সরোজ পিতার সহিত একটা বোঝাপাড়া করিতে গিয়াছে। কি ফল হইল জানিবার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় নিশি ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল "খুড়িমা, তোমার সরোজ এতদিনে ধর্ম্মের একটা নতুন আকার খুঁজে পেয়েছে।"

সরোজ পিছনেই ছিল। সে চটিয়া গেল। বলিল "ফের সেই কথা !"

নিশি বলিল "আচ্ছা আর ওকথা প্রকাশ কর্‌বোনা।" তারপর অপ্রাসঙ্গিকভাবে প্রশ্ন করিল "আচ্ছা, খুড়িমা, তুমি বল, যদি বে' কর্‌তেই হয় ত কি রকম মেয়ে বে' করা উচিত ?"

প্রতিভা। কেন, তুই বে' কচ্চিস্‌ নাকি ?

নিশি। না, আমি কর্‌তে যাব কেন ? তবে সরোজ শীগ্‌গির কর্‌বে। ওকে একটা উপদেশ দাও পাত্রী বাছতে গেলে কোন গুণটার দিকে নজর রাখা উচিত। ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মীর পক্ষে কোন গুণটী বিশেষ দরকারী।

প্রতিভার মনে ভয় ছিল সরোজ অবিলম্বে একটী শিক্ষিতা ব্রাহ্মমহিলা বিবাহ করিয়া বিপন্ন হইবে। নিজে কিছু কিছু শিক্ষালাভ করিলেও, শিক্ষিত মেয়েদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার তাঁহার মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। সেকালকার অনেক বড় বড় লোকদের মত তিনিও মাঝে মাঝে মনে করিতেন,

"স্ত্রী'রা যদি জেনে ফেলে অকস্মাৎ ;
যে পৃথিবীটা জোরে
ভোঁ ভোঁ ক'রে ঘোরে,—
* * *
কিংবা যদি জানে তারা পাঁচ আর দুয়ে সাত,
তা হলে কি ভাব তারা রেঁধে দিবে ভাত ?"

তাই একেবারে উল্টা দিকে ঝুঁকিয়া বলিলেন, "আমার মনে হয়, খুব খাট্‌তে পারাই সকলের চেয়ে বড় গুণ।

নিশি একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বলিল, "ঠিক বলেছ, খুড়িমা। আমারও ঐ মত।"

প্রতিভা। সে কি কথা রে! তোর ত এ মত ছিল না।

নিশি। ছিল না। কিন্তু একবার ভেবে দেখ, এই যত সংসার নষ্ট হয়, তা অজ্ঞতার ফলে তত নয়, যত আলস্যের ফলে। 'ছেলেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ্‌তে হয়'—এ জ্ঞান থাক্‌লেই অলস মা তা কর্‌তে পারেন না। কিন্তু যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম কর্‌তে পারেন তিনি তাঁর ছেলেদের পরিষ্কার রাখ্‌বেন,—নিজে মূর্খ হ'লেও, পাঁচজনের কথা শুনে।

প্রতিভা। পাঁচজনের কথা শুন্‌বে কেন? তার হয়ত বিশ্বাস গা মোছালে ছেলেদের ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।

নিশি। তা, বোঝালে বুঝবে না?

প্রতিভা। বোঝালে যে বোঝে, সে আর মুর্খ থাকৃতে পারে কত দিন?

সরোজ হঠাৎ বলিয়া উঠিল "নিশি, এবার আমার সন্দেহ কর্‌বার পালা।"

সরোজের কথায় নিশি কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া গেল। শেষে হাসিয়া বলিল, "বেশ ত, সন্দেহ কর না।"

প্রতিভা একবার সরোজ ও একবার নিশির দিকে চাহিলেন। বলিলেন "না, নিশি, তোর কথা আমার ভাল লাগ্‌লো না। আমরা মেয়ে মানুষ যা' তা' বল্‌তে পারি। তা ব'লে তোরাও বল্‌বি? তুই সংসারের যে কাজের কথা বল্‌চিস একটা ছ'টাকা মাইনের কুলি দিয়ে সে কাজ করান যায়। বাসন মাজাবার জন্যেই কি লোকে বিয়ে করে?—তোদের মত শিক্ষিত হয়ে?"

নিশি কোন উত্তর দিল না। হয়ত সকল কথা সে ভাল করিয়া শুনে নাই।

প্রতিভা বলিলেন "বাড়ীতে সত্যনারায়ণের সিন্নি আছে, খাবি?"

ইহাতে সরোজ ঘোরতর আপত্তি করিল। নিশি কিন্তু তাহার সহিত যোগ দিল না।

সে বলিল "আমার অত সহজে জাত যায় না, খুড়িমা। তুমি যা ইচ্ছে হয় দিতে পার। খেতে ভাল হ'লেই খাব। তবে বেশী দিও না, সরোজ কষ্ট পাবে।"

তারপর সরোজকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "বাস্তবিক, সিন্নিটা বড় good conductor of পৌত্তলিকত্বা';—moisture বেশী কি না।"

নিশির এই ব্যবহারে সরোজ একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধনবিহারী মুখোপাধ্যায়

গান

(পুরীতে 'স্বর্গদ্বারে' লিখিত)

যে আছে তোর ঘরের ভিতর
বাইরে তারে মিথ্যে খোঁজা,—
সকল কথা বুঝিস্ কেবল
সেই কথাটি যায় না বোঝা।

মধুর নেশায় মাতোয়ারা
রইলি বিবেক-বিচার-হারা,—
(তোরে) ক্ষ্যাপায় রে ভাই ঝুটা বড়াই,
জ্ঞানের গরব, মানের বোঝা।

বেড়াস্ বটে মানুষ-বেশে।
কি দশা তোর ঘট্‌ল শেষে,—
ছুট্‌লো না ঘোর, খুললো না তোর
নিদ্-মহলের বা'র দরজা।

আয়নাতে তোর ময়লা যে ভাই
আসল ছবি দেখ্‌লিনে তাই;
ফুট্‌লি'নেতো ফুলের মতো,
পাপ্‌ড়িগুলো রইল বোজা।

শেষ জোয়ারের ইসারাতে,
পারাপারের সীমানাতে
(ওযে) ধুসর-আলোয় হারিয়ে গেল
তোর আকাশের নীল-ফিরোজা।

শোন্ আরতি গগন-কোলে
বাজে সাঁঝের শঙ্খ-রোলে,—
সৃষ্টি-প্রলয় যাঁহার লীলায়
ধর্ এসে তাঁর অভয়-ধ্বজা।

ওঠ্ সাধনার স্তরে স্তরে
মহৎ হ'তে মহত্তরে,
(তখন) এক বিনা তুই দেখ্‌বি না দুই
মৃত্যু-হরণ অমৃত-যা'।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

বাট্টার হার

কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত গভর্ণমেণ্ট মুদ্রা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য কয়েকর্জন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের অভিমত অনুসারে ভারতীয় রূপার টাকা যাহাতে বিলাতী ১ শিলিং ৬ পেনির সহিত সমান বলিয়া পরিগণিত এবং প্রচলিত থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য রাজপুরুষেরা উদ্যোগী হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে দুইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের একটি ১৲=১ শিলিং ৬ পেনির পক্ষপাতী; অপরটি ১৲=১ শিলিং ৪ পেনির পাক্ষপাতী।

(১) ১৲=১ শিলিং ৬ পেনি হইলে তাহার ফলাফল নিম্নলিখিতভাবে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে :—

ক। ভারতবর্ষের যে সকল শিল্পের সহিত বিলাতী শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে—তাহাদের ক্ষতি হইবে।

ধরা যাউক একবস্তা বিলাতী কাপড় তৈয়ারি করিয়া এ দেশে পাঠাইতে হইলে ন্যায্য লাভ সমেত বিলাতী ধনীর প্রাপ্য ১০০ পাউণ্ড।

যখন ১৲=১ শিলিং ৪ পেনি, তখন ঐ কাপড়ের বস্তা ভারতের বাজারে ১৫০০৲ টাকায় বিক্রয় না করিলে সেই ধনী ১০০ পাউণ্ড পাইবে না। কেননা ১শিলিং ৪ পেনি =১৲; সুতরাং ১০০ পাউণ্ড=১৫০০৲ টাকা।

কিন্তু ১৲=১ শিলিং ৬ পেনি হইলে ঐ কাপড় এ দেশে ১৩৩৩⅓ টাকায় বিক্রয় করিলেও বিলাতী ধনী ১০০ পাউণ্ড পাইবে। কেননা ১ পাউণ্ড=১৩⅓ টাকা।

বিলাতী কাপড়ের দাম এ দেশে কমিয়া যাওয়াতে তাহার সঙ্গে বোম্বাই মিলের যে সকল কাপড় প্রতিযোগিতা করিতেছে তাহাদের দামও কমাইতে হইবে।

খ। এ দেশ হইতে যে সকল দ্রব্য বিলাতে চালান যায়, তাহাদের প্রস্তুতকারিগণের লোকসান হইবে।

১ টন্ পাট=১০০ পাউণ্ড=১৫০০৲ (যখন ১ পাউণ্ড=১৫৲ অথবা ১ শিঃ ৪ পেনি=১৲)

১ টন্ পাট=১০০ পাউণ্ড= ১৩৩৩⅓ টাকা (যখন ১ পাউণ্ড=১৩⅓ টাকা অথবা ১ শিলিং ৬ পেনি=১৲)

গ। ভারতবাসী পণ্য-ক্রেতারা লাভবান হইবে।

বিলাতী দ্রব্য তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে পাইবে এবং দেশীয় যে সকল দ্রব্য বিলাতে চালান যায়—তাহাদের মূল্যও সুলভ হইবে। যে সকল দেশীয় দ্রব্য চালান যায় না, তাহাদের মূল্য পূর্ব্বের মতই থাকিবে সুতরাং মোটের উপর তাহাদের সুবিধাই হইবে।

ঘ। যে সকল ভারতবাসী চাকরি বা মজুরী করে, তাহাদের সুবিধা হইবে। জমিদার, কুসীদজীবী এবং অন্যান্য প্রকার বৃত্তি ভোগীগণেরও সুবিধা হইবে। তাহাদের আয়ের যে টাকা, তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভোগায়ত্ত করিতে পারিবে।

ঙ। ভারত প্রবাসী ইংরাজ বণিক, রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি এবং যাঁহাদের বিলাতে টাকা পাঠাইতে হয় তাঁহাদের সুবিধা হইবে। ১০০ পাউণ্ড পাঠাইতে পূর্ব্বে (১৲ = ১ শিঃ ৪ পেনি হারে) তাঁহাদের ১৫০০৲ খরচ হইত, এখন (১৲ = ১ শিঃ ৬ পেনি হারে) ১৩৩৩⅓ টাকা খরচ হইবে।

চ। ভারতীয় রাজস্ব-ভাণ্ডারের লাভ হইবে।

হোমচার্জ্জ—২ কোটি পাউণ্ড = ৩০কোটি (১৲ = ১শিঃ ৪পেনি হারে) = প্রায় ২৬,৬৬ কোটি (১৲ = ১ শিঃ ৬ পেনি হারে)। সুতরাং রাজস্ব ভাণ্ডারে ৩ কোটির উপর টাকার সাশ্রয় হইবে।

(২) ১৲ = ১ শিঃ ৪ পেনি হইলে তাহার ফলাফল উপরে যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার বিপরীত ভাবে কার্য্য করিবে। অর্থাৎ

ক। বোম্বাই মিলের কাপড়ের পক্ষে ভারতের বাজারে বিলাতী কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতায় সুবিধা হইবে। বিলাতী কাপড়ের দাম চড়িয়া যাইবে এবং দেশী কাপড় বিক্রয় হইবে। ১০০ পাউণ্ডের কাপড় যাহা ১৩৩৩⅓ টাকায় বিক্রয় করা যাইতে পারিত তাহা এখন ১৫০০৲ টাকার কমে বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না।

খ। এ দেশের যে সকল জিনিষ বিলাতে চালান যায় তাহাদের দাম টাকার মাপে চড়িয়া যাইবে।

১ টন পাট = ১০০ পাউণ্ড = ১৫০০৲ (১ শিঃ ৬ পেনি হার হইলে উহার মূল্য হইবে ১৩৩৩⅓ টাকা।)

গ। যাহারা দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ব্যবহার করে তাহাদের ক্ষতি হইবে। বিলাতী দ্রব্যের মূল্য চড়িয়া যাইবে এবং এ দেশ হইতে যে সকল দ্রব্য বিলাতে চালান যায়, তাহাদেরও দাম চড়িয়া যাইবে।

ঘ। বৃত্তিভোগী সকল প্রকার লোকেরই অসুবিধা হইবে। তাহাদের আয়ের যে টাকা তাহার বদলে এখন তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণ সামগ্রী ভোগায়ত্ত করিতে পারিবে।

ঙ। যাহাদের বিলাতে টাকা পাঠাইতে হয় তাহাদের অসুবিধা হইবে। এক্ষণে ১০০ পাউণ্ড পাঠাইতে ১৫০০৲ লাগিয়া যাইবে। পূর্ব্বে ১৩৩৩⅓ টাকা দিলেই হইত।

চ। ভারতের রাজস্ব ভাণ্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

২ কোটি পাউণ্ড হোমচার্জ্জের জন্য এখন ৩০ কোটি টাকা পাঠাইতে হইবে; পূর্ব্বে প্রায় ২৬,৬৬ কোটি পাঠাইলেই হয়ত।

মোটের উপর বলিতে হইলে বলা যায় যে ১ শিঃ ৬ পেনি হারের চেয়ে ১ শিঃ ৪ পেনি হারই ভাল। কেন না তাহাতে অধিকাংশ ভারতবাসীর (কৃষক প্রভৃতির) লাভ আছে।

তবে এই ফলাফল সাময়িক মাত্র।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

রাধা

মানময়ী রাধা! শুধু তোমারই নামে
বাজিয়াছে চিরদিন শ্যামের বাঁশরী
মোহন মধুর রবে। 'শ্যাম সোহাগিনী'
এ নাম তোমারই একা। প্রিয়ের সোহাগে
গৌরবের উচ্চ চূড়া লভেছিলে তুমি
কোন্ সে বিস্মৃত যুগে। কলঙ্কের রেখা
ও বরললাটে হল খ্যাতির চন্দন!
সেই যুগ হতে আজ এতকাল পরে
চেয়ে দেখি প্রেমিকার শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে
রয়েছ অটল তুমি। আজও তাই শুনি
শ্যামের বাঁশির মত তব নামে সাধা
কত গান, কত গাথা, কত পদাবলী।
কত কবি-মনে তুমি বিছায়ে রেখেছ
তোমার আসন স্থির। কত প্রেমিকের
হৃদয় করেছ জয়।—আমি আজ ভাবি
তোমার যে সিংহাসন, তোমার গৌরব,
প্রাপ্য সে কি গরবিনি, একা তোমারই?
কেহ কি বাসে নি ভাল তোমার মতন?
কেহ কি নেয় নি তুলে কলঙ্ক-পসরা
চিরদিন তরে নিজ মাথার উপর
প্রণয়ীর নামে? কেহ দয়িতের তরে
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বিসর্জ্জন দিয়া
ডোবে নাই আত্মত্যাগ-মন্দাকিনী নীরে?
থাকুক্ অন্যের কথা,—তোমারই সঙ্গিনী
ছিল না কি গোপী কেহ কৃষ্ণ-অন্ত-প্রাণ
তোমারই মতন,—কিংবা তোমার অধিক?
ছিল,—জানি ধ্রুবসত্য,—তবুও তাদের
দেখেনি কেহই চেয়ে; তাদের সে প্রেম
বিস্মৃতির অতলেতে ডুবে গেছে আজি।
এ কি শুধু ভাগ্য-লেখা? অদৃষ্টের খেলা?
সমান প্রেমের দাম হল না সমান!
দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিই অদৃষ্টের দোষ,
দূষি কবিজনে,—ভাবি তাহাদেরই ভুলে
কাব্যে উপেক্ষিতা শত প্রেমময়ী নারী।
নয় তাহা বুঝিয়াছি। অভাগিনী তারা
কাব্যে কেন পায় নাই স্থান, কেন শত
প্রেমিকের প্রেম-গান-স্তুতি-বন্দনায়
হয় নাই মহিয়সী তারা,—বুঝিয়াছি।
তারা যে বেসেছে ভাল আপনার মনে,—
প্রেমের সোহাগমাখা মালাগুলি লয়ে
উপহার দিয়াছে যে দেবতা চরণে,—
পরিবর্ত্তে পায় নি ত প্রিয়-কণ্ঠ-মালা,
যে মালা গলায় দিলে চিনিবে ভুবন।
তাহাদের নাম ধরে আদরে সোহাগে
ডাকে নি ত বাঁশি! তাই ভুলেছি তাদের।
আপন প্রেমের গুণে লভ নাই খ্যাতি
হে মানিনী রাধা! তুমি চির-গরবিনী
প্রিয়ের প্রেমের গর্ব্বে। শ্যামের সোহাগ
সাজায়েছে তব দেহ রাজরাণী বেশে।
তারই প্রেম রচিয়াছে সিংহাসন নব
বসাতে তোমায়। তার আকুল আহ্বান
দিশি দিশি ছড়ায়েছে মিষ্ট তব নাম।
বল্লভের প্রীতি বিনা মানময়ী রাধা
ব্যর্থ হয়ে যেত তব পরিপূর্ণ প্রেম।
বাঞ্ছিত দেবতা বুকে লভিয়াছ ঠাঁই
সেই অভিমানে তুমি রাধা গরবিনী।

শ্রীসুনীতি দেবী

তৃপ্তিঃ

(২১)

অনেক দেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া শিশির বোম্বাই আসিয়া উঠিয়াছিল।

বোম্বাই স্থানটা তার বরাবরই খুব ভাল লাগিত। এবার আসিয়া সে এখানে একদম জমিয়া গেল। সমুদ্রতীরে বহুদূরে সে বেড়াইত। সম্মুখে বীচি-বিক্ষুব্ধ সাগরের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, চাহিয়া চাহিয়া তার আশ মিটিত না। সাগরের বিক্ষুব্ধ বক্ষের ভিতর সে নিজের অশান্ত হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইত।

মানুষ জন্মিয়াছিল পৌত্তলিক হইয়া। তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল সকল জিনিষের ভিতর মানবের মত প্রাণের আরোপ করা। তাই আদিম মানবের কাছে, আকাশ বাতাস মেঘ পর্ব্বত গাছ পাতা ফুল সবই সজীব আত্মময় হইয়া প্রতিভাত হইত। আজ মানুষ জ্ঞান লাভ করিয়াছে—পাহাড় তার কাছে মৃত প্রস্তর, মেঘ শুধু বারিবিন্দু, গ্রহগুলি মরা পৃথিবী, বিদ্যুৎ তার পাখা-কুলী। প্রাচীন কালের মানবের চক্ষে বিশ্বের সব জিনিষের উপর যে একটা অপূর্ব্ব কাব্যের ছাপ থাকিত তাহা খসিয়া পড়িয়া সত্যের নগ্ন হাড় কখানা গিজ্ গিজ্ করিতেছে। তাই সেকালের মানুষ যেখানে গাছ দেখিলেই তার ভিতরকার দেব বা দৈত্যকে গড় হইয়া প্রণাম করিত, সেখানে আমরা সে গাছের ফল খাইবার যোগ্য কি না, তার কাঠ জ্বালান হইবে, না আসবাবের জন্য ব্যবহার করা যায় তার হিসাব করিতে বসি। জ্ঞানের তীব্র আলোকের সামনে দেবতা ও দানব পলায়ন করিয়া শিশুর মনোরাজ্যে সঙ্কীর্ণ আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

কিন্তু আজও দুই একটি জিনিস এমন আছে যার সামনে দাঁড়াইয়া মানুষের এই প্রচণ্ড বুদ্ধি হার মানিয়া পলায়ন করে, আপনার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সে মানবের সেই শৈশবকালে ফিরিয়া যায়। বিস্তীর্ণ অপার সাগরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে তার তরঙ্গ বিক্ষোভের ভিতর একটা বিশাল আত্মার স্পর্শ অনুভব না করে এমন বস্তুতান্ত্রিক এই বিংশ শতাব্দীতেও দুর্লভ।

শিশির ধর্ম্মাচার যথেষ্ট করিত, কিন্তু দেব দৈত্যে যে খুব বিশ্বাস করিত এমন নয়। সে মনের তলাটা খুব নাড়িয়া দেখিত না, তাই তার বিশ্বাস ও আচারের ভিতর পরস্পর বিরুদ্ধ বহু ভাব অনায়াসে পাশাপাশি বাস করিত। ইংরাজী খানা সে খায় না, কিন্তু খাওয়ায় কোনও গুরুতর দোষও দেখে না। মাটীর শিব গড়িয়া সে রোজ পূজা করে অথচ স্বয়ং শিবকেও স্থলবিশেষে সে অনায়াসে অস্বীকার করে। সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই সে প্রণাম করে, অথচ তাদের ক্লাবে বসিয়া এই licensed vagrancyর বিরুদ্ধে অজস্র বক্তৃতা করে।

এক কথায় শিশির একদিকে সম্পূর্ণ আধুনিক এবং আর এক দিকে সে সম্পূর্ণ সেকেলে। ইট দেবতা, কাঠ দেবতা, ঘটি দেবতা, বাটী দেবতা, গাছ দেবতা, পাহাড় দেবতা সম্বন্ধে সে উপহাস করিতে ছাড়ে না, অথচ বাড়ীতে ঘেঁটুপূজা হইলেও সে তার আচার নিয়ম ষোল আনা মানিয়া চলে।

সমুদ্রের সামনে বসিয়া শিশিরের মনে যে ভাবের উদয় হইত সেটা মোটেই আধুনিক নয়, সে সেই শাশ্বত পুরাতন ভাব। সমুদ্র তার কাছে ছিল সজীব—একটা বিরাট বৃহৎ আত্মার প্রত্যক্ষ প্রকাশ। সমুদ্রবক্ষের তাণ্ডব নর্ত্তনে এবং তার প্রশান্ত স্নিগ্ধ তরঙ্গের ভিতর সর্ব্বত্রই সে দেখিত একটা বিরাট প্রাণের অনন্ত অশ্রান্ত চঞ্চলতার উচ্ছ্বাস। তটের দিকে চাহিয়া সে দেখিত তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া বেলাকে আক্রমণ করিতেছে—বহুদূর পর্য্যন্ত তাকে অভিভূত করিয়া সে বীচি ক্ষুদ্র বুদ্বুদে পরিণত হইয়া লয়প্রাপ্ত হইতেছে—বিক্ষুব্ধ পরিশ্রান্ত জলরাশি ফিরিয়া যাইতেছে, আবার ফিরিয়া আসিতেছে, নূতন উৎসাহে, নূতন আক্ষোভ লইয়া বিরাট, শক্তিমান হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই পরিণতি লাভ করিতেছে। দিবারাত্রি, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ এই অশ্রান্ত চেষ্টা চলিয়াছে। দূরে চাহিয়া শিশির দেখিত সমুদ্র প্রশান্ত - কে বলিবে তার ভিতর কোনও আক্ষেপ আছে—তার জীবনের প্রান্তদেশে তার এমন অশ্রান্ত চঞ্চলতা—সীমাতটের বিরুদ্ধে সে এমন এক শাশ্বত সংগ্রাম চালাইতেছে।

এ আক্ষোভ, এ জ্বালা এ অশান্তি সাগরের, এ কি কখনও মিটিবে না! শিশিরের অন্তরেও তো এমনি অপরিশ্রান্ত বেদনা অবিরত তার বুকের ভিতর হানা দিতেছে, আঘাতের পর আঘাত পাইয়া সে বিক্ষুব্ধ হইতেছে—শান্তি কি তার মিলিবে না? এক একবার শিশির এই ভাবিয়া শান্তি পাইত যে তার মৃত্যু হইবে—সাগরের মৃত্যু নাই। মরণে তার সকল জ্বালা একদিন জুড়াইবে। কিন্তু জুড়াইবে কি? মনে পড়িল Hamletএর কথা,

> To die, to sleep, perhaps to dream—
> Aye there's the rub.

মরণেই যে সব শেষ একথা কে বলিতে পারে। মরণে এ জীবনের শ্রান্তি শেষ করিলে কে জানে তখনি আবার নূতন উদ্বেগ নূতন বেদনা নূতন ক্লান্তিময় এক অভিনব জীবনের আরম্ভ হইবে না? আমাদের জন্মগত সংস্কার এই যে—আত্মা অবিনাশী দেহ হইতে দেহান্তরে ইহা বিচরণ করে যাবৎ ইহার ভোগের শান্তি না হয়। তাই যদি হয়, তার আত্মার এ দুর্ভোগ কত জীবনে পরিসমাপ্তি লাভ করিবে কে বলিতে পারে। সেও কি এই সাগরের মত অশ্রান্ত অক্লান্ত হইয়া অনাদি অনন্তকাল বিক্ষুব্ধ হইতে থাকিবে?

ভাবিতে তার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত—কিন্তু সাগরের এই অনন্ত বিশাল সীমাশূন্য

বিক্ষোভের সামনে দাঁড়াইয়া একথা চিন্তা করিতে তার অন্তরের জ্বালা অনেকটা নিবৃত্ত হইত। সাগরের এ বিরাট বিস্তীর্ণ যাতনা সে আপনার হৃদয় দিয়া অনুভব করিত—তার পাশে তার ক্ষুদ্র বেদনা সহনীয় বোধ হইত।

একদিন সে এপোলো বন্দরে একটা বেঞ্চে বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিল। তার চক্ষের সম্মুখে বন্দরের জাহাজের ভিড়ের দিকে তার দৃষ্টি ছিল না। একখানা জাহাজ অল্পক্ষণ হইল বন্দরে ভিড়িয়াছে। সোঁ সাঁ ভস্ ভস্ ঘড় ঘড় প্রভৃতি বিচিত্র শব্দসংযোগে এই বিরাট জলদৈত্য তীরে সংলগ্ন হইয়া আপনার উদর হইতে জনসমুদ্র উদ্গার করিবার আয়োজন করিতেছে। সূর্য্য ডুবিয়া গেল—পশ্চিম গগন তখনও বিচিত্র আলোকে উদ্ভাসিত—সাগরের সীমায় জলরাশি তখনও একটু আলোয় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। তখন সেই দানবের বিকট কোলাহলে শিশিরের দৃষ্টি সেই জাহাজের দিকে আকৃষ্ট হইল। তখন সিঁড়ি নামান হইয়াছে—যাত্রীগণ দলে দলে ভিড় করিয়া নামিতেছে।

একে একে সব যাত্রী নামিয়া গেল। একটি তরুণ ইংরাজ সেই সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া ক্যাপ্টেনের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করিতেছিল। শেষে ক্যাপ্টেন হাত বাড়াইয়া যুবকের সঙ্গে খুব আন্তরিকতার সহিত করমর্দ্দন করিল। যুবক সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে যাইতে ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য কয়েক জন নাবিক যারা রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল তাহাদিগকে হাত দিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "Cheerio! see you again!" তারা সবাই বলিল, "Cheerio."

শিশির সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে দেখিতে লাগিল।

যুবক শিশিরের পাশ দিয়া গেল—নিকটে তার মুখের দিকে চাহিয়া শিশিরের মনটা হঠাৎ ছাঁৎ করিয়া উঠিল! সে বেশ করিয়া চাহিয়া দেখিল। যুবকের দাড়ী গোঁফ কামান, সুন্দর ছাঁট-কাটযুক্ত একটা ছাই রঙ্গের পোষাক পরা, মাথায়ও প্রায় সেই রঙ্গের ভেলুর হাট, গলায় খুব চটকদার টাই। জোরে জোরে পা ফেলিয়া সে বীরদর্পে অগ্রসর হইতেছে—আসল ইংরাজের বাচ্ছা। শিশির মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহাকে দৃষ্টি দিয়া অনুসরণ করিল।

যুবকের হাতে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ ছিল। শিশির সেদিকে চাহিয়া দেখিল—তার উপর নাম লেখা আছে, Chas. Dayton. শিশির একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া সাগরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

সেই দিন Postal Expressএ শিশির এলাহাবাদে যাত্রা করিল। সে যে কামরায় ছিল সেই কামরাতে উঠিয়া সে দেখিল তাতে একটি ইংরাজ আর একটি পাঞ্জাবী তার সহযাত্রী। তারা তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই কিন্তু তাদের নাম লেখা আছে। কৌতূহলভরে নামগুলি পড়িতে পড়িতে সে দেখিল যে তাদের মধ্যে একজন C. Dayton.

দেখিতে দেখিতে ডেটন আসিয়া জুটিল। সে জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিয়া তড়বড় করিয়া নামিয়া গেল, ফর্ ফর্ করিয়া প্লাটফরমে ঘুরিতে লাগিল এবং তার জাহাজের সহযাত্রী পুরুষ ও নারীদের সঙ্গে খুব গল্পগুজব, হাসি তামাসা করিতে লাগিল। দেখা গেল ছোকরা খুব জনপ্রিয় ও মিশুক। বিশেষ মেয়েরা তার উপর ভারী অনুরক্ত। তার চঞ্চলতা সজীবতা এবং রহস্যপ্রিয়তা অল্পক্ষণের মধ্যে তাকে অনেকের চক্ষেই বিশিষ্ট করিয়া তুলিল।

যে পাঞ্জাবী ছোকরা শিশিরের সহযাত্রী ছিল, তার নাম কুন্দনলাল। সেও বিলাত হইতে আসিতেছে এবং দেখা গেল যে, তার সঙ্গেও ডেটনের বেশ আলাপ আছে। অনেকক্ষণ তারা গল্পগুজব হাসি তামাসা করিল।

তারপর ডেটন হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "I say, Lall, I'll give you the surprise of your life."

কুন্দনলাল বলিল, "কি রকম ?"

ডেটন বলিল, "আমি যদি এই বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির সঙ্গে বাঙ্গালায় কথা বলতে পারি তবে তুমি আমাকে কি দেবে ?"

অবিশ্বাসের ভরে কুন্দনলাল বলিল "No !"

ডেটন বলিল, "সত্যি আমি পারি।"

কুন্দনলাল বলিল, "হবে, তুমি কোথাও ভাষাটা শিখে থাকবে।"

ডেটন। কিন্তু কেমন ক'রে পারবো বল ? আজ আট বচ্ছর হ'ল আমি জাহাজে কাজ ক'রছি—এ আট বচ্ছর ইউরোপ ও আমেরিকার মধেই ঘোরা ফেরা ক'রেছি। কোনও দিন ভারতে আসি নি। ভেবে দেখ, তবে কেমন ক'রে শিখলাম। বলতে পার ?"

কুন্দনলাল হাসিয়া বলিল, "আমার মনে হয় আমি ব'লতে পারি। জাহাজে বোধ হয় তোমার একটী বাঙ্গালী মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আর তার সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলে।"

"সে ধার দিয়েও নয়। ভালবাসাটা আমার ধাতে নেই।"

"তোমার রকম সকম দেখে তো তো মনে হয় না। তোমাকে মেয়ে মহলে বেশ পশার জমাতে দেখতে পাই।"

"ও: সে আলাদা কথা। মেয়েগুলোকে নাচাতে বেশ। তারা এত বেকুব—তাদের বোকা বানাতে কিছুই লাগে না। দুটো মিষ্টি কথা, দুটো হাসি তামাসা—বস্ তারা অমনি গ'লে যায়।"

"তুমি তো ভয়ানক লোক—a regular Bluebeard. র'স সব মেয়েদের কাছে এবার আমি তোমার নামে লাগাচ্ছি।"

"Oh don't please ! অমি বরং তোমাকে এক বাক্স টফি কি সিগারেট ঘুস দেব।"

"আচ্ছা, ঘুস স্বীকার করলাম। কিন্তু রহস্যটা কি তাহ'লে? কেমন ক'রে তুমি শিখলে?"

"রহস্যটা ভারী গভীর—নিদারুণ গোপন কথা। কিন্তু অত্যন্ত গোপন কথা। কথাটা এই যে আমি আসলে বাঙ্গালী।"

শিশির শুইয়া পড়িয়াছিল, একথা শুনিয়া উঠিয়া বসিল।

কুন্দনলাল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সত্যি।"

"Gods own truth, man!" বলিয়া যুবক বলিল, "তের বচ্ছর বয়সে আমি হঠাৎ বাবার উপর রাগ করে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাই। যখন ক'লকাতায় এলাম তখন সম্বল ছিল মাত্র গোটা চল্লিশেক টাকা। ক'লকাতায় এসে আমার খেয়াল হ'ল ভারতবর্ষ ছেড়ে যাব। খিদিরপুরে গিয়ে জাহাজে জাহাজে ঘুরে কয়েকদিন চাকরীর সন্ধান ক'রলাম। জুটলো না। তারপর চাঁদনী থেকে এক ইংরাজী পোষাক কিনে নাম ভাঁড়িয়ে চার্লস ডেটন হ'লাম। ইংরাজীটা বেশ ভাল বলতে পারতাম—ফিরিঙ্গী ব'লে বেশ চ'লে গেলাম। তারপর কিছু চেষ্টা চরিত্র ক'রে Boy হ'য়ে জাহাজে চাকরী পেলাম।"

"সে-জাহাজের সেকেণ্ড মেট লোকটা বেশ ভাল মানুষ ছিল। Bay of Bengalএ জাহাজ প'ড়তেই আমার যা' sea sickness হ'ল তা ব'লবার নয়। আমি একরকম মড়ার মত পড়ে কেবল বমি ক'রতে লাগলাম। এই মেট লোকটা তখন আমাকে শুশ্রূষা ক'রে খাড়া করালে। তারপর বিলেত গিয়ে আমি অনেক কাণ্ডকারখানা ক'রে শেষে পাকা চাকরী পেলাম। এইবারে আমি সেকেণ্ড মেটের সার্টিফিকেট পেয়েছি। আর কয়েক বৎসর চাকরী ক'রলেই হয়তো ক্যাপ্টেন হ'তে পারবো।"

কুন্দন লাল। বাঃ তুমি ওস্তাদ ছেলে। বাহাদুরছেলে। তা তের বচ্ছর বয়সে তুমি দেশ ছেড়ে গিয়েছ। এতদিন তোমার দেশের জন্য মন কেমন করে নি?

"প্রথম কিছুদিন ক'রেছিল। তারপর বিশেষ কিছু হয় নি। আমি একেবারে কাজে উন্মত্ত হ'য়েছিলাম। এ কত বড় একটা adventure বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে। এ জীবনটা আমার ভারী ভাল লাগতো। তা' ছাড়া হাড়ভাঙ্গা খাটুনি সে—কাজের মধ্যে একেবারে ডুবে থাকতে হ'ত। ভাববার বড় সময় ছিল না। তা ছাড়া জাহাজের সে life ভারী মজার। Sailorদের মত ফুর্ত্তিবাজ লোক কম আছে। কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন হ'ল মনটায় ভারী অশান্তি বোধ হচ্ছিল।"

কেন?"

"যাবার সময় আমি বাবার বাক্স আমার একটা চাবী দিয়ে খুলে পঞ্চাশটা টাকা বের ক'রে নিয়েছিলাম। লিখে গিয়েছিলাম যে একদিন এ টাকা শোধ ক'রবো। গেল বারে লণ্ডনে ফিরে এসে আমি টমাস কুককে দিয়ে সে টাকা বাবাকে ফিরে পাঠিয়েছিলাম। এবার

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে জানলাম যে সে টাকা বাবা draw করেন নি, আর তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নি। শুনে মনটা ভারী খারাপ হ'য়ে গেল। কারণ যদিও তাঁর উপর রাগ ক'রেই চলে গিয়েছিলাম, তবু বাবা আমাকে ভয়ানক ভাল বাসতেন, আর আমিও তাঁকে বরাবরই খুব ভালবাসতাম। মনে হ'ল আমিই হয়তো, বাবার মৃত্যুর কারণ হ'য়েছি। মন ভারি খারাপ হল, তাই ছুটি নিয়ে চলে' এলাম একবার বাবার খোঁজ কর'তে।"

শিশির শুনিতেছিল। শুনিতে শুনিতে তার মনের ভিতর ঝড় বহিতেছিল। দিলীপকে এতদিন পর সম্মুখে দেখিয়া একটা প্রবল আনন্দ তার সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন করিল। এ কয় বৎসরে দিলীপের স্বভাবসুন্দর মূর্ত্তি অপরূপ সৌষ্ঠবে ভরিয়া উঠিয়াছিল—তার সুগঠিত পৌরুষভরা মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া শিশিরের অন্তর গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিতেছিল। তারপর তার জীবনের ইতিহাস শুনিয়া তার আনন্দ হইল এই তো পৌরুষ, এই মনুষ্যত্ব! এমন ছেলের বাপ হওয়া কি সহজ সৌভাগ্যের কথা! তবু মনের ভিতর দারুণ অভিমান গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছিল। ছেলে যে তার বুকভরা স্নেহের এমন নিদারুণ অপমান করিয়া গিয়াছে একথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। তাই সে মনে মনে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

কিন্তু দিলীপ যখন বলিল, "বাবা আমাকে ভালবাসতেন—আর আমিও তাঁকে বরাবরই খুব ভালবাসতাম।" আর তার পর তার মৃত্যুর আশঙ্কার কথা বলিয়া সে যখন তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিল ; তখন শিশিরের সব অভিমান ভাসিয়া গেল। সেও মুখ ফিরাইয়া চক্ষু মুছিল। তার বুকটা এমন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল যে চট্ করিয়া কিছু বলিতে পারিল না।

দিলীপ তখন তার পিতৃগৃহ ত্যাগের কথা, তার পিতার স্নেহের নানা নিদর্শনের কথা কুন্দনলালকে বলিয়া গেল। তার গলাটা ভয়ানক ভারী হইয়া উঠিল।

শেষে শিশির কতকটা আত্মস্থ হইয়া বলিল, "আমি তোমাদের কথার মধ্যে কথা বলতে বাধ্য হ'চ্ছি ক্ষমা করো। কিন্তু মিঃ ডেটন, তোমার পক্ষে কি এটা খুব নীচ কাজ হয়নি —পঞ্চাশ টাকা দিয়ে তোমার বাপের ঋণ শোধের চেষ্টা? সে বেচারা হয় তো তোমাকে হারিয়ে তার নিজের জীবনটাই নষ্ট ক'রেছে।"

ডেটন একটু চমকিত হইয়া শিশিরের দিকে চাহিল। তার পর বলিল, "হাঁ এখন মনে হ'চ্ছে বটে কাজটা কতকটা নীচাশয়ের মতই হ'য়েছিল। হয়তো ও-পঞ্চাশটা টাকার চেয়ে বাবা আমার একটা খবর, একটা ভালবাসার কথার জন্যই বেশী লালায়িত ছিলেন। কিন্তু তখন তেমন ভাবিনি, বরং ভেবেছিলাম যে এটা আমার একটা honourable obligation".

শিশির বলিল, "তুমি কি তোমার বাবাকে এখন চিন্‌তে পারবে দিলীপ?" তার কণ্ঠ অশ্রুতে ভরিয়াছিল।

দিলীপ উঠিয়া দাঁড়াইল—তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এই পক্ককেশ শ্মশ্রুবহুল মুখের দিকে চাহিয়া

দেখিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। সে আস্তে আস্তে বলিল, "আপনি, আপনি কি"—শিশির দুই বাহু বাড়াইয়া বলিলেন, "হাঁ বাবা, আমি তোমার বাবা।"—

দিলীপের মুখ একবার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে একবার হাত ছুঁড়িয়া বলিল, "Oh joy!" তার পর শিশিরের পায় পড়িয়া বলিল, "বাবা আমাকে ক্ষমা করুন।"

শিশির কম্পিত বাহুতে দিলীপকে বুকে টানিয়া লইল। অনেকক্ষণ দুজনে আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া অশ্রুমোচন করিল। কুন্দনলালের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

তার পর আর সেরাত্রে তাদের ঘুমের কথা মনে হইল না। দুজনে বসিয়া তাদের এ-কয় বৎসরের জীবনের কথা আলোচনা করিতে লাগিল। শিশির প্রথম দিলীপের কথা জিজ্ঞাসা করিল। দিলীপ বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার পর হইতে যাহা যাহা করিয়াছে যতস্থানে গিয়াছে, যত ভাল কাজ করিয়াছে, যত লোকের কাছে প্রশংসা পাইয়াছে তাহা শতমুখে বলিয়া গেল। তার গল্প শুনিতে শুনিতে শিশিরের ছাতি ফুলিয়া উঠিল। দেশ বিদেশে ছেলে যে শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দিয়াছে, কত আর্ত্তকে রক্ষা করিয়াছে, কত দুর্ব্বৃত্তকে শাস্তি দিয়াছে, ক্যাপ্টেনের কাছে কত রকম সমাদর লাভ করিয়াছে সে কথা শিশির খুঁটিয়া খুঁটিয়া শুনিল। তার অন্তরের যে শূন্য কুঠরী এতদিন হাহাকার করিতেছিল সেইখানে সে পুত্রের গৌরবের এই সব পরিচয় ঠাসিয়া বোঝাই করিতে লাগিল।

শিশির তাঁর নিজের জীবনের কথা খুব বেশী করিয়া বলিল না। মিনতির কথা তুলিলই না। দিলীপ যাওয়ার পর হইতে সে চাকরী ছাড়িয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এই কথাই সে বলিল। দিলীপ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা, মা কোথায়?"

চমকিত হইয়া শিশির পুত্রের মুখের দিকে চাহিল। তার পর বলিল, "তোমার বিমাতা? সে চুঁচুড়ায় আছে।"

ক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়া দিলীপ জানিল যে এ আট বৎসর মাতার সঙ্গে পিতার দেখা হয় নাই। কথাটা শুনিয়া দিলীপের মনে ব্যথা লাগিল। তার মনে হইল সে এই দুইটি প্রাণীর সমস্ত জীবন নষ্ট ও বঞ্চিত করিয়াছে—অপরাধ বোধে তার মন ভারী হইয়া উঠিল।

সে বলিল, "এবার আপনি এখন বাড়ী চলুন, বাবা।"

শিশির কোনও কথা কহিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তার এখন মনে হইল, মিনতির কাছে এখন তার মুখ দেখাইবার পথ নাই। পুত্রকে সে ফিরিয়া পাইয়াছে—পুত্র হারাইয়া তার চিত্তে যে গ্লানি ছিল এ আনন্দে সে সব ধুইয়া গিয়াছিল। তাই এখন তার এই কথাই খুব বেশী করিয়া মনে হইল যে মিনতিকে শিশির বিনা অপরাধে নিদারুণ শাস্তি দিয়াছে। মনে হইল মিনতি যদি তার এই অবহেলা সম্বন্ধে অভিযোগ করে, তবে তার উত্তর দিবার কিছুই নাই। মিনতির দুঃখের ব্যথা আজ সে প্রথম পরিপূর্ণরূপে অনুভব করিল।

মনে পড়িল তার সেই পুরাতন কথা—মিনতির সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ। তার পর তার সঙ্গে স্বল্প পরিচয়। মিনতির গুণের কথা তাহাকে এখন অভিভূত করিল। এমন গুণবতীকে বিনা অপরাধে এমন কঠোর শাস্তি দিয়া যে অপরাধ করিয়াছে তার অনুভূতি শিশিরকে কাতর করিল।

দিলীপ বলিল, "সে হ'বে না বাবা, আপনার আমার সঙ্গে যেতে হ'বে। মার কাছে আমার ক্ষমা চাইতে হ'বে।"

শিশিরের দুই চক্ষু গড়াইয়া জল পড়িতে লাগিল। শেষে সে বলিল, "চল বাবা, তুমি যা বলবে তাই আমি করবো।"

তখন তার মনে হইল যে মিনতি তাহাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিল, দিলীপ ফিরিয়াছে। কথাটার রহস্য সে ভেদ করিতে পারিল না। দিলীপের সঙ্গে সে এই কথা আলোচনা করিতে লাগিল। অনেক গবেষণা করিয়া তারা সিদ্ধান্ত করিল যে, এটা ফাঁকি দিয়া শিশিরকে বাড়ী ফিরাইবার একটা চক্রান্ত মাত্র। কিন্তু শিশিরের মনে হইল যে আট বৎসর পরে মিনতির পক্ষে এমন চক্রান্ত করা সম্ভব নয়। আর দিলীপের সন্দেহ হইল যে, কোনও ভণ্ড দিলীপ সাজিয়া আসিয়া তাদের সম্পত্তি ফাঁকি দিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে।

দুজনেই স্থির করিল অবিলম্বে চুঁচুড়ায় যাইয়া এ সম্বন্ধে একটা নিষ্পত্তি করা আবশ্যক।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি কাটিয়া গেল।

ভোর বেলায় রামধারী বাবুর খিদমৎ করিতে আসিলে দিলীপ তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া চিনিল। সে হাসিয়া বলিল, "ওকে বলবেন বাবা, দেখি ও আমাকে চেনে কিনা।"

গাড়ীতে রামধারী উঠিলে দিলীপ বলিল, "রামধারী!"

রামধারী হঠাৎ থ মারিয়া গেল। সে সাহেবকে চট করিয়া সেলাম করিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। দিলীপ হাসিমুখে তাহাকে দেখিতে লাগিল।

"চিনতে পারলি না, রামধারী?"

রামধারী আরও অবাক্ হইল। সাহেব হইয়া এমন বাঙ্গলা কথা বলে। আবার রামধারীকে চেনে, কে এ? সে শিশিরের মুখের দিকে চাহিল। শিশির হাসিতে লাগিল। শিশিরের মুখে এমন হাসি রামধারী অনেক দিন দেখে নাই। দেখিয়া তার মুখ হাসিয়া উঠিল।

শেষে শিশির বলিল, "খোকাবাবু রে রামধারী।"

রামধারী তখন কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। সে হাসিবে, না নাচিবে, না কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না। দিলীপ তাহাকে এ দ্বিধা হইতে মুক্তি দিয়া তাহাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তুই বেঁচে আছিস বুড্ঢা—বেশ বেশ।"

(২২)

দিলীপ যখন শিশিরকে লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল তখন মিনতি একেবারে আড়ষ্ট স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত বিশ্বটা তার চক্ষের সামনে বন্‌বন্‌ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, পায়ের তলা হইতে মাটি যেন সরিয়া গেল সে টলিয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল।

তোতারাম ব্যস্ত হইয়া তাহাকে ধরিতে গেল, মিনতি সরিয়া গিয়া তাহাকে নিবারণ করিল।

অনেকক্ষণ পর মিনতি বলিল, "দিলীপ! তুমি দিলীপ নও!"

তোতারাম শান্তভাবে বলিল, "না মা, আমি তো বরাবরই ব'লেছি আমি দিলীপ নই।"

"তবে কেন?" - বলিতে বলিতে মিনতি থামিয়া গেল। কেন কি? কিছুই তার মনে আসিল না। তোতারামের উপর অনুযোগে অভিযোগে তার মন ভরিয়া গেল, কিন্তু এমন কোনও একটা কথাই তার মনে হইল না যাহা লইয়া তাহাকে অনুযোগ করা যাইতে পারে।

তার মন কেবল বলিল "কেন তুমি দিলীপ হ'লে না?" কিন্তু সে অপরাধ তো তোতারামের নয়।

মিনতি বলিল, "কে তুমি?"

"মা আমি আপনার ছেলে।"

মিনতি বিরক্ত হইয়া বলিল, "যাও তুমি।" তোতারাম মুখ ভার করিয়া চলিল। তখন মিনতি বলিল, "এ বাড়ী ছেড়ে যেয়ো না।"

"আচ্ছা মা," বলিয়া তোতারাম নীচে চলিয়া গেল।

এদিকে শিশিরকে তার নিজের ঘরে শোয়াইয়া দিয়া দিলীপ তাকে শুশ্রূষা করিয়া শান্ত করিল। শিশির বারবার কি কথা বলি বলি করিয়া দিলীপের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কিছু বলা হইল না। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখভার করিয়া বসিয়া রহিল।

দিলীপের মাথার ভিতর তখন আগুন ছুটিতেছিল। পিতাকে এই অবস্থায় একলা ফেলিয়া যাইতে পারিতেছিল না বলিয়া তার মন ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল।

যখন শিশির খানিকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন তখন দিলীপ রামধারীকে তার কাছে রাখিয়া "আমি এখনি আসছি বাবা," বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

মিনতির ঘরে গিয়া দিলীপ দেখিতে পাইল মিনতি বিছানার উপর অসাড় হইয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে।

সে সেদিকে একবার মাত্র অগ্নিময় দৃষ্টিতে চাহিয়া গট্‌মট্‌ করিয়া নীচে চলিয়া গেল।

বাহিরের ঘরে গিয়া দেখিল তোতারাম গম্ভীরভাবে পায়চারী করিতেছে। সে বিনা বাক্যব্যয়ে তোতারামের পশ্চাদ্দেশে একটা প্রচণ্ড লাথি মারিল।

অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া তোতারাম হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু সে চট্ করিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। তখন দিলীপ তার শ্রমকঠোর বলিষ্ঠ বাহু আস্ফালন করিয়া প্রথমে বাম হস্তে এক প্রচণ্ড ঘুসি বাগাইয়া তোতারামের দুই চক্ষের মধ্যস্থলে লক্ষ্য করিল। তোতারাম একটু সরিয়া গেল, সে আঘাত তার লাগিল না। অমনি চক্ষের নিমিষে দিলীপের ডান হাত তোতারামের কাণের কাছে প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া আসিল। বিদ্যুৎগতিতে তোতারাম মাথা নীচু করিয়া আঘাত এড়াইয়া দিলীপের কোমর সাপটিয়া ধরিল।

দিলীপ বিচক্ষণ মুষ্টিযোদ্ধা। তার জাহাজে সে মুষ্টিযুদ্ধের পারদর্শিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু তোতারামও বলিষ্ঠ কুস্তিগির। সুতরাং রাগের ঝোঁকে দিলীপ তোতারামকে যত সহজে যত বিষম শাস্তি দিবে বলিয়া ভাবিয়াছিল তাহা সম্ভব হইল না। অনেকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর দিলীপ যদিও তোতারামকে গোটা কুড়ি খুব শক্ত শক্ত ঘুসি লাগাইল, তবু শেষ পর্য্যন্ত তোতারাম তাহাকে সুকৌশলে ভূশায়ী করিয়া চাপিয়া ধরিল।

বাড়ীর চাকর-বাকর হাঁ হা করিয়া ছুটিয়া দুইজনকে টানাটানি করিতে লাগিল। শেষে তোতারাম দিলীপকে ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইল, দিলীপও উঠিয়া তোতারামের দিকে হিংস্রদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।

তোতারাম একটু সুস্থির হইলে বলিল, "মাপ কর ভাই, তোমার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব করা অন্যায় হয়েছে।"

দিলীপ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল, "শুয়ার কে বাচ্চা! রসো তোমায় দেখছি!" বলিয়া সে ধাঁই করিয়া তিন চারটা প্রচণ্ড ঘুসি তোতারামকে লাগাইল। তোতারামের নানাস্থান দিয়া রক্ত প্রবাহ ছুটিল—মুখময় ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু সে আর বাধা দিল না।

তোতারাম কোনও বাধা দেয় না দেখিয়া দিলীপ থামিয়া গেল। এমন নির্ব্বিরোধী শত্রুকে আঘাত করা কাপুরুষের কাজ—ইহাতে দিলীপের রুচি ছিল না। সে সরিয়া গিয়া বলিল, "নেও, আত্মরক্ষা কর।"

তোতারাম বলিল, "না ভাই, আত্মরক্ষা করবো না। ক'রবার অধিকার আমার নেই, আমাকে যত আঘাত ক'রলে তোমার রোষের তৃপ্তি হয় তুমি তাই কর।"

"ভীরু—slave! তোমার যোগ্য এই!" বলিয়া দিলীপ তাকে পদাঘাত করিল।

"দিলীপ, ক্ষান্ত হও।" বলিয়া মিনতি আসিয়া দুয়ার গোড়ায় দাঁড়াইল। তার মুখ একদম সাদা হইয়া গিয়াছে—সে যেন একমাস রোগ ভোগ করিয়া উঠিয়াছে।

দিলীপ, তোতারাম দুজনেই তার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

মিনতি দরজার চৌকাট ধরিয়া আপনাকে কোনও মতে সোজা করিয়া রাখিল। চাকর বাকররা বুঝিতে না পারে সেইজন্য সে ইংরাজীতে বলিল "তুমি যদি মনে কর যে আমার কোনও কাজে তোমাদের পরিবারের সম্মান নষ্ট হ'য়েছে বা তোমার পিতার কোনও অনিষ্ট হ'য়েছে সে জন্য শাস্তি প্রাপ্য আমার। তোতারাম নিরপরাধ, ওর উপর অত্যাচার ক'রো না। তোতারাম, তুমি এখন যেতে পার।"

তোতারাম অগ্রসর হইয়া মিনতির পায়ের ধূলা লইয়া নীরবে চলিয়া গেল। দিলীপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মিনতির উপর তার আক্রোশ কম ছিল না, কিন্তু নারীকে ঠিক কিরূপে শাস্তি দেওয়া যায় তাহা সে জানিত না। স্ত্রীজাতিকে সে একরকম ঘৃণা করিত, কিন্তু তাদের গায় হাত তোলা বা তাদের তিরস্কার করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। তা' ছাড়া বর্ত্তমান অবস্থায় সে ঠিক আপনাকে তিরস্কার করিবার যোগ্য অবস্থায় অনুভব করিতেছিল না— সে অত্যন্ত লজ্জার সহিত অনুভব করিল যে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেই বরঞ্চ মিনতির কাছেই অনেকটা খাটো হইয়া পড়িয়াছে। তাই সে চুপ করিয়া রহিল।

তোতারাম চলিয়া গেলে মিনতি দিলীপকে ইংরাজীতেই বলিল, "তোমার যদি আপত্তি না থাকে তবে তুমি আমার ঘরে আসতে পার, দিলীপ। এখানকার চেয়ে সেখানে আমরা অনেকটা স্বচ্ছন্দে কথাবার্ত্তা কইতে পারবো।"

দিলীপ শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া ইংরাজীতে বলিল, "ক্ষমা ক'রবেন, আমার আপনার সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক রাখবার ইচ্ছা নেই। আপনি যেতে পারেন।"

"কোনও সম্পর্কই নয়? শাস্তি দিতেও ইচ্ছা নেই। আমার কোনও উত্তর শোনবারও ইচ্ছা নেই?"

"সে অধিকার আমার নেই।

"বেশ", বলিয়া মিনতি মুখ ঘুরাইয়া রাণীর মত তেজের সহিত চলিয়া গেল। ঘরে গিয়া সে দুয়ার বন্ধ করিয়া খাটের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পর যখন তার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল তখন মিনতির শরীরটা অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হইল, সে মাথা তুলিতে পারিল না। নিশ্চেষ্ট অসহায় হইয়া সে একা পড়িয়া রহিল। আর রাশি রাশি অন্ধকার দুশ্চিন্তা তার মাথার ভিতর ভিড় করিয়া ছুটিতে লাগিল।

এ কি হইল! কি সর্ব্বনাশ হইয়া গেল তার? কি করিতে কি হইল?

তার জীবন তন্ন তন্ন করিয়া সে অনুসন্ধান করিল, সে কোনও অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তার মনে হইল না। কিন্তু তবু তার একি শাস্তি। আজন্ম ব্রহ্মচারিণী সে, কেবল দুটি দিন শিশিরের সংসর্গ ভিন্ন সে কখনও পুরুষের চিন্তা মনে স্থান দেয় নাই। তবু ঘটনাচক্রে এমন একটা কুৎসিৎ কলঙ্ক তার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে যাহা দূর করিবার তার কোনও উপায়ই

নাই। কে তার কথা বিশ্বাস করিবে? অন্য কাহারও নামে এমন কথা শুনিলে সে নিজেই যে বিশ্বাস করিত না। তবে সে তার স্বামী বা সপত্নীপুত্রকে কিরূপে বিশ্বাস করাইবে?

আজ দিলীপ আসিয়াছে। কতদিন সে একাগ্র সাধনা করিয়াছে এই দিলীপের প্রত্যাগমন প্রার্থনায়। বুক ভরা মাতৃস্নেহ লইয়া সে এই সপত্নীপুত্রের সম্বর্দ্ধনার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল—তার পর এক নিঃসম্পর্ক যুবককে দিলীপের জন্য সঞ্চিত স্নেহধারায় সে এতদিন অভিষিক্ত করিয়াছে। আজ ভগবান তার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন, দিলীপ আসিয়াছে, তার স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এ প্রার্থনা পূরণ করিয়া ভগবান তার অভিমানকে কি নিদারুণ শাস্তি দিয়াছেন। সে বড় স্পর্দ্ধা করিয়া ভাবিয়াছিল যে তার পক্ষে কি মঙ্গল তাহা সে জানে, তাই সে দিলীপ ও স্বামীর প্রত্যাগমন প্রার্থনা করিয়াছিল। বিধাতা তার সেই প্রার্থনা পূরণ করিয়া তার শাস্তির মাত্রা পূর্ণ করিয়াছেন।

মনে পড়িল, বিবাহের পূর্ব্বে সে বিদ্যুতের সৌভাগ্যের হিংসা করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল তেমনি সুযোগ পাইলে সে বিদ্যুতের গৌরব ম্লান করিয়া দিতে পারিবে। ভাবিয়াছিল বিদ্যুতের চেয়ে তার কৃতিত্ব কত অধিক। বিধাতা তার সে অভিলাষও শুনিয়াছিলেন। বিদ্যুতের শূন্য আসনে তাকে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তখন সে বড় স্পর্দ্ধা করিয়া আসিয়াছিল বিদ্যুতের গৌরব ম্লান করিতে। কিন্তু কোথায় তার সে কল্পিত গৌরব। নারীর যার চেয়ে বড় কলঙ্ক নাই আজ সেই কলঙ্কের ভিতর তার এ অহঙ্কারের অভিযান সমাপ্তি লাভ করিল। কপট নারায়ণের একি কঠিন পরিহাস!

আর তোতারাম—তাকে সে পুত্রের অধিক স্নেহ দিয়া এতদিন বাড়াইয়াছে তাহা হইতে তার এ কলঙ্ক! আর সন্ন্যাসী তোতারাম, তার এ পোড়া অদৃষ্টের ভাগী হইয়া তার সন্ন্যাস ভ্রষ্ট হইয়া কি গভীর কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া গেল। আজ দিলীপের হাতে আসন্ন মৃত্যু হইতে মিনতি তাহাকে রক্ষা করিয়াছে—কিন্তু কে জানে ইহার পর গৃহের বাহিরে তার কি শাস্তি হইবে। সে কোথায় যাইবে? কি দুর্গতি কি লাঞ্ছনা তার অদৃষ্টে আছে কে জানে? কে জানে সে এই দুর্গতির জন্য ধিক্কারে কি সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে? ভাবিতে মিনতির প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। হঠাৎ আতঙ্কে সে কাঁপিয়া উঠিল।

দিলীপ বলিয়া মিনতি তোতারামকে ভালবাসিয়াছিল। ছয় বৎসর সে তাকে ভালবাসিয়াছে—তোতারামের কাছে ভক্তি ও প্রীতি পাইয়াছে। তা' ছাড়া তোতারাম ছিল তার ধর্ম্মজীবনের সহচর, ধর্ম্মে তার একরকম পথ-প্রদর্শক! আজ প্রমাণ হইয়া গেল সে দিলীপ নয়, কিন্তু যে স্নেহ তার বুকের ভিতর শিকড় গাড়িয়া বসিয়া গিয়াছে তাহা তো ইহাতে ভাসিয়া যাইবার নয়। তাই সে তোতারামের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

মিনতির মনে পড়িল তোতারাম সন্ন্যাসী হইলেও অভিমানী। দিলীপের মতই সে

নিশ্চয় কোনও অভিমানে গৃহ ছাড়িয়া আসিয়াছে। কেবল অপরিসীম স্নেহ দিয়াই মিনতি তাকে এখানে বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছিল। আজ সে স্নেহের স্থানে হঠাৎ এ নিদারুণ অপমান লাভ করিয়া সে না জানি কি সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে।

এ কথা মনে হইতে মিনতির মন এত ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, সে তার উপস্থিত বেদনা ভুলিয়া গেল; নিজের কঠিন সঙ্কটের কথা বিস্মৃত হইল। না জানি তোতারাম কোথায় গিয়াছে, কি কষ্ট সে পাইতেছে—কি জানি বুঝিবা সে আত্মহত্যাই করিয়া বসিয়াছে। তা' ছাড়া তার তো যাইবার কোনও স্থান নাই। তার গুরু কোথায় আছে তাও সে জানে না। কোথাও যাইবার সম্বল তার নাই। সে শুধু একটা লোটা ও কম্বল লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, ভিক্ষা না করিলে তার আজ খাওয়াই হয় তো জুটিবে না।

ভাবিতে ভাবিতে মিনতি ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিয়া পড়িল। তার হাত কামড়াইতে ইচ্ছা হইল। কি নির্ব্বুদ্ধি সে! তোতারামকে বিদায় দিবার সময় কিছু টাকা দিবার কথাও তার মনে হইল না। বৃন্দাবনে তীর্থানন্দ স্বামীর কাছে যাইবার মত সম্বল তাহাকে দিয়া দিলেও তো তার একটা গতি হইত। কি ভুল তার।

ছট্ ফট্ করিয়া সে ঘরের ভিতর পাইচারী করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া ভাবিয়া বুদ্ধি স্থির করিয়া একখানা চিঠি লিখিল। তার দেরাজ খুলিয়া যা' কিছু টাকা কড়ি ছিল বাহির করিল—নোটে টাকায় সে প্রায় দুইশত টাকা হইবে। তারপর আহ্লাদী ঝিকে ডাকিল।

আহ্লাদীকে মিনতিই নিযুক্ত করিয়াছিল। সে মিনতির ভয়ানক অনুরক্ত এবং মিনতি তাকে বিশ্বাস করে।

মিনতি আহ্লাদীকে বলিল, "তুই একটা কাজ কর'তে প্যারবি আহ্লাদী?"

"পারবো না কেনে গো মা, কি কাজখানা বল না?"

"তোতারামকে খুঁজে বের করতে পারবি?"

"সে কেনে পারবো নাই। এই তো গেল, হুগলী সহরটা কতটুকু যে তাকে খুঁজে বার কর'তে লারবো।"

"তাকে খুঁজে বের ক'রে এই চিঠি আর এই টাকা দিবি, আর একটা জবাব নিয়ে আসবি। বুঝলি? দেখিস, কেউ যেন টের না পায়।"

আহ্লাদী একটু হাসিল। সে হাসিটা মিনতির বুকের ভিতর বিষাক্ত ছুরীর মত বসিয়া গেল। সমস্ত অন্তর তার ঘৃণায় ভরিয়া গেল।

আহ্লাদী হাসিয়া বলিল, "ইয়ার লিগে তুমি কিছু ভেবো না মা। আহ্লাদী তেমনটা নয়। আজ দুপহর না যেতে তার খবর নিয়ে আসবো, বাড়ীর ইঁদুরটা অবধি জানবেক নাই।"

কি লজ্জা! কি ঘৃণা! এ ঝিটা ভাবিল মিনতি তার প্রেমিকের কাছে গোপনে পত্র পাঠাইতেছে! কিন্তু উপায় নাই—আর এ কথা তাকে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনাও বটে, তার মধ্যে একটা হীনতাও আছে। মিনতি কিছু বলিল না, মুখ চাপিয়া সহিয়া গেল। ভাবিল, এখন তো এমন তার কতই সহিতে হইবে!

আহ্লাদীকে বিদায় করিয়া সে অনেকটা সুস্থচিত্তে আবার নিজের অবস্থা ভাবিতে লাগিল। ভাবিল এখন সে কি করিবে? তারপর মনে করিল, তার স্বামী কি করিবেন তার উপরই সেটা নির্ভর করিবে। সে ধরিয়া লইল শিশির বা দিলীপ কেহই তার নির্দ্দোষিতায় বিশ্বাস করিবে না। অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাতে তাহাদের বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা করিয়াও কোনও লাভ নাই।

শিশির এখন বোধ হয় তাহাকে অপমান করিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবে। এ কথা ভাবিতেই তার সমস্ত রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। এ আট বৎসর শিশির নির্ম্মম অত্যাচারে তাকে নিপীড়িত করিয়াছে। বিনা দোষে তার অশেষ লাঞ্ছনা করিয়াছে। এই দীর্ঘ নির্য্যাতনের উত্তরে সে কোনও দিন একটি কথাও কহে নাই। শিশিরের সে অপরাধের কোনও শাস্তিই সে দেয় নাই, অনুযোগ পর্য্যন্ত করে নাই। আজ শিশির আট বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া ধাঁ করিয়া স্বামীগিরির অধিকার জাহির করিয়া তার শাস্তি দিতে বসিবে! কি নিদারুণ পরিহাস! অপরাধী করিবে নির্য্যাতিতের শাস্তি! কেননা সে স্বামী আর মিনতি স্ত্রী! সেজন্য মিনতির অপরাধের উপযুক্ত বিচার পর্য্যন্ত করিবার প্রয়োজন বোধ হয় হইবে না!

স্বামীত্বের এই বিকট ভেঙ্গানি, পবিত্র পতি পত্নী সম্বন্ধের এই মর্ম্মন্তুদ পরিহাস মিনতির হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। এই অসত্য এই অপমান, অন্যায়ের এই লাঞ্ছনা কি সে মাথা পাতিয়া সুধু সহিয়া যাইবে? কখনই না। তার মনে পড়িল বিনোদের কথা। তার একটা স্বাধীন সত্তা আছে—তার আত্মা আছে, যার মর্য্যাদা শিশিরের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। আজ তার মনে হইল যে মনুষ্যত্ব হিসাবে স্বামীর চেয়ে সে অনেক উপরে। তবু সে স্বামীর ছায়া বই আর কিছুই হইতে পারিবে না, স্বামীকে ছাড়িয়া তার আত্ম-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইবে না, তার অপমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা খাড়া পর্য্যন্ত করিতে পারিবে না? এত কি সে মনুষ্যত্বহীন—সে কি কেবলই একটা ছায়া, মানুষ নয় সে?

সে স্থির করিল এ অবিচার ও অত্যাচারকে সে তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত করিয়া আপনি স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাইবে। অন্যায়কারীকে বিচারক সাজিয়া বসিবার সুযোগ সে দিবে না। তার পর কলিকাতায় গিয়া শিক্ষকতা করিয়া বা অন্য কোনও উপায়ে সে একটা জীবিকার সংস্থান করিবে। তারপর সে তার জীবনের প্রধান কার্য্য করিবে—তার ধর্ম্ম জগৎকে শুনাইবে, তার মত অপমানিত লাঞ্ছিত নারীকে সে আশ্রয় দিবে, তাদের ভিতর শক্তি উদ্বুদ্ধ করিবে—নারীর আত্ম-প্রতিষ্ঠার শক্তি জাগ্রত করিবে।

সে একান্ত মনে প্রার্থনা করিল, "নারায়ণ শক্তি দেও, বিদ্রোহ করিবার— শক্তি দেও এ বিদ্রোহে জয়ী হইবার"—

হঠাৎ সে থমকিয়া গেল। আবার প্রার্থনা! প্রার্থনা করিতে গিয়া তার মনে পড়িল যে জীবনে যখনই সে কিছু প্রার্থনা করিয়াছে তখনই সে প্রার্থনা পূরিত হইয়া তাহাকে লাঞ্ছনা করিয়াছে। তার জীবন নিয়মিত করিবার ভার লইয়াছেন যে বিশ্বদেবতা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া সে যখনি তার নিজের বুদ্ধিতে নিজের ভাল মন্দ বিচার করিবার প্রার্থনা করিয়াছে তখনি দেবতা তার সে স্পর্দ্ধার এমনি লাঞ্ছনা করিয়াছেন। আবার অভিমান! আবার দেবতার কাছে আবদার! আপনার ক্ষুদ্র বিচার শক্তি ও ধূলিকণার তুল্য বুদ্ধি দিয়া আবার সে নিজের শুভাশুভ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছে! সে নিবৃত্ত হইল।

বিশ্ববিধাতা সমস্ত লীলাস্রোতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তার জীবন নিয়মিত করিতেছেন। তার দুঃখ কষ্ট ভাল মন্দ সবই সেই লীলা প্রবাহের এক একটা নগণ্য তুচ্ছ তরঙ্গ মাত্র। বিশ্বদেব তার গতি নিয়মিত করিতেছেন—তার উপর কথা কহিবার সে কে? এই চিন্তায় মিনতি অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করিল। সে তার ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করিয়া বলিল, "প্রেমময় নারায়ণ, তোমার প্রেমের লীলায় তুমি আমাকে নাচাইতেছ – তুমি জান কিসে আমার ভাল মন্দ, তোমার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক —তোমার লীলা সার্থক হউক। তুমি যে পথে আমাকে লইবে তাই লও প্রভু! আমার হৃদয় নিয়ত করিয়া দেও, তোমার বিশ্ব লীলায় আমাকে ডুবাইয়া দেও—আর কিছুই চাই না প্রভু। আমার অভিমান ডুবাইয়া দেও, তোমার ইচ্ছায় আমাকে আনন্দ দেও প্রভু।"

নত হইয়া সে নারায়ণের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া প্রশান্ত চিত্তে উঠিয়া বসিল। তারপর দুয়ার খুলিয়া বাহির হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রশ্ন

ওগো চিরজীবনের পরম! আমার
প্রিয়তম! আসিয়াছি আমি।
সব তো দিয়েছ তুমি হে মোর উদার!
চাহিবার নাহি আর স্বামি
আজ শুধু সুধাবারে আসিয়াছি নাথ!
বল একবার বল শুনি—
ওই হাসি, ওই অশ্রু, ওই আঁখিপাত,
সত্য কি দিয়াছ মোরে তুমি?

ওগো মোর চির সত্য! তোমার জীবনে—
আমি কি ক্ষণিক সত্য নহি?
বল নাথ! বল সত্য আমার স্মরণে—
তোমার মুহূর্ত্ত গেছে বহি?
সত্য-সত্য-সত্য মোর! তোমারে প্রণাম,
আর মোর কোন সাধ নাই—
মরণ সম্বল মাগি কাঁদে আজ প্রাণ
এক বিন্দু সত্য শুধু চাই।

শ্রীসুশীলাসুন্দরী দেবী

গিরীশচন্দ্রের স্মৃতি

(৩)

প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় শ্রীযুত গিরীশ বাবুর ঘরে একটা বৈঠক বসিত। নানা ভাবের নানা সম্প্রদায়ের লোক এবং নানাবিধ পদস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট আসিতেন। থিয়েটার, সাহিত্য, ও ধর্ম্ম এবং কখনও কখনও সাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গও হইত। একদিন তাঁর সঙ্গে দেশীয় রঙ্গালয় সম্বন্ধে আলোচনা হওয়াতে—

তিনি বলিলেন "যাত্রা, কথকতা ও হাফ আখড়ার শ্রোতাদের দেখে দেশে নাটক লিখ্‌তে হত। সেই দর্শকদের মনোরঞ্জন কর্‌তে গেলে পৌরাণিক ছাড়া আর উপায় কি? বাংলায় থিয়েটারের ইতিহাস যদি কেহ লেখেন তবে তাঁকে এইটী বিশেষ ক'রে মনে রাখ্‌তে হবে। stageএর কথা ছেড়ে দাও!"

আমি বল্লাম "কেহ কেহ বলেন যে বাংলা দেশে নাটক কোথায়? বাংলা রঙ্গমঞ্চে যে নাটক অভিনয় হয় তা যাত্রার এক ধাপ উপরে।"

গিরীশ বাবু। বটে! যাঁরা বলেন তাঁরা নাটক কাকে বলেন জানেন কি?—আমার বিশ্বাস তাঁরা ঠিক মন দিয়ে কখনও বাংলা নাটক পড়েন না।—নাটকগুলি যে সব নির্দ্দোষ নিখুঁত—আমি তা বল্‌চি না। তবে দোষ দেখ্‌তে গেলে মহাকবিদের ভেতরও বের হ'তে পারে।—লোকে ভগবানের এই সৃষ্টি কল্পনারও দোষ দেয়!—আমি তা বল্‌চি না—নাটক বল্‌তে জগতের লোক যা বুঝে থাকে বাংলা দেশে, সে রকম নাটক হয়েছে। ভবিষ্যতে নাট্যসাহিত্যের কষ্টি পাথরে তার স্থান নির্দ্দেশ কর্‌বে।—

আমি।—কোনও কোনও পণ্ডিতেরা ব'লে থাকেন যে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের দৃষ্টিতে দেখ্‌তে গেলে বাংলা সাহিত্যে দুই একখানা প্রকৃত নাটক পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। আর—ইংরাজী সাহিত্যের dramatic artএর তুলনায় বাংলার নাটকগুলি নাটক নামেই অভিহিত হ'তে পারে না।

গিরীশ বাবু।—তোমার কি বোধ হয়?

আমি।—আজ্ঞে—আমি আর কি জানি বা বুঝি বলুন। তবে বোধ হয় ইংরাজী নাটকাদির সঙ্গে বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। মহাকবি সেক্ষপীর, Ben Johnson, Marlowe, Green প্রভৃতি Elizabethian যুগের সঙ্গে বাংলা নাটক—বিশেষ আপনার নাটকগুলি যেন এক ছাঁচে গড়া—এটাই আমার মনে হয়। তবে সে যুগে সে দেশে প্রাচীন ইতিহাসগাথা থেকে মাল-মসল্লা সংগ্রহ করেছে, কিন্তু আপনি রামায়ণ মহাভারতের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে তা আহরণ ক'রেছেন।

গিরীশ বাবু।—তুমি ঠিক বলেছ।—মহাকবি সেক্ষপীরই আমার আদর্শ। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলেছি। তবে জেন আমার নিজেরও একটা স্বাধীন ভাব আছে। কি জান প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির সাহিত্য সেই দেশের ভাবরসে পুষ্ট ও বৰ্দ্ধিত হয়।—এটা স্বাভাবিক।—বিয়োগান্ত মিলনান্ত নাটক ইউরোপীয় সাহিত্যে, বিশেষ ইংরাজী সাহিত্যে, যে রকম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, মহাকবির প্রতিভাদীপ্ত তুলিকায় নাট্যকলার যে অপূর্ব্ব শ্রী পরিস্ফুট হয়েছে—তা ভবিষ্যতে যিনিই নাটক রচনা করুন তাঁর আদর্শকে তাঁর অনুসরণ করতেই হবে।—তবে মহাকবি কালিদাস ভবভূতি এঁদেরও আমি অনাদর করি না। কিন্তু আমি পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্রবেই বেশী এসেছি। কিন্তু মহাকবি কাশীরাম দাস কৃত্তিবাস আমার ভাষার বনিয়াদ্। আমার লেখায় তাঁদের প্রভাবও বিদ্যমান দেখ্‌তে পাবে।

আমি। আচ্ছা মশায়, কাশীরাম দাসকে কৃত্তিবাসকে কি মহাকবি বলা যায়?

গিরীশ বাবু। নিশ্চয়। যদিও তাঁরা সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারতকে অবলম্বন ক'রেছিলেন, তবুও তাঁদের স্বাধীন কল্পনা এবং স্বাধীন ভাব ছিল।—কি অপূর্ব্ব বর্ণনা—দুচার ছত্রে গোটা চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই বলিয়া গিরীশ বাবু আবৃত্তি করিলেন—

এই যুক্তি রাবণ রাজা করিতেছিল ব'সে।
এমত কালে অঙ্গদ বীর উত্তরিল এসে॥
প্রকাণ্ড শরীর তার মন্দ মন্দ গতি।
পূর্ব্বাচল হৈতে যেন এল দিনপতি॥
আকাশে দেউটি যেন দুই চক্ষু জ্বলে।
মস্তক ঠেকিছে বীরের গগন-মণ্ডলে॥
রাবণের সেনাপতি দ্বারে ছিল যারা।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল তারা॥
বড় বড় বীর ছিল রাজার রক্ষক।
তক্ষক দেখিয়া যেন পলায় মূষক॥
দুয়ারে দুয়ারী ছিল উঠে দিল রড়।
লাথির চোটে কপাট ভেঙ্গে প্রবেশিল গড়॥
যেখানে রাবণ রাজা বসেছে দেওয়ানে।
লম্ফ দিয়া বীর গিয়া বৈসে মধ্যখানে॥
ব'সেছে রাবণ রাজা উচ্চ সিংহাসনে।
তাহা দেখি অঙ্গদের বড় দুঃখ মনে॥
কুণ্ডলী করিয়া লেজ—বসিল সভাতে।
পুরন্দর বীর যেন বসে ঐরাবতে॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন অঙ্গদের দেহ?
রাক্ষসেরা বলে বাপ এটা এলো কেহ॥
বড় বড় বীর ছিল রাবণ রাজার কাছে।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখি চুপ করিয়ে আছে॥

এই বর্ণনা পড়্‌লে একটা মহাবীরের সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। আরও শোন,—

শ্রীরাম বলেন শুন হে অঙ্গদ বলী।
রাবণ রাজারে কিছু দিয়া এস গালি॥
অঙ্গদ বলেন প্রভু যুক্তি নাহি হয়।
বালি পুত্র আমি যে আমাতে কি প্রত্যয়॥
শ্রীরাম বলেন সত্য হেতু বালি বধি।
তোমাতে প্রত্যয় মম আছে তদবধি॥
অঙ্গদ বলিল প্রভু এবা কোন কথা।
নখে ছিঁড়ি আনিব তাহার দশ মাথা॥
বালির বিক্রম তুমি জান ভালে ভালে।
বিক্রম জানিবা মম সংগ্রামের কালে॥
পশির রাক্ষস মধ্যে করিব উঠানি।
রাবণেরে গালি দিয়া আসিব এখনি॥

আমি। আপনার এই সব এখনও কণ্ঠস্থ আছে?

গিরীশ বাবু।— কাশীরাম কৃত্তিবাস আগাগোড়া মুখস্থ বলে যেতে পারি।

এই বলিয়া গিরীশ বাবু অঙ্গদ ও রাবণের উত্তর-প্রত্যুত্তর আবৃত্তি করিলেন। গিরীশ বাবু যখন তাঁর গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—

রামের বাণের সনে—নাহি তোর দেখা।
কাটা নাক কাণ দেখ ঘরে স্থর্পণখা॥
ঘরে আছে ভগিনী সে তোর নহে ভিন্ন।
বিদ্যমান দেখহ রামের বাণ চিহ্ন॥
রামের বাণের সনে হইলে দর্শন।
এক বাণে সংবশেতে মরিবি রাবণ॥
যত বাণ ধরেন শ্রীরাম গুণধাম।
অবোধ রাবণ শুন সে সবার নাম॥
অমর্ত্ত সমর্থ বাণ বলে মহাবল।
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কালান্ত অনল॥
উল্কামুখ বরুণ বিদ্যুৎ খরসান।
গ্রহপতি নক্ষত্র গগন রুদ্রবাণ॥
সূচীমুখ শিলীমুখ ঘোর দরশন।
সিংহদণ্ড বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন॥
কালদণ্ড ঐষিক দেখহ কর্ণিকার।
চন্দ্রমুখ অশ্বমুখ দেখ সপ্তসার॥
বিকট সঙ্কট বাণ সপ্ত ধারাধার।
অর্দ্ধচন্দ্র খুরপা আশুগ খুরধার॥
পশু পক্ষী অগ্নি আর অগ্নিমুখ বাণ।
কুবেরাস্ত্র রাজহংস বাণ বর্দ্ধমান॥
যমজ দুর্জ্জয় বাণ ভঙ্গ যে বিভঙ্গ।
ত্রিশূল অঙ্কুশ বাণ বায়ব্য আতঙ্গ॥
বজ্রবাণ গরুড় ময়ূর সুসন্ধান।
কাকমুখ ভেকমুখ কপোতক বাণ॥
বিষ্ণুচক্র ষট্‌চক্র বাণ হুতাশন।
সন্তাপন বিলাপন সংগ্রামে শমন॥
গজাঙ্ক সন্ধান বাণ চারিদিকে আঁটা।
সিংহ শার্দ্দূল তার চারিদিকে ঝাঁটা॥
এত বাণ রঘুনাথ করেন সন্ধান।
যাঁর এক বাণে—বালি ত্যাজিলেক প্রাণ॥
যে বালির নিকটেতে তোর পরাজয়।
সে বালিকে মারিলেন রাম মহাশয়॥
বাল্যক্রীড়া যাহার শিবের ধনুর্ভঙ্গ।
কি সাহসে তার সঙ্গে যুদ্ধের প্রসঙ্গ॥
ভেদিলেন সপ্ততাল রাম এক শরে।
তাঁর তুল্য বীর কি আছয়ে চরাচরে॥
কি হেতু দেখিস্ রে পাকল করি আঁখি।
মাকড়ের ডিম্ব হেন তোর লঙ্কা দেখি॥
তোর কাছে আসি তোরে নাহি করি শঙ্কা।
উপাড়িয়া লইতে পারি স্বর্ণপুরী লঙ্কা॥
হের মুণ্ড দেখ মোর সুমেরুর চূড়া।
হের পদ দেখ মোর কৈলাসের গোড়া॥
হের হস্ত দেখ মোর বজ্রের সমান।
একই চাপড়ে তোর লইব পরাণ॥

তখন গিরীশ বাবুর আবৃত্তি শুনিয়া—মহাকবির বর্ণনা যেন চোখের সম্মুখে জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আমি তাঁর অদ্ভুত স্মরণশক্তি নিরীক্ষণ করলেম।

গিরীশ বাবু।—রামায়ণ-মহাভারতে এই দুই মহাকবি বাংলা ভাষায় এমন অপূর্ব্বভাবে রচনা ক'রেছেন যে শুধু পণ্ডিত শিক্ষিতের মধ্যে এঁদের প্রভাব সীমাবদ্ধ নয়—মুদীখানার দোকানে—চাষার কুঁড়েঘরে—আবালবৃদ্ধ বনিতার ভিতরে এঁদের প্রভাব—এঁদের রাজত্ব।

আমি। তার মূলে ধর্ম্ম বিশ্বাস সরল ভক্তি। লোকে বুঝুক না বুঝুক—ভক্তি বিশ্বাসে পাঠ করে। সেটা শুধু মহাকবিদের কবিত্ব-প্রতিভা নয়।—

গিরীশ বাবু।—বাংলার ঘরে ঘরে সে ভক্তি বিশ্বাস বিতরণ করেছেন এই দুই মহাকবি। —রামায়ণ মহাভারত এমন সরল প্রাঞ্জল—প্রাণস্পর্শী ভাষায় নানারসে নানাভাবে চরিত্রগুলি এমন জীবন্ত-জ্বলন্ত আকারে তাঁরা ফুটিয়ে তুলেছেন যে, কাশীরাম কৃত্তিবাস বাঙালীর হাড়ে মাসে জড়িয়ে আছে।—কাশীরাম কৃত্তিবাসের ভিতর দিয়ে ব্যাস বাল্মিকীর পরিচয় সাধারণ লোকে পেয়েছে। যাঁরা শিক্ষিত পণ্ডিত-বিদ্বান—সংস্কৃতজ্ঞ তাঁদের কথা বল্‌ছি না।—সাধারণ লোকের ভিতর, বাংলার ঘরে ঘরে—এই দুই মহাকবির প্রভাব।—দেখ—মহাপুরুষদের ভাব চরিত্র—ঠিক এম্‌নি ভাবে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে যায়—কোনও সঙ্কীর্ণ—গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না—প্রকৃত মহাকবিদের কাব্যও তাই হয়। ইলিয়াদ্ ইনিয়াস্‌ও ইউরোপে তাই হয়েছিল। অন্ধ ভিক্ষুকও হোমার ভার্জ্জিলের কবিতা পথে পথে গেয়ে বেড়াত।—প্রকৃত মহাকাব্যের প্রভাব সার্ব্বজনীন, দেশ কাল পাত্র নির্ব্বিচারে বিদ্বান মূর্খ জ্ঞানী অজ্ঞানী বালক বৃদ্ধ—সকলকে অনির্ব্বচনীয় ভাবরসে পুষ্ট ক'রে মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। সাহিত্য এখানে বিশেষ কোনও শ্রেণী বা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়।—পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্রবে আস্‌বার পূর্ব্বে বাংলা দেশে বাংলা সাহিত্য নিজের স্বাধীনভাবে পরিপুষ্ট হয়ে সমগ্র বাঙালী জাত্‌কে অপূর্ব্ব রসধারায় প্লাবিত কর্‌ছিল—সেই ভাব ও রসের অনুভূতি ছিল বাংলার খাঁটী নিজস্ব। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বৈষ্ণব মহাজনপদ-রচয়িতারা, কবিকঙ্কণ, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, রামপ্রসাদ—ভারতচন্দ্র—ঈশ্বরগুপ্ত—নিধুবাবু—গোপাল উড়ে—দাশুরায়, কবির দল, পাঁচালীর দল—বাঙালীর ঘরে ঘরে প্রভাব বিস্তার ক'রেছিলেন—হাটে মাঠে ঘাটে—এঁদের গান হাজার হাজার লোকের কণ্ঠে। কিন্তু সব ক্রমশঃ আদিরসপ্রধান হয়ে এক ঘেয়ে হ'য়ে যাচ্ছিল। গুপ্ত কবি ব্যঙ্গরসে পরিবর্ত্তন আন্‌লেও তাঁর আদিরসের বাহুল্যও বড় কম ছিল না। ভাষায় যে প্রাণশক্তি সজীব ছিল—তা ক্রমশঃ নির্জ্জীব হচ্ছিল—ঠিক এম্‌নি সময়ে—পাশ্চাত্য সাহিত্যের স্পর্শে বাংলা সাহিত্যের নব প্রাণসঞ্চার কর্‌লে। মাইকেল অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে পাশ্চাত্য ভাষার ছন্দে সুরে পাশ্চাত্য সাহিত্যের মাধুরী দিয়ে বাংলা ভাষাকে অপূর্ব্ব তেজ ও লালিত্য প্রদান কর্‌লেন। পূর্ব্ব-পশ্চিমের অপূর্ব্ব সমন্বয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলা ভাষায় যে গম্ভীর ঝঙ্কার তুল্‌লে তাতে সমগ্র শিক্ষিত বাঙালীর হৃদয়তন্ত্রী বেজে উঠ্‌লো। নাটক, কবিতা, উপন্যাস বর্ত্তমান গদ্য পদ্য সাহিত্যে মাইকেলের বীণার ঝঙ্কারে ধ্বনিত হল সেই প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলনগীতি। এই সুর ধীরে ধীরে বাংলার জাতীয় সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করুচে।

আমি। কিন্তু আমাদের দেশে একদল সাহিত্যিক আছেন, তাঁরা আমাদের এই বাংলা সাহিত্যকে এই পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে দেখ্‌তে চান। তাঁরা বলেন এখনকার সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের অনুকরণ—এই সাহিত্য বাংলার জাতীয় সাহিত্য নয়।

গিরীশ বাবু বিরক্তিভরে বলিলেন—সর্ব্বত্রই গোঁড়ামি ভাল নয়।—ভাবের আদান প্রদানে

ভাব পুষ্ট করে। ইংরাজী সাহিত্য—পাশ্চাত্য সাহিত্য—যে অপূর্ব্ব জ্ঞানভাণ্ডার, যে শিল্প-সৌন্দর্য্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তাকে অস্বীকার কর্‌া মানে সূর্য্যের তেজকে মান্‌বো না ব'লে চোখ বুজে থাকা।—Artistএর জাত্‌বিচার নেই—স্রষ্টার অনন্ত সৌন্দর্য্য অনন্ত ভাব তার লক্ষ্য। বীণাপানির সভায় সব জাতের সমান অধিকার। তবে একটা কথা জেনে রেখ—কোনও জাতীয় সাহিত্য তার জাতীয় ভাব ছাড়্‌তে পারে না।—পাশ্চত্যদেশে যেমন ইংরাজী সাহিত্য, গ্রীক সাহিত্য জার্ম্মাণ সাহিত্যের একটা পৃথক পৃথক রূপ বা ভাব আছে, বাংলা সাহিত্যে তেমনি একটা স্বতন্ত্র রূপ আছে, সেটা ভুল্‌লে চলবে না, মহাকবি মাইকেল সেই স্বতন্ত্র রূপকে বিদেশী সাহিত্যের পুষ্পালঙ্কারে আরও উজ্জ্বল ও প্রাণময় ক'রেছিলেন। অবশ্য এই নূতন ভাবে mass literature থেকে বাংলা সাহিত্য একটু পৃথক হয়ে পড়্‌লো, কিন্তু ক্রমে ক্রমে শিক্ষা ও কালের আবর্ত্তনে দেশের ও জাতের ইহা প্রাণস্পর্শ কর্‌বে। বাংলা সাহিত্যের সেই গৌরবের দিন আস্‌বেই আসবে।

আমি। আমার বোধ হয় প্রাচীন বাংলা ভাষায় একটা প্রাণ ছিল, কিন্তু ইদানীন্তন বাংলা সাহিত্যে সে প্রাণ নেই।—গুহক চণ্ডালে দাশরথী রায় যে আদর্শ সৌখ্যরসের ছবি দিয়েছেন, তুচার ছত্রে তার প্রাণের আকুলতা ও বন্ধুত্বের একটা সজীব মূর্ত্তি এঁকে দেখিয়েছেন—আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা কোথায়?

গুহকের মুখ দিয়ে দাশরথী বলিয়েছেন—

ব'লে গেলিনে বলে ভাই! ভেবেছিনু আমি চিতে।
দীনকে বুঝি ভুলে গেছ, দিন পেয়ে রে রামা মিতে!
গণ্য না করিয়ে মোরে, অন্য পথে গেলে পরে,
ত্যজিতাম রে! প্রাণ, বাণ দান করে হৃদয় পরে,
নতুবা জীবনে যেতাম জীবন সঁপিতে॥
আশা দিয়ে গেলি যে কালে, আসিব বলে আসা-কালে
সেই আসার আশাতে তব আশাপথে,—
সতত নবঘনরূপ জাগিছে মম অন্তরে,
গগনে দেখি নবঘন, ঘন ঘন নয়ন ঝরে
ভালবাসিরে মিতে তোরে জীবন সহিতে।

"ভালবাসিরে মিতে তোরে জীবন সহিতে।"—এই খানে একজন চণ্ডালের মুখের ভাষায় হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা ও প্রেম একসঙ্গে মূর্ত্ত হ'য়ে প্রকাশ হয়েছে।

গিরিশবাবু। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে—যেটা ছিল—যাকে তুমি প্রাণ বল্‌চো—সেটা সরলতা। সরলতা—নিজেই সুন্দর—মধুর—চিত্তাকর্ষক। সমাজ যেমন দিন দিন complex হচ্চে—সাহিত্য ও শিল্পও তেম্নি 'complex হচ্চে। এটাই তুনিয়ার নিয়ম। প্রাণ না থাকলে

সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। এই প্রাণের স্পন্দনে যার যেমন অনুভূতি হয়—তার তেমন প্রকাশ। সূক্ষ্মদৃষ্টি, বিচার অভিজ্ঞতা শুধু পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি নয়—কলাবিজ্ঞানের ভিত্তিও তাই। —কালের পরিবর্ত্তনে যেমন সব জিনিষের পরিবর্ত্তন হয়—ভাষার আকারের সেই রকম পরিবর্ত্তন হয়। Forms of expression যুগে যুগে বদলায় - এটা ধ্রুব সত্য। বর্ত্তমান সাহিত্যে যে প্রাণ নেই—তা নয়, তবে প্রাচীন সরলতা নেই। সরলতার যে সরসতা আছে—সেটার অভাব হ'তে পারে। অনুকরণের ঠেলায় প্রাণের অনুভূতি চাপা প'ড়ে কতকগুলো কৃত্রিম ভাব এসে পড়াই স্বাভাবিক। সে রকম আগাছা সব দেশের ভাষাসাহিত্যেই হয়েছে - তবে কম আর বেশী। কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হ'য়ে বাংলা ভাষা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ ক'রেছে, ভাষার দেহ প্রাণ সতেজ হ'য়েছে,—পরে জগতের সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের আদর হ'বে—তার উপাদান যথেষ্ট আছে এবং পরে আরও হবে। বর্ত্তমানকালে সর্ব্ববিধ পাশ্চাত্য সাহিত্যের তুলনায় অবশ্য বাংলা সাহিত্যের দৈন্য প্রকাশ পাবে। এখনও স্কট সেক্সপীর মিল্টন বাইরণ শেলী কিট্‌সের প্রতিধ্বনি বাংলা সাহিত্যে শিক্ষিত বাঙ্গালী খুঁজে বেড়ায় এবং এই খেতাবই কবি ঔপন্যাসিককে দিয়ে সব গর্ব্ব ক'রে বেড়ায়। এই মোহ কেটে গিয়ে যখন আমরা ধার করা পরিচয়ে নয়—নিজের পরিচয়ে—গৌরব বোধ করব—তখনই বাংলা সাহিত্য সত্যিকার প্রাণরসে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠ্‌বে—জগতের আসরে নিজের অধিকার প্রচার করবার জন্য কোনও সার্টিফিকেটের দরকার হ'বে না।—জগত আপ্‌নি তার পায়ের তলায় নুইয়ে পড়ে। যথার্থ মহাপ্রাণ মহাকবি নিজেদের জীবনে বোধ হয় বড় একটা লোকমান্য খ্যাতি আদর সম্ভ্রম পায় না—হয়তো অনেকে তাঁর জীবনকালে তাঁর প্রতিভা এক কড়া কাণাকড়ির মূল্য ব'লেও বিবেচনা করে না -কিন্তু উত্তরকালে মধ্যাহ্ন ভাস্করের চেয়েও দীপ্তিমান হয়ে তিনি প্রকাশ পান- জাতি তার গর্ব্বে গৌরব করে। এই দেখ না সেক্সপীর। যদিও সাধারণ দর্শক তাঁর নাটক অভিনয় দেখ্‌তে ভালবাস্‌তো—কিন্তু সেটা একটা সাময়িক হুজুগমাত্র ছিল। সে সময় Ben Johnsonএর নাটকের কাট্‌তি বেশী —শিক্ষিতের মধ্যে -ইংরেজ জাতের মধ্যে তার আদর বেশী। দুশ' আড়াইশ বছর পরে—সেক্সপীরের নাটক সমাদৃত হ'ল—ইংরাজ জাত মহাকবির নামে মেতে উঠ্‌লো—তাঁর জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র হ'ল। এমন কি কার্লাইল তাঁর Hero worshipএ বলে উঠ্‌লেন "In spite of the sad state Hero-worship now lies in, consider what this Shakspeare has actually become among us. Which Englishman we ever made, in this land of ours, which million of Englishmen, would we not give up rather than Stratford Peasant? There is no regiment of highest Dignitaries that we would sell him for. He is the grandest thing we have yet done. For our honour among foreign nations, as an ornament to our English Household, what item is there that we would not surrender

rather than him? Consider now, if they asked us, will you give up your Indian Empire or your Shakspeare, you English; never have had any Indian Empire or never have had any Shakspeare? Really it were a grave question. Official persons would answer doubtless in official language, but we, for our part too, should not we be forced to answer. Indian Empire or no Indian Empire we cannot do without Shakspeare. Indian Empire will go at any rate, some day; but this Shakspeare does not go, he lasts forever with us. We cannot give up owr Shakspeare. বাস্তবিকই এটা শুধু জাতিগত উক্তি নয়—প্রকৃত Artistদের কথা।

আমি। কেহ কেহ কালিদাসকে সেক্ষপীরের অপেক্ষা বড় কবি বলেন—আবার কেহ কেহ সেক্ষপীরকে কালিদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলেন। কোন্‌টা ঠিক?

গিরীশ বাবু। দুই মহাকবি'র ছোট বড় তুলনা হয় না। কালিদাস প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্য বিশেষণ করিয়ে দেখিয়েছেন। মানবের সঙ্গে প্রকৃতির যে সম্বন্ধ—Nature in all its relations to human mind দেখিয়েছেন। তাই তাঁর কাব্যের উপমাগুলিও অতুলনীয়। নাটকগুলিতে মানবচরিত্রের ভাববিকাশ ঘটনার সন্নিবেশ, অপূর্ব্ব নাটকীয় চরিত্রের সৃষ্টি এবং inimitable dramatic touches আছে - কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর নাটকের হাব ভাব গতি—উদ্দাম উচ্ছ্বাস—শান্ত সংযত মৃদু কোমল ও সৌম্য ভারতীয় আদর্শের ও কল্পনার অনুরূপ,—মানবচিত্ত ও বাহ্যপ্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য—তারই ঝঙ্কার।

সেক্ষপার—পাশ্চাত্য জগতের কর্ম্মদ্বন্দ্বের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সমগ্র মানব জাতির মনোজগতের অদম্য পিপাসা উচ্ছ্বাস ক্রূরতা সরলতা প্রেম নিষ্ফলতা—স্তরে স্তরে দেখিয়েছেন।—জীবনের বিয়োগান্ত মিলনান্ত ঘটনায় analytical ছবি জীবন্তভাবে জীবন্তভাষায় দেখিয়েছেন। মনোজগতের প্রতিবিম্বরূপে তিনি প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ ক'রেছিলেন।—দুইজনের সম্পূর্ণ পৃথক সৃষ্টি পৃথক কল্পনা। সেক্ষপীর মনোজগতের master artist, ইউরোপের কর্ম্ম-বহুল স্বাধীন সমাজের বৈচিত্র্যগতিতে—বিভিন্ন হৃদয়বৃত্তির বিকাশ পায়—মহাকবি সেক্ষপীর তাই সর্ব্ববিধ মনোবৃত্তি নিরীক্ষণ ক'রে কল্পনার কল্পলোকে অতুলনীয় শিল্প-তুলিকায় নূতন জগত সৃষ্টি ক'রেছেন। দুইজনই অদ্ভুত অসামান্য প্রতিভাশালী,—আমি দুইজনকে নমস্কার করি। কিন্তু আমি সেক্ষপীরের আদর্শের অনুকরণে নাটক রচনা ক'রেছি। তিনিই আমার আদর্শ। আমার বিশ্বাস Dramatic artএর এত বড় শ্রেষ্ঠ আদর্শ জগতে অতুলনীয়। Dramatic artএর পরিপূর্ণ ছবি—সেক্ষপীরের ভিতর দেখ্‌তে পাওয়া যায়—এইটী আমার ব্যক্তিগত মত। আমি কখনও বাঁধা ধরা নিয়মের ভিতর চল্‌তে পারিনি,—জীবনেও নয়—সাহিত্যেও নয়। আমাদের বাংলা সাহিত্য ইংরেজী বা সংস্কৃতের প্রতিধ্বনি হবে, আমি তা মনে করি না। নিজের ভাবে নিজের স্বাধীন কল্পনায় নিজের সৌন্দর্য্যে দাঁড়াবে। কবি যেমন পারিপার্শ্বিক জগতের সহায়তায় কল্পনারাজ্যে বিচরণ করেন, তেমনভাবে পূর্ব্বগামী কবি ও চিন্তাশীল লেখকদের ভাবরাশির উপাদান সাহায্যে তিনি তাঁর কল্পনা-সৌধ নির্ম্মাণ করবেন, তাতে সন্দেহ নাই।

এই সব আলোচনা হইতে হইতে রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল—আমি তাঁর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম।

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

স্বর্গ

(১)

এই ধরায়ই জনম আমার, মায়ের বুকের ছেলে,
কোথায় যাব স্বর্গে আমি এই ধরণী ফেলে ?
বাতাস হেথায় গন্ধে ভরা, আকুল করে প্রাণ,
গাছের দোলায় দয়েল, শ্যামা উষায় করে গান,
মোহন ছবি বালক রবির ফাগ্ মাখান মুখ,
সোনার বরণ স্নিগ্ধ কিরণ নাচিয়ে তোলে বুক,
বনের কোলে ময়ূর দোলে হরিণ শিশু খেলে,
কোথায় যাব স্বর্গে আমি এই ধরণী ফেলে ?

(২)

কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে জোনাকীদের মেলা,
শালিক পাখীর কিচির মিচির সন্ধ্যা সকালবেলা,
কাঠবিড়ালী বেড়ায় ছুটে গাছের ডালে ডালে,
রাখাল হেথায় বংশী বাজায় গো-মহিষের পালে ;
সন্ধ্যা যবে ঝিল্লীরবে বধির করে কাণ,
কানন মাঝে মন্দ্র বাজে পিক-পাপিয়ার তান,
স্বপ্নলোকের ছবি জাগে গোপন হৃদয় পুরে,
এই ধরণী ছেড়ে আমি কোথায় যাব দূরে ?

(৩)

জ্যোৎস্নানীরে দিগঙ্গনা যখন করি স্নান,
স্তব্ধ রাতে বিশ্বপাটে করেন ব'সে ধ্যান,
পবন তারে ব্যজন করে লক্ষ্মী মেয়ের মত,
কানন তারে বরণ করে দেউটী ল'য়ে শত,
সাগর ধোয়ায় চরণ তাঁহার ঢেউয়ের ঝারি ঢালি,
আকাশ ঢালে তাহার পায়ে লক্ষ হীরার ডালি,
মনো বিমোহন ছবি এমন ছাড়তে কিগো পারি,
কোথায় যাব স্বর্গে আমি এই ধরণী ছাড়ি ?

(৪)

আমার মায়ের শৈলরাজি উচ্চে তুলি শির
তুহিন ছলে কেশের জলে নিত্য যোগায় নীর,
অভ্রভেদী তরুর সারি বিরাট হৃদয় ল'য়ে,
কি গাম্ভীর্য্যে অতুল বীর্য্যে দাঁড়িয়ে শত্রু জয়ে,
ঊর্দ্ধে, নীচে, সাম্নে, পিছে শুভ্র মেঘের মেলা,
রঙ্গ-বেরঙ্গে তাহার সঙ্গে রৌদ্র ছায়ার খেলা,
ফাঁকে ফাঁকে দেবতা ডাকে অচিন্ মধুর বোলে,
এই মায়েরে ছেড়ে আমি কোথায় যা'ব চ'লে ?

(৫)

সেথায় কিবে নদীর নীরে দিবাশেষের রবি,
লক্ষ দোলায় আলোর খেলায় ফুটায় এমন ছবি ?
চূড়ায় এমন রজত বরণ রাকা নিশির শশী
শুভ্রহাসি সুধার রাশি নীল আকাশে বসি ?
গাছের মাথায়, লতায়, পাতায়, ফুলের, ফলের গায়
মুক্তামণির তরলতা ঢেউ খেলে কি যায় ?
দৃশ্যে দৃশ্যে বিশ্বে মোহের মুগ্ধ দিবা যামি
এই ধরণী ছেড়ে স্বর্গে কোথায় যাব আমি ?

(৬)

হেথায় আমার রাত্রি কাটে মধুর কাব্য পাঠে,
স্বপ্নলোকের স্বর্গ গড়ি অলস দুপুর কাটে ;
সাঁঝের মঠে শঙ্খ-ঘণ্টা যখন উঠে বাজি,
চিত্তে ফোটে কি অপূর্ব্ব ভাব কুসুমের রাজি,
উপনিষৎ, গীতা, বেদের মন্ত্র কত শত,
আমাদের এই বিশ্বে করে স্বর্গে পরিণত ;
বিশ্ব ছেড়ে কোথায় যাব, কোথায় এমন দেশ ?
এই ত আমার সত্য স্বর্গ, এই ত আছি বেশ।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

ভারতে গণিত-চর্চ্চা

আর্য্যজাতি অতি প্রাচীনকালে প্রকৃতির গর্ভ হইতে গণিতজ্ঞান সঞ্চয় করিয়া অপরিমেয় জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার বেদমধ্যে বীজরূপে নিক্ষিপ্ত রাখিয়াছিলেন। কালে সেই বীজ অঙ্কুরিত ও শাখা পল্লবাদি-শোভিত হইয়া, পণ্ডিতগণের মনোরঞ্জন এবং আজ সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া অখণ্ড কীর্ত্তি-স্থাপন করিয়াছে।

ধর্ম্মপরায়ণ আর্য্যগণ যজ্ঞ-সম্পাদনের জন্য যে সকল গ্রন্থের চর্চ্চা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে জ্যোতিষ অন্যতম। এই সকল শাস্ত্র বেদের অঙ্গীভূত বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছিল। বেদাঙ্গ ছয়টী শাখায় বিভক্ত (১)। বৈদিক মন্ত্র কণ্ঠতালব্যাদিভেদে যথাযথরূপে উচ্চারণের জন্য শিক্ষা, যাগক্রিয়ার উপদেশ-সম্বলিত কল্প, মন্ত্রসকলকে অবয়ব দান করিবার জন্য ছন্দঃ, সাধু শব্দবিন্যাসের জন্য ব্যাকরণ ও বর্ণাগম ও বর্ণবিপর্য্যয় প্রভৃতির কারণ নির্ণয়ের নিমিত্ত নিরুক্তের সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং যজ্ঞ-সম্পাদনের উপযুক্ত কাল নিরূপণের নিমিত্ত অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্য কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, গগনমণ্ডলের কোথায় কোন নক্ষত্রের উদয় হইলে, কোন যজ্ঞসম্পাদন করা বিধেয়, তাহা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারণের জন্য আর্য্যগণ জ্যোতিষের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বেদাঙ্গ জ্যোতিষকার লগধমুনি বলিয়াছেন, "যজ্ঞার্থ বেদসকল অভিপ্রবৃত্ত হইয়াছে, যথাকালে অনুষ্ঠিত না হইলে, যজ্ঞ ফলপ্রসূ হয় না, অতএব যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হইলে, কালজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। জ্যোতিষ কালবিজ্ঞান শাস্ত্র। যিনি এই কালবিধান শাস্ত্র জ্যোতিষ অবগত আছেন তিনিই যথার্থ যজ্ঞতত্ত্বজ্ঞ।" (২)। ভাস্করাচার্য্যও ঠিক এইরূপই বলিয়াছেন (গণিতাধ্যায়, মধ্যমাধিকার, ৯)। কালজ্ঞানমূলক জ্যোতিষের আলোচনা গণিতজ্ঞানসাপেক্ষ। ঋগ্বেদপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালেই তিথিগণনা (ঋক্ ২।৩২), নক্ষত্রগণনা (ঋক্ ১০।৮৫।২,১৩), মলমাসগণনা (ঋক্ ১।২৫।৮), এবং ঋতুগণনার (১০।৮৫।১৮) সূত্রপাত হইয়াছিল ; এমন কি অত্রিবংশীয় ঋষিগণ গ্রহণ গণনাতেও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন (৫।৪০।৫-৯)। এইরূপে আমরা বলিতে পারি, বেদের জন্মকালেই গণিতজ্ঞান বিকসিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়—শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, মোক্ষমূলর, বেবর, মার্টিন হৌগ প্রভৃতির নির্ণীত কাল অবলম্বন করিয়া—স্থির

---

(১) শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষং তথা।
ছন্দশ্চেতি ষড়ঙ্গানি বেদানাং বৈদিকা বিদুঃ॥ শব্দরত্নাবলী।

(২) বেদাহি যজ্ঞার্থমভিপ্রবৃত্তাঃ কালানুপূর্ব্বাবিহিতাশ্চ যজ্ঞাঃ। তস্মাদিদং কালবিজ্ঞানশাস্ত্রং যো জ্যোতিষং বেদ স বেদ যজ্ঞং॥ ৩ বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ॥

করিয়াছেন যে, ঋগ্‌যজুর্বেদাঙ্গ জ্যোতিষ খৃঃ পূঃ ১২০০ হইতে ১৪০০ বৎসর মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। দীক্ষিত মহাশয় শতপথ-ব্রাহ্মণ (২।১।২) হইতে স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে, শকের প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতে নক্ষত্রগণনা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের বয়স নিরূপণ করিতে দীক্ষিত মহাশয় বলিয়াছেন যে, ঋগ্বেদ শকবর্ষের ৬০০০ বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীন। অতএব ভারতীয় গণিতজ্ঞানের প্রথম বিকাশ যে, ৮০০০ বৎসরেরও প্রাচীন, নিঃসন্দেহে তাহা বলিতে পারা যায়।

ঋগ্বেদের মধ্যে গণিতের প্রক্রিয়া ও বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া না যাইলেও, তৎকালে গণিতের প্রকৃতি কিরূপ ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালেও যে আর্য্যগণ যোগ, বিয়োগ গুণন, হরণ—গণিতের চারিটী মূল প্রক্রিয়া অবগত ছিলেন, তাহা ঋগ্বেদের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বুঝিতে পারা যায়। "আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতং মধুপে যমশ্চিনা" (ঋক্ ১।৭।৩৪।১১) ঋকার্দ্ধের "ত্রিভিরেকাদশৈঃ" শব্দের টীকায় সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন, "ত্রিভিঃ একাদশৈঃ একাদশানাং পূরণৈঃ" অর্থাৎ তিন গুণিত একাদশ—৩×(১০+)=৩৩ বুঝাইতেছে। "চতুঃভিসাকং নবতিং" (১।২৭।১৫৫।৬) এর টীকায় সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন, "সাকং সহিতাং নবতিং চ। চতুর্নবতিমিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ ৯০+৪=৯৪। পণ্ডিতবর মিউয়র (Muir) "চতুর্ভিঃ নবতিং" অর্থে চারি গুণ নব্বই অর্থাৎ ৩৬০ করিয়াছেন। "আ পুত্রা অগ্নে মিথুনসো অত্র সপ্তশতানি বিংশতিশ্চ তস্থুঃ" (ঋক্ ১।১৬৪।১১) অর্থে সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন, "সপ্তশতানি বিংশতিশ্চ বিংশত্যুত্তরসপ্তশত সংখ্যকাঃ", অর্থাৎ ৭×১০০+২০=৭২০। ঋগ্বেদ হইতে আরও একটী উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে—

"ত্বমেতাঞ্জনরাজ্ঞোর্দ্বির্দশাবন্ধুনাসুশ্রবসোপজগ্মুষঃ।
ষষ্ঠিং সহস্রা নবতিং নব শ্রুতো নি চক্রেণ রথ্যা দুষ্পদাবৃণক্।" ১।৫৩।৯

অর্থাৎ, 'হে ইন্দ্র অতি বিখ্যাত আপনি সহায়বিহীন সুশ্রবা রাজা কর্ত্তৃক আক্রমিত বিংশতি সংখ্যক জনপদাধিপতি ও তাহাদের ষষ্ঠিসহস্র নিরানব্বই সংখ্যক অনুচর শত্রুনাশক দুর্ব্বর চক্র দ্বারা বিনাশ করিয়াছিলেন।' এই স্থানেও 'দ্বির্দশ'=২×১০=২০, এবং 'ষষ্ঠিসহস্রা নবতিং নব'=৬০×১০০০+৯০+৯=৬০০৯৯ বুঝাইতেছে। উপরি উদ্ধৃত ঋক্-সমুদায়ে—গণিত বিজ্ঞানের অন্তর্গত পাটীগণিতের কোন উল্লেখ না থাকিলেও—পাটীগণিতের প্রক্রিয়াসমূহ বেশ প্রকাশ পাইতেছে। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষেও গণিতের প্রক্রিয়া বুঝিবার উপায় নাই, কারণ লগধমুনি ও শেষ কৃত যে দুইখানি বেদাঙ্গ জ্যোতিষ পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় জ্যোতিষ—গণিত নহে, তাহাতে জ্যোতিষেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দর্শিত হইয়াছে—গণিত-মূলক কোন ক্রিয়া প্রদর্শনের প্রয়োজনই তাহাতে হয় নাই।

ভারতীয় গণিত চিরকালই জ্যোতিষের আশ্রয়ে লালিত হইয়াছে, কোন দিনই স্বাতন্ত্র্য

অবলম্বন করিয়া স্পর্দ্ধা-প্রকাশ করে নাই। যজ্ঞসম্পাদনের নিমিত্ত কালজ্ঞানের আবশ্যক হইয়াছিল; উপযুক্ত কাল-নিরূপণের উপায় স্বরূপ গণিতের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছিল। কাজেই জ্যোতিষের শ্রীবৃদ্ধিতে ভারতীয় গণিত গর্ব্বিত, এবং জ্যোতিষের অবনতিতে ভারতীয় গণিত হতশ্রী। যে কেহ জ্যোতিষের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাকেই গণিতের আশ্রয় লইতে হইয়াছে—গণিতের আশ্রয় ব্যতিরেকে জ্যোতিষের রম্য হর্ম্মে প্রবেশ-লাভ সুদূরপরাহত।

ভারতবর্ষে দ্বিবিধ বিদ্যার চর্চ্চা হইত। মুণ্ডক উপনিষদ্ বলিয়াছেন, (৩) "বিদ্যা দ্বিবিধ—পরা এবং অপরা। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ অপরা বিদ্যা; এবং যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মের জ্ঞান হয় তাহাই পরা বিদ্যা নামে অভিহিত।" অপরা বিদ্যা বেদাঙ্গ-শাস্ত্র-সমূহ মধ্যে জ্যোতিষ সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। শিক্ষা এবং ভাস্করাচার্য্যের গণিতাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে,—বেদরূপী পুরুষের ব্যাকরণ মুখ, জ্যোতিষ চক্ষুঃ, শিক্ষা নাসিকা, নিরুক্ত কর্ণ, কল্প হস্ত এবং ছন্দঃ তাহার পদ-দ্বয়। ৪) চক্ষুঃ যেমন সকল অঙ্গের শ্রেষ্ঠ, হস্তপদ নাসিকাদি-সম্পন্ন মানব যেমন চক্ষুহীন হইলে কোন কার্য্যই করিতে পারে না, সেইরূপ জ্যোতিজ্ঞানহীন বেদদ্বারা কোন ধর্ম্ম কার্য্যই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। দ্বিজমাত্রেরই জ্যোতিষ অবশ্যপাঠ্য। লগধমুনি বলিয়াছেন, "চূড়া যেমন ময়ূরগণের শিরোভূষণ, মনি যেমন সর্পের মস্তকের সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক—সেইরূপ সমস্ত বেদাঙ্গ-শাস্ত্রের শিরঃশোভা গণিত। (৫) এইরূপে গণিত বা জ্যোতিষ সকল শাস্ত্রের শিরোদেশে অধিরূঢ় থাকিয়া, স্মরণাতীত কাল হইতে তাহার চর্চ্চা অব্যাহত রাখিয়াছে।

বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সহিত গণিতের অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলিত; ছান্দোগ্যোপনিষদে গণিতালোচনার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে (১।৭।২।৪৭৬,৪৮০)। রামায়ণ (১।৮০।৪; ২।২।৬), মহাভারত (সভা, ১১ অঃ) পাঠেও গণিতালোচনার পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের জীবনীপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি গণিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। (ললিত বিস্তর)।

(৩) দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হস্ম যদ্ ব্রহ্ম বিদো বদন্তি পরাচৈবাপরা চ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি॥ মুং উং ১।১।৪, ৫॥

(৪) ছন্দঃ পাদৌতু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুঃ নিরুক্ত শ্রোত্রমুচ্যতে॥
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতং।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ শিক্ষা

ভাস্করাচার্যের গণিতাধ্যায় মধ্যমাধিকারে কালমানাধ্যায় ৯-১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৫) যথা শিখাময়ূরাণাং নাগানাং মণয়ো যথা।
তদ্বদ্বেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং গণিতং মূর্দ্ধনি স্থিতং॥ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ।

খৃষ্টের পরবর্ত্তী কালে রচিত বাণভট্টের কাদম্বরী, দশকুমারচরিত, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি কাব্য-নাটকেও গণিতগবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গণিতজ্ঞানে জগতের শিক্ষকপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

জ্যোতিষের আশ্রয়ে গণিত শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল সত্য, আবার জ্যোতিষের যে কিছু উন্নতি তাহা গণিত অবলম্বনে। ভাস্করাচার্য্য গোলাধ্যায়ে বলিয়াছেন, "প্রাচীন গণকগণ বলেন, শুভাশুভ ফলাদেশই জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু ফল লগ্ন ও গ্রহবলের আশ্রিত, লগ্ন ও গ্রহবল স্পষ্টগ্রহের অধীন। স্পষ্টগ্রহজ্ঞান, গোলজ্ঞানের অধীন। গণিতজ্ঞানভিন্ন গোলজ্ঞানও হইতে পারে। যে গণিতজ্ঞানহীন তাহার গোলাদির জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? ব্যক্তগণিত ও অব্যক্তগণিত নামক দ্বিবিধ গণিত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং শব্দশাস্ত্রে পটীয়ান্ ব্যক্তিই বহুভেদবিশিষ্ট এই জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠ করিবার অধিকারী অন্যথা কেবল জ্যোতিষী নামধারী হইয়া থাকে (৬,৭)।" ভারতবর্ষীয় গণিত ও জ্যোতিষ এরূপ নিকট সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ রহিয়াছে যে, তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিলে দুইই মৃতকল্প হইয়া পড়ে। সুভূতি জ্যোতিষকে গণিতশাস্ত্র বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন। জ্যোতিষই যে শুধু গণিতের আশ্রয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা নহে—প্রাচীন কালের দর্শন, পুরাণ, বৈদ্যক গ্রন্থ, ধর্ম্মশাস্ত্র, তন্ত্রগ্রন্থ প্রভৃতিও গণিতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আর অধুনাতন কালের কথা কি বলিব—পদার্থ-বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, স্থপতিবিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় ব্যবহারিক বিজ্ঞান গণিতের সাহায্যেই মস্তক উন্নত করিয়া তুলিয়াছে।

জ্যোতির্জ্ঞানের সহিত কালজ্ঞানমূলক গণিতের উৎপত্তি হইয়াছিল। আবার যাগযজ্ঞ সম্পাদনের উপযুক্ত ভূমি নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতে গণিতের অন্য এক শাখা উদ্ভূত হইয়াছিল। কোন্ যজ্ঞ কিরূপ বেদিকার উপর সংস্থাপিত করিতে হইবে—বেদিকা, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, বৃত্তাকার অথবা অন্য কোন আকার প্রাপ্ত হইবে—তাহা আর্য্যঋষিগণ বিচারের দ্বারা নিরূপণ পূর্ব্বক তাহাদের নির্ম্মাণের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। বেদিকার আকার যেমনই হউক, তাহাদের ক্ষেত্রফলে কোন তারতম্য থাকিত না। সুতরাং এইরূপ বেদিনির্ম্মাণে যথেষ্ট গণিতজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইত। যে সকল শাস্ত্রে যজ্ঞীয় বেদিনির্ম্মাণের প্রণালীসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহারা শুল্বসূত্র নামে অভিহিত। বৌধায়ন, আপস্তম্ভ, কাত্যায়ন, মানব, মৈত্রায়নীয় ঋষিগণ শুল্বসূত্রসমূহের রচক। এই শুল্বসূত্রগুলি কল্পসূত্রের অন্তর্গত এবং ভারতে—ভারতে কেন সমগ্র জগতে—জ্যামিতিজ্ঞানের প্রথম প্রচারক।

জ্যোতিষ যেমন কালজ্ঞানমূলক গণিতের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেইরূপ শুল্বশাস্ত্র হইতে স্থান পরিমাপক গণিতজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল। ভগবান পরাশর গণিতকে খগোলগণিত ও

ভূগোলগণিত এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (৬) খগোলগণিতের দ্বারা চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্রের উদয়াস্ত স্থির করিয়া কালজ্ঞান নিরূপিত হয়, এবং ভূগোলগণিতের দ্বারা ভূম্যাদির পরিমাপ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।—পাণিনিতে পরাশরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। রমেশ বাবু পাণিনির কাল খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দী অনুমান করিয়াছেন। কলির প্রথমেই মহাভারত রচিত হইয়াছিল বলিয়া বিখ্যাত। পরাশর মহাভারতকার বেদব্যাসের পিতা। দীক্ষিত মহাশয় ও অন্যান্য আধুনিক পণ্ডিতের মতে অন্যূন খৃঃ পূঃ ৫৫০ অব্দে মহাভারত রচিত হইয়াছিল। অতএব, অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে উক্ত দ্বিবিধ গণিতের সৃষ্টি হইয়াছিল।

বৈদিক ও পৌরাণিক জ্যোতিষে গণিতের পৃথক্ সত্তা লক্ষিত না হইলেও, পরবর্ত্তী কালে গণিতের পৃথক্ আলোচনার আবশ্যক উপলব্ধি হইয়াছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে যে সকল পাঠ্য নিরূপিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে 'রাশিবিদ্যা' এবং 'নক্ষত্রবিদ্যা' নামে দুইটী বিদ্যার উল্লেখ পাই। (৭) ভগবান শঙ্করাচার্য্য 'রাশিং' ও 'নক্ষত্রবিদ্যাং' শব্দদ্বয়ের ভাষ্যে যথাক্রমে 'গণিতং' ও 'জ্যোতিষং' লিখিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, উপনিষদ্ রচনার সময়েই গণিত ও জ্যোতিষ পৃথক্‌রূপে আলোচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সূর্য্যসিদ্ধান্তের গণনা প্রণালী দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত রচনার পূর্ব্বেই গণিত পৃথক্‌ভাবে আলোচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তে বিশুদ্ধ গণিতের কোন স্বতন্ত্র অধ্যায় সন্নিবিষ্ট হয় নাই। ইহার পরবর্ত্তী প্রায় জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত গ্রন্থেই বিশুদ্ধ গণিতের স্বতন্ত্র অধ্যায় আলোচিত হইয়া গণিতের অভাবনীয় উন্নতি প্রদর্শিত হইয়াছে। আর্য্যভট্টের গ্রন্থেই সর্ব্বপ্রথম গণিতের পৃথক্ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি জ্যামিতি সম্বলিত পাটীগণিত এবং 'কুট্টম' নামে বীজগণিতের প্রচার করেন। ক্রমে লল্লাচার্য্যের পাটীগণিত; ব্রহ্মগুপ্তের ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের অন্তর্গত পাটীগণিত, জ্যামিতি ও বীজগণিত; শ্রীধরাচার্য্যের বীজগণিত ও ত্রিশতিকাখ্য পাটীগণিত; পদ্মনাভের বীজগণিত; দ্বিতীয় আর্য্যভট্টের মহাসিদ্ধান্তের অন্তর্গত পাটীগণিত, জ্যামিতি ও বীজগণিত; ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী ও বীজগণিত প্রভৃতি মহামূল্য গ্রন্থসমুদায়ে স্বাধীন গণিতগবেষণার ফল প্রদর্শিত হইয়াছে। শুল্বসূত্রসমূহ জ্যামিতির জনক হইলেও, কালে এই সূত্রগুলি লুপ্ত হইলে, কুণ্ডসিদ্ধি নামক কতকগুলি ক্ষুদ্রগ্রন্থে বেদিনির্ম্মাণ প্রণালী বিবৃত হইয়াছিল। অতঃপর ১৬৪৬ শকে জগন্নাথ

(৬) "দ্বিবিধং গনিতং জ্ঞাত্বা শাখাস্কন্দং বিমৃশ্য চ।" * * * বৃহৎ পরাশর হোরা উত্তর ভাগ।
"ধঃ দ্বিবিধং খগোল-ভূগোল বিষয়ং গণিতং জ্ঞাত্বা।" * * * বৃহৎ পরাশর হোরা টীকা।

(৭) ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থ মিতিহাস পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজন বিদ্যামেতদ্ ভগবোঽধ্যেমি। ছান্দোগ্য ৭।২।৪৭ *cf* ছান্দোগ্য ৭।২।৪৮০, ৪৮১।

সম্রাটের 'রেখাগণিত' এবং অন্য এক গ্রন্থকারের 'সিদ্ধান্তচূড়ামণি' নামে দুইখানি জ্যামিতি গ্রন্থ য়ুক্লিডের (Euclid) জ্যামিতি হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যে শুধু পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতিরই আলোচনা হইয়াছিল, তাহা নহে। এই স্থানেই ত্রিকোণমিতি (trigonometry), চলনকলন (calculus) ও বলবিজ্ঞানের (dynamics) বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কতকাংশে শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, পূর্ব্ব গাণিতিকগণ তাঁহাদের কোন জীবনী বা ইতিহাস রাখিয়া যান নাই। তাঁহাদের অনেকেরই নাম বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। যে দুই চারি জন পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায় তাঁহাদের সকলের সমগ্র গ্রন্থ সুপ্রাপ্য নহে—অধিকাংশ পুথিই বিলাত ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে নীত হইয়াছে। এখনও যে কয়েকখানি গ্রন্থ আছে তাহারও আলোচনা দেশে লোপ পাইয়াছে। পাশ্চাত্য গণিতের শোভাসম্পদে মুগ্ধ হইয়া আমাদের ঘরের বার্দ্ধক্য-জর্জ্জরিত গণিতগ্রন্থকে অনাদরে কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছি। হায় হতভাগ্য আমরা! একবার নাড়িয়াও দেখি না পলিতকেশ লোলচর্ম্ম পঙ্গুসদৃশ সেই গণক আমাদের জন্য কি জ্ঞানভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন! সেই ভাণ্ডারে যক্ষ কোন্ গুপ্তধন রক্ষা করিতেছে!

শ্রীফণিভূষণ দত্ত

ফতেপুর সিক্রীর স্বপ্নপুরী

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া ফতেপুর সিক্রী যাইবার জন্য বম্বে-বরোদা রেল লাইনের গাড়ি ধরিতে, আমি, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নারাণ চন্দ্র দে ও শ্রীমান ফটু এই তিনজনে ফটুর বাসা হইতে তার হিন্দুস্থানী পাচক চিন্তাকে লইয়া আগ্রা ষ্টেশনে যাইয়া গাড়ি ধরিলাম। আগ্রা হইতে সিক্রী প্রায় তেইস মাইল যাইতে হয়। আলিগড় কলেজের কয়েকটি মুসলমান ছাত্র গাড়িতে ছিল, উহাদের সহিত আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্প শুনিতে শুনিতে ও রেলপথের উভয় পার্শ্বের প্রাতঃসৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে বেলা ৮টার সময় গাড়ি ফতেপুর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। রেললাইন পুরাতন প্রাচীর বেষ্টিত সহরের বুক চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র ষ্টেশনটি প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত।

গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া জানিলাম দ্রষ্টব্য স্থানগুলি নিকটেই। ষ্টেশন হইতেই একজন গাইড্ আমাদের সঙ্গ লইল। তাহার সহিত আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দেখিলাম প্রায় সমস্ত লোক যাঁহারা আসিয়াছেন সকলেই এক পথের যাত্রী। একটু যাইতেই অদূরে এক প্রাচীন, স্থানে স্থানে জীর্ণ, দুর্গ নয়নপথে পতিত হইল। গাড়ি হইতে নগর প্রাচীর

দেখিয়া উহাকে দুর্গ প্রাকার বলিয়া যাহা মনে হইয়াছিল, বুঝিলাম উহা আমার ভুল হইয়াছিল। দুর্গের নিকট পর্য্যন্ত সে পথে কোন লোকের বসতি বা পল্লীচিহ্ন দেখিলাম না। মাঠের বিভিন্ন প্রকার ওলি ফসলের শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া বক্র পথ। এই পথপ্রান্তে দুর্গের পাদমূলে জনবিরল পল্লীতে নিম্ব বট বকুল বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন স্তব্ধ প্রান্তর পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র শিবালয় সান্নিধ্যে তরুমূলে আমাদের জিনিষপত্র আমাদের লোকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া মধ্যাহ্নের ব্যবস্থা করিবার আদেশ করিয়া উহার সম্মুখের পথপার্শ্বের দ্বার ধরিয়া আমরা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়, ফতেপুর সিক্রীতে পূর্ব্বে যখন রাজধানী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তখন ইহার তিন দিক প্রস্তর-নির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হইয়াছিল এবং উত্তর পশ্চিম দিকে একটি দীর্ঘে ছয় মাইল ও প্রস্থে দুই মাইল কৃত্রিম হ্রদ ছিল। নগরে প্রবেশের জন্য তখন নয়টি দ্বার ছিল, তন্মধ্যে আগরা দরজাই প্রধান ছিল। প্রাচীরের অনেকটা অংশ এখনও জীর্ণাবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিলেও সে হ্রদের এখন আর কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এখানকার এখন যাহা কিছু দেখিবার তাহা এই দুর্গ ও তন্মধ্যস্থ ভিন্ন ভিন্ন হর্ম্ম্যাবলী, মসজিদ, মহল, সমাধিমন্দির প্রভৃতি স্থান।

এই পরিত্যক্ত রাজধানীর পূর্ব্ব ইতিহাস যাহা জানিতে পারা যায় তাহা এইরূপ,—সিক্রীর সৌভাগ্য দেবতা আকবরের ইহার উপর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে ইহা একটি নগণ্য ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম ছিল। তথায় সেখ সেলিম চিস্তি নামে একজন খ্যাতনামা পীর বাস করিতেন। গুজরাটের বিদ্রোহ দমনের পর ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে আকবর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে উক্ত পীরের আস্তানার নিকট ছাউনী করেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার রাজপুত মহিষীর যমজ সন্তান বিনষ্ট হওয়ায় তখন তিনি উত্তরাধিকারী অভাবে বিশেষ ম্রিয়মাণ ছিলেন এবং উহা লাভের জন্য ব্যাকুল হন। পীরের কৃপায় তাঁহার পুত্রলাভ হয় এবং তাঁহার নামানুযায়ী পুত্রের নাম রাখেন সেলিম, ইনিই পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর নামে খ্যাত হন। পীরের এইরূপ কৃপালাভে আকবর তাঁহার একজন বিশেষ ভক্ত হইয়া উঠেন এবং বিপুল অর্থব্যয় করিয়া এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। মহাসমৃদ্ধ মোগল সম্রাটের ঐশ্বর্য্যে এইরূপে অচিরে ফতেপুরের ক্ষুদ্র পল্লী এক সুরম্য রাজধানীতে পরিণত হয়। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। যাঁহার প্রীত্যর্থ তিনি এই কার্য্য করেন, তাঁহারই মনস্তুষ্টির জন্য সপ্তদশ বৎসরের পর এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় আগরায় নব রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। কেহ কেহ বলেন জলাভাব হেতু অসুবিধা হওয়াই এই স্থান পরিত্যাগের প্রকৃত কারণ।

আমরা যে পথ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম, ইহা একটি পশ্চাতের ছোট পথ। এ দিকটা আড়ম্বরশূন্য কতকটা খিড়কির পথের মত। এধারে কোন বৃহদাকার তোরণ দেখা

যায় না। প্রথমেই একটি সুবৃহৎ সুগভীর কূপ দেখিলাম। উহার তলদেশ হইতে জল লইয়া আসিবার জন্য একপার্শ্বে সুদীর্ঘ সোপান শ্রেণী রহিয়াছে। ইহার পর কয়েকটি সৌষ্ঠববিহীন একটু অসাধারণ রকমের ঘর অতিক্রম করিলাম। প্রদর্শকের কথায় বুঝিলাম, এ সকল হাঁসপাতাল বা চিকিৎসাগার ও ঔষধ প্রস্তুতের স্থান। এই স্থান হইতে উপরে উঠিয়া, গাইডের কথা শুনিতে শুনিতে একটির পর একটি করিয়া শতস্মৃতি-বিজড়িত কক্ষ, প্রাঙ্গণ, মহল ও অন্যান্য সৌধাদি অতিক্রম করিতে লাগিলাম। সমস্তই প্রায় লোহিত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। সাধারণ লোকের কল্পনা যতটা উর্দ্ধে উঠিতে পারে, এই সকল তাহারও অনেক অধিক করিয়া নির্ম্মিত। সে-সব বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে শুধু কেবল কতকগুলি সৌন্দর্য্যবাচক শব্দের প্রয়োগে হয় না। ঠিক যাহা মনে হয়, যে একটা গভীর বিস্ময় বিষাদে হৃদয় মন ভরিয়া উঠে, তাহা যথাযথ বর্ণনা করিয়া অপরকে বুঝাইতে পারেন এমন কবি কমই আছেন।

পাঁচ মহল

দিল্লী ও আগ্রার দুর্গমধ্যে যাহা যাহা দেখিয়াছি প্রায় সমস্তই অর্থাৎ দেওয়ানি খাস, দেওয়ানি আম, জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি এখানে আছে। ভিন্ন ভিন্ন বেগমদিগের স্বতন্ত্র মহল, তোষাখানা, দপ্তরখানা, নাজিনা মসজিদও এখানে আছে। তদ্ভিন্ন মহল খাস, পঞ্চমহল, বীরবলের সৌধাবলী, আবুল ফাজেল ও ফৈজির বাসস্থান, ঝরোকা দর্শনের স্থান, খাওয়াবগা, জল সরবরাহের ব্যবস্থা, পঁচিশি খেলার চত্বর, পীরের ও অন্যান্য বহু কবর, জ্যোতিষীর স্থান প্রভৃতি আছে।

এখানে একমাত্র সেলিম চিস্তি সাহেবের সমাধি ও জুম্মা মসজিদের কোন কোন অংশ

ভিন্ন শ্বেত মর্ম্মরের কাজ অন্যত্র কোথাও দেখিলাম না। লোহিত হর্ম্ম্যরাজির মধ্যে উক্ত পীরের তুষার-শ্বেত সমাধি গৃহটি অতি রমণীয়। এরূপ ঝিল্লীকাটা কাজ ও ভিতরে বিবিধ বর্ণসম্পাতে অঙ্কিত বৃক্ষ লতা চিত্রময় সমাধিগৃহ আগরার মধ্যেও অধিক নাই, আর তন্মধ্যস্থিত আবলুস কাষ্ঠ নির্ম্মিত কবরের উপরকার বেদী ও উহার চাঁদোয়ার শোভা অতুলনীয়। ইহাতে শুধু ঝিনুকের যে সুচারু কার্য্য করা আছে এ ভাবের কাজ অন্য কোথাও দেখি নাই। সমাধি গৃহের দ্বার আবলুস কাষ্ঠনির্ম্মিত। এই সমাধি জুম্মা মসজিদের প্রাঙ্গণ পার্শ্বে অবস্থিত। এই শিল্প নিদর্শন অনিন্দ্যসুন্দর সমাধি গৃহটি আকবর শাহ ও তৎপুত্র জাঁহাগীরের সেলিম চিস্তির প্রতি
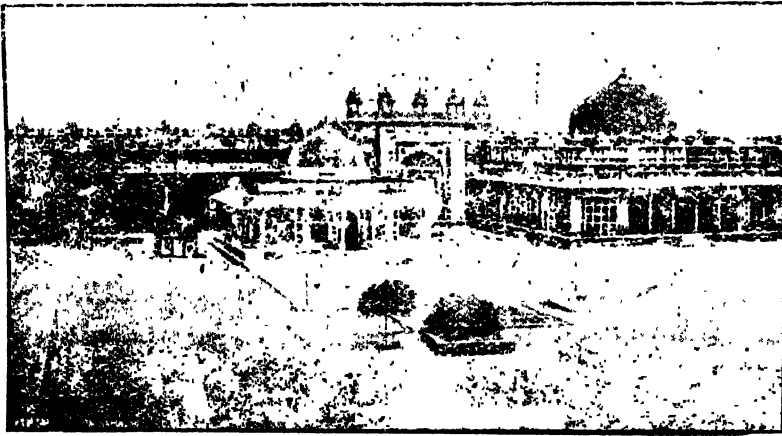
সেখ সেলিম চিস্তি ও ইসলাম খাঁর সমাধি

অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচায়ক। এখানে অদ্যাপি হিন্দু ও মুসলমান বন্ধ্যা নারীগণ সন্তান লাভাকাঙ্ক্ষায় আগমন করিয়া থাকেন এবং পাথরের জাথরিতে গাঁইট বাঁধিয়া আইসেন। ইহা ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পার্শ্বেই ঢাকার প্রথম শাসনকর্ত্তা কুতুবউদ্দিন ইসলাম খাঁর সুন্দর সমাধি এবং আশে পাশে চিস্তি পরিবারস্থ রমণীবৃন্দের বহুসংখ্যক সমাধি আছে। ইহারই উত্তরাংশে আবুল ফজেল ও তাঁহার ভ্রাতা রাজকবি ফৈজির বাসভবন। কথিত আছে আইন-ই-আকবরী প্রণেতা আবুল ফজলের সহিত আকবরশাহের এই ফতেপুরেই প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

এখানকার এই জুম্মা মসজিদ দিল্লীর মসজিদের প্রায় সমতুল্য। এই মসজিদেই সম্রাট আকবর তাঁহার প্রবর্ত্তিত নবধর্ম্মের প্রচলনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। উহার প্রাঙ্গণে প্রবেশার্থ বুলন্দ দরজা নামক তোরণটির বিরাটত্ব চক্ষে না দেখিলে কল্পনা করা যায় না। দাক্ষিণাত্যে আকবরের জয় ঘোষণা করিবার জন্য উহা রচিত হইয়াছিল। এত বড় তোরণ ভারতের আর

কোথাও নাই। গাইডের কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয়, জগতের মধ্যে এত বড় দরওয়াজা আর কোথাও নাই।
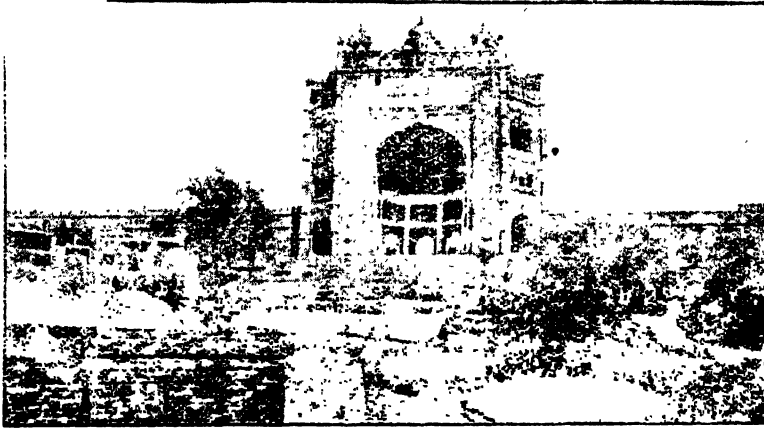
লন্দ দরওয়াজা
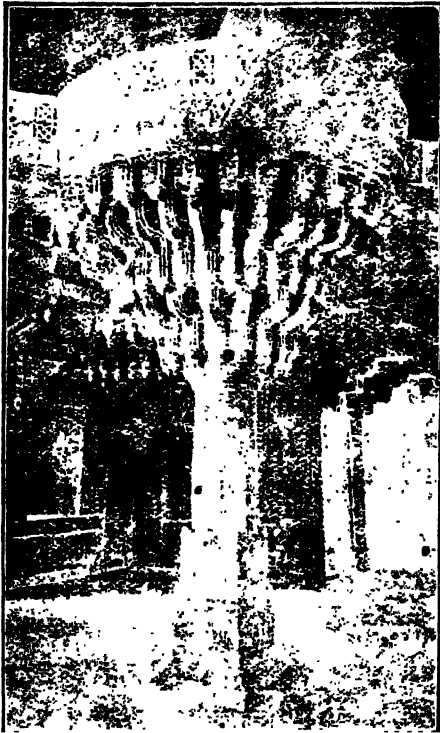
দেওয়ানি খাসের বিরাট স্তম্ভ

এখানকার দেওয়ানি খাস দিল্লী ও আগ্রার তুলনায় অতি সামান্য কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্নাকারের। ইহার অপর একটি নাম একথাম্বা। ইহা একটি অনতিবৃহৎ কক্ষ, মধ্যস্থলে একখণ্ড লাল প্রস্তরে নির্ম্মিত অপরূপ সৌন্দর্য্যময় একটি বিরাট স্তম্ভ আছে। এরূপ শিল্প নৈপুণ্যের আধার বিশাল স্তম্ভ কোথাও নাই। ইহারই উপরে সম্রাটের সিংহাসন সংস্থাপিত ছিল এবং উহাতে পঁহুছিবার জন্য চারিদিক হইতে চারিটি দশ ফুট লম্বা প্রস্তর সেতু আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এখানকার দেওয়ানি আমও অন্যত্র হইতে বিভিন্ন। আড়ম্বরে হীন হইলেও আকারে ছোট নহে। যে দ্বিতল প্রকোষ্ঠে বসিয়া সম্রাট বিচারাদি করিতেন, তাহার সম্মুখস্থ নিম্নের চত্বরটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩৬০ × ১৮০ ফুট, উহার চতুর্দ্দিকে বারান্দা আছে।

বেগমদিগের ভিন্ন, ভিন্ন মহলের ভিন্ন ভিন্ন স্থাপত্য ও গঠনপ্রণালী দর্শনীয়। রাজপুত

মহিষীর মহল, তাঁহার পূজাগৃহ, প্রাঙ্গণ প্রভৃতিতে সমস্তই হিন্দু স্থাপত্য বিরাজমান। তাঁহার ব্যবহারের জন্য হাওয়ামহল নামক চতুর্দ্দিকে লাল পাথরের ঝিল্লিকাটা উপরের গৃহটীও মনোরম। এই সমস্তই যোধাবাইয়ের মহল নামে খ্যাত। এখানকার সমস্ত প্রাসাদাদি পরিক্রম করিতে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যোধাবাইয়ের মহলের সৌন্দর্য্য ও সুবিধার জন্য সম্রাটের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ইহার নিকট আকবরশাহের খ্রীষ্টান মাহিষী মেরিয়মের প্রাসাদ নামক মহলের দেওয়ালে ও ছাদের তলে যে সব লতাপাতার কাজ আছে তাহাও বিচিত্র, এবং একঘেয়ে নহে। এখানে খ্রীষ্টধর্ম্মের চিহ্নাদি বিদ্যমান আছে। উহাকে কেহ কেহ সানেরি মহল বলিয়া থাকে।
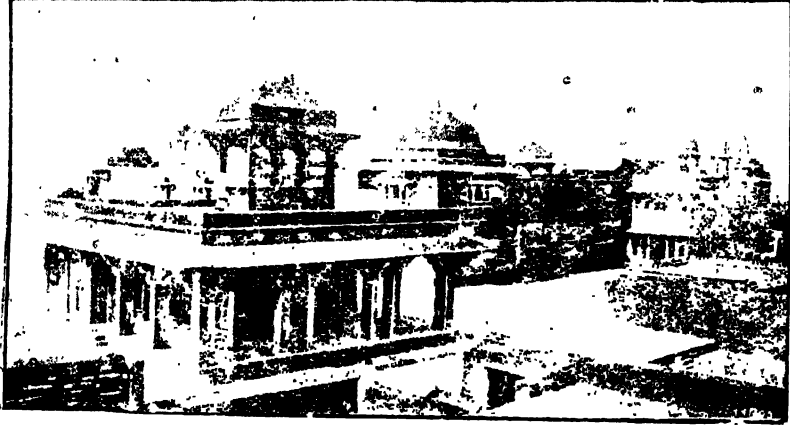
বিবি মেরিয়ম ও যোধাবাইর মহল

সুলতানা সলিনা বেগমের মহলখাস নামে যে মহল দেখা যায়, তাহাতে পাথরের উপর কারুকার্য্য এমন কিছু বেশি নাই। উহার সর্ব্বাংশ চিত্র বিচিত্র ছিল তাহার নিদর্শন এখনও রহিয়াছে। উহার নিকটেই মেরিয়মের উদ্যান ছিল, এখন সেখানে কয়েকটি দেবদারু তরু রোপিত রহিয়াছে দেখিলাম। এই উদ্যানে যাইতে যে একটি দীর্ঘ বারান্দার মত স্থান আছে, শুনিলাম এই স্থানে মাসে একবার করিয়া মিনাবাজার নামে একটি বাজার বসিত। উহার সমস্ত বিক্রেতা ছিল অন্তঃপুরস্থ রমণীগণ। উল্লিখিত মহল সকলের প্রকোষ্ঠোপরি কোন কোন স্থানে নীলবর্ণের মিনার কাজের অবশিষ্ট এখনও দেখা যায়।

পাঁচমহল নামক সুউচ্চ পাঁচতলা মহলটির উপরে উঠিলে নগরের বহু দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। ইহা ঠিক কি কারণে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না, অনেকে বলে এই স্থানটি বেগমদের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই প্রাসাদের এক পার্শ্বে উত্তর

দিকের চত্বরে যে বিরাট দশ পঁচিশ বা পঁচিশি খেলিবার ছক দেখা যায়, কথিত আছে এই স্থানে সম্রাট ও তাঁহার মহিষীরা সুসজ্জিতা সুন্দরী ক্রীতদাসীদের খেলার ঘুঁটিরূপে ব্যবহার করিয়া পঁচিশি খেলিতেন। এতদিন গল্পে যে কথা শুনা ছিল, আজ তাহারি প্রমাণ স্বরূপে কতকটা দেখা হইল।

বীরবলের প্রাসাদ

বীরবলের ভবন নামে যে সুবৃহৎ সৌধাবলী দেখিলাম, তাহা বেগমদের মহলের নিকটে অবস্থিত বলিয়া একথার সত্যতা সম্বন্ধে কোন কোন গ্রন্থকার সন্দেহ করিয়াছেন। ইহাও সৌন্দর্য্যে ও সজ্জায় অতীব মনোরম। দৃঢ় প্রস্তর গাত্রে ইহার চারুকার্য্যাবলী দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বেগমদের মহলের অনতিদূরে আর একটি বৃহৎ গভীর কূপ আছে। উল্লিখিত হর্ম্ম্যাবলী ভিন্ন বেগম মহল নামে আরও কতিপয় সৌধনিচয় দেখা যায়, ইহার মধ্যে রুমি বেগমের ও স্তাম্বুলি বেগমের প্রাসাদ উল্লেখযোগ্য।

বাদসার সুবৃহৎ অশ্বশালাটি এখনও দেখা যায়; ইহাতে একশত দশটি অশ্ব রাখিবার স্থান আছে। ইহার নাম চৌগন। এই সকল ভিন্ন নানা দিগ্দেশাগত বণিকদের কারাওন সরাই নামক বিশ্রামাবাস, জ্যোতিষীদের বাস করিবার স্থান, হাসান বালিকাদের বিদ্যালয় প্রভৃতি আরও বহু স্থান প্রদর্শক আমাদের দেখাইয়া দিল। দেওয়ানি খাসের পশ্চিমে যে স্থানটিকে "আঁখ মিচৌলি" বলে, কথিত আছে অকবরশাহ অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদের সহিত এই স্থানে লুকোচুরি খেলিতেন। ইহাকে কেহ কেহ ধনাগারও বলিয়া থাকে। এখানে একটি স্বতন্ত্র টাঁকশাল ছিল বলিয়াও জানা যায়। ইহা আগরা দরওয়াজা নামক তোরণের নিকট নহবৎখানার পর, রাস্তার পরপার্শ্বে তোষাখানা।

এখানে হিরণ মিনার নামক যে সুন্দর সুউচ্চ মিনারটি আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত হাতিপুল দরজার বহির্দ্দেশে অবস্থিত। উহার উচ্চতা প্রায় ৭৬০ ফুট। উহা প্রধানতঃ বাদসাহের শিকারের জন্য এবং বেগমদের দ্বারা ব্যবহৃত হইত। উক্ত দরজার উভয় পার্শ্বে দুইটি প্রকাণ্ড
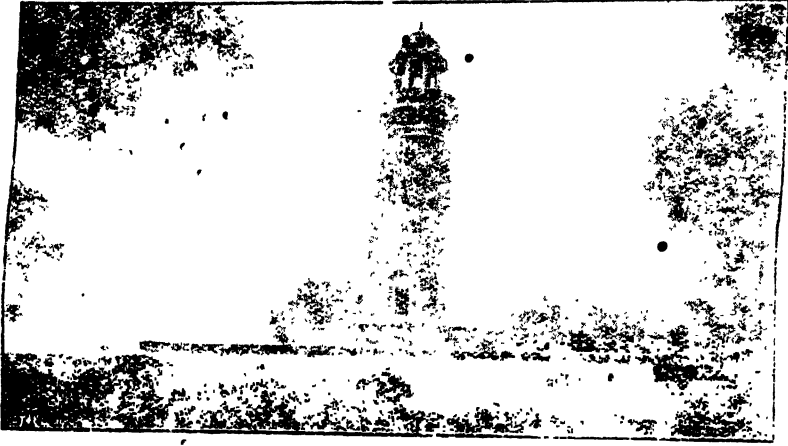
হিরণ মিনার

প্রস্তরময় হস্তী বিরাজিত আছে। উহা এক্ষণে সম্রাট আরঙ্গজেবের রোষবশে মস্তকহীন। পূর্ব্বে অন্তঃপুর হইতে এই দরওয়াজা পর্য্যন্ত অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদের গমনাগমনের জন্য একটি সেতুপথ ছিল, এখনও তাহার নিদর্শন দেখা যায়।

ফতেপুর সিক্রীর প্রসাদপুঞ্জের কথা খুব মোটামুটি বলা হইল। দীর্ঘকালের পর, তৎকালের তেমন কোন লিখিত-বিবরণ-বিহীন অবস্থায়, একজন সামান্য প্রদর্শকের এই সব বর্ণনা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না, তবে ডাক্ বাঙ্গালায় রক্ষিত যে নক্সা আছে, দেখিলাম তাহাতেও ঐ সকল নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিলেও এখনও শুধু ইহার যে গাম্ভীর্য্য বিশালত্ব সৌন্দর্য্যও বিরাজমান, তাহা দেখিয়া ইহার স্রষ্টা মোগল সম্রাটদের প্রতি যে একটা সম্ভ্রমের ভাব উদয় হয় তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অন্যের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। ইহার প্রতি মহল, প্রতি সৌধ, প্রতি কক্ষ, প্রত্যেক আলিন্দ অঙ্গিনা পর্য্যন্ত যেমন তাঁহাদের সীমাহীন ঐশ্বর্য্যলীলার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিবার জন্য ও তাঁহাদের বিরাট কল্পনার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে এই সার্দ্ধ তিন শত বর্ষ ধরিয়া প্রকৃতির ঝঞ্ঝাবাত সহিয়া আজিও দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তেমনি প্রকৃতির পরিহাসে এই সব মহামানবতার নশ্বরত্বও সেই সঙ্গে যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিতেছে। একদিন যে স্থান ফুল্ল কমল ও কুসুম পরিপূরিত জন-কোলাহল-মুখরিত রম্য কাননবৎ শোভাশালী ছিল, কল্পনায় যাহা স্বর্গ সুষমা মণ্ডিত মনে হয়, আজ শৃগাল কুকুরের বিহার ক্ষেত্র সেই স্থানের প্রতি প্রাসাদ, প্রতি মিনার, প্রতি তোরণের গভীর

নিস্তব্ধতা যেন একটা স্বপ্নপুরীর সৃষ্টি করিয়া হৃদয় যুগপৎ বিস্ময় বিষাদে ভরিয়া দিতেছে। কবি হেমচন্দ্রের কথায় কেবলই মনে হয় "হায় সে জাতি কোথায়!"

এখান হইতে নামিয়া পল্লী ও বাজারের দিকে যাইলাম। শুনিলাম এখনও এখানে প্রায় পাঁচ সহস্র লোকের বাস। সকলেই সামান্য অবস্থার লোক বলিয়া মনে হয়। পল্লীর হিসাবে বাজার মন্দ নহে। দুধ ঘির দাম এখনও এখানে অনেক কম। আট আনা সের রাবড়ি ও দুই আনা সের দধি কিনিলাম। তরিতরকারি যথেষ্ট সুলভ। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে এখানকার একপ্রকার চাদর উল্লেখযোগ্য। উহাকে স্থানীয় লোকেরা দোরি বলে। এখানে গোয়ালিয়র রাজ্যের মুদ্রাও প্রচলিত আছে দেখিলাম।

বাজার হইতে সেই তরুমূলস্থিত আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম চিন্তা আমাদের জন্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া বসিয়া আছে। সামান্য বিশ্রামের পর নিকটস্থ কূপের জলে স্নান করিয়া পরম পরিতোষের সহিত মধ্যাহ্ন ক্রিয়া শেষ করা গেল। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্তিতে দেহ অবসন্নপ্রায়, এ দিকে ফিরিবার গাড়ি সন্ধ্যার সময়। সুতরাং একটু বিশ্রামের জন্য বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল। যেখানে আশ্রয় লইয়াছিলাম তথায় রৌদ্রপাত হওয়ায় আর থাকা চলে না, অথচ আর স্থানই বা কোথায়। ভাবিতে ভাবিতে স্থির হইল, ভারত-সম্রাট আকবর শাহের দেববাঞ্ছিত বিশ্রাম-কক্ষেই আজ আমাদের মধ্যাহ্ন বিশ্রাম লাভ করিব। সেই আশায় পুনরায় উপরে উঠিয়া জনমানবশূন্য পুরীর একটি কক্ষ মনোনীত করিয়া তাহার লোহিত প্রস্তরময় গৃহ কুট্টিমে শতরঞ্চ বিছাইয়া আশ্রয় লইলাম।

বন্ধুদ্বয় একেবারে শুইয়া পড়িল, আমরা তিনজনেই নিস্তব্ধ। ইতিহাসের কত কথাই মনে হইতে লাগিল। কল্পনায় অতীতের অদৃষ্টপূর্ব্ব কত ছবিই দেখিতে লাগিলাম, আর অননুভূতপূর্ব্ব কত ভাবেই হৃদয় পূরিত হইয়া যে জাগ্রত স্বপনের সৃষ্টি করিতে লাগিল কেমন করিয়া তাহার বর্ণনা করিব। স্বল্প সময়ের মধ্যেই আমার সঙ্গীদ্বয়ের নাসিকা-ধ্বনিতে জাগ্রত স্বপনের পরিবর্ত্তে তাহাদের সত্যকার স্বপনের কথা জানাইয়া দিল। আর আমি—আমি একাকী এই কাগজ কলম লইয়া তিন শতাধিক বৎসরের পর এই দ্বিপ্রহরে রৌদ্রে ইংরাজরাজ রক্ষিত ভারতের ভূতপূর্ব্ব অদ্বিতীয় সম্রাটের পরিত্যক্ত প্রাসাদের নির্জ্জন স্তব্ধ সুখ সদনে বসিয়া, শত কথার সঙ্গে সেই তখনকার মুসলমান শাসিত ভারত ও আজিকার এই শ্বেতজাতি শাসিত ভারতের কথা ভাবিতে ভাবিতে, অপরের জন্য যত না হৌক আমার নিজের জন্য আজিকার দিনটি স্মরণ রাখিবার উদ্দেশ্যে এই লেখাটুকু শেষ করিলাম।

শ্রীহরিহর শেঠ

গাঁয়ের ডাক্তার

(১)

ডাক্তার ঘেচারাম চক্রবর্ত্তী।

ডাক্তারী বিদ্যাটা তাঁহার কতখানি জানা ছিল তাহা বলিতে গেলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে, সেসব কথা বলিয়া বিশেষ আবশ্যকও নাই।

অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি এই গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছেন। মাসিক বেতন দশ টাকা মাত্র। আজ কালকার দিনে দশ টাকায় দিন চালানো বড় কঠিন, তবে কোনক্রমে তাঁহার চলিয়া যাইত, কারণ সংসারে তাঁহার আর কেহ ছিল না।

লোকটী ছিলেন অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির, কোনও জটিল ব্যাপারে কিছুতেই জড়াইয়া পড়িতেন না। এখানে বাস করিয়া গ্রামের একজন হইয়াও তিনি সকলের নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া ছিলেন।

রায়েদের প্রকাণ্ড বড় বাগান, মাঝখানে বড় একটী পুষ্করিণী, জলটি তাহার কাচের মত স্বচ্ছ। বাঁধানো ঘাটের দুইপার্শ্বে সারি সারি কয়টী বকুল গাছ। বর্ষার সময়ে বকুল ফুটিয়া উঠিত, ঝরিয়া তলা বিছাইয়া পড়িত। এ পাশের কেয়াগাছগুলিতে ফুল ফুটিত, কেয়া বকুলের গন্ধ লইয়া মাতাল ভ্রমর ছুটাছুটি করিত। আম গাছের শাখায় বসিয়া দোয়েল শিস দিত, পাতায় পাতায় খঞ্জন নাচিয়া বেড়াইত। বকুলতলা শূন্য হইতে না হইতে এদিককার শিউলি গাছগুলি সাদা সাদা ফুলে ভরিয়া উঠিত, সমস্ত রাত্রে গন্ধ বিলাইয়া সকালে ঝরিয়া পড়িত। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ফুল কুড়ানোর বিরাম ছিল না, সমস্ত বাগানটা তাহাদের অশান্ত পদবিক্ষেপে, চপল চীৎকারে তরল হাসিতে মুখরিত হইয়া উঠিত।

এই বাগানের একটী পার্শ্বে পথের ধারে ছিল চক্রবর্ত্তী ডাক্তারের ছোট্ট খড়ের ঘরখানা। চারচালা বারান্দা, মাঝখানে দুখানা মাত্র ঘর। এক দিককার বারান্দা খানিকটা ঝাঁপ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া তাহাই রন্ধনশালারূপে ব্যবহৃত হয়। ঘর হইতে কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে দাতব্য চিকিৎসালয়। এ ঘরটীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। খুঁটিগুলিতে উই ধরিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে, চাল অনেক জায়গায় নাই, দেয়ালটি কোনক্রমে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে মাত্র। এই ঘরখানির মধ্যে গুটি দুই ছোট আলমারী আছে, একখানা অতি জীর্ণ কোন অতীতের সাক্ষী চেয়ার আছে,—তাহারই সমসাময়িক একখানা টেবিলও সেখানে আছে।

যিনি এই দাতব্য চিকিৎসালয়টী স্থাপন করিয়াছিলেন সেই দয়ার্দ্রহৃদয় উদারস্বভাব জমীদার রজনীনাথ এখন পরলোকে। দেশের দরিদ্র সম্প্রদায়ের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া

ছল; ইহারা ব্যারামে পড়ে, এক শিশি ঔষধ পায় না, ভুগিয়া ভুগিয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দরিদ্রের কষ্ট তিনি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া নিজ ব্যয়ে এই চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন লোকে খাঁটি ঔষধ পাইয়াছে, সকল রকম ঔষধই তখন মজুদ থাকিত। তাঁহার অন্তে চিকিৎসালয় গৃহটির সংস্কার পর্য্যন্ত হয় নাই। তাঁহার কথানুসারে তরুণ জমিদার অবনীনাথকে বাধ্য হইয়া এই চিকিৎসালয়ে বৎসরান্তর কিছু করিয়া ঔষধ আনাইয়া দিতে হইত, অপদার্থ ডাক্তারকে মাস মাস দশটা করিয়া টাকা যোগাইতে হইত।

ঔষধ আগে আসিত প্রচুর, লোকে খাঁটি ঔষধ পাইত, এখন ডাক্তারখানায় আছে শুধু ক্যাষ্টর অয়েল ও কুইনাইন মিকশ্চার। সেই ডাক্তার মহাশয়ই এখনও মিকশ্চার তৈয়ারী করেন, কিন্তু এখন তাঁহার হাত কাঁপে, জলের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী হইয়া যায়। ঔষধের শিশি দিয়া তিনি যখন বলিয়া দেন—কেমন থাকে বলে যাস,—বলিতেই মনে পড়িয়া যায় তিনি যে ঔষধ দিয়াছেন তাহা নিছক জল মাত্র। যে ঔষধে তিনি আগে একটি দাগ করিতেন এখন তাহাতে আট মাত্রা হয়।

কিন্তু এ মিথ্যাকে ঢাকার সকল চেষ্টাই তাঁহার ব্যর্থ হইয়া যাইত। কেন না লোকের অসুখ না কমিয়া বরং বাড়িয়াই চলিতেছিল, তথাপি অজ্ঞ লোকেরা এই ঔষধই গ্রহণ করিত।

তাঁহার দেশ পূর্ব্ববাংলার কোন পল্লীগ্রামে। কদাচিৎ তিনি দেশে যাইতেন, কারণ, তাঁহার কেহই ছিল না। যৌবনের প্রারম্ভে পত্নী পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন, তখন তাঁহার মাতা বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি অনেক জিদ করিয়াও পুত্রের আর বিবাহ দিতে পারেন নাই।

দেশ হইতে ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র প্রায়ই পত্র দিতেন, মাঝে মাঝে দেশে আসা দরকার। তদুত্তরে তিনি জানাইতেন তাঁহার কি যাইবার যো আছে, একদণ্ড কোথাও সরিবার যো নাই, কারণ এত বড় গ্রামটার সব লোকগুলি তাঁহারই মুখ চাহিয়া বাঁচিয়া আছে, তিনি একটা দিন কোথাও গেলে ইহাদের দেখার লোক নাই—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের পাঁচু মণ্ডল, ছকু মিঞা, রামচন্দর সাক প্রভৃতি লোকগুলি তাঁহার বারাণ্ডায় বসিয়া পাঁচটা সুখ দুঃখের কথা পাড়িত, তাহারই মধ্যে এক ফাঁকে তিনি জানাইয়া দিতেন—"এই দেখ, আমার ভাই ভাইপো দেশে ফিরে যাওয়ার জন্যে চিঠির ওপর চিঠি দিচ্ছে, কিন্তু যাই বা কি করে? তাদের লিখে দিলুম,—এখন তো আমার কোন রকমেই যাওয়া হতে পারে না এই সব অসুখ বিশুখ নিত্য এ গাঁয়ে লেগে রয়েছে, চোলে গেলে যদি কিছু হয়—আমারই পাপ,—তোমাদের আর কি।"

গ্রামের বুদ্ধিমান মণ্ডলগুলি চমকাইয়া উঠিত, আরও ভাল করিয়া ডাক্তার মহাশয়কে

আঁকড়াইয়া ধরিত. "তা কি হয় ডাক্তার মশাই, আপনি গেলে আমরা দাঁড়িয়ে মরব। যাও বা এক আধ শিশি ওষুধ পাচ্চি তাও আর পাব না।"

গদগদকণ্ঠে ডাক্তার বলিলেন, "সেটা কি আমি বুঝিনে মণ্ডল,—এই জন্যেই তো যাইনে. নইলে সেখানে আমার অভাব কিসের ? দিন দিন বুড়ো হয়ে পড়্‌ছি, তারা এখন আমায় বসিয়ে খাওয়াতে চায় ; কিন্তু ওই যে বল্লুম,—কেবল তোমাদেরই জন্যে,—নইলে এখানে থাকায় আমার কি লাভ হয় বল ?"

এমনই করিয়া দিন বেশ কাটিয়া যাইত।

(২)

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি। আম বাগান আমে ভরিয়া উঠিয়াছে, বালক বালিকাদের দৌরাত্ম্যও অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারই মধ্যে কয়টি দল কাগজে লবণ ও হাতে ছুরি,—অভাবে শামুকের খোলা লইয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। সমস্ত দুপুরটা ইহাদের শ্রান্তি নাই।

ডাক্তার মশাই নিজের গৃহটীর মধ্যে একখানা তক্তার উপরে মাদুরটা বিছাইয়া তাহার উপর শুইয়া পড়িয়া ছিলেন। আহারাদি শেষ হইয়া গিয়াছে, পাঁচু মণ্ডলের বিধবা মেয়ে নারায়ণী বাসনগুলা মাজিতে লইয়া গিয়াছিল ; সে সেগুলা মাজা শেষ করিয়া বারাণ্ডায় উপুড় করিয়া সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে শ্রান্তভাবে বলিল, "বাবা—কি রোদ ; চারিদিক যেন ঝলসে উঠছে।"

গৃহমধ্য হইতে স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাক্তার মশাই বলিলেন, "তোকে তো তখনি বারণ করলুম নারাণী—এত রোদে ওগুলো মাজতে নিয়ে যাসনে—শুনলিনে তো আমার কথা।"

নারায়ণী শ্রান্তভাবে বারাণ্ডায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আপনার যেমন কথা ডাক্তার মশাই, বিকেল বেলা কি ঘাটে যাবার যো আছে ? গাঁয়ের ভদ্দর লোকের ছেলেরা এমন বদ, ঘাটে পথে দেখলে যা না তাই বলে বসে। আমরা গরীব মানুষ, তাদের কথা বলতে পারিনে যে, তাই সব সয়ে যেতে হয়।"

আর একদিনকার কথা ডাক্তারের মনে জাগিয়া উঠিল। নারায়ণীর পিতা একদিন বড় দুঃখ করিয়াই বলিয়াছিল, "ভদ্দরলোকের ছেলেদের জ্বালায় আমাদের মত গরীব লোকদের পরিবার নিয়ে গাঁয়ে বাস করা দুরূহ হয়ে উঠল দেখছি।"

কেন যে সে একথা বলিয়াছিল তাহা বুঝিতে ডাক্তারের বিশেষ বিলম্ব হয় নাই, একদিন ঘাটের পথে এ প্রমাণ তিনি পাইয়াছিলেন।

তিনি একটু থামিয়া বলিলেন, "কথা শোনার চেয়ে দুপুরে কাজ করে রাখিস সে ভাল ; কিন্তু এখন এই দুপুর রোদে কি করে বাড়ী ফির্‌বি নারাণী ? খানিকটা বস, রোদটা একটু কমে আসুক, তারপরে যাস।"

এই মেয়েটীর বিবাহ হইয়াছিল খুব কম বয়সে, সে নাকি তখন চার পাঁচ বছরের ছিল মাত্র, সাত আট বৎসর বয়সেই সে বিধবা হয়। মা এতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, বছর খানেক হইল তিনি মারা গিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে পিতা আবার বিবাহ করিয়াছেন। এই নূতন বধূটীর সহিত নারায়ণীর মোটেই সদ্ভাব জন্মে নাই। বধূটী প্রায় তাহার সমবয়স্কা, ঝগড়া বিবাদে সুদক্ষা, নারায়ণীকে সে আদতেই দেখিতে পারিত না, প্রায়ই তাহাকে খাইতে দিত না। নারায়ণীও নূতন বধূকে জব্দ করিবার চেষ্টায় অহোরাত্র ফিরিত; ইহার জন্য তাহাকে শাস্তিও পাইতে হইত বড় কম নয়, কিন্তু তাহাতে সে ভ্রূক্ষেপও করিত না। দৈহিক উৎপীড়নে সে বড় একটা কাবু হইত না, আহার বন্ধ করিলেই একটু মুস্কিল বাধিত। ডাক্তার মশাইয়ের কাছে দুই একবার ভাত খাইতে পাইয়া সে ভয়শূন্য হইয়াছিল; বাড়ীতে নিত্য অত্যাচার উপদ্রব করিয়া বধূটীকে মারিয়া ধরিয়া পলাইয়া সে এখানে আসিয়া জুটিত। সন্ধ্যার সময় তাহার পিতা আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইত।

তাহার বয়স চৌদ্দ পনের বৎসর; যৌবনসীমায় পা দিয়াও মেয়েটী সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। অধুনা কেমন করিয়া সে যে বুঝিল ছেলেরা তাহাকে বিদ্রূপ করে, এবং তাহাতে কেমন করিয়া তাহার লজ্জা অনুভব হয়, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

ডাক্তার একবেলাই কোন রকমে ভাতে ভাত রাঁধিতেন কিছুদিন হইতে এই মেয়েটী তাঁহার রাত্রের আহার্য্যে ভাগ বসাইতেছিল, বেচারা বৃদ্ধকে একবেলা আহার করিয়া থাকিতে হইত।

মেয়েটী যে দিন এখানে আসিয়া জুটিত সে দিন সে আর কিছুতেই নড়িতে চাহিত না। ডাক্তার ডাক্তারী বইগুলা নাড়াচাড়া করিতেন, পাতা উল্টাইতেন, আর সে অবাক হইয়া বসিয়া দেখিত। বোধ হয় ভাবিত ডাক্তার অত মোটা বইগুলা কি করিয়া পড়েন। ডাক্তার যখন বইগুলা রাখিয়া শ্রান্তভাবে তামাক টানিতেন ও নানা দেশ বিদেশের গল্প করিতেন, তখন সে হাঁ করিয়া সেই সব গল্প যেন গিলিয়া খাইত। ডাক্তার নিজেদের দেশের গল্প করিতেন, কত নদীর গল্প করিতেন, কলিকাতার একটা বাগানে কত রকম জন্তু জানোয়ার আছে সে সব গল্প সবিস্তারে শুনাইতেন, শুনিতে শুনিতে বালিকা শ্রোত্রীর চক্ষু দুইটা অস্বাভাবিক রকম দীপ্ত হইয়া উঠিত। ডাক্তার গল্প সমাপ্তে যখন নিয়মিত দিবানিদ্রাটুকু উপভোগ করিতেন তখন সে বসিয়া বসিয়া সেই সব কথাই মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিত, এবং এই ভ্রমণকারী ডাক্তারটীকে অসাধারণ মানুষ বলিয়া ধারণা করিত।

সে একদিন বারাণ্ডায় আঁচলটা বেশ ভাল করিয়া বিছাইয়া শুইয়া পড়িল, তাহার পরই বলিল, "কাল গল্প বলবেন বলেছিলেন, আজ বলুন না।"

ডাক্তার অবাক হইয়া গিয়া বলিলেন, "কিসের গল্প বল্‌ব বলেছিলুম?'

নারায়ণী বলিল, "আপনার দেশের গল্প। অন্য দেশের অনেক গল্প শুনেছি, আপনার দেশের গল্প ভাল ক'রে বলুন।"

"আমার দেশের গল্প?" ডাক্তার হাসিয়াই আকুল, "আমার দেশের গল্প শুনবি,—তবেই হয়েছে। আচ্ছা, শোন তবে।"

সে এক আশ্চর্য্য গল্প। ডাক্তারের দেশ,—সে মেঘনা নদীর ধারে, সেখানে নীচে ধূ ধূ করে সবুজ জল, উপরে ধূ ধূ করে সুনীল আকাশ। এপার হইতে ওপারটা দেখায় শাড়ীর পাড়ের মত। ডাক্তারের বাড়ী সেই নদীর ধারে—শাড়ীর পাড়ের মত জায়গা তাহারই উপরে। আজও মনে পড়ে নৌকায় করিয়া মেঘনার বক্ষে ভ্রমণ, মাছ ধরা, আনন্দের সেই সব গান। হায় রে, আজ সে সবই অতীতে মিশিয়া গিয়াছে, অতীতের সেই সুখময় দিনগুলার পানে তাকাইয়া তিনি আজ কিছুতেই সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস দমন করিতে পারেন না।

গল্প শুনিতে শুনিতে নারায়ণীর চোখে কেবল সেই বিগত দিনগুলি ফুটিয়া উঠিত, সে বাস্তব চোখে নৌকায় উঠা, মাছ ধরা দেখিত, কাণে গান শুনিত।

এই একদিন কি তাঁহার গল্প শোনা? সে প্রায়ই আসিয়া জুটিত, ডাক্তারের দেশের গল্প তাহার কাণে বড়ই ভাল লাগিত। সেখানকার লোকেরা কি ভাবে জীবন যাপন করে, তাহাদের মতই তাহাদের দিন যায় কিনা ইত্যাদি কথাগুলা সে বিশেষ করিয়া জানিয়া লইত। বারাণ্ডায় পা ছড়াইয়া বসিয়া একটু একটু দুলিতে দুলিতে হঠাৎ সে কখন স্থির হইয়া যাইত, তাহার মনটা এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইত উত্তালতরঙ্গময়ী মেঘনার ওপারে সেই গ্রামখানির মধ্যে।

হঠাৎ কোন দিন সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিত, "আপনার বিয়ে হয় নি ডাক্তার মশাই?"

ডাক্তার হাসিতেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রফুল্ল মুখখানা গাম্ভীর্য্যের অন্ধকারে ছাইয়া উঠিত; তিনি বলিতেন, "বিয়ে?—না, বিয়ে আমার হয় নি।"

বালিকার কৌতূহল বাড়িয়া উঠিত, "বিয়ে হয়নি? আচ্ছা বিয়ে হয়নি কেন—বলুন না; আপনি বুড়ো হয়েছেন, এখনও কেন বিয়ে করেন নি?"

সে সব কথার উত্তর এই ক্ষুদ্র বালিকার কাছে দেওয়া যায় না, কাজেই ডাক্তার একেবারে নীরব হইয়া যাইতেন। বালিকা বুঝিত না বৃদ্ধ এখানে সকলের মধ্যে থাকিয়া নিজের অতীত দিনের স্মৃতিকে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টায় আছেন। বালিকা জানিত না, বিবাহের কথায় বৃদ্ধের মনে সেই অতীতের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে মরণাধিক যন্ত্রণা দেয়, কাজেই সে বার বার সেই গোপন কারণটী জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করে।

ডাক্তার ইহার কথাকে চাপা দিবার মতলবে আবার এক আজগুবি গল্প ফাঁদিয়া বসিতেন, নারায়ণী তাহার প্রশ্ন ভুলিয়া যাইত, আবার হাঁ করিয়া গল্প গিলিত।

(৩)

এই চিকিৎস্যালয়টী ছিল ডাক্তারের প্রাণ। আজ, এই ভগ্ন গৃহখানার পানে তাকাইয়া তাঁহার মনে পড়ে ইহার প্রতিষ্ঠান-দিনটীর কথা। আজ সেই গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে, ইহাতে কাহারও দৃষ্টি নাই।

একদিনকার বৈশাখী ঝড়ের একটা দমকায় চালের মট্‌কাটা সশরীরে কোথায় উধাও হইয়া গেল, চালের যে খড়গুলি অবশিষ্ট ছিল তাহাও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার নমঃশূদ্রদের মণ্ডল, পাঁচু মণ্ডলের বাড়ী দেখা দিলেন; সকলকে ডাকাইয়া আনিয়া সে ঘরের শোচনীয় অবস্থার কথা বিবৃত করিয়া অবশেষে বলিলেন, "তোমরা তো দেখ্‌তে পাচ্ছ ঘরটা ভেঙ্গে পড়ছে, এখন উপায় কি?

পাঁচু মণ্ডল মাথা নাড়িয়া বলিল, "দেখুন ডাক্তার মশাই, ঘরটা একেবারে নতুন করেই করতে হবে নইলে মোটেই থাকবে না। ওর খুঁটীগুলো সব পচে গিয়েছে, দেয়ালটারও অনেক জায়গায় খারাপ হয়ে গেছে। এতে খরচ ত বড় কম হবে না ডাক্তার মশাই, আমরা কি এ খরচ করতে পারব? কোনরকমে ছেলেপুলেগুলোকে মানুষ করি, ক্ষেত খামারের কাজ করি, বছরে খাজনা দিতে ত্রাহি ত্রাহি কর্‌তে হয়।"

মণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই এই কথায় সায় দিল।

নিরুপায় ডাক্তার বলিলেন, "তবে উপায়?"

নিতাই দাস বলিল, "এককাজ কর্‌লে হয় ডাক্তার মশাই, বাবুর কাছে গেলে হয় না? শুনেছি বাবু এসেছেন এখন দিন কতক থাকবেনও বটে। তিনি অব্যিশ্যি ঘরটা নতুন করে তুলে দেবেন,—দেওয়ারই কথা, কারণ তাঁর বাপেরই জিনিস তো।"

পঞ্চানন বলিয়া উঠিল, "ঠিক ঠিক, বাবুর কাছে যাওয়াই উচিত।"

যুবক জমিদারের রুদ্রমুর্ত্তি ও অশিষ্ট আচরণের কথা মনে করিয়া ডাক্তার দমিয়া গেলেন।

ইব্রাহিম মিঞা বলিল, "আপনি এখনই যান ডাক্তার মশাই, বাবু এখন বাইরেই আছেন, এই আমি দেখে আস্‌ছি।"

অবশেষে তাহাই করিতে হইল।

* * * * *

অবনীনাথের বৈঠকখানা তখন গুলজার, বন্ধু বান্ধবে পূর্ণ। সম্প্রতি এখানে একটা থিয়েটার ঘর তৈয়ারী করিবার কথা চলিতেছে। একটা বাঁধা ষ্টেজ না থাকিলে থিয়েটার করা চলে না, অভাবটা সকলেরই ভীষণ বলিয়া বোধ হইতেছে। বন্ধু বান্ধবেরা যথাসাধ্য দু এক টাকা চাঁদা দিবেন, বাকি সব অবনীনাথ দিবেন।

ডাক্তার গিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। নায়েব মহাশয় জমিদার বাবুর নিকটে অগ্রসর হইয়া জনান্তিকে বলিয়া দিলেন—"ডাক্তার মশাই,—"

"আঃ, ডাক্তার মশাই—"

বিকট একটা হো হো হাসির ধমকে ঘরটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই সব বর্ব্বরদের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে ডাক্তারের মাথাটা নুইয়া পড়িতেছিল, তিনি ইহাদের কাছে তাঁহার প্রার্থনা জানাইবেন কিরূপে?

অবনীনাথ ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "বসুন মশাই, ওই টুলটাতেই না নয় বসে পড়ুন।"

ডাক্তার ভগ্নপ্রায় টুলটার পানে একবার চাহিলেন। এই গৃহটার মধ্যে টুলে বসিলে তাঁহাকে কিরূপ দেখাইবে তাহা কল্পনা করিয়া তিনি বসিতে পারিলেন না, দাঁড়াইয়া রহিলেন। বলিলেন, "আমার দরকার খুব সামান্য, শেষ করে এখনি চলে যাচ্ছি।"

রাখালচন্দ্র হাতে একটা তুড়ি দিয়া কি একটা কথা বলিতে যাইবামাত্র অবনীনাথ একটা ধমক দিয়া উঠিলেন, "চুপ কর রাখাল। হ্যাঁ আপনার যা কথা একটু তাড়াতাড়ি করে বলে ফেললেই ভাল হয় ডাক্তার বাবু, আমার এখনও ঢের কাজ পড়ে আছে।"

ডাক্তার বলিলেন, "না আপনার কাজে বাধা দেব না, দুই একটা কথাতেই শেষ হবে। আপনার পিতা ৺রায় মহাশয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্যে যে ঘরটী তৈরী করে দিয়েছিলেন সে ঘরটীর অবস্থা ভারী খারাপ হয়ে পড়েছে। আপনি বাৎসরিক ওষুধ দেন কিন্তু ঘরটার দিকে কোনদিন চান নি। আপনার পিতার কীর্ত্তি এ, খুব আশা করছি ঘরটাকে আবার ঠিক করে দেবেন দয়া করে।"

অবনীনাথ খানিক চুপ করিয়া রহিলেন তাহার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এখন ওইতেই চালিয়ে নিন ডাক্তার বাবু, ওদিকে বিশেষ আর কিছু করা হবে না। আমি মনে করছি আমাদের বাড়ীতেই অ্যান্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটীর একটা শাখা খুলে দেব। এতে আমার একটা পয়সা লাগবে না, বরং গাঁয়ের লোকেরা ভাল ডাক্তার পাবে, ভাল ওষুধটাও পাবে।"

ডাক্তারের মাথাটা ঘুরিতেছিল, খানিক তিনি কথা বলিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পরে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে ভাল কথা, কিন্তু এখনও তার দেরী আছে, ততদিনে গোটাকত টাকা দিয়ে এ ঘরের চালটা—"

রুদ্রগর্জ্জনে তরুণ জমিদার বলিয়া উঠিলেন "যান যান, আর বেশী কথা বলবেন না। জমিদারের এক কথা, এর বেশী আর বলা হবে না। আর দেখুন, আপনার সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা আমার কানে এসেছে। শুনলুম আপনি নাকি একটা নৈশ পাঠশালা করেন চাষার ছেলেদের পড়াবার জন্যে? এটা ভয়ানক খারাপ কাজ হচ্ছে, জমিদারের বিপক্ষে একটা ষড়্‌যন্ত্র বাধিয়ে তোলারই ইচ্ছে আপনার। ওই সব ছেলেরা লেখাপড়া শিখে আর কি

জমিদার বলে তেমনিই খাতির করবে? লেখাপড়া শিক্ষা মানে—ছোটলোক গুলোর মাথা খাওয়া,—সেটা জানেন?"

দৃঢ় অথচ ধীরভাবে ডাক্তার বলিলেন, "না, আগে জানি নি, এখন জানলুম। আপনি যা বললেন এ সত্য কথা, বুঝলুম আপনি তরুণ হ'লেও ভবিষ্যৎ ভাবতে পারেন। এই সব ছোটলোকেরা—আপনার লাথী বুক পেতে নিচ্ছে, অসহ্য ব্যথায় লুটিয়ে পড়ছে তবু জানতে সাহস নেই তাদের, কেন লাথী খেলে। লেখাপড়া শেখালে, আত্মবোধ শক্তি জন্মালে তারা এমন ভাবে লাথী বুক পেতে নেবে না। কিন্তু জমিদারবাবু, আপনি জানেন না আপনার বাপ যে ছিলেন,—এই ছোটলোকেরাই তাঁর কতখানি প্রিয় ছিল, তিনি এদের মূল্য বুঝতেন, তাই এদের মানুষ করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন, এদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে তিনি নিজে নৈশ পাঠশালা করে শিক্ষা দিতেন, আপনার সে কথা আজ মনে না থাকতে পারে, যারা তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছে তারা ভুলে যায় নি। আপনি সব রকমে গ্রামটাকে উন্নত করতে চান, করুন, কিন্তু এই সব ছোটলোকদের বাদ দেবেন না, কারণ এরাই হবে আপনার উন্নতির প্রধান সহায়,—এ কথা মনে রাখবেন।"

ধীরে ধীরে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

পথে পাঁচুমণ্ডল দাঁড়াইয়াছিল, সোৎসুকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হল ডাক্তার মশাই?"

হায়রে অভাগা দরিদ্রগুলি, তোদের বেদনা বুঝিবে কে? ব্যথিত না হইলে পরের ব্যথা কেহ বুঝে না, নিজের চোখে অশ্রু না ঝরিলে কেহ অন্যের অশ্রুজলের মূল্য বুঝে না।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার বলিলেন, "ও ঘরে আর ডাক্তারখানা চলবে না পাঁচু। কিছুদিন পরে বাবুর বাড়ীতেই একটা ঘরে ডাক্তারখানা হবে, একজন বড় ডাক্তার আসবে, সেই তোদের দেখাশোনা করবে। যাই হোক ওষুধ খেয়ে বাঁচবি তখন পাঁচু, শুধু জল খেয়ে আর সর্দ্দি কাশিতে ভুগে মরবি নে।"

পাঁচুমণ্ডল ভারী খুসি হইয়া উঠিল,—"সত্যি ডাক্তার মশাই, তা হ'লে আমরা বাঁচব বটে। সেবারে আনন্দবাবুর ছেলের ব্যারামে সেই যে কোত্থেকে একজন বড়-ডাক্তার মশাই এসেছিলেন তাঁর কি-ই বা চেহারা, কি-ই বা নলচালা। কাণে লাগিয়ে সেই যে নল চাললেন, ছেলে একেবারে দুদিনে খাড়া হয়ে উঠল। আচ্ছা ডাক্তার মশাই, আপনি কেন নলচালাটা শিখলেন না?"

কপালে হাতখানা ঠেকাইয়া মলিন হাসিয়া ডাক্তার কেবলমাত্র বলিলেন, "অদৃষ্ট।"

পাঁচু জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি থাকবেন তো ডাক্তার মশাই? দুজন ডাক্তার মশাই থাকলে—"

বাধা দিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আমার আর থাকা কই হয় পাঁচু, দুচার দিনের মধ্যেই চলে যাব ভাবছি।"

বিস্মিত হইয়া গিয়া পাঁচু বলিল, "চলে যাবেন,—কেন ?"

ডাক্তার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চাপাস্বরে বলিলেন, "এখানে থেকে কি করব পাঁচু, আমার মত লোককে দিয়ে কোন কাজই হবে না। নতুন ডাক্তার আসবেন, ওষুধ তিনিই দেবেন, লোককে দেখাশোনা তিনিই করবেন। বাবু গাঁয়ে একটা বড় স্কুল করবেন, তোমাদের ছেলেপুলেদের নৈশ পাঠশালায় পড়তে হবে না, সেখানে ভাল পড়া হবে। বাবু তোমাদের কর্ম্মশ্রান্ত জীবনে আনন্দ ধারা ঢালবার জন্যে থিয়েটার ঘর করবেন, বিনা পয়সায় সে আনন্দ তোমরা উপভোগ করতে পারবে। দুর্দ্দিনে আমি তোমাদের কাছে ছিলুম, সুখের দিনে তোমরা তো আমায় ডাকবে না পাঁচু, তাই আগেই আমি সরে যেতে চাই। আমার যোগ্যতা সীমার মধ্যে আবদ্ধ, অসীমে নিজেকে বিস্তার করবার যোগ্যতা আমার নেই। একদিন এমনি কাজ খুঁজতে খুঁজতে তরুণ বয়সে তোমাদের কাছে এসেছিলুম, এখন এখানকার কাজ সাঙ্গ হয়ে গেছে। আবার খুঁজে দেখি গিয়ে কোথায় একটা কাজ পেতে পারি।"

(৪)

সমস্ত রাত্রিটা সে দিন ডাক্তার ঘুমাইতে পারিলেন না। কি একটা অসহ্য বেদনায় সারা বুকখানা ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উচ্ছ্বাস ঠেলিয়া আসিতেছিল, বাহির হইয়া পড়িতে চাহিতেছিল।

তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন, এই গ্রামে এই সব দরিদ্রদের মাঝে তাঁহার জীবনের পঁয়ত্রিশটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তিনি আজ বাহিরের লোক নহেন, এই গ্রামের একটী অধিবাসিরূপে পরিণত হইয়াছেন।

তাঁহার নৈশস্কুলে অনেকগুলি নীচবংশীয় ছাত্র ছিল। এই সব অন্ত্যজদের গ্রামের ভদ্রলোকেরা আন্তরিক ঘৃণা করিতেন, ইহাদের স্পর্শ করা দূরে থাক ছায়া মাড়াইতেও সঙ্কুচিত হইতেন। অবনীনাথ স্কুল করিতেছেন, কিন্তু এই সব ছেলে কি সেই স্কুলে পড়িতে পাইবে ? কয়েকটী ছেলে অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছে, ইহারা কালে একটা মানুষ হইতে পারিত। চালনা না করিলে—এত পড়াশুনা—ডাক্তারের এতটা পরিশ্রম সবই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

সকালে উঠিয়াই তিনি একখানা দীর্ঘ পত্র লিখিয়া অবনীনাথের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই পত্রে তিনি স্পষ্টই জানাইলেন অবনীনাথ যে সব কার্য্য করিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়, কিন্তু ইহাতে তাঁহার কয়েকটী কথা বলিবার মত আছে। প্রথম—কে ডাক্তার আসিবেন তাঁহার শুধু ভদ্রলোকদের দেখিলেই চলিবে না, দরিদ্রদেরও দেখিতে হইবে

এবং ভদ্রলোকদের মত দরিদ্রদেরও যত্ন করিয়া ঔষধ দিতে হইবে। গ্রামে যে স্কুল হইবে ইহাতে শুধু ভদ্রলোকের ছেলেরাই প্রবেশাধিকার পাইবে না, অস্পৃশ্য চণ্ডাল, মালী, জেলে প্রভৃতিরাও পড়িতে পাইবে এরূপ ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতে করা বিশেষ আবশ্যক। অবনীনাথের একটা কথা তিনি জানিতে চাহেন; যদি অবনীনাথ এ সকল প্রস্তাবে সম্মত না হন তিনি স্বর্গীয় কর্ত্তার স্বহস্তলিখিত দলিলের বলে নিজে যেমন আছেন তেমনি থাকিয়া এই সব ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন।

স্বর্গীয় জমিদার পুত্রের খেয়ালের উপর প্রজাদের শিক্ষা ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে মরিতে পারেন নাই। বিজ্ঞ জমিদার নিজের উইলে ইহা লিখিয়া গিয়াছিলেন এবং জমীদারীর আয়ের তিনভাগের একভাগ এই সকল কার্য্যে ব্যয় হইবে এ সম্বন্ধে একটা লেখাপড়া করিয়া ডাক্তারের হাতে দিয়াছিলেন। তিনি মানুষ চিনিতেন, ডাক্তারকে চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই।

এতদিন অবনীনাথ নিতান্ত দয়া করিয়া প্রজাদের হিতার্থে যাহা কিছু দিতেছিল ডাক্তার তাহাই লইতেছিলেন, একটা আপত্তি তিনি করেন নাই। কিন্তু দরিদ্রদের এবার বিশেষরূপে নির্য্যাতিত হইতে হইবে দেখিয়া তাঁহার অন্তরে সুপ্ত সিংহ গর্জ্জিয়া উঠিল, তিনি দরিদ্রদের দাবী লইয়া জমিদারের বিপক্ষে দৃঢ়পদে দাঁড়াইলেন।

এই পত্রখানা অবনীনাথের ক্রোধাগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দিল। তিনি বরাবরই এই অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধকে দেখিতে পারিতেন না, তিনি ঠিক জানিতেন এই বৃদ্ধ ভিতরে ভিতরে প্রজাদের উত্তেজিত করে, সেই জন্য প্রজারা নিয়মিত খাজনা ভিন্ন জমিদারের সেলামি একপয়সাও দেয় না। এই পত্রখানা তাঁহার জীঘাংসাকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল; কি করিয়া এই বাঙ্গাল বৃদ্ধটাকে বিশেষরূপ জব্দ করিয়া, লোকের কাছে ঘৃণিত নিন্দিত করিয়া চিরবিদায় দেওয়া যাইতে পারে তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

অবিলম্বে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল অবনীনাথের বহুমূল্য হীরার আংটীটা হারাইয়াছে: সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রচারিত হইল সেদিন রাত্রে যখন ডাক্তার দেখা করিতে গিয়াছিলেন তখন আংটীটা টুলের পাশটায় পড়িয়াছিল—হঠাৎ মনে পড়ায় অবনীনাথ খোঁজ করিয়া আর পান নাই।

গ্রামের ছোট বড় সকলেই পরস্পর পরস্পরের পানে তাকাইল, বিস্ময়ে সকলেই বলিল, "অ্যাঁ, ডাক্তার মশাইয়ের এই কাজ?"

পাঁচুমণ্ডল শুনিয়া মাথা নাড়িল; রন্ধননিরতা পত্নীর পানে চহিয়া বলিল, "দুনিয়ায় সাধু সবাই। বাবু আজ সকালে আমায় ডেকে বললেন, খবরদার পাঁচু, চোরের দিকে যেন চাস নে। গরীব মানুষ,—থানা পুলিস জড়িয়ে শেষটায় কেন মরবি? বাবু আরও বললেন, দেখ

পাঁচু, আমি একটা ডাক্তারখানা কর্‌ছি, সহরের খুব বড় ডাক্তার আসবে,—সেই তোদের দেখবে শুনবে ওষুধ পত্তর দেবে। আর পাঠশালায় ছেলে পড়াবিই বা কেন? আমি মস্ত বড় ইস্কুল করব—যেখানে ডাক্তারখানা রয়েছে ওইখানে, সেইখানে ছেলে পুলেদের পড়াবি। বাবুর ইটের পাঁজা তৈরী হচ্ছে, মাস খানেকের মধ্যে আগুন পড়বে, তারপর ইটগুলো হয়ে গেলে ইস্কুল হতে আর কতক্ষণ?"

ডাক্তার মশাই চোর—কথাটা শুনিয়াই নারায়ণী তাঁহার গৃহে ছুটিল।

বেলা তখন প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে, অস্তগামী রবির সোণার মত কিরণটুকু গাছের পাতায় পাতায় পড়িয়া ঝিকমিক করিয়া জ্বলিতেছে। ডাক্তার নিজের জরাজীর্ণ বেতের বাক্সটা বারাণ্ডায় টানিয়া আনিয়া তাহার ভিতরের কাপড় জামাগুলো ফেলিয়া কি খুঁজিতেছিলেন।

নারায়ণী একেবারে কাছে গিয়া বসিয়া পড়িল, "কি খুঁজছেন ডাক্তার মশাই?"

"একটা জিনিস নারাণী।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর বড় ভার।

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, "আংটী ডাক্তার মশাই?"

ডাক্তার দুইটী চোখ তুলিয়া তাহার মুখের উপর রাখিলেন, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আংটী নয়; আংটীব চেয়ে বেশী দাম তার, সেইটাই খুঁজছি।"

ব্যগ্র চোখে নারায়ণী দেখিল, হিজিবিজি কি সব লেখা বহুপুরাতন এক টুকরা কাগজ পাইয়া ডাক্তার মশাইয়ের চোখ দুইটা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি অতি যত্নে সেখানা হাতের মধ্যে রাখিয়া বাক্সে কাপড় জামা তুলিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। নারায়ণীর পানে চাহিয়া মলিন মুখে একটু হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াসে বিকৃত করিয়া ফেলিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "আমি কাল সকালে এ দেশ ছেড়ে চলে যাব নারাণী।"

"চলে যাবেন,—কোথায় যাবেন, আবার কবে আসবেন?"

তাহার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর ডাক্তারের হৃদয় স্পর্শ করিল, তাঁহার দীপ্ত চোখ দুইটা অজ্ঞাতে কেমন করিয়া জলে ভরিয়া উঠিল; তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কোথায় যে যাব তা এখনও ঠিক করতে পারিনি; তবে এ গ্রাম হতে জন্মের মতই যাচ্ছি, আর যে ফিরে আসব না, এ কথা ঠিক।"

নারায়ণী অন্যদিকে চাহিয়া আড়ষ্টভাবে বসিয়া রহিল, খানিক পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আংটী চুরি করার কথাতেই আপনি—"

অকস্মাৎ দীপ্ত হইয়া উঠিয়া ডাক্তার বলিলেন, "তুইও কি ভাবিস নারাণী আংটী আমি নিয়েছি?"

ছোট্ট একটী "না" বলিয়াই নারায়ণী ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় আবার একখানা পত্র লিখিয়া ৺জমীদার মহাশয়ের লেখা দলিলখানি দিয়া একটী বালককে তিনি অবনীনাথের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

* * * * *

ঘাটে নৌকা বাঁধা, নৌকায় খানিক দূর গিয়া তবে রেলওয়ে ষ্টেশনে যাওয়া যাইবে। স্থলপথ দিয়াও যাওয়া চলে, কিন্তু জ্যৈষ্ঠের দারুণ রৌদ্রে স্থলপথ অপেক্ষা জলপথে গমন প্রশস্ত ভাবিয়া ডাক্তার নৌকা ঠিক করিয়াছেন।

নিস্তব্ধ ঘাটে আসিয়া ডাক্তার একবার পিছন ফিরিয়া চাহিলেন। ওই—অদূরে দেখা যাইতেছে আমবাগান, উহারই মধ্যে তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় চিকিৎসালয়, চিরপরিচিত ছোট ঘরখানি। আজ তাঁহার সব হারাইয়া চোর বদনাম লইয়া—কেবলমাত্র একটি বাক্স সম্বল করিয়া চিরবিদায় লইতে হইতেছে, এ দুঃখ কি কিছুতেই যায়? এত শীঘ্র তিনি পরাজয় মানিতেন না, যদি বদনামটা তাঁহার বিস্তৃতি লাভ না করিত। আজ তিনি ছোট বড় সকলের কাছে ঘৃণিত, কাহারও নিকটে মুখ দেখাইবার যো আজ তাঁহার নাই। কাল রাত্রে তিনি পাঁচুর বাটীতে গিয়াছিলেন, সে গৃহমধ্য হইতে তাঁহাকে শুনাইয়া কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল,—"বল গিয়ে বাড়ী নেই। জমীদারের বিষচোখে ওঁর জন্যে পড়তে পারব না।"

আরও কি শুনিবার জন্য তিনি এখানে পড়িয়া থাকিতে চান?

দেশটা ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার বুকে বড় ব্যথা বাজিতেছিল, চোখ ফাটিয়া জল আসিতে ছিল। ইহার পথ, ঘাট, মাঠ সবই যেন তাঁহার আজন্মকালের পরিচিত ছিল, অনেক সময় তিনি নিজেই ভুলিয়া যাইতেন, তিনি এখানকার কেহ নহেন, বিদেশী মাত্র। ইহার অধিবাসীরা তাঁহার কেহই ছিল না, আপনার স্বভাবগুণে তিনি ইহাদের বড় আপনার হইতে পারিয়াছিলেন। এর উদার সুনীল আকাশ, বহমান মৃদুল বাতাস, পাখীর কলগীতি, সবই তাঁহার বড় আপনার ছিল। আজ এসব ছাড়িয়া যাইতে হৃদয় চাহিতেছিল না, তাই দুই পা চলিয়া চমকিয়া দাঁড়াইয়া তিনি পিছন দিকে চাহিতেছিলেন।

নারায়ণী আসিয়া প্রণাম করিতেই তিনি চমকাইয়া উঠিলেন, উর্দ্ধনেত্র নত করিয়া রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "তুই এসেছিস নারাণী—?"

নারায়ণী কাঁদিয়া বলিল, "হ্যাঁ ডাক্তার মশাই, বাবা আসতে দিচ্ছিল না, আমি পালিয়ে এসেছি।"

একটা বুকভাঙ্গা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আমি য়াচ্চি নারাণী, কিন্তু যতদিন আর বেঁচে থাকবো তোদের কথা ভুলব না। তোদের গরীব ডাক্তার মশাই কিছু দিয়ে যেতে পারলে না রে, কিন্তু অনেকখানি নিয়ে চললো।"

মাঝি ডাকিল, "বাবু আসুন, ট্রেণ ধরতে হবে।"

চমকাইয়া ডাক্তার বলিলেন, "হ্যাঁ, এই আসি। আজকের দিনে, এই অবস্থায় সবাই আমায় পর বলে ভাবলে, সবাই আমায় দূরে রেখে দাঁড়ালে, কেবলমাত্র তুই নারাণী,—তুই মাত্র আমায় আপনার ভেবে কাছে এসে দাঁড়ালি। আজ শেষ বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে নিজেকে একেবারে একলা ভেবে একলা চোখের জল মুছছিলুম, তুই এমনি সময় এসে তোর চোখের জল আমায় উপহার দিলি; যাতে জানতে পারলুম—সবাই আমায় ভুলে গেলেও তুই ভুলবি নে। আশীর্ব্বাদ করে যাচ্চি— যেন সুখী হতে পারিস।"

গোপনে চোখের জল মুছিতে মুছিতে তিনি নৌকায় উঠিলেন।

নদীর কালো জল চিরিয়া নৌকা সোজা অগ্রসর হইল। অতৃপ্ত নয়নে ডাক্তার দেখিতে দেখিতে চলিলেন, সবই চির পরিচিত। তাঁহার এই শেষ বিদায়ের ক্ষণেও গ্রাম পূর্ব্বে যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে।

ফিরিয়া দেখিলেন শূন্যঘাটে নারায়ণী একা দাঁড়াইয়া উচ্ছলিত অশ্রুজল মুছিতেছে।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

শ্রদ্ধানন্দ

পঙ্গু জাতির সচল মানুষ, সন্ন্যাসী বীর হিন্দু-নেতা,
আততায়ীর গুলীর চোটে প্রাণ দিল সে মরণ-জেতা!
বাইশ কোটির হিন্দু-সমাজ শক্তিতে যার স্পন্দমান,
জান্ নিল তার ইস্লামের এক ভ্রান্ত সেবক মোসলমান।
শুদ্ধি এবং সংগঠনে হিন্দুকে যে কর্‌লো বড়,
ছিন্ন সমাজ গাঁথ্‌লো প্রেমে কর্‌তে আরো মহত্তর,
ঘুমন্তকে জাগায় যে রে, জোর করে' তায় চাও ঘুমাতে?
হায় কাপুরুষ, খোঁজ রাখো না? অমর তারা এই ধরাতে!

এ-ফাত্তুরে শয্যাশায়ী সাধুর বুকে মার্‌লে গুলী?
মর্‌লো কোথায়? জন্মেছে সে! কর্‌ছি বরণ হৃদয় খুলি'!
বাইশ কোটির হিন্দুজাতির মার্‌বে না হয় দুচার জনে;
লোপাট হয়ে লোপ পাবে না, বাড়ছে আরো সংগঠনে।
বর্ব্বরতায় শক্তি বাড়ে, অত্যাচারীর সর্ব্বনাশ;
সাক্ষ্য তোমায় দেয় নি কি ওই যবন জাতির ইতিহাস?
ফ্যানার মতো মিশ্‌লো কত রাজ্য রাজা প্রবল জাতি!
বাদ্‌শাহদের গোরস্থানে জোনাক্ জ্বালায় চেরাগ্-বাতি!

আওরঙ্‌জেব হ'তে নাগাদ মামুদ ঘোরী বখ্‌তিয়ার
হিন্দুনাশের চেষ্টা করে' পায়নি ধাতার এক্‌তিয়ার।
সতেরো বার লুঠ্‌লো আবার মামুদ গজ্‌নী হিন্দুস্থান;
মঠ মন্দির ধ্বংস করি' কর্‌লো নারীর অসম্মান।
মোগল পাঠান আফ্‌গানীদের জবর জুলুম চল্‌লো কত!
আজকে তাদের শক্তি কোথায়? হিন্দু আজো অব্যাহত।
শিখ মারাঠী রাজপুতেরা উঠ্‌লো ভীষণ হুঙ্কারিয়া;
শির দিয়েছে, শের দিল না; সত্য কিনা রশিদ মিঞা?

বল্‌ছো, মরে' শহিদ হবে, খালাস পেলে মস্ত গাজী;
ইংরাজের ওই আইন, চাচা, রেহাই দিতে নয়কো রাজী!
কর্‌ছো আশা ফাঁসির পরে যাবে নাকি বেহেস্তেই!
গুপ্তঘাতক শহিদ গাজী হয় কি তোমার ধর্ম্মেতেই?
প্রাণ দিতে যার নাই ক্ষমতা, প্রাণ নিবে সে গায়ের জোরে?
ইয়াদ্ রেখো, ইয়াদ্ রেখো! নিত্য ন্যায়ের চক্র ঘোরে।
যতই কেন কওনা মুখে, ন্যায়ের বিচার মান্‌তে হবে;
'আল্লা' বলে' পড়বে ঝুলে', মরবে ভীষণ অগৌরবে।

'কাফের' তুমি বল্‌লে যাকে, তার কাছে ঘোর কাফের তুমি ;
ধর্ম্ম প্রচার করতো সে যে, করলে তুমি গোঙার্ত্তুমি।
যে কাহারো ন্যায়্‌নি জীবন, কর্‌লে তাহার জীবন্ শেষ ;
সভ্য সমাজ সিট্‌কালো নাক, খিট্‌কালোটা করলে বেশ !
মহম্মদ আলী মৌলানা তাই তোমার কৃত পাপ ক্ষালনে
চাইলো ক্ষমা গৌহাটীতে ভারত-রাষ্ট্রসম্মিলনে।
গভীর খেদে বল্‌লো সে যে, "ধিক্কৃত এ মোসলমান !
জাতির পাপে হিন্দু-হাতে করবো আমার জীবন দান।"

তুচ্ছ নহে, তুচ্ছ নহে এই যে লালা মুন্সীরাম !
হিন্দু স্মৃতির করবে পূজা, পূরুক্ পাপীর মনস্কাম !
পঞ্চনদের জলন্ধরের তাল্‌বনে সে জন্ম নিয়ে,
স্থবির জাতির প্রাণ জাগালো ধর্ম্মকাজে জীবন দিয়ে।
আর্য্য সমাজ ধন্য হোলো, ধন্য হোলো হিন্দুজাতি ;
হরিদ্বারের গুরুকুলে জল্‌বে দ্বিগুণ প্রাণের ভাতি।
তুল্‌লো গড়ে' জলন্ধরে কন্যা-মহাবিদ্যালয় ;
কীর্ত্তি এসব রইলো দেশে, কর্‌লো স্বামী মৃত্যুজয়।

রাউলাট্‌-আইন আন্দোলনে সন্ন্যাসী এই সুনির্ভীক
গোরার গুলীর সাম্‌নে দাঁড়ায় ; দিল্লীবাসী নির্নিমিখ !
এই ঘটনার পর্‌-দিবসে শাহী জুম্মা মস্‌জিদেই,
বস্‌লো প্রথম বেদীর উপর মোসলমানের আগ্রহেই।
মন্দ্রস্বরে কর্‌লো মহান্ মিলন্‌-মন্ত্র সুপ্রচার ;
আবদুর রশিদ মিঞা তাদের আজকে নিল জীবন তার।
নৃশংসতায় জাগ্‌ছে মনে, 'সাম্প্রদায়িক মুর্গী পোষা' ;
বন্ধু পরম হয় দুষ্‌মন একটু যদি বাড়্‌লো গোসা !

কারাদণ্ড সইলো স্বামী গুরুকাবাগ হাঙ্গামায় ;
আদালতের উক্তিতে দেশ মুখর হোলো প্রশংসায় !
অসহযোগ আন্দোলনের শেষভাগে তার ভাঙ্‌লো হৃদি ;
রাষ্ট্রনীতি ছাড়তে যেন আদেশ দিল বিবেক-বিধি।
হিঁদুর প্রতি মোপ্‌লা-জুলুম, সাহারাণপুর্‌-অত্যাচার,
পাগল কর্‌লো সন্ন্যাসীকে ; কার্য্য হোলো চমৎকার !
ঘোর কাপুরুষ হিন্দু যেসব রইলো হয়ে মোসলমান,
শুদ্ধি করে' শ্রদ্ধানন্দ ঘুচায় তাদের অসম্মান।

সঙ্ঘবদ্ধ করতে স্বামী মাত্‌লো হিন্দু-সংগঠনে ;
দুর্ব্বলতা ফেল্‌তে ঝেড়ে মন দিল ফের্ সংযমনে।
হৃদয় দিয়ে সন্ন্যাসী এ কর্‌লো হিঁদুর ধ্বংসরোধ ;
জাগায় বিশাল জাতির বুকে এক্‌টা বিরাট্ আত্মবোধ।
হিন্দু হোলো আশি হাজার মাল্‌কানা সব মোসলমান ;
এই স্বামীজী কর্‌লো একা আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষাদান।
"ধর্ম্ম গেল ! ধর্ম্ম গেল !" চ্যাঁচায় কানা চাচার দল ;
মোল্লা মিঞা মৌলবীরা বচন ঝাড়ে অনর্গল।

পয়দা নিয়ে হেথায় যারা কয় এ-বুলির ফয়দা নাই,
শিরায় যাদের হিন্দু-শোণিত জোর-বহমান দেখ্‌তে পাই,
বাপ দাদারা আজো যাদের হিন্দু নামেই ছায় পরিচয়,
হিন্দুনারী করছে চুরি তারাই বেশী ভারতময়।
'আল্লা' বলে' কাল্লা ফাটায়, হল্লাতে নাম জাঁকায় বেশী ;
টুক্‌টুকে লাল বাল্‌তি-টুপি পরছে কাপড় সব বিদেশী।
দেশের প্রতি নাই মমতা, তুর্কী ইরাণ আপন ভাবে ;
বাবুর্চি খান্‌সামা হয়ে নাড়্‌ছে দাড়ি পরের তাঁবে।

আস্‌গরি বেগম সাঁহেবা স্বেচ্ছাতে হন হিন্দু যবে,
দিল্লীবাসী মোসলমান উঠ্‌লো ক্ষেপে বিকট রবে।
'শান্তিদেবী' নাম হোলো যেই, গোস্ত রুটি ছাড়্‌লো তারা,
বুক-পিটে' আর মাথা কুটে' গুণ্ডামিতে পাগল্‌-পারা।
শ্রদ্ধানন্দের জীবন তাতেই ধ্বংস করে চোরের মতো ;
ধরম সিং-ও ঘায়েল হোলো ; হইনি তবু মর্ম্মাহত।
এই স্বামীজীর শূন্য আসন পূর্ণ হবে, পূর্ণ হবে !
কার্য্য তাহার আগের চেয়ে চল্‌বে আরো সগৌরবে।

শোক কোরো না, হিন্দুসমাজ, হৃদয় যেন যায় না পুড়ে'
বাড়াও জাতি সংগঠনে, শুদ্ধি চালাও জগৎ জুড়ে' !
আসন পেলো শ্রদ্ধানন্দ যিশু মহম্মদের সাথে,
এর চেয়ে আর শান্তি কোথায় ? মন মেতেছে সান্ত্বনাতে।
আমরা মরি মরার মতো, সত্য বটে, সত্য বটে ;
বরণ্‌যোগ্য এই যে মরণ, কয়জনের বা ভাগ্যে ঘটে !
ধর্ম্ম যাদের সর্ব্বগ্রাসী, আজকে তারা আত্মঘাতী !
চণ্ডুখোরের মতন্ কেন ঝিমায় বিরাট্ আর্য্যজাতি ?

—————

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

প্যারীচাঁদ মিত্রের বঙ্গভাষা

(৩)

আমরা ইতিপূর্ব্বে* প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত "মাসিক পত্রিকা"র বিষয় লিখিয়াছিলাম। তখনকার সময়ে সংস্কৃতবহুল গুরুগম্ভীর ভাষার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সরস ও সতেজ কথ্য ভাষা সাহিত্যে প্রথম প্রবর্ত্তন করার জন্য এই পত্রিকার নাম বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চির-পরিচিত থাকিবে। আবার তৎকালের "রসরাজ" প্রভৃতি অশ্লীলভাষী সংবাদ পত্রাদির কথা উল্লেখ না করিয়াও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরিচালিত "সংবাদ প্রভাকরে" ও "গুড়গুড়ে" ভট্টাচার্য্যের "সংবাদ ভাস্করে" সময়ে সময়ে এমত পূতিগন্ধময় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত যাহা যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি পাঠ করিতে লজ্জিত হইতেন। অচিরকালের মধ্যে দেশে একটা নিন্দার বাণী উত্থিত হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, এই বর্ব্বরজনোচিত কবির লড়াই যত শীঘ্র বন্ধ হয় ততই ভাল। এজন্য যখন "মাসিক পত্রিকা" প্রকাশিত হইল তখন সকলেই আহ্লাদিত হইলেন। এমন কি প্রাচ্যদলের অগ্রণী রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই বাঙ্গালা ভাষার স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছিল বলিয়া এই পত্রিকার প্রশংসা করিতেন।

পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব যথানিয়মমত রাখিবার জন্য ইহাতে একটি গার্হস্থ্য উপন্যাস† পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশিত হইত। এই পুস্তকে অস্বাভাবিকতা বা অপ্রাসঙ্গিকতার লেশমাত্র নাই এবং ইহাতে দুঃখ দারিদ্র্য বা জাল জুয়াচুরি অথবা লাম্পট্যাচরণ প্রভৃতি পাপাচরণের বর্ণনা ছিল না। ঘটনাগুলি বায়স্কোপের দৃশ্যের ন্যায় স্বতঃই পরম্পর ঘটিয়া যাইতেছে। এই পুস্তক পাঠে আমরা আর একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই। বঙ্কিমবাবু ও তাঁহার অনুকরণকারীরা হিন্দু পরিবারের প্রধান অঙ্গ স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী প্রভৃতিকে অধিকাংশ স্থলেই ছাড়িয়া দিয়াছেন এই পুস্তকে জননী কেবল যে পরিত্যক্তা হন নাই তাহা নহে প্রত্যুত প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহার বর্ণনা আছে; সুতরাং ঘটনা-পরম্পরা স্বতঃই স্বাভাবিকভাবে ঘটিয়া গিয়াছে। আরও ইহার বর্ণনাপ্রণালী অতি সূক্ষ্ম। বাবুরাম বাবুকে তিনি কেবল সঙ্গতিপন্ন বলিয়াই তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। কোন্ কোন্ উপায়ে তাঁহার আয়,—তৎকালীন বাঙ্গালী জাতি চাকরি করিতে গিয়া কিরূপে অর্থ সংগ্রহ করিতেন এ সকল কথা তিনি বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রতি মাসের প্রকাশিত বিজ্ঞাপণীতে "সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের" চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ কথা লেখা থাকিত এবং পত্রিকা-প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধই নারীজাতির

* বঙ্গবাণী। চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয়ার্দ্ধ চতুর্থ সংখ্যা। অগ্রহায়ণ। ১৩৩২

† আলালের ঘরের দুলাল।

পাঠোপযোগী ও তাঁহাদিগের মনোরঞ্জক ছিল। তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধীয় এবং নৈতিক প্রবন্ধও সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইত। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মামুদের ভারত আক্রমণের কথা গল্পচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছিল ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহৎ লোকের জীবনীও স্থান পাইত। তবে বলিতে কি জনসাধারণের জন্য, যাহাদের ইংরাজীতে mass people বলিয়া নির্দ্ধারিত করে তাহাদের উপযোগী পত্রিকা—ভারত শ্রমজীবী—ইহার প্রায় বিংশতি বৎসর পরে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শশীপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"মাসিক পত্রিকা" এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য; কদাচ কোনও প্রাচীন গ্রন্থাগারে কিম্বা কোনও সাহিত্যসেবীর নিকট বহু অনুসন্ধানে দুই এক খণ্ড সংগ্রহ করা যাইলেও যাইতে পারে। সাধারণ ব্যক্তিদিগের শিক্ষার্থ কিরূপ প্রবন্ধ ইহাতে স্থান পাইত তাহার নিদর্শনস্বরূপ আমরা ১২৬৩ সালের পৌষ ও ফাল্গুন সংখ্যা হইতে—"অধ্যাপক হেনের কথা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিলাম। পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারেও আমরা বর্ণাশুদ্ধি কিম্বা ছেদ প্রভৃতি বিরাম-চিহ্নের কোনও পরিবর্ত্তন করি নাই।

অধ্যাপক হেনের কথা। নং ১

(১২৬৩ পৌষ সংখ্যা)

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর হইল জরমানি দেশে বড় এক ডাক্‌সাইটে ইউনিবরসিটিতে হেন নামে একজন প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। লাটিন ও গ্রিক ভাষায় তাঁহার সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ছিল। হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন সংস্কৃত মান্য, মুসলমানদিগের মধ্যে যেমন আরবী মান্য, জরমানিবাসী ও আর ২ গোরাদিগের মধ্যে গ্রীক ও লাটিন ভাষা সেইরূপ মান্য হয়। গ্রীক ও লাটিন ভাষায় অনেক ভাল ২ গ্রন্থ আছে। তাহার মধ্যে দশ বারখানা গ্রন্থ লইয়া, তাহার লেখা শুদ্ধ করিয়া, হেন ছাপাইয়া দেন। আরো সে সকল গ্রন্থের তিনি টীকা লেখেন। তদ্‌সওয়ায় তিনি লাটিন ভাষায় অনেক বই লিখিয়া ছাপান। হেন বর্ত্তমানে তাঁহার তুল্য সুপণ্ডিত গোরাদিগের দেশে আর কেহ ছিল না।

বত্রিশ তেত্রিশ বৎসর হইলে পর, হেন অধ্যাপকের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তাহার পূর্ব্বে তিনি দারুণ দুঃখী ছিলেন। প্রাণ যায় এমন কষ্ট স্বীকার করিয়া পড়াশুনা করেন। সে সকল কষ্টের বেওরা নীচে লিখি, তাহা পড়িয়া বাঙ্গালিদিগের ছেলেরা দেখুক,—হেনের তুল্য যাহার পড়াশুনা করিবার প্রতি যত্ন, তাহার যেমন দুরবস্থা হউক না কেন; তথাচ সে পড়াশুনা করিয়া এক দিবস বিদ্বান্ হইয়া উঠিবেক সন্দেহ নাই।

হেনের বাপ মা নিতান্ত গরীব ছিল। তাহাদিগের অনেকগুলিন ছেলেপিলে ছিল। বাপের ব্যবসা কাপড় বুনিয়া বিক্রী করা। সে ব্যবসা করিয়া যাহা যৎকিঞ্চিৎ লাভ হইত, তাহাতে অত্যন্ত কষ্টে সংসার চলিত। অধ্যাপকের কর্ম্ম পাইলে পর হেন আপনি পুনঃ ২ বলিতেন,—জন্মাবধি আমি দারুণ দুঃখী ছিলাম। ছেলেবেলায় কোন ২ দিবস এমন হইত যে আমাদিগের ঘরে কিছুমাত্র খাওয়া দাওয়ার থাকিত না, সে সময়ে ছেলে পিলে খাবার চাহিলে, কি খাবার দিব, এই বলিয়া মা কাঁদিতেন। মায়ের কান্না আমি কখনই ভুলিব না, তাহা আজ কাল যখন মনে করি, আমার দুই চক্ষুতে জল আইসে। কখন কখন

ছেলে বেলাকার সকল দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া আমি ছেলেমানুষের মতন বসিয়া কাঁদি। দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া বাবা কাপড় বুনিতেন। সে সকল কাপড় মা শনিবারের হাটে লইয়া গিয়া বেচিতেন। কোন ২ দিবস এমন হইত, যে কিছুমাত্র বিক্রী হইত না, সে সকল দিবসে মা মাথা টাথা চাপড়াইয়া কাঁদিতে ২ ঘরে আসিতেন, ঘরে আসিয়া বলিতেন,—আজ তো কিছুই বিক্রী হইল না, বাপধনদের কি খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিব। এই সকল হেনের মুখ থেকে শুনা কথা।

হেনের বাপ মা নিতান্ত গরীব ছিল বটে, তথাচ ছেলেটির বয়েস পাঁচ বৎসর হইলে, তাহারা তাঁহাকে গ্রামের স্কুলে পাঠাইয়া দেয়। সে স্কুল বড় সামান্য স্কুল, সেখানে ছোট ২ ছেলে বই, আর কেহ লেখা পড়া শিখিত না। স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সময়ে, হেন প্রায় শিশু ছিলেন বলিতে হইবেক, তথাচ তাঁহার লেখাপড়ার প্রতি এত যত্ন, যে দশ বৎসর বয়স না হইতে ২ তিনি স্বদেশীয় ভাষায় অনেক বই টই পড়িয়া সাঙ্গ করেন। লেখা পড়ায় হেনের এত বোধ সোধ হইয়াছে, ইহা দেখিয়া, একজন পাড়া প্রতিবাসি তাঁহাকে ডাকিয়া বলেন,—হেন, তুমি সকালে বৈকালে আমার মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখাও, আমি তোমাকে মাসে ২ এত মাহিনা দিব। পাড়া প্রতিবাসির মেয়েটিকে লেখা পড়া শিখাইতে হেন রাজী হন। সে কর্ম্ম করিয়া যে মাহিনা পান, তাহাতে তাঁহার নিজের স্কুলের খরচ পত্র দিয়া তিনি আরো পড়া শুনা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে স্কুলের মাষ্টর যে ২ বিষয় শিখাইতে পারিত, তাহা সকলি হেন শিখিয়া উঠেন। পরে তাঁহার মনে একটা প্রবল বাসনা হয়,—আমি লাটিন ভাষা শিখিব। মাষ্টরের বড় ছেলে লাটিন ভাষা জানিত। সে হেনকে বলে,—আমি তোমাকে লাটিন ভাষা শিখাইব, তুমি আমাকে সাড়ে দশ আনা করে মাসে ২ দিও। মাষ্টরের ছেলের টাকা লইবার কথা শুনিয়া হেন মনে মনে ভাবেন,—আমি প্রতি মাসে সাড়ে দশ আনা কোথায় পাইব, বুঝি আমার লাটিন শেখা হইল না।

লাটিন ভাষা শেখা হইলনা বলিয়া হেন অত্যন্ত মনোদুঃখান্বিত হইয়া কিছু দিন থাকেন। এমন সময়ে তাঁহার বাবা তাঁহাকে এক দিবস বলে,—হেন, তুমি তোমার ধর্ম্ম পিতার কাছে গিয়া একখানা পাঁউরুটী চাহিয়া আন, আজ বাড়ীতে খাওয়া দাওয়ার বড় অকুলান হইয়াছে। হেনের ধর্ম্ম পিতা পাঁউরুটীর দোকান করিত। সে দোকানে তাহার যথেষ্ট লাভ ছিল, তদ্‌সওয়ায় তাহার বিষয় আশয়ও অল্প ছিল। এই জন্যে তাহার ভরণ পোষণে কিছুমাত্র কষ্ট হইত না, তাহার সকল খরচ পত্র স্বচ্ছন্দে চলিত।

বাপের কথাক্রমে হেন ধর্ম্মপিতা রুটীওয়ালার দোকানে গিয়া উপস্থিত হন। রুটীওয়ালা দেখে হেন বড় ভাবনান্বিত, এই জন্যে জিজ্ঞাসা করে, হেন, তোমার মুখ এত ভারি ২ কেন, তোমার কি হইয়াছে বল দেখি! রুটীওয়ালাকে হেন সকল মনের কথা খুলিয়া বলেন। সকল কথা শুনে হেনের পড়া শুনায় এত যত্ন দেখিয়া রুটীওয়ালা উত্তর দেয়,—হেন, তুমি এত মনোদুঃখ করিও না, তুমি লাটিন শেখ, আমি তোমাকে মাসে ২ সাড়ে দশ আনা করে দিব। এই সকল কথা দুঃখের সময়ে হয়। কিন্তু অধ্যাপকের কর্ম্ম পাইয়া সম্পদকালে হেন পুনঃ পুনঃ বলিতেন,—যখন আমি ধর্ম্ম পিতার ঠাঁই শুনি আমি লাটিন শিখিব বলিয়া তিনি আমাকে মাসে মাসে সাড়ে দশ আনা করে দিবেন, আমি একেবারে আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়ি। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহার ঠাঁই একখানা পাঁউরুটী চাহিয়া লই। আমার পায়ে জুতা নাই, আমি ছেঁড়া কাপড় পরিয়া আছি, এই সকল আমি কিছুমাত্র মানি নে, আহ্লাদে আমার বুদ্ধি শুদ্ধি উড়িয়া যায়, আমি দুই হাতে পাঁউরুটীখানা লুফিতে ২ দৌড়াদৌড়ি করিয়া বাড়ীতে আসিতেছি, এমন সময়ে হাত থেকে রুটীখানা

পড়িয়া গিয়া একেবারে নর্দ্দমায় গড়াইয়া যায়। রুটীখানা নর্দ্দমায় পড়িয়া নষ্ট হইলে আমার চেতন হয়। আমি মনে ২ বলি, আমি কি মন্দ কর্ম্ম করিলাম। পরে বাড়ীতে আসি, বাবা ধমকিয়া কহেন,—টানা টানির সময়ে তুই রুটী খানা নষ্ট করিলি, আমরা কি খাইব বল দেখি। এইসকল হেনের নিজের বলা কথা।'

আপনার কথাক্রমে রুটীওয়ালা হেনকে মাসে মাসে সাড়ে দশ আনা পয়সা দিতে লাগল। সে পয়সা লইয়া মাষ্টরের ছেলেকে দিয়া হেন লাটিন শিখেন। হেন দুই বৎসর লাটিন শিখেন। পরে স্কুলের মাষ্টরের ছেলে বলে হেন আমি যতদূর পর্য্যন্ত লাটিন জানিতাম, তাহা তোমাকে শিখাইলাম, আমাকে আর বৃথা মাহিনা দিও না, আমি তোমার আর কিছু বেসি শিখাইতে পারিব না।

যে সময়ে মাষ্টরের ছেলে এই সকল কথা বলে, হেনের বয়স সাড়ে বারু বৎসর; হদ্দ তের বৎসর হইবেক। হেনের বাপের নেহাৎ ইচ্ছা, হেন বড় হইল, এক্ষণে সে কোন ছোট মোট ব্যবসা শিখিয়া রোজকার করুক। কিন্তু হেনের প্রবল বাসনা,—আমি কোন ব্যবসা ট্যেবসা শিখিব না, তাহাতে আমার মন যায় না, আমি পড়াশুনা করিব, কেবল তাহাতেই আমার মন যায়।

আরো বেসি লাটিন ভাষা শিখিতে গেলে, তাহা ছাড়া গ্রীকভাষা অভ্যাস করিতে হইলে, হেনের আর বাপ মার সঙ্গে গ্রামে থাকা হয় না। তাঁহাকে সহরে গিয়া বড় স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া পড়া শুনা করিতে হয়। সে সব করা সহজ বিষয় নয়। তাহা করিতে গেলে সহরে বাসা করিয়া থাকিবার খরচ চাই, আরো বই টই কিনিবার জন্য টাকা চাই, তদ্‌সওয়ায় স্কুলের মাহিনা চাই। এসকল খরচ কে দিবেক। ঐসকল কথা মনে তোলাপাড়া করিতে ২ হেন বড় দুর্ভাবনাপন্ন হইয়া পড়েন।

রুটীওয়ালা ছাড়া হেনের আরো একজন ধর্ম্মপিতা ছিল। তিনি পাদ্রি, যোত্রাপন্ন লোক। হেনের পড়াশুনার প্রতি এত আস্থি, তাহা শুনিয়া তিনি হেনকে ডাকাইয়া বলেন,—গ্রামের নিকটে যে সহর আছে, তুমি সে সহরের স্কুলে গিয়া পড়াশুনা কর, তাহাতে যে খরচ পত্র হয়, তাহা সকলি আমি দিব। পাদ্রির কথার উপর নির্ভর করিয়া হেন সহরের স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। পাদ্রি যোত্রাপন্ন লোক বটে, কিন্তু বড় কৃপণ। তিনি হেনের ন্যায্য খরচের মতন টাকা দিতেন না, যৎকিঞ্চিৎ টাকা অর্থাৎ যে টাকা না দিলে নয়, তাহাই তিনি দিতেন। সে টাকায় হেনের বই টই কেনা দূরে থাকুক তাঁহার খাওয়া দাওয়ার খরচ অত্যন্ত কষ্টে চলিত। নিজে বই টই কিনিতে পারিলাম না বলিয়া, হেন পড়াশুনায় কিছুমাত্র গাফিলি করেন নাই। তিনি আর ২ ছোকরার ঠাঁই বই ধার লইয়া তাহা নকল করিতেন, পরে সে নকল থেকে প্রতি দিবস পড়া মুখস্ত করিতেন। কিছুদিন এই প্রকার করিয়া হেন পড়া অভ্যাস করেন। পরে একজন ভদ্র লোক হেনের অনেক সদ্‌গুণের কথা শুনিয়া বলেন,—হেন, তুমি আমার ছেলেকে লেখা পড়া শিখাও। সে ভদ্রলোকের ছেলেকে লেখা পড়া শিখাইয়া হেন যে মাহিনা পান, তাহাতে তাঁহার খাওয়া পরা ও স্কুলের খরচ স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল।

সহরের স্কুলে যে ২ বই পড়া শুনা হইত, তাহা সকলি অল্প দিবসের মধ্যে হেন পড়া শুনা করিয়া সমাপ্ত করেন। হেনের অনেক দূর পর্য্যন্ত বিদ্যা অভাস হইল বটে, তথাচ বিদ্যা অভ্যাসের প্রতি তাঁহার যে সাধ তাহা মেটে নাই। তিনি আরো পড়া শুনা করিতে চান। এই জন্যে যে সহরে ছিলেন, সেখানে তাঁহার আর থাকা হয় না। তাঁহার উচিত একবারে লিপ্‌সিক্‌ সহরে গিয়া ইউনিবর্‌সিটিতে ভর্ত্তি হইয়া পড়া শুনা করা। হেন মনে স্থির করেন,—আচ্ছা, আমি তাহাই করিব। এই কথা বলিয়া হেন লিপসিক্‌ সহরে

যান। সেখানে গিয়া দেখেন,—সঙ্গে দুইটি বই টাকা নাই। খরচ পত্রের টাকা কড়ি নাই বলিয়া হেন কিছুমাত্র ভয় পান না। তিনি ইউনিবরসিটিতে ভর্ত্তি হইয়া লাটিন ও গ্রীক ভাষায় যে বড় বড় ভারি গ্রন্থ ছিল তাহা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। পরম যত্ন পূর্ব্বক হেন পড়া শুনা করেন বটে, কিন্তু তাহা করিয়া তিনি যে প্রকার কষ্ট ভুগিতে লাগিলেন, তাহার আর সীমা পরিসীমা নাই। পূর্ব্বকার মতন পাদ্রি ধর্ম্ম পিতা যৎকিঞ্চিৎ খরচ পত্র পাঠাইয়া দিতেন বটে, কিন্তু সে টাকায় হেনের কিছুমাত্র হইত না। কোন ২ দিবস খরচ পত্র নাই বলিয়া হেন সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিতেন। সন্ধ্যাকালে ইউনিবর্‌সিটি থেকে আস্তে আস্তে বাসায় আসিতেন। যে গৃহস্থের বাড়ীতে হেন বাসা করিয়াছিলেন, সে বাড়ীতে একজন চাকরাণী ছিল। সে চাকরাণী দয়া মমতা করিয়া সন্ধ্যাকালে হেনকে যৎকিঞ্চিৎ খাবার আনিয়া দিত, তাহা খাইয়া হেন ক্ষুধা নিবারণ করিতেন। এইপ্রকার সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যাকালে চাকরাণীর ঠাঁই যৎকিঞ্চিৎ খাবার পাইয়া হেন কত বার ক্ষুধা নিবারণ করিয়া ছিলেন তাহার ঠিকানা নাই। যদি বল এত কষ্ট স্বীকার করিয়া হেন পড়া শুনা করেন কেন ? একথার উত্তর তিনি আপনি দিয়াছেন। সে উত্তর শুন।

হেন বলেন,—আমি যে পড়াশুনা করিয়া বড় ২ রাজ রাজরার নিকটে ভারি চাকরি টাকরি করিব, আমার এমন অভিলাষ ছিল না। আরো আমি এমনও কখন মনে ভাবি নাই, যে বিদ্যা অভ্যাস করিয়া আমি এক দিবস পণ্ডিতদিগের মধ্যে পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইব। কিন্তু আমি যে মূর্খ হইয়া থাকিব, ইহার উপর আমার বড় ঘৃণা হইত। আর ২ সকল অধমতা বরদাস্ত হয়, কিন্তু মূর্খ হইয়া থাকিলে যে অধমতা বোধ হয়, তাহা সহ্য হইবার নয়। আমি যেন মূর্খ না হই; এই জন্যে প্রাণ যায় এমন কষ্ট স্বীকার করিয়া পড়াশুনা করি। আরো আমি মনে ভাবি, আমার ভাগ্য ভাল নয়, এই নিমিত্তে দুরবস্থায় পড়িয়াছি, কিন্তু দুরবস্থায় পড়িয়াছি বলিয়া আমি কি একাবারে সম্পূর্ণ অধম হইয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইব। তাহা করিলে আমার মর্দ্দানি কি। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া আমার মনে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হয়, দুঃখে পড়িয়া আমি কখনই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিব না। দুর্ভাগ্যের কতদূর পর্য্যন্ত দৌড় তাহা আমি দেখিব। আমি যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিব। পরিশ্রমের জোরে দুরবস্থা থেকে উদ্ধার হইয়া অমি নিজে সু অবস্থা করিয়া লইব। এই প্রতিজ্ঞা ক্রমে হেন বিদ্যা অভ্যাস করেন।

খরচপত্র অভাবে হেনের যত কষ্ট বাড়িতে লাগিল, তিনি ততই মনোযোগ পূর্ব্বক পড়া শুনা করিতে লাগিলেন। তিনি আর বই ছাড়া কখনই হন না। প্রতি সপ্তাহে কেবল দুই দিবস রাত্রে শয়ন করিতেন। আর সকল সময়ে দিবা রাত্রি কেবল বই লইয়া থাকিতেন।

হেন যে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিলেন, এই কথাটি ইউনিবরসিটিময় রাষ্ট্র হইয়া যায়। সকলেই তাঁহাকে দয়া মমতা করে। এক দিবস ইউনিবরসিটির একজন প্রধান অধ্যাপক হেনকে ডাকিয়া বলেন,—হেন, অমুক সহরে একজন বড়মানুষ আপনার ছেলেকে ঘরে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতে চান, আমি তাঁহাকে বলিয়া দি, তুমি তাঁহার ছেলের মাষ্টার হও গিয়া। একথা শুনিয়া হেন উত্তর দেন,—মহাশয়, আপনি যে কথা কহিতেছেন, আমার পক্ষে তাহা সর্ব্বতোভাবে ভাল হইবেক, কিন্তু তাহা আমি কেমন করে করি, তাহা করিলে আমাকে তো ইউনিবর্‌সিটি ছেড়ে অমুক সহরে গিয়া থাকিতে হয়। ইউনিবর্‌সিটি ছাড়িলে আমার তো আর পড়াশুনা হইবেক না। আমি এক্ষণে বড় কষ্ট পাইতেছি বটে, কিন্তু আর কিছুদিন কষ্ট ভোগ করিয়া মনের অভিলাষটা পূর্ণ করিয়া লইনা কেন। মহাশয়, আমার প্রবল ইচ্ছা পড়া শুনা সাঙ্গ না হইলে,

আমি ইউনিবর্‌সিটি ছাড়িয়া দিব না। এইসকল কথা বলিয়া হেন বড়মানুষের ছেলের মাষ্টার গিরি কর্ম্ম গ্রহণ করেন না।

হেন পূর্ব্বোক্ত মাষ্টার গিরিরি কর্ম্ম ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে উপরি লিখিত অধ্যাপক মহাশয়ের চেষ্টায় তাঁহার আর একটি বেস মাষ্টার গিরি কর্ম্ম হয়। ইউনিবর্‌সিটির নিকটে একজন বড়মানুষ থাকিতেন, তাঁহার বাসনা আমি ছেলেকে ঘরে রাখিয়া লেখা পড়া শিখাইব। অধ্যাপক মহাশয় ঐ বড়মানুষকে বলিয়া দেন, হেন তাঁহার বাড়ীতে গিয়া তাঁহার ছেলেকে পড়াশুনা করান। সে কর্ম্ম করিয়া যে মাহিনা পান, তাহাতে হেনের খাওয়া দাওয়া ও ইউনিবর্‌সিটির খরচ সচ্ছন্দে চলিতে লাগিল।

খরচপত্রের আর ভাবনা নাই বলিয়া হেন প্রাণপণে পরিশ্রম পূর্ব্বক পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে বিপর্য্যয় পরিশ্রম তিনি বিস্তর দিবস বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। অল্প দিবসের মধ্যে সে পরিশ্রম জন্য তাঁহার একটা বিষম ব্যারাম উপস্থিত হয়। সে ব্যারাম শীঘ্র আরাম হইবার নয়। এই জন্যে তিনি মাষ্টার গিরি কর্ম্ম ছেড়ে দেন। পরে আরাম হইলে দেখেন,—ডাক্তার ও ঔষধ ও পীড়ার সময়ে খাওয়া দাওয়ার খরচ দিতে তাঁহার নিকটে যাহা যৎকিঞ্চিৎ টাকা ছিল, তাহা সকলি ফুরিয়া গেল। পরে তাঁহার হাতে এক দিবসের জন্যেও খাওয়া দাওয়ার সঙ্গতি রহিল না।

অধ্যাপক হেন সংক্রান্ত আর যে বাকি কথা রহিল, তাহা আগামী পত্রিকায় লিখিব।

অধ্যাপক হেনের কথা নং ২।

(১২৬৩ ফাল্গুন সংখ্যা)

পৌষ মাসের পত্রিকায় বলিয়াছি, হেনের যে শক্ত ব্যারাম হইয়াছিল তাহা থেকে আরাম হইয়া দেখেন,—তাঁহার ঠাঁই এক দিবসের জন্যেও খাওয়া দাওয়ার খরচ পত্র নাই, এমন সময়ে কয়েকজন আত্মীয় বন্ধু হেনের নিকটে আসিয়া পরামর্শ দেন,—হেন, তুমি যে লাটিন ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া ছাপাইয়াছিলে, তাহা অমুক রাজমন্ত্রী পড়িয়া বড় প্রশংসা করেন। তুমি সে রাজমন্ত্রীর নিকটে যাও। এক্ষণে তিনি রাজার সঙ্গে ড্রেস্‌ডেন্ সহরে আছেন। রাজমন্ত্রীর নিকটে উপস্থিত হইয়া তোমার দুরাবস্থা জানাইলেই তিনি আপনি মুরুব্বি হইয়া তোমার এমন চাকরি করিয়া দিবেন, যে তুমি একাবারে বড়মানুষ হইবে। বন্ধুদের পরামর্শক্রমে হেন ড্রেস্‌ডেন্ সহরে যাইতে সম্মত হন। যে সহরে হেন ছিলেন সেখান থেকে ড্রেস্‌ডেন্ পাকা পঁইত্রিশ ক্রোশ। হেনের কিছুমাত্র সঙ্গতি নাই বলিয়া তিনি যৎকিঞ্চিৎ টাকা ধার করেন। সে টাকাতে পথ খরচ করিয়া তিনি ড্রেস্‌ডেন্ সহরে যান, গিয়া রাজ-মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা সাক্ষ্যাৎ করেন। হেনকে রাজ-মন্ত্রী দুই একটা ফাল্‌তো কথা বলেন, এই মাত্র, তাহা বই তাঁহার জন্যে আর কিছু করেন না। হেন দেখেন,—তাঁহার ড্রেস্‌ডেনে আসাই বৃথা হইল। তাঁহার সঙ্গে যে বই টই ছিল, তাহা সকলি বেচিয়া দিন কতক খরচপত্র চালান। পরে সঙ্গতি অভাবে নাচার হইয়া তিনি একজন ওমরার কেতাব খানার কর্ম্মকর্ত্তা হন। তাঁহার মাসিক মাহিনা চৌদ্দ টাকা করে হয়। দেশে খাবার দাবার সামগ্রী বড় সস্তা বটে, তথাচ চৌদ্দ টাকা দিয়া ভদ্রলোকের গুজরান চলে না। কিন্তু হেন তাহা মানেন না, যেমন করে হউক চৌদ্দ টাকাতে তাঁহার সকল খরচপত্র চালাইতেন। তিনি মনে ভাবেন,—আমি যে কেতাব খানায় চাক্‌রি করিতেছি, সেখানথেকে তো সকল বই পড়িতে পাই, তাহা ছাড়া ড্রেস্‌ডেন্ সহরে আর যে যে বড় কেতাব খানা আছে;

সেখান থেকেও সকল বই খাড়ীতে আনিয়া পড়িতেছি, এত পড়া শুনা করিয়া আমি যে খাওয়া পরার জন্যে কষ্ট পাইতেছি, তাহা সে পড়া শুনাতে বেশ পুষিয়া আসিতেছে বলিতে হইবেক।

হেনের বড় একটা বড় ভদ্র কর্ম্ম। তিনি মনে করেন,—ড্রেস্‌ডেন্ সহরে আসিবার পূর্ব্বে আমি যৎকিঞ্চিৎ টাকা ধার করিলাম, সে দেনা শুধিতে হইবেক। ইহা বলিয়া লাটিন ও গ্রীক ভাষায় তিনি কয়েকখানা বই ছাপাইয়া যে লাভ হয়, তাহা দিয়া তাঁহার সকল দেনা পরিশোধ করেন।

কেতাব খানায় দুই বৎসর চাকরি করিলে পর, হেনের মাসিক মাহিনা দিগুন অর্থাৎ আটাস টাকা হয়। কিন্তু বাড়া মাহিনা হেন এক মাসের জন্যেও ভোগ করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ,—যে সময়ে হেনের মাহিনা বাড়ে, দেশে বড় একটা লড়াই উপস্থিত হয়। সে লড়াই দুই এক বৎসরে শেষ হয় না, সে ক্রমাগত সাত বৎসর চলে। দেশে লড়াই হইয়াছে বলিয়া যে ওমরার কেতাব খানায় হেন কর্ম্ম করিতেন, তিনি সে কেতাব খানা উঠাইয়া দেন। কেতাব খানা উঠিয়া গেলে, হেনের চাকরিও যায়। বেচাকরে হইয়া হেনের যাহা মেজ চৌকি যৎকিঞ্চিৎ জিনীসপত্র ছিল, তাহা ড্রেস্‌ডেন সহরে একজনের জিম্বা রাখিয়া তিনি চাকরির উদ্দেশে স্থানান্তরে যান।

কর্ম্মতল্লাসে হেন একবার এ সহরে, একবার ও সহরে গমন করেন। কিন্তু কোথাও তাঁহার কর্ম্ম হয় না। এই প্রকার কর্ম্ম অভাবে তিনি কয়েক মাস দেশময় বেড়াইয়া বড় হায়রান হন। হায়রান হইয়া শেষে উইটন্‌বর্গ সহরে তাঁহার ছোট খাট একটি চাকরি হয়। হেন সে চাকরি কিছুদিন করেন, পরে পূর্ব্বোক্ত লড়াইয়ের জন্যে তাঁহাকে সে চাকরিও ছাড়িয়া দিতে হয়। চাকরি গেলে পর হেন পুনরায় ড্রেস্‌ডেন্ সহরে আইসেন, আসিয়া দেখেন,—বিপক্ষেরা সেনার দ্বারায় সহর বেষ্টন করিয়া তাহার উপর কামান করিতেছে। সে কামান থেকে জ্বলন্ত গোলা নির্গত হইয়া সহরময় পড়িয়া সকল বাড়ী ঘর দ্বার জ্বালাইয়া দেয়। দিন কতকের মধ্যে সকল বাড়ী ঘর দ্বার জ্বলে পুরে ছার খার হইয়া যায়। বাড়ী ঘর দ্বারের সঙ্গে ড্রেস্‌ডেন্ সহরে হেনের যাহা যৎকিঞ্চিৎ জিনীসপত্র ছিল তাহার সকলি জ্বলে পুড়ে গেল।

হেন পুনরায় উইটন্‌বর্গ সহরে আইসেন, আসিয়া বিবাহ করেন। যে বিবীকে করেন, তিনিও যেমন গরীব হেনও তেমনি গরীব। বিবাহের পর দুই পক্ষের আত্মীয় গণেরা অনেক চেষ্টা মেষ্টা করিয়া হেনকে একটি ছোট মোট কর্ম্ম করিয়া দেন। সে কর্ম্ম হেন কয়েক বৎসর করেন।

ইংরাজি সন ১৭৬৩ সালে জরমানি দেশের পূর্ব্বোক্ত সাত বৎসরের লড়াই শেষ হইলে পর, হেন ড্রেস্‌ডেন্ সহরে তৃতীয় বারের বার আইসেন। এবার বড় শুভ বড় লক্ষণের যাত্রা করিয়া হেন ড্রেস্‌ডেন্ সহরে আসিয়াছিলেন। ইহার কয়েকমাস পূর্ব্বে গোটিন্‌জন্ সহরের ইউনিবর্‌সিটিতে একজন প্রধান অধ্যাপকের কাল হওয়াতে তাঁহার কর্ম্ম খালি হইয়াছিল। সে কর্ম্ম সংক্রান্ত রাজমন্ত্রী একজন বড় পণ্ডিতকে লিখিয়া পাঠান,—আপনি এ কর্ম্ম গ্রহণ করুন। সে পণ্ডিত উত্তর দেন,—আমার এক জায়গায় অধ্যাপকের কর্ম্ম আছে, সে কর্ম্ম ছাড়িয়া আমি অন্যস্তরে যাইব না। আমার নিবেদন, আপনি কর্ম্মটী হেনকে দিন। হেন বড় যোগ্য লোক, তাঁহার সঙ্গে আমার চাক্ষস আলাপ নাই বটে, কিন্তু লাটিন ভাষায় তিনি যে কয়েকখানা বই ছাপাইয়াছেন তাহা আমি পড়িয়াছি, সে সকল বই করা বড় পণ্ডিতের কর্ম্ম। অধ্যাপক পণ্ডিতের ঠাঁই হেনের সুখ্যাতির কথা শুনিয়া রাজমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ হেনের তত্ত্বতাবাসে চাকর পাঠাইয়া দেন। হেন বড় গরীব লোকের মতন থাকিতেন, তাঁহাকে সহরের মধ্যে কেহই চিনিত না। এইজন্যে রাজমন্ত্রীর চাকরেরা তাঁহার বাড়ী শীঘ্র খুঁজে পায় না। পরে অনেক অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার বাড়ী বাহির করিয়া তাঁহার সঙ্গে গিয়া দেখা সাক্ষাৎ করে। হেন রাজমন্ত্রীর নিকটে উপস্থিত হইলেই তিনি অধ্যাপকের কর্ম্ম পান। সে কর্ম্ম হওয়া হেনের সম্পদ কালের সুরু। অধ্যাপকের কর্ম্ম করিয়া হেন দেশময় বড় বিখ্যাত ও মান্য হন। তিনি পঞ্চাশ বৎসর অধ্যাপকের কর্ম্ম করেন। পরে তাঁহার কাল হয়।

গান

১

শ্রমীর গান

দাঁড়া সবাই খাড়া মাথায়, ভুঁয়ে নুয়ে পড়িস্ নে ;
হোস্‌নে রে পা-চাটা কুকুর,—মানীর ঠাকুর গড়িস্ নে।
জড়িয়ে রক্তে, মাংসে, হাড়ে, শক্তিদাতা ধাতা বাড়ে ;
বাড়িয়ে তাকে চল্‌রে আগে, বাধার ধাঁধায় সরিস্ নে।
আসবে মরণ, জানাই আছে, দমিস্ নে তুই যমের কাছে ;
থাক্‌রে ঝুঁকে কাজের কাজে,—মরণ খুঁজে মরিস্ নে।
ছাড়িস্ না কেউ পথে চলা, দুঃখ-জ্বালা পায়ে দলা ;
নয় সে মুকুট, নয় সে মালা,—টেনে এনে পরিস্ নে।
থাকিস্ সোজা—থাকিস্ খাঁটি ; পাথর ভেঙ্গে করিস্ মাটি ;
যানের রাজার আমরা মজুর,—জুজুর তাড়ায় ডরিস্ নে।

২

চাষার গান

হো-হো বলদ, হৈ !
জোয়াল কাঁধে চল্‌রে সিদে, টেনে লাঙ্গল টেনে বিঁদে
টেনে নিয়ে মৈ।
গুড়, গুড়, হাঁকে—
ছিটিয়ে বৃষ্টি আমার মাথায়, দু-চার ফোঁটা গাছের পাতায়
আকাশে দেও ডাকে।
জমাট মেঘের গাদা !
আয়রে নেমে ভিজিয়ে ধারায়, ঝরে' পড়ে' ধানের চারায়
ধূলা কর কাদা।
জল, জল, জল ;
আস্‌ছে টোকা আমার তরে,—বাউটি, খাড়ু, পঁইছে, নড়ে ;
চল্‌রে বলদ চল্ !
আঁটি আঁটি ধান—
বয়ে নিয়ে মাড়িয়ে খোলায়, ক'র্‌ব পুঁজি তুল্‌ব গোলায়
ভগবানের দান।
ধান, মুগ, কলাই—
কত পাব দেব্‌তা দিলে ; এই মাটিতে সবাই মিলে
আম্‌রা সোনা ফলাই।

প্রতিবাদ

(১)

"রাম ও কৃষ্ণ"

(ক)

এদেশে ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত হইলে সেই শিক্ষার মোহে পড়িয়া প্রথমাবস্থায় অনেকেই জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট দেশীয় যা কিছু সবই মন্দ এবং ইউরোপীয় তথা ইংরাজী যা কিছু তাহাই ভাল বোধ হইত। সেকালের ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র ভূদেব বাবু এ-ধাক্কা সামলাইয়া অনেকটা মাথা ঠিক রাখিয়া ছিলেন। তার পর ক্রমশঃ হাওয়া ফিরিতেছে। এখনও সে দলের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার "বঙ্গবাণীতে" শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর সেন মহাশয়ের "রাম ও কৃষ্ণ" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মনে হইতেছে বীরেশ্বর বাবুও ঐ দলের লোক। রাম ভগবানের অবতার। মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহাকে আদর্শ ক্ষত্রিয় রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তবে রাম মানব-দেবতা, কাঠ বা পাথরের দেবতা নহেন। তিনি মানবসুলভ সুখ দুঃখের অধীন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কোটী কোটী ভারতবাসী তাঁহাদিগকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া ভক্তির অঞ্জলি প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। অথচ বীরেশ্বর বাবু তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া যেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা সঙ্কীর্ণহৃদয় ধর্ম্মান্ধ খৃষ্টান পাদরির মুখেই শোভা পায়।

বীরেশ্বর বাবু "রাম বনবাসের" ইতিহাস পুনর্গঠন করিতে সাহসী হইয়াছেন এবং রাম ও কৃষ্ণের বিবরণ সকল পুরাণাদিতে এক রকম নাথাকার একটা অনুমান বা থিওরী পণ্ডিত দিগের সমক্ষে খাড়া করিয়াছেন। আবশ্যক বোধ করিলে পণ্ডিতেরা তাঁহার অনুমান লইয়া বিচার করিবেন। তবে তাঁর 'রাম বনবাসের' ইতিহাস পুনর্গঠনের নমুনা দেখিয়া মনে হইতেছে যে তিন যদি দীনবন্ধু মিত্র রচিত "জামাই বারিকে" এক নিঃশ্বাসে বর্ণিত "রামায়ণ কাহিনী" এবং দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের "রাম বনবাস" গানটী আর একবার পড়িয়া লইতেন তাহা হইলে তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণাটা আরও লাগ্-সহি হইত।

এ দেশে ইংরাজিশিক্ষা-প্রাপ্ত কেহ কেহ সীতা বর্জ্জনের জন্য, বালী বধের জন্য, এবং শম্বুক বধের জন্য, রামের উপর মহা খাপ্পা; কিন্তু রাম চৌদ্দ বৎসর বনবাসের পর অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করায় তাঁহার সমগ্র পিতৃ সত্য পালন হয় নাই; এই অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রথম গৌরব বীরেশ্বর বাবুরই প্রাপ্য। এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া তৎ-সমর্থনার্থ বীরেশ্বর বাবু ভরতের প্রতি রামের নিম্নলিখিত উক্তিটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—"আমাদের পিতা যখন তোমার মাতাকে বিবাহ করেন তখন তিনি কেকয় রাজার নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে তিনি কৈকেয়ীর গর্ভজাত পুত্রকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী করিবেন।" মূল শ্লোকটী এইরূপ :—

"পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্।
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্রাজ্যশুল্কমনুত্তমম্॥"

এই শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত রামায়ণের বঙ্গানুবাদে বীরেশ্বর বাবু যেরূপ লিখিয়াছেন

অনেকটা সেইরূপই দেখিতেছি। "মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্রাজ্যশুল্কমনুত্তমম্" এর মানে "তোমার মাতামহের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে তাঁহার কন্যার, গর্ভজাত পুত্রকে রাজ্য দিবেন," কেমন করিয়া হইল তাহা টীকা টিপ্পনি না দেখিয়া বুঝিতে পারা কঠিন। যদি ধরিয়া ল... যায় যে ঐ শ্লোকটীর অর্থ বীরেশ্বর বাবু যেরূপ লিখিয়াছেন সেই রূপই, তাহা হইলে ঐ শ্লোকটীকে প্রক্ষি... ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। কারণ ঐরূপ কথা রামবনবাস সম্বন্ধীয় পূর্ব্বাপর ঘটনার সম্পূর্ণ বিরোধী। দশরথ রাজা যদি কৈকেয়ীকে বিবাহ করিবার সময়েই কৈকেয়ীর পিতার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন যে কৈকেয়ীর গর্ভজাত পুত্রকেই রাজ্য দিবেন, তাহা হইলে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কথাই উঠিত না; এবং উঠিলেও কৈকেয়ী রাজা দশরথকে সেই প্রতিজ্ঞার কথা না বলিয়া অসুর যুদ্ধে রাজা দশরথ আহত হইলে কৈকেয়ী রাজাকে শুশ্রূষা করিয়া প্রীত করিয়াছিলেন বলিয়া রাজা কৈকেয়ীকে যে দুইটী বর দিতে চাহেন এবং যে বর দুইটী কৈকেয়ী রাজার নিকট গচ্ছিত রাখেন সেই বরদুইটীর উল্লেখ করিয়া এক বরে ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেক, এবং দ্বিতীয় বরে রামের চৌদ্দ বৎসর বনবাস প্রার্থনা করিতেন না। ভরতের মাতামহের নিকট কৈকেয়ীর বিবাহ কালে দশরথ রাজার প্রতিশ্রুতির কথা কৈকেয়ী জানিলেন না, ভরত জানিলেন না, জানিলেন কেবল মাত্র রাম! অথচ "পুরাভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং" ইত্যাদি শ্লোকটীর পরেই রাম ভরতকে বলিতেছেন, "দেবাসুর যুদ্ধকালে পিতা তোমার জননী কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন; এবং এ জন্য তাঁহাকে দুইটী বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। তৎপর তোমার যশস্বিনী বরবর্ণিনী জননী নরশ্রেষ্ঠ পিতাকে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করাইয়া তাঁহার নিকট দুইটী বর প্রার্থনা করেন। নরবর, তার মধ্যে প্রথম বরে তোমার রাজ্যাভিসেক এবং দ্বিতীয় বরে আমার চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস প্রার্থনা করিয়াছিলেন।" রামের রাজ্যের প্রতি লোভ থাকিলে এবং তিনি বনে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, দশরথ রাজার সাধ্যও ছিল না যে রামকে বনে পাঠান। কারণ লক্ষ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজাবর্গ পর্য্যন্ত সকলেই রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামের পক্ষে ছিলেন। রামই অসন্তুষ্ট প্রজাপুঞ্জকে এই বলিয়া নিবৃত্ত করিয়াছিলেন যে তিনি বনে না গেলে তাঁহার পিতার সত্যভঙ্গ হয়।

তৎপর রাবণ বধ করিয়া রাম যখন সীতা লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, বিভীষণ আদির সহিত পুষ্পক রথারোহণে অযোধ্যায় ফিরিতেছিলেন, সেই সময় ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে বিশ্রাম কালে হনুমানকে ভরতের নিকট সংবাদ দিতে পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন, "আমার প্রত্যাগমন বৃত্তান্ত শুনিয়া ভরতের আকার ইঙ্গিতে যেরূপ মনোভাব প্রকাশ পাইবে তাহা তুমি বিশেষ লক্ষ্য করিবে।......বহু কাল রাজ্য ভোগ করাতে স্বভাবতই ভরতের রাজ্যে লোভ হইবার কথা। তাহা হইলে সেই এই পৃথিবী শাসন করিবে। আমরা যে পর্য্যন্ত বহুদূর অগ্রসর না হই তাহার মধ্যে তুমি তাহার বুদ্ধি এবং ব্যবসায় অবগত হইয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে!" ত্যাগের এইরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহাভারতে মহামতি ভীষ্ম ছাড়া আর কোথাও বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। এ হেন সত্যসন্ধ, নির্লোভ, পিতৃসত্যপালনে কৃতসংকল্প রাম সমগ্র পিতৃ সত্য পালন করেন নাই এ কথা বীরেশ্বর বাবুর মনে হইল কেমন করিয়া তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

রামের বিরুদ্ধে বীরেশ্বর বাবুর দ্বিতীয় অভিযোগ গুপ্ত ভাবে বালীকে হত্যা। বালীকে রাম তাহার যে কারণ বলিয়াছিলেন তাহা বীরেশ্বর বাবুর মনঃপূত হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "তাঁহার এই উত্তরে প্রতীয়মান হয় যে গুপ্ত প্রহার করা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া রাম নিজে বুঝিয়াছিলেন, এবং সেই ...কূট যুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।" সত্যব্রত রামের প্রতি এই হীন অভিপ্রায় আরোপ করিয়া বীরেশ্বর বাবু স্বীয় কদর্য্য

রুচি ও জঘন্য মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। রামচরিত্র সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় তেজে স্বঃপ্রকাশ, তাহাতে গোপনতার লেশমাত্র নাই। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-বধূ হরণকারী বালীকে দণ্ড দিবার অধিকার রামের সম্পূর্ণ ছিল। বালী রামশরে বিদ্ধ হইয়া প্রথমে রামকে তিরস্কার করিলেও রামের উত্তর শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তিরস্কার করার জন্য রামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

বীরেশ্বর বাবুর তৃতীয় অভিযোগ,—লবণ বধের জন্য রাম শত্রুঘ্নকে পাঠাইবার সময় তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, লবণকে অস্ত্র ধারণ করিবার অবসর দিবে না। সে যখন বাহিরে যাইবে তুমি তখন গৃহ দ্বারে থাকিয়া তাহার প্রবেশ নিবারণ করিয়া তাহাকে বধ করিবে। কেননা সে একবার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক অস্ত্র ধারণ করিলে তুমি তাহার কিছুই করিতে পারিবে না।" ইহা লিখিয়া বীরেশ্বর বাবু পরম পুলকের সহিত প্রচার করিতেছেন যে "এই উপদেশ বালী-বধ-কারীর উপযুক্তই হইয়াছিল।" বীরেশ্বর বাবু রামের মুখে যে কথা বসাইয়াছেন রাম ঠিক সেকথা বলেন নাই। ঐ অংশ লিখিবার সময় বীরেশ্বর বাবুর মনে বোধ হয় মেঘনাদবধ কাব্যে বর্ণিত লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক মেঘনাদ বধের বিবরণ মনে হইয়াছিল।

লবণ বধের বৃত্তান্ত এই রূপ।—লবণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ভৃগুপুত্র চ্যবন রামচন্দ্রের নিকট গিয়া লবণের অত্যাচার নিবারণ করিতে অনুরোধ করেন। এবং এই সংবাদও দেন যে লবণের নিকটে শিবদত্ত একটী শূল আছে। সেই শূল লইয়া যুদ্ধ করিলে সে অজেয়। সে সেই শূল গৃহে রাখিয়া প্রাতঃকালে মৃগয়া করিতে যায়। সেই সময়ে তাহার পথ রোধ করিয়া তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে মারিতে হইবে। রামও শত্রুঘ্নকে তদনুরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। শত্রুঘ্নও লবণের গৃহপ্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিয়া তাহাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং লবণ গাছ পাথর লইয়া ও শত্রুঘ্ন ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের লক্ষ্মণ যেমন নিরস্ত্র অবস্থায় মেঘনাদকে মারিয়াছিলেন, বাল্মীকির শত্রুঘ্ন সেরূপ করেন নাই। শূল আনিবার জন্য লবণ গৃহে প্রবেশ করিতে চাহিলে তাহাতে বাধা দিয়া শত্রুঘ্ন বলিয়াছিলেন, "বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা শত্রুকে উপস্থিত পাইলে কদাচ পরিত্যাগ করেন না। সুতরাং তুই আমার নিকট হইতে জীবিত অবস্থায় কোথায় যাইবি? বিশেষতঃ যে ব্যক্তি নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ শত্রুকে অবকাশ দেয়, সেই নির্ব্বোধ কাপুরুষের ন্যায় নিহত হয়।" ইহা সকল দেশে সর্ব্বকালে যুদ্ধনীতি। লবণের সহিত শত্রুঘ্নের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল।

বীরেশ্বর বাবুর চতুর্থ অভিযোগ এই যে, রাবণ বধের পর সীতা রামের নিকট আনীত হইলে রাম সীতাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিলেন। সীতা সে কথার যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা যুক্তি ও তেজস্বিতাপূর্ণ। বীরেশ্বর বাবু বলিতেছেন সে সকল যুক্তি কি রামের মনে হয় নাই? তদুপলক্ষ্যে গৌতম কর্ত্তৃক অহল্যাকে পুনর্গ্রহণের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। বীরেশ্বর বাবু কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে বহুকাল পর্য্যন্ত

"অহল্যা পাষাণপ্রায় ছিল পাপাচারে।
কৃপাসিন্ধু রামচন্দ্র উদ্ধারেন তারে॥"

রাম কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা হইয়া সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করেন। কোন ব্যক্তি দোষী বিবেচিত হইলে সে দোষী কি নির্দ্দোষ তাহা নির্ণয় করিবার জন্য অগ্নি পরীক্ষা প্রভৃতি দৈব উপায় পুরাকালে সকল দেশেই অবলম্বিত হইত; অগ্নিদেব অন্যান্য দেবগণের সমক্ষে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণা সীতাকে রামের হস্তে অর্পণ করিয়া বলেন, "সীতা বিশুদ্ধা।" রাম সেই সময়ে সীতাকে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "জানকী যে লোক সকলের মধ্যে সমধিক পবিত্রা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি রাবণের অন্তঃপুরে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন; সুতরাং আমি যদি

বিশুদ্ধরূপে পরীক্ষা না করিয়াই ইঁহাকে লইতাম, লোকে বলিত যে দশরথের পুত্র রাম নিতান্ত কামপরতন্ত্র, এবং সাংসারিক ব্যবহারে অনভিজ্ঞ। জনকনন্দিনী সীতা অনন্য-হৃদয়া এবং আমাতেই তিনি একান্ত অনুরাগিণী তাহা আমি জানিতাম। মহাসাগর যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ রাবণও নিজ তেজোবলে নিজেই রক্ষিতা এই বিশালাক্ষী জানকীকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।"

রামের বিরুদ্ধে বীরেশ্বর বাবুর পঞ্চম অভিযোগ এই যে, সীতাকে বনে পাঠাইবার সময় রাম মিথ্যা আচরণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি তপোবন দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছ, লক্ষ্মণ তোমাকে তপোবন দেখাইতে লইয়া যাইবে।" লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, "তুমি সীতাকে তপোবন দেখাইবার ভান করিয়া তাঁহাকে এক জঙ্গলে রাখিয়া আইস।"

বাল্মীকির রামায়ণে ঐ ব্যাপার এইরূপ বর্ণিত আছে। সীতার গর্ভ লক্ষণ সুস্পষ্ট দেখিয়া রাম সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কিসে অভিলাষ হয়?" সীতা বলিলেন, "পবিত্র তপোবন দেখিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে। গঙ্গাতীর-বাসী উগ্রতেজা মুনিগণের চরণতলে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা হয়। মুনিগণের তপোবনে অন্ততঃ এক রাত্রি বাস করি ইহা আমার একান্ত অভিলাষ।" তদুত্তরে রাম বলিলেন, "বৈদেহী আশ্বস্তা হও। কল্যই তপোবনে যাইতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।" তখন সীতাবর্জ্জনের কোন কথাই উঠে নাই। রাম সীতাকে এই কথা বলিবার পর সুহৃদ্গণের সহিত সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে কথাপ্রসঙ্গে রাম কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভদ্রনামক একজন সভাসদ বলিলেন, "রাজন্, বন, উপবন, দোকান, প্রাঙ্গণ, ও পথি মধ্যে পুরবাসীরা যে সকল ভাল ও মন্দ কথা বলে তাহা শুনুন। রাম দুষ্কর সেতু বাঁধিয়াছেন। রাম সৈন্য ও বাহুবলে দুর্দ্ধর্ষ রাবণকে বধ করিয়াছেন। এমন কি বনের ভল্লুক, বানর ও রাক্ষসদিগকেও আপন বশে আনিয়াছেন। কিন্তু রঘুনন্দন রাম, যুদ্ধে রাবণকে বধ করিয়া, রাবণ যে সীতাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন তজ্জন্য কিছুমাত্র কুপিত না হইয়া পুনরায় সীতাকে নিজপুরীতে আনিয়াছেন। সীতা রাক্ষসগণের বশীভূতা হইয়া অশোক বনে ছিলেন, অথচ রাম তাঁহাকে ঘৃণা করেন না। রাজা যাহা করেন প্রজারাও তাহাই করে। সুতরাং আমাদিগকেও আমাদিগের স্ত্রীদিগের এই দোষ সহ্য করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া রাম অন্যান্য সভাসদ্গণকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা সকলেই বলিলেন যে, "ভদ্র যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য। ইহাতে সংশয় নাই।" তখন রাম সভাসদ্গণকে বিদায় দিয়া, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে ডাকিয়া লোকনিন্দা নিবারণ জন্য, বংশের কীর্ত্তি রক্ষার জন্য সীতাকে বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব করিলেন। রাম আদর্শ রাজা। প্রজারঞ্জন রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। প্রজারা বলে, রাজা যাহা করেন, প্রজারাও তাহাই করে। "যদেব কুরুতে রাজা লোকস্তদনুবর্ত্ততে।" রাম সীতাকে অন্তঃপুরে স্থান দিয়াছেন অথচ তিনি রাক্ষসালয়ে ছিলেন। সুতরাং প্রজাদের স্ত্রীগণের সেই দোষ প্রজাগণকে সহ্য করিতে হইবে। প্রজারা সীতার রাজার অন্তঃপুরে বাসে অসন্তুষ্ট। রাম প্রজাদিগের নিন্দায় কর্ণপাত না করিয়া পূর্ব্ববৎ সীতাকে লইয়া বাস করিতে পারিতেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার রাজধর্ম্মের আদর্শ মলিন হইত। বিখ্যাত রঘুবংশের শুভ্রযশে কালিমা স্পর্শ করিত। রামের হৃদয়ে তখন শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ এই দুইটী পরস্পরবিরোধী ভাবের সংগ্রাম চলিতেছিল। লোক-নিন্দায় উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্ববৎ সীতাকে লইয়া বাস করা প্রেয়ঃ, পক্ষান্তরে লোকমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া বিশুদ্ধা জানিয়াও সীতাকে পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ। রাম শ্রেয়ের পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহা অতি অপ্রীতিকর ও শোকাবহ কর্ত্তব্য। কিন্তু রাম সে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তিনি যাহা কর্ত্তব্য-

বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহা হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। এই প্রসঙ্গে রাম তাঁহার ভ্রাতাদিগকে বলিয়াছিলেন, "কীর্ত্তি রক্ষার জন্য আমি নিজের প্রাণ, ও তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, সীতার ত কথাই নাই।" কালিদাস এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া রামকে দিয়া বলাইয়াছেন,—

"অপিস্বদেহাৎ কিমুতেন্দ্রিয়ার্থাৎ।
যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ॥"

কেহ বলিতে পারেন, তবে কি সীতা রামের "ইন্দ্রিয়ার্থ" মাত্র? স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্বন্ধও আছে। রাম সীতাকে নির্ব্বাসিতা করিয়া সীতার সহিত একত্র বাস রূপ দৈহিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সীতার প্রতি রামের যে পবিত্র প্রেম তাহার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। কারণ, সীতা বর্জ্জনের পর রাম দারান্তর গ্রহণ করেন নাই। অশ্বমেধযজ্ঞের সময় স্বীয় বামপার্শ্বে সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়া শাস্ত্রের বিধি রক্ষা করিয়াছিলেন।

সীতাকে বর্জ্জন করিবার কথা উঠিবার পূর্ব্বেই রাম সীতাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি মুনিদিগের তপোবনে যাইতে পারিবে।" তাহার পর রাম সীতাকে বর্জ্জন করিবেন স্থির করিলেন। এবং লক্ষ্মণকে বলিলেন, "সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আইস। তিনি সেইরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।" রাম সীতাকে অন্য স্থানেও নির্ব্বাসিতা করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া বাল্মীকির তপোবনে নির্ব্বাসিত করায় সীতাকে নির্ব্বাসনে পাঠানও হইল এবং সীতার তপোবন দর্শনের অভিলাষও পূর্ণ করা হইল। ইহাতে মিথ্যা আচরণ কোথায়? ইহা না করিয়া রাম যদি সীতাকে সম্মুখে ডাকিয়া অন্তঃপুরেই হউক বা প্রকাশ্য সভাতেই হউক, সীতাকে নির্ব্বাসনের আদেশ শুনাইতেন, তাহা হইলে ব্যাপার কি অন্য রূপ দাঁড়াইত? সীতা নির্ব্বাসন কি নিবারিত হইত? এ সম্বন্ধে রাজার আজ্ঞা অমোঘ। সুতরাং সীতা বর্জ্জনের আদেশ দিয়া তাঁহাকে বনে পাঠাইবার জন্য রাম যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্তি বিশেষের মনঃপূত না হইলেও, তাহাতে মিথ্যা আচরণের লেশ মাত্র নাই।

কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, লোকনিন্দা ভয়ে সীতাকে বর্জ্জন করা রামের অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছিল, ইহা করিয়া তিনি সীতার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকের সহিত রাজা রামচন্দ্রের তুলনা হইতে পারে না। রাজধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম সকল সময়ে এক নয়। এবং ধর্ম্ম সকল সময়ে সুখও সম্পদের হেতুও নয়। এতদ্ব্যতীত রামের সীতাবর্জ্জন হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় সে সময়ে লোকমতের এমনই শক্তি ছিল যে রাজাকেও সেই শক্তির সমক্ষে মস্তক অবনত করিতে হইত। জনমত ঈশ্বরাভিমত। Vox populi Vox Dei। রাম জনমতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই জন্যই রাম আদর্শ রাজা। সেই জন্যই কোন রাজ্য সুখে স্বচ্ছন্দে ও নিরুপদ্রবে বাস করিতে পাইলে আমাদের দেশের লোকেরা এখনও বলিয়া থাকে, "রামরাজ্যে বাস করিতেছি।"

অশ্বমেধযজ্ঞের পর সীতা সভামধ্যে শপথ করিবার জন্য আনীতা হইলে, মহর্ষি বাল্মীকি সীতার বিশুদ্ধিতার বিষয় বলিয়া সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য রামকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সে সময়ে রাম সীতাকে কটূক্তি করিবার কথা হীরেশ্বর বাবু কোথায় পাইলেন? এসম্বন্ধে বাল্মীকি রামায়ণের বিবরণ এইরূপ:—কুশ ও লবের রামায়ণ গান শুনিয়া রাম বুঝিতে পারিলেন, কুশ ও লব তাঁহার ও সীতার সন্তান। তখন তিনি মহর্ষি বাল্মীকির নিকট দূত মুখে এইরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, "জানকীর চরিত্র যদি বিশুদ্ধ ও নিষ্পাপ হয়

তাহা হইলে তিনি মহর্ষির অনুমতি লইয়া তাঁহার বিশুদ্ধতার পরিচয় দিন। তোমরা (অর্থাৎ প্রেরিত দূতেরা) মহর্ষির এবং সীতার মনোগত অভিপ্রায় জানিয়া সীতা যদি বিশুদ্ধতার পরিচয় দিতে সম্মত হন, তাহা হইলে শীঘ্র আসিয়া আমাকে বলিবে। তাহা হইলে কল্য প্রাতেই জানকী সভামধ্যে শপথ করুন।" মহর্ষি বাল্মীকির অনুরোধে সীতা মহর্ষির সহিত সভায় উপস্থিত হইলেন। তখন মহর্ষি বাল্মীকি রামকে বলিলেন, "সীতা বিশুদ্ধা, আমি ইঁহাকে বিশুদ্ধা জানিয়াই আমার আশ্রমে স্থান দিয়াছিলাম। তুমি লোকনিন্দা ভয়ে ভীত হইয়াছ বলিয়াই এই শুদ্ধাচারিণী পতিদেবতা সীতা আজ তোমার সমক্ষে প্রত্যয় প্রদান করিবেন।" তদুত্তরে রাম বলিলেন, "হে মহাভাগ, হে ব্রহ্মজ্ঞ, আপনি যেরূপ বলিলেন সেইরূপই বটে। আপনার নির্ম্মল বাক্যে আমার বিশ্বাস হইয়াছে। ব্রহ্মন্, বৈদেহী পূর্ব্বেও দেবগণের সমক্ষে প্রত্যয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি ইঁহাকে গৃহে আনিয়াছিলাম। ব্রহ্মন্, লোকনিন্দা অতি বলবান্। সেই ভয়েই আমি নিষ্পাপা জানিয়াও সীতাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।...এই যমজ কুশ লব যে আমার পুত্র আমি তাহাও জানি। তথাপি বৈদেহী ত্রিভুবনবাসী সকলের নিকট বিশুদ্ধা বলিয়া পরিচিতা এবং আমার প্রীতি-পাত্রী হউন।" তখন দেবগণ সীতার শপথ দেখিতে সভায় উপস্থিত হইলেন। রাম দেবগণ সমক্ষেও পূর্ব্ববৎ কথা বলিলেন। তখন সীতা এই বলিয়া শপথ করিলেন, "আমি রাম ভিন্ন অন্য কাহাকেও মনে স্থান দিই নাই। এই সত্য বলে ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে তাঁহার গর্ভবিবরে স্থান দান করুন।..." সীতা এইরূপ শপথ করিতেছেন এমন সময় অদ্ভুত ব্যাপার হইল। ভূগর্ভ হইতে এক উত্তম সিংহাসন উঠিল এবং বসুন্ধরা দেবী দুই হাত দিয়া সীতাকে তুলিয়া লইয়া সিংহাসনে বসাইয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন। এই ব্যাপারে সীতার প্রতি রামের কটূক্তির ফলেই তৎক্ষণাৎ সীতার মৃত্যু হইল এই সত্যঘটনার আভাস বীরেশ্বর বাবু কেমন করিয়া পাইলেন? তাঁহার কল্পনা কবিগুরু বাল্মীকির কল্পনাকেও অতিক্রম করিয়াছে দেখিতে পাইতেছি।

রামের বিরুদ্ধে বীরেশ্বর বাবুর স্পষ্ট অভিযোগ শম্বুক বধ। বীরেশ্বর বাবু বলেন এই ঘটনা মিথ্যা হইলেই ভাল হইত। রাম চরিত্রের একটা কলঙ্কের অপনোদন হইত। বীরেশ্বর বাবুর মতে রাম কর্ত্তৃক শম্বুক বধে ব্রাহ্মণদের কারসাজী, রামের নির্বুদ্ধিতা এবং ধর্ম্মানুরাগের অভাব প্রমাণ হয়। বীরেশ্বর বাবু ব্রাহ্মণদিগের উপর বড় নারাজ, তাঁহাদিগকে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না এবং বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন সমাজের লোক-দিগের ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় মতের মাপকাঠি দিয়া বহু প্রাচীনকালের লোকদিগের কার্য্যকলাপ বিচার করিতে সমুৎসুক। রাম ত্রেতাযুগের মানুষ। তখন ব্রাহ্মণেরা রাজ্য ও সমাজ শাসনের বিধি প্রণয়ন করিতেন। ক্ষত্রিয় রাজারা সেই বিধি অনুসারে রাজ্য শাসন করিতেন, সমাজও সেই বিধি অনুসারে শাসিত হইত। রাজাকেও সেই সামাজিক বিধান মানিতে হইত।

বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত আছে যে দশরথ রাজার সময়ে প্রজারা—

"না জানিত দুঃখ ভয় অকাল মরণ,
নিত্য মহোৎসবে সবে যাপিত জীবন।"

তৎপর রামের রাজ্যেও তদ্রূপ ছিল। সুতরাং রামের রাজত্বকালে এক ব্রাহ্মণের পুত্র অকালে মরা গেলে তাহা লইয়া একটা হৈ রৈ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। বালকের পিতা আসিয়া রাজার নিকট অভিযোগ করিল। রাজার পাপে প্রজা নষ্ট এ কথা সেকালের ভারতবর্ষের লোকেরা বিশ্বাস করিত, এখনও অনেকে করেন। দুঃখের বিষয় এখনকার রাজপুরুষেরা সে কথা বিশ্বাস করেন না। রামের নিশ্চয়ই কোন পাপ হইয়াছে, নচেৎ

অকালে ব্রাহ্মণ বালক মরিল কেন ? বীরেশ্বর বাবুর নিকট বর্ত্তমান সময়ে এই বিশ্বাস যুক্তিহীন ও হাস্যজনক মনে হইতে পারে কিন্তু রামের সময়ে লোকে তাহাই বিশ্বাস করিত। এক সময়ের লোকে যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, পরবর্ত্তীকালের লোকেরা কখন কখন তাহা মানিতে চায় না এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তখনকার রাজাদের প্রজা রক্ষা করা একটা প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। অকালে ব্রাহ্মণ বালকের মৃত্যু হইলে রাম নিজে তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজসভায় মুনিগণ, অমাত্যগণ এবং ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিয়া অকালে ব্রাহ্মণ বালকের মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বলিলেন, "ত্রেতাযুগে শূদ্রের তপস্যায় অধিকার নাই। তোমার রাজ্যে কোন শূদ্র তপস্যা করিতেছে। তুমি যদি সেই পাপকার্য্য নিবারণ কর, ব্রাহ্মণ বালক বাঁচিয়া উঠিবে।" এই কথায় বিশ্বাস করার জন্য বীরেশ্বর বাবু রামকে ব্যক্তিত্ব শূন্য এবং ব্রাহ্মণদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া নরহত্যারূপ মহাপাপকারী বলিয়াছেন। বীরেশ্বর বাবুর এটা বিবেচনা করা উচিত ছিল যে ব্রাহ্মণেরা তখন বিধি ব্যবস্থার প্রণেতা ছিলেন, রাজারা তাহা মানিতে বাধ্য ছিলেন। তাঁহারা রাজসভায় পরামর্শ করিয়া শূদ্রতপস্বী শম্বুককে বধ করিতে হইবে তাহা স্থির করেন। সুতরাং তদনুসারে শম্বুককে বধ করিয়া রাম নরহত্যার মহাপাতক ত করেনই নাই, বরং তিনি যে স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না, ব্যবস্থাপকদের প্রদত্ত বিধি অনুসারে রাজ্যশাসন ও অপরাধীদিগকে দণ্ড দিতেন তাহাই প্রমাণিত হয়। এবং একজন প্রজার মৃত্যু হইলে স্বয়ং রাজাও বিচলিত হইয়া সেই মৃত্যুর কারণ স্বয়ং অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া অকাল মৃত্যুর কারণ নিবারণে যত্নবান্ হইয়াছিলেন তাহাই প্রমাণিত হয়। লঘু পাপে গুরু দণ্ডের বিধি থাকিলে, বিধিকর্ত্তার দোষ দিলেও দেওয়া যাইতে পারে, বিচারকে দোষ দেওয়া চলে না। কারণ বিচারক বিধি অনুসারেই বিচার করিতে বাধ্য।

শতাধিক বৎসর হইল আমরা আমলা তান্ত্রিক বৃটিশ শাসনাধীনে রহিয়াছি। আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতেছি এই শাসনাধীনে প্রজাদের মতামতের কোন মূল্যই নাই। প্রজারা তাহাদের অভাব অভিযোগ রাজপুরুষদের গোচরে আনিবার জন্য যতই তারস্বরে চীৎকার করুক না কেন, যতই আন্দোলন করুক না কেন তাহা অরণ্যে রোদনে পর্য্যবসিত হয়। রাজপুরুষেরা প্রজাদের কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাদের নিজের চাল বজায় রাখিয়া চলেন। তাঁরা মনে করেন তাঁদের মত বুঝক্কড় লোক আর কেহ হইতে পারে না। তাঁরা নামে জনসাধারণের সেবক (public servant) হইলেও, কার্য্যতঃ জনসাধারণ (publicই) তাঁদের সেবক (servant)। তাঁদের জন্যই জনসাধারণ (public) রহিয়াছে। তাঁরা জনসাধারণের (publicএর) জন্য নিযুক্ত হন নাই। তাঁরা মনে করেন জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করা, তাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করা দুর্ব্বলতার চিহ্ন, তাহা করিলে আমলা তান্ত্রিক মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায়। শত শত লোক না খাইয়া বা মারী প্রভৃতিতে প্রাণত্যাগ করিলেও, রাজার মাথার টনক নড়া ত দূরের কথা, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের বিন্দুমাত্র স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত হয় না। সামান্য চৌকিদারেরাও তার জন্য বিচলিত হয় না।

কয়েক বৎসর হইল এদেশে মণ্টফোর্ড সংস্কার আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পর, সরলবিশ্বাসী কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন যে ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাদিগের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের হস্তে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যেন কতক ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যাইতেছে যে তাহা ভুয়াবাজী মাত্র। প্রজানির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের কোন প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় যথারীতি পরিগৃহীত হইলেও তাহা যদি শাসক সম্প্রদায়ের মনের মত না হয় তাহা হইলে সেই প্রস্তাবের প্রতি কিছুমাত্র সম্মান প্রদর্শন করা হয় না, এবং সেই প্রস্তাব অনুসারে কোন কাজই হয় না।

বীরেশ্বর বাবুর লেখার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছে তিনি এই আমলাতন্ত্রের প্রভাব এখনও অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাই, লোকাপবাদ নিবারণ জন্য অর্থাৎ জনমতের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিয়া সীতা বর্জ্জন করার জন্য রামকে দুর্ব্বলচিত বা ভীরু বলিতেছেন; এবং ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণদের এবং সভাসদ্দিগের ব্যবস্থা অনুসারে অনধিকারে তপস্যাকারী শম্বুককে বধ করার জন্য রামকে ব্যক্তিত্বশূন্য এবং ব্রাহ্মণদের মতে আত্মসমর্পণ করিয়া নরহত্যার পাতকী বলিতেছেন। আমলাতন্ত্রের রঙিন চসমা চোখে দিয়া বীরেশ্বর বাবু ভালকে মন্দ দেখিতেছেন এবং সেই জন্যই রামের গুণ বীরেশ্বর বাবুর কাছে দোষে পরিণত হইয়াছে।

কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন ধ্যান করিয়া বহুযাত্রী যশের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কালিদাস বাল্মীকি রচিত রামায়ণের বিরোধী কোন কথাই লেখেন নাই। সেইজন্য তাঁহার রঘুবংশে চিত্রিত রামচরিত্র সকল বিষয়েই আদর্শচরিত্র হইয়াছে। তাহাতে দীলিপের রাজধর্ম্ম, রঘুর শৌর্য্যবীর্য্য ও পিতৃভক্তি, অজের পত্নীপ্রেম, দশরথের পুত্রবৎসলতা; এবং তা ছাড়া সৌভ্রাত্র, আত্মত্যাগ, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি গুণ একাধারে বিদ্যমান। বাল্মীকি ও কালিদাসের রামই অবস্থা বিশেষে "বজ্রাদপি কঠিন ও মৃদুণি কুসুমাদপি" চিত্রিত হইয়াছেন। যদি কেহ বাল্মীকি চিত্রিত রামচরিত্রে কোন দোষ দেখিতে পান তাহা এত কম যে তাহা "একোহিদোষোগুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

যে কবিই বাল্মীকি-রামায়ণের বিরোধী কোন কথা লিখিয়াছেন তিনি তাল সামলাইতে পারেন নাই, কোন দিকে রাম চরিত্রের একটু উৎকর্ষ সাধন করিতে গিয়া অন্যদিকে সেই চরিত্রের গৌরব হানি করিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাঁহার রুচি এমনই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে পাপাচারী রাবণকে বাড়াইতে গিয়া আর্য্যগৌরব রাম ও লক্ষণকে হীনভাবে চিত্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন।

ভবভূতিও উত্তর চরিতের রামকে স্থানে স্থানে সাধারণ স্ত্রীলোক অপেক্ষাও অধিক কোমলহৃদয় করিয়া ফেলিয়াছেন।

লোকোত্তর রামচন্দ্র সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে তাহা শ্রদ্ধার সহিত বলা কর্ত্তব্য। তাঁহার সম্বন্ধে অসম্মানসূচক কথা কহিলে,

"নকেবলং যো মহতোঽপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ পাপভাক্।"

রাম সম্বন্ধে বীরেশ্বর বাবু আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। সে সম্বন্ধে এবং তাঁহার লিখিত "কৃষ্ণ" সম্বন্ধে লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায় সুতরাং এ যাত্রা এই পর্য্যন্ত।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি, এল

উত্তর

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত মহাশয় সমালোচনার ভূমিকা এই বলিয়া করিয়াছেন যে ইংরেজী শিক্ষার ফলে এদেশের অনেকেই জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি যে সেই বিশেষত্ব হারান নাই সে জন্য তিনি অবশ্যই অভিনন্দিতব্য। কিন্তু তিনি যদি জাতীয় বিশেষত্ব কাহাকে বলে তাহা জানাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় বহু লোকের উপকার হইত। তবে আমি সরল ভাবে বলিতে পারি আমার প্রবন্ধটা ইংরেজী পাঠের ফল নহে

কেননা রামায়ণ সম্বন্ধে আমি কোন ইংরেজী পুস্তক পাঠ করি নাই। আমি যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা রামায়ণ অধ্যয়ন করিয়াই লিখিয়াছিলাম।

সমালোচনায় আমার একটী ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে আমি সেই অসাবধানতা স্বীকার করিতেছি। আমি লিখিয়াছিলাম তপোবন হইতে সীতাকে আনাইয়া রাম আবার তাঁহাকে কটুবাক্য বলিয়াছিলেন। এটা আমার ভুল। তিনি সীতাকে পুনরায় অগ্নি পরীক্ষা করিতে বলিলেন তাহাতেই সীতার মনে এত দুঃখ হইল যে সেই দুঃখেই তাঁহার মৃত্যু হইল। যে কথায় তাঁহার প্রাণ গেল সে কথাটা কটূক্তি বলিয়াই আমার মনে অঙ্কিত হইয়াছিল। গুপ্ত মহাশয় রামের উক্তিটা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু কি অভিপ্রায়ে এমন একটা কথা কিরূপ ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে এ সম্বন্ধে গুপ্ত মহাশয় একটা থিওরি দিলেই ভাল হইত। আমার ত বোধ হয় কোন সাক্ষী মিথ্য সাক্ষ্য দিবার সময়ে ব্যবহারাজীবের কূট প্রশ্নে যেমন সত্য কথা বলিয়া ফেলে বাল্মীকিও তেমনি অসম্ভব কথা বলিতে বলিতে সেই সত্য কথাটা বলিয়াছেন। যাহা হউক ইহা লইয়া আমি এই উত্তরে তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না।

প্রক্ষিপ্তের কথায় আমার একটা কথা মনে পড়িল—তাহা বোধ হয় Volairএর উক্তি—"কোন প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ কালে তাহার যে সকল কথা তোমার মতের বিরুদ্ধ দেখিবে তাহাই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া জানিবে।"

বালীবধ বিষয়ে সমালোচক যাহা বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে কিষ্কিন্ধা যে আযোধ্যা রাজ্যের অধীন ছিল এবং রাম যে বনবাসে রাজ প্রতিনিধি রূপে কার্য্য করিতে পারিবেন এরূপ কোন ইঙ্গিত যদি পূর্ব্বে থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই সমালোচকের কথা মানিয়া লওয়া যাইতে পারিত। আমার ত বোধ হয় পরবর্ত্তী কোন লেখক রামের দোষক্ষালন করিবার জন্য বালীর প্রতি রামের এই 'প্রক্ষিপ্ত' উক্তি সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

বালী এবং লবণ বধ সম্বন্ধে আমার নিজের private opinion বা ব্যক্তিগত মত এই যে, যে উপায়ে তাহাদিগকে বধ করা হইয়াছিল তাহাতে কোন দোষ বা পাপ হয় নাই। এ কথা আমি বিস্তারিত ভাবে সমায়ান্তরে বলিবার চেষ্টা করিব।

অহল্যা পাষাণ হইয়াছিলেন বা পাষাণতুল্যা হইয়া ছিলেন এমন কথা রামায়ণে নাই। তিনি বিরূপা হইয়া পতি গৃহেই থাকিতেন এবং রামের আগমনে পুনরায় পতিপত্নীর মধ্যে সদ্‌ভাব হইল।

অগ্নি পরীক্ষার পর রাম সীতাকে গ্রহণ করিয়া ছিলেন সত্য কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তিনি সীতাকে যে নিষ্ঠুর কথা বলিয়াছিলেন সমালোচক কি তাহার দোষ-ক্ষালন করিয়াছিন ?

সীতাকে বনবাসে পাঠাইবার সময়ে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার উল্লেখ কালে আমার কিছু অসাবধানতা হইয়াছিল। কিন্তু রাম যে বনবাসে পাঠাইবার সময় সীতাকে জানিতে দেন নাই যে তাঁহকে বনে পাঠান হইতেছে তাহাও ঠিক। যাহা হউক বনবাসে যাইবার সময়ে রামের পূর্ব্বদিনের কথায় সীতার মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অতি অল্প সময়ের জন্য তপোবন দেখিতে যাইতেছেন। রাম তখন সীতার নিকট সত্য গোপন করিয়া তাঁহার মনে পূর্ব্ব বিশ্বাসই রাখিয়া দিয়াছিলেন। মিথ্যা বলিলেও যাহা হইত সত্য গোপন করাতেও তাহাই হইয়াছিল।

Vox populi vox Dei এই কথাটা বোধ হয় কোন উকীল special pleading এর সময়ে বলিয়াছিলেন। কখন কখনও সত্য হইলেও অধিক সময়েই ইহা সত্য নহে। যখন সতীদাহ নিবারণ জন্য আইন পাশ হইল

তখন ভারতবর্ষীয়েরা ধর্ম্মগেল ধর্ম্মগেল বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন এবং পার্লিমেণ্ট ও রাজ,সন্নিধান পর্য্যন্ত অভিযোগ করিয়াছিলেন। তখন Vox populi কি বাস্তবিক vox Dei ছিল? পরে সম্মতি আইনের সময়ে আবার সেই রব উঠিয়াছিল। কাশীতে জলের কল স্থাপনের সময়ে হিন্দুরা সেই রব উত্থাপিত করিয়া সমস্ত কল বিধ্বস্ত করিয়াছিল। সেই সকল সময়েও vox populi কি vox Dei ছিল?

সমালোচক মহাশয়কে দুই একটা আমি সরল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। নিরপরাধ সীতাকে শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল কি না এবং স্বীয় বিশ্বাসানুসারে কাহারও অনিষ্ট না করিয়া ধর্ম্মাচরণ করার জন্য শম্বুক প্রাণ দণ্ড পাইবার উপযুক্ত ছিল কি না? এই দুই জনকে শাস্তি দিবার সময়ে রাম স্বীয় বিবেকের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, না প্রকৃতি পুঞ্জের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন? যদি বিবেক বুদ্ধির অনুমোদনেই তিনি কার্য্য করিয়া থাকেন তাহা হইলে প্রজার বুদ্ধি ও তাঁহার বুদ্ধি সমকক্ষ ছিল কি না? যদি তাঁহার বুদ্ধি প্রজার বুদ্ধি অপেক্ষা অধিক না হয় তবে তিনি কোন্ গুণে তাহাদের অপেক্ষা বড় ছিলেন? দেশ ও কালের বুদ্ধি অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিশালী লোকই মহাপুরুষ বাচ্য কি না? দেশ কাল নিরপেক্ষ হইয়া যদি ইহা বলিতে হয় যে শম্বুকের প্রাণদণ্ড অন্যায় হইয়াছে তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হয় না কি যে তাহার প্রাণদণ্ড করিয়া রাম দেশকালের অতীত বুদ্ধির প্রমাণ দেন নাই? রামের মত রাজা থাকিলে আমাদের দেশে অদ্যাপি সহগমন, বালিকা বিবাহ, চড়ক, গঙ্গাসাগরে শিশু হত্যা, জলের কলের অভাব, গঙ্গায় সেতু বন্ধন, সম্মতি আইনের অভাব প্রভৃতি থাকিত কি না?

শ্রীবীরেশ্বর সেন

"রাম ও কৃষ্ণ"

(খ)

১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গবাণীতে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় "রাম ও কৃষ্ণ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা হিন্দু মাত্রেরই মনে কষ্ট প্রদান করে।

তাঁহার উক্ত প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, তিনি রাম ও কৃষ্ণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটা মতবাদ প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন।

প্রথমেই বলিয়াছি বীরেশ্বর বাবুর উক্ত প্রবন্ধটা হিন্দুমাত্রেরই মনে বেদনা সঞ্চার করে। কথাটা sentimental বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে; কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত মতবাদগুলি কতদূর যুক্তিসহ ও বিচারসহ তাহাই দেখা যাউক।

সেন মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের প্রারম্ভে এক থিওরী দাঁড় করাইলেন এই যে :—"রাম এবং কৃষ্ণের বিবরণ তাঁহাদের সমসাময়িক বা তাঁহাদের পরে বহু শত বৎসরের মধ্যেও কোন লেখক লিপিবদ্ধ করেন নাই। তাঁহাদের ইতিহাস মুখে মুখেই চলিয়াছিল.........এমত অবস্থায় রাম ও কৃষ্ণের **ইতিহাস লিখিত** হইবার সময় বিকৃত হইয়াছিল।"

কিন্তু কথা এই যে রাম ও কৃষ্ণের "ইতিহাস" কাহা কর্ত্তৃক কখন লিখিত হইল? সেন মহাশয়ের মতে কি রামের ইতিহাস রামায়ণ, লেখক বাল্মীকি,—কৃষ্ণের ইতিহাস মহাভারত ও লেখক ব্যাস? তাহা হইলে ত

গোড়ায় গলদ রহিয়া গেল। কারণ লেখকও জানেন, আর সকলেও জানেন যে, রামায়ণ ও মহাভারত ইতিহাস নহে, দুইখানিই কাব্য। কাব্য ইতিহাসের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিবে কেন ?

তারপর প্রবন্ধকার লিখিলেন "বাল্মীকি নারদের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাই প্রথম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিলেন।" অতএব রামায়ণের প্রথম অধ্যায়টী ঐতিহাসিক বলিয়া ধরিতে পারা যায় ইহাই কি লেখকের উদ্দেশ্য ? তাহাই যদি হয় তবে নারদ লোকটী যে রামের সমসাময়িক তাহার প্রমাণ লেখক পাইলেন কোথায় ?

তারপর "রামায়ণের অবশিষ্ট অংশ বাল্মীকি ধ্যানে লাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে লঙ্কাকাণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত **সমস্তই** তাঁহার **কল্পনা-প্রসূত**।" কিন্তু তাহার পরই লেখক লিখিতেছেন "কিন্তু তাহা হইলেও রামায়ণে অন্যান্য বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্যের অনেক আভাস আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি হয়ত বাল্মীকির নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ এবং কতকগুলি তিনি অন্যের মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন।" তাহা হইলে দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে লঙ্কাকাণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত **সমস্তই কল্পনা-প্রসূত**—এ কথাটা বলিবার সার্থকতা কি ?

বাল্মীকি ইতিহাস লিখেন নাই। কাজেই "ভারতবর্ষ এবং লঙ্কার মধ্যস্থ সাগরের পরিসর" মাপিবার বা প্রাগ্‌জ্যোতিষদেশের প্রকৃত ভৌগোলিক অবস্থান দিবার তাঁহার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং ঐ সকল বিষয় লিখিয়া বাল্মীকিকে খাটো করিয়া লেখকের কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে ?

তারপর লেখক রামায়ণ হইতে "বাল্মীকির সময়ের" সামাজিক অবস্থা, ধর্ম্ম, খাদ্যাখাদ্য, আচার ব্যবহার, দেশের অবস্থা, পানাহার বিষয়ে যে সকল ইঙ্গিত পাইয়াছেন তাহা তিনটী paragraphএ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অর্থাৎ বাল্মীকির সময়ে সামাজিক অবস্থা, দেশের অবস্থা, ইত্যাদি যেরূপ ছিল বাল্মীকি তাহাই রামের সময়ে ছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :—ইহাই দেখান কি লেখকের উদ্দেশ্য ?

তারপর লেখক দেবগণের চরিত্র সম্বন্ধে যে দুই একটী কথা বলিয়াছেন সে কথা কয়টীর অবতারণার উদ্দেশ্য কি বুঝিলাম না। দেবগণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও তাঁহাদের কার্য্যকলাপ ঐতিহাসিক সত্য—ইহাই লেখক মানিয়া লইতে বলিতেছেন—কি, ঐগুলি বাল্মীকির কল্পনা-প্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দিতে বলিতেছেন কিছুই বুঝা গেল না।

তারপর লেখক রামের সম্বন্ধে বলিতেছেন "বাল্মীকি রাম সম্বন্ধে নারদের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তদপেক্ষা অনেক অধিক কথা রামায়ণে আছে। এই সকল বিবরণের বহু অংশ ঐতিহাসিক বলিয়া বোধ হয়," এইখানে পুনরায় বলি—লেখক যে প্রথমে লিখিয়াছিলেন "রামায়ণের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে লঙ্কাকাণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই বাল্মীকির কল্পনা-প্রসূত" তাহার সামাঞ্জস্য রহিল কোথায় ?

যাহা হউক লেখক মহাশয় লিখিতেছেন এই সকল বিবরণের বহু অংশ ঐতিহাসিক বলিয়া বোধ হয়। কারণ :—

"কবিরা তাঁহাদের কাব্যের নায়ক, প্রতিনায়ক প্রভৃতিকে হয় সম্পূর্ণ ভাল না হয় সম্পূর্ণ মন্দ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।......কিন্তু রামায়ণে রামের যে চরিত্র বর্ণিত আছে তাহাতে আমরা সর্ব্বত্রই তাঁহাতে ন্যায়ানুরাগ, ধৈর্য্য, দয়া প্রভৃতি গুণ দেখিতে পাই না।" অতএব রাম একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ; কারণ লেখকের মতে "বাস্তবজীবনে আমরা দেখিতে পাই যে প্রত্যেক ব্যক্তিই ভালমন্দে মিশ্রণ।" রামের জীবনও ভালমন্দের মিশ্রণ ; অতএব রাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এইটুকু বলিয়া লেখক মহাশয় যদি নিবৃত্ত হইতেন

তাহা হইলেও তাঁহার মতটা বেশ সুষ্ঠভাবেই প্রকাশ পাইত। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি রামের মন্দের দিকটা দেখাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এক একটী করিয়া সংক্ষেপতঃ তাঁহার কথার আলোচনা করিতেছি।

(১) রাম সমগ্র পিতৃসত্য পালন করেন নাই। কারণ দশরথ নাকি কেকয় রাজার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, তিনি কৈকেয়ীর গর্ভজাত পুত্রকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী করিবেন। এ কথাটা রামই ভরতকে বলিয়াছিলেন; সুতরাং কথাটা ধ্রুবসত্য। এমন কি লেখক মহাশয় এই কথার উপর বনবাসের ইতিহাসটা পুনর্গঠন (reconstruct) করিতে সাহসী হইয়াছেন। রাম যে কি অবস্থায় ভরতকে এই কথাটা বলিয়াছিলেন তাহা বিবেচনা করিবার দরকার হয় নাই। রাম আর কাহারো নিকট আর কোনও সময় বলিয়াছেন কি না; রাম নিজেই কি প্রকারে বা কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন সে সব বিষয়ের অনুসন্ধান বা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল বনবাসের ইতিহাসটা পুনর্গঠন করিলেই হইল।

পক্ষান্তরে দশরথ কৈকেয়ীকে ভালবাসিতেন, কৈকেয়ীও দশরথকে ভালবাসিতেন। কৈকেয়ী সেবা শুশ্রূষা করিয়া দশরথের দুষ্ট ব্রণ সারাইয়াছিলেন। দশরথের তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী কৈকেয়ীকে কিইবা অদেয় ছিল? কৈকেয়ীর বা কিসের অভাব ছিল? দশরথ কৈকেয়ীর সেবাগুণে দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "তুমি আমার নিকট কি বর চাও? তুমি যাহা চাও তাহাই দিব।"

স্বামী দুরোরোগ্য রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, সাধ্বী পত্নীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। বিশেষতঃ কৈকেয়ীর অভাব বা কিসের? তিনি কেবল স্বামীর মন সন্তুষ্টের জন্য বলিলেন "এখন আমার কিছুই দরকার নাই, আর এক সময় বর চাহিয়া লইব।" তখন কি কৈকেয়ী স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন যে কৌশল্যার পুত্র আগে জন্মিবে ও তাঁহার পুত্র পরে জন্মিবে; কাজেই জ্যেষ্ঠ বলিয়া যখন কৌশল্যার পুত্রের অভিষেকের কথা উঠিবে তখন তিনি ভরতের জন্য রাজ্য এবং রামের জন্য বনবাস চাহিয়া লইবেন? তবে ঘটনা-চক্রে ও কালক্রমে তাহাই ঘটিল সত্য। এখন কৈকেয়ীর পুত্র হওয়ায় স্বামীর প্রতি তাঁহার সে অখণ্ড ভালবাসা আর নাই; কারণ পুত্র তাহাতে ভাগ বসাইয়াছে। তাহার উপর মন্থরার ক্রমাগত কুমন্ত্রনায় কৈকেয়ীর অন্তঃকরণ বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এমত অবস্থায় সপত্নী পুত্র রামের অভিষেক যখন সুনিশ্চিত হইয়া উঠিল, তখন অনন্যোপায়া কৈকেয়ীর মনে যে হঠাৎ পূর্ব্ব কথা উদিত হইবে না, এমন কি কোন কারণ থাকিতে পারে? প্রত্যেকে একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন প্রত্যেকের জীবনেই এইরূপ দুই একটা ঘটনা ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্ত দিয়া সমালেচনার কলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। তবে কিনা আমরা সকলেই আর দশরথের মত সত্যসন্ধ বা সত্যব্রত নাই। তাই আমাদের নিকট সত্যের মর্য্যাদাও তত নাই। কিন্তু রামায়ণের দশরথ সত্যসন্ধ ও সত্যব্রত; কৈকেয়ী ও মন্থরা তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। রামের রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত ঘটাইবার মত শক্তি কৈকেয়ী বা মন্থরার ছিল না। এমন কি কোন উপায় নাই যদ্দারা রামের রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারা যায়? তাইত, দশরথ যে কৈকেয়ীর নিকট সত্যবদ্ধ! কৈকেয়ীর এহেন অবস্থায় কৈকেয়ী বা মন্থরার মনে যে হঠাৎ পূর্ব্ব-কথাটী স্মরণ হইয়াছে—যাহার ফলে রামের বনবাস ঘটিল এইরূপ ঘটনা ঘটা কি এতই অবিশ্বাস্য বা অসম্ভব যে প্রবন্ধকার লিখিয়া বসিলেন "এইরূপ ঘটনা কেবল গল্পেই শোভা পায় কিন্তু কোন যুগেই যে এইরূপ ঘটনা বাস্তবিক ঘটিতে পারে ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।" "যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি" "Inscrutable are the ways of Heaven"—ঐ সব কথাগুলি কি নিতান্তই নিরর্থক?

(২) "রাম রাজা হইয়া লবণাসুরকে বধ করিবার জন্য শত্রুঘ্নকে যে উপদেশ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন সে উপদেশ বালী বধ কারীরই উপযুক্ত ছিল।" অর্থাৎ রামের চরিত্র গুপ্ত ঘাতকদের চরিত্রের মত বরাবর ঘৃণ্য ও অধম ছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভীমবল, দুর্জ্জয় শত্রু বিনাশের জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তৎসম্বন্ধে দুর্জ্জয় শত্রুকে কি ভাবে নিধন করিতে পারা যায় তাহার উপদেশ দেওয়ায় তাঁহার ভ্রাতৃ-বৎসলতা প্রকাশ পাইল না; প্রকাশ পাইল গুপ্ত-ঘাতকের চরিত্র।

(৩) রাম নির্দ্দয় ছিলেন; কারণ রাবণ-বধের পর সীতা যখন তাঁহার সমক্ষে আনীত হইলেন তিনি তাঁহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করেন নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিবার কি দরকার নাই?

(৪) রাম দুর্ব্বলচিত্ত ও কাপুরুষ ছিলেন; কারণ বাল্মীকি এবং ভবভূতিও বর্ণনা করিয়াছিলেন যে "রাম সময়ে সময়ে ক্রন্দন করিতেন।" অকাট্য যুক্তি!

(৫) রাম মিথ্যাচারী; কারণ "সীতাকে বনবাসে পাঠাইবার সময় রাম সীতাকে বলিলেন "তুমি মুনিদের তপোবন দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছ। লক্ষ্মণ তোমাকে তপোবন দেখাইতে লইয়া যাইবেন।" লক্ষ্মণকে বলিয়া দিলেন "তুমি সীতাকে তপোবন দেখাইবার ভাণ করিয়া তাঁহাকে এক জঙ্গলে রাখিয়া আসিবে।" ব্যস্—সীতার গর্ভাবস্থা, রামের মানসিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

(৬) "সীতাকে নিষ্পাপ জানিয়াও যখন রাম প্রজাদের ভয়ে তাঁহাকে শাস্তি দিলেন তখন তাঁহার কার্য্যকে কিরূপ অভিহিত করা উচিত সকলেই তাহা বিবেচনা করিবেন।" রামের উক্ত কার্য্যকে জঘন্য, পৈশাচিক বলিয়া অভিহিত করিলে কেমন শোনায়?

(৭) "রামের কার্য্য-কারণ জ্ঞান মোটেই ছিল না।"

(৮) "তাঁহার কিছুমাত্র ব্যক্তিত্ব ছিল না।"

(৯) "তিনি হত্যারূপ মহাপাপেও সংশ্লিষ্ট।"

(১০) "রামের বুদ্ধি এবং ধর্ম্মানুরাগের প্রশংসা" (লেখক ত নয়-ই) "বোধ হয় কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই করিবেন না।" ইতি শম্বুক-বধ-ব্যাপার।

উপরোক্ত প্রকারে লেখক মহাশয় প্রতিপন্ন করিলেন যে রামের জীবন বাস্তব জীবনের ন্যায় ভালমন্দের মিশ্রণ ছিল, অতএব রাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। লেখকের উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। কিন্তু আমি দুইএকটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। লেখক মহাশয় রামের যে কয়েকটী কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন ভবভূতিও তৎসমুদয়ই উত্তররামচরিতে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের বলিবার ভঙ্গিতে কি আকাশ-পাতাল পার্থক্য!

সীতা-নির্ব্বাসন ব্যাপারের জন্য ভবভূতি প্রথমতঃ রামকে বলাইলেন "প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য নিজের প্রাণ এমন কি জানকীকেও ত্যাগ করিব; তাঁহার সেই "অথবা জানকীমপি" কথাটীর দ্বারা সীতা যে রামের পক্ষে কি ছিলেন, কিরূপ অবস্থায় তিনি যে সীতাকে বনবাসে পাঠাইয়াছিলেন তাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায়।

রামের তারিকারাক্ষসী বধ, বালী বধ ইত্যাদি যাহা বীরোচিত বা পুরুষোচিত বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায় না, তাহা ভবভূতি কেমন সুকৌশলে রামের স্বীয় বালক পুত্রের মুখে "বৃদ্ধ-স্ত্রী নিধনে" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

শম্বুক বধের সময় রাম স্বীয় দক্ষিণহস্তকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিতেছেন তাহার সমগ্রটা উদ্ধৃত করিলাম, যথা :—

রে হস্ত দক্ষিণ ! মৃতস্য শিশোর্দ্বিজস্য
জীবাতবে বিসৃজ শূদ্রমুনৌ কৃপাণম্।
রামস্য গাত্রমসি ! নির্ব্বহ গর্ভক্লিন্না
সীতা বিবাসনপটোঃ করুণা কুতস্তে ॥

উপরোক্ত শ্লোকটী পড়িলে মনে হয় কি রাম খুনীর মন লইয়া (with murderer's mind) শম্বুককে বধ করিয়াছিলেন ? পক্ষান্তরে ইহাই কি মনে হয় না যে শম্বুকের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে রামের হাত সরিতেছে না ; তিনি নিতান্ত কাতর চিত্তে নাচার হইয়া সে কার্য্য করিতেছেন। আর "সীতা বিবাসনপাটা" কথাটী প্রণিধান করিবার যোগ্য। লেখক মহাশয়ের ভবভূতি অপেক্ষা নূতন কিছুই বলেন নাই। এখন তাঁহার লিখিবার ভঙ্গিকে "কিরূপে অভিহিত করা উচিত সকলেই তাহা বিবেচনা করিবেন।"

ইহার পর লেখক রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ ব্যাপারটাও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়াছেন। কারণ "রাবণ যখন সীতা হরণ করে তখন তাহার বহু পুত্র, পৌত্র হইয়াছিল, পৌত্রদেরও যুদ্ধ করিবার বয়স হইয়াছিল।" কাজেই "রাবণ যে তখন অশীতিপর হইয়াছিল" সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে বয়সে স্বয়ং গিয়া রাবণের সীতাহরণ করাটা বিশ্বাস করা যায় না।

এখন এই 'অশীতিপর' কথাটায় লেখকের মনে যে ধাঁধা লাগিয়াছে তিনি উক্ত কথাটীর দ্বারা অপরের চক্ষেও ধাঁধা লাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আজকালকার দিনে অশীতিপর বলিলে স্বতঃই একটী কঙ্কালসার লোলচর্ম্ম, শুক্লকেশ, জরাজীর্ণ, স্থবির বৃদ্ধের কথাই মনে উদিত হয়। কিন্তু আজকালকার দিনেও সকল অশীতিপর বৃদ্ধের দশা কি এইরকম ? স্যার সুরেন্দ্রনাথ ৭৫ বৎসর বয়সে যে কর্ম্মকুশলতা দেখাইয়া গিয়াছেন কয়জন যুবকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর ? এইরূপ আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই দেশে কিছুকাল পূর্ব্বে কুলীন ব্রাহ্মণেরা কত বয়সে বিবাহ করিতেন তাহা কি লেখকের জানা নাই ? বঙ্কিম বাবু তাঁহার দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর মুখে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম..........."তোর (ব্রজেশ্বরে) ঠাকুর দাদার তেষট্টিটা বিয়ে ছিল—কিন্তু চৌদ্দ বছরই হোক আর চুয়াত্তর বছরই হোক—কই, কেউ ডাকলে ত কখন না বলিত না।" আজকালকার দিনে যাহা সম্ভবপর, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন মানবের তেজোবীর্য্য, স্বাস্থ্য, পরমায়ু আজকালকার মানবের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, তখন মহৈশ্বর্য্যশালী, পরম ভোগী, মহা তেজস্বী রাবণের অনেক পুত্র পৌত্র হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার দ্বারা সীতা হরণ ব্যাপারটা এতই অবিশ্বাস্য হইয়া দাঁড়াইল ?

তারপর লেখক মহাশয় যে রামায়ণে বিবৃত ঘটনা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরবর্ত্তী কি পূর্ব্ববর্ত্তী, রাম ত্রেতা-যুগের লোক ত দ্বাপর যুগের লোক বলিয়া কেন লেখা হয়,—ইত্যাদি প্রশ্ন তুলিয়াছেন তাহার মীমাংসা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পণ্ডিতবর্গ করিতে থাকুন। সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার বর্ত্তমানে প্রয়োজন নাই। লেখক যদি রামায়ণে ও মহাভারতে বিবৃত ঘটনা ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারেন অথবা তাহার মালমশলাও অন্ততঃ যোগাইয়া দেন তবে তাহা যে অতীব আনন্দ ও গৌরবের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা করিতে যাইয়া লেখক মহাশয় যদি কেবলই "বাল্মীকির ভৌগোলিক জ্ঞান ভ্রান্তিপূর্ণ

ছিল". "তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষ সম্বন্ধে নামটা ভিন্ন কিছুই জানিতেন না" ইত্যাকার বাল্মীকি ও ব্যাসের অজ্ঞতা ও নিজের বিজ্ঞতা দেখাইতে থাকেন, রামকে উপরিলিখিত এক হইতে দশ সংখ্যা পর্য্যন্ত বিশেষণে বিশিষ্ট করিতে থাকেন (কৃষ্ণকেও ছাড়িয়া কথা কহেন নাই)। তাহা হইলে "শিব গড়িতে বানর গড়াই হইবে।" বাল্মীকি ও ব্যাস, রামায়ণ ও মহাভারত, ভারতের জাতীয় গৌরব। তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কিছু লিখিতে হইলে সংযতভাবে লেখনী চালাইলে শোভা পায়। বঙ্কিম বাবু তাঁহার সীতারাম উপন্যাস লিখিতে লিখিতে কোন একস্থলে আত্মহারা হইয়া লিখিতেছেন..........."তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষৎ, গীতা, রামায়ণ মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক.........তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"—(সীতারাম ১ম খণ্ড ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)

বঙ্কিম বাবু যে ভাবে প্রণোদিত হইয়া উক্ত কয়েকটী কথা লিখিয়াছিলেন সেই ভাবটী মনে রাখিয়া ইতিহাস পড়িলে, কি সমালোচনা করিলে কিছুই ত অশোভন, অসমীচীন বা অযৌক্তিক হইয়া যায় না।

লেখক মহাশয় কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার বেশী কিছু বক্তব্য নাই। তথাপি দুই চারি কথা বলিব।

লেখক প্রশ্ন করিতেছেন কৃষ্ণের জন্ম একদিন বর্ষাকালে হইয়াছিল এ কথাটা পুরাণকারেরা কিরূপে জানিলেন। তাঁহার মতে খ্রীষ্টের জন্ম বর্ষাকালে হইয়াছিল এবং খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণের জীবনে আরো অনেক সাদৃশ্য আছে। বিশেষ কৃষ্ণের বহুশত বৎসর পরে খ্রীষ্ট জন্মিয়াছিলেন ; আর খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রচার প্রথম শতকের মধ্যেই ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল। তখন কৃষ্ণের কথা সকল লোকে ভুলিয়াই গিয়াছিল। অতএব খ্রীষ্ট জীবনের কথাই কৃষ্ণ জীবনে আরোপিত হইয়াছে। প্রমাণ, মহাভারতের আদি পর্ব্বে খৃষ্টীয় সমাজের ইউকারিষ্ট্ নামক অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। মহাভারতে ইউকারিষ্ট্ নামক অনুষ্ঠানেরই বর্ণনা আছে তদ্বিষয়ে লেখক নিঃসন্দেহ হইতে পারেন কিন্তু তৎসম্বন্ধে আরো যথেষ্ট যুক্তি প্রমাণ না দিলে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের সন্দেহ নিরসন হয় না। বিশেষ এই অনুষ্ঠানের সহিত খ্রীষ্ট চরিত্রের অন্যান্য বৃত্তান্তও ভারতবর্ষের লোক বিদিত ছিল এইরূপ সিদ্ধান্তেরই বা কারণ কি, কিছু বোঝা গেল না। যেহেতু খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছিল অমনি ভারতবর্ষের লোক তাহা জানিয়া লইল ও মহাভারত, পুরাণ, গীতা ইত্যাদি রচনা করিয়া ফেলিল। লেখকের নিকট মহাভারত গীতার মূল্য কি এতই কম ?

তারপর লেখকের দ্বিতীয় অনুমান এই যে, "ভারতীয় লোক খ্রীষ্টকে বিদেশীয় বলিয়া গ্রহণ করেন নাই ; কিন্তু কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের নামের ধ্বনিগত সাদৃশ্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টচরিত্রের বিবরণগুলি বহু গুণিত করিয়া কৃষ্ণ-চরিতে আরোপ করিয়া অবশেষে কৃষ্ণকে একেবারে ঈশ্বরের পদে স্থাপন করিলেন।" লেখক মহাশয় তাঁহার দুইটী অনুমানের মধ্যে শেষোক্তটীকে অধিকতর সম্ভব বলিয়া বোধ করেন। হায় রে মহাভারতকার! পুরাণকার! তোমরা শেষে কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের নামের ধ্বনিগত সাদৃশ্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া এত বড় ভণ্ডামি করিয়া গিয়াছ। তোমরা কৃষ্ণের উচ্চারণ "কৃষ্‌ণ" করিতে, না, আধুনিক বাঙ্গালীগণের ন্যায় "কৃষ্‌ট" করিতে ?

লেখকের মতে "তাঁহার সমকালবর্ত্তী ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, অর্জ্জুন প্রভৃতি অপেক্ষা কৃষ্ণ এমন অধিক গণ্যমান্য ছিলেন না যে; কেবল তাঁহারই জন্ম সময়টা—পুরাণকারেরা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।" বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণ চরিত্র লেখাটা নিরর্থক হইয়াছে।

লেখক মহাশয় কৃষ্ণ ও বলরামকে পাপী বলিয়া উল্লেখ করিয়া তবে তাঁহার প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করিতে যাইয়া জাতীয় গৌরবকে এইরূপ ভাবে হ্রাস ও মলিন করিবার চেষ্টা বিদেশীয় পণ্ডিতগণও করিয়াছেন কি না সন্দেহ।

শ্রীসতীশকৃষ্ণ মাইতি, বি, এল্,

উত্তর

শ্রীযুক্ত বাবু সতীশকৃষ্ণ মাইতি মহাশয় এই বলিয়া সমালোচনার ভূমিকা করিয়াছেন যে আমার প্রবন্ধ হিন্দুমাত্রেরই মনে কষ্ট প্রদান করে। কিন্তু আমি রাম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা রামায়ণেই আছে। অধিক কিছুই বলি নাই। ইহাতে কাহারও মনে কষ্ট হইলে রামায়ণই সে জন্য দায়ী।

রামকে বাল্মীকি যে সম্পূর্ণ দোষ-বর্জ্জিত বলিয়া বর্ণণা করেন নাই ইহাই প্রদর্শন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল।

বাল্মীকি যে রামের বহুকাল পরের লোক, ইহা বিবেচনা করিবার কারণ কি, আমি তাহা স্পষ্টই লিখিয়াছি।

সমালোচক বলেন রামায়ণ ও মহাভারত ইতিহাস নহে, কাব্য। তাহা হইলে রামায়ণের কোন কোন কথায় আমি অবিশ্বাস করিলে অপরাধ হইবে না।

নারদ যে বাল্মীকির সমসাময়িক একথা রামায়ণেই আছে।

বাল্মীকির কোন কোন বিবরণ প্রকৃত কোন কোন বিবরণের সহিত বাস্তবতায় ঐক্য নাই আমি ইহা বলিয়াছি। সমালোচক কি বলিতে চাহেন যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে ৩২০০ মাইল দূরে সমুদ্র মধ্যস্থ স্থান? যদি তাঁহার মত অন্যরূপ হয় অর্থাৎ বাল্মীকির মতের সঙ্গে না মিলে, তাহা হইলেই কি বাল্মীকি খাট হইয়া গেলেন?

সমালোচক আমার প্রায় প্রত্যেক কথায়ই এই প্রশ্ন করিয়াছেন যে সে কথা বলার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিয়া যদি বাহিরই করিতে না পারিলেন, তবে সমালোচনা করিতে বসিয়াছেন কেন? অমুক যে একখানা ইতিহাস লিখিয়াছেন, অমুক যে একটা কবিতা লিখিয়াছেন, অমুক যে একটা কূপ বা পুষ্করিণী খনন করাইয়াছেন, এ সকলের উদ্দেশ্য কি? এরূপ প্রশ্ন না করিয়া উদ্দেশ্যটা যুক্তি সংকারে আবিষ্কৃত করিয়া তাহা ভাল কি মন্দ ইহাই সমালোচকের কার্য্য। তথাপি আমি সমালোচকের অবগতির জন্য বলিব, তথ্য নিরুপণ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

রাম নিজেই বলিয়াছিল যে, দশরথ এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, কৈকেয়ীর পুত্র রাজা হইবে। আমি এই কথাটা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া কৈকেয়ীর বর প্রার্থনার কথাটা প্রকৃত নহে এই মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। সমালোচক কিন্তু এই শেষ অসম্ভব কথাটায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান্। এই বলিয়া কৈকেয়ী-দশরথ সংবাদের বিস্তৃত ইতিহাসটা বিবৃত করিয়াছেন। তাহার বিবক্ষা নিশ্চয়ই এই যে কেকয়রাজকে দশরথের প্রতিশ্রুতি দিবার কথাটা মিথ্যা। কিন্তু ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা তাঁহার সাহসে কুলায় নাই। কোন বিবরণের একটা অংশ মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ করিলেই তাহার পুনর্গঠন হয়। তাহা আমিও যেমন করিয়াছি, সমলোচকও তেমনি করিয়াছেন।

রাম যে শত্রুঘ্নের প্রতি বাৎসল্যবশতঃই লবণ বধের উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন সে বিষয়ে মতদ্বৈধ হইতে

পারে না। আমি সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলি নাই। আমি কেবল এই বলিয়াছিলাম যে রাম যেরূপে বালীবধ করিয়াছিলেন, শত্রুঘ্নের লবণবধ কতকটা তদ্রূপ এবং তাহা রামেরই উপদেশজনিত।

"রাম নির্দ্দয় ছিলেন" একথাও আমি বলি নাই। আমি কেবল বলিয়াছিলাম যে রাম সীতার প্রতি রাবণবধের পর বড় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। একথা কি সমালোচক অস্বীকার করেন?

রাম দুর্ব্বলচিত্ত ও কাপুরুষ ছিলেন বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন আমি এমন কথাও বলি নাই। রাম কাঁদিতেছেন বলিয়া মাইকেল বর্ণনা করিয়াছেন সেজন্য কেহ কেহ মাইকেলের দোষ ধরিয়াছেন। আমি কেবল ইহাই প্রদর্শন করিয়াছি যে, বাল্মীকি এবং ভবভূতিও সেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সীতাকে বনবাস দিবার সময়ে রাম যাহা বলিয়াছিলেন আমি কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়াছি। ইহাতে সমালোচক আমার কি দোষ পাইয়াছেন তাহা বুঝিলাম না।

শম্বুকবধ ব্যাপারে রামের কার্য্য সম্বন্ধে সমালোচকের নিজের মত কি তাহা জানান নাই। তাঁহার নিজের মতের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া আমার দোষ দেখান কি উচিত ছিল না?

বাল্মীকি রাম সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন আমি তাহা লইয়াই প্রবন্ধ লিখিয়াছি। সে প্রবন্ধে ভবভূতির বর্ণনা অপ্রাসাঙ্গিক বা irrelevant।

রাবণের বয়স হইয়াছিল অনেক। তত অধিক বয়সেও যে সে নিজে সীতাহরণ করিতে গিয়াছিল ইহা আমার কিছু অসম্ভব বোধ হইয়াছিল। তাহার উত্তরে সমালোচক লিখিয়াছেন এখনও বহু ব্যক্তি বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করিয়া থাকে। সমালোচকের যুক্তির বাহাদুরি আছে। যেমন বৃদ্ধ হইলেও চোর ঘরে বসিয়া অপহৃত বস্তু গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু বার্দ্ধক্যজনিত দুর্ব্বলতাবশতঃ স্থানান্তরে গিয়া সিঁধ কাটিতে পারে না, তেমনি বৃদ্ধ লম্পটও বাড়ীতে বসিয়া অর্থবলে বিবাহ করিতে পারে কিন্তু বার্দ্ধক্যবশতঃ ক্ষীণবল হইলে নারী হরণের জন্য একাকী তাহার দূরবর্ত্তী স্থানে যাইয়া চেষ্টা করা অসম্ভব। রাবণ যে একাকী সেই বৃদ্ধ বয়সে সমুদ্র পার হইয়া সীতা হরণ করিতে গিয়াছিল তাহা আমি তেমন সম্ভব বলিয়া মনে করি নাই।

বাল্মীকির ভৌগোলিক জ্ঞান ছিল না, আমি এমন কথা বলি নাই। আমি কেবল বলিয়াছিলাম যে, প্রাগ্জ্যোতিষ বিষয়ে তাঁহার ভৌগোলিক জ্ঞান ছিল না। ইহার সহজ বাঙ্গালা এই যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষ কোথায় তাহা তিনি জানিতেন না।

আমি যাহা বলি নাই তাহাই বলিয়াছি বলিয়া সমালোচক আমার সহিত বৃদ্ধা নারীর মত কলহ করিতে চাহেন। আমি নাকি বলিয়াছি যে বলরাম ও কৃষ্ণ পাপী ছিলেন। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা কি আমার নিজের কথা না বিষ্ণু পুরাণ হইতে উদ্ধৃত স্বয়ং কৃষ্ণের উক্তি? আমি কি ইহা স্পষ্ট করিয়া বলি নাই?

শ্রীবীরেশ্বর সেন

প্রতিবাদ

(২)

বাঙ্গলার হিন্দু

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গবাণীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র পাল মহাশয় লিখিত "বাঙ্গালার হিন্দু" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি হিন্দুজাতির উপজাতির যে তালিকা দিয়াছেন সে সম্বন্ধে ২।১টী কথা এখানে বলা দরকার বোধ করিতেছি ;—উপরোক্ত তালিকায় প্রবন্ধকার ব্রাহ্মণকে এক উপজাতি ধরিয়া সংখ্যা দিয়াছেন ১৩১৪৪৩০। যে উদ্দেশ্যে এই তালিকা দেওয়া হইয়াছে ব্রাহ্মণের মোট সংখ্যা দিয়া সকলকে "জলচল" বলায় সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় নাই, কেন না সকল ব্রাহ্মণই "জলচল" নহে। উদাহরণ স্বরূপ সাহার ব্রাহ্মণ, লগ্নাচার্য্য, দানীক ব্রাহ্মণ, অগ্রদানী ব্রাহ্মণ, ভুঞ্জ বিপ্র (ভুই মালীর ব্রাহ্মণ), ধোপার ব্রাহ্মণ, কাপালীর ব্রাহ্মণ, তিওরের ব্রাহ্মণ, নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ, পাটনীর ব্রাহ্মণ, প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এবং ইহারা প্রত্যেকেই এক একটী উপজাতি।

নাপিতদিগকে জলচল বলা হইয়াছে, কিন্তু সকল নাপিত জলচল নহে। উদাহরণ স্বরূপ নমঃশূদ্রের নাপিতের কথা বলা যাইতে পারে। ইহারা একটী ভিন্ন উপজাতি বলিয়া গণ্য।

গন্ধবণিক, বারুই এবং তাঁতি এই তিনটী উপজাতিকে জলচল বলা হয় নাই, বাস্তবিক পক্ষে এই তিন উপজাতিই জলচল।

শাঁখারী (শঙ্খ বণিক) শ্রেণীকে উপজাতি হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গদেশে শাঁখারীর সংখ্যা একেবারে কম নহে, এবং ইহারা জলচল। মালী বলিতে প্রবন্ধকার কোন্ জাতিকে বুঝাইয়াছেন? যদি তিনি মালাকর—যাহারা ফরিদপুর বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে সোলার টোপর তৈয়ার করিয়া দেয় তাহাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই শ্রেণীকে জলচল হইতে বাদ দেওয়া ঠিক হয় নাই, কেন না ইহারা জলচল।

বাঙ্গালা দেশে "তিওর" নামে এক উপজাতি আছে। মুর্শীদাবাদ-এর রাজসাহী জেলায় ইহাদের বাস। ইহারা জলচল নহে। প্রবন্ধকার ইংরেজী Census report নকল করিতে যাইয়া "তিওর"কে "টিয়ার" করিয়াছেন কি? আর যদি "টিয়ার" ও "তিওর" বিভিন্ন হয় তবে এখানেও উপজাতির সংখ্যা বাড়িবে।

শ্রীযুত যোগেশ পাল বহু অনুসন্ধান করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে ২।১টা ভুল দেখাইয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা আমার এ আলোচনার উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া পাঠকগণ আমার উপর অবিচার করিবেন না। তিনি হিন্দুজাতির অচলায়তনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার উপর যে আরো দু'চার খানা জগদ্দল পাথর আছে তাহারই সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলাম। ইতি—

বিনীত

শ্রীঅশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী

রাজবন্দী

বহরমপুর জেল

২০শে পৌষ

১৩৩৩

গত ও অনাগত

পশ্চিম গগনপ্রান্তে রজনীর শেষ দীপতারা ওই নিভে যায়!
সে তারার করুণ আলোকে রাত্রি তা'র বিদায় জানায়
অনাগত দিবসের সাথে।
স্থল কমলের পাতে পাতে
কাঁপিছে বিদায় অশ্রু শিশিরের মালা,
অসমাপ্ত উৎসবের অঙ্গনেতে ঢালা
সদ্যঝরা শেফালী মঞ্জরী।
হিমচ্ছত্র বেণুবনে এখনও গুঞ্জরি'
বাজিছে রাত্রির গান—
এখনও হয়নি অবসান!
ছন্দহারা কত বাণী, অসমাপ্ত কত চিত্রগুলি
অনন্তের অন্তর আকুলি
মূহ্যমান প্রকাশ ব্যথায়!
এরি মাঝে হায়!
বেজে গেল বিদায়ের ভেরী—
বলে "ওরে, চল্, চল্, করিস্‌নে দেরী,
এসেছে পথের ডাক,
তুলে নে কাঁধের ঝুলি, যা আছে যেখানে পড়ে থাক্!"
নিশান্তের ম্লান শশী মূহ্যমান বিয়োগ ব্যথায়
পাংশু মুখে চায়
দিগন্তের অন্ত পারে দূরে
যেথা পুন পূরবীর সুরে
শেষ করি দিবসের বিদায় নন্দন
পাতা হ'ল সন্ধ্যার আসন!
এস অনাগত শিশু, এস সুপ্রভাত,
হে নূতন জীবন সম্পাৎ!
আমার এ অসমাপ্ত উৎসব-অঙ্গনে
যেথা বনে বনে
শিহরিছে সহস্র কামনা;
অসমাপ্ত জীবনের প্রারব্ধ সাধনা;
সকরুণ সহস্র মিনতি
যেথা তার মাগে পরিণতি!
যে কুঁড়ি উঠেনি ফুটে, যে গান হয়নি আজও গাওয়া,
ব্যর্থ যে প্রার্থনা আজও লভেনিক' তা'র শেষ পাওয়া,
লগ্নভ্রষ্ট যে পূজাটি দেবতার হারাল শরণ,
যে প্রেম পায়নি আজও প্রণয়ের প্রথম চুম্বন;
এস আলোকের শিশু, এস মোর অনাগত কবি!
পূর্ণ কর তাহাদের সবি।
যে খড়্গ রাখিয়া গেনু অসমাপ্ত রণাঙ্গন মাঝে,
যে মালা হয়নি শেষ উৎসবের সাঁজে
তুমি তা'র কর সমাপন।
হে মোর আত্মজ, প্রিয়, হে আমার একান্ত আপন!
তুলে লও যুদ্ধ অসি, তুলে লও হেমসূত্র গাছি!
জাগাইয়া জয়ধ্বনি ডেকে বল, "আমি আছি, আছি!"
যে যাত্রা হয়েছে সুরু আলোকের প্রথম প্রভাতে,
কিম্বা কোন অন্ধকার রাতে;
সহস্র দিবস রাত্রি অতিক্রমি যেই চিত্ত নদী
বহিয়া চলেছে নিরবধি
অনন্তের অন্তর সন্ধানে;
যুগে যুগে ভগীরথ শুভ শঙ্খগানে
আগুসরি লয়েছে যাহারে
আজি সে বহিয়া পথ এল তব দ্বারে।
এস কবি! তুলে লও শুভ শঙ্খ তব
গাও গীত নব;
অনন্তের যাত্রাপথে তুমি তা'রে কর অগ্রসর,
নবযুগ মন্ত্রদ্রষ্টা হে ঋষি ভাস্বর!

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

ছিটে-ফোঁটা

(১)

বঙ্গগৃহের মহোৎসব

বঙ্গে বহু অন্দরেতে রাত্রি দিবা চল্‌ছে মজা
মহোৎসবের ছড়াছড়ি, গড়াগড়ি জিহ্বা-গজা ;
একটানা ভাই বাজ্‌ছে সানাই,   করুণ, মধুর কামাই তো নাই,
'পাঁঠী' বাজায় 'রস্থন চোকী' ঢক্কা জোরে বাজায় 'পচা'
কেরোসিনের রোসনাইটা, আয় না ছুটে, দেখবি 'ভজা'।
এত আমোদ চল্‌ছে তবু নিরানন্দ বলিস্ কেবা ?
অন্দরেতে আছেন যাঁরা—লাথি ঝাঁটা করেন সেবা ;
তাদের প্রতি নাইকো দরদ—   বলবি তবু ?—হায়রে মরদ !
দেখতো কেমন ঠাণ্ডা গারদ—তৈরি করতে কে পারে বা ?
স্থাপন করে যত্নে যেন সিংহাসনে পুজ্‌ছি "দেবা।"
একটুখানি স্বতন্ত্র ভাই আরতির এই উপকরণ,
"ঢক্কা" কোথায় খুঁজ্‌বো ? নারীর পৃষ্ঠে বাজাই দিয়ে চরণ ;
তাইতে তাহার জিহ্বা যদি—   বেরোয় ; বেরোক নিরবধি,
জিভ্ বেরুনো কালো মেয়ের পদে কি শিব লয়না শরণ ?
নিন্দা তবু করবি তোরা ? দেখ্‌ছি দশা আর কি মরণ !
পিঠে ঢাকের বাজনা যখন চোখে ছুটায় সুখের বারি,
কৃতজ্ঞতার করুণ সানাই ফুটায় মুখে ;—বলিহারি !
অধিকারী নয়তো কোঁচার,   অত কাপড় করবে কি আর ?
কেরোসিনে সিক্ত করি—"চেরাগ" জ্বালায় তাইতো নারী ;
নারী মোদের দেবী, তারে করি মোরা ভক্তি ভারি।
ভক্তি যত, শ্রদ্ধা যত, জানেন গোঁসাই, মনে মনে,
বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে, জানেন সবাই জনে জনে,
উল্টো কথাই বোলবো তবু,   আসল যাহা স্বীকার কভু—
করবো না তো ; শুধু শুধু কোরবো বিবাদ তাহার সনে—
সঠিক কথা বোল্‌বে যে জন—বেঠিক বলি' পরাণপণে

"এক"এ চন্দ্র, দুই-এ পক্ষ, থাকুক লেখা ধারাপাতে,
পাঁচটা চাঁদ ও সাতটা পক্ষ প্রমাণ করি হাতে হাতে ;
তাইতে কত বাজনা গৃহে— বাজে ; তাহা বুঝ্‌ছো কি হে—
কত আলোর ঝালোর ঝলে, ঘরের কোণে আঁখির পাতে,
দেখেছে কেউ এত আমোদ, করতে কভু দিবারাতে ?
নয় বছরের নাত্‌নী, করুক নির্জ্জলা সে একাদশী,
বিরাশীর এই বৃহৎ জঠর ; আমি এখন গিল্‌তে বসি ;
নাতনী আমার একটুখানি, ক্ষুধাও তাহার নাইকো জানি,
উপোস দিলে রোগা 'ছুঁড়ির' "ম্যালেরিয়া" পড়বে খসি' ;
নাক-রাগিনী বাজাতে ভাই, এখন শয়ন ঘরে পশি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

(২)

কলেজি বাসায়

পরলোক ? সে মিথ্যে কথা। "কেমন করে' জান্‌লে ?"
প্রমাণের ভার তোমার উপর,—কেমন করে মান্‌লে ?
ভাগ্‌ল রমেশ (তৃতীয় সে)—মনে নাই তার খট্‌কা ;
বলে গেল,—উড়া কথা যত পারিস্‌ চট্‌কা।
বাড়্‌ল তর্ক— ধারা যেন নায়াগ্রার প্রপাতে ;
"জান কত বড় লোক থিয়সফি সভাতে ?
আস্তিক ছিলেন নিউটন্‌, ফেরাডে ও অর্‌বিং।"
আর নাস্তিক ছিলেন স্পেন্সর্‌, হক্সলে ও ডরবিন্‌।
দুপুর রাতে চেচাঁয় রমেশ শিঁড়ির পথে উৎরে—
ওরে! ঘরে ঢিল পড়্‌ছে,—পেত্নী না হয় ভূতরে!
তার্কিকদের খাড়া তর্কের কোমর গেল মচ্‌কে ;
দোঁহে ভোরে লেখে চিঠি অলিভার লজ্‌কে।

(৩)

মডারেট্‌

যাওনি কোথাও ? দেশে ঘোরার ছিল যে গো সর্ত্ত!
"চল-ফেরা মড়ার রেটেই মডারেটের অর্থ।"

মডারেট্ ! গেলাসে কি, মেশাচ্ছ যা সোডাতে ?
"কড়া সোডা কর্‌ছি মৃদু মধুর দু-চার ফোঁটাতে।"

(৪)

স্বরাজ্য

আছে যথা বাক্য ছিলেন বিনা কণ্ঠযন্ত্র,
মাথা গেলে মাথার ব্যথার নাইক যথা অন্ত।
না থাক্‌লে চাল, যেমন ভাতে-ভাত রন্ধন
বিয়ে বিনাই কার্ত্তিক পূজায় মেলে যথা নন্দন।
গ্রাম নাস্তির বেলায় যথা বাড়ে সীমা করার জো ;
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় তথা, বাড়ে মোদের স্বরাজ্য।

(৫)

মানে

বনিতার মত কবিতার পদ একালে কঠিন বোঝা ;
বিনা অলঙ্কারে খট্‌খটি বাড়ে ; মানে-ঢাকা জুতা-মোজা।

(৬)

মাঘের একছিটে

নয় শাঁসাল, নয়ক সরস কল্পনা যে শুঁট্‌কি গো।
কুঁচ্‌কে পড়ে নিঙ্‌ড়ে নিতে ছিটে-ফোঁটার চুট্‌কি-ও
ভাবের খোঁজে চক্ষু বুঁজে স্বপ্নে গেলাম নন্দনেই ;
শুঁকে দেখি পারিজাতের পাঁপড়িতে আর গন্ধ নেই।
উধাও কোথাও ইন্দ্রসভার নৃত্যপরা সুন্দরী ;
ঐরাবতের মৃত্যুশোকে মরেছে তার কুঞ্জরী।
কেশেই সারা মদন বুড়া চ্যবনপ্রাশে কর্‌বে কি।
রতির শিরে শনের নুড়া—তাহে চূড়া গড়্‌বে কি ?
কাকের ডাকে স্বপ্ন ভাগে ; বল্লাম্ জেগে ধুত্তোরি।
ফেলে কাঁথা জড়াই মাথায় শীতের ভয়ে উত্তরী।
শীতের পরে বসন্তে কি শুষ্ক তরু মুঞ্জরে ?
ফাল্গুনেতে দেখ্‌ব যদি কল্পনাটি গুঞ্জরে।

সব চেয়ে সে আপনার

পড়ার ঘরে ব'সে সে লিখ্‌ছিল।

প্রিয়ার কল্পনা প্রজাপতির মতো পাখা ছড়িয়ে তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যেন আঙুরের মতো তার আঙুলগুলি ছেলেটির চুলগুলির মধ্যে লতিয়ে দিচ্ছে—এম্‌নি মনে হচ্ছিল।

কাগজের ওপর দিয়ে কলমটা খস্‌খসিয়ে ছুট্‌ছিল—আর ছেলেটির চাপা ঠোঁটের কোণে মৃদু একটি হাসি। সে-প্রিয়াকে ভালোবাস্‌তে পাওয়া বা ফেরা-ফির্‌তি তারো ভালোবাসা পাওয়ার মধ্যে নিবিড় অসহ্য সুখ। ছেলেটি কলমটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিল। লিখতে চেষ্টা করা বৃথা। তার শুধু এখন গা এলিয়ে দিয়ে চুপটি করে পড়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করছিল। সে তার প্রকাণ্ড চেয়ারটায় শুয়ে পড়ে পাইপ্‌টা ধরাল। রুদ্ধ ঘরের এই উত্তাপটি কি মিষ্টি! আশ্চর্য্য, মায়্‌রা তার কাছে নেই আজ—তাকে ছাড়া এটুকুন্‌ও তেতো লাগে। সে তো অনায়াসেই তার হতে পার্‌তো—

বিয়ে করাটা তার কি বোকামিই হয়ে গেছে! অসহায় চিররুগ্ন স্ত্রী—হয়ত কাল্‌কেই মরে' যাবে, কিম্বা হয়ত বছরের পর বছর বেঁচেও থাকৃতে পারে।

এর মধ্যে পাঁচটি বছর তো এই রোগের স্যাঁতসেতে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। এ পাঁচ বছরে তার প্রেমও তো মীইয়ে গেছে। প্রেম কতদিনই বা বাঁচে? তার ঘরে যেতেও এখন ঘেন্না বোধ হয়—মেয়েটি তার কাছে একটা পাঁকের পোকা। সেই লম্বাটে মুখ, ঘোলাটে ঝাপ্‌সা দুই চোখ, শীর্ণ শিটিয়ে-পড়া হাত,—আর দুই ঠোঁটের মাঝে ওষুধের সেই চিরন্তন গন্ধ—সে এগোতে পারে না। কিন্তু তবু, তবু একদিন সে কী সুন্দরীই না ছিল!

টেবিলের একধারে তার স্ত্রীর একখানি ছবি। অন্যমনস্কের মতো সে-দিকে তাকাল। কত বছর বাদে সেদিকে তাকাচ্ছে সে আজ! এতদিন তো ঐ ছবিটা প্রাণহীন, আসবাবেরই সামিল ছিল। কিন্তু আজ হঠাৎ সে হাত বাড়িয়ে ছবিটিকে নিজের কাছে নিয়ে এল। একটি কিশোরী মেয়ের ছবি, দুটি চোখ উজ্জ্বল বিশ্বাসে পরিপূর, মাথায় একরাশ চুল। তার চুল কি সুন্দর পাঁশুটেই না ছিল! কতদিন ঐ ঘন ঘন কেশগুচ্ছে সে তার শ্রান্ত আঙুলগুলি লুকিয়ে রেখেছে। সে পাখীর মতো গান গাইত। তাদের ঘর তো তখন সূর্য্যের আলোয় আর ফুলের গন্ধে ভরা ছিল।

ছবিটা তাড়াতাড়ি সে ঠেলে দিলে। পেছনের দিকে চোখ ফিরিয়ে লাভ কি? এই সমুখ—এই নিকটই তো-তার সব কিছু—তার মায়্‌রা। তার মায়্‌রা জীবনে একটি দিনের জন্যও রোগে ম্লান হয়নি, তার টুলটুলে ভরা দুটি গালে অর্দ্ধস্ফুট গোলাপের আভা, দুটি নৃত্যচঞ্চল

পায়ের তাজা স্বাস্থ্যের মদিরা উছ্‌লে পড়্‌ছে। মায়রার সর্ব্বাঙ্গে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের শ্যামল সুগন্ধ,—তাঁর চুম্বনে ওষুধের তেতো গন্ধ নেই।

পড়ার ঘরের দরজা খুলে গেল। নার্স ভেতরে এসে বল্লে—"আপনাকে বিরক্ত করছি হয়ত। কিন্তু মিসেস্ গ্রাহামের অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে। আপনাকে না দেখে কিছুতেই ঘুমোতে চাচ্ছেন না। আস্‌বেন ?"

ছেলেটি নার্সকে অনুসরণ কর্‌লে। অনবরত উঠে যাওয়ায় সে মনে মনে ভারি চটে। কিছুই তো করতে পারে না সে—সে একা থাক্‌তে চায়। কিন্তু রোগীর ঘরের চৌকাঠটার কাছে এসে দাঁড়াতেই মুহূর্ত্তের মধ্যে কেমন করে' কি জানি হয়ে গেল। ঘরে বাতি ছিল না। সূর্য্যাস্তের লালিমা সে ঘরে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বিছানায়ও এসে পড়েছে। আশ্চর্য্য। মেয়েটিকে এত তাজা ও তরুণ তো কোনোদিন দেখায়নি। ছেলেটি খুসি হয়ে তার কাছে গিয়ে তাকে চুম্বন কর্‌লে। ভুলে গেল তার চুলে পাক ধরেছে, তার চোখের কাছের চামড়াগুলি কুঁচকে গেছে। এই চুম্বনে অনেক-দূরে-ফেলে আসা গত দিনের হারানো স্মৃতি যেন শিউরে উঠ্‌ল।

মেয়েটি বিস্মিত হয়ে তাকাল। তারপর অজান্তে কখন সে তার কাহিল বাহুটি স্বামীর গলার ওপর তুলে দিয়েছে। ধীরে নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে,—"তুমি আমাকে আগের মতোই চুমু দিলে। তুমি যেন আমাকে ভালোবাস।"

"তোমাকে ভালোবাসি বৈ কি।"—হঠাৎ মুখ দিয়ে তার বেরিয়ে এল। কিন্তু বলে' ফেলার পর সে ভেবে দেখ্‌লে সত্যি কথাই সে বলেছে। বিবাহের রহস্যময় সূক্ষ্ম বন্ধন-ডোর আবার তাকে ধীরে ধীরে যাদু ক'রে মেয়েটির কাছে নিয়ে এসেছে। এ তো তার—একান্ত তার। সে তাকে ভালোবাসে বৈ কি—নিশ্চয়ই। সব চেয়ে এই তো তার আপ্‌নার। মেয়েটী হাস্‌ল—দুর্ব্বল ক্ষীণ হাসি—কিন্তু সান্ত্বনায় ও তৃপ্তিতে তা ভিজা।

—"আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো। কতদিন অন্যায় করে' ভেবেছি তুমি আমাকে চাও না, আমাকে নিয়ে তুমি বিরক্ত হয়ে গেছ। কী সুখ, তুমি আমার কাছে—একেবারে আমার বুকের কাছটিতে।"—মেয়েটি তার শিথিল শীর্ণ আঙুলগুলি দিয়ে স্বামীর গালে অতি কোমল আঘাত দিতে লাগ্‌ল—চুম্বনের মতো।

—"আমি আজ সন্ধ্যায় কী দুঃস্বপ্ন দেখেছি, জান ? যেন তপ্ত বালুচরে আমি একা হেঁটে চলেছি—মাইলের পর মাইল। আমি একেবারে একা। তুমি আমাকে ফেলে চলে' গেছ। তোমাকে খালি ডাক্‌ছি, তুমি আস্‌ছ না। মনে হচ্ছিল, তোমাকে আমি একেবারে হারিয়ে ফেলেছি।"

—"বোকা মেয়ে!" ছেলেটি আবার তাকে চুমু দিলে।—"আমি যে তোমার পিছু-পিছু ছুটে আস্‌ছিলুম, দেখনি ? বালির ওপরে পায়ের শব্দ, কি করেই বা শুনবে ?"

মেয়েটি নিশ্বাস ফেল্‌লে।—"আশ্চর্য্য, আমার তখন তা মনে হয়নি কিন্তু। স্বপ্নেও তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারছিলুম না। মরণের বিরুদ্ধে আমার তো খালি এই নালিশ যে তোমাকে সেখানে পাব না। নইলে মরতে আমার কত সুখ। আমার কি মনে হয়, জান? মনে হয় আমি এম্‌নি এক সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাব।—কোথায়? সূর্য্যাস্তের লালিমার মাঝে। তুমি কাঠের বাক্সটায় সত্যি সত্যি আমাকে গোর্ দিতে পার্‌বে না।"

ছেলেটি তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। মায়্‌রা তখন অনেক দূরে চলে' গেছে—হারিয়ে গেছে যে মেয়েটি তার বাহুর বন্ধনে বন্দী—সেই তার প্রিয়া, সে তার স্ত্রী।

কিন্তু মেয়েটির মারা যাবার পর—সে এর পরে হঠাৎ একদিন মারা গেল, সেদিন মেঘলা ছিল, সূর্য্য ওঠেনি—ছেলেটি মায়্‌রাকে বিয়ে কর্‌ল।

তবেই দেখা যাচ্ছে, জীবনে সব চেয়ে যে কাছে, বাহুর মধ্যে—সব চেয়ে সে সত্যি,—সব চেয়ে সে আপ্‌নার।*

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মাঘে

স্বরাজ্য কি?—পরাধীন আমরা। পরের কাছে আমরা সেই প্রার্থনীয় রাষ্ট্রীয় অধিকার চাই যাহা না থাকিলে কোন দেশের মানুষেরই মনুষ্যত্ব লাভ সম্ভবে না। উন্নত হউক, অর্দ্ধসভ্য হউক বা বর্ব্বর হউক, কোন জাতির লোকেরাই যে অধিকারে বঞ্চিত থাকিলে মানুষ না হইয়া পশু হয়, আর যে অধিকার পাইতে হইলে মানুষের উপযোগিতার ও অনুপযোগিতার বিচার চলে না ও চলিতে পারেনা, এ সেই অধিকারের কথা। মানুষেরা তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারাইয়া অন্যের অত্যাচারে পীড়িত হইবে না—এ অধিকার সকলের বিশ্বব্যাপী অধিকার; আইনে লেখে আমাদের সেই আত্মরক্ষার অধিকার আছে,—উৎপীড়িত হইলে বিচার পাইবার অধিকার আছে। এই বিশ্বজনীয় সাধারণ অধিকারটুকু হইতেও আমরা বঞ্চিত হই কি না, বিচার চাহিয়াও বিনা বিচারে দণ্ডিত হই কি না, তাহা নানা দৃষ্টান্ত তুলিয়া আলোচনা করা সম্ভব হইলেও করিব না; তর্কের খাতিরে এদিককার ত্রুটিকে আকস্মিক ভুল-চুকের ফল বলিয়া ধরিয়া নিতেছি, কারণ আইনে এ বিষয়ের অধিকার বিধিবদ্ধ আছে।

প্রত্যেক ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক প্রভৃতি সকল উন্নতি লাভের পথ অবাধ হইবে, নিজের ক্ষমতায় কিছু উপার্জ্জন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার পথ অবাধ হইবে, ইহাও হইল বিশ্বজনীয় অধিকার; আর এই অধিকার লাভের জন্য উন্মুখ কোন শ্রেণীর ব্যক্তির গায়ে জাতিবিশেষের নামের ছাপ মারিয়া দিয়া কোণঠেসা করা চলিতে পারে না। ক্ষমতা ও প্রবৃত্তির অনুরূপে শিক্ষা পাইবার পথ আমাদের পক্ষে সকল স্থানে অবাধ কি না, তাহার বিচারের প্রয়োজন আছে; ইচ্ছা করিলেই ও ক্ষমতা থাকিলেই যে আমরা ইউরোপীয়দের মত বৈজ্ঞানিক বিদ্যা খাটাইয়া ব্যবহারের অনেক জিনিস প্রস্তুত করিবার উপায়

* লুইস্ হিল্‌জাস হইতে

শিখিতে পারি না, আর উদ্ভাবনী শক্তি থাকিলেও যে নানা কলকারখানা, রেলের এঞ্জিন, জাহাজ, এরোপ্লেন প্রস্তুত করিবার অধিকারী নই, তাহা অনেকেই কিছু কিছু জানেন। টাকা থাকিলে যেমন রেলগাড়ীর যে কোন শ্রেণীতে টিকিট দেখাইয়া উঠিতে পারা যায়, সেই ভাবে বিদ্যা ও ক্ষমতার টিকিট দেখাইয়া অবাধে সকল শ্রেণীর চাকুরিতে জুটিবার অধিকার আমাদের নাই। ভারতীয় নামের ছাপের দরুণ উচ্চ অঙ্গের অনেক চাকুরিতে একটি নির্দ্দিষ্ট শতকরার অনুপাতে আমরা চাকুরি পাইতে পারি, আবার অনেক স্থলে একেবারেই কিছু পাইতে পারি না। যখনই কথা ওঠে যে স্থল বিশেষে কিছু কিছু Indianisation কাজ চালান হইবে, সেখানেই অর্থ হয় যে আমরা পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছি,—ইউরোপীয়দের মত কেবল ক্ষমতার বলে সকল অধিকার পাইতে পারি না। ইউরোপীয় কোম্পানীর লোকেরা রেল চালাইতে পারেন, আমরা যত টাকা থাকিলেও তাহা করিবার মঞ্জুরি পাইব না। যেখানে মানুষে "জাতিমাত্রেণ হন্যতে বা পূজ্যতে," সেখানে বিশ্বজনীয় অবাধ অধিকারের কথা উঠিতেই পারে না। দাতারা যখন আমাদের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার কথা তোলেন; অথবা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস খুলিয়া শুনাইয়া দেন যে অমুক শ্রেণীর অধিকার আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভোগ করে নাই বলিয়া উহা তিলে তিলে লব্ধ হইবার যোগ্য, তখন তাঁহাদের মনের আসল কথাটি লুকান থাকিলেও ধরা পড়ে।

যাঁহারা বলেন আমরা স্বরাজ্যের ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা দিতে পারিতেছি না বলিয়া উহা আমাদের জন্য মঞ্জুর হইতে পারিতেছে না, তাঁহাদিগকে এই একটা ছোট কথা বলিয়াই স্বরাজ্যের অর্থ বলিয়া দেওয়া চলে, যে আমরা সেই সর্ব্বজনীয় অধিকারের প্রার্থী যাহা হইতে অতি হীন বর্ব্বরকেও বঞ্চিত করা চলে না। তুমি যদি অবাধ গতি দাও আর ভারতীয় নামটির অপরাধে কাহাকেও না দাবাও, ও জাতীয় বিদ্বেষের ফলে মানুষকে পায়ের বলে দূরে ঠেলিয়া না দাও, তাহা হইলেই আমরা আমাদের প্রার্থিত স্বরাজ্য পাই। রেলের গাড়ীতে সকলেই সকল শ্রেণী অধিকার করিতে পারে না; এখানেও ক্ষমতার হিসাবে মানুষে আপনার যোগ্য অধিকার পাইতে পারে, যদি জাতিবিশেষের ছাপের দরুণ তাড়া না খায়। সমর-বিভাগ হইতে কেরাণিগিরি পর্য্যন্ত সকল চাকুরিতেই যদি জুটিবার মত লোক থাকে তবে জুটিবে। এখন আমাদের স্বাধীন বাণিজ্যের অধিকার নাই; সে অধিকার থাকিলে বহু অর্থব্যয়ে জাহাজ কিনিতে পারিতাম কি না ও জাহাজে আত্মরক্ষার উপায় করিতে পারিতাম কিনা তাহা একেবারে স্বতন্ত্র কথা। অধিকার থাকিতেও ক্ষমতার অভাবে কিছু না করিতে পারি, কিন্তু এখন অবাধ আশায় মাথা উঁচু করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা এদেশের লোকে কোম্পানি বাঁধিয়া রেল চালাইতে হয়ত পারি না, কিন্তু যদি পারি তাহা হইলেও রাজা আমাদিগকে সে কাজ করিতে অধিকার দিবেন কি না,—আমাদের জন্য ভূমি সংগ্রহ করিয়া দিবেন কি না, এইগুলি হইল আসল কথা। ভবিষ্যতের রিফর্ম্মে আমাদের অধিকারের মাত্রা আর কতখানি বাড়িবে, তাহার উপর স্বরাজ্য লাভ নির্ভর করা চলে না; ঐ ধরণের ক্রমোন্নতির আশা দিলে কেবল ইহাই বোঝায় যে আমরা মানুষমাত্রের প্রাপ্য সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিতেছি, যাহা অবাধভাবে না পাইলে কোন দেশের লোকের পক্ষে মনুষ্যত্ব লাভ অসম্ভব ও যাহা পাইবার পথে কোন হীনতা বা বর্ব্বরতা বাধা নয়। এই শ্রেণীর অধিকারলাভের নামই স্বরাজ্যলাভ।

ব্যবস্থাপক সভায় হউক, দেশ শাসনের দায়িত্বের যে কোন চাকুরিতে নিযুক্ত হওয়া হউক, দেশরক্ষার জন্য সামরিক কার্য্যে হউক, আর ব্যবসা বাণিজ্যের যে কোন দিকের কার্য্যে হউক ভারতীয়েরা সকল দিকেই সকল বিষয়ের অধিকারী ও তাহারা কেবল জাতির বিচারে কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত নয়—ইহাই যদি পূর্ণ মাত্রায় রাজার অনুজ্ঞায় প্রচারিত ও বিধিবদ্ধ হয়, তাহা হইলেই মানুষ মাত্রের অবশ্য প্রাপ্য অধিকার পাইবার পথ মুক্ত হয়। কোন স্বাধীন দেশের সকল লোকেই সকল শ্রেণীর দায়িত্বের কাজ ঘাড়ে বহিয়া কাজ করে না, তবে ক্ষমতা ও দক্ষতা থাকিলে যে কোন ব্যক্তিই যে কোন কাজ করিবার অধিকারী হয়—ইহাই হইল যথার্থ স্বাধীনতা। আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ থাকিতে পারে, শিক্ষিতে ও অশিক্ষিতে অতি মাত্রায় প্রভেদ থাকিতে পারে, আমরা শাসনের কাজে বা সামরিক কাজে অনভিজ্ঞ বা অপটু হইতে পারি, কিন্তু ইহার কোন অজুহাতেই মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে অগ্রসর হইবার সময়ে বাধা পাইতে পারি না।

* * * * *

পেটেণ্ট উপদেশ ও তিরস্কার—আমরা যাঁহাদের ক্ষমতায় শাসিত ও ইঙ্গিতে চালিত তাঁহাদের একটি বিশেষ ধরণের উপদেশ ও তিরস্কারের কথা বলিতেছি। মুসলমান সম্প্রদায়ের কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত ও অশিষ্ট লোক মাঝে মাঝে নানা উপদ্রব সৃষ্টি করিতেছে ও নানা রকম পাপ করিতেছে। যখনই এইগুলি ঘটে তখনই দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য ইংরেজি পত্রের সম্পাদকেরা ও তাঁহাদের মুরুব্বিরা অ-মুসলমানদিগকে একটি পেটেণ্ট উপদেশের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। তাঁহারা অ-মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন,—তোমরা সাম্প্রদায়িক বিবাদ মিটাও। অ-মুসলমানেরা কিরূপ বিবাদ তুলিয়া কাহাকে উত্তেজিত করিবার ফলে উপদ্রব ঘটিল, তাহা জানা নাই, তবুও পাপের জন্য উপদেশের পুরস্কার পায় অ-মুসলমানেরা। তাহার পর আবার যখন কোন রাষ্ট্রীয় অধিকারের কথা ওঠে, তখন খোঁটা খাইয়া মরে অ-মুসলমানেরা, যে তাহারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পুষিলে কোন অধিকার পাইতে পারে না। ইহার অর্থ কি এই নয় যে যাহারা এই অনিষ্ট সহিবে তাহারাই অপমান বহিবে? যাঁহারা বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্য রক্ষায় দক্ষ তাঁহাদের কাছে এই উপদ্রব প্রতীকারের উপায় স্বরূপে ঐ পেটেণ্ট উপদেশ ও তিরস্কার ছাড়া কি আর কিছু নাই? একের রোগে অন্যে কেন ঔষধ খায়—তাহাও সুবোধ্য নয়। হিন্দু ও মুসলমানদের নেতাদিগকে ডাকিয়া সভা-সমিতি করাইলে ও কতকগুলি প্রস্তাব নির্দ্ধারিত করাইলে কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই, বরং উহাতে দেশের কাছে মিথ্যা করিয়া ইহাই প্রচার করা হয় যে উভয় দলের নেতারা ক্রমাগত কোমর বাঁধিয়া বিবাদ করিতেছেন, আর তাহারই ফলে যত উপদ্রব ঘটিতেছে।

* * * *

চীনে অশান্তি—প্রাচীন ভারতে চীন সাম্রাজ্যের নাম ছিল মহাচীন, আর উহার আয়তন আগে ছিল প্রায় ভারতের তিনগুণ। এখন কাটিয়া ছাঁটিয়া যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতেও খাস ভারতের দ্বিগুণের অধিক। ভারতের সঙ্গে এক সময়ে এই মহাদেশের নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল; ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম চীনে যাইবার পূর্ব্ব হইতেও ভারতের সভ্যতা চীনদেশে সংক্রামিত হইয়াছিল, আর চীনের অনেক তান্ত্রিক পদ্ধতি ভারতে আসিয়াছিল। এখন সেদেশের কোন সংবাদ আমরা রাখি না: চীন দেশে যে ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব ঘটিতেছে তাহার খাঁটি খবরও

এদেশে পাওয়া দুঃসাধ্য। সাধারণভাবে এইটুকু জানা গিয়াছে যে, চীনের লোকেরা নূতন ধরণের প্রজাতন্ত্র শাসন চালাইবার জন্য চঞ্চল হইয়াছে, ও যাহাতে ইউরোপীয়েরা চীন রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হয় তাহার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে। চীনের সীমান্তে যে সকল ইউরোপীয়দের অধিকার ও উপনিবেশ আছে তাহাদের বাণিজ্যের ফলে চীন সম্রাজ্যের আয় হয় অনেক, তবুও সেদেশের লোকেরা ইউরোপীয় সংস্পর্শ এড়াইবার জন্য উদ্যোগী। বিভিন্ন ইউরোপীয়দের সমবেত নাম হইয়াছে Powers; এই Powers বা "ক্ষমতা"র বিরুদ্ধে চীনেরা অধিক দিন লড়িতে পারিবে না, কিন্তু এখন অনেক স্থান হইতে ক্ষমতার দলের লোকেরা কতকটা অপসৃত হইয়াছেন। চীনদেশের লোকের অতি গভীর ক্রোধ খৃষ্টান মিশনরি সম্প্রদায়গুলির উপর। অশান্তি দূর করিয়া যাহাতে ইউরোপীয়েরা আপনাদের পূর্ব্বস্থিতি ও বাণিজ্য রক্ষা করিতে পারেন তাহার চেষ্টা হইতেছে, ও এই উদ্দেশ্যে ইউরোপীয়েরা প্রায় স্থির করিয়াছেন যে খাস চীন দেশের মধ্যে ইউরোপীয় মিশনরিদের আড্ডা থাকিতে দেওয়া হইবে না। ইউরোপীয়েরা সামরিক উদ্যোগ করিতেও ছাড়িতেছেন না, তবে যাহাতে যুদ্ধ না বাধে ও কেবল ক্ষমতার দব্‌দবাই-এর জোরে স্থিতি রক্ষা করা যায় সেইরূপ মন্ত্রণাই চলিতেছে। গোড়ায় মিশনরিদের প্রচার আরম্ভের পর কিরূপে "হিদেন"দের দেশে ইউরোপীয় প্রভাব বাড়ে তাহা বহুদিন পূর্ব্বে হর্‌বর্ট স্পেন্সর্‌ যাহা লিখিয়া ছিলেন তাহার মর্ম্ম এই —আগে ধর্ম্ম প্রচার, তাহার পর কামানের শব্দ ও তাহার পরে দেশে ধূলা উড়ে। কালিদাসের একটি ছত্রে যদি "প্রতাপ" কথাটির স্থানে "প্রচার" বসান যায় তবে ঠিক ঐ অবস্থাটি বর্ণনা করা যায়, যথা—"প্রচারাগ্রে ততঃ শব্দঃ পরাগস্তদনন্তরম্"। এবারে চীনে "প্রচার" উঠিতেছে শুনিয়া আনন্দ হইল।

* * * *

আমাদের মেকি পার্লামেণ্ট—নূতন ধরণের ব্যবস্থাপক সভাগুলির জন্মদিন হইতে এই ছয় বৎসরের মধ্যে অনেকবার শোনা গিয়াছে, যে নিদানপক্ষে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ওরফে এসেম্‌ব্লিটি বিলাতি পার্লামেণ্টের মত আমাদের পার্লামেণ্ট। এবারে সরকারি হাতের টোকার আওয়াজে নির্ভুল ধরা পড়িয়াছে, উহা মেকি। দিল্লীতে তর্ক উঠিয়াছিল, বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র যখন আইনের নিখুঁত বিধানে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, আর তিনি ফৌজদারি আইনের বিচারে দণ্ডিত criminal নন, তখন তাঁহাকে পুলিসের নেঘাবানিতে রাখিয়া এসেম্ব্লিতে উপস্থিত করিয়া সদস্যের কাজ করিতে দেওয়া হইবে না কেন। বিলাতি পার্লামেণ্টের পদ্ধতিতে কাজ করিলে নির্ব্বাসিতের পক্ষে এরূপ অধিকার পাওয়া যে আইনসঙ্গত হয় তাহা শ্রীযুক্ত নেহেরুপ্রমুখ বক্তারা বলিয়াছিলেন। ঐ প্রশ্নের উত্তরে সরকারি উক্তিতে ধ্বনিত হইয়াছে,—এসেম্‌ব্লিটি পার্লামেণ্ট নয় ও পার্লামেণ্টের আইন-কানুন ধরিয়া এসেম্‌ব্লির কাজ চলিতে পারে না। স্পষ্ট সত্য কথা বড় উপাদেয়; আমাদের মেকি মজ্‌লিসগুলি যে স্বরাজ্যের হোতা ও ঋত্বিক নয়, আমাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষায় গড়া পদার্থ নয়, ইহা সরকারি মুখে ব্যক্ত হইয়া ভাল হইয়াছে।

সর্ব্বত্রই কর্ত্তার ইচ্ছায় কাজ চলিবে, অথচ অধিকারার পোষাকে মিনিষ্টার সাজাইয়া সদস্যদিগকে স্বাধীন কর্ত্তাগিরির অভিনয় করিতে হইবে। মিনিষ্টার নিয়োগের সময় আমাদের বড় কর্ত্তারা দেশের সুস্পষ্ট মনের প্রবল ভাবকে উপেক্ষা করিয়া কাজ করেন; তাই যাঁহার উক্তি ও নীতির বিরুদ্ধে এক বৎসর ধরিয়া তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলন হইল, এমন ব্যক্তিকে

সর্ব্বাগ্রে অতি আদরে ও আগ্রহে বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় মিনিষ্টার করা হইল। এ অবস্থায় মিনিষ্টার উঠিয়া গিয়া যদি সরকারি কর্ত্তৃত্বে কাজ চলে, তবে দেশের উপকার হয় অনেক। একদিকে মিনিষ্টারের দৌলতে স্বাধীনভাবে দেশের কাজ হইতে পারে না, অন্যদিকে এইরূপ নিয়োগ না হইলে লোকের মানসিক ক্লেশ ও সাম্প্রদায়িক মন কসাকসি জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। যাহা নিবারণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট শান্তি আনিতে চান ও নির্ব্বিরোধে কাজ করিতে চান, তাহাই যদি দৈবাৎ প্রশ্রয় পায়, তবে অবস্থা হয় শোচনীয়।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী বয়স্ক, অভিজ্ঞ ও আইনজ্ঞ; তিনি স্যর আবহুরের সহযোগে কাজ করিবেন না বলিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট স্যর আবহুরকে মিনিষ্টারির দপ্তর হাতে বসাইয়া এমন একজন হিন্দু সদস্য খুঁজিতে বলিলেন যিনি তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া কাজ করেন, কিন্তু সদস্যবর্গের কাহাকেও স্যর আবহুর তাঁহার সখারূপে পাইলেন না। এ অবস্থায় হয়ত স্যর আরহুরকে পদত্যাগ করিতে হইবে ও গবর্ণর বাহাদুরকে নূতন আর এক জোড়া লোক খুঁজিতে হইবে। মিনিষ্টার নিয়োগে আমাদের কোন আকাঙ্ক্ষা পুরিবে না, তবে কি পদ্ধতিতে এই নিয়োগের কাজ চলিয়াছে তাহা জানাইবার জন্য একথা লেখা গেল।

পার্লামেণ্ট ও আমাদের ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। বড়লাট সাহেব বলিয়াছেন, পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া না চলা, অথবা উহাকে কোনস্থলেও উপেক্ষা করিতে চেষ্টা করা ডাহা মূর্খতা। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে তাঁহার নিজের ক্ষমতা পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্বে শাসিত ও বঙ্গের নির্ব্বাসিতদের ভাগ্যের বিধাতা তিনি নহেন,—পার্লামেণ্ট। তবে তিনি যদি অভাগাদের মুক্তির প্রস্তাব করেন তবে সে প্রস্তাব যে রদ হইবার নয় এ কথাটা তিনি কেন বলেন নাই, জানি না। বলিয়াছেন যে পার্লামেণ্ট যদি মনে করেন,—যে এই মুক্তির ব্যবস্থায় এদেশে বিদ্রোহের পাপ বাড়িবে না, তবেই সে কাজ হইবে। এই বিদ্রোহের পাপের সঙ্গে নির্ব্বাসিতেরা যে যুক্ত, তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? এমন দেশ নাই যেখানে পাপিষ্ঠেরা পাপ করে না,—আর এদেশেও সম্প্রতি অনেক পাপের অনুষ্ঠান ধরা পড়িয়াছে। পৃথিবীর কোন দেশে যাহা হয় নাই, তাহা কবে হইবে,—ভারত কবে নিষ্পাপ হইবে, তাহার বুদ্ধির অতীত; কাজেই বিনা বিচারে নির্ব্বাসিতদের দুঃখ অনন্ত।

পুনশ্চ,—উপরের অংশ ছাপা হইবার সময় জানা গেল, সর আবদার ইস্তাফা দাখিল করিয়াছেন, আর শ্রীযুক্ত গজনবি ও ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মিনিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছেন।

শোক সংবাদ

ডাক্তার স্যর কৈলাসচন্দ্র বসু ৭৭ বৎসর বয়সে ৬ই মাঘ তারিখে জীবন লীলা শেষ করিয়াছেন। সারা কলিকাতার সমাজে তিনি আদৃত ও সম্মানিত ছিলেন, আর ইঁহার উদ্যোগে ও চেষ্টায় চিকিৎসা বিভাগের নানা দিকের নানা উন্নতি হইয়াছে। ইঁহার সৌজন্য, অমায়িকতা ও লোকানুরাগ আমরা বিস্মৃত হইতে পারিব না।

Editor · Bejoychndra Majumdar.
Printed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani Office, 77 Russa Road North, Bhawanipur, Calcutta.